সরদানা

অমরেন্দ্র দাস

ীগুরু পাবলিকেশন, ২৩নং নুর আলী লেন, কলিকাতা-১৪

Sardana
by Amarendra Das

প্রকাশ কে

এস.

৮৩, নূর আলী

কলিকাং

ছেপ

স্থান

"আমাে :

৮৩, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

কলিাত

সরদানা

একটি স্মরণীয় রমণীর জীবনালেখ্য

ইতিহাসের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে একটি রমণীর কথা বার বার মনে আসত, শোনা যেত কত বিস্ময়কর কাহিনী। কোনটা সত্য, কোনটা অসত্য। এমন কি এক এক সময়ে সবটুকু সত্য বলে ধরে নেওয়া হত। কেমন যেন আস্তে আস্তে সেই মেয়েটি সম্পূর্ণ পরিচিতা হয়ে উঠল। তখন আর কৌতূহল দমন করতে পারা গেল না। জাতীয় গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হল। অনুশীলন চলল। ধূলিমলিন কত গ্রন্থ এগিয়ে এল। শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'বেগম সোমরু' আমার প্রথম পঠিত গ্রন্থ। তারপর শ্লিম্যান, বেলিফন্টার, ভিক্টর জ্যাকুইমন্ট, হিগিম বথাম, উইলিয়ম ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতির বই। পড়ি আর বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। একটি রমণী কিন্তু সে কত ক্ষমতা শরীরে ধরত, যার তুলনা নেই। তুলনা যে কারুর সঙ্গে হয় না। মুঘলদের অবনতির যুগে তখন বহুশক্তির আবির্ভাব। জাঠ, মারাঠা, রোহিলা, আফগান, ইংরেজ, ফরাসী। চতুর্দিকে রণ কোলাহল। ষড়যন্ত্র। রক্ত তান্ডব। অন্তর্বিপ্লব। প্রত্যেক শক্তিই তখন ভারতের শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চায়। সেই সময়ে এই রমণী আপন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিতা হয়ে কি রাজ্য পরিচালনা, কি যুদ্ধ ক্ষেত্র, এমন কি পারিবারিক জীবনেও সে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। কোথাও হার স্বীকার করে নি। তবু বুঝি হার স্বীকার করেছিল নিজের জীবনে। নিজের অশান্ত প্রকৃতি বার বার সংযত করেও সংহত করতে পারেনি। মূল আখ্যানভাগের এই অন্তর্নিহিত অর্থটুকু নিয়েই বৃহৎ উপন্যাসের প্রস্তাবনা।

ইংরেজ ভারতবর্ষ জয় করেছিল। সমস্ত স্বাধীন রাজ্য করায়ত্ত করে, প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তবু বেগমের অনুরোধ তারা উপেক্ষা করে নি। 'সরদানার রাজ্য পরিচালনা তার মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষিত হয়েছিল। বীরদের সকলেই পূজা করে। ইংরেজ নিজেই বীরজাতি। তাই বীরাঙ্গনাকে স্তুতি জানাতে কার্পন্য করেনি। বীরের স্তুতি ছাড়া একজন নারী কিভাবে রাজ্য রক্ষা করেছিল সে ইতিহাসও কম কৌতু-হলোদ্দীপক নয়। লর্ড বেন্টিক ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার সময়ে বেগমকে 'সমাদৃত বন্ধু' বলে পত্র প্রেরণ করেছিলেন। 'To her Highness the Begum Sumroo.'

এই উপন্যাসটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, ঐতিহাসিক ডঃ প্রতুল গুপ্ত পড়ে বলেছিলেন; আটশো পৃষ্ঠার উপন্যাস আমাকে যে ভাবে ধরে রেখেছিল; আমি মুগ্ধ, বিস্মিত। এত দীর্ঘ বিরাট লেখার এমন শ্বাসরোধকারী বাঁধুনি আমি আর দেখিনি। প্রথম প্রকাশের উৎসর্গে ছিল।

যার কথা ভাবতে ভাবতে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়েছি, সেই

জোয়ানা নোবিলিসকে

'আল্লাটদেবীর দোহাই, এ যাত্রা আমাদের সুগম কর।' এই কথাগুলি বার বার সেই মরুসংকুল বিজনপথের যাত্রীদের মধ্য থেকে উচ্চারিত হয়ে সমস্ত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। দীর্ঘ পথ, এ পথ কোথায় গিয়ে শেষ হবে কেউ জানে না, তবু একদিন শেষ হবে এবং শেষ হ'লে মিলবে হিন্দুস্তানের মাটি। হিন্দুস্থানের মাটিতে আছে দুনিয়ার সেরা দৌলত। কষ্ট না করলেও মিলবে আহার, বাসস্থান, বেঁচে থাকার মত রসদ।

সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি ক'রেই একটি দল আরবের এই বিপজ্জনক মরু-প্রান্তর অভিযান ক'রে হিন্দুস্তানের দিকে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা পেঁছিতে পারবে তো? সন্দেহ তাদের মধ্যে আছে তবু তারা নিঃসন্দেহ এই ভেবে যে তারা আশাবাদী। সবাই না পেঁছিতে পারুক অন্তত কিছু যাত্রী নিশ্চয় পেঁছুবে। আর পেঁছিলে তারা পাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ।

সূর্য প্রখর আলো দেয় ব'লে দিনের অন্ধকার রূপ অপসারিত হয়। যদি একদিন সূর্য না ওঠে তাহলে দুনিয়া লয় হয়ে যাবে। সেইজন্যে কোন কোন দেশে সূর্যকেই দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়। এই সূর্য যেমন আলো দেয়, তেমনি দেয় প্রচণ্ড তাপশক্তি। যে শক্তির প্রভাবে কোন কোন অঞ্চল ত্রাহি ত্রাহি রব ছাড়ে। আরবের এই মরুপ্রান্তর সূর্যতাপে দিনের বেলা এমনি অবস্থা হয় যে মানুষ কেন কোন পশু সেই উত্তপ্ত শুষ্ক বালুকাময় প্রান্তরে একদণ্ড টিঁকতে পারে না। শুধু উষ্ট্রজাতির বিচরণ চলে এই শুষ্ক উষ্ণ অঞ্চলে। আর তারই ওপর সওয়ার হয়ে আরবের কষ্টসহিষ্ণু বেদুইনরা এই প্রদেশ পার হয়।

শুধু বেদুইন কেন বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা আরবে কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন যাপন করে। পাঁচটি প্রদেশ, যিমেন, হিজাজ, তিহামা, নেজদ্ যেমামা। কোন প্রদেশেই নেই পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য। তবু গর্বের এই আরব। এখানে ইস্লামী ধর্মগুরু মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বগদাদের মত শ্রেষ্ঠ রাজ্য এই আরবেই ছিল। এই আরবই একদিন গ্রীকবীর আলেকজান্ডার জয় করতে চেয়েছিলেন। খলিফা মানসুর, হারুন-অল্ রসীদ ও মামুন বাদশাহ এই বগদাদের সিংহাসনই শোভা করেছিলেন।

তবু ইস্রায়িল হালিম আলিকে চলে আসতে হ'ল। শুধু সে একা এল না, সঙ্গে তার সমস্ত পরিবারটিকে নিয়ে জন্মভূমি ছাড়তে হ'ল। যে জন্মভূমি শুধু অনাহার ও দুশ্চিন্তা উপহার দেয়, সে জন্মভূমি খোদা নিজের ক'রে রাখুন অন্তত ইস্রায়িলের মত লোকেরা পারবে না। হাজার হোক্ তারা তো মানুষ, মানুষের রক্ত যখন শরীরে, তখন উপবাস দিয়ে কি ক'রে বাঁচা যায়? যদি আল্লা উদরের উদগ্র জ্বালা নিবারণ ক'রে খাদ্যের কোন চাহিদা না রাখেন, তাহলে স্থানত্যাগের কোন ঝঞ্ঝাটই থাকে না।

অনেক ভেবেছে ইস্রায়িল হালিম আলি। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রে তারপর এই যাত্রা শুরু করেছে। একমাত্র পুত্র লুতুফ আলিকে জিজ্ঞেস করেছে। তার মতামত নিয়েছে তারপর আর দ্বিধা করেনি।

লুতুফ আলি তো ক্ষেপে গিয়ে আব্বাকে বলেছে,—তোর ঐ মুক্তোর ব্যবসা কি চলে? আর পিন্ডী খেজুর কেউ কিনতে চায় না।

ইস্রায়িল রাগ করেনি। সে বৃদ্ধ হয়ে আসছে। তার তেজ ক্ষীণপ্রায়। এখন শুধু কোন রকমে প্রদীপের সল্‌তেটা জ্বলছে। নিভলেই হয়ে গেল। তার জীবন কোনরকমে কেটেছে। তার বিবি আশনাই কোনদিন প্রতিবাদ করেনি। আজ দুনিয়া পালটে যাচ্ছে। জোয়ান মরদ লুতুফ ভাগ্যের দোহাই মানবে না। তার খুবানি মেওয়ার মত ভাগর জোরু। সেই জোরু আবার মরকত মণির মত এক লড়্‌কা পয়দা করেছে। সেই খুবসুরত জোরু উপোস করলে প্রাণে লাগবে না? তাই লুতুফ ক্ষিপ্ত হয়েছে। সেইজন্যে ইস্রায়িল রাগ করে না। লড়্‌কাকে সে ক্ষমা করে। আর লড়্‌কার চোখের তলায় অনাহারের কালিমা দেখে তার দিলে দর্দ আসে। 'হায়, কেন আমি বেঁচে আছি? মৃত্যু এলে তো এই বেদনা জাগতো না?'

তবু দ্বিধা! মহম্মদের দেশ এই আরব। হিজাজের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কা, মদিনা ছেড়ে যেতে কার মন চায়? যে দেশে আসবার জন্যে দুনিয়ার মুসলমানের প্রার্থনা, যে মক্কার বিরাট মসজিদ গাত্রে মাথা নোওয়াবার জন্যে কত দুর্গম পথ ভেঙে পুণ্যাত্মা মুসলমান আসে, সেই তীর্থভূমি চিরতরে ছেড়ে চলে যেতে হবে?

এত ভাবনার কিছু নেই। আরব থেকে বহুলোকই পারস্যোপসাগর, লোহিত-সাগর পার হয়ে অন্যান্য দেশে চলে যায়। বেদুইনরা কখনও নিজের দেশে দীর্ঘকাল থাকে না। সিনাই পাহাড়ের মরুস্থল থেকে সর্বদাই বেদুইনরা বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিচ্ছে। যাযাবর জাতি, তাঁবু খাটিয়ে যত্রতত্র বাসই তাদের জীবন। আর আহারের মধ্যে তন্দুর রুটি।

কিন্তু ইস্রায়িলরা বেদুইন নয় বলেই যত চিন্তা। তারা এসেছে সেমিতিক জাতি থেকে। সেমিতিক জাতি সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন। তারা হঠাৎ কোন অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতে পারে না। তাছাড়া এই আরবে জোক্তনের পৌত্র শেম প্রথম এসেছিল। সেই প্রথম পুরুষের উৎপত্তি থেকে এই জাতি আহূত বলে ইস্রায়িলের বংশের গর্ব ছিল। সেইজন্যেও দুশ্চিন্তা কম নয়।

যাহোক, ইস্রায়িল যত দুশ্চিন্তা নিয়ে জড়ভতের মত দিন কাটাক্‌, লুতুফ একদিনও আর অপেক্ষা করলো না। পিতাকে বললো, তোর সেই মরকত, বৈদুর্য, ইন্দ্রনীল মণিমানিক্যগুলো দে। বেচে দিয়ে একটা উট কিনে আনি।

সম্বল মাত্র ঐ। বহু বিপদ এসেছে জীবনে, অনাহারে কত বিনিদ্র রাত্রি দুঃসহ বেদনা নিয়ে পার হয়েছে, তবু ইস্রায়িল কখনও ঐ কটি দৌলত হাত ছাড়া করে নি। ঐ কটি মূল্যবান সম্পদই তার বুকের বল, পেশীর শক্তি। সেগুলি পুত্র চাইতে ইস্রায়িল বললে,—বেটা, ওগুলোর দিকে হাত বাড়াস না। আছে বলেই বুকে বল।

অন্যভাবে কি মরু-পশু কেনা যায় না ?

লুতুফ আব্বার ওপর কিছুমাত্র খুশি নয়। বরং এই নসীবের জন্যে পিতা দায়ী বলেই তার রাগ। তাই দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, —তুই কি আমার জোরু বেচে উট কিনতে বলিস্ ?

ইস্রায়িলের ইচ্ছা করলো, বেটাকে শাসন করে, ঠাস্ ক'রে দু'গালে চড় মারে। এত বড় আহাম্মকের মত যে কথা বলে তাকে ক্ষমা করা চলে না। কিন্তু জোয়ান মরদকে মারবার মত সিনা তার কোথায় ? এখন সে বৃদ্ধ, রক্ত তরল হয়ে গেছে। আল্লাকে মনে মনে প্রার্থনা জানানো ছাড়া তার আর কোন গতি নেই। তাই মনে মনে খোদাকে বেদনা জানিয়ে মুখে বললো,—বেটা, গোসা করিস্ না। যা আছে সে তো তোরই। তাই বলছি, অন্য ব্যবস্থা করে কি মরু-পশু কেনা যায় না ?

লুতুফ কিন্তু কোন অনুতাপ প্রকাশ করলো না। বরং ব্যবহার তার আরো চরম হল। সে আরো উত্তপ্তস্বরে বললো,—অন্য ব্যবস্থাটা কি হবে শুনি ? এতদিন ধরে সংসার করে তো যোগাড় করেছিস্ গরীবি ইজ্জত। লড়্কার জন্ম দিয়েছিস, তাকে দিস্নি ভালভাবে বাঁচবার অধিকার। আর আছে তো তোর সবেধন নীলমণি ঐ কটি পাথর। তোর যখন মরবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তখন দে তোর গুপ্তধন বের করে। একটা উট আর তিনটি ঘোড়া না সওদা করলে মরুঅঞ্চল পার হওয়া যাবে না।

ইস্রায়িল আর কোন কথা বললো না। আস্তে আস্তে রুগ্ন পেশীগুলিকে সবল করে, কোমরে হাতটা চেপে ধরে যন্ত্রণা বোধ করে, তারপর গুটি গুটি ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তারপর সমস্ত বল নিঃশেষ করে, স্বপ্নকে চোখ থেকে বিদায় দিয়ে মুঠি ভরে তুলে আনলো জীবনের যাবতীয় সম্পদ ! আনলো মাটির একটি হাঁড়ির মধ্যে কয়েকটি ছেঁড়া কাপড়ের তলায় ছিল তার যত্নে পোষিত আলাদিনের সম্পত্তি।

না, না, লুতুফ কেন তার আশনাইও জানে না, এ সম্পদ সে কোথা থেকে পেয়েছিল ? সে ইতিহাস যৌবনের। সে ইতিহাস ঐ লুতুফের মত এক জোয়ান মরদের। না, সে কথা থাক্। বড় মর্মন্তুদ সে ইতিহাস। আজ বয়েস হয়েছে, অনেক দুঃখ কষ্টের ভেতর জীবন পার হয়েছে। আজ চিন্তা করতেও ভয়ে হাত-পা শিটিয়ে যায়। আজ প্রশ্ন জাগে, সেদিন কেন ঐ কান্ডটা করেছিলাম ? কেন হত্যা করলাম সেই মৃত পুরুষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীটিকে ? তবে কি সামান্য কটি পাথরের জন্যে তাকে হত্যা করলাম ?

এ প্রশ্ন যতদিন দেহে আসুরিক শক্তি ছিল, আসেনি। বার্ধক্যের জরা দেহ কবলিত করতেই অতীতের যত অন্যায় এসে মনে বাসা বেঁধেছে। আর সবচেয়ে বেশী মনে হয়েছে, সেই যুবতী রমণীকে। কারণ তার দেওয়া পাথরগুলি আজও আছে।

লুতুফ যদি আজ সে কাহিনী শোনে, তাহলে নির্ঘাত তাকে হত্যা করবে। পিতা বলে ক্ষমা করবে না। কারণ লুতুফ সুন্দরী যুবতীদের জীবনের মূল্য সবচেয়ে বেশী বেশী বলে মনে করে। তাছাড়া তার যুবতী জোরুও সুন্দরী। তার আব্বা এক সুন্দরী যুবতীকে গলা টিপে হত্যা করে এই পাথরগুলি যোগাড়

করেছে জানলে নির্ঘাত সে বড় ছোরাখানা আমুল পিতার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে।

তাই ইস্রায়িল ভয়ে সে কথা ভাবতে চায় না। বাতাসের চোখ আছে, দেয়ালের কান আছে। যদি তারা মনের কথা পড়ে জোয়ান বেটাকে বলে দেয়।

বহুকাল আগের সে কাহিনী। একদিন সাগর থেকে ফেরার পথে হঠাৎ মরুস্থল থেকে কান্নার রোল কানে পেঁছোয়। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে পৃথিবীকে গ্রাস করেছে। ইস্রায়িল তখন নৌকো করে সাগরে মাছ ধরে বেড়াতো। সন্ধ্যা নেমে এলে তাই সে নৌকো পাড়ে তুলে তাকে ভাল করে ঠিক জায়গায় রেখে ক্লান্ত হয়ে বালির পাহাড় ভেঙে ফিরত, সেদিন ফিরছে, সেইসময় সেই কান্না।

সাগরের পাড় ধরেই ধুধু মরুভূমি। দিনের বেলায় বালি সূর্যের তাপে তেতে জ্বলন্ত ইস্পাত হয়ে থাকে। রাত্রিবেলা অবশ্য অন্য আবহাওয়া। সাগরের জলীয় বাষ্পতে শীতের কনকনে আমেজ।

তবে এসব পরিবেশ ইস্রাইলের জানা। তাই অসুবিধার কিছু নেই। মুখে একমুখ ঝুল দাড়ি। একখানি বিরাট কাপড় মাথা থেকে আলখাল্লার মত পিছন দিকে ফেলা। মাথাটি কাপড়ের বেষ্টনে দড়ি দিয়ে বাঁধা। আরববাসীর এই রীতি সমস্ত পুরুষদের মধ্যে। সেই আলখাল্লায় দেহ আবরিত করে ইস্রায়িল ক্লান্তিতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরছিল।

হঠাৎ মরুস্থল থেকে কান্নার ঝটিকা ইস্রায়িলের পথ চলায় বাধা দিল। সে থমকে দাঁড়িয়ে একবার দাড়িতে হাত বুলোল।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই, বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরে কোন অপরিচিত মুসাফির পথ না চিনে এলে বিপদে পড়ে। হয়তো তেমন কেউ বিপদে পড়েছে।

কিন্তু ইস্রায়িল থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, রমণীর কান্না শুনে। আর কান্না খুব দূরে নয়, অতি নিকটে। কিন্তু কাঁদছে যে তার কন্ঠটি আশ্চর্য সুন্দর। কান্নাও যে সময় সময় ভাল লাগে, সেই প্রথম জানলো ইস্রায়িল। তাই তার ভাবনা।

অবশ্য মনেও তার কু-অভিপ্রায়। জোয়ান মরদ দিনরাত মেহনত করে করেই বেশী ক্লান্ত। এখনও শাদী ভাগ্যে জোটেনি। অথচ যৌবনের অঙ্গার দগ্ধ করছে বুকের কলিজা। সেইজন্যে দুষ্ট মতলব জাগা বিচিত্র নয়।

আর তারই জন্যে ইস্রায়িল দাঁড়িয়ে পড়ে ভাবছে। ঐ কন্ঠ যদি কোন সুন্দরীর হয়? হয় যুবতী খুবসুরত জোয়ানী লড়কীর। তাহলে কোন বাধা না, কারও শাদী করা পেয়ারী জোরু হলেও ইস্রায়িল তাকে তুলে নিয়ে পালাবে। কিন্তু এ কথা সেই মুহূর্তে সেই সময় ইস্রায়িল কেন ভাবল তা সে জানে না। অবশ্য এমনি গুরুত্বহীনভাবে ভাবে নি। ভাবনার মধ্যে নিশ্চয় সেই কামজর্জরিত শয়তান ছিল।

যাহোক, ইস্রায়িল অদম্য কৌতূহল নিয়ে সেই কান্নার নিশানা ধরে ছুটল। পথ যত নিকট মনে করেছিল, তত নিকট নয় তা ছুটেই বুঝতে পারলো। বালির গর্তে হাঁটু পর্যন্ত পা ডুবিয়ে দিয়ে বার বার আছাড় খেতে খেতে এক চাপবাঁধা অন্ধকারের সীমিতে গিয়ে ইস্রায়িল পেঁছিলো।

কান্না তখন মন্দীভূত হয়েছে। তবে একেবারে বিলীন হয়নি।

ইস্রায়িল সেই কান্নাকে উদ্দেশ্য করে বললো,—কে আছ তুমি? কেন কাঁদছো? আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয়, বলো, আমি তা করতে রাজী আছি।

সেই কণ্ঠ হঠাৎ মধুবৃষ্টি করে বললো,—যুবক, আমি তোমারই মত একজন উদ্ধারকর্তা আশা করছিলাম। যখন মেরে খোদা তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, তাহলে আমার স্বামীর একটা গতি কর।

ইস্রায়িল বললো,—তোমার স্বামীর কি হয়েছে!

সেই অপরিচিতা অন্ধকারে আবার কেঁদে উঠলো, কাঁদতে কাঁদতে বললো,—আমার স্বামী মরে গেছে। এই দুর্গম পথ জলাভাবে পার হতে না পেরে তেষ্টায় ছাতি ফেটে ঘুমিয়ে গেছে।

তখন ইস্রায়িল জিজ্ঞেস করলো;—তোমার কাছে আলো জবালার ইন্ধন আছে?

অপরিচিতা বললো,—থাকলে আমিই কাপড় জবালিয়ে আলো করতাম। কেঁদে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হত না।

ইস্রায়িল আর কোন কথা না বলে তার পিরানের জেব্ থেকে দুটি চকমকি পাথর বের করলো—দাও তোমার কি কাপড় আছে?

অপরিচিতা অন্ধকারে একটু চুপ করে থাকলো। কাপড় বলতে তার পরনে একটি অঙ্গদ, আর মৃত স্বামীর পরনে একটি। আর সব দস্যু শয়তানরা নিয়ে পালিয়েছে।

ইস্রায়িল চকমকি পাথর ঠুকে ঝিলিক দিয়ে আলো বের করলো। সেই আলোতে সে এক লহমায় দেখে নিল অপরিচিতাকে। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে চমকে উঠলো। এ কি এ যে সেই শোনা কথা, বগদাদের হারেমের জৌলুস? তা বগদাদ রাজসভা তো অস্তমিত! রূপসী এলো কোথা থেকে? তবে কি বাদশাহ খলিফার বাইশ হাজার রূপসীরা এখনও আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আবার ইস্রায়িল চকমকি ঠুকলো। আবার ঝিলিক দিল একটুকরো হীরার ঔজ্জ্বল্য। সেই ঔজ্জ্বল্যে অপরিচিতার দেহবর্ণ প্রতিফলিত হ'ল।

ইস্রায়িল কেমন যেন পাগল হয়ে গেল। মাথাটা কেমন যেন উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। চতুর্দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে সে আর একটু এগিয়ে গিয়ে চাপাস্বরে বললো,—তুমি কোত্থেকে আসছো বিবি? যাবে কোথায়?

অপরিচিতা বললো,—আসছি য়ুমন থেকে। যাবো হিজাজের তীর্থস্থানে। তারপর লাসায় আমার আত্মীয়ের বাড়ি ঘুরে আবার য়ুমনে ফিরবো। কিন্তু আল্লা সব আশাই জলাঞ্জলি দিলেন। তখন বার বার করে বলেছিলাম একটি উট ভাড়া নিতে। তা না নিয়ে ঘোড়া নিল, পথে ঘোড়া মরে গেল, পদব্রজে আসতে গিয়ে দস্যুরা সব কেড়ে নিলে।

অপরিচিতা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থামলো।

ইস্রায়িলের কিন্তু তখন কিছুই শুনতে ভাল লাগছিল না। তার অন্য

মতলব। বললো,—যা হবার সে তো হয়ে গেছে। এখন আমার দ্বারা কি সাহায্য চাও বলো ?

তখন অপরিচিতা বললো,—আমার কাছে কটি মূল্যবান মণি পাথর আছে, সেগুলি বেচে যদি স্বামীকে মাটি দেবার জায়গা করে দাও, ভাল হয়। আর আমাকে বাসায় পৌঁছে দাও।

ইস্রায়িল কোন কিছু না ভেবেই অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে বললো,—দাও মণি-পাথরগুলি, দেখি কদ্দুর কি করতে পারি !

অপরিচিতা সেই মরকত, বৈদূর্য, ইন্দ্রনীল মণিমাণিক্যগুলি ইস্রায়িলের প্রসারিত হাতে দিল।

ইস্রায়িল সেগুলি হাতে করে অন্ধকারেই অনুভব করলো তার দ্যুতি। তারপর সেগুলি জেবের মধ্যে ফেলে দিয়ে বললো,—তুমি এখানেই থাক, আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যেও না। এই বলে ইস্রায়িল আবার পিছন ফিরে দৌড় মারলো।

কিন্তু কিছু পথ গিয়ে ইস্রায়িল থমকে দাঁড়িয়ে চুপ করে ভেবে নিল তার কর্তব্য। তারপর একটু সময় নিয়ে আবার সেই অপরিচিতার কাছে যাবার জন্যে ছুটলো।

এবার সে গিয়ে পৌঁছলো মনটিকে সম্পূর্ণ কঠিন করে। যে কাজ সে করতে চায়, তাতে দুর্বলতা শোভা পায় না। বরং শক্তি সংগ্রহ না করলে বলপ্রয়োগ করা যাবে না। আর বলপ্রয়োগ না করতে পারলে মিলবে না সে যা চায়।

তাই কাছে গিয়ে বললো,—সাগরের কিনারে আমার নৌকো বাঁধা আছে, সেখানে আছে আমার গর্ত করবার অস্ত্র, তুমি যদি আমার সঙ্গী হও তাহলে সেখানে গিয়ে একটি গর্ত খুঁড়ে তোমার স্বামীর গতি করতে পারি।

অপরিচিতা দ্বিধা না করে বললো,—বেশ, কিন্তু স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যেতে তুমি সাহায্য কর।

ইস্রায়িল বললো,—না, না এখন নয়। মৃতদেহ এখানে থাকুক, আগে সেখানে গিয়ে গর্ত খুঁড়ে তারপর নিয়ে যাব।

অপরিচিতা বললো,—কিন্তু মৃতদেহ একলা ফেলে যাওয়া কি উচিত হবে ?

ইস্রায়িল বললো,—উপায় কি ?

তখন অপরিচিতা আর প্রতিবাদ করলো না। ইস্রায়িলকে অনুসরণ করলো।

তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল। চাঁদ উঠি উঠি করছে। নক্ষত্রও আসমানের জমিনে সলমা চুমকির বুটি বসিয়েছে।

ধুধু মরুপ্রান্তর এবার দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। জনমানবহীন ভয়াবহ সেই প্রান্তর কেমন যেন দৈত্যের মত হাঁ করে মুখব্যাদান করেছে।

এবার উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। ইস্রায়িল সেই অপরূপ সুন্দরী যুবতী রমণীকে স্পষ্ট দেখতে পেল। রমণী ইস্রায়িলকে দেখলো।

রমণী কি ভাবছিল বোঝা গেল না কিন্তু ইস্রায়িল কি ভাবছিল বোঝা গেল। ইস্রায়িলের রক্তস্রোতে তখন দানবীয় আদিম প্রবৃত্তি শয়তানের রূপ নিয়ে সুযোগ

খুঁজছে। পেশীবহুল বলিষ্ঠ হাত দু'খানিতে যেন কিসের জিজ্ঞাসা!

রমণীর পরণে ছিল একটি কালো পোষাক। সালোয়ার, কামিজ পরা ও ওড়না দিয়ে মাথায় অবগুণ্ঠন টানা। সে চলছিল যখন তার অবগুণ্ঠনের অনেকটা উপরে তোলা। মুখখানি সে অবগুণ্ঠন মোচন করে রাত্রির রহস্যময় আলোকে ধরেছে। চোখ দুটি ডাগর ও সুরমালাঞ্ছিত। সেই চোখের দিকে আড়নয়নে তাকিয়ে ইস্রায়িল বুকে হাত দিল। হঠাৎ সে নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না, কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে উঠলো। কেমন যেন তার প্রবৃত্তির পাশবিকতা সপ্তমে উঠলো।

একবার বিবশ চোখে সে চতুর্দিকে কত পথ এসেছে তার একটা পরিমাপ করে নিল। সাগর এখান থেকে আর বেশীদূরে নয়, ঠান্ডা মিষ্টি আবহাওয়া ছুটে আসছে। এখান থেকে চীৎকার করলে কেউ শুনতে পাবে না। কেউ জানতেও পারবে না, এই রাতের রহস্যালোকে এই মরুপ্রদেশে কি ঘটে গেল। দূরে অসীম জলরাশির প্লাবন, দিনের বেলা হলে সিনাই পাহাড়ের বহুলোক নৌকা নিয়ে পারস্য উপসাগরের এই খাসাই জলস্রোতে মাছ ধরতে আসতো কিন্তু রাত্রিবেলা খাসাই কেন, বেলে, মুসা কোন জলস্রোতেই কোন লোক নেই। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যার প্রাণ নিয়ে ঘরে চলে গেছে।

না, আর ভাবনা মনে আসছে না। জোয়ান দেহের শিরাগুলিতে যেন রক্ত চলাচল দুর্দাম হয়ে উঠছে। হঠাৎ ইস্রায়িল ঘুরে দাঁড়ালো, দাঁড়িয়ে সেই রূপসী তরুণীকে অতর্কিতে জাপটে ধরে মাটিতে শোয়ানোর চেষ্টা করলো।

অতর্কিত আক্রমণ। তরুণী বিহ্বল হয়ে, কেমন যেন দুর্বল হয়ে গেল। মৃত স্বামীর কবরের জন্য তার ভাবনা ছিল। নিজের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দুশ্চিন্তা ছিল। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আগ্রহান্বিতা ছিল কিন্তু কেউ যে তাকে আক্রমণ করে তার রমণী ইজ্জত লুন্ঠন করবে, এ তার ধারণা ছিল না। তাই অতর্কিত আক্রমণে প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়লো, তারপর চাঁদের আলোয় আক্রমণকারীর মুখ দেখে, তার দু'চোখের শয়তানী দৃষ্টি দেখে কেমন যেন ইজ্জত রক্ষার চেষ্টা ছেড়ে দিল। তারপর হঠাৎ কি মনে পড়তে নিজের কোমরে লুক্কায়িত একটি বক্রাকৃতি ছুরিকা টেনে বের করলো।

ইস্রায়িল তখন একটানে তার আলখাল্লা খুলে ফেলে তরুণীর বুকের ওপর চেপে বসেছে। আর রূপসী রমণী বালির স্তুপের ওপর শুয়ে আকুল হয়ে হিংস্র পুরুষের দিকে তাকিয়ে আছে। এইসময় সে ছুরিকাটি কোমরের কামিজের তলায় অনুভব করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে তা বের করে ইস্রায়িলের পেটের তলায় চালিয়ে দিল।

অব্যর্থ লক্ষ্য। ইস্রায়িল সঙ্গে সঙ্গে তলপেটের নরম মাংস চেপে ধরলো। বোধহয় রক্তও ছুটে চললো। কিন্তু ইস্রায়িল সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে জিঘাংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠলো। তখন তার শক্তি অসীম। আদিম প্রবৃত্তি ও জিঘাংসার বাসনা একসঙ্গে মিলে অন্য এক মানুষে রূপান্তরিত করলো তাকে। সে আর ছেড়ে দিল

না রূপসীর অঙ্গারসম লুব্ধ দেহটিকে। পুরুষের ক্ষমতায় রমণীকে যেটুকু অত্যাচার করা যায়, তার সবটুকু নিঃশেষে প্রয়োগ করে যখন ইস্রায়িল উঠে দাঁড়ালো, তার কামিজ রক্তে লাল হয়ে গেছে।

রমণীটি অচৈতন্য। তার বেশবাস ছিন্নভিন্ন। এমনকি লজ্জার আবরণও সেই রাত্রের রহস্যময় আলোর চোখের সামনে মুক্ত। কিন্তু ইস্রায়িলের সেদিকে লক্ষ্য দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না। তার অতৃপ্ত যৌবন কুসুম জোয়ান মরদের রক্তে চঞ্চল, রমণী তার প্রয়োজন ছিল, সে তা পেয়েছে। উপভোগ করেছে কিন্তু সে বিক্ষিপ্তভাবে। শান্তি মেলেনি, স্বস্তি মেলেনি, সুখও কোথায়? এবং তল-পেটের ক্ষতস্থান দিয়ে প্রবলভাবে রক্ত ঝরে যাচ্ছে।

হঠাৎ ইস্রায়িল রাত্রের স্বপ্নময় আলোয় বালির ওপর শোয়ানো রমণীর অচৈতন্য দেহটির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। যে রূপসীকে সে প্রথম দেখে বগদাদের বাদশাহ খলিফার হারেম শোভা বলেছিল, যাকে পাবার জন্যে তার এই অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা, তার দিকে তাকিয়ে আবার ইস্রায়িল উন্মত্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু এবার উন্মত্ততার ধরণ আলাদা, সে রমণীটির কন্ঠটি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরতে গেল।

ওদিকে তার তলপেটের নরম মাংস ফুঁড়ে রক্ত ছুটে আসছে। আর বিলম্ব করলে অধিক রক্তক্ষরণে তার প্রাণ সংশয় হবে। তাই ত্বরিৎপদে ছুটে গিয়ে নিজের পেশীবহুল দু-হাত দিয়ে রমণীটির কন্ঠটি চেপে ধরে বারকয়েক ঝাঁকি দিল। ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে যখন দেহটি বারকয়েক ছটফট করে নিস্পন্দ হয়ে গেল, তখন সে রমণীটির হাত থেকে দুটি চাঁদির বালা ও কান থেকে দুটি মুক্তোর কুন্ডল খুলে নিয়ে ছুট্ দিল।

সে বালা ও কুন্ডল, একবার আশনাইয়ের খুব অসুখ করেছিল, তখন বাধ্য হয়ে বিক্রি করেছিল।

লুতুফ ঘরের বাইরে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে তখনও ছটফট করছিল। অধৈর্য হয়ে উঠতে সে চিৎকার করে বললো,—কিরে, আব্বা, তুই কি ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?

ইস্রায়িল পিঠের মজাটা চেপে ধরে যন্ত্রণা চাপতে চাপতে বাইরে এসে পুত্রের হাতে সেই মণিপাথরগুলি সঁপে দিল।

লুতুফ হাতে নিয়ে পাথরগুলি যাচাই করতে করতে বললো,—আমি চললাম লাসায়। এই পাথরগুলি বেচে তিনটি ঘোড়া, একটি উট, কিছু পোষাক ও খাদ্যবস্তু কিনে আনবো। কৃষ্ণপক্ষ গেলে শুক্লপক্ষ এলেই এদেশ ত্যাগ করবো।

ইস্রায়িল আর কোন কথা বললো না। সে ভীরু চোখে মুখখানি অন্য পাশে ধরে থাকলো। তার তখন মনে সেই দুষ্কার্যের অনুশোচনা। আর ভাবনা, এই অতীত ইতিহাস কেউ যেন না জানতে পারে। অন্তত লুতুফ যেন অনুমানও না করতে পারে। তাহলে এই বৃদ্ধ বয়েসে তার অনেক হয়রানি। অনেক তক্‌লিফ।

আরব থেকে হিন্দুস্তান।

সে এক বিস্তীর্ণ দুর্গম অঞ্চল। কত পাহাড়, পর্বত, নদনদী, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, দ্বীপ, তার ওপর সবচেয়ে ভয়ংকর মরু অঞ্চল। ধুধু বালুকার প্রান্তর পার হয়ে অমৃতময় প্রদেশ হিন্দুস্থানে পেঁছিনো বড়ই কষ্টসাধ্য। জলাভাবে এই মরুস্থল পার হওয়া মৃত্যুর মতই কঠিন। মৃত্যুর মতই ভয়ংকর এই বালুকাময় উত্তপ্ত ধরিত্রী দিনের বেলায় সূর্যের তাপে এই বালুকাময় ধরিত্রী যেন আগুনের প্রদাহ নিয়ে শয়-তানের রূপ পরিগ্রহ করে। তাই মানুষ এই মরুভূমি পার হতে ভয় পায়। তবে আরববাসী কতকগুলি কৌশল জানে, কোন্ সময় এই মরুস্থলপার হলে প্রাণ-রক্ষা হয়, তা তার জানা। তবু ভয়ভাব অপসারিত হয় না, কারণ মরুভূমি যেন প্রাণ নেবার জন্যেই ওত পেতে থাকে। পথে চলতে চলতে বালুকা গহবরে বহু কঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখা যায়; যা এই মরুভূমিরই কোরবানী।

সে সব কথা লুতুফ বা ইস্রায়িল জানে না, তা নয়। জানে বলেই লুতুফ তোড়-জোড় কম করলো না। লাসা থেকে তিনদিন পরে তিনটি শক্তিশালী ঘোড়া, একটি ভারবাহী উট, কিছু পোষাক বিশেষ করে আম্মা আশনাই ও জোরু ফতুমার জন্যে কিনে আনলো। সঙ্গে দুটি মোটা শীতবস্ত্র ও লুতুফের বাচ্চা বেটা হানিফের জন্যে একখানি বিচিত্র কামিজ। দুটি শীতবস্ত্র কেন কিনলো জিজ্ঞেস করলে বলতো, যত অসুবিধা পোয়াতে হবে তার আব্বা ও তাকে। সেইজন্যে রাত্রিকালের পরিবেশ থেকে বাঁচবার জন্যে এই মোটা পোষাক। আব্বার জন্যে লুতুফের কম ভাবনা নয়। লোকটা তিনকাল শেষ করে বৃদ্ধ হয়েছে। আগে অনেক দুষ্কর্ম করেছে তাই এখন কোমর তুলে দাঁড়াতে পারে না। যন্ত্রণায় নীল হয়ে থেবড়ে বসে পড়ে। তার জন্যেই ভাবনা। অশ্বপৃষ্ঠে উঠে এত পথ চলতে পারবে কিনা সন্দেহ। মরবে বুড়ো। হজরতের নাম নিতে নিতেই মরবে। তার জন্যে লুতুফ যাওয়া স্থগিত করবে না। যাবে যখন মনস্থ করেছে যাবেই।

খাদ্যদ্রব্যও কিছু লুতুফ যোগাড় করেছিল। পথ কতদিনে শেষ হবে জানে না। তাই বিভিন্ন রকম খাদ্যবস্তু নিয়েছে। নিয়েছে কিছু মেওয়া, পিণ্ডী খেজুর, বাদাম, খুবানি, সেব, নাসপাতি, বিহিদানা আর আরবি-বাবুল ও বালসাম। আর একটু বেশী পরিমাণে জনারের ভুসি! কঙ্গুর রুটির চেয়ে এই জনারের রুটি পেটে অনেকক্ষণ থাকে, তাই লুতুফ বুদ্ধি করে জনার নিয়েছে অনেক। অবশ্য জনারের সঙ্গে যব নিতেও ভোলেনি। কারণ জোরু ফতুমা যে জনারের রুটি খেতে পারে না, সে কথা সেইমুহূর্তে লুতুফের মনে এসে গিয়েছিল।

আরো লুকিয়ে নিয়েছে কিছু আঙুর। টসটসে লাল মিঠা আঙুর। ঠিক ফতুমার গাল দুটির মত। ফতুমা এই দু'বরস হ'ল একটা বাচ্চা পয়দা করেছে কিন্তু যৌবনটা যেন আরো খোলতাই হয়েছে। কতদিন ঘরে উপোসে কাটে দিন, সকলের চোখের তলায় কালিসিটে পড়ে কিন্তু ফতুমার দুধে আলতা রঙ আরো খোলতাই হয়।

লুতুফ কতদিন বিস্ময়ে ফতুমাকে জড়িয়ে ধরে ভেবেছে—দুনিয়ার এই নিয়ম কেমন করে হ'ল ? ফতুমা ঠান্ডাপানি খেয়েই লুতুফের বিছানায় এসে শুয়েছে।

সেই ফতুমার জন্যে সে আঙুর নেবে না ? ফতুমা যে বড় আঙুর খেতে ভালবাসে। সাধ তার অনেক আছে। ফতুমার জন্যে অনেক কিছু কিনতে মন চায়, কিন্তু ঐ শয়তান খোদাই তার হাত বেঁধেছে। না হলে, সে কি পেয়ারী জোরুর সাধ অপূরণ রাখতো ?

সেইজন্যে পয়সা পেয়েই কিনেছে আঙুর। আর কিনেছে একফালি একটি কাঁচুলি। হ্যাঁ, শহরের লোকেরা তাকে কাঁচুলিই বলে। তাছাড়া সে শহরে গিয়ে সুন্দর সুন্দর রমণীদের দেখেছে ঐ পোষাক পরতে। একটুকরো একটি কাপড়ের ফালি। অবশ্য সেই কাপড়ের ফালিটি অনেক রকমের হয়, মসলিন, মখমল, ভেলভেট সাটিন নানারকমের। এ সব কথা জানলো সে ঐ দোকানে গিয়ে। তা না হলে কার বুকের দিকে তাকিয়ে দেখবে ? তবে দেখেছে আড়চোখে লাসার ছোট ছোট কাঠের বাড়িগুলির জানলা দিয়ে। ঢোলা কামিজের ভেতরে উত্তুঙ্গবক্ষের স্তম্ভচূড়া বাঁধতে ঐ কাঁচুলির আশ্রয়। কাঁচুলি বাঁধলে রমণীর বক্ষসৌন্দর্য বেশ আঁটোসাটো হয়। আর দেখায় বেশ লাবণ্যময়ী ও সুসজ্জিতা।

ফতুমার কথা ভেবেই লুতুফ সেইজন্যে একটি গোলাপী কাঁচুলি কিনে ফেললো। এখন আর লড়্কাটা দুধ পান করে না। স্তম্ভের স্ফীতভাব অনেক মন্দ। এইসময় কাঁচুলি বাঁধলে বেশ বাহার হবে। ফতুমা হয়তো লজ্জায় রাঙা হয়ে 'ধেৎ' বলে পালাবে, তবু জোর করে লুতুফ ফতুমাকে কাঁচুলি পরাবে। জীবনের আনন্দ আর আছে কি ? এইটুকু যদি না থাকলো তবে মক্কার পুণ্যপানিতে জীবন আহুতি দিলেই তো শেষ !

সঙ্গে আরও দুটি নফর গোছের লোক লুতুফকে সওদা করে নিল। এরকম ভাড়া করা জোয়ান মর্দানা আরবের সর্বত্র কিনতে পাওয়া যেত। গরীব দেশ বলে লোকের প্রাণের মূল্যও শস্তা। দুটি লোককে সঙ্গে নেবার জন্যে লাসার এক সরাইখানায় খোঁজ করতে মিলে গেল আবেদীন ও মোস্তাফাকে। দুটি মর্দানাই অভাবী। সরাইখানায় পড়ে থাকে কোন আমীর মুসাফিরের আশায়। তাদের দয়া হলে মিলবে দুমুঠো খানা। সেই পেয়েই তাদের জীবন।

সরাই-মালিকের খবরদারীতে আর লুতুফের দুর্লভ সংবাদে দুজনেই এক কথায় রাজী হয়ে গেল। তারাও যাবে হিন্দুস্তানে। ভাগ্যকে ফেরাতে হবে। হিমালয়ের অপর পারে নাকি হীরা জহরৎ মাটিতে পড়ে আছে। সেখানে কোন অভাব নেই। সবাই আমীর।

কিন্তু আবেদীন, মোস্তাফা দুজনেই কবুল করিয়ে নিল,—কর্তা, তবে একটা বাত আছে, হিন্দুস্তানে পেঁৗছে কিন্তু আর কোন খিদমত খাটবো না। তখন আমাদের মতলব আমাদের পথ। তখন যে বলবেন, না তোমাদের আরব থেকে হিন্দুস্তানে এনেছি, তোমাদের জান্ আমার, সে হবে না।

লুতুফ কথা দিল,—আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে।

সেই আবেদীন ও মোস্তাফাই তিনটি ঘোড়া ও একটি উটকে কায়দা করে তার ওপর লুতুফের কেনা যাবতীয় জিনিস চাড়িয়ে লাসা থেকে বাড়ি চলে এল।

সন্ধ্যার মুখে সে বাড়ী এসে পেঁছেছিল। তাই রাত্রিটা বেশ ভালই কাটলো। লুতুফ লাসা থেকে কিছু মাংস কিনে এনেছিল, সেই মাংস ও জনারের রুটি। তোফা।

ইস্রায়িল পুত্রকে দেখে আর তার সঙ্গে লটবহর দেখে মনে মনে কি যেন বিড়বিড় করতে লাগলো। লুতুফ এক সময় কাছে আসলে সে শুধু নিম্নস্বরে জিজ্ঞেস করলো,—বেটা, মণিগুলো কি সবই বেচেছিস্ ?

লুতুফ আব্বার মুখের দিকে তাকিয়ে চটে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু চটলো না। কারণ সে বুঝতে পারলো, অনেক দিনের গচ্ছিত সম্পত্তি খোয়া গেছে বলে আব্বা মনকষ্টে ভুগছে; তার ওপর দুঃখ দেওয়া অনুচিত। হঠাৎ তার কি মনে পড়ে যেতে ছুটে ঘর থেকে কি যেন নিয়ে এসে পিতার সামনে ধরলো।

ইস্রায়িল কোমরের ব্যথাটা চাপতে চাপতে মুখব্যাদান করে বললো;—কি এটা ?

লুতুফ কন্ঠে একটু মোলায়েম মাখন ঢেলে বললো,—খুলেই দেখ না: খুস্ হবি।

একটু বড় মতন একটি পাতার মোড়ক।

ইস্রায়িল তাচ্ছিল্যভরে মোড়ক খুলে ফেললো। ভুরভুরে সুগন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গেল। এ খুস্বু ইস্রায়িলের বহু পরিচিত। মদিনার তীর্থ মসজিদের ধারে সালাউদ্দিন খোরসান আলি সাহেবের দোকানের বিখ্যাত তামাকু। এ তামাকু একটু সেবন করলেই কেমন যেন বেহেস্তের হারেম চোখের ওপর ভেসে ওঠে। অনেক আগে ইস্রায়িল এই তামাকু সেবন করতো। কেউ মদিনায় গেলে তাকে দিয়ে আনাতো। এখন অনেককাল সে সব বন্ধ হয়ে গেছে। পয়সাও নেই, ইচ্ছেও নেই।

সেই তামাকু লুতুফ চোখের সামনে ধরতে ইস্রায়িলের মুখের ওপর প্রশ্ন ভেসে উঠলো। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না, শুধু নিম্নস্বরে বললো;—দরকার নেই, নিয়ে যা।

লুতুফ চলে গেল। বললো,—দরকার নেইটা কি রকম ? তুই কি এ তামাকু খেতিস্ না ?

ইস্রায়িল চোখ না তুলে ঘাড় নেড়ে জানলো;—খেতাম।

তবে ?

অনেকক্ষণ ইস্রায়িল আর কোন কথা বললো না।

তাই দেখে লুতুফ আবার চটে গিয়ে বললো;—তুই এত ব্যাজার হয়ে আছিস্ কেন ? এ জায়গা না ছাড়তে চাস্, না ছাড়বি। এখানে না হয় তুই একা একা না খেয়ে পচে মরবি, আমি পারবো না।

লুতুফ বীরদর্পে চলে যাচ্ছিল দেখে ইস্রায়িল দুর্বলকন্ঠে ডাকলো;—এটা নিয়ে

যা লুতুফ। নষ্ট করে লাভ কি?

তাহলে তুই নিবি না?

একদিন সুখ করে কি হবে? যা ছেড়ে দিয়েছি, তা আর ধরতে চাই না।

লাসায় মদিনার লোক সালাউদ্দিনের তামাকু এনেছিল, আমি তোর কথা ভেবেই আনলুম খানিকটা।

ইস্রায়িল আর কোন কথা বললো না।

লুতুফ পিতার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিলের মত ছোঁ মেরে মোড়কটা তুলে নিয়ে চলে গেল।

তারপর বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে এল। রাত যত বাড়তে লাগলো ইস্রায়িলের কোমরের যন্ত্রণাটা তত প্রচন্ড হতে লাগলো। সে দাওয়ায় বসে নিঝুম হয়ে সেই যন্ত্রণা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে লাগলো। এমনি যন্ত্রণা সে প্রত্যহ ভোগ করে। আজ যেন যন্ত্রণাটা আরো প্রচন্ড। ব্যথায় দেহটা নীল হয়ে বার বার পাক খেয়ে যাচ্ছে।

ইস্রায়িল বিস্ময়ে ভাবতে চাইলো, কেন আজ এত অসোয়াস্তি? কেন বেদনাটা এত প্রচন্ড হয়ে উঠলো? তবে কি এ জায়গা ছাড়তে হবে বলে দেহটা বিদ্রোহ করছে? কিন্তু কেন? কেন এই দেহ ও মনের বিদ্বেষ? লুতুফ তো ভাল কাজই করছে; এই উপার্জনহীন দেশে বাস করার চেয়ে বিদেশে অনাহারে মরাও ভাল। তবু সান্ত্বনা এই যে; পরদেশে মেলেনি রুটি, তাই মৃত্যু হ'ল। কিন্তু সে কথা ভেবেও তো মন সান্ত্বনা পায় না। আগামী রাত্রে আরব ছেড়ে তারা যাত্রা করবে। লুতুফ এই ব্যবস্থাই জানিয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষ আজ শেষ হবে; আগামী রাত্রিই শুক্ল-পক্ষ। সেই শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় যাত্রা শুরু করলে প্রথম মরু অঞ্চল পার হতে অসুবিধা হবে না। অন্তত দিনের চেয়ে রাত্রির যাত্রা আরামপ্রদ। দিনে আছে প্রচন্ড দাহ কিন্তু রাত্রিতে তার বিপরীত।

লুতুফ উত্তম ব্যবস্থাই করেছে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যাত্রার সময় যত এগিয়ে আসছে; ততই যেন তার কোমরের যন্ত্রণা বাড়ছে। সেই জন্যেই ইস্রায়িল বিস্ময়ে ভাবছে কেন? কেন এই বিদ্রোহ? আর যন্ত্রণাটাই বা আজ কেন এত প্রচন্ড হচ্ছে? তবে কি এই বার বছরের যন্ত্রণা একটা মনুষ্যরূপ নিয়ে এ বাড়ির কলজেতে চিরস্থায়ী হয়ে বসে গেছে? সে যেতে চায় না বলেই তার এই পীড়ন?

কিন্তু যন্ত্রণাটা হঠাৎ মনুষ্যরূপ পেল কেমন করে? তাকে তো সে কোন সুযোগ দেয় নি? তাছাড়া যন্ত্রণার সেই জন্মও তো এক অশুভমুহূর্তে। ইস্রায়িলের সিংহের মত পেশীবহুল শরীর। ডুবুরী হয়ে জলের তলায় নেমে যেত মুক্তো তুলতে। অবলীলাক্রমে নেমে যেত। কোন দ্বিধা না। কোন সংশয় না। এ কাজ সে আজ করছে না। খুব ছোটবেলা থেকে। বাবাই তাকে শিখিয়ে দিয়ে-ছিল। মুক্তো তুলতে যত না তার সুখ হত, জলের তলায় খেলা করতে তার আরো

আমোদ লাগতো। জলের তলায় নানাধরনের মাছের ঝাঁক। কোনটা বড়, কোনটা ছোট। সমুদ্রের মাছ এক একটা এমন যে, দৈত্যের মত। কিন্তু ইস্রায়িলের ভয় করতো না। তার সম্বল বলতে একটিমাত্র ছুরিকা। সে সেই ছুরি সম্বল করেই দৈত্যের সঙ্গে খেলা করতো। হাঙরের মুখেও সে মাঝে মাঝে পড়ে নি তা নয়, তবে সে খুব কম। সাগর হলে হাঙরকে ভয় করতে হয়, কিন্তু এ উপসাগর। আরব সাগরের শাখা স্রোত। পারস্যোপসাগর। তাই হাঙর খুব বড় একটা আসতো না। একবার ইস্রায়িল আদেনে গিয়ে আরব সাগরের অতলে নেমেছিল।

সে যাক্‌গে, ইস্রায়িলের যন্ত্রণাটার জন্ম কেমন করে হল, সেটাই প্রশ্ন। সম্পূর্ণ অতর্কিতে একদিন ইস্রায়িল এক হিংস্র মাছের আঘাত খেল। সে জানতো না, সমুদ্রের গভীর অতলে ছুরিখানা নিয়ে নেমে গেছে। উদ্দেশ্য, একেবারে তলা থেকে মুক্তো তুলে আনবে। সচরাচর সেই গভীর অতলে কেউ যেত না। ইস্রায়িলের সেইটাই সুবিধে। তারপর কি? কিছুক্ষণের মধ্যে জল লাল হয়ে উঠলো। কোমরের দিকে অসহ্য যন্ত্রণা। ইস্রায়িল বুঝতে পারার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। কিন্তু সে দৈত্যসমান সমুদ্র শয়তানকে ছাড়লো না, কোমরটা চেপে ধরে তার পিছন পিছন তাড়া করে কয়েকটি আঘাত সে ছুরিকা দিয়ে লাগিয়ে দিল। তার রক্তে ও সেই শয়তান মাছের রক্তে সমুদ্রের এক অংশ লাল হয়ে উঠলো। সংজ্ঞা হারাবার আগেই কিন্তু ইস্রায়িল পারে উঠে এল। তারপর আর তার কোন খেয়াল নেই। মাটির ওপর শুয়েই সে অজ্ঞান।

সেই জ্ঞান তার পনের দিন পর ভেঙেছিল বটে, কিন্তু যন্ত্রণা তার সহজে উপশম হয় নি। দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে হেকিমের দাওয়াই খেয়ে সুস্থ হ'ল কিন্তু ক্ষত সারলো না। ক্ষত যেমন রক্তাভ জ্বালা নিয়ে জেগে থাকলো, তেমনি এলো আরো উপসর্গ। সিংহের মত পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীর তার সঙ্কুচিত হয়ে কেমন যেন শুষ্ক হয়ে গেল। বার্ধক্য এসে তাকে চেপে ধরলো। আর জরা এসে তাকে একেবারে চিরকালের জন্যে অথর্ব করে দিল।

সেই বারো বছরের যন্ত্রণা আজ মনুষ্যরূপ নিয়ে বিদ্রোহ করতে চায়? সে যাবে না এই বাড়ি ছেড়ে। সে এই জায়গার মায়া কাটাতে চায় না। সেইজন্যে যাত্রা যত সন্নিকট হচ্ছে, যন্ত্রণাও ততো বাড়িয়ে দিয়ে একটা কিছু অঘটন ঘটাতে চাইছে।

বাড়ি নিশুতি হয়ে এসেছে। রাত্রি কম হয়নি। এতক্ষণ একটু কলরব ছিল। বাড়িতে অনেকদিন পর একটু আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল। দুটো নতুন লোক এসেছে, তারা আহার করলো। তিনটি ঘোড়া ও একটি উট উঠোনের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। ইস্রায়িল দেখলো, তাদেরও খাদ্য দেওয়া হ'ল।

লুতুফও বোধ হয় খেয়ে-দেয়ে তার সুন্দরী জোরু নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করেছে। লুতুফের বাচ্চা লড়্‌কাটা এতক্ষণ কাঁদছিল। আর যখন কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তখন নিশ্চয় ঘুমিয়েছে।

কিন্তু আশনাই তাকে ডাকলো না কেন? তবে কি তাকে আজ খাবার দেওয়া

হবে না? কিন্তু কেন? লুতুফের নিষেধ! তামাকু মিই নি বলে সে রাগ করেছে। হিন্দুস্তানে যেতে চাই না বলে তার বিদ্বেষ! সবই যদি সত্যি হয়, বেটা হয়ে সে আমাকে চরম দন্ড দেবে? বাড়ির সকলেই যখন দুদিন উপবাস করলো, সে ও তো তাই ছিল। না, লুতুফ যেন দিন দিন কেমন মেজাজী হয়ে যাচ্ছে। পিতাকে অশ্রদ্ধা করার এমনি ইতিহাস বোধ হয় আর কোনদিন শোনা যায় নি।

হঠাৎ তার কেমন যেন রাগ চড়ে গেল। সহ্যাতিরিক্ত হ'ল সহনশীল ক্ষমতা। হয়তো বা যন্ত্রণাটা আরো উদগ্র হয়েছিল বলেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সে চিৎকার করে বাড়ি কাঁপিয়ে হঠাৎ প্রচন্ডস্বরে ডেকে উঠলো—লুতুফ! এই বেটা লু-তু-ফ!

থরথর করে কেঁপে উঠলো নিস্তব্ধ বাড়িটা। অন্ধকার ঘুমন্ত নিঃঝুম বাড়িটা হঠাৎ সচল হয়ে উঠলো।

ইস্রায়িলের বৃদ্ধা আশনাই ছুটে এল—কি হয়েছে? অমন চিল্লোচ্ছো কেন?

ইস্রায়িল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললো—তোকে তার জবাব দেব?

ডাকটা লুতুফের কানে গিয়েছিল কিন্তু সে এত ব্যস্ত ছিল যে দ্রুত চলে আসতে পারলো না। সে তখন ফতুমাকে কাঁচুলি পরাবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে।

ফতুমা লজ্জায় আপেল রাঙা হয়ে চোখে দু'হাত চাপা দিয়ে ঘরের শেষ কোণে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে।

আর লুতুফ তার সামনে গিয়ে বোঝাচ্ছে।

এই শোন্। এটা খারাপ জিনিস্ না! আমি লাসা নগরে মেয়েদের বুকে শোভা করতে দেখলাম। পরলে ভাল দেখাবে। দেখ্না পরে একবার দেখ্। যদি খারাপ লাগে ফেলে দিস্।

ফতুমা তবু দু'চোখ হাত চাপা দিয়ে আরো রক্তিম হয়ে নিজেকে হাঁটুর মধ্যে লুকিয়ে না না বলতে বলতে আরো সঙ্কুচিত হয়ে যেতে লাগলো। সে এমন করতে লাগলো, যেন লুতুফ ফতুমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁচুলি পরাবে।

লুতুফ বোধ হয় তাই করতো কিন্তু এই সময় আব্বাজান ইস্রায়িলের ডাক। লুতুফ থমকে গেল।

আর ফতুমা মুচকি হেসে বললো,—এই তোমার আব্বা ডাকছে, যাও!

লুতুফ থমকে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে বললো,—ধেৎ তেরি, বুড়োটা মরে না কেন? এই বলে সে কাঁচুলিটা মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে দিয়ে দুমদাম করে পা ফেলে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ইস্রায়িল তখন বেশ দেহে বল পেয়েছে। কেমন যেন আগের শক্তি তার ফিরে এসেছে। সেই বারো বছর আগের শক্তি। জরা ও বার্ধক্য আসার আগে যে কর্মঠ ক্ষমতা তার ছিল। সেই শক্তির পূর্ণরূপের মধ্যে ফিরে এসে সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো। যন্ত্রণাটা তার ভূতের মত কেমন যেন অদ্ভুতভাবে পালিয়ে গেল। পাশের

দেওয়ালটা ধরে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

এইসময় আশনাই আবার ছুটে এল। আগের বার এসেছিল, স্বামীর তাড়ুনি খাবার পর চলে গিয়েছিল। এবার একটা কলাই পাত্রে স্বামীর জন্যে খাবার নিয়ে এসে চাপাস্বরে বললো,—চললে কোথায় ?

ইস্রায়িল কথার উত্তর দিল না।

আশনাই কাতর হয়ে বললো,—তোমার যে খাবার এনেছি গো ! খাবে না ?

ইস্রায়িল ঘুরে দাঁড়ালো, মুখখানা বিকৃত করে বললো— তোর খাবার তুই নিয়ে যা।

কেন, খাবে না ?

না।

কেন, না খাবার কি হল ?

আমি বাড়ির নফর না।

ওমা, ওকি কথা !

ঠিক কথাই বলছি। তোরা ভেবেছিস্, আমি অকর্মণ্য, পঙ্গু, বৃদ্ধ, যন্ত্রণায় একপাশে পড়ে আছি। ওকে যখন খুশি সবার উচ্ছিষ্ট দিলেই মুখ বুজে খেয়ে নেবে।

আশনাই স্বামীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তার চোখে অনেক দুঃখে জলের ধারা নামলো। সে সতর্ক হয়ে চতুর্দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললো,—তুমি এমন কথাও ভাবতে পারো ?

না, ভাবনা তোরাই জুগিয়ে দিস্ !

তখন আশনাই ক্রন্দনমুখরিত স্বরে বললো,—আর আমি তোমার জন্যে আলাদা করে খাবার তুলে রেখে সব পাট চুকিয়ে তাড়াতাড়ি আসছি এইজন্যে যে, তোমার সঙ্গে আমার নিভৃতে কিছু আলাপ আলোচনা আছে। বেটা লুতুফ আমাকে কত করে বলে গেল, আম্মা তুই বাবাকে ভাল করে বুঝিয়ে রাজী করাস্। আব্বাজান যে-রকম ক্ষেপেছে, হয়তো শেষপর্যন্ত যাওয়া ভন্ডুলি করে দেবে। তাই আমি তোমাকে সবার পরে খেতে দিয়ে বুঝিয়ে বলবো বলে একটু দেরি করেছি।

ইস্রায়িল ক্ষুব্ধস্বরেই উত্তর দিল,—তুই বুঝিয়ে বললেই কি আমি যাবার মত করবো ? আর ঐ শয়তান লুতুফটা, সেটা আমার বেটা হয়ে জন্মেছে বলেই আমি ক্ষমা করেছি। না হলে তার ঔদ্ধত্য আমি চাবকে শায়েস্তা করে দিতাম।

আশনাই তাড়াতাড়ি খাবারের থালাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে কাছে এসে বললো, — চুপ চুপ। বেটা লুতুফ শুনতে পাবে। তুমি তার ওপর কেন যে গোসা করেছ বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ ইস্রায়িল ধমকে উঠলো,—চুপ করে থাক। লুতুফের স্বভাবের ফিরিস্তি তোকে দিতে হবে না।

এই সময় লুতুফ সামনে এসে দাঁড়ালো। এতক্ষণ সে অন্ধকারে থামের একপাশে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়েছিল।

লুতুফ সামনে আসতেই ইস্রায়িল সদম্ভে জানালো,—তোকে ডাকছিলাম ভাবনার কিছু নেই। আমি যাবো। মহম্মদের দেশ এই আরব চিরতরে ত্যাগ করে আমি হিন্দুস্থানে যাবো।

লুতুফ চুপ করে থেকে বললো,—আব্বাজান খানা খেয়ে নে।

ইস্রায়িলের কানে সে কথা বোধ হয় গেল না। সে তখন কি ভাবছিল কে জানে? বোধ হয় ভাবছিল মহম্মদের কথা না, ভাবছিল পূর্বপুরুষের উপাস্য দেবী অল্লাট মাতার কথা। হ্যাঁ, অল্লাটদেবীর মোহিনী রূপই ইস্রায়িলের পূর্বপুরুষের দেবতা ছিল। দেবতার মত দেবতা। রূপের মত রূপ। ইস্রায়িল দেখেছে সেই অপরূপ মোহিনী রূপসী ভক্তিময়ী অল্লাটদেবীর মূর্তি। কোথায় লাগে কাবা মসজিদের সৌষ্ঠব। অবশ্য এ ইসলামের শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ কোরানের উপাস্য দেবতা। অল্লাট, আল-উল্লা, মেনাট্ তিনদেবীই পূর্বে আরবের সর্বত্র পুজিত হত। তবে অল্লাটই বিখ্যাত। অল্লাটই সবার পূজা পেত। বোধ হয় অল্লাটের মূর্তি সুন্দর ছিল বলে এটি সম্ভব হয়েছিল। সেইজন্যে এই অল্লাটের অনেক মন্দির যেখানে সেখানে দেখা যেত। নাখলা নগরে অল্লাটের বিরাট মন্দির ছিল কিন্তু দস্যুরা হঠাৎ এসে এই মন্দির ধ্বংস করে দেয়। ইস্রায়িল জন্মাবার আগেই এ মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন শুধু ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এখন তামাম আরবের কোথাও অল্লাটদেবীর মন্দির নেই তবে মনে মনে পূজা অনেকেরই আছে। মুসলমানের রমজান মাসে জুম্মারাতে এখনও কোথাও কোথাও অল্লাটদেবীর পূজা হয়।

ইস্রায়িলও তাই আজও অল্লাটদেবীকে মনে মনে ডাকে। ইসলামের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান আল্লার নাম যেমন তার মনের পিঞ্জর, তেমনি অল্লাটের নাম।

লুতুফ আবার বললো,—আব্বা, আমাকে মাফ কর্। তোকে যদি আমি কিছু বলে থাকি, তা আমার সত্যিই অপরাধ—তুই খানা খেয়ে নে। অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে, আবার দিনে উঠে অনেক তোড়জোড় করতে হবে।

ইস্রায়িল শক্ত মজবুত হয়ে বুকের কলিজা মেলে ধরে দাঁড়িয়েছিল। শুধু কোমরটা যা বাগ মানছিল না। সে সামনের দিকে যেমন ঝুঁকে সংকুচিত হয়ে গেছে, তাকে চাপ দিতেও সে তেমনি বেংকে থাকলো। শুধু মনের জোরটা ইস্রায়িলের অদম্য হয়ে উঠেছিল বলে সে দাঁড়িয়ে উঠেছিল। ইস্রায়িলের নিজের বিগত পেশী-বহুল হাত দুখানির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে গেল। হাত দুখানি কেমন যেন এই বারো বছর ধরে শুকিয়ে শুকিয়ে একেবারে শীর্ণ হয়ে গেছে। শুধু হাড়ই দেখা যাচ্ছে, পেশী একেবারে নেই, মেদ শুকিয়ে শুধু পাতলা মাংসের একটা আবরণ। ইস্রায়িল হাত দুটো মুঠো করলো। না, আঙুলগুলি হঠাৎ চাপ পেয়ে থরথর করে কাঁপছে। তবে কি এ হাতে সে আর ছুরি ধরতে পারবে না?

ইস্রায়িল লুতুফের দিকে তাকালো। আমার সেই ছোরাখানা একবার নিয়ে আয় তো!

এত রাত্রে আবার ছোরা কেন আব্বা?

আমি তোকে নিয়ে আসতে বলছি নিয়ে আয়।

লুতুফ আর কোন কথা বললো না, ছোরা আনতে চলে গেল।

আশনাই খাবারের থালার সামনে চুপ করে বসে থাকলো।

রাত্রি আরো এগিয়ে চললো। উঠোনে রক্ষিত ঘোড়া তিনটির মধ্যে থেকে একটি হঠাৎ হ্রেষা রবে নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করলো। আর তার পরেই লুতুফের লড়্কা হানিফ কঁকিয়ে কেঁদে উঠলো।

লুতুফ ছোরা এনে ইস্রায়িলের হাতে দিল।

ইস্রায়িল ছোরাখানি চাঁদের আলোয় মেলে মুঠিতে চেপে ধরলো। তারপর শূন্যে কয়েকবার বাতাস কেটে লুতুফকে ফিসফিস করে বললো,—মরুভূমি পার হতে গেলে অনেক বেদুইন দস্যুর হাতে পড়তে হবে। তাদের ধড়টা মুন্ডু থেকে নামাতে গেলে এমনি হাতে ছুরি ধরতে হবে। দেখ্ দিকিনি ছুরিটা আগের মত ঠিক চালাতে পারছি কি না। এই বলে ইস্রায়িল আবার বাতাসে কয়েকবার ছুরিটা সঞ্চালন করে উল্লসিত হয়ে উঠলো।

লুতুফ পিতার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে বললো,—ঠিক আছে আব্বা। তুই তো দেখছি, অনেক ভাল হয়ে গেছিস্। এবার খানাটা খেয়ে নে!

ইস্রায়িল লুতুফের দিকে তাকিয়ে বললো,—তাহলে তুই বলছিস্ পারবো!

হ্যাঁ আব্বা, পারবি।

তাহলে আমি সবার আগে যাবো?

হ্যাঁ যাবি।

লুতুফ আবার বললো,—আব্বা, খানা খেয়ে নে।

ইস্রায়িল মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে কি ভাবলো। তারপর আশনাইয়ের দিকে তাকিয়ে লুতুফকে বললো,—তুই যা বেটা! শুগে যা। আমি খানা খেয়ে নিচ্ছি।

লুতুফ চলে গেলে ইস্রায়িল জোরুর দিকে তাকিয়ে বললো,—নে ওঠ্। খানাটা আজ না খেলে দেহে বলসঞ্চার হবে না। আগামী রাত্রে আমিই তোদের দলপতি হয়ে সবার আগে এ মরুভূমি ত্যাগ করবো।

আশনাই তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে সহাস্যে স্বামীকে খাবারের পাত্র এগিয়ে দিয়ে সস্নেহে বললো,—তুমি একটু বস, আমি একটা আলো নিয়ে আসি।

ইস্রায়িল বাধা দিয়ে বললো,—দরকার নেই আশনাই। আল্লার আলো ঐ আসমান থেকে পড়ছে। তাছাড়া তুই আমার আশনাই, আলো জ্বেলে আছিস্ ভাল খানা ঠিকই দেখতে পাবো।

আশনাই মৃদু হেসে বললো,—আমি আর কি আলো দেব, বৃদ্ধ হয়েছি।

ইস্রায়িল খেতে খেতে জোরুর দিকে তাকিয়ে বললো,—গোসা করছিস্।

আশনাই মুখখানা স্বামীর দিক থেকে সরিয়ে অন্যপাশে ধরে থাকলো। কোন কথা বললো না।

ইস্রায়িল একবার জোরুর শুষ্ক মুখের দিকে তাকিয়ে আর কথা না বলে খানা

খেতে লাগলো।

তারপর খানা খাওয়া হয়ে গেলে ইস্রায়িল প্রত্যহ যেমনি জোরুর কাঁধে ভর করে ঘরে গিয়ে ঢোকে, তেমনি আশনাই এগিয়ে গেল স্বামীকে সাহায্য করতে।

ইস্রায়িল হেসে বললো,—বিবি, আজ আর আমার অবলম্বন দরকার নেই। আজ আমি নিজেই ঘরে যেতে পারবো। খোদা আমার হঠাৎ এই বারো বছর পরে আগের শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছে। এই বলে ইস্রায়িল আর আশনাইয়ের উত্তরের অপেক্ষা না করে জোয়ান মর্দানার মত নিজের ঘরের পথে চলে গেল।

আর আশনাই সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকলো।

রাত্রি তখন অনেক গভীর। রকুল অঞ্চলের প্রান্তর জুড়ে ঘুমের আমেজ নেমে এসেছে। নাবা মসজিদের গম্বুজের মস্তকে প্রহরীর প্রহর ঘোষণার প্রচণ্ড ধ্বনি সৃষ্টি হল। সেই শব্দে লুতুফের তিনটি ঘোড়া আবার হেষাধ্বনি করে উঠলো।

ভোরের আলো ইস্রায়িলের চোখের ওপর পড়লে গত রাত্রের কথা ভেবে সে বিস্মিত হ'ল। হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখলো, কই সে তো আর ওঠে না! তাহলে গতরাত্রের সব ঘটনাটাই কি একটা স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন, স্বপ্ন—স্বপ্ন ছাড়া তবে কি এ কিছু নয়? ইস্রায়িল হঠাৎ বিছানায় শুয়ে কেমন যেন ককিয়ে উঠলো। হঠাৎ তার চোখ গেল বিছানার অন্য পাশে। একখানা ধারালো অদ্ভুত ধরনের ছুরিকা। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো, যৌবনের হাতিয়ার। দিয়েছিল লুতুফ গতরাত্রে তাকে এনে। সে ছুরিকাটি হাতের মুঠিতে ধরে বাতাস কেটেছিল। বাতাস কেন কাল রাত্রে সে ইচ্ছা করলে দশটি বেদুইন দস্যুর মুণ্ড ধড় থেকে নামিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু আজ!

ইস্রায়িল হাতের মুঠিটা বার বার কঠিন করার চেষ্টা করলো। বল আনতে চাইলো হাতে, পেশী ফোলাতে চাইলো চাপ দিয়ে কিন্তু হাঁফ ধরে গেল। দম বন্ধ হয়ে যেতে লাগলো। কেমন যেন কোমরের যন্ত্রণাটা আবার চাবুক মেরে জাগিয়ে তুললো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে ইস্রারিল কেঁদে উঠলো ডুকরে।

আল্লা, মেহেরবান খোদা, দুনিয়ার ঐশ্বর্যের সেরা সুলতান—আবার এ আমার কি করলে? তবে কি তুমি চাও না, আমি এই হজরত মহম্মদের দেশ ছেড়ে রুজি রোজগারের জন্য কোথাও যাই?'

মক্কা আমি দেখেছি। কাবা মসজিদের শ্রেষ্ঠত্ব মুসলমানদের কাছে জগতের সেরা দৌলত। সেই কাবা যে দেখেছে, যে তার কৃষ্ণবর্ণ ঔজ্জ্বল্যমান প্রস্তরের বুকে
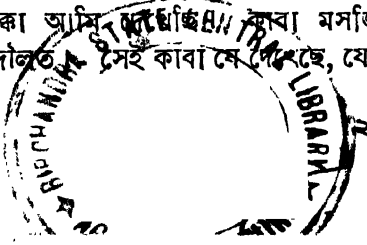
ওষ্ঠের চুম্বন এঁকেছে, সে আল্লার আশীর্ব্বাদ পেয়েছে। তবে কেন ইস্রায়িল্ আজ আল্লার আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত !

ইস্রায়িল মনে করতে চেষ্টা করলো তার সেই মক্কা যাওয়ার ইতিহাস। কখনও যে সে মক্কায় যাবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। হঠাৎ সুযোগ জুটে গেল। আল্লা নিজেই জুটিয়ে দিলেন সে সুযোগ।

এক মুসাফিরের সঙ্গে একদিন নাখলার এক সরাইখানাতে তার আলাপ। ইস্রায়িল চলেছিল কি একটা কাজে বগদাদ নগরে। তখন তার আব্বা রহিম আলি বেঁচে। বগদাদ রকুল থেকে বহুদূর পথ। আরবের বিস্তৃত ভূখন্ড অতিক্রম করে বগদাদে পেঁছিতে গেলে কয়েক জায়গায় বিশ্রাম নিতে হয়। তখনকার দিনে বগদাদ শহরে যাবার জন্যে অনেকেরই আগ্রহ ছিল। এমন সাজালো একটি শহর ঐ অঞ্চলের আর কোথাও নেই। যেন স্বর্ণখচিত দেয়ালের গায়ে হীরার দ্যুতি। সেই শহর দেখার লোভ ইস্রায়িলের অনেকদিন ছিল। রহিম আলির এক দোস্ত্‌কে একটি সংবাদ দেবার জন্যে রহিম আলি লড়্‌কাকে পাঠিয়েছিল।

ইস্রায়িল আর দ্বিরুক্তি না করে ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। পথে হিল্লা, রিয়াদ, হোফুল তারপর পারস্য উপসাগরের কূল ধরে নাখলায় গিয়ে পেঁছিলো। এর পরই বসোরা কিন্তু বসোরা পেঁছানোর আগেই নাখলার সরাই-খানায় এক মুসাফিরের সঙ্গে দেখা। নাখলায় অল্লাটদেবীর বিখ্যাত মসজিদ। তখন মসজিদ ছিল না, ছিল তার ধ্বংসস্তূপ। মুসাফিরের সঙ্গে আলাপ হতে তিনি বললেন,—তিনি অল্লাটদেবীর ধ্বংসস্তূপ দেখতে এসেছিলেন। এই দেবীর মূর্তি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জাগ্রত দেবতা। মুসাফির হিন্দু, নাম গুরুবক সিং হিন্দুস্তানের পাঞ্জাবে বাড়ি। এসেছেন মুসলমান তীর্থস্থান ভ্রমণ করতে। যাবেন মক্কায়। পথে তাই অল্লাটদেবীর পুরনো কীর্তি দেখে নিলেন।

ইস্রায়িলের সঙ্গে গুরুবক সিংয়ের ঘনিষ্ঠতা হবার পর আসল কথাটা সিংজী আর বললেন না, বললো সরাইখানার মালিক। বললো,—সিংজীর ইচ্ছে তুমি তার মক্কার সঙ্গী হও।

কারণ ?

কারণ মুসলমান তীর্থ। একজন সেই ধর্মের লোক সঙ্গে থাকলে সুবিধে।

ইস্রায়িলের মনটা মক্কা যাবার জন্যে নেচে উঠলো। কিন্তু পরক্ষণে নিরুৎসাহ হ'ল আব্বা রহিম আলির কথাটা ভেবে। আব্বা বলে দিয়েছে—জল্‌দি বগদাদে গিয়ে দোস্ত শেখ সাহেবকে সংবাদটা দেবে। আর তার পরিবর্তে সে যা জানাবে, তুরন্ত নিয়ে চলে আসবে। পথে আর কোন মতলব করবে না বা কারও প্রলোভনে সাড়া দেবে না।

সেই কথা মনে আসতে সে সরাইখানার মালিককে বললো,—না আমার অন্য কাজ আছে। সিংজীকে দোস্‌রা লোক দেখতে বলো।

সরাইখানার মালিক মুখ বিকৃত করে বললো,—মিঞা, তুমি না মুসলমান ?

বিনা পয়সায় এমন একটি দুর্লভ তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার আমন্ত্রণ পাচ্ছো, অথচ যেতে চাইছো না! আমার যদি সরাইখানার গুরুভার না থাকতো, তাহলে আমি সিংজীর সঙ্গী হতাম।

ইস্রায়িল বললো,—কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। মক্কা যাবার আমন্ত্রণ পেলে কে আর না করে? কিন্তু আমার আব্বা এখন এক কাজের ভার দিয়েছে, যা সত্যি না করলে মুশকিল হবে।

সরাইখানায় মালিক বললো,—ধেৎ তেরি, তোমার আব্বার কাজ। স্বয়ং আল্লা যখন তোমাকে ডাকছে, তখন আব্বার কাজ ভুলে যাও। এই বলে সরাইখানার মালিক প্রমাণ করলো ইস্রায়িলকে আল্লা মক্কা থেকে না ডাকলে এই সুযোগ তার আসতো না। লোক তো সমস্ত আরব, ইরাক, তুরস্কে হাজার হাজার আছে কিন্তু ক'জনের ভাগ্যে এই মক্কা যাত্রার সৌভাগ্য মেলে! মিঞার সৌভাগ্য ভাল না হলে কি হঠাৎ সিংজী তাকেই সঙ্গী করতে চাইলেন! তিনি তো সাফ বলে দিলেন, লোকের তার অভাব নেই, তবে উপযুক্ত লোক পাওয়া দুষ্কর। ঐ মিঞা যদি রাজী হয়, তাহলে সে তার সাহায্য নিতে পারে।

ইস্রায়িল সরাইখানার মালিকের কোন কথার উত্তর না দিয়ে ভাবতে লাগলো, আব্বার কাজটি মুলতুবী রেখে সে যদি মক্কায় যায়, তাহলে হয়তো বাড়ি ফিরে গেলে আব্বা গালাগালি দেবে কিন্তু তার উপরি পাওনা এই হবে যে, মাঝখান থেকে মক্কা ঘোরা হয়ে যাবে। এই সুযোগ হাতছাড়া করলে হয়তো জীবনে আর সুযোগ নাও আসতে পারে। তাছাড়া মক্কা যাবার সঙ্গতি তার কোথায়?

কিন্তু ইস্রায়িল সরাইখানার মালিককে হঠাৎ বললো,—মুসাফির সিংজী যদি এক সপ্তাহকাল আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করেন, তাহলে আমি যেতে পারি। আমি এ সপ্তাহের মধ্যে বগদাদ থেকে ঘুরে এসে তার সঙ্গে এই সরাইখানায় মিলবো।

সরাইখানার মালিক প্রস্তাবটি শুনে মন্দ যুক্তি ঠাওরালো না। এই এক সপ্তাহ যদি সিংজী এখানে থাকে তাহলে প্রচুর হোটেল খরচ মিলবে আর সঙ্গীও পাবে সিংজী। তাই সে বললো,—তোমার যুক্তিটা আমার মনঃপুত হয়েছে। তবে অপেক্ষা কর, আমি একবার সিংজীর মত নিয়ে আসি।

সিংজী শুনে বললেন,—বেশ, আমি রাজী।

তখন ইস্রায়িল আর বিলম্ব না করে বগদাদের পথে চলে গেল।

সেখানে গিয়ে সে শেখসাহেবকে আব্বার সংবাদ দিয়ে নাখলায় ফিরলো এক সপ্তাহের দু রোজ আগে।

সিংজী তাই দেখে বললেন,—মিঞা, তোমার দেখছি মক্কায় যাবার আগ্রহ প্রচণ্ড হয়েছে।

ইস্রায়িল লজ্জিত হল না, বরং গর্বভরে বললো,—হাঁ জী, আমার এ আগ্রহ স্বাভাবিক। আমি কেন—যে কোন মুসলমানের ভাগ্যে এই সৌভাগ্য জুটলে সে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতো। তাছাড়া, আপনি তো

আমাদের কাবা মসজিদ দেখেন নি, দেখলে বুঝতেন তারই অভ্যন্তরে যে কৃষ্ণময় প্রস্তরখণ্ড আছে, একটি চুম্বনের জন্য মানুষের কি অধীর কাতরতা।

গুরুবক সিং বললেন,—তুমি দেখেছ কাবা মসজিদ ?

ইস্রায়িল বললো, দেখিনি, শুধু গল্প শুনেছি। দেখবো কি ? সেখানে যাওয়ার মত রসদ কোথায় ?

গুরুবক সিং বললেন, কিন্তু তুমি এই বয়সে তীর্থক্ষেত্রে যাবার জন্যে এত ব্যগ্র কেন ? লোকে তীর্থক্ষেত্রে যায় তো বৃদ্ধ হলে।

ইস্রায়িল হাসলো। তার নরম সুন্দর ঝুলন্ত দাড়িতে দোলন জাগিয়ে বললো, —বৃদ্ধ হলে তীর্থক্ষেত্রে যায় জীবনের পাপ স্খালন করতে। আমি যেতে চাই মক্কার সেই কাবা মসজিদের মহিমা দেখতে। তার অদ্ভুত গঠনপ্রণালী ঈশ্বরের ঐশ্বরিক মহিমার রাজসিকতা, তাছাড়া শুনেছি সেই কাবা মসজিদের কৃষ্ণময় প্রস্তর মহিমা নাকি দুনিয়া প্রস্তুত হবার দু'হাজার বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল।

গুরুবক হেসে বললেন,—তাহলে তুমি তীর্থ করতে যাচ্ছো না ?

ইস্রায়িল বললো,—বয়স আমার মাত্র এক কুঁড়ি। সবে কৈশোর গিয়ে যৌবন এসেছে। এখনও শাদী করি নি, সংসার করি নি সুতরাং জীবন আমার শুরুই হয়নি। পাপ করলে তো পাপস্খালনের জন্যে তীর্থ করবো, আল্লার কাছে গিয়ে মাথা খুঁড়ে নামাজ পড়ে মুক্তি চাইবো !

গুরুবক সিং হেসে বললেন,—তুমি তো বেশ সুন্দর কথা বলো। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে দেখছি আমার উপকারই হ'ল। পথকষ্ট আর বোধ হবে না।

তারপর হঠাৎ গুরুবক সিংয়ের একটি কথা মনে পড়তে বললেন,—শুনেছি, মক্কার কাবা মসজিদে প্রবেশ করতে গেলে জমজমা নামে এক কূপের জল পান করে পোষাক ছেড়ে নগ্ন হয়ে নিতে হয় এবং মস্তক মুণ্ডন করে চুলগুলি নাপিতের কাছে দিয়ে দিতে হয়। তুমি তো ধর্ম করতে যাচ্ছো না, তাহলে তুমি এই নিয়ম পালন করবে কেন ?

ইস্রায়িল বললো,— এই নিয়ম পালন না করলে কাবার সেই অপরূপ কারুকার্য-মণ্ডিত মসজিদ অভ্যন্তরে ঢোকবার অধিকার মিলবে না। তাই আমিও তীর্থযাত্রীর সঙ্গে এই নিয়ম পালন করবো। তবে নগ্নতার কথা যে বললেন, আপনি তা ভুল শুনেছেন। কাবায় আগে লোকে নগ্ন হয়ে যেত, এখন শুধু বস্ত্র পরিবর্তন করে নিলে হয়।

তারপর ইস্রায়িল বললো,—সিংজী, আপনার তো সেখানে স্বধর্ম নিয়ে যাওয়া চলবে না। মুসলমানের ধর্মক্ষেত্রে, একমাত্র মুসলমানের যাওয়ার অধিকার। সেখানে আর যে কেউ অন্য ধর্মের লোক যাবে তাদের মুসলমান হয়ে যেতে হবে।

গুরুবক সিং বললেন,—তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো। হ্যাঁ, আমি সে ব্যবস্থা করেই যাচ্ছি। আর সেইজন্যেই তুমি আমার সঙ্গী হয়েছ। তোমাদের ইমামসাহেবের কাছে ধর্মমতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তারপর কাবায় প্রবেশ করবো।

ইস্রায়িল সেদিনের সেই গুরুবক সিংয়ের কথা বুঝতে পারে নি। লোকটির বিরাট চওড়া মুখ ও মাথার পাগড়ীর দিকে তাকিয়ে নির্বোধের মত মনে মনে বলেছিল শুধু দেখবার জন্যেই অন্যধর্মের এই আগ্রহ! নাকি অন্যকিছু আছে এই অভিযানের পিছনে। তার মনের আগ্রহ ও গুরুবক সিংয়ের আগ্রহ যেন এক নয়। দুজনের মাঝে যেন আকাশ-জমিন তফাত।

তারপর তারা দুজন সরাইখানা ছেড়ে মক্কার পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

এ সব ঘটনা বহুদিন আগে জীবনের সন্ধিক্ষণে ঘটে গেছে। কিন্তু সেদিনের কথা আজ এই বৃদ্ধবয়সে ইস্রায়িলের মনে যেন নব উদ্দীপনা দান করতে লাগলো। সেদিন যদি সে মক্কায় না যেত তাহলে হয়তো এ কাহিনী মনের স্মৃতিকোঠায় উজ্জ্বল হত না। হয়তো কেন, ঠিকই। যে ঘটনা না ঘটে তার কল্পনা কতটুকু আর মনে রঙ ধরায়।

মক্কায় সে গিয়েছিল। কাবা মসজিদ সে দেখেছিল কিন্তু তার চেয়ে গুরুবক সিংয়ের স্মৃতিটাই আজ উজ্জ্বল হয়ে আছে। গুরুবক সিং শুধু দেখবার জন্যেই সেই মুসলমানের তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল। সামান্য কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে মানুষ যে কত বৃহত্তমের মধ্যে ঢুকে যায়, তারই প্রমাণ এই গুরুবক সিং। তাই মক্কার ধর্ম, মসজিদের গাম্ভীর্য, কাবার গঠনপ্রণালী সবই ইস্রায়িলের মন থেকে লোপ পেয়েছে। পেয়েছে শুধু ঐ একটি মানুষের জন্যে। গুরুবক সিং।

মক্কায় প্রবেশ ক'রে গুরুবক সিংয়ের নাম আর গুরুবক থাকে নি, গোলাম আলি হয়ে গিয়েছিল। পঞ্চাশোত্তীর্ণের এক মানুষ। হিন্দুস্থান থেকে এসেছেন। বহুদেশ ঘুরেছেন। জেরুসালেম, বেথলহাম, পালেস্টাইন, কারবালা, বগদাদ, বসোরা, প্রায় কোন অঞ্চলই বাদ দেন নি। শুধু তীর্থক্ষেত্র দেখাই সিংজীর উদ্দেশ্য নয়, বড় বড় শহরেও তিনি গেছেন। বড় বড় লোকের ঘরে মেহমান হয়েছেন। খানাপিনা করেছেন। সরাব খেয়েছেন, গানবাজনায় যোগদান করেছেন। আমীর লোকের অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে মিশেছেন, তারা আনন্দ দিয়েছে, তিনি আনন্দ গ্রহণ করেছেন ও নিঃশেষে দিয়েছেন।

মক্কার পথে চলতে চলতে সিংজী হেসে বলেছিলেন, তার জীবনের একটি রসালো অধ্যায়। কে যেন তাকে এই বয়সে মহব্বত দান করেছিল। জায়গাটার নাম বললেন না তবে বগদাদ হওয়াই সম্ভব।

অতিথির ঘরে রাত্রিবেলা কালো ওড়নায় মুখ ঢাকা এক রমণী এসে উপস্থিত হ'ল। সিংজী তখন ঘুমের সাধনা করছেন। ঘরে মৃদু আলোর সামান্য দ্যুতি।

সেই আলোতে রমণী ওড়নার আবরণ মোচন করলো। একঝলক জোরালো আ... যেন ঘরের অন্ধকারকে কেড়ে নিল।

গুরুবক সিং তাই দেখে খাটিয়ার ওপর উঠে বসলেন।

রমণী এগিয়ে এসে চাপাস্বরে বললো,—পরদেশী, আমাকে তোমার দেশে নিয়ে যাবে?

গুরুবক সিং অবাক হয়েছিলেন। বিস্ময়ের মাত্রা তার সপ্তমে উঠেছিল। হঠাৎ বলে ফেললেন,—কেন?

আমি তোমার দেশকে ভালবাসি।

কিন্তু তুমি আওরত! আমার সঙ্গে তুমি যাবে কেন?

শাদী করে যাবো।

আমি হিন্দু, আমি তোমায় শাদী করবো কেন?

রমণী চুপ করে রইলো।

গুরুবক সিং রমণীর মনের বেদনা বুঝলেন। যে রমণী হয়ে লজ্জা ত্যাগ করে এই গভীর রাত্রে তাঁর কাছে এসেছে, সে হঠাৎ আসে নি, মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করার পর এসেছে। তাকে এমনি উত্তর দেওয়া উচিত হয় নি।

তাই সিংজী সান্ত্বনার ছলে বললেন,—আগে বলো তুমি কে? আমি যাঁর অতিথি তিনি তোমার কে হন?

রমণী মাথা হেঁট করে চুপ করে থাকলো। কোন উত্তর দিল না।

গুরুবক সিং বুঝলেন—রমণী তার পরিচয় দিতে চায় না। বোধ হয় তাকে স্বীকার না করলে সে রহস্য হয়েই চলে যাবে।

সিংজীও মনে মনে তাকে ঘুমের স্বপ্ন বলে প্রমাণ করবার জন্যে রহস্যময় করে তুললেন। বললেন,—বেশ, তুমি যখন তোমার পরিচয় দেবে না, তখন আমার অল্পক্ষণের সঙ্গ নিয়ে চলে যাও। আমি তোমার লোভাতুরা যৌবনদেহ অল্প-মুহূর্তের জন্যে উপভোগ করে তোমাকে সৌভাগ্যবতী করতে পারি। তুমি যদি খুশি হও, তাহলে এগিয়ে এস।

গুরুবক সিং পথ চলতে চলতে ইস্রায়িলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—বুঝলে মিঞাসাহেব, সেই রমণী আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালো।

আগে ইস্রায়িল মনে করেছিল, সিংজী আসলে একজন ভাল বক্তা। বানিয়ে বানিয়ে আরব্য কাহিনী পেশ করতে ওস্তাদ। কিন্তু মক্কায় প্রবেশের আগে ইমান-সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার সে ভুল ভাঙলো। সিংজী গল্পই ভাল বলেন না। গল্পের নায়ক হয়ে সত্যকাহিনী ঘটাতেও পটু।

এই গুরুবক সিং ওরফে গোলাম আলিকে তাই ইস্রায়িল ভুলতে পারে নি। মক্কার কাবা মসজিদ যেমন তার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তেমনি সেই পরদেশী হিন্দুস্তানের লোক গুরুবক সিং। লোকটি কি এইজন্যেই দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াতো? কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে?

আজ গুরুবক নয় গোলাম আলি। গোলাম আলি এখনও মক্কাতেই আছে। তীর্থক্ষেত্র তাকে ত্যাগ করে নি, আপন করে নিয়েছে। এমন করে তাকে বেঁধেছে, যা সে কখনও ছাড়িয়ে আর নিজের দেশে ফিরতে পারবে না।

যাই হোক লোহিত সাগরের তীরভূমির জলীয় বাষ্প দেহে নিয়ে ওরা দুজন মক্কানগরে প্রবেশ করেছিল। মক্কা নগর এই লোহিতবর্ণের সাগরের পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। নগরটি সমস্তই পার্বত্য উপত্যকার ভূমিতে। নগরের মূলভাগ উপত্যকার সমতলবক্ষে অবস্থিত হলেও পার্শ্ববর্তী পর্বতগাত্রে যত সুসজ্জিত মর্মরময় অট্টালিকা। আর অট্টালিকাগুলি সবই ত্রিতল ও প্রস্তরনির্মিত।

গুরুবক সিং এরই এক জায়গায় এসে বললেন,—মিঞাভাই, একবার যে এখানে দাঁড়াতে হয়।

ইস্রায়িল কথা না বলে শুধু ভ্রূকুটি প্রকাশ করলো।

তাই দেখে গুরুবক সিং চাপাস্বরে বললেন,—তোমাদের তীর্থক্ষেত্রে প্রবেশের আগে নিজের ধর্মটা যদি পালটে না নিই তাহলে যে মসজিদ প্রবেশই নিষিদ্ধ হবে। তাই এক মোল্লা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে ধর্মটা পালটে নিতে চাই।

ইস্রায়িলের ইচ্ছা করলো, বলে সর্দারজী, ধর্ম না পালটে মসজিদে চলো। আমি মিথ্যে বলে তোমাকে বাঁচাবো'খণ। কিন্তু তা না বলে শুধু বললো,— কোথায় সিংজী আপনার ইমানসাহেব?

তখন গুরুবক সিং আঙুল দিয়ে একটি প্রস্তর নির্মিত তিনতলা বাড়ির দিকে নির্দেশ করে বললেন,—মনে হচ্ছে ঐ সেই বাড়ি। তবে যদি সরাইখানার মালিকের কথা সত্যি হয়, তাহলে আমরা ইমামসাহেবের দেখা পাবো।

প্রশস্ত পথ। সেই পথ দিয়ে অগণিত তীর্থযাত্রী সর্বদা যাওয়া আসা করছে। বিচিত্র কলরব। সে কলরবের শেষ নেই। মানুষের কলরব, অশ্বখুরের ধ্বনি, উষ্ট্রের পদশব্দ, আবার মাঝে মাঝে পালকিও কোথা থেকে এসে সেই পথ দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলে যাচ্ছে, তার ধ্বনি মুখর করছে নগর পথ।

ওরা দুজনে পর্বত সোপান ভেঙে একটি প্রস্তরময় ত্রিতল অট্টালিকার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনে ক্ষুদ্রাকার মেহগনি দরজা। দরজার কড়া ধরে নাড়লেন গুরুবক সিং। গুরুবক সিং অবশ্য পোশাক পালটে ছিলেন, মাথায় পাগড়ীও আর রাখেননি। এখন কেউ দেখলে তাঁকে হিন্দু বলে অন্তত সন্দেহ করবে না। তবু পুরোপুরি মুসলমান না হলেও নিস্তার নেই। মক্কায় ঢুকে পড়েছেন, অপরাধ যতখানি হবার প্রায় হয়েই গেছে। এখন কেউ জানবার আগে ইমামসাহেবকে কটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে মুসলমান হয়ে নিলেই নিস্তার।

ইমানসাহেব বেশী উৎকোচ পেলে এমনি কাজ করতে অভ্যস্ত জেনেই গুরুবক সিং এসেছেন। সরাইখানার মালিক রহিমউল্লা সেই কথাই বলেছে। এই ইমানসাহেব চুপি চুপি বহু ভিন্নধর্মের লোককে মক্কার মধ্যেই স্বধর্মে এনেছেন। তাতে

তাঁর লাভ, কিছু বেশী রোজগার হয়েছে।

গুরুবক সিং ইস্রায়িলের মত একটা লম্বা কাপড় দিয়ে আলখাল্লার মত মাথা ঢেকেছিলেন। তবে ইস্রায়িলের যেমন মুখটি খোলা ছিল, গুরুবক সিংয়ের ছিল না। গুরুবক সিং বোধহয় ভয়েই মুখটি ঢেকেছিলেন।

ভয় হওয়া স্বাভাবিক। পাশ দিয়ে যে সব যাত্রীরা চলে যাচ্ছিল, তাদের আকৃতি খুব দুর্বল নয়। একবার শুনলেই হ'ল। তাছাড়া আছে সুলতানের বহু ধার্মিক অনুচর। বিধর্মী মক্কায় ঢুকেছে শুনলে খাপ থেকে তরোয়াল খুলে চলে আসবে। এই ভয়েই গুরুবক সিং মুখ ঢেকেছিলেন।

যা'হোক সেই বাড়ির অভ্যন্তরেই ইমানসাহেবের দেখা মিললো। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মস্তকে শুভ্রকেশগুচ্ছ নিয়ে আপেলের মত রাঙা চেহারার মানুষ জানালেন —আপনি মুসলমান হবেন, এতে আর অপরাধ কি? তবে একটা কথা, শেষকালে দেশে গিয়ে আবার যেন নিজের ধর্মে ফিরে যাবেন না।

সেই ইমানসাহেবের বাড়িতে তারা একঘণ্টা ছিল। যখন ইমানসাহেব গুরুবক সিংকে কলমা পড়াচ্ছেন, এই সময় একটি ঘটনা ঘটলো। একটি হুরীর মত যুবতী রমণী ঊর্দ্ধশ্বাসে এসে গুরুবক সিংকে বললো,—আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, ধর্ম দিচ্ছেন কেন?

ইমানসাহেব ধমক দিলেন,—সাকী ভেতরে যাও।

সাকী ইমানসাহেবের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলো না। তার দুটি নীল চোখের দৃষ্টি নিয়ে গুরুবক সিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইলো।

আর গুরুবক সিংও স্থান-কাল ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন তাঁর বয়স। তিনি যে প্রৌঢ়ত্বের ধাপে উন্নীত হয়েছেন সে কথা ভুলে গিয়ে একান্ত নির্লজ্জের মত সেই যুবতীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

ইস্রায়িল পাশে দাঁড়িয়েছিল, লজ্জা পেল সেই। ইতস্তত করে গুরুবক সিংকে নিজের উপস্থিতি জানাতে চাইলো।

কিন্তু গুরুবক সিং তখন এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে ইমানসাহেবের উপস্থিতিও তিনি ভুলে গেলেন। তিনি বোধহয় তখন বেহেস্তের হুরীর রূপ কল্পনা করছিলেন। তাই অনুসন্ধিৎসু চোখের অভিজ্ঞ দৃষ্টি নিয়ে সাকীর অগ্নিসম যুবতীদেহের ঐশ্বরিক রূপ পরীক্ষা করলেন। তবে কি এ রূপসীটি খোদার প্রেরিত কোন দেবদূতী? না হলে কামনার সমস্ত উপাচার নিয়ে সে কেমন করে এখানে এল? এই তীর্থক্ষেত্রে তো তার অবস্থান মানানসই নয়। একে দেখলে যে পুরুষের মনের সমস্ত সংযম লোপ পায়। মন হয়ে ওঠে একাগ্র। আর সেই একাগ্রতা শুধু আদিম পাশবিকতাকে চরিতার্থ করে।

ইমানসাহেব ভ্রূকুটি করে এই সব ঘটনা পর্যালোচনা করছিলেন। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন,—সিংজী, আমাদের কার্যে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

সিংজী তখন মোহগ্রস্ত। সেই রূপসী ঐশ্বর্যময়ীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে

নিয়ে ইমানসাহেবের কথার জবাবে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—এ কে ইমানসাহেব ? আপনার বেটি ?

ইমানসাহেব উত্তর দিতে চাইলেন না। কিন্তু সিংজীর আয়ত চোখের দৃষ্টির প্রশ্ন সহ্য করতে পারলেন না দেখে তাচ্ছিল্যভাবে উত্তর দিলেন,—আমার বেটির মতন।

মতন ?

ইমানসাহেব ইতস্তত করলেন, তারপর বললেন,—হ্যাঁ, ও আমার দোস্তের বেটি। দোস্ত মরবার সময় আমার কাছে সঁপে দিয়ে গেছে।

দোস্ত কি করতেন ?

কাবা মসজিদের মোল্লা শরিফের কাজ করতো হালিম।

বেটির শাদী হয় নি ?

ইমানসাহেব আবার একটু ইতস্তত করলেন।

এবার সেই সাকী এগিয়ে এল। কন্ঠে ঝাঁজ সৃষ্টি করে বললো,—অত খোঁজের কি আছে ? এসেছেন ধর্ম করতে করে চলে যান। আমার শাদীর সঙ্গে আপনার ধর্মের কি আছে ?

মেজাজও যে অন্য সুর সৃষ্টি করে, ক্ষোভও যে জায়গা হিসেবে তার প্রকৃতি পালটায়, সাকীর কথার সুরে তা প্রমাণ হ'ল। যেন মধু। মধুও বোধহয় এত মিঠা নয়। যে মিঠা সৃষ্টি করলো সাকী তার ঐ কটি কথায়।

আর ইস্রায়িলের অনুভূতি এখানে অপ্রকাশ্যই থাক্। কারণ ইস্রায়িল এখানে গুরুবক সিংয়ের বাহক। তার অনুভূতি উপভোগের শীর্ষে যখন উন্নীত হবে না, তখন আপাতত তার কথা মুলতুবী রইল। শুধু এইটুকু বলা যায়, যে ইস্রায়িল তার মর্দানা রক্তের উত্তাপ নিয়ে নিজেই দগ্ধ হয়েছিল।

গুরুবক সিং সাকীর কথাগুলি মনের মধ্যে ধরে মনে মনে 'আহা' বলছিলেন। মুখে বললেন,—তামাম দুনিয়া প্রায় আমি ঘুরেছি কিন্তু এই মক্কায় এসে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। আমার কসুর মাফ করুন বিবি, আপনার স্বধর্মে আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করতে চাইলে আপনি আমাকে নিষেধ করলেন! আমি পরদেশী, আমার দেশ হিন্দুস্থানে কিন্তু আপনি আরববাসী হয়ে যে মনের পরিচয় দিলেন সে মন কোথায় ? আমি অন্তত কোথাও এমনটি দেখিনি। শুধু বেহেস্তের হুরীর মত, স্বর্গের অপ্সরীর মত রূপই আপনার নেই, আছে দিল, আর সেই দিলে আছে আসমানের মত এক দরদ। মন ভী বহুত সুন্দর আছে। যে মন ফুলের মত সৌরভময়।

গুরুবক সিংয়ের আবেগ এসে গিয়েছিল, তিনি আরো হয়তো অনেক কিছু স্রোতের মত অনর্গল বলতেন কিন্তু ইমানসাহেব অসোয়াস্তি প্রকাশ করলেন। আর সাকী লজ্জায় আপেল রাঙা গন্ড নিয়ে আনন্দে, হরষে হৃদয় পূর্ণ করে উর্ধ্বশ্বাসে পালালো।

সাকী পলায়ন করলে গুরুবক সিং হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে বোকার মত ইমানসাহেবের দিকে তাকালেন। তারপর ব্যাপারটা খুবই অন্যায় করেছেন, এমনি ধারণা হতে অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,,—ইমানজী, আমি কি খুবই অন্যায় কিছু করে ফেললাম ?

ইমানসাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন,—আপনার কাজ শেষ করে নিন্ সর্দারজী ! আমার বহুত কাজ বাকি আছে।

তারপর আর কি ?

গুরুবক সিং গোলাম আলি নাম গ্রহণ করে মুসলমান সমাজের নিয়মকানুন রপ্ত করে ইস্রায়িলের হাত ধরে জমজমা কূপের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু পথে যেতে যেতে গুরুবক সিং ওরফে গোলাম আলি ইস্রায়িলকে হাজার প্রশ্ন করতে লাগলেন। আচ্ছা, মিঞাসাহেব এই যে আউরত তুমি দেখলে, একে দেখে তোমার কি মনে হ'ল ? আউরতটি খুবসুরত না ! শুধু খুবসুরত নয় এমন রূপ আর জীবনে দেখিনি। আউরতের যে এত রূপ হয়, আর তা দেখলে যে দিলের মধ্যে ধড়ফড় করে, তাও আগে কখনও হয় নি।

গোলাম আলি বলতে লাগলেন,—সারা হিন্দুস্থান আমি চুঁড়েছি। পাঞ্জাব আমার দেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, রাজপুতানা, দিল্লী, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, রাঁচী, উড়িষ্যা। তামাম বাংলা মুলুকও আমার বাদ যায় নি। কিন্তু কোথাও এমনি খুবসুরত, এমনি দৃষ্টির চাউনি, এমনি নৃত্যের ছন্দের মত হাসির সুরবাহার, এমনি আঁখির নীল সদ্য ফোটা ফুলের মত যৌবনের লাবণ্য, এমনি পাকা ফলের সুন্দর গড়নের মত দেহের প্রস্ফুটিত কৌমার্য !

হঠাৎ সিংজী ইস্রায়িলকে ধাক্কা মারলেন,—কি আলিসাহেব কিছু বলো ? তুমি যে একেবারে বুঁদ হয়ে গেলে !

ইস্রায়িল সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে দূরে আঙুল বাড়িয়ে নির্দেশ করে দেখালো—মক্কার মসজিদের আসমান ছোঁয়া দীর্ঘ মিনার।

হ্যাঁ, মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র সেই মক্কা। যে মক্কায় গিয়ে কাবা দর্শন করেছে, তার সমস্ত পাপ স্খালন হয়ে গেছে। মানুষের পাপ ধারণ করে করেই তো কাবার অভ্যন্তরের শ্বেতবর্ণের প্রস্তর কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধারণ করেছে। শুধু কাবা ইসলাম-ধর্মেরই শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। কেউ যদি একবার সেখানে গিয়ে কাবা দর্শন করে তাহলে সে আর কথা বলতে পারবে না। স্তব্ধ সাধনার যে রূপ এর মর্মরময় গাত্রের প্রতিটি খিলানে খিলানে, তার আর তুলনা হয় না। আরও অনেক কিছুর—যা ভাষায়ও অঙ্কিত করা যায় না।

দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয় প্রস্তর নির্মিত ধূসরবর্ণের এক মসজিদ গম্বুজ। পর্বতের পর পর্বত পাশাপাশি গম্ভীর হয়ে দণ্ডায়মান। তারই ঠিক বক্ষোপরে মক্কা মসজিদের ছাউনি। আর সেই মসজিদ থেকে গহ্বরের মধ্যে নেমে গেলে কাবার অলৌকিক অবস্থান। এই কাবা যে দর্শন না করেছে তার পুণ্য পূর্ণতার রূপ পায় নি। অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হয় না।

গুরুবক সিং ও ইস্রায়িল বালুকাময় পথ অতিক্রম করে জমজমায় গিয়ে পেট পুরে জল খেয়ে মসজিদ সোপানে উঠতে লাগলো। মসজিদ সোপানের কয়েক ধাপ উঠে আনুষ্ঠানিক কাজ তাদের সম্পন্ন করতে হ'ল। মস্তক মুন্ডন, নতুন বস্ত্র পরিধান করে তারপর তারা আরো সোপান বেয়ে উঠলো।

ভীড় প্রচন্ড। যেতে গেলে সর্বদা যাত্রীর বাধা পেতে হয়। ওরা সেই বাধা অতিক্রম করে এগোতে লাগলো। সঙ্গে জুটলো এক মোল্লা। মোল্লার কাজ ভাল করে দর্শন করিয়ে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিক কাজগুলো সম্পন্ন করে দেওয়া।

ওরা সেই অনুসরণকারীর পিছু নিয়ে প্রাঙ্গণের পর প্রাঙ্গণ অতিক্রম করতে লাগলো। শুধু ধুসর প্রস্তরের মেলা। আর অন্ধকারের গাঢ় তমিস্রা। দিনের বেলা বাইরে সূর্যতাপে পাহাড় গলছে, বালি উত্তপ্ত হচ্ছে কিন্তু মসজিদের অভ্যন্তরে যেমন ঠান্ডা তেমন অন্ধকার।

তারপর কাবা। ওরা মসজিদ সোপান থেকে আরো নিচে নেমে গিয়ে কাবার সাতটি দরজা দেখতে পেল। চারিকোণ বিশিষ্ট মসজিদ। প্রত্যেক কোণে কোণে স্তম্ভরাজি বিরাজিত। স্তম্ভরাজির গায়ে গায়ে অপরূপ নকশার সমন্বয়। উপরের দ্বার অতিক্রম করে নেমে গেলে আরো বহু সোপানশ্রেণী। সোপান পথ প্রস্তরময়, অন্ধকার ও পিচ্ছিল।

অনুসরণকারী মোল্লা ওদের বললো,—খাঁসাহেব, থোড়া সামালকে পথ, বহুত পিচ্ছিল।

সোপান অতিক্রম করতেই রৌপ্যনির্মিত ঝকমকে কাবার গহ্বর দেওয়াল। তার-পরই পূর্বধারে চারি থাক্‌ ও অপর তিনদিকে তিনথাক্‌ করে বিভিন্ন স্তরের স্তম্ভ। স্তম্ভগুলি পরস্পর খিলান দ্বারা গ্রথিত এবং প্রত্যেক চারটি স্তম্ভের ওপর এক একটি গম্বুজ নির্মিত দেখা গেল।

ইস্রায়িল সেইদিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বললো,—আলিসাহেব, নির্মাণ কৌশল লক্ষ্য করুন।

আলিসাহেব ওরফে গুরুবক সিং তখন কি ভাবছিলেন, ইস্রায়িল জানে না। জানলে হয়তো ঐ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতো না। গুরুবক সিংহের চোখের ওপর তখন কাবার মাহাত্ম্য নয়, সাকীর রূপ—ইমানসাহেবের বাড়ির ঐশ্বর্য। সিংজীর বক্ষের হৃদয় কুমকুম ঐ ইমানসাহেবের বাড়িতে বাঁধা পড়ে গেছে। সিংজী হারিয়েছেন পঞ্চাশোত্তীর্ণের জীবন ও ম্লান যৌবন।

এবার মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। ভিড়ের চাপ সর্বদা এত বেশী যে, ভাল করে সব কিছু দেখা যায় না। অর্থ ব্যয় করে দেশবিদেশ থেকে এত লোক তীর্থভ্রমণে আসে যে, কোন সময়ই মসজিদ একটু ফাঁকা হয় না।

তাই ওদেরকে একটু অসুবিধার মধ্যে দিয়ে পথ করতে হ'ল।

কাবার গৃহের মধ্যে দুটি দীর্ঘ ও স্থূল স্তম্ভ। ঐ স্তম্ভের ওপরে স্তরে স্তরে খাঁজকাটা। সেই খাঁজের সোপানে স্তরে স্তরে সুবর্ণদীপ। কাবার অনতিদূরে

বত্রিশটি স্তম্ভের একটি চাঁদনী আছে। ঐ স্তম্ভরাজির প্রত্যেকটিতে সাতটি করে সুবর্ণপ্রদীপ প্রজ্বলিত রয়েছে। আর সেই প্রজ্বলনের প্রতিফলন অপরূপ শ্রী দান করেছে।

ইব্রায়িল অস্ফুটস্বরে বললো,—বাহ্! এমন না হলে ভক্তি? শ্রেষ্ঠ না হলে শ্রেষ্ঠতর মহিমা প্রচার হয়? তাজ্জব না করলে দর্শনের সার্থকতা থাকে? আমার বহুদিনের সাধ আজ পূর্ণ হ'ল।

কিন্তু গুরুবক সিং কিছু বললেন না, তিনি শুধু নিথর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

অনুসরণকারী মোল্লা বললো,—আপলোগ প্রদীপের আলো ধরে মস্তকে দান করুন। তারপর হাঁটু গেড়ে খোদার কাছে প্রার্থনা জানান। বলুন, আমার সমস্ত পাপ এবার স্খালন হোক্। আল্লা আমাকে মুক্তি দিন।

ওরা দুজনে তাই করলো কিন্তু তবু গুরুবক সিং কোন কথা বললো না। সাই সে মনে মনে উচ্চারণ করলো আর অধিকক্ষণ মৌন হয়েই থাকলো। শুধু তার মুখটি চিন্তান্বিত, ইব্রায়িল তা দেখে বুঝতে পারলো।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। স্তম্ভের ওপরে ছাদের খিলান থেকে শত শত ঝাড়ে আলোর দ্যুতি ঐশ্বর্যের হীরক ঔজ্জ্বল্যদান করলো।

এবার তারা এল কৃষ্ণবর্ণ সেই বহু ঈপ্সিত প্রস্তরের কাছে। যার একবার স্পর্শ, একটু ওষ্ঠের চুম্বনের জন্য যুগ যুগ ধরে তপস্যা।

সেখানেও অগণিত তীর্থযাত্রীর ভিড়। ইব্রায়িল গুরুবক সিংহের হাত ধরে এগিয়ে গেল। হঠাৎ গুরুবক সিং বললেন, মিঞাসাহেব, আমি যদি সাকীকে শাদী করি কেমন হয়?

ঐসময় ঐরকম হঠাৎ এক অদ্ভুত প্রশ্নে ইব্রায়িল তাজ্জব হয়ে গেল। সামনে দুনিয়ার সেরা মুসলমান ধর্মের জাগ্রত পীঠ। যার গাত্র স্পর্শ করলে জীবনের মুক্তি। যার মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যেখানে আসবার জন্য মরু-প্রান্তরে কত লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। আর তারই সামনে দাঁড়িয়ে সিংজীর এই প্রশ্ন! সিংজীও এখানে আসতে কম মেহনত করেন নি। আপন ধর্ম দান করে মুসলমান ধর্ম নিয়েছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই ধর্ম ত্যাগ করে কি হ'ল? সামান্য একটি আউরতের আকর্ষণের মধ্যে পুরুষের অহমিকা সব জলাঞ্জলি গেল?

ইব্রায়িলের সিংজীকে বড় খারাপ লাগলো। লোকটার সঙ্গে না এলেই ভাল হ'ত। না জানে, এই পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে আবার কি পাপ হয়ে গেল!

ইব্রায়িল তাড়াতাড়ি সেই জাগ্রত প্রস্তরখণ্ডের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে নামাজের ভঙ্গিতে বসে সেই প্রস্তরের স্পর্শ নিল, তাতে চুম্বন আঁকলো, তারপর উঠে এসে গুরুবক সিংয়ের সঙ্গ নিল। গুরুবক সিং তখনও যেন কেমন মোহাচ্ছন্ন। মদ খেলে যেমন আচ্ছন্নভাব চোখকে ঘিরে থাকে তেমনি আচ্ছন্নতা দুই চোখ ঘিরে।

হঠাৎ সিংজী বললেন,—মিঞাসাহেব, এবার চলিয়ে।

আর সেইমুহূর্তে ইস্রায়িল ভাবলো—এই সিংজীই মক্কায় আসার জন্যে তাকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ও বুঝতে পারলো সিংজীর কি হয়েছে। তবু কেমন যেন সে স্বীকার করতে পারলো না। এই আউরতের সঙ্গে এই তীর্থক্ষেত্রের তুলনা হয়? হোক্ না সে আউরত বহুত খুবসুরত। তবু শ্রেষ্ঠ এই পীঠস্থান।

ইস্রায়িল মনে মনে ধারণা করলো—আল্লার কাছে সিংজীর গুনাহ্ হয়ে গেল। এমন কি তারও হ'ল বোধ হয়।

কিন্তু আরো যে অনেক বাকী ছিল ইস্রায়িল জানতো না, পরে তা ঘটতে লাগিলো।

পথ দিয়ে ফিরছে, এক ফকির মসজিদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে চলছিল। সে বেশ উদাত্তস্বরে বর্ণনা করছিল।

ইস্রায়িলের তা কানে গেল।

'তীর্থবাসী তোমরা কাবার মাহাত্ম্য কতটুকু জানো? দুনিয়া যখন সৃষ্টি হয়নি, তারও দু'হাজার বছর আগে এই মসজিদ। এ মসজিদের নির্মাণ ঐ বেহেস্তের প্রাসাদপুরীতে নির্মিত। তারপর দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম যখন এই ভূমিতে এলেন, তখন এই মসজিদ বর্তমানস্থলে আনয়ন করলেন। আদিমানব 'আদম' তার জোরু 'হবার' মিলনে এই দুনিয়া পূর্ণ হ'ল এবং এই মসজিদ স্থায়ী হল। এই মসজিদেই খোদার আসল সাধনার ক্ষেত্র, সমস্ত ধর্মের উপাসনালয়।'

আরও অনেক কথাই ফকির সাহেব উদাত্ত স্বরে বলতে বলতে গেল। কিন্তু ইস্রায়িল শুনতে পেল না। কারণ সে তখন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। মনটা অন্য-মনস্ক হয়ে গেছে।

আর গুরুবক সিংয়ের কাণ্ড দেখে সে তাজ্জব। সিংজী ইমানসাহেবের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকে হাত নেড়ে ডাকছেন।

ইস্রায়িল কাছে গেলে বললেন,—মিঞা, আমি একবার ইমানসাহেবের সঙ্গে মোলাকাত করতে চাই।

দরকার কি? একথাটা ইস্রায়িলের মুখে এসে গিয়েছিল কিন্তু সবই বুঝতে পারছিল বলে কোন কথার প্রতিবাদ করলো না। শুধু গুরুবক সিংকে অনুসরণ করলো। আর মনে মনে বিস্ময়ে ভাবলো, সিংজী একজন সমঝদার আদমী হয়ে শেষপর্যন্ত এমনি দেমাগ্ খারাপ করে ফেললো।

যা'হোক পরবর্তী ঘটনা দেখবার জন্যে দর্শকের ভূমিকায় ইস্রায়িল নিজেকে ধরে থাকলো।

ইমানসাহেবের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল, পরস্পর সৌজন্যের পরিচয়ে আদাব বিনিময় হ'ল।

গুরুবক সিং কোন ভূমিকা না করেই তাঁর আর্জি পেশ করলেন—ইমানসাহেব, আমার একটি বেসরম আর্জি আছে, আমি আপনার বেটি তুল্য ঐ আউরতকে শাদী করতে চাই।

এমন স্পষ্ট কথায় ইমানসাহেব গম্ভীর মানুষ কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন। জবাব দিতে তার সময় নিল। তারপর বললেন,—এ কেমন করে হয় সর্দারজী? সাকী বড় বাচ্চা লড়কী আছে। ও আপনার সঙ্গে যা দিল্লাগী করেছে মাফি করুন। আর তাছাড়া আপনি পরদেশী, এসেছেন মুসলমান তীর্থ দেখতে। এখন নিজের দেশে ফিরে যাবেন। এ কেমন করে হয় সর্দারজী? আপনার এ প্রস্তাব বড়ই মুশকিল আছে, আপনি আমাকে মাফ করুন।

কিন্তু গুরুবকের অবস্থা যে আরো সঙ্গীন হয়েছিল, পরবর্তী ঘটনায় তা প্রমাণ হ'ল, তিনি বললেন, ইমানসাহেব আমি দেশে ফিরবো না। এখানেই থাকবো। আর আমি তো মুসলমান ধর্ম আপনার কাছ থেকে গ্রহণ করেছি। এবার মুসলমান আউরত শাদী করে আমি পুরোপুরি মুসলমান হব।

ইমানসাহেব তবু প্রতিবাদ করতে ছাড়লেন না—সর্দারজী, আপনি রাজী হলেও সাকী রাজী হবে না। আমার দোস্ত হালিমের বড় পেয়ারী বেটি। ওর মনে দুখ্ দিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না।

হঠাৎ গুরুবক সিং বললেন,—বেশ, আপনি সাকীকে এখানে ডাকুন। সে যদি অমত করে তাহলে আমি আর পীড়াপীড়ি করবো না।

ইমানসাহেব এবার পরাজয় স্বীকার করলেন, কিন্তু তবু বললেন,—সর্দারজী, আমাদের অন্তঃপুরিকারা তো বাইরের লোকের সামনে বেরোয় না।

বেশ, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করে আসুন।

গুরুবক সিং যেন মরিয়া। কোন কিছুতেই তিনি পেছোবেন না।

ইমানসাহেব শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে ভেতরে গেলেন।

তারপর কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে গম্ভীর হয়ে বললেন,—বড়ই তাজ্জব ব্যাপার সর্দারজী। সাকী রাজী।

আর সঙ্গে সঙ্গে এদিকে তৃতীয় ব্যক্তি ইস্রায়িল সিংজীর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো,—তাহলে আমি চলি সিংজী।

গুরুবক সিং তখন এত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, উচিত অনুচিত বিবেচনা বোধ লোপ পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বললেন,—হ্যাঁ, মিঞাসাহেব তুমি এস। তোমার তো আবার অনেক পথ যেতে হবে।

শেষ ছেদটুকু পর্যন্ত দেখবার ইচ্ছে ছিল ইস্রায়িলের কিন্তু সিংজী যখন তাকে থাকতে বললেন না তখন ইস্রায়িল একরকম অভিমান করেই মক্কা ত্যাগ করল।

হয়তো সিংজী ভাবলেন, তার আওরতের ওপর ইস্রায়িল যদি ভাগ বসায়, তার চেয়ে তাড়িয়ে দেওয়াই ভাল।

আজ ইস্রায়িল বৃদ্ধ বয়সেও সেই কথা ভাবে, আর মনে মনে হাসে। সিংজী কত ছোটমনের লোক ছিলেন। একটা লোকের সঙ্গে প্রায় পনের দিন ঘুরলেন, অথচ লোকটিকে চিনতে পারলেন না!

কিন্তু গুরুবক সিংয়ের ব্যবহারের জন্যে আজ তার দুঃখ হয়। দুঃখ সেদিন তীর্থে গিয়ে সিংজী কেন অপরাধ করলেন? তার যে সারাজীবনই মনে হয়েছে, সেও খোদার কাছে অপরাধ করেছে, সিংজীও করেছেন। গোলাম আলি আজ বেঁচে আছেন কিনা সে জানে না। যদি বেঁচে থাকেন, সাকীকে নিয়ে সুখে আছেন কিনা একবার দেখতে ইচ্ছা হ'ত। তবে মনে হয়, গোলাম আলি বয়সের জন্যে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তার সাকী রূপ হারিয়ে এক গাদা বালবাচ্চা নিয়ে মক্কার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তার বাচ্চারা দুটি খানার জন্যে কেঁদে কেঁদে ভিঙ্ মাঙ্ছে।

তবে যদি এই কথা সত্যি হয়, তাহলে গোলাম আলি সুখী হয়েছে বলতে হবে। কাবা মসজিদের সেই কৃষ্ণময় প্রস্তরের সামনে যে অপরাধ গুরুবক সিং করেছিল, তার ক্ষমা নেই। ঈশ্বর ছেড়ে কামনার উপাসনা, এ কি কখনও মেহেরবান খোদা সহ্য করেন? খোদা মেহেরবান সবাই জানে কিন্তু খোদাকে অবহেলা করলে তিনি দয়া করবেন কেন?

সেদিনের পাপ তাকেও না স্পর্শ করে পারে নি। স্পর্শ করেছে বলে আজ তার এই অবস্থা।

তিনি সারাজীবন ধরে কি পেয়েছেন? কিছুই পান নি বলে কিছু দিতেও পারেন নি। তার পেয়ারী জোরু, বড় সোহাগের ইন্তেজার—আশনাইকে তিনি শুধু দিয়েছেন নিজের বেদনায় ভরা আকুতির উচ্ছ্বাস, পরিবর্তে নিয়েছেন আশনাইয়ের কুমারীত্বের সব ঐশ্বর্যটুকু। আশনাই কখনও শোক প্রকাশ করে নি, নীরবে সব কিছু সহ্য করেছে। অভাবের সংসারে জোটেনি পেটপুরে আহার, তার জন্যে কই কখনও তো সোহাগী অনুযোগ করে নি! করেছে ঐ বেটা লুতুফ। ও ছোটবেলা থেকে কেমন যেন বিদ্রোহী। কেমন যেন বিক্ষুব্ধ! আর বাপজানকে আঘাত করতে পারলেই যেন খুশি।

আগে তবু সহ্য হ'ত। ইদানীং আর একেবারে সহ্য হয় না। ইদানীং বলতে এই বারো বছর। এই বারো বছর তার জীবনে অন্ধকার নেমে এসেছে। সে অকর্মণ্য, পঙ্গু হয়ে দিনরাত বাড়িতে বসে আবোল-তাবোল ভাবছে। তখন লুতুফ কিছু বললে তার সবচেয়ে মনে পড়ে যায়, সে পঙ্গু। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মাজার যন্ত্রণা সূচ ফোটায়?

এই যে সে হঠাৎ অকর্মণ্য হয়ে গেল, তার জন্যে দায়ী কে? বিক্ষিপ্ত মন বার বার বলে কাবার সেই ঘটনা। আল্লা তাকে ক্ষমা না করে শাস্তি দিয়েছে। আর সে সেই শাস্তিতে পাগল হয়ে পরিত্রাহি চিৎকার করছে। বাঁচবার কোন পথ নেই। বাঁচতে সে পারে নি। আজ পরমুখাপেক্ষী হয়ে আছে। আর সেই পরমুখাপেক্ষী হয়েই তার যন্ত্রণা। যন্ত্রণার শয়তান কুরে কুরে তাকে খেয়ে চলেছে। সমস্ত শরীরে ক্ষত। সেই ক্ষত দিয়ে দূষিত রক্ত বেরুচ্ছে। দুর্গন্ধ সারা দেহময়।

একটি শক্ত সমর্থ পুরুষ একদিন বুকের সিনা ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতো। সে হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। আর উঠতে পারলো না। অথচ বেঁচে থেকে

নির্যাতন সহ্য করে চললো।

এইজন্যে একদিন ভয়ে ইস্রায়িল খোদাকে ডাকা ছেড়ে দিল। তার মনে হচ্ছিল, দুঃখের সময় খোদাকে ডাকলেই মনে পড়ে যায় সেই অতীতের অবহেলা। আর সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা বেড়ে যায়। সেইজন্যে ইস্রায়িল খোদার অনুগ্রহ ছেড়ে দিয়ে অল্লাট-দেবীকে ডাকতে লাগলো।

তবু শান্তি তার জীবনে আসেনি, অল্লাটদেবী পুনরুজ্জীবিত হয়ে ইস্রায়িলকে কোন দয়া দেননি, তবু ইস্রায়িল সেই অল্লাটদেবীরই ভক্ত।

তাপ আসতে আসতে সপ্তমে উঠেছিল! গ্রীষ্মকালের আরব আবহাওয়া। যত সূর্য মধ্যগগনে সরে সরে যাচ্ছে, তত এদিকে আরবের মাটি তাতছে। সেই গরম আবহাওয়া বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শুষ্ক করে তুলেছিল।

ইস্রায়িলের গায়ে একঝলক সেই তাপ এসে লাগতে তার চৈতন্যোদয় হ'ল। কিন্তু হঠাৎ সে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলো। খোদাকে ডাকবে না ঠিক করেছিল কিন্তু আজ খোদা ছাড়া যেন কেউ নেই। আজ সবচেয়ে বড় মনে হচ্ছে, তীর্থপ্রদেশ এই আরব, এখানে দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে। আর তাকে আজ এই প্রদেশ থেকে নির্বাসন নিতে হবে! এর চেয়ে দুঃখের আর কি থাকতে পারে।

আল্লা বুঝি তাকে ক্ষমা করলেন না। ক্ষমা করলেন না, সেদিনের এক মুহূর্তের পাপ। সেই পাপেই আজ তার নির্বাসন। পঙ্গু করেছেন, জরা দিয়েছেন, শক্তি কেড়েছেন। এখন বিতাড়ন পর্ব।

তাই আজ তার বড় বেশী আল্লাকে মনে পড়তে লাগলো।

কিন্তু এত শাস্তি কেন? গুরুবক সিং তো এক আওরতের মোহে মুগ্ধ হয়ে ঈশ্বরের উপাসনা ভুলেছেন। কিন্তু সে তো তারই মধ্যে প্রদীপের তাপ নিয়েছে, কোরানের মন্ত্র উচ্চারণ করেছে, কৃষ্ণময় প্রস্তরের স্পর্শ নিয়ে চুম্বন দিয়েছে, তবে কেন তার প্রতি এই অবিচার?

ইস্রায়িল নিজেকে রোধ করতে পারলো না। কেঁদে চললো একলা সেই ঘরে। আর কোমরের যন্ত্রণাটা যেন তার উদগ্র হয়ে উঠলো।

সেইসময় ঘরে প্রবেশ করলো লুতুফ আলি। ইস্রায়িলের বেটা।

আব্বাজান কাঁদছে দেখে সে থমকে দাঁড়ালো।

কিন্তু ইস্রায়িল পুত্রকে দেখে চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করলো,—বেটা, কিছু দরকার?

লুতুফ যে কথা বলতে এসেছিল তা না বলে হঠাৎ আব্বাজানের জন্যে তার কাতরতা জাগলো। লোকটি রোগে ভুগে ভুগেই ঝাঁঝরা হয়ে গেল। তাই সে বললো,—আব্বা, তুই এত কি ভাবিস্? ভাবতে ভাবতে যে মরতে বসেছিস্?

সান্ত্বনা মানুষকে আরো শোকার্ত করে। ইস্রায়িলও আরো শোকার্ত হ'ল। আবার তার চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। বললো,—আমি অক্ষম হয়ে গেছি।

বেটা, আমি তোদের জন্যে কিছু করতে পারলুম না। দেখ, কালরাত্রে আমি উঠে দাঁড়াতে পেরেছিলাম, মুঠিতে ছুরি ধরতে পেরেছিলাম, আজ আবার সব হারিয়ে ফেলেছি। আর আমি দাঁড়াতেও পারছি না, ছুরি ধরতেও পারছি না।

লুতুফ পিতার অবস্থা দেখে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলো, তারপর বললো,—তার জন্যে তোর দুঃখ করতে হবে না। তুই উটের পিঠে চড়ে যাবি, সঙ্গে আম্মা থাকবে। আর আমি ফতুমাকে নিয়ে একটি ঘোড়ার পিঠে চড়বো। আর বাকী মালপত্তর ও দুজন লোক দুটি ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাদের পাহারা দিতে দিতে চলবে।

ইস্রায়িল চোখের জল মুছতে মুছতে বললো,—আমি দুর্বলা আওরতের মত অক্ষম হয়ে উটের পিঠে সওয়ার হব!

লুতুফ তাতে বললো,—আব্বা, এর জন্যে তোর মনে দুঃখ কেন? মানুষ কি বুড্ডা হয় না? আমিও তো একদিন বুড্ডা হব!

ইস্রায়িল বললো, অকালে বুড়ো হলে মনে বড় লাগে।

লুতুফ আর কোন কথা বললো না।

পিতার শোকের কোন হেতু নেই দেখে আর কোন দরদ জানালো না। তার তখন মেজাজ চঞ্চল, সন্ধ্যা হওয়ার মুখেই যাত্রা করতে হবে। তার জন্যে অনেক অনেক তোড়জোড় বাকী। আবেদীন ও মোস্তাফা বেশ কাজের লোক। কোত্থেকে একটা গর্দভ যোগাড় করেছে। গর্দভের ওপর সাংসারিক যাবতীয় মালপত্তর তুলে দেবে বলে তাকে এনেছে।

লুতুফ দেখে বললো,—কারুর দরজা ভেঙে এটাকে বের করে আনলে নাতো! জানতে পারলে জিব টেনে বের করবে।

লোকদুটি বললো,—আমরা অতো বোকা নাকি? এক জায়গায় একা একা চরছিল ধরে আনলাম।

লুতুফ সেইজন্যে খুশি। সে খুশি হয়েই পিতার ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু পিতার কান্না দেখে আবার তার মন বিগড়ে গেল। সে আবার অন্যমনস্ক মন নিয়েই পিতার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু মনকে সে শক্ত করলো—না, কোন মায়া নয়। এ দেশ তাকে ছাড়তেই হবে। আব্বার শোক দেখে কাতর হলে চলবে না। কাতর হলে অনাহারে থাকতে হবে। অনাহার তার সহ্যাতীত।

পৃথিবীর মধ্যে এই দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রক্তাক্ষরে লেখা থাকবে আর

একটি পরিবার অন্নসংস্থানের জন্যে নিজের দেশ ছেড়ে ভিন্‌দেশে ছুটেছিল। আরব থেকে হিন্দুস্থান! হিন্দুস্থানে চিরকালই নতুন নতুন মানুষের আমদানী হয়েছে, এতে আর নতুনত্ব কি? এমন কি আরব থেকে লোক চলে যাওয়াও নতুন নয়। বেদুইনরা প্রত্যহই যাচ্ছে। বেদুইনদের যাওয়ার মধ্যেও নতুনত্ব নেই, তারা যাযাবর জাতি। পশুপালন তাদের বৃত্তি। আর তাঁবু খাটিয়ে বাস করা তাদের রীতি। সেইজন্যে তারা ভাগ্যান্বেষণে এখানে ওখানে চলে যায়।

আর এই জন্যেই নতুনত্ব নেই আরব থেকে কারুর যাওয়ার।

তবু নতুনত্ব সৃষ্টি হ'ল এই এদের যাওয়ার মধ্যে।

রকুল অঞ্চলে যে ছ'ঘর অধিবাসী থাকতো, তাদের মধ্যে এক ঘর চলে যাচ্ছে দেখে তারা শোকার্ত হ'ল। কিন্তু তারা বাধা দিল না, বললো—খোদা তোমাদের মঙ্গল করুন। যেখানে যাচ্ছো যেন সুখে থেকো।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যাও নেমে এল। নেমে এল অন্ধকারের সম্রাজ্ঞী কালো কাপড়ের ওড়নায় মুখ ঢেকে।

ওরা যাত্রা করলো।

শুক্লপক্ষের রাত্রি। সুতরাং আঁধার পথে পথ চলার বিপদ নেই। একটু পরেই ঈশ্বরের আলো আশমান আলোকিত করবে। তখন মরুপ্রান্তরের ভয়াবহতা কমবে। ওরা তুরন্ত মরুপ্রান্তর পার হবে। তবে এক রাতে কি মরুভূমি শেষ হবে? বালুকাময় দুর্গম পথ পার হতে যেমন কষ্ট, তেমনি পর্বতসংকুল বিপজ্জনক পরিখা। তাও না হয় সহ্য হ'ত, কারণ আরববাসীরা চির অভ্যস্ত এই সব পথের সঙ্গে। প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করতে তাদের মত মানুষ আর দুনিয়াতে দ্বিতীয় নেই! তবু ভয় করে তারা দিনের সূর্যলোককে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপশক্তি এত ভয়াবহ যে সহ্য করা আরববাসীর ক্ষমতার বাইরে। সেই তাপের কথা স্মরণ করে প্রথম যাত্রা লুতুফ রাত্রিবেলাতেই করলো।

আর জলের ব্যবস্থা! কত জল সঙ্গে নেবে? পিপাসা যেন মরুপ্রান্তরে সহজাত সঙ্গী। অথচ সমস্ত আরব ভূখণ্ডে জলেরই সবচেয়ে অভাব। ওয়েডিস্ বলে এক শুষ্ক নদী আছে, তার অভ্যন্তরে কূপ খনন করে যেটুকু জল। লুতুফ জল একটু বেশী করেই সঙ্গে নিল। সঙ্গে দুটি আওরত তাছাড়া একটি বাচ্চা আছে। এদের কথা চিন্তা করেই লুতুফ গাধার পিঠে চামড়ার থলিতে করে প্রচুর পরিমাণে জল চাপিয়ে দিল। মনে মনে তারও ভয় জাগতে লাগলো। সংশয় জাগলো, সব কটি জীবনকে হিন্দুস্থানে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারবে তো!

লুতুফের আব্বা ইস্রায়িল কিছুতে উটের পিঠে উঠবে না। তাকে তুলতে গেলে সে গর্জন করে বললো,—আমি আউরত আছি? আমি কেন উটের পিঠে উঠবো? লুতুফ আমাকে ঘোড়া দে!

লুতুফ বললো,—দেব আব্বা। সামনের পর্বতগুলো পার হলেই তোকে অশ্ব সওয়ার করবো।

কিন্তু ইস্রায়িলকে কোলে করেই লুতুফ উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। আর ইস্রায়িল উঠতে উঠতে কোমরের যন্ত্রণাটা চেপে ধরে ককিয়ে উঠলো। চিৎকার করে মুখ বিকৃত করে বললো,—লুতুফ তুই একটা আস্ত শয়তান! আশনাই তোকে গর্ভে ধরে দারুণ অন্যায় করেছে। আমার যদি আবার শক্তি ফিরে আসে তাহলে তোকে ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে কাটবো।

ইস্রায়িল সাজ করেছিল উঁচু ধরনের। তার বহুকালের একটি রেশমের আলখাল্লা গায়ে চাপিয়েছে। আলখাল্লা অবশ্য পোকায় কেটে কেটে রকমারী নকসা করেছে, তবু ঐটি পরে ইস্রায়িল গর্বিত। লুতুফ নতুন একটি ঢোলা কামিজ দিতে গিয়েছিল, ইস্রায়িল ঠেলে দিয়ে বলেছে, আমার জন্যে তোদের ভাবতে হবে না।

ইস্রায়িলের আর একটি বস্তু ছিল, টুপির মত একটি মাথার ঘেরাটোপ। সেটিও মজবুত কাপড়ের। দড়ির মত পাকানো পাকানো পাগড়ীর আকার। মাথার কাপড়ের ওপর আটকে দিলে শোভন হয়। সেটিও ইস্রায়িল তার পেটিকা থেকে বের করে মাথায় পরলো।

পরে দাঁড়াতে মনে হ'ল ঠিক যেন দস্যুসর্দার। কোমরে ছুরি। সেও তার জোয়ান বয়সের সংগ্রহ। কিন্তু সবই হল। সর্দারের মত পোষাক পরে ইস্রায়িল দাঁড়াতে পারলো না, পা খুড়ে থেবড়ে মাটিতে বসে পড়লো।

আর তাই দেখে বিলম্ব না করে লুতুফ আব্বাকে কোলে করে উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। তারপর আব্বার পাশে আম্মা আশনাইকে।

ফতুমা বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

লুতুফ তার দিকে তাকালো।

ফতুমা সুন্দরী। এক সন্তানের জননী হয়ে যেন আরও সুন্দরী হয়েছে। চোখের দুই কোনায় সুরমা টেনেছে। নিটোল দুটি ফোলা গালে রঙ না দিয়েও আপেল-রঙের আভা। লুতুফের এনে দেওয়া ঘাগরা, ব্লাউজ পরেছে, তার সঙ্গে বক্ষের যৌবনস্তম্ভকে প্রকট করার জন্যে লুতুফের এনে দেওয়া কাঁচুলি বুকে বেঁধেছে। স্বল্প আলোয় লুতুফের দৃষ্টি অনুসরণ করে ফতুমা লজ্জা-রাঙায় মাথা নিচু করলো, তারপর স্বামীর কাছে গিয়ে চাপাস্বরে বললো,—অসভ্য। অমন হাঁ করে কি দেখছিলে?

লুতুফ কৌতুক অনুভব করে চাপাস্বরেই উত্তর দিল, তোর যৌবন। ইচ্ছে করছে তোর যৌবনটা ছিঁড়ে খুঁড়ে হজম করি।

ফতুমা আরো চাপাস্বরে বললো,—কিন্তু তুমি জামার মধ্যে দিয়ে কি দেখছিলে?

তুই কাঁচুলিটা পরেছিস, কেমন দেখাচ্ছে তাই দেখছিলাম।

ফতুমা বললো,—অমন অসভ্যের মত দেখতে হয় না। হিন্দুস্থানে যাচ্ছো, শুনেছি সেখানকার আউরত নাকি আরো খুবসুরত। আমার ভয় করে, তুমি না আমাকে ভুলে যাও!

হঠাৎ লুতুফ কসম খেয়ে বললো,—কোন্ হারামি তোকে ভুলে যায় !

এরপর লুতুফ অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হ'ল। সামনে বসিয়ে নিল ফতুমাকে। আর ফতুমা চেপে ধরে থাকলো বাচ্চাটাকে। লুতুফ ফতুমার পেটের কাছে এক হাত বেড় দিয়ে তাকে চেপে ধরে থাকলো। গর্দভের পিঠে মালপত্তর। কিছু মাল উটের পিছন দিকেও রাখা হ'ল। আবেদীন ও মোস্তাফা সঙ্গে বর্শা ও ছোরা নিয়ে দলের সামনে থেকে পাহারা দিল।

রকুলের আরো পাঁচটি অধিবাসীর লোকজন এদের বিদায় দিতে এসেছিল। তারা চোখের জল মুছে বিদায় জানালো।

যাত্রার প্রাক্কালে হঠাৎ ইস্রায়িল চিৎকার করে বললো,—খোদা, তোকে এখানেই নির্বাসন দিলাম। আর তোর গোলাম নয়। এবার ভাগ্যের দোহাই। জয় অল্লাট-দেবীর জয়! সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ইস্রায়িলের ভগ্নকণ্ঠের প্রতিধ্বনি সোচ্চার হয়ে উঠলো।

অন্যান্যরা আল্লাকেই প্রার্থনা পেশ করলো। এমনকি আশনাই নামাজের ভঙ্গিতে খোদাকে জানালো স্বামীর জন্যে প্রার্থনা। স্বামীর অপরাধ যেন খোদা ক্ষমা করেন এই কথা সে মনে মনে বললো।

ইস্রায়িল তখনও চিৎকার করছিল,—জয় অল্লাটদেবীর জয়, জয় আল-উজ্জার জয়। জয় মেনাটের জয় !

আরবের বহু প্রাচীন সেই মূর্তি দেবতার নাম বার বার ইস্রায়িল করতে লাগলো। সে সময় ইসলাম ধর্মের কেউ আল্লা ছাড়া অন্য কারুর উপাসনা করতো না। হজরত মহম্মদের ধর্মমতকেই সবাই মেনে নিয়ে আল্লারই উপাসনা করতো। মসজিদে গিয়ে তার নামে নামাজ পড়তো।

কিন্তু ইস্রায়িল সেই আল্লার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলো।

যাত্রা শুরু করেই ছুটে চললো দলটি। এমনভাবে শব্দ জাগিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চললো, যেন এখুনি হিন্দুস্থানের মাটিতে গিয়ে চুম্বন আঁকবে।

প্রথম উদ্দম। উদ্দীপনা। তাছাড়া একটু কষ্ট করতে পারলেই অভিশপ্ত জীবনের অবসান। এই সব চিন্তা করেই দলটি এগিয়ে চললো। লুতুফ সবচেয়ে উৎসাহী। উন্মুক্ত আসমানের তলায় সহস্র নক্ষত্রমালাকে সাক্ষী রেখে বাতাসের শক্তিকে পরাজিত করে এগিয়ে চলা। এ যার অভিজ্ঞতা নেই সে বুঝবে না। বিপদ সর্বদা আসতে পারে। বিপদের কোন চেহারা নেই। অথচ এই নিঃশব্দ ভয়ঙ্কর উন্মুক্ত প্রান্তর ছেয়ে কত না বিভীষিকা। মৃত্যুদূত কোনদিক দিয়ে এসে যে কার ওপর ছোবল বসাবে, কাকে নিঃশেষ করবে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। অন্ধকার আস্তে আস্তে বিদূরিত হয়ে আসছে। বিশাল নীল আসমানের রমণীয় বক্ষে নক্ষত্ররাজি আলোর স্ফুলিঙ্গ নিয়ে রমণীর ললাটের টিকার মত জ্বলে উঠছে। তাতে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। অন্তত পথ চলার পক্ষে কোন বিঘ্ন নেই।

দূরের পথ দেখা যাচ্ছে না। তবে কাছের পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। দস্যুর পথ

ধূসর জালের মধ্যে আচ্ছন্ন। বালুকারাশির প্রান্তর ছেড়ে পর্বতের যেমন চিহ্ন চোখে পড়ছে না, অথচ মনে হচ্ছে, আর একটু গেলেই পর্বতের বাধা। তবে নিশ্চিন্ত সকলে এইজন্যে যে, লুতুফ পথ জানে।

চাঁদ উঠি উঠি করছে। কিন্তু উঁকি দিয়েও মেঘের আড়ালে লুকিয়ে যাচ্ছে।

আগে দুজন প্রহরী। আবেদীন ও মোস্তাফা। তারা বর্শা তুলে তৈরী হয়ে চলেছে। বিশেষ করে ভয় আরব দস্যুর। তারা কখন যে ঘোড়া ছুটিয়ে আসে, তার কোন ঠিক নেই। হয়তো অতর্কিতে এসে মেরে কেটে সমস্ত কিছু কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। সেইজন্যে সজাগ সবাই।

এই বিপদটিই প্রধান। তবে আরও বিপদ আসতে পারে, যেমন ঘূর্ণিবাতাস। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ঘূর্ণিবাতাস এসে সব ছিন্নভিন্ন করে দিতে পারে। আর আছে পর্বতে ওঠার ভয়াবহতা। এ ছাড়া আরো অনেক বিপদ আসতে পারে, যার কোন ইতিহাস নেই।

রাত্রের বিপদ থেকে তবু বাঁচার আশা করা যায় কিন্তু দিনের বেলায় চিন্তা মনে এলে বুক শুকিয়ে যায়।

প্রথমে রক্ষী দুজন। পরে উটের পিঠে ইস্রায়িল ও আশনাই, তারপর গর্দভের পিঠে মালপত্তর, সর্বশেষে লুতুফ ফতুমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে নিয়ে চলেছে। ফতুমার কোলে বাচ্চা হানিফ।

তিনটি ঘোড়া, একটি উট ও একটি গর্দভ। তাদের পায়ের শুধু অবিরাম চলা। মরুপথে যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতেই তারা চলেছিল।

বার বার উন্মত্ত বাতাস এসে তাদের প্রতিহত করছিল কিন্তু তারা তার জন্যে তৈরী হয়েই লাগাম ধরেছিল। শুধু মাথা নিচু করে চোখ বাঁচানো। বাতাসের সাথে বালুকার মিশ্রণ। সেই বালুকণা ঝটিকাবেগে চোখে এসে পড়লে চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি হত। সেইজন্যে তারা বার বার চোখ নামিয়ে বাতাস প্রতিহত করছিল।

হঠাৎ কিসের একটা শোঁ শোঁ শব্দ হ'ল। শব্দটা দূর থেকে কাছে এসে পৌঁছুলো। শব্দটা কাছে আসতে প্রচন্ড গর্জনের রূপ নিয়ে আকাশ বাতাস মথিত করলো।

লুতুফ চিৎকার করে উঠলো,—সামালকে, শয়তান বাতাস।

দৈত্য বার বার ধাক্কা মেরে এই দলটির মানুষগুলির পাঁজরা ভেঙে দিতে চাইলো। ভয়ে হানিফ কেঁপে উঠলো। একটি ঝড় নয়, অনেকগুলি ঝড়ের শয়তান। পর পর এসে ধাক্কা মেরে লন্ডভন্ড করতে চাইলো। এরা যুদ্ধের জন্যে তৈরী ছিল। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হল। লুতুফ ফতুমাকে অশ্বপৃষ্ঠের ওপর একেবার শুয়ে পড়তে বলে নিজে তাকে চেপে ধরে রক্ষা করতে লাগলো। ঘোড়াগুলি ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে চিঁ চিঁ শব্দে চিৎকার করে উঠলো।

চিৎকার সে সময় কারুরই কর্ণগোচর হবে না। তবু লুতুফ আব্বাকে সাবধান করবার জন্যে বললো,—মেরে আব্বাজান, উটের পিঠে শুয়ে পড়।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। বাতাসের দাপট শেষ হলে দেখা গেল, সবই ঠিক আছে শুধু গর্দভটি মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে।

চাঁদের আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে রাতের অন্ধকার বিদূরিত করেছে। সেই আলোতে সবাই দেখলো গর্দভের যন্ত্রণাকাতর দেহটি। তার দেহের উপরিভাগ থেকে মালপত্তর বালুকা পথে পড়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। আর প্রাণীটি কেমন যেন মৃত্যু-যন্ত্রণায় ভীত হয়ে চারি পা তুলে কাতরাচ্ছে। রক্ষী দুজন এগিয়ে গেল। লুতুফও লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামলো।

কিন্তু আরো কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গর্দভটি প্রাণত্যাগ করলো।

লুতুফ সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করল না। একান্ত নির্বিকারভাবে গর্দভের পিঠের মালপত্তরগুলি ভাগ করে উট ও ঘোড়াগুলির পিঠে উঠিয়ে দিল।

তারপর আবার পথ চলা। আবার দলটি গতি বাড়িয়ে ছুটে চললো। থামলে চলবে না। থামার সময়ও নেই। লক্ষ্যপথ এসে না পেঁছিলে থামলে আবার বিপদের মুখোমুখি হতে হবে। যে গেছে যাক্। যাবে বলেই তো এই বিপজ্জনক পথে বের হওয়া! যাদের যাবার সময় হয়েছে চলে যাবে। তার জন্যে মায়া করে থমকে দাঁড়ালে চলবে না। দাঁড়ালেই আবার বিপদ আসবে, আবার ক্ষয়ক্ষতির মাঝ-খানে পড়তে হবে।

লুতুফ তাই নির্বিকার হয়ে চলতে লাগলো। গর্দভের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু ভাববে না বলেই নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করলো। এখন এই মুহূর্তে যদি তার অতি আদরের পেয়ারী জোরু ফতুমাবিবি মারা যায়, তাতেও হয়তো সে থমকে দাঁড়াবে না।

হিন্দুস্তানে তাকে পেঁছতে হবেই। এবং সেখানে পেঁছিয়ে মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, রোহিলা, পাঠান, মোগল এদের কারুর দরবারে একটা চাকরি জোটাতে পারলেই মুক্তি। বিবি ফতুমা, বেটা হানিফ, আম্মা আশনাই, আব্বাজান ইস্রায়িল এদের সে সুখী করবে। এইজন্যে তার আজকে শত সহস্র কষ্ট এলেও দাঁড়াবে না। সহ্যের জন্যে সে তৈরী হয়েই এই দুর্গম পথ অভিযানে নেমেছে। অভিযান তার সাফল্য-মণ্ডিত করতেই হবে।

লুতুফ ভাবনা ছেড়ে সামনের পথ দেখলো।

উত্তর-পূর্ব প্রান্তর জুড়ে বিস্তীর্ণ পর্বতমালা। রাত্রের রুপোরঙের আলোয় পর্বতমালার আকৃতি অনেক ভয়াবহহীন। মনে হচ্ছে এ পর্বতমালা পার হতে কোন কষ্ট হবে না।

হঠাৎ এইসময়ে ইস্রায়িল হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আশনাইয়ের চিৎকার উন্মুক্ত প্রান্তর মুখর হ'ল।

লুতুফ ঘোড়া নিয়ে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গেল।

ইস্রায়িল তখন জ্ঞানহারা। বালুকাময় শয্যায় শুয়ে ইস্রায়িল হারিয়েছে তার চেতনা শক্তি। অনেকক্ষণ আগেই ইস্রায়িলের চেতনা লুপ্ত হয়েছিল। শুধু অপেক্ষা ছিল পূর্ণতার সৃষ্টি হতে। পূর্ণতা অনেক পরে আসতে তাই সকলে জানলো।

ঝড় চলে যাবার পর গর্দভটিকে মাটিতে পড়ে কাতরাতে দেখে ইস্রায়িল কেমন যেন নিজের শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করেছিল। তারপর গর্দভটি মারা যেতে ইস্রায়িলের মধ্যে বিকার এল। কি যেন বার বার বিড়বিড় করে বলতে লাগলো। কেউ জানে না, আশনাই স্বামীকে বার বার ঠ্যালা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো। ইস্রায়িল তখন অন্যজগতে চলে গেছে। আশনাই পাশে বসে বসে অনুভব করলো, স্বামীর দেহ যেন কেমন হিম হয়ে আসছে।

হঠাৎ যখন উটটি চলতে শুরু করলো, তখন ঝাঁকি পেয়ে ইস্রায়িল চেতনার মধ্যে এল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠে বললো,– সর্বনাশী মরুভূমি, হাঁ করে সব গিলে খাবে। আমার বেটা লুতুফ হিন্দুস্তানে যাবে। সেখানে গিয়ে সুখী হবে! ধুৎ যেতে পারলে তো!

আশনাই স্বামীকে মুখে হাত চাপা দিতে গেল।

ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে ইস্রায়িল আরো আবোল তাবোল বকতে লাগলো। গর্দভটা কিরকম ছটফট করে মরে গেল? সব যাবে, কেউ বাঁচবে না। আল্লা কাকেও রেহাই দেবে না। এই মরুভূমিতেই আছে হাজার হাজার শয়তান। ছুরি শানিয়ে তারা ওত পেতে বসে আছে। হি, হি, হি, হি! কেমন যেন পাগলের মত ইস্রায়িল হেসে উঠলো।

কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছিল না, শুধু বাতাসের হাহাকার ধ্বনি আর প্রান্তরের উন্মুক্ততার জন্যে। তারপর পর্বতমালার কাছে এসে পড়তে এই বিপত্তি!

লুতুফ কাছে গিয়ে বিরক্ত হয়ে বললো,—আব্বাকে এখানে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চল!

লুতুফের আম্মা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো। সত্যিই যদি বেটা তার আব্বাকে ফেলে যায়, এই ভেবে সে কেমন যেন কাতর হয়ে উঠলো।

লুতুফ কোন কথা না বলে একবার আম্মার দিকে তাকিয়ে ঘোড়া থেকে আবার তড়াক করে নামলো। ততক্ষণে রক্ষী দুজন ইস্রায়িলের কাছে এগিয়ে গেছে। ইস্রায়িলকে শুশ্রূষা করে তার চেতনা ফিরিয়ে এনেছে।

কিন্তু আর বিলম্ব করার উপায় ছিল না। ওদিকে রাত্রি আরো গভীরের দিকে এগিয়ে চলেছে। তার জন্যে চিন্তা নেই। চিন্তা সামনের দুর্গম পর্বতমালা। এই পর্বতগুলি এই দলটিকে পার হতে হবে। না হলে পথ প্রশস্ত নয়। সেইজন্যেই বিলম্ব করবার উপায় নেই। বিলম্ব যত করবে ওদিকে হিন্দুস্তানে পেঁছানো তত বিলম্ব হয়ে যাবে। আরো বিলম্ব করলে বিপদের আশঙ্কাই সবচেয়ে বেশী। কোত্থেকে যে কি হয়ে যাবে কে জানে? একে তো যাত্রার অনতিবিলম্বে একটি প্রাণী প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে!

সেইজন্যে লুতুফ তৎপর হল। আব্বাকে কোলে করে আবার উটের পিঠে তুলে দিতে রক্ষীদ্বয়কে নির্দেশ দিল।

ইস্রায়িল জ্ঞান ফিরে পেয়ে বালুকার ওপর থেবড়ে বসে পড়েছিল।

রক্ষী দুজন এগিয়ে আসতে হঠাৎ সে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠে ছেলেকে বললো,—আমাকে ছেড়ে যা লুতুফ, আমাকে ছেড়ে যা। আমার যাওয়া হবে না। খোদা আমার উপর বড় গোসা করেছে। আর কথা বলতে পারলো না ইস্রায়িল। কান্নার দমকে তার গলা বুজে এল।

লুতুফ আবার ভ্রূকুটি করলো। মেলা ঝামেলা তো দেখছি! এই পথের মাঝখানে বুড়ো কাঁদতে বসলো? ও সাঁৎই রক্ষীকে বলে বসলো,—আবেদীন, মোস্তাফা, অশ্ব সওয়ার হও। এখন ভাববিলাসের সময় নেই। বুড়ো এখানে পড়ে থাক্।

ফতুমা এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। মরঙ্গ লুতুফের কান্ড দেখছিল। সে হঠাৎ বললো,—আব্বা যদি পড়ে থাকে, তাহলে আমাকেও এখানে নামিয়ে দাও।

লুতুফ বিবির কথা শুনে বিরক্ত হয়ে বললো,—তোরা আরম্ভ করেছিস্ কি? আমি কি আমার একার জন্যে হিন্দুস্তানে যেতে চাইছি!

ফতুমা উত্তর করলো,—মনে হচ্ছে তোমার যেন সেইরকম মতলব।

সর্পের দংশন দেহে নিয়ে লুতুফ আর কথা না বাড়িয়ে আব্বাজানের দিকে এগিয়ে গেল। কাতরকণ্ঠে বললো,—আব্বা, আমার কসুর হয়েছে। এখন উটের পিঠে ওঠ। সামনে দুর্গম পর্বতমালা। কিছুক্ষণের মধ্যে পার না হলে আসমান-রোশনী মেঘের মধ্যে লুকোবে। তখন সেই অন্ধকারে এতগুলি মানুষের মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। পর্বতমালার গহ্বরে হিংস্র জন্তুর গতিবিধি তো তোর অজানা নয়।

ইস্রায়িল হঠাৎ চিৎকার করে বললো,—যা, দূর'হ এখান থেকে। আমি যাব না বলেছি, যাব না।

কেন যাবি না? লুতুফ রুখে দাঁড়ালো।

সে আমার খুশি। আমি কাউকে কৈফিয়ত দেব না।

তবে আমাদের সঙ্গী হলি কেন? রকুলে পড়ে থাকলে পারতিস্?

হঠাৎ ইস্রায়িল কোমরে গোঁজা ছোরাখানা হাতের বজ্রমুষ্টিতে তুলে আনলো। এনে চাঁদের আলোয় ধরে চিৎকার করে বললো,—আয় এগিয়ে আয়। দিই তোর বুকখানা রক্তাক্ত করে, প্রাণটি শেষ করে। আমার কাছ থেকে চাস কৈফিয়ত! এতদূর স্পর্ধা! কিন্তু পরক্ষণে ইস্রায়িল বদলে গেল! নিজের ছুরি ধরা হাত-খানির দিকে তাকিয়ে উল্লাসে চিৎকার করে বললো—লুতুফ দেখ্ দেখ্ আমার শক্তি আবার ফিরে এসেছে! আমি আবার ছুরি ধরতে পেরেছি!

ইস্রায়িল আনন্দে, উল্লাসে উঠে দাঁড়ালো সেই বালুকা প্রান্তরের ওপর। শক্ত একটি মজবুত মানুষের মত তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি। দাঁড়িয়ে উঠে আবার বললো,—দেখতে পাচ্ছিস্ লুতুফ, আল্লা আছে, খোদা আছে, ঈশ্বর আছে। অল্লাটদেবীর মূর্তি কল্পনা নয়। আমার শক্তি তারা ফিরে দিয়েছে। তারা শ্রেষ্ঠ, আমি ক্ষুদ্র—তাই আমি তাদের মহিমা বুঝি না।

ইস্রায়িল হাঁটু গেড়ে নমাজ পড়তে বসে গেল। আল্লাকে বার বার সেলাম জানিয়ে তার মহিমা গুণকীর্তন করলো।

তখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল দলটি।

দেখছিল জরাগ্রস্ত বৃদ্ধ ইস্রায়িলের আকস্মিক পরিবর্তন।

ফতুমা বাচ্চা হানিফকে বুকে জড়িয়ে ধরে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়েছিল। হানিফ আম্মার নরম বুকের সীমিতে মুখখানি গুঁজে দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে জানে না কোথায় যাচ্ছে? তবে তার মাঝে মাঝে অসুবিধা হচ্ছিল বলে আম্মার বুকের মধ্যে ছটফট করছিল। কান্নার আকুলি তার মধ্যে খুব কম বলে তার উপস্থিতি মাঝে মাঝে বোঝা যাচ্ছিল না।

ফতুমা যে ঘোড়াটিতে বসেছিল, সেই ঘোড়াটি পা তুলে তুলে দেহ দোলাচ্ছিল। মাঝে মাঝে ফতুমা তাই লাগাম ধরে নিজেকে সামলাচ্ছিল। আর দুটি ঘোড়া পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, তাদের পিঠে সওয়ার ছিল না। আবেদীন, মোস্তাফা দুজনেই ইস্রায়িলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। লুতুফও তাদের পাশে। আর একটু দূরে আশনাই মালপত্তরের সঙ্গে উটের পিঠে।

তার মুখখানি বিরক্তিতে ভরা। ভ্রূকুটি করে স্বামীর আচরণ লক্ষ্য করছিল। স্বামীকে তার ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল। এ সময়ে এসব কাণ্ড না করলে কি চলতো না? মানুষটা চিরকালই অবুঝ রইলো। রাগ হলে প্রচণ্ড তার দাপট, আবার উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তার প্রকৃতি উল্লাসে আত্মহারা। তাই তার বিরক্ত লাগছিল। বেটার কাছে শুধু স্বামীরই অবমাননা নয়, তারও যে অপমান, এই ভেবেই সে বিরক্ত হচ্ছিল।

তারপর যখন ইস্রায়িল নিজের ক্ষমতায় দাঁড়িয়ে উঠলো, তখন আনন্দে আশনাইয়ের চোখে জল এসে গেল। সে সেই উটের পিঠে বসেই ওড়না দিয়ে চোখের জল মুছলো।

এদিকে তখন ইস্রায়িল নামাজ পড়া শেষ করেছে। তারপর নিজেকে সর্দার কল্পনা করে হঠাৎ আবেদীন ও মোস্তাফার একটি ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলো। তারপর হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে প্রান্তর মুখরিত করে, চিৎকার করে উঠলো। —এই এবার আমাকে অনুসরণ কর্। আমিই সর্দার। আমিই তোদের দলপতি। আমিই যাবো সবার আগে এই ছোরা সঙ্গীন তুলে। এই বলে ইস্রায়িল আবার অট্টহাসি হেসে ছোরা তুলে বীরদর্পে এগিয়ে গেল।

অশ্ব সওয়ার পেয়ে ও লাগামে জোর টান পেয়ে ছুটলো উল্কার বেগে সামনের ধূসর পথ অনুসরণ করে। দূর থেকে শোনা গেল আবার ইস্রায়িলের অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ!

যেন একটি বিয়োগান্ত নাটকের শেষ অভিনয় হয়ে গেল। নায়ক তার শেষ খেলা দেখিয়ে দর্শকের হাততালি নিয়ে পর্দার আড়ালে লুকোলো। কিন্তু বর্তমানের দর্শক কেউ হাততালি দিল না। সকলেই বোবা, অর্থহীন চোখে পরস্পর

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ সকলেই অপেক্ষা করলো অশ্বারোহীর ফিরে আসার অপেক্ষায় কিন্তু সামনের পথে কোন চিহ্ন ফুটে উঠলো না।

তখন মোস্তাফা বললো,—আলিসাহেব কেমন যেন ক্ষিপ্ত হয়ে কোথায় চলে গেলেন! সঙ্গে সঙ্গে না খুঁজলে বিপদে পড়াও অসম্ভব নয়। একবার দেখে আসবো মিঞাসাহেব?

লুতুফ তখন অন্যকথা ভাবছিল। এই অযথা বিলম্বও তার সহ্য হচ্ছিল না। মোস্তাফার কথায় তাড়াতাড়ি বললো,—না না, কোন প্রয়োজন নেই। আব্বার যদি প্রাণের মায়া থাকে, তাহলে ঠিক দলে এসে ভিড়বে।

আশনাই স্বামীর শক্তি পুনরুদ্ধার হতে খুশি হয়েছিল কিন্তু স্বামী হঠাৎ অশ্বারূঢ় হয়ে চলে গেল দেখে হতবুদ্ধি হল। কিন্তু ছেলের কথায় আবার চমকে উঠে হঠাৎ চিৎকার করে বললো, লুতুফ, তুই না বেটা! আব্বার জান পয়চান হবে, তা তুই বেটা হয়ে সহ্য করবি?

এবার লুতুফ ক্ষিপ্ত হল, বললো—বেটার কর্তব্য আমিও করতাম, যদি আব্বা পাগ্‌লামি না করতো। আব্বার আচরণটা আম্মা দেখলি না!

আশনাই চুপ করে থাকলো।

লুতুফ একবার ইতস্তত করে তারপর মোস্তাফাকে বললে,—ঠিক আছে, তোমরা সকলে এগিয়ে চল। আমি আব্বাকে খুঁজে আসি। এই বলে লুতুফ এগিয়ে গিয়ে ফতুমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে আম্মার সাথে উটের পিঠে উঠিয়ে দিল। তারপর নিজে সেই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে, আবেদীনের অশ্বে মোস্তাফাকে সওয়ার হতে বলে আব্বা যে পথে গিয়েছিল সে পথে এগিয়ে গেল।

লুতুফ চলে গেলে দলটি আবার চলতে লাগলো।

একটি উটের পিঠে শাশুড়ী ও বৌ। আশনাই ও ফতুমা। ফতুমা উটের উঁচু গলার কাছে বসেছিল। সে টাল সামলাবার জন্যে গলাটা এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল। অন্যহাত ছিল বেটা হানিফের দু'বছরের শরীরটি! বৌয়ের কষ্ট হচ্ছে দেখে আশনাই হাত বাড়িয়ে নাতিকে নিজের কোলে নিল।

ফতুমা কোন প্রতিবাদ করলো না। সে বিরক্ত হয়ে নিরুত্তর হয়েছিল। শাশুড়ীর আচরণটি তাকে যারপর নাই ক্ষিপ্ত করেছিল। একটি বৃদ্ধ, পঙ্গু লোককে এক জোয়ান মরদ খুঁজতে গেল। যদি কিছু অঘটন ঘটে যায় তাহলে কি হবে? এই মরুপ্রান্তরে কত অজানা বিপদ সর্বদা ওত পেতে থাকে। বৃদ্ধ গেলে ক্ষতি নেই কিন্তু জোয়ানের মৃত্যুতে কত ক্ষতি হবে! সে কথা কি শাশুড়ীঠাকরুণ উপলব্ধি করলেন না?

নিজের না হয় নাই প্রয়োজন হল কিন্তু একটি জোয়ান আওরতের ভাগ্য তার ওপর নির্ভর। তাছাড়া আছে একটি বাচ্চা। তাকে মানুষ করার ভার রয়েছে। স্বামীর বিপদের আশংকায় ফতুমা কেমন যেন শাশুড়ীর ওপর আস্থা হারালো। হঠাৎ

বিরক্ত হয়ে ক্ষুব্ধভাব প্রকাশ করে ফেললো—খোদা জানে নসীবের কি হাল হবে!

আশনাই বুঝতে পেরেছিল কাজটা ভাল হয়নি। লুতুফের গমনে বাধা দিলেই ভাল হত। কিন্তু নিজের অন্যায়টা গোপন করবে বলেই ফতুমার কথায় কোন উত্তর দিল না। লুতুফ সেই বা কি আচরণটা ভাল করলো? ইদানীং আব্বার ওপর তার ব্যবহারটাও তো ভাল নয়। তাই আশনাই নাতিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বসে থাকলো।

উটটি তখন গাত্র দুলিয়ে দুলিয়ে বালির গর্তে পা ঢুকিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিছনে তার একটি বিরাট সংসার।

এই মুহূর্তে আর একটি অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা শোনা গেল। তারা হচ্ছে লুতুফের ভাড়া করা দুই রক্ষী আবেদীন ও মোস্তাফার আলাপ আলোচনা। তারা একটি ঘোড়ায় দুজনে পাশাপাশি সওয়ার হয়ে উটটিকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

এই সময়ে আবেদীন বললো,—দোস্ত, লুতুফ আলি যদি না ফেরে তাহলে ভাল হয়, না!

মোস্তাফা মৃদু হেসে বললো,—কী মতলব করছো সাঙাৎ?

আবেদীন হেসে বললো,—লুতুফ আলির বিবিটি একটি আসলি চিজ। আলিসাহেব না ফিরলে বেশ ভাল হয়!

মোস্তাফা আর একটু এগিয়ে বললো,—সে কৌশল তো আমরাও করতে পারি। আমরা ভিন্নপথে গেলেই উদ্দেশ্য সাধন হবে।

আবেদীন চিন্তান্বিত হয়ে বললো,—তা অবশ্য হতে পারে কিন্তু জেনানাটি একটু বেয়াড়া ধরনের। ভিন্নপথে নিয়ে গেলে নিজের জান্ খতম করে দেবে। তারপর হেসে বললো,—একটু বেশী স্বামী সোহাগিনী কিনা! স্বামীর মৃত্যু হয়েছে শুনলে যত কাজ সহজ হবে, বেইমানী করলে তত সহজ হবে না।

মোস্তাফা বললো,—এক কাজ করলে হয়? ঘোড়াটা আমাকে দাও, আমি ওদের খোজার নাম করে এগিয়ে যাই। তারপর পথে লুতুফ আলিকে দেখলে বর্শার এক ঘায়ে শেষ করে দেব।

আবেদীন বললো,—যুক্তিটা মন্দ নয়! আমি বরং কষ্ট করে পায়ে হেঁটে উটের অনুসরণ করি, তুমি ঘোড়াটা নিয়ে এগিয়ে যাও।

এই বলে আবেদীন ঘোড়া দাঁড় করিয়ে নেমে পড়লো।

মোস্তাফা আবেদীনের উৎসাহ দেখে হঠাৎ হেসে বললো,—কিন্তু সাঙাৎ ইয়াদ রেখো, আমাকে ভাগিয়ে দিয়ে যেন তুমি রসগুল্লা একা খেও না!

আবেদীনের মধ্যে সেই কৌশলটিই খেলা করছিল। হঠাৎ হাঃ হাঃ করে অট্ট-হাস্য হেসে বললো,—তুমি কি ক্ষেপেছ? দুজনেই ভাগ করে খাবো বলেই এই তোড়জোড়।

মোস্তাফা অশ্বারূঢ় হয়ে চলে যাচ্ছে দেখে আশনাই আতঙ্কে বললো,—এই

মর্দানা, কোথায় চলেছ আমাদের ফেলে ?

মোস্তাফা অশ্বে লাগাম পরিয়ে চলতে চলতে চিৎকার করে বললো,— আম্মাজী, আমি ওদের খুঁজে নিয়ে আসছি। এই এলুম বলে। আবেদীন থাকলো, ডর কর না; খোদা মেহেরবান কোন অসুবিধা হবে না

সব চলে গেল। মরদ থাকলো একটি। আওরত থাকলো দুটি। আর থাকলো একটি বাচ্চা ও একটি নীরব প্রাণী উট।

আবেদীন উটের পিছন পিছন ছুটতে লাগলো।

রাতের শেষযামিনী এগিয়ে এসেছে। চন্দ্রিকা ঢলে পড়েছে পশ্চিমাংশে। বাতাস কিছুক্ষণ আগে শক্তিহীন হয়েছিল। আবার শক্তি ধারণ করতে লাগলো। বাতাস প্রবল হয়ে উঠলো। বালুকণা মিশ্রিত হয়ে ঝড় উঠলো প্রচণ্ড।

বিপদ আসন্ন। আবেদীন অন্যকথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে বললো— আম্মাজী. শির নামিয়ে উটের পিঠে শুয়ে পড়ুন।

কথা শেষ হবার আগেই ঝড় দৈত্যের মত ছুটে এল। আবেদীন নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে বালির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো।

ঝড় চলে গেল। কি নিয়ে গেল বোঝা গেল না। কিন্তু হঠাৎ রমণীকণ্ঠের গোঙানি শোনা গেল।

আবেদীন উটের পাশে গিয়ে দেখলো—লুতুফ আলির জোরু বালির ওপর পড়ে গোঙাচ্ছে।

আশনাই বললো,—আমাকে জলদি নামিয়ে দাও আমি দেখছি।

আবেদীন মনে মনে সুযোগ সন্ধানে ছিল। সুযোগ পেতে তাই প্রতিবাদ করে বললো,—আম্মাজী, আপনি নামবেন না, আমি সুস্থ করা বিবিকে উটের পিঠে তুলে দিচ্ছি।

এই বলে আবেদীন আর অপেক্ষা না করে ছুটে গিয়ে ফতুমার কোমল দেহটি বুকের মধ্যে জাপটে তুলে নিল। মোস্তাফা থাকলে এই সুযোগ গ্রহণ করা যেত না। সে নেই ভালই হয়েছে। আবেদীন আরো একটু দুঃসাহসী হয়ে আশনাইয়ের ব্যাকুল দৃষ্টি আড়াল করে অচৈতন্য ফতুমার রক্তাভ দুই ঠোঁটে কয়েকটি চুম্বন এঁকে দিল। পরিতৃপ্তির আস্বাদন। যেন পিপাসা আরো বেড়ে যায়। আরও পান করতে ইচ্ছে হয় অমৃত।

কিন্তু ওদিক থেকে আশনাই চিৎকার করে বললো,—এই মরদ, এত দেরি কেন ? কি হচ্ছে ওখানে ?

আবেদীন চিৎকার করে উত্তর দিল,- আসছি আম্মা। জ্ঞান ফিরতে দেরী

হচ্ছে।

এই কথা বলে আবেদীন অচৈতন্য ফতুমার বক্ষের সমুন্নত যৌবনস্তম্ভের দিকে তাকালো। আরো সে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। আস্তে আস্তে তার হাতের আঙুলগুলি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে বক্ষের কামিজের ওপর দিয়ে হাত বুলোলো। কী নরম, মাখনসুন্দর, তুলোর মত অনুভূতি! আবেদীনের ইচ্ছে করলো জামার আবরণ সরিয়ে রক্তাভ দুই রমণীরত্নে হাতের স্পর্শ আঁকে কিন্তু বুড়িটা আবার চিল্লোতে লাগলো,—এই মর্দানা, হুঁশিয়ার! আওরতের ইজ্জত গেলে খোদার অভিশাপ পাবি।

আবেদীন দাঁতে দাঁত ঘষলো। বুড়িটাকে এইমুহূর্তে ছুরি মারলে ঠিক হয়!

কিন্তু ফতুমার জ্ঞান ফিরলো। জ্ঞান ফিরতে আবেদীন বাহু আলিঙ্গনে নিজেকে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো,—একি তুমি কে মরদ?

আমি আবেদীন!

তুমি আমাকে এমন করে ধরেছ কেন?

আবেদীন লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিয়ে বললো, বালুকণায় শরীর নষ্ট হবে বলে হাতে তুলে নিয়েছিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলো,—বিবিজী, এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

ফতুমা কোন উত্তর দিল না।

সে জ্ঞান হারালেও বুঝতে পেরেছিল, তার অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে এই লোকটি কি করেছে? তার তখন মনে হয়েছিল সে তার ঘরের বিছানায় শুয়ে আছে। আর সোয়ামী যেমন তাকে নিয়ে সোহাগ করে তেমনি বুঝি সোহাগ করছে। কিন্তু তা নয় দেখে সে মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে নতমস্তকে উটের কাছে এগোল।

কিন্তু এবার সাহায্য না পেলে ঐ অত উঁচুতে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে আবেদীনের দিকে তাকালো।

আবেদীন কাছে এসে তাকে কোমর ধরে ওঠাতে চাইলে ফতুমা বললো,—হাতটি ধর, আমি উঠে যাব।

আবেদীন তাই করলো।

ফতুমা উটের পিঠে উঠে পড়লো।

আর উটের পিঠে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আশনাই মুখ বিকৃত করে বললো,—লুতুফ এলে এর বিচার হবে!

ফতুমা শাশুড়ীর দিকে তাকালো। কেমন যেন সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। কি বলতে চাও তুমি?

আশনাই মাথা নেড়ে বললো,—এখন কিছুই বলতে চাই না, বেটা ফিরুক তারপর ব্যবস্থা হবে।

কি ব্যবস্থা ?

তুই ঢঙ করে উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে যে কান্ড করলি, তার আমি সবই দেখেছি।

আমি ঢঙ করে পড়ে গেলাম ?

তাই তো দেখলুম।

হঠাৎ ফতুমা ক্ষেপে গিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—তুমি আম্মা নয়, তুমি একটি রাক্ষুসী শয়তান। যে নিজের বৌয়ের বিরুদ্ধে এমনি কলঙ্ক আরোপ করে, তার দোজকে স্থান হবে।

তোর বেহেস্তে হবে তো, তাহলেই যথেষ্ট !

বেটা লুতুফ আসুক তারপর তোর মজাটা দেখাবো।

আচ্ছা, আচ্ছা সে আসুক তখন দেখা যাবে। ফতুমাও ছাড়বার পাত্রী নয়, সেও শাশুড়ীর কথার প্রতিবাদ করতে লাগলো। তার রাগ হচ্ছিল এই ভেবে যে, বৃদ্ধা আশনাই শুধু শুধু তাকে দোষ দিচ্ছে। আওরতটির মাথা খারাপ না হলে এমন কথা বলে। সে কোথায় ঝড়ের দাপটে টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। হয়তো গর্দভটার মত মরেই যেত। শুধু ভাগ্য ভাল বলে চেতনা হারানোর মধ্য দিয়ে রেহাই পেল। আর ঐ লোকটা সেই সুযোগে যা করেছে তার জন্যে দায়ী কি সে ? অভিযোগ তো তারও আছে ঐ লোকটির বিরুদ্ধে কিন্তু লুতুফ ফিরে না আসা পর্যন্ত কি করবে ? বলতে গেলে তো অন্য বিপত্তি এসে পড়তে পারে ! হয়তো তাদের দুটি অবলা স্ত্রীলোক ও একটি বাচ্চাকে এই জনমানবহীন মরুভূমিতে শেষ রাত্রিতে ফেলে দিয়ে পালাবে। আর তখন মৃত্যু ছাড়া কোন পথ থাকবে না।

সে কি ঐ বৃদ্ধ আশনাইয়ের মত অবুঝ স্ত্রীলোক ? যেমন তার মরদ ইসমায়িল, ক্ষেপা কুত্তার মত জ্বালিয়ে খায়—তেমনি তার বিবি। ফতুমা শ্বশুর শাশুড়ীর ওপর কোন শ্রদ্ধা না রেখেই মনে মনে তাদের বিরুদ্ধে গাল পাড়তে লাগলো।....অনেক সহ্য করেছি ? আর না। জীবনে কিছুই তারা দিল না, শুধু গঞ্জনা। চরিত্রহীনতার কলংক ! একবার হিন্দুস্থানে গিয়ে পেঁছোই, তারপর এই অহঙ্কার আমি ভাঙবো।

আসুক না লুতুফ আলি ফিরে ? আমি কি তাকে ডরাই ? বরং সেই আমার ওড়নার তলায় আশ্রয় পাবার জন্য বার বার ছুটে আসে। তার আম্মা হয়তো সে কথা জানে না। তার বেটার পৌরুষ যে এই ফতুমা রাক্ষসী সব তার ওড়নার গিঁটে বেঁধে নিয়েছে।

তবুও যদি লুতুফ আলি আম্মাকে খুশি করবার জন্যে তাকে কিছু বলে। তাহলে সেও দ্বিরুক্তি না করে ঐ লোকটার হাত ধরে হিন্দুস্থানে চলে যাবে। লোকটি এমনি খারাপ কিসে ? লুতুফের মতই জোয়ান মর্দ। লুতুফের মতই ভাগ্যান্বেষী। লুতুফ যেমন ভাগ্যান্বেষণের জন্যে হিন্দুস্থানে যাচ্ছে। এখন সে কর্পদকহীন। তেমনি ঐ লোকটিও এখন কর্পদহীন। সেও হিন্দুস্থানে গিয়ে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলতে পারে। এমন কি তার সাহায্য পেলে লুতুফের চেয়ে ভাগ্য আরও উন্নত হতে পারে। সুতরাং লোকটি কারুর চেয়ে কম নয় ?

আর তার এই যৌবন, এই রূপ যার বাহুবন্ধনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হবে, সেই বেহেস্তের অমৃত সুখ সঞ্চয় করবে। সুতরাং সে ঐ বৃদ্ধা আশনাইনের কটুক্তিকে ভয় করবে কেন?

আর বৃদ্ধা শাশুড়ীও কেমন যেন হঠাৎ পালটে গেল। না হলে মানুষটা খারাপ নয়। এতদিন তার শাদী হয়েছে, শাদীর আগেও সে কতদিন ঐ বাড়িতে ছিল, কখনও ভাল কথা ছাড়া মন্দ কথা বলে নি। মর্যাদা ছাড়া কখনও অমর্যাদা করে নি। স্বল্পভাষিণী ঐ ঠান্ডা মেজাজের মানুষটি হঠাৎ যেন তার স্বভাব পালটে ফেললো।

ফতুমা নিজের সহানুভূতিপূর্ণ মন নিয়ে শাশুড়ীকে বিচার করতে লাগলো। মনে হচ্ছে, শাশুড়ী শ্বশুরের হঠাৎ অন্তর্ধানে নিজের প্রকৃতি হারিয়েছে। এতকালের সংযম আজ নানা কারণে শ্লথ হয়ে গেছে। সেইজন্যে সে সমস্ত আক্রোশ ফতুমার ওপর প্রকাশ করছে। কিন্তু তাই বলে বিনা কারণে তাকে চরিত্রহীনার কলঙ্ক দেবে, আর ফতুমা সহ্য করবে? আওরত সব সহ্য করতে পারে, বিশেষ ঐ কলঙ্ক সহ্য করতে পারে না।

লোকটি তার অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়ে যা করেছে তার জন্যে দায়ী কে? যদি তস্কর এসে ঘরের মূল্যবান সামগ্রীর সাথে তার ইজ্জত নিয়ে যায়। তাহলে সকলে কি তাকে কলঙ্কিনী বলবে?

একটি উটের পিঠে স্বল্প পরিসরে দুটি রমণী দুটি বিপরীত চিন্তা নিয়ে সময় কাটাচ্ছিল। হানিফ ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল, সে বিহ্বল চোখে সম্মুখ পথের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ আশনাই হানিফকে তুলে ফতুমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,—তোর লড়কাকে নে!

ফতুমার ইচ্ছে করলো বলে আমি পারবো না। ও বোঝা তোমার বেটার—সে এলে তাকে দিও। কিন্তু কি ভেবে সে চুপ করে হানিফকে হাত বাড়িয়ে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

আসমান থেকে তখন চাঁদের আলো বিদায় নিয়েছে। পর্বতের স্বর্ণচূড়ার ওপর সূর্যের রক্তিমাভা ফুটে উঠেছিল। ওরা থামলো সামনের এক বিস্তীর্ণ পর্বতমালা দেখে। প্রস্তরের সীমাহীন বিস্তারের মাঝে রূঢ় বাস্তবের দুর্গম পথবাহার। এই পথেই বহুক্ষণ আগে ইস্রায়িল, লুতুফ ও মোস্তাফা এসেছে। এখন তারা কোথায় কে জানে? শুধু সামনে মাথা উঁচু করে দৈত্যের মত পর্বতের পর পর্বত দণ্ডায়মান রয়েছে। এই দুর্গম পথ তাদের পার হতে হবে। তারপর আবার পড়বে মরুপ্রান্তরের শেষ যেন এ জীবনে আর হবে না।

আবেদীন হাঁটা পথে আসছিল। পর্বতের সানুদেশে এসে বিশ্রামের জন্যে বসে পড়ে বললো,—আমরা এখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো। এখানেই যে কেউ ফিরবে, ফিরলে তারপর যাত্রা শুরু হবে। তাছাড়া দিন এসে গেছে। সূর্যালোক আসমান রাঙা করেছে।

আওরতদের তরফ থেকে কোন সাড়া এল না।

আবেদীন মনে মনে মোস্তাফার আগমন আশা করতে লাগলো। মোস্তাফা যদি কাজ হাসিল করে থাকে তাহলে আর এক কাজ বাড়বে, মোস্তাফাকে তার খতম করতে হবে।

এক পাশে পর্বতের প্রাচীর। প্রাচীরের ওপর আলোর ঝলমল। পর্বত পূর্বদিকেই অবস্থিত ছিল। তাই দিনের আলোর প্রথম চুম্বন পর্বতশীর্ষে সোহাগ রঞ্জন এঁকেছিল। তাই আলোটা পর্বতমালার গাত্র বেয়ে বেয়ে ঝরনা ধারার মত নেমে এসেছিল।

ফতুমা তাকিয়েছিল সেই প্রস্তর মেলার দিকে। তৃণদলের কোন চিহ্ন নেই। শুধু পাথরের স্তূপ। পাথরের পর পাথর। পর্বতের পর পর্বত। সামনের দৃষ্টিতে শুধু এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে পিছনে তাকালে বালুকাময় মরুপ্রান্তরের ধূসরতা চোখে পড়ে। এই পথ তারা পার হয়ে এসেছে মনে এলেই বুক শুকিয়ে যায়। এমনি মরুভূমি পর্বতের পিছন দিকেও। তাও তাদের পার হতে হবে। পার হতে পারবে তো! সন্দেহ জাগে, কিন্তু উপায় কি? এই পথ পার হবে বলেই তো তারা পথে নেমেছে। জেনে শুনেই তো বিপদকে বরণ!

আবেদীন কাছে এসে বললো,—আপনাদের যদি খানাপিনার কিছু থাকে, করে নিন। এর পর সময় পাবেন না।

আশনাই কথার উত্তর দিল না। শুধু বললো,—আমাদের উটের পিঠ থেকে নামিয়ে দিতে সাহায্য কর।

আবেদীন এগিয়ে এল।

ওরা ভূমিতে নামলো।

আশনাই উটের পিঠে থেকে কয়েক টুকরো খেজুর নিয়ে এসে হানিফকে দিল। হানিফ তখন ফতুমার কোল থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়িয়েছে।

আশনাই হানিফকে খেজুর দিয়ে শূন্যে উদ্দেশ্য করে বললো,—ওরা ফিরুক, তারপর যা হয় খানাপিনা করা যাবে।

আর ফতুমা সেই কথায় মনে মনে শাশুড়ীকে ভেংচি কেটে বললো,—খানাপিনা করার জন্যে আমার যেন উদর উথলে উঠছে! সে তখনও শাশুড়ীর ওপর অপ্রসন্ন।

আরও কিছু সময় অতিবাহিত হল।

এদিকে মরুভূমির আলো স্নিগ্ধবিহীন তাপ নিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। এবার সূর্যকে পর্বতের আড়াল থেকে বাইরে বেরোতে দেখা গেল কিন্তু তার দিকে

আঁকিয়ে তার রূপ বর্ণনা করা গেল না! অন্তত মানুষের অসাধ্য এই সৌন্দর্য বর্ণনা করা। কারণ সূর্যের এই ভীষণাকৃতি এই দিগন্তবিস্তারিত মরু অঞ্চলে না এলে উপলব্ধি করা যায় না।

আবেদীন একটু তফাতে থেকে এদের দেখাশুনা করছিল। আশনাই তাকে বলে দিয়েছে, তুমি বাপু জেনানার কাছে থেকো না। স্পষ্ট কথা। কোন গোলমাল নেই।

আবেদীন অবশ্য তাতে কোন প্রতিবাদ করেনি। সে সরে গিয়েই ভাবছিল মোস্তাফার কথা। সাঙাৎটা যে কোথায় গেল? অবশ্য ভয়ও তার করছিল, লুতুফ আলি বলশালী লোক, তার কাছে আছে একটি বৃহৎ ছোরা। যদি কোন সন্দেহ তার মনে আসে তাহলে আর মোস্তাফার পরিত্রাণ নেই।

কিন্তু সে না হয় মোস্তাফার প্রসঙ্গ! এদিকে যে তার অবস্থা সঙ্গীন। সামনে লোভাতুরা খাদ্যসামগ্রী। একটু আস্বাদন করেই যেন আরও পিপাসা বেড়েছে। অথচ নিবারণের উপায় নেই। প্রহরা দিচ্ছে বুড়ি আশনাই। জেনানাটি যেন আস্ত শয়তান। বৌকে কড়া চোখে শকুনের মত পাহারা দিচ্ছে। তারই মাঝে সুযোগ আহরণ করা এ যেন মরুভূমি পার হওয়ার চেয়েও দুর্গম। আর ফতুমার কথা স্বতন্ত্র। রাত্রিজাগরণের মালিন্য তার সারামুখের ওপর ছড়িয়ে আরো তাকে সুন্দর করেছে। ডাগর সুন্দর চোখ দুটি ঢুলু ঢুলু। যেন সুরমার প্রলেপে আরো ঘন কালো ও আকর্ষণীয়। মাঝে মাঝে চোরা চাহনি দিয়ে তার দিকে তাকাচ্ছে।

মনে হয় ও বুঝতে পেরেছে গতরাত্রির অনুভূতি। ভালই হয়েছে, অন্তত নিষ্প্রাণ জিনিসের বুকে সে সোহাগ আঁকেনি তাতেই সান্ত্বনা। রমণীর বুঝতে পারার মধ্যে যে আনন্দ- সেই আনন্দ আবেদীনের মধ্যে খেলা করলো। আবেদীনও মাঝে মাঝে আড়চোখে তাকাতে লাগলো ফতুমার দিকে।

এমনিভাবে যখন সময় কাটাতে লাগলো, হঠাৎ পর্বতের অতি কাছে অশ্বক্ষুর-ধ্বনি শোনা গেল। অনতিবিলম্বে লুতুফ আলি নেমে এল পর্বত সানুদেশে; কিন্তু একি? লুতুফ আলির সমস্ত কামিজ রক্তে লাল, হাতে উন্মুক্ত সেই দীর্ঘ ছুরিকা। ছুরিকা দিয়ে তখনও রক্ত ঝঁঝিয়ে পড়ছে।

একবারে কাছে এলে আশনাই বেটাকে দেখে মায়াকান্না জুড়ে দিল। তুই তোর আব্বাকে শেষ পর্যন্ত খুন করলি লুতুফ? শেষপর্যন্ত তোর আব্বার নসীবে এই লেখা ছিল? আমি জানতুম এমনটি হবে! আমি জানতুম তোর আব্বা তোর হাতেই প্রাণ দেবে! প্রান্তর মুখরিত করে আশনাইয়ের কান্না প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

লুতুফ আলি পথকণ্টে পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে এসেছিল। সে আর কথা না বলতে তার রক্তমাখা বসনেই বালির ওপর থপ্ করে বসে পড়লো। তারপর কিছুক্ষণ ধরে নিজেকে শান্ত করে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে চিৎকার করে বললো,—তুই কি এমনি চিল্লোবি আম্মা?

আশনাই কাঁদতে কাঁদতে বললো,—আমাকেও না হয় খুন কর। তুই কি বলতে চাস্ আমি পাষাণী! এতকাল ধরে যার সঙ্গে সুখে, দুঃখে জীবন কাটলো,

তার জন্যে একটু কাঁদতে পারবো না !

লুতুফ আর কোন কথা বললো না। সে একবার শুধু আড়চোখে আবেদীনের দিকে তাকালো।

আর আবেদীন তখন ভাবছিল—কে খুন হল ? বুড়ো ইস্রায়িল না মোস্তাফা। না, পর্বতের গুহান্তরে লুক্কায়িত কোন বেদুইন দস্যু !

কিন্তু এদিকে লুতুফ ভাবছিল রহস্যটা প্রকাশ করবে কিনা ! প্রকাশ করলে আবেদীন সাবধান হয়ে যাবে। অথচ আম্মা যেমন মরা কান্না জুড়ে দিয়েছে, তাতে আব্বার কথা না বললে তার মরা কান্না থামবে না। কিন্তু আব্বা জীবিত আছে, সে তাকে হত্যা করেনি, একথা বললে মোস্তাফা খুন হয়েছে প্রমাণ হয়ে যাবে।

অথচ মোস্তাফাই যে খুন হয়েছে এ কথা তো সত্যি !

আব্বাকে তার খুঁজতে অনেকদূর যেতে হয়েছিল। অনেক দুর্গমপথ, গুহা থেকে গুহান্তর তাকে অন্বেষণে ব্যয়িত করতে হয়েছিল। তার জন্য তার সারারাত্রি চলে গেছে। কিন্তু কোথায় আব্বা ? কোথায় সেই রুগ্ন বৃদ্ধ ? ক্ষমতাহীনের অভিমানে শক্তিজয়ের জন্যে অন্তরালে লুকোলো ?

যখন পর্বতের পর পর্বত—প্রস্তরের অসংখ্য বাধাকে অতিক্রম করে লুতুফ আলি অকৃতকার্য হ'ল, সে যখন ফিরবে বলে মনস্থ করছে, এই সময় হঠাৎ অশ্ব-ক্ষুরের ধ্বনি তার কানে এল। মুহূর্তে তার অবসন্ন ভাব বিদূরিত হ'ল, পরিবর্তে মুখে জেগে উঠলো আনন্দ। তাহলে আব্বার দেখা সে পেল ? তার পরিশ্রম বৃথা গেল না !

কিন্তু অশ্ব পদধ্বনি কাছে আসতে, ও একটি টিলার অন্তরাল থেকে মানুষটিকে দৃষ্টি পথে পড়তে লতুফের সমস্ত আনন্দ বেলুনের মত চুপসে গেল। সে জায়গায় তার মুখে জেগে উঠলো বিস্ময়।

অশ্বারোহী সামনে এলে লুতুফ আলি জিজ্ঞেস করলো,—একি মোস্তাফা ?

মোস্তাফা মনে মনে ভেবেছিল, লুতুফ আলির সঙ্গে বেশী কথা বলবে না। অতর্কিত আক্রমণ করবে ও হত্যা করবে। তাই একটু গম্ভীর হয়ে বললো,—হ্যাঁ, আমি !

কিন্তু তুমি ওদের ছেড়ে এলে কেন ?

এলাম ! এই বলে হঠাৎ মোস্তাফা লুতুফ আলিকে বর্শাযোগে আক্রমণ করলো।

লুতুফ আলি অপ্রস্তুত ছিল, তাই বর্শার আক্রমণটা প্রতিহত করতে পারলো না। কিন্তু ভাগ্যগুণে তার আঘাতটাও বেশী লাগলো না।

মোস্তাফা ভীষণ বিক্রমে লুতুফ আলির বক্ষ লক্ষ্য করে বর্শা ত্যাগ করেছিল কিন্তু বর্শা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে লুতুফ আলির বাম কাঁধের উপরভাগের সামান্য অংশের মাংস ছিন্ন করলো।

এবার আর পরিত্রাণ নেই ! লুতুফআলি মুহূর্তে বুঝতে পারলো, কোন কারণবশত মোস্তাফা তার প্রাণ সংহার করতে চায়। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তার

কোমরের বন্ধনী থেকে বৃহৎ ছোরাখানা উঠে এল।

তারপর আর কি? মোস্তাফা আবার ছুরি নিয়ে আক্রমণ করবার আগেই লুতুফের ছুরি গিয়ে তার বক্ষ বিদীর্ণ করলো। রক্ত ছুটলো বক্ষ প্লাবিত করে।

মোস্তাফা পড়ে গেল প্রস্তরের কঠিন মেঝের ওপর। তখন দিনের আলো পর্বতের ওপর ফুটে উঠেছে।

লুতুফ আলি অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হচ্ছিল কিন্তু কি ভেবে মোস্তাফার মৃত্যু যন্ত্রণা কাতর দেহের দিকে এগিয়ে গেল। লুতুফের বৃহৎ ছুরিকার এক আক্রমনেই মোস্তাফার শেষনিশ্বাস এগিয়ে এসেছিল। প্রাণটি যা বের হতে দেরী। সমস্ত বক্ষ প্লাবিত করে রক্তের স্রোত মোস্তাফার কামিজ লাল করে তুলছিল।

লুতুফ আলি সেই মুমূর্ষের পাশে বসে পড়ে জিজ্ঞেস করলো,—তুমি হঠাৎ এ কাজ করলে কেন?

লুতুফ আলি কিছুতে বুঝতে পারছিল না, তাকে হত্যা করার আসল উদ্দেশ্য কি?

কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী মরবার সময়ও নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করলো না। যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে টেনে টেনে বললো,—আলিসাহেব, আবেদীনকে সাবধান। সে তোমার জোরুর প্রতি লুব্ধ।

তুমি কি জন্যে আমাকে হত্যা করতে এসেছিলে?

তোমাকে হত্যা করলে তোমার জোরুকে দুজনে উপভোগ করতে পারবো এই অনুমানে।

তারপর মোস্তাফা মারা গেল।

লুতুফ আলি আর বিলম্ব না করে ত্বরিৎপদে অশ্বারূঢ় হয়ে এগিয়ে চললো! অবিলম্বে তার স্ত্রীর কাছে পেঁছতে হবে! না জানি তাদের আঁরো কত বিপদ হ'ল। আবেদীন সঙ্গে আছে। আবেদীন আর কোন শয়তানের আশ্রয় নিয়েছে কিনা কে জানে! আবার ভাবলো, মোস্তাফা মরবার সময় কৌশল করে গেল না তো! আবেদীন হয়তো তাকে কৌশল করে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছিল বলে সে আবেদীনের ওপর প্রতিশোধ নিল।

লুতুফ আলি দ্রুত চলতে চলতে হঠাৎ মোস্তাফার ঘোড়াটা দেখে তাকে ধরবার জন্যে তাড়া করলো কিন্তু ঘোড়াটা লাগাম ছাড়া পেয়ে দ্রুত পাহাড়ের কোথায় যে লুকিয়ে গেল, লুতুফ আলি তার সন্ধান পেল না। তাছাড়া আর তার কিছু ইচ্ছেও করছিল, অযথা বিলম্ব করে দল ছাড়া হয়ে থাকে। শয়তান আবেদীন যদি এখনও কিছু না করে থাকে, তাহলে অবিলম্বে তার সেখানে পেঁছানো দরকার।

সেইজন্যে সে দলের কাছে এসে ঐরকম ভূমিকা নিল ও সন্দেহের চোখে আবেদীনকে দেখতে লাগলো। সে বললো না, সে মোস্তাফাকে খুন করে এসেছে এইজন্যে যে, আবেদীনের মতলব না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

তারপর সে তাকালো ফতুমার দিকে। ফতুমা কাছে এল না, সে তাকে কাছে ডাকলো।

ফতুমা কাছে এলে সে চাপাস্বরে বললো,—বিবি, গোসা করবি না, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

মনে মনে ফতুমা ভীষণ ভীত হয়ে উঠলো।

ঐ আবেদীন তোর কোন অনিষ্ট করেছে?

ফতুমা ভয়ে ভয়ে তাকালো শাশুড়ীর দিকে। তিনি তখন স্বামীর জন্যে কান্নায় ব্যস্ত। এসব দিকে তার মন নেই। তবে কে বললো? স্বামী জানলো কেমন করে?

তাই সহজ হবার অভিনয় করে হেসে বললো,—ধেৎ তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

তখন লুতুফ আরো চাপাস্বরে বললো,—আমি মোস্তাফাকে খুন করেছি। সে মরবার সময় আমার মনে এক সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে।

হঠাৎ ফতুমা দক্ষ অভিনেত্রীর মত বললো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ লোকটিই একটু শয়তান ধরণের ছিল। সে মরেছে, ভালই হয়েছে। আবেদীন ভাল। সে জেনানাকে বড় শ্রদ্ধা করে। এই তো এত পথ সে অশ্বাভাবে হেঁটে এল। কেন তুমি তার সম্বন্ধে আম্মাকে জিজ্ঞেস কর না?

ফতুমা জানতো, আম্মা এখন কোন কথার উত্তর দেবে না।

লুতুফ নিশ্চিন্ত হ'ল।

ফতুমার কথায় সে মুহূর্তে নিশ্চিন্ত হ'ল বটে কিন্তু আবার পরক্ষণে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলো! তার মনে হ'ল, ফতুমা যেন মিথ্যে কথা বলছে? কিন্তু ফতুমা যদি মিথ্যেকথা বলে থাকে, আর আবেদীন যদি কিছু করেই থাকে, তবু সে কিছুই করতে পারবে না। কারণ ফতুমার ওপর দুর্বলতা তার চিরন্তন। ফতুমার রূপ তাকে প্রলোভিত করেছে, যৌবন তার জোয়ান শক্তিকে দুর্বল করেছে। আর ফতুমার অন্যায় তার জীবনে আশীর্বাদস্বরূপ বর্ষিত হয়েছে। সে কথা জানে বলেই ফতুমা মাঝে মাঝে তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। সেইজন্যে তার মনে হ'ল ফতুমা সত্য কথা বলছে না। কোথায় যেন জট্ পাকিয়েছে।

আর আবেদীনকে সে এখুনি কিছু বলতে পারে না এইজন্যে যে, লোকের তার অভাব। পুরুষ বলতে মাত্র সে ছাড়া আর কেউ নেই। অথচ এই বীভৎস মরু-প্রান্তরে পুরুষের শক্তিই একান্ত দরকার। আব্বাজান ইস্রায়িল ছিল, সে অক্ষম হলেও পুরুষ বলে ভরসা ছিল। তারপর মোস্তাফা অন্যায়ের শাস্তি পেয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন বর্তমানে অবশিষ্ট আছে সে নিজে ও আবেদীন। আবেদীনের অপরাধের শাস্তি এখুনি দেওয়া যায় কিন্তু তাহলে সে সহায়হীন হয়ে যাবে। অথচ শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে পিছন পিছন নিয়ে যাওয়াও যুক্তিযুক্ত নয়।

লুতুফ আলি কি করবে ভেবে ঠিক করতে পারলো না। বড় মুশকিলে পড়ে

গেল সে।

এদিকে তাপ চড়চড় করে ওপরে উঠছে। সূর্যের তীক্ষ্ম রশ্মিমালা বালির সমুদ্রে গা ডুবিয়ে বালুকারাশি উত্তপ্ত করে চলেছে। আস্তে আস্তে দেহের ওপর উষ্ণতাপ শুষ্ক করতে শুরু করেছে গাত্রচর্ম।

আর তো অপেক্ষা করা সমীচীন নয়!

হঠাৎ লুতুফ আলির স্মরণ পড়লো, আম্মা তার অনুপস্থিতিতে এখানে ছিল, তাকে জিজ্ঞেস করলে সব জানা যায়। কিন্তু আম্মার দিকে তাকিয়ে সে উৎসাহ তার নিভে গেল। সে যেরকম ধারায় রোদন করে চলেছে, অন্তত কিছুক্ষণের মধ্যে উপশম হবে মনে হয় না।

তবু লুতুফ আলি একটু দূরে বালির ওপর বসে পড়া আশনাইয়ের কাছে গিয়ে হাজির হ'ল।

লুতুফ কোন ভণিতা না করেই বললো,—আম্মা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

আশনাই লুতুফের ওপর প্রসন্ন ছিল না। চোখের জল সামলাতে মুখখানা ঘুরিয়ে নিয়ে বললো—আর জিজ্ঞেস করার কি আছে? যা করবার সে তো না জিজ্ঞেস করেই করেছিস্।

লুতুফ কি ভেবে তাড়াতাড়ি আশনাইয়ের আরও কাছে সরে গেল। সরে গিয়ে চাপাস্বরে বললো,—আব্বাকে আমি খুন করি নি। বিশ্বাস কর, তার দেখা আমি পাইনি।

তবে কাকে তুই খুন করে এলি?

মোস্তাফা, আমার যে ভাড়া করা রক্ষী ছিল, তাকে।

তার অপরাধ!

সে অনেক কথা। তোকে আমি সে কথা পরে বলবো।

তারপর লুতুফ থেমে বললো,—তোকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি, তার জবাব দিবি?

এইসময় হঠাৎ ফতুমা সেখানে এসে হাজির হল। স্বামীকে বললো—তোমার বেটা আমাকে কি রকম জ্বালাতন করছে দেখ?

কেন কি করছে?

তার পিপাসা পেয়েছে, সে পানি খেতে চায়!

বেশতো, পানি তাকে দাও। তবে অল্প দেবে, বেশী না। এখন বেশী পান করলে পরে আরো পানির দরকার পড়বে।

তখন ফতুমা বললো,—তোমার লোকটাকে হুকুম কর না, হানুকে একটু পানি দেবে।

লুতুফ সেখান থেকে চিৎকার করে ডাকলো,—আবেদীনভাই, বাচ্চাকে একটু পানি পিলাও না।

কিন্তু ফতুমা সেখান থেকে গেল না।

তাই দেখে লুতুফ একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বললো,—আম্মার সঙ্গে আমার একটু বার্তাচিত আছে, তুই এখানে থেকে এখন যা।

ফতুমা ঠোঁট উলটে বললো,—বার্তাচিত কর না তোমার আম্মার সঙ্গে। আমি কি শুনতে চাইছি কিছু!

না, তুই এখান থেকে সরে যা।

ফতুমা তবু কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

কি সরবি না?

না! হঠাৎ ফতুমা ক্রুদ্ধ হ'ল। বললো,—অত গরম গরম বাত বলছো কেন? আমি কি করেছি?

এবার আশনাই ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিল, তুই কি করেছিস্, তুই নিজে জানিস্ না?

তখন ফতুমা কোমরে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। বললো,—বেশ, যা হয়েছে তা আমি নিজেই বলছি। এই বলে সে সমস্ত ঘটনাটি বলে গেল। শেষে বললো,—এইটুকু অচেতন অবস্থায় বুঝতে পেরেছি। এর জন্যে কি আমি দায়ী? আম্মা আমাকে বললো, আমি ইচ্ছে করে অজ্ঞান হয়ে উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম।

আশনাই সবটুকু জানতো না। কিন্তু জানবার পরও বিশ্বাস করলো না। হঠাৎ বউয়ের কথার প্রতিবাদে চিৎকার করে বললো,—তুই মিথ্যুক, তুই বদমাইস, তুই বেসরম, তুই স্বৈরিণী। বেটা যদি তোর সুরতের পায়ে মাথা ঠোকে ঠুকুক; আমি তোকে ক্ষমা করবো না।

আম্মাকে দারুণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে দেখে লুতুফ বাধা দিয়ে বললো,—আঃ আম্মা তুই কি ভুলে গেলি, এটা পথ! আমরা চলেছি অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে হিন্দুস্তানের পথে!

ফতুমা ক্ষিপ্ত হয়ে বললো,—আসলে তোমার আম্মা, তার স্বামীর প্রতিশোধ আমার ওপর দিয়েই নিতে চায়। দেখছো না, কি রকম পাগলের মত ব্যবহার করছে!

এই সময়ে আকস্মিক উত্থিত হল অশ্বখুরের ধ্বনি।

সকলে বিস্ময়ে সেইদিকে তাকালো।

অশ্বপিঠে সওয়ার হয়ে আবেদীন ছুটে চলেছে।

লুতুফ ত্বরিতপদে উঠে তার পিছন পিছন ছুটলো। চিৎকার করে বললো,—আবেদীন যেও না শোনো। আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করেছি। এই দুর্গম মরুভূমিতে দুটি জেনানাকে আমার ওপর ফেলে দিয়ে যেও না। খোদা তোমার এই অপরাধ ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু কে শুনবে লুতুফের আর্তস্বর। অশ্ব আরো দ্রুত এগিয়ে গেল, তারপর পর্বতের ওপর উঠে তা সীমানার বাইরে চলে গেল।

লুতুফ বালির ওপর একান্ত অসহায়ের মত থপ্ করে বসে পড়লো। এই নির্জন প্রান্তরে সে সম্পূর্ণ একা। আর দুটি অবলা আওরত ও একটি বাচ্চা। তিনটি ঘোড়া ছিল, তার একটিও নেই। শুধুমাত্র উটটি সম্বল। এই উটের ওপর চড়ে তাদের সকলকে এই দুর্গম মরুভূমি পার হতে হবে।

লুতুফ শক্তিশালী, সাহস তার অদম্য। যখন বাড়ি থেকে যাত্রা করেছিল, তার উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু একদিনের পর সব লোকগুলি হারাতে সে দিশেহারা হয়ে পড়লো। আবার একটি সমস্যা উদয় হয়েছে, ফতুমাকে নিয়ে। ফতুমা হঠাৎ যে কেন বিগড়ে গেল বোঝা মুশকিল। তিনবছরের শাদীর জীবন। কখনও ফতুমার স্বভাবের মধ্যে এমন উপসর্গ দেখা যায়নি। বরং তার মহব্বত লুতুফকে অনেক বেশী শক্তিশালী করেছিল।

আর আজ এই মরুপ্রান্তরে সে যেন হঠাৎ পালটে গেল। তবে কি আব্বাজান ইস্রায়িলের কথাই ঠিক? খোদার আশীর্বাদ তাদের ওপর নেই। তারা ধ্বংস হয়ে যাবার জন্যেই এই যাত্রা করেছে। এবং তারা ধ্বংস হয়ে যাবে।

হঠাৎ লুতুফ যেন শক্তি সঞ্চয় করে নিজেই 'না' বলে উঠলো। না, সে খোদার বিরুদ্ধে লড়বে। যদি খোদার ধ্বংসই অভিপ্রেত হয়, তাহলে সে ক্ষুদ্র হয়েও লড়বে।

লুতুফ দাঁড়িয়ে উঠলো বলশালীর মত। আর ফতুমার মধ্যে যেটুকু বিদ্বেষ জমেছে, এখন আর কোন অঘটন ঘটাবার সম্ভাবনা নেই, কারণ আর কোন মর্দানা নেই তার দলে যে, তার সর্বনাশ করতে পারে।

তাপ বাড়ছিল দ্রুত। জলীয় তাপ বাতাসের সঙ্গে ছোটাছুটি করে চোখমুখে ঝাপ্টা দিচ্ছিল।

লুতুফ, আশনাই, ফতুমা ও বাচ্চা হানিফকে চামড়ার মোটা জামা পরিয়ে উটের পিঠে তুললো, তারপর নিজে একটি মোটা আলখাল্লা গায়ে চাপিয়ে সেই একই সঙ্গে উটের পিঠে উঠলো।

উটের পিঠে মালপত্তর ছিল অনেক। তারপর জায়গা সঙ্কুলান হওয়া বড়ই কষ্টকর। তবু উপায়ন্তর না দেখে সকলকেই সেই একটি পশুর ওপর সওয়ার হতে হল।

আশনাই বললো,—বেটা, তোর আব্বা জিন্দা আছে তো!

লুতুফ বললো জানি না জিন্দা আছে কিনা। তবে তাকে আমি অনেক খুঁজেছি। লুতুফ তারপর বললো,—আম্মা, তাপ বাড়ছে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, এই পর্বতমালা পার হতে হবে। খানাপিনা পর্বত পার হয়ে করলেই হবে, কি বলো?

আশনাই বললো,—যেটা ভাল হয় সেটাই কর। আমি আর কি বলবো?

তারপর আর কোন কথা নয়। উটটি বিরাট বোঝা নিয়ে পর্বতের উঁচুনিচু পথ অতিক্রম করতে লাগলো। উটের পিঠে আগে বসেছে আশনাই নাতিকে কোলে

নিয়ে, তার পিছনে ফতুমা, সর্বশেষে লুতুফ। আর লুতুফের পিছনে সাংসারিক জিনিষপত্তর। একটি উটের পিঠে চারটি মানুষ, আবার অপর্যাপ্ত জিনিসপত্তর।

তবু উষ্ট্রজাতি কষ্টসহিষ্ণু ও বোঝা বওয়া তার সাধ্যের মধ্যে বলে তার এই ভারে কোন কষ্ট হচ্ছিল না। সে বেশ অবলীলাক্রমে পর্বতের কঠিন বাঁধা অতিক্রম করছিল।

এদিকে তাপ বাড়ছে। বাড়ছে কি এত বেড়েছিল যে, হানিফ সহ্য করতে না পেরে চিৎকার জুড়ে দিল। ফতুমারও কোমল চর্মের ওপর জ্বালা ধরালো।

লুতুফ চিৎকার করে বললো,—সামালকে!

আশনাই হানিফকে জড়িয়ে ধরে উটের ওপর শুয়ে পড়লো।

লুতুফের সামনে বসে ফতুমা। এসময় আম্মার কথা ভুলে গিয়ে লুতুফ প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ফতুমার কোমল শরীরটি বক্ষের মাঝে চেপে ধরে দুই বাহু দিয়ে তাকে ঘন করে জড়িয়ে ধরলো। এমন করে জড়িয়ে ধরলো যা স্বামী তার স্ত্রীকেই জড়িয়ে ধরতে পারে। জড়িয়ে ধরার পর পুরুষের শিরায় শিরায় জেগে ওঠে যে রোমাঞ্চ কিন্তু ঐ মুহূর্তে ঐসব অনুভূতি লুতুফের জাগলো না। সে তার নিজের প্রাণের চেয়ে জোরুর প্রাণই রক্ষা করার চেষ্টা করলো। এমন কি ভুলে গেল, কিছুক্ষণ আগে ফতুমার মনে বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল। স্বামীর ওপর তার অশ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল।

আবার লুতুফ চিৎকার করে বললো,—সামালকে।

জিভের তালুটা কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন বুকের ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, প্রচুর পরিমানে পান করলে সব কষ্টের অবসান। সব কষ্টের শেষ।

লুতুফের নিজেরই কেমন যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছিল। সমস্ত শরীরটা যেন কেমন হঠাৎ শক্তিহীন হয়ে গেল। কেমন যেন অসোয়াস্তি। মাথাটা চাপা দিয়ে মুখখানা ঢাকা দিয়ে, শুধু চোখ দুটি বের করে চলেছিল কিন্তু সেই চোখদুটি আর সহজ দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে পারছিল না। জ্বালা, জ্বালা, অসম্ভব জ্বালা। মনে হয় যেন চোখদুটি উপড়ে ফেললে সব জ্বালা চলে যায়।

আশনাই, হানিফ, ফতুমা উটের পিঠের ওপর শুয়েছিল, তাই তাদের চোখের জ্বালা অনুভব করতে হল না। লুতুফকে শুধু করতে হল এইজন্যে যে, তাকে উটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে হচ্ছিল।

হঠাৎ লুতুফের কথা কেমন যেন বন্ধ হয়ে গেল। সে চিৎকার করে বলতে যাচ্ছিল, 'অল্লাটদেবী আমাদের যাত্রাপথ সুগম কর' কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। কেমন যেন মনের মধ্যে কথা গুমরে উঠে বুকের মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

অল্লাটদেবীর সেই প্রাচীন মাহাত্ম্য মাঝে মাঝে আরববাসীকে প্রলোভিত করতো বলে সেইজন্যে লুতুফ তাঁকেই ডেকে আরো অনুগ্রহ চাইলো। কিন্তু কষ্ট আরো

প্রচণ্ড হতে সে ইসলামের সর্বকালের খোদাবানকেই ডাকলো, যেন এ যাত্রায় তাদের আর কোন বিপদ না হয়।

কিন্তু বিপদ না হলেও শারীরিক কষ্ট যাত্রীদলের মধ্যে উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। লুতুফ নিজে যত শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করে, আম্মা, জোরু, লড়কার প্রতি তার তত যত্ন বেড়ে যায়।

শেষকালে এমন হল, চারটি প্রাণীর আর কোন চেতনা থাকলো না। লুতুফ নিজেকে বার বার সচেতন করে রাখবার চেষ্টা করলো, কারণ সচেতন করে না রাখলে উটের গতিবিধি কে নিয়ন্ত্রিত করবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাও সম্ভব হ'ল না। ফতুমাকে জড়িয়ে ধরে সে কেমন যেন জীবন্মৃতের মত উটের পিঠে থাকলো।

তারপর অনেক অনেক পরে তার জ্ঞান ফিরে এল। জ্ঞান ফিরে আসতে সে দেখলো, সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে, আঁধার নেমে আসছে আবার এবং উটটি থেমে পড়েছে এক জায়গায়। কিন্তু উটের সামনের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে শান্তি বোধ করলো। পর্বতমালা তারা পার হয়ে এসেছে। পুনরায় মরুভূমির আরও কিছু পথ তারা অতিক্রম করেছে। এবং বুদ্ধিমান উটটি যেখানে এসে থেমেছে, সে একটি মরূদ্যান। বোধ হয় উটের তৃষ্ণা পেয়েছিল, সেইজন্যে এই থেমে পড়া। কিংবা হয়তো আরোহীদের কষ্ট দেখেই পশুর এই অনুগ্রহ।

সে যাহোক লুতুফ আলি মরূদ্যান থেকে ভেসে আসা জলীয় বাষ্প প্রাণে ধারণ করে একটু সুস্থ হ'ল। কিন্তু হঠাৎ সে চমকে উঠলো তার সামনের দিকে চেয়ে। একি ফতুমা কোথায়?

উটের অগ্রভাগে আম্মা আশনাই তখনও নাতিকে জড়িয়ে ধরে পড়ে আছে নিষ্প্রাণের মত। তাদের কোন নড়াচড়া নেই। শুধু লুতুফ আলির সামনের জায়গাটুকু ফাঁকা। মনে হয়, কে যেন ঐটুকু জায়গা থেকে ফতুমাকে আলগোছে তুলে নিয়ে গেছে! কিম্বা ফতুমা চলন্ত উটের পিঠ থেকে সবার অচেতনতার মাঝে সুযোগ গ্রহণ করেছে। পলায়ন করেছে চিরতরে লুতুফ আলির নাগপাশ থেকে।

না, না আর কিছু লুতুফ আলি ভাবতে পারলো না। দুদিন ধরে সে সবকিছু সহ্য করছে, সমস্ত বিপদ সে দক্ষ পরিচালকের মত সুচিন্তিতভাবে সমাধা করেছে। কিন্তু এই বিপদে সে হঠাৎ সমস্ত সংযম হারিয়ে ফেললো।

অকস্মাৎ সে সেই নির্জন মরূদ্যানের সামনে একটি নির্বোধ শিশুর মত ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললো।

ফতুমা নেই। তার কলিজা সে ভেঙে দিয়ে নিজের বাসনাটাই চরিতার্থ করতে চলে গেছে। একবার ভাবলো না। একবার থমকে তলিয়ে দেখলো না, সে চলে গেলে তার স্বামীর কি হবে? আওরত কি এতই স্বার্থপর? এতই তার স্বার্থের জন্যে সে অন্ধ? কিন্তু লুতুফ আলি তার সবকিছু দিয়ে তো জোরুর মহব্বত চেয়েছিল!

সেই মুহূর্তে ফতুমার অনেক কথাই লুতুফ আলির মনে পড়লো।

ফতুমা বলতো—দেখো মিঞাসাহেব, আমাকে কখনও অবহেলা করো না। আমার এই অসামান্য রূপ, এই আল্লার দেওয়া নিটোল যৌবন তোমার ইচ্ছার ছুরিকা-তলে বলি দিচ্ছি, আমার কোন আক্ষেপ নেই তুমি আমাকে ভোগ করছো বলে। দুনিয়াতে ভোগ করবার জন্যেই আমাদের জন্ম। তোমার কাছে নিবেদন, সেই ভোগ যেন অপাত্রে না হয়।

তবে কি সে নিজের অজ্ঞাতে ফতুমাকে অবহেলা করেছে? লুতুফ আলি অশ্রু-ভেজা চোখে ভাবতে লাগলো। মোস্তাফার মৃত্যুর সময়ের উক্তি, আবেদীনের পরবর্তী আচরণ। তারপর ফতুমার হঠাৎ বিক্ষোভ প্রদর্শন। সব লক্ষ্য করবার পরও তো সে সংযমের বলয় পরিয়ে নিজেকে রোধ করেছে! খুব ভালভাবে স্মরণ করবার চেষ্টা করলো। আম্মা ফতুমার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিল কিন্তু সে একটি কথাও ফতুমাকে জিজ্ঞেস করেনি, বরং ফতুমার উক্তি সে বিশ্বাস করেছিল। তবে বিশ্বাস করলেও অন্যায়টি আর চাপা থাকেনি। প্রকটতর হয়ে উঠেছিল বলেই ফতুমা পলায়ন করেছে। তারপর আবেদীন নিজের দোষ কবুল করে হঠাৎ পালিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ফতুমার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেল।

কিন্তু লুতুফ আলির কেমন যেন সন্দেহ হল, ফতুমা পালায় নি। তাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে। এই মৃত্যুর মত দুর্গম পর্বতসংকুল মরুদেশে ফতুমা কখনও নিজের অন্য বাসনা চরিতার্থের জন্যে পালায় নি। কারণ পালালে সে জানে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর কাছে বাসনা নিশ্চয় এক নয়। তাই লুতুফ নিশ্চিন্ত হল, ফতুমা স্বেচ্ছায় তার সঙ্গত্যাগ করেনি। তাকে কেউ অচৈতন্য অবস্থায় উষ্ট্রপৃষ্ঠ থেকে তুলে নিয়ে গেছে।

আরব দস্যুরা সুন্দরী আওরতদের দেখলে চুরি করে বগদাদের খোলা বাজারে অনেক স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে নিলামে তুলে দেয়। কোন কোন সওদাগর অথবা আমীর গোছের লোক। ফতুমা সুন্দরী, শুধু সুন্দরী নয় খুবসুরত। নিলামে তুললে অল্পদামে বিক্রি হবে না। বরং বেশী মুনাফা হবে ফতুমাকে বেচলে। আরবদস্যুরা যদি সন্ধান পেয়ে থাকে, তাহলে তারা চুরি করেছে। কিন্তু এতেও লুতুফ আলি নিশ্চিন্ত হতে পারলো না।

আরবদস্যুরা চুরি করলে এমন নিঃশব্দে চুরি করবে না বা তারা লুতুফ আলিকে অক্ষত রেখে যাবে না। তারা যেমন দলে ভারী করে আসে, তেমনি আসে প্রচণ্ড হৈচৈ করতে করতে। তারপর মেরে কেটে লুণ্ঠন করে ঝড়ের বেগে চলে যায়। সুতরাং সে সব কিছু যখন হয়নি তখন এ কাজ আবেদীনের।

আবেদীনের পৌরুষ হঠাৎ জাগ্রত হয়ে এই দুঃসাহসিক কাজ করেছে। সে ফতুমার অধরযুগল অচৈতন্যতার সুযোগ নিয়ে স্পর্শ করেছিল। চুম্বন এঁকেছিল পাগলের মত। আওরতের অধরের অমৃত-স্বাদ পেয়ে তার ইন্দ্রিয় জেগেছে। কাম-প্রপীড়িত হয়ে এসেই দুঃসাহসিক কাজ করেছে। যখন তারা প্রকৃতির শত্রুতায় উটের পিঠে জ্ঞান হারিয়েছিল, সেই সুযোগে আবেদীন নিঃশব্দে এসে ফতুমাকে টুপ্

করে তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

এই দৃঢ়বিশ্বাস যখন তার মনে রূপ পেল, তখন লুতুফের চোখের জল অপসারিত হয়ে গেল। পরিবর্তে তার শারীরিক দৃঢ়তা এল প্রচন্ড। ফতুমার কোন দোষ নেই। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় ঐ শয়তান আবেদীন ধরে নিয়ে গেছে। ফতুমাকে বাঁচাতে হবে। আর বেশী দেরি করলে তার আওরত ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে। হবে কি হয়েছে হয়তো—তবু ফতুমাকে তার চাই। ফতুমা ছাড়া সে বাঁচতে পারে না। সেইজন্যেও তাকে চাই।

লুতুফ আলি আর অযথা সময় নষ্ট করলো না। ত্বরিতপদে উঠে দাঁড়ালো এবং নিজের কর্তব্য ভেবে নিয়ে উটের পিঠ থেকে অচৈতন্য আম্মা ও বেটাকে নামিয়ে নিল। তারপর তাদের মুখচোখে চামড়ার থলি থেকে পানি বের করে দিল। তাদের জ্ঞান ফিরলে খানাপিনা দিল।

আশনাই বৌয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে লুতুফ আলি বিস্তৃত কাহিনীর মধ্যে গেল না, শুধু দ্রুত বললো, বুঝতে পাচ্ছি না, মনে হচ্ছে চুরি হয়ে গেছে। তারপর বললো,—তুই হানিফকে নিয়ে এখানে থাক্, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, আমি আর বিলম্ব করবো না, উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আবার পর্বতের ওপর উঠছি। তবে যতক্ষণ না আসবো, তুই কোথাও যাবি না।

আশনাই হঠাৎ বললো,—কেন মিছে তুই মনেও করছিস বেটা? সে আর ফিরবে না! আমি আওরত হয়ে আওরতের মনের খবর বুঝতে পারি না!

লুতুফ আম্মার কথায় থমকে দাঁড়ালো, হঠাৎ চোখের জল সামলাতে সামলাতে উটের পিঠে লম্ফ দিয়ে উঠে বললো,—আম্মা, তুই এমন করে আমার মনে যন্ত্রণা দিস্ না?

তারপর আর সে অপেক্ষা করলো না, উটটিকে দ্রুতগামী করে—আবার পশ্চাদ্ধাবন করলো।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছিল।

সূর্যতাপ অপসারিত। দিনের প্রচন্ড ভীষণতা লুপ্ত হয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছিল শান্ত আবহাওয়া। মরূদ্যানের যে জলাশয়টি নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল, তার প্রবাহমান স্রোতে গোধূলির রক্তরাগ আবীর ছড়িয়েছিল। স্রোতের স্বর্ণশিখরে হীরার ঔজ্জ্বল্য। সীমন্তিনীর সিঁদুরের আভা। জোয়ানী আওরতের আপেল রাঙা সুমসৃণ গন্ডের মত। তাছাড়া সেই মুহূর্তে আসমানকেও কেমন যেন সুন্দর দেখাচ্ছিল।

আশনাই যদি এসব দেখতো হয়তো তার মনটা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যেত কিন্তু সে তখন তার ছেলের আচরণে ক্ষিপ্ত। আব্বা কোথায় গেল তার কোন খোঁজ নেই, সে গেল জোরুকে খুঁজতে! একটা জোরু গেলে কি দোসরা জোরু মিলবে না? বরং আব্বা গেলে আর দোসরা আব্বাকে পাওয়া যাবে না।

এই চিন্তাতেই আশনাই প্রকৃতির সেই অপরূপ সৌন্দর্য হারালো।

পর্বতের অপরিস্কৃত গুহার অভ্যন্তরে দুটি প্রাণী।

একজন খাদকের বেশধারণ করে লুব্ধ দৃষ্টিতে খাদ্যের দিকে তাকিয়ে আছে, আর খাদ্য তার বিস্ময়ের ভাব নিয়ে ভয়জড়িত দৃষ্টিতে খাদককে দেখছে।

গুহার বাইরে অশ্বটি বাঁধা আছে। সে অন্যমনস্কভাবে পায়ের শব্দ করে আরোহীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সে বোধ হয় বুঝতে পেরেছে, তার আরোহী এক অন্যায় কাজ করতে চলেছে। পাপ থেকে নিবারণের জন্যে পশুরও মানসিক যন্ত্রণা। পশুরও এই পরিস্থিতি অসহ্য লাগছে বলে তার এই পদধ্বনি। সে এই পদধ্বনি উত্থিত করে গুহার অভ্যন্তরের শান্তি বিঘ্নিত করছে।

ফতুমা গুহার মেঝের অপরিস্কৃত একাংশে হাঁটু গেড়ে বসে আবেদীনের কাছে জোড়হাত করে প্রার্থনা করছিল—তুমি আমার খোদা, আমায় রেহাই দাও। আমার ইজ্জত নিও না। আমাকে আমার মরদের কাছে পেঁছে দাও।

তার উত্তরে আবেদীন বলছিল—বেশ দেব। তোমাকে নিয়ে আমার কি হবে? শুধু একটিবার তুমি তোমার আওরত ইজ্জত স্বেচ্ছায় পেশ কর, তাহলে আমি তোমাকে আবার যথাস্থানে ফেরত দিয়ে আসবো।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব হয়? তাই যদি দিলাম, তাহলে আর ফিরে কি হবে?

কেউ জানবে না। আমিও কখনও কাউকে বলবো না।

কিন্তু ইজ্জত তো গেল? আওরতের তাই যখন গেল তখন কি থাকলো?

আবেদীন বিলম্ব হচ্ছে দেখে বিরক্ত হচ্ছিল। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললো,—ওসব কথা ছেড়ে দাও। আওরতের আছে তো শুধু ঐ। তোমাকে চুরি করে উটের পিঠ থেকে তুলে নিয়ে এসেছি কী ইজ্জত রক্ষা করবো বলে! আল্লা যখন তোমাকে বেহেস্তের হুরীর মত সুরত দিয়েছে তখন ভোগ করবার জন্যে মরদকে তাকত ভী দিয়েছে। লুতুফ আলি তোমাকে একা একা ভোগ করবে তা কেমন করে হয়?

আবার আবেদীন বললো,—ঝুটমুট সময় বরবাদ না করে জল্‌দি তৈরি হও। তারপর বললো,—তবে তোমাকে এইটুকু সাহায্য করতে পারি, লুতুফ আলি যাতে না তোমাকে ত্যাগ করে তার জন্যে কোশিষ। তুমি উটের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পথ হারিয়েছিলে, হাঁটাপথে ফিরছো এই ধরনের কোন বক্তব্য। তাতে লুতুফ আলির কোন সন্দেহই হবে না। সে যে তোমাকে ভালবাসে সে তুমি জানো। সন্দেহ করলেও উৎপীড়ন করে কিছু জানতে চাইবে না।

ফতুমার কানে সব কথাগুলি গেল। কিন্তু কোন কথাই তার পছন্দ হ'ল না। সে দিশেহারা হয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো।

কোন আওরত কি স্বেচ্ছায় একটি বেওয়ারিশ উপভোগের ইচ্ছায় তার দেহ উৎসর্গ করতে পারে?

পারে না সে কথা বুঝতে পেরেই আবেদীন বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেবে বলে ঠিক

করলো। কারণ আর বিলম্ব করা সমীচিন নয়। হয়তো লুতুফ আলি জানতে পেরেছে। জোরুকে সে ত্যাগ করে হিন্দুস্তান যাত্রা করবে বলে মনে হয় না। সেইজন্যে উটের পিঠে সওয়ার হয়েই ছুটে আসবে এই পর্বতের বিভিন্ন খাদে খাদে। এমন কি হয়তো এর সন্ধানও অবিলম্বে পেয়ে যাবে, যদিও এই গুহাটি সবচেয়ে দীর্ঘ পর্বতের অনেক উঁচুতে।

এই কথা স্মরণ করেই আবেদীন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাছাড়া তার পুরুষদেহের শিরায় শিরায় দুর্লভ রমণী ভোগের আকাঙ্ক্ষাটা কেমন যেন উচ্চ হয়ে উঠছিল। মস্তিকের কোষে কোষে জাগছিল কি এক উন্মাদনা! সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি কেমন যেন শিহরিত হয়ে তাকে আসুরিক বল দান করলো।

আবেদীন আর সহ্য করতে না পেরে ফতুমার ওপর ঝাঁপ দিল।

ফতুমা হাঁটু গেড়ে বসে আগে প্রার্থনা করছিল, পরে আবেদীনের মুখের অবস্থা দেখে বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে হাত দিয়ে নিজের লজ্জাকে আটকাতে চাইলো কিন্তু সিংহের সঙ্গে একটি ভয়কাতরা হরিণী পারবে কেন?

আবেদীনের আসুরিক শক্তির কাছে ফতুমার সমস্ত বাধা মুহূর্তে লয় হয়ে গেল।

আবেদীন তখন মরিয়া। আগে ফতুমার উষ্ণ-অধরযুগলের বিচিত্র আস্বাদন উপলব্ধি করেছিল, তবে সে স্থান ছিল বড় বিপজ্জনক। একটি শকুন তার তীক্ষ্ন-দৃষ্টি দিয়ে পাহারা দিচ্ছিল। তাই তখন আস্বাদনে তৃপ্তি থাকলেও ছিল না পরি-পূর্ণতার আমেজ এখন সেই পরিপূর্ণতার জন্যে প্রথমেই আবেদীন ফতুমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুম্বনে চুম্বনে রাঙা করে দিল ফতুমার গোলাপ অধরযুগল, আপেলবর্ণ গণ্ডদ্বয়, তাছাড়া আরো আরো অন্যান্য অনেক অংশ। যে অংশে চুম্বন আঁকলে পুরুষের মনে পরিতৃপ্তি বোধ জাগে।

সেই চুম্বন দিয়েই আবেদীনের বাসনা পরিতৃপ্ত হল না। মরু-প্রান্তরের বালুকা-ভূমিতে অচৈতন্য ফতুমার উন্নত বক্ষের ওপর যে হাতের স্পর্শ এঁকে সে আনন্দ পেতে চেয়েছিল কিন্তু আনন্দ পায়নি শুধু বসনের ওপর স্পর্শ এঁকে ছিল। সেই স্পর্শ সে বসনোম্মুক্ত করে আঁকবে বলে হঠাৎ উন্মত্ত হয়ে ফতুমার বক্ষবাস শক্তি-প্রয়োগে ছিন্ন করলো।

ফতুমার তখন বাধা দেওয়ার শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে। তবু শেষ প্রদীপের শিখা প্রজ্বলনের মত একবার জ্বলে উঠলো। চিৎকার করে পর্বত গিরিগুহায় প্রতিধ্বনি তুলতে গেল কিন্তু আবেদীন মুখে হাত চাপা দিয়ে তা বন্ধ করে দিল।

তারপর আর কি?

ফতুমার দেহ পুরুষের বলিষ্ঠ শক্তির কাছে হার স্বীকার করলো। আর আবেদীন নিজের খুশিমত ফতুমাকে উপভোগ করতে লাগলো।

কতরকম করে একটি পুরুষ একটি রমণীকে উপভোগ করতে পারে, তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই গিরিগুহার অভ্যন্তরে। আবেদীন প্রাণভরে নিজের লুব্ধদৃষ্টি

দিয়ে একটি আওরতের যৌবন দেখতে লাগলো। বুকের সুউন্নত গোলাপ পুষ্পের ওপর এখন আর কোন আবরণ নেই। আবেদীন স্পর্শ আঁকলো, উপভোগ করলো, অনুভূতি দিয়ে আল্লার সৃষ্টির মহিমা কীর্তন করলো।

আর কিছুক্ষণ। অন্তত আর কিছুক্ষণ যেন সময় পাওয়া যায়। তাহলে সমস্ত উপভোগের পরিতৃপ্তি নেমে আসবে বেহেস্ত থেকে।

অবেদীন ভাবছিল, লুতুফ আলির আসার আর বিলম্ব নেই। তার আসার আগেই যেন তার জোরুর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়। সেইজন্যে সে কালবিলম্ব না করে নেমে পড়লো অসীম সমুদ্রের উষ্ণজলের একেবারে সীমাহীন অতলে। ডুবুরী হয়ে সে মুক্তা তোলার মত নেমে গেল চেতন অবস্থার শেষ অচেতন ধাপে।

ফতুমার তখন চেতনা লুপ্ত। শুধু তার অবশ নগ্নদেহটি নিয়ে যা কিছু ক্রীড়া। তাও একসময় শেষ হয়ে গেল।

আবেদীন যেন পরিতৃপ্ত হবার মুহূর্তেই বুঝতে পারলো, পালাতে হবে। লুতুফ আলি এসে পড়লে আর তার জান বাঁচবে না। লুতুফ আলি কোরবানী দেবে। কিন্তু এই আওরতটির কি হবে? এখন তার যেরকম বেশবাস তাতে বাইরে নিয়ে যাওয়াই মুশকিল। অন্তত রাত্রি এগিয়ে এলে নিয়ে যাওয়ায় অসুবিধা হত না। কিন্তু রাত্রি এগিয়ে এসেছে কি?

আবেদীন এবার প্রাণের মায়ায় আবার চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ আগে তার মধ্যে ছিল রমণীভোগের আকাঙ্ক্ষা, পরিতৃপ্ত হবার পর যে আকাঙ্ক্ষায় মানুষ আরো চঞ্চল হয় সেই প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আবেদীন পাগল হয়ে উঠলো।

গুহান্তর থেকে বাইরে এসে দেখলো, আনমানের বুকে ধূসরতার ছায়া। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন হয়ে ধরিত্রী বুকের ওপর কালো কাপড়ের ওড়না চাপা দিয়ে দেবে। সুতরাং অশ্ব প্রস্তুত। ঐ অশ্বের ওপর লুতুফ আলির জোরুকে নিয়ে কোথাও লোকচক্ষুর মাঝে ফেলে দিয়ে এলেই হবে। উদ্দেশ্য, যেন আবেদীন তার জোরুর কোন ধর্মহানি করে নি, এরূপ বোধ হবে—পথে অজ্ঞান অচেতন হয়ে পড়ে আছে। অবশ্য আবেদীন তার জন্যে কিছু মনে করে না। জীবনে কখনও আর তার লুতুফ আলির সঙ্গে দেখা হবে না। সে এখন আবার আরবের পথই ধরবে।

এমনি চিন্তা করে আবেদীন দ্রুত গুহার অভ্যন্তরে গিয়ে ফতুমার নগ্ন দেহের ওপর ছিন্ন বসনগুলি স্থাপন করলো তারপর তাকে ক্রোড়ে ধারণ করে বাইরে বেরিয়ে এল। এসে অশ্বের ওপর দেহটি আড়াআড়িভাবে তুলে নিয়ে নিজে লাফিয়ে উঠলো।

ফতুমার দেহটি অশ্বপৃষ্ঠে এমনভাবে রাখা হল, যা খুবই বিপজ্জনক। মুণ্ডটি বাইরে ঝুলতে লাগলো। একমাথা কালো চুল শূন্যে উড়তে লাগলো সর্পের মত। আর এদিকে বিপরীত অংশে দুটি পা ও নিম্নাংশের অনেকটা। শুধু অশ্বপিঠে বক্ষের খানিকটা পেষণ অবস্থায় ধরা ছিল। যে লোভাতুর উত্তুঙ্গ বক্ষ দেখে আবেদীন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সেই উত্তুঙ্গ বক্ষের প্রায় অংশই অশ্বপৃষ্ঠের ওপর পেষণ অবস্থায় ছিল। অর্থাৎ ফতুমাকে উপুড় করে শোয়ানো হয়েছিল।

আবেদীন একটু ঘ্রর পথে অশ্ব ছ্রটিয়ে দিল। ঘ্রর পথে গেল এইজন্য যে, সোজাপথে গেলে যদি একেবারে ল্রতুফ আলির ম্রখোম্রখি হতে হয়!

কিন্তু ধ্রর্ত সবসময়ই অতিব্রদ্ধির জন্যে ধরা পড়ে যায়, শেষপর্যন্ত আবেদীনের অবস্থা তাই হল।

তখনও রাত্রি একেবারে নামেনি? সবে সন্ধ্যার ধ্রসরতা নামতে শ্রর্ব করেছে। পর্বতের বিভিন্ন প্রস্তরের বিভিন্ন অবস্থান্তরে ধ্রসরতার চিহ্ন। আবেদীনের কোনদিকে খেয়াল নেই। তার তখন প্রাণের মায়া প্রচন্ড। সে ফতুমাকে নামিয়ে দিয়ে পালাতে পারলেই বাঁচে।

তাই দ্রত তার অশ্বখ্ররের ধ্বনি। পর্বতের মর্মরগাত্রে সেই ধ্বনি প্রচন্ড থেকে প্রচন্ডতর হয়েছিল।

সেই ধ্বনিকে অন্রসরণ করেই একজনের হঠাৎ সজাগদ্রষ্টি জাগরিত হল। সে ইস্রায়িল। ব্রদ্ধ ইস্রায়িল পথশ্রমে অবসন্ন হয়ে একটি প্রকান্ড প্রস্তরের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ ব্রজেছিল। হয়তো তার চোখে নিদ্রাও এসে গিয়েছিল। হঠাৎ অশ্বখ্ররের ধ্বনি প্রচন্ড হয়ে তার কানে ঢুকতে সে জাগরিত হয়ে উঠলো। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেদিক থেকে শব্দ কাছে আসছিল সেইদিকে সন্দিগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

শ্রধ্র তাকিয়ে থাকলো না, শত্রর সম্ভাবনা মনে করে কোমর থেকে ছোরা বের করে হাতের ম্রঠিতে চেপে ধরলো।

অন্ধকার যদি না হ'ত, হয়তো দ্রর থেকেই সে আরোহীকে চিনতে পারতো। কিন্তু বেশ ঘন হয়ে অন্ধকার নামছিল বলে সে চিনতে পারলো না কিন্তু অনেক কাছে আসতে সে চিনতে পারলো ল্রতুফের সেই দ্রজন রক্ষীর মধ্যে একজন। এবং আবেদীনের নামটাও তার হঠাৎ মনে এল। কিন্তু ওকি? আবেদীনের অশ্বপ্রষ্ঠে কি?

আওরত! কে এই আওরত? কোত্থেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? মনে হচ্ছে, আবেদীন পালাচ্ছে কোথাও! কারণ এ পথ তো হিন্দ্রস্তানে যাবার জন্যে নয়! বরং এটাই হিন্দ্রস্তানে যাবার উলটো পথ। সে নিজেকে ল্রকিয়েছে হিন্দ্রস্তানে যাবে না বলে। ল্রতুফের দল চলে গেলে সে আরবে ফিরবে। এই বাসনা নিয়েই সে এই পর্বত শিখরে উঠে এসেছে।

কিন্তু সেই শিখরদেশে আবেদীন! আর অশ্বপ্রষ্ঠে একটি নগ্ন আওরতের দেহ। দ্ররত্ব থাকলেও ইস্রায়িল বেশ দেখতে পাচ্ছিল।

ইস্রায়িল একটু সরে গিয়ে আত্মগোপন করেছিল বলে অশ্বারোহী তাকে দেখতে

পেল না কিন্তু অশ্বারোহী কাছে আসতে ইস্রায়িল আর কালবিলম্ব না করে দ্রুতগামী অশ্বের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

সামনে বাধা পেতে অশ্ব ক্ষিপ্ত হয়ে লম্ফ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে আবেদীন টাল সামলাতে না পেরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে গেল।

ইস্রায়িলও তৈরী ছিল, আবেদীনের পতিত দেহের ওপর চেপে বসে উম্মুক্ত ছুরিকা তুললো শূন্যে।

কোথায় পালাচ্ছিলে ?

জীবনে যা ভাবা যায় না, তাই এক এক সময়ে ঘটে যায়। আবেদীনও বিকৃত মস্তিষ্ক সেই ইস্রায়িলকে চিনতে পেরেছিল কিন্তু উপায় কি ? ধরা পড়ে গেছে। অশ্বপৃষ্ঠে বামাল গচ্ছিত আছে।

সময় মুহূর্তমাত্র। বুকের উপর চড়ে বসে আছে বৃদ্ধ ইস্রায়িল কিন্তু তার বাহুতে আসুরিক শক্তি। সে ছুরিকা তুলে জবাবের আশায় আছে। মনোমত জবাব হলে পরিত্রাণ, নতুবা মৃত্যু। মৃত্যুই নিশ্চিত সেই ভেবে আবেদীন কৌশলের আশ্রয় নিল।

বললো—অশ্বপৃষ্ঠে কে আছে দেখুন ?

সে আমি পরে দেখছি, এখন আমি যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও।

কি জিজ্ঞেস করছেন ?

কোথায় পালাচ্ছিলে ?

পালায়নি তো ! দলের খোঁজে ছুটছিলাম।

দলের খোঁজে ছুটছিলে এই পথে ? হঠাৎ ইস্রায়িল একহাতে ছোরা তুলে এক হাতে আবেদীনের কণ্ঠনালি চেপে ধরলো।

ঝুট্ বলছিস্ ? দাঁতে দাঁত চেপে ইস্রায়িল কণ্ঠনালিতে আরো জোরে চাপ দিল।

মৃত্যু যখন কাছে আসে তখন কোন মানুষেরই হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, আবেদীনেরও থাকলো না। সে ইস্রায়িলের হাত থেকে একটিবার ছাড়া পাবার জন্য কৌশল অবলম্বন করছিল, পুনরায় করলো। বললো,—মিঞাসাহেব, অশ্বপৃষ্ঠে কে আছে জানেন ? আপনার পুত্রবধূ লুতুফ আলির জোরু ফতুমা বিবি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে ইস্রায়িল তার উদ্ধত ছুরিকা শূন্যে তুলে আবেদীনের বক্ষ বিদ্ধ করলো। এক আঘাতেই শেষ। ইস্রায়িলের পুনরুদ্ধার শক্তি যেন আসুরিক বল পেয়েছিল। তাকে আর দ্বিতীয়বার আঘাত হানতে হল না।

আবেদীন আর কথা বললো না। রক্তে লাল হয়ে উঠলো তার দেহের কামিজ। নিষ্প্রাণ দেহ ঢলে পড়লো এক পাশে।

ইস্রায়িল উঠে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটলো আবেদীনের পরিত্যক্ত ঘোড়াটির দিকে। ঘোড়াটি কিছুদূরে একপাশে দাঁড়িয়েছিল চুপ করে। বন্ধন ছাড়াই সে কেন যেন অপেক্ষা করছিল। পূর্বে ইস্রায়িল ভেবেছিল ঘোড়াটি তার পিঠের প্রাণীটি

নিয়ে পলায়ন করবে। কিন্তু সে তখন আবেদীনের বক্ষের ওপর। শয়তানকে ছেড়ে ঘোড়ার পিঠের প্রাণীটিকে রক্ষা করা সমীচীন নয় মনে করেই সে শয়তানকেই শায়েস্তা করবার ব্যবস্থা নিয়েছিল। তারপর শয়তান শায়েস্তা হবার পর সে আর একমুহূর্ত অপেক্ষা না করে ঘোড়ার সন্ধানে তাকালো।

কিন্তু ঘোড়াটিকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে মনে একটু খুশি হল। এবং ঘোড়ার সামনে দ্রুত ধাবিত হয়ে ফতুমার যে অবস্থা দেখলো, তাতে তাকে চোখে হাত চাপা দিতে হল। নিজের বেটার জোরুর এই হাল! নগ্ন একটি অচৈতন্য দেহ ঘোড়ার ওপর নিঃশব্দে ঝুলছে।

একটি গর্দ্দভ চোখের সামনে প্রকৃতির তান্ডবে মারা গিয়েছিল বলে সে সহ্য করতে না পেরে দল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন পুত্রবধূর এই হাল দেখে সে কেমন যেন আরো উন্মত্ত হয়ে উঠলো। ছুটে গিয়ে আবেদীনের রক্তাক্ত মৃতদেহের ওপর আরও কয়েকটি ছুরিকাঘাত করে তার প্রতিহিংসা মেটালো। তারপর ফিরে এসে নিজের গা থেকে চামড়ার আবরণীটি খুলে পুত্রবধূর নগ্ন দেহের ওপর চাপা দিল। তারপর সেই ঘোড়াতেই পুত্রবধূকে ভাল করে শুইয়ে ঘোড়ার ওপর সওয়ার হয়ে নিল।

তারপর লুতুফের উদ্দেশ্যে নেমে চললো পর্বতের নিচে।

অন্ধকার পথ। এখন চাঁদ ওঠেনি। শুধু আসমানে নক্ষত্রমালার ফুলকি।

না, ইস্রায়িলের চোখে জল এল না। মনের মধ্যে আরও ক্ষোভ জমে উঠলো। লুতুফ তার ঘরের লক্ষ্মীকে হারালো। তাকে রক্ষা করতে পারলো না। তার ওপর এই অত্যাচার, এ তাদেরই নসীবের খেল। ফতুমা ইজ্জত হারালো না, হারালো আলিবংশ সম্মান। এই জন্যেই তার তখন আরব ছাড়তে ইচ্ছে হয় নি। নিজের দেশ যখন তাদের আহার, নিদ্রা সুখ দিল না, পরদেশ দেবে তাই! কিন্তু লুতুফ শুনলো না, দারিদ্র্যতা ঘোচাবার জন্য বাড়ি ছাড়লো।

না, আর ভাবার মত শক্তি নেই। এখন ধ্বংসের রঙ্গমঞ্চে দাঁড়িয়ে শুধু বিভীষিকার আকৃতি দেখে আতঙ্কিত হওয়া!

বেটা লুতুফ তাকে বলে, পাগল। পাগলই বটে। আজ যেন এই মুহূর্তে তার পাগলামিটা উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। ঘোড়ায় বসেই ইস্রায়িল কেমন যেন মাথাটার মধ্যে ভাবনাগুলো সাজাতে পারলো না। তালগোল পাকিয়ে গেল সব।

পালিয়েছিল বেশ ভালই হয়েছিল। আবার তাকে জড়াতে হল। ঘোড়াটি সূর্যতাপে দগ্ধ হয়ে পর্বতের কোলে ঢলে পড়েছে। অনাহার দুদিন ধরে। তার জন্যে কোন কষ্ট নেই। এখন যেন এই অবস্থায় সমস্ত কষ্টগুলি এক তাকে চলৎশক্তিহীন করলো। লুতুফ হয়তো তার জোরুকে খুঁজছে।

আর যখন সে লুতুফের সামনে ফতুমাকে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবে তখন বেটার মুখের চেহারা কি হবে?

লুতুফ যে তার জোয়ানী খুবসুরত জোরুকে বড় পেয়ার করতো! হা আল্লা,

খোদাতাল্লা এ আমার কি করলে? শেষকালে নিজে বাপ হয়ে বেটার জোরুর ইজ্জত হারা দেহ নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করবো? আর বেটার জোয়ান দেহটি কম্পিত হয়ে, চক্ষু দুটি রক্তবর্ণ হবে। দুই গন্ডবেয়ে জলের ধারা নামবে তাই আমি দেখবো?

বাপ হয়ে বেটার সুখ যেমন দেখেছি, দুঃখ দেখবো কেমন করে? তাতো সহ্য করতে পারবো না। একদিন লুতুফ এই ডাগর জোরুর যৌবন উপভোগ করে সব ভুলেছিল, সেদিন বেটার এই স্ত্রৈণ হওয়ার আচরণে যার পর নাই সে ক্ষিপ্ত হয়েছিল, মনে মনে তার জন্যে কত গাল পেড়েছিল—আজ এই বিশ্রী পরিণামে সেই সব কথা মনে পড়তে তার হৃদয় দগ্ধ হতে লাগলো।

ফতুমাও ভাল ছিল। পুত্রবধু হওয়ার যোগ্য! আর সেও তার শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতো। সেবা ছাড়া কোনদিন কোন অবহেলা প্রদর্শন করে নি। এমন কি পিতার বন্ধু বলেও তার শ্রদ্ধা ছিল। হ্যাঁ, আব্বাস ছিল ইস্রায়িলের মাছধরার বন্ধু। তার বেটি এই ফতুমা। ফতুমা জন্মের একটি বেশ ইতিহাস আছে।

ফতুমা জন্মের পর আব্বাসের জোরু মারা গেল। লোকে বললো, মেয়ে অপয়া। তাছাড়া আরবদেশে মেয়েদের খুব সম্মান ছিল না। মেয়ে কারও ঘরে জন্মালেই তাকে জ্যান্ত কবর দেওয়ার তোড়জোর চলতো। কারণ মেয়ে জন্মানো মানে পরিবারের অমঙ্গল। অথচ এই মেয়ে একদিন বড় হলে যে ঘর আলো করবে, কেউ চিন্তা করতো না। বরং ভাবতো, মেয়ে বড় হলে মরদ খুঁজতে হবে, শাদী না দিলে কেলেঙ্কারীর একশেষ। তাছাড়া কেমন যেন রীতি হয়ে গিয়েছিল, পরিবারে মেয়ে জন্মালে শোকের রোল উঠতো।

অবশ্য ফতুমা জন্মাবার পর সে সব কিছু হয় নি। শুধু তার আম্মা মারা যেতে তাকে দেখবার লোক থাকলো না, আর সেইজন্যে আব্বাস একথা ভেবেছিল। রীতি যখন আছে, বড় হবার আগেই জ্যান্ত কবরে শুইয়ে দিই।

মাছধরার নৌকার মধ্যে বসে ইস্রায়িল সেদিন আব্বাসের সংকল্প শুনে গালে হাত দিয়েছিল—ও মোল্লার পো, শেষকালে লড়কীটাকে খতম করে দেবে?

আব্বাস বললো,—কি করবো বলো দোস্ত? জোরু চোখ বুজলো। আমি বাইরে বাইরে ঘুরি। ঘরে আওরত না থাকলে বেটিকে কে পালবে?

ইস্রায়িল বললো,—কেন একটা শাদী কর?

আব্বাস হা হা করে হেসে উঠলো। তুমি ক্ষেপেছ? আর শাদী করবো? সেটা মরেছে আমি শান্তি পেয়েছি।

ইস্রায়িল তারপর একটু ইতস্তত করে বললো,—তাহলে তুমি ঠিকই করে ফেলেছ, লড়কীটাকে জ্যান্ত কবর দেবে?

তাইতো ঠিক করেছি। ও আপদ বড় হওয়ার চেয়ে কবরে যাওয়া ভাল। বড় হলেই তো আবার বাপজানের দায়িত্ব আসবে?

তখন ইস্রায়িল একটু অনমনস্ক হয়ে কি ভাবলো, তারপর গম্ভীর হয়ে বললো,—তোমার বেটিকে দেখতে কেমন?

আব্বাস হেসে বললো,—তিনমাসের লড়কী, দেখতে কেমন আর আর বলবো ? তবে মনে হয় ওর অম্মাজানের মত হবে।

আম্মাজান কেমন দেখতে ছিল ?

আব্বাস লজ্জা পেয়ে বললো,—জোরুর সুরতের ব্যাখ্যা আর নিজে করি কেমন করে ? তবে তাকে দেখে আমি দিনরাত ভুলতাম।

ইস্রায়িল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললো,—বেটির নাম কি রেখেছ ?

ফতুমা। হজরত মহম্মদের এক কন্যার নাম ফতেমা ছিল। আমার জোরু মরবার আগে তাই বেটির নাম ফতুমা রেখে গেল। সেই নামই আছে। তারপর আব্বাস ম্লান হেসে বললো,—নামে আর হবে কি ? বালির গর্তে যখন তার কোরবানী হবে তখন আর না ভাবাই ভাল। তারপর ইস্রায়িলের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো—হঠাৎ তুমিই বা এত কথা জিজ্ঞেস করছো—কেন ?

ইস্রায়িল গম্ভীর হয়ে বললো,—আব্বাস তুমি জানো, আমার একটি লড়কা আছে।

আব্বাস মাথা নাড়লো।

আমি ভাবছি তোমার বেটিকে তার জন্যে ব্যবস্থা করবো।

আব্বাস কুয়াশার মধ্যে কোন আলো না দেখতে পেয়ে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কি বলছো ইস্রায়িল ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

তখন ইস্রায়িল খুলে বললো। তার তখন সমস্ত পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছে। মনে মনে স্থির সিদ্ধান্তে এসে আব্বাসকে বললো, হ্যাঁ, আমার বেটার জন্যেই তোমার বেটিকে কবুল করলাম। তাকে তুমি পালন করে বড় কর। সময় হলেই আমার বেটার সাথে শাদী দিয়ে নিয়ে যাবো।

আব্বাস বিস্মিত হয়ে হঠাৎ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আবেগজড়িত কণ্ঠে বললো,—ভাই ইস্রায়িল, আমার বেটির জীবন তুমি দান করলে। কোথায় সে কবরের তলায় যাবে, তা না গিয়ে ভবিষ্যতের ব্যবস্থা পাকা হল।

ইস্রায়িল বললো,—এসো আমরা কবুল করি। এই বলে সে লোহিত সাগরের নোনা পানি হাতে নিয়ে কবুল করলো, আমার জান থাকতে এই কথার কোন নড়চড় হবে না।

আব্বাসও প্রতিজ্ঞা করলো—আমার বেটিকে যথাসময়ে ইস্রায়িলের বেটার প্রয়োজনে পাঠিয়ে দেব। আজ থেকে আমার বেটির ওপর আমার কোন অধিকার থাকলো না। আমি শুধু আব্বাজান হয়ে পালন করবো মাত্র।

তারপর বহু বছর চলে গেছে।

ইস্রায়িল, আব্বাস দুজনেরই দেখাশুনা আর হয় না।

ইস্রায়িল কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করেছিল। আব্বাস কি করেছিল ইস্রায়িল জানে না। তবে জানলো লুতুফের সঙ্গে ফতুমার শাদীর তিনবছর আগে।

একদিন সকালবেলা। সে মাসটা রমজানের মাস ছিল। মুসলমানদের এই

মাসটি খুবই উল্লেখযোগ্য। সেইজন্যে ইস্রায়িল ভুলতে পারেনি সেদিন।

একটি মেওয়া ফলের মত আপেল বর্ণসম্ভবা যুবতী লড়কী এল তাদের বাড়িতে। তখন ইস্রায়িল ঘরের দাওয়ায় বসে কোমরের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

যুবতীটির সঙ্গে একটি নফর শ্রেণীর লোক।

ইস্রায়িলের সামনে এসেই যুবতীটি সলজ্জভঙ্গিতে আবদার করে জিজ্ঞেস করলো,—এটা কি ইস্রায়িল চাচার বাড়ি?

ইস্রায়িল মেয়েটিকে দেখে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। এমন আলো করা রূপ যে সে জীবনে দেখেনি। যেন দেবী প্রতিমা বেহেস্ত থেকে এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে। তাই সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞেস করলো,—কে তুমি বেটি? আমি তো তোমাকে চিনতে পারলুম না!

তখন মেয়েটি এতটুকু দ্বিধা না করে ষোল বছর আগের সেই প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি শোনালো ইস্রায়িলের সামনে। তারপর বললো,—আমার আব্বা মারা গেছে আজ সাতদিন। পাড়ার লোকের জ্বালায় বাড়িতে টিঁকতে না পেরে নিজেই চলে এলাম আপনার কাছে।

ইস্রায়িল তাকে ঘরে তুলে নিল।

কিন্তু তখুনি লুতুফের সাথে শাদী দিতে দ্বিধা করলো। কারণ লুতুফ তখন কেমন যেন সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। বাইরেই থাকে সমস্ত দিনরাত্রি। কাজকর্ম বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে করে না। সংসার সম্বন্ধে তার কোন টান নেই। এইসময় বেটার শাদী দিয়ে একটা বিশ্রী আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে ইস্রায়িল চাইলো না। তবে আড়ালে ফতুমাকে বলে দিল ঐ আমার বেটা। ওর সঙ্গেই তোমার শাদী দেব বলে আব্বাসকে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার এখন কাজ হবে, ঐ শয়তানকে ঘরের আকর্ষণে ফিরিয়ে আনা। যদি আনতে পারো তাহলে আর শাদীর বিলম্ব হবে না। কিন্তু তোমাকেও একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে, যতদিন না লুতুফ ঘরের আকর্ষণে ফেরে, ততদিন তুমি তাকে এই প্রতিজ্ঞার কথা বলতে পারবে না। বলবে তুমি এসেছ এখানে কিছুদিন থাকতে। সময় হলেই চলে যাব। পিতার বন্ধু বলে এ বাড়িতে থাকবার তোমার অধিকার আছে।

তারপর আরো তিনবছর গেল।

একদিন ফতুমার অগ্নিতপস্যা সার্থক হল।

লুতুফ গিয়ে বললো,—আব্বা, আমি তোর বন্ধুর বেটিকে শাদী করতে চাই?

তখন ইস্রায়িল আদ্যোপান্ত সমস্ত প্রতিজ্ঞার কথাই বেটাকে বললো। তারপর আর কি? লুতুফ ও ফতুমার একদিন শাদী হয়ে গেল। তারপরই এল নাতি হানিফ।

আজ সেই ফতুমা নিজের আওরত ইজ্জত হারালো? এর জন্যে দায়ী কে? লুতুফ তার বেটা, না সে নিজে। তাকে জেনেই তো আব্বাস একদিন ফতুমার ভবিষ্যৎ বিশ্বাস করে দিয়েছিল। না হলে ফতুমার কবর হয়তো কেউ আটকাতে

পারতো না। কিন্তু সেদিন ইস্রায়িল আব্বাসকে ঠেকিয়ে কবর আটকেছিল কি শুধু আজকের জন্যে ?

অশ্ব দুর্দামবেগে ছুটে চলেছে। রাত্রি আরও গভীর থেকে গভীরের দিকে নেমে যাচ্ছে। ইস্রায়িলের কোনদিকে খেয়াল নেই। তার দৃষ্টি সম্মুখ পথের দিকে। লুতুফ আলির কাছে তাকে এখুনি পেঁাছতে হবে। কিন্তু কতদূরে যে সে বেটা চলে গেছে কে জানে।

চাঁদ উঠেছে মাথার ওপরে। আসমানের জমিনে চাঁদের রোশনাই। ইস্রায়িল ঘোড়ার পিঠের ওপর দৃষ্টি দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করলো কিন্তু কেমন যেন চোখ বার বার চলে যায়। কেমন যেন চাঁদের রোশনাই ঘোড়ার পিঠের ওপর। ফতুমার নগ্নদেহের ওপর ইস্রায়িলের চামড়ার আবরণী চাপা দেওয়া ছিল কিন্তু অশ্বের দোলানিতে তা স্থানচ্যুত হয়ে ফতুমার যুবতী দেহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ইস্রায়িলের শয়তান চোখ দুটি তা লেহন করছে।

ইস্রায়িল তাই দেখে তার চক্ষুদুটিকে শাসন করবার চেষ্টা করলো। মনে মনে চোখের সামনে দাঁড় করালো আশনাইয়ের নগ্নদেহ। যে দেহের নগ্নরূপ দেখবার অধিকার তার আছে। যে দেহকে বেষ্টন করে সে অনেক কিছু ভাবতে পারে কিন্তু সে দেহ তার স্মরণে এল না। একটি কৃশকায়, লোলচর্ম, বিগতযৌবনা বৃদ্ধার আকৃতি তার চোখে ধরা পড়লো বটে কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপরে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণার রেখা সৃষ্টি হল। ইস্রায়িল আশনাইয়ের যুবতী বয়সের তনুসম্ভারের চিত্র দেখতে চাইলো কিন্তু তা মনশ্চক্ষে ধরা না পড়ে দৃষ্টিপথে বার বার পড়তে লাগলো পুত্রবধূর নগ্নদেহের যৌবনসম্ভার।

খোদা, আমার দৃষ্টি তুমি তুলে নাও। কেন আমি এই অবলা রমণীর প্রতি লোলুপ হচ্ছি ? বেটির প্রতি বাপজান কখনও কি লোলুপ হয় ? তাছাড়া এ আমার পুত্রবধূ। বেটির তুল্য। লুতুফ যার দেহভোগের অধিকারী, আমি তার দেহ দেখি কেন ? এযে পাপ, ভীষণ পাপ। সেই পাপ আবার সে করছে ? তাকে দিয়ে করাচ্ছে খোদা ! কি আশ্চর্য বিচার এই খোদার ? একটি তারই পেয়ারের আওরত আজ বিশেষ দুরবস্থায় পড়ে অচৈতন্য অবস্থায় নগ্ন হয়ে শ্বশুরের অশ্বপৃষ্ঠে শুয়ে চলেছে, আর শ্বশুর যাকে দেখে অন্য সময় মাথা নিচু করে থাকতো, আজ স্বাধীনতা পেয়ে মাথা উঁচু করে পুত্রবধূরে নগ্নরূপ দেখছে !

ছি, এ জীবন ধ্বংস করাই উচিত।

এখন যদি এখুনি ফতুমার জ্ঞান হয় ! জ্ঞান হয়ে সে যদি দেখে তার শ্বশুরমশাই তার দিকে লোলুপ চোখে তাকিয়ে আছে ! না, না এ লজ্জা রাখবার কোথাও উপায় থাকবে না !

পর্বতের নীচে এসে ইস্রায়িল হালিম আলি অশ্ব নিয়ে থমকে দাঁড়ালো। সেই মরূদ্যান। যেখানে লুতুফ আলি আম্মা ও বেটাকে রেখে আবার উটের পিঠে চড়ে জোরুকে খুঁজতে গিয়েছিল। গভীর রাত্রিতে ইস্রায়িল আলি সেই মরূদ্যানের সামনে

দাঁড়িয়ে ভাবলো, জলাশয় থেকে পানি নিয়ে এসে ফতুমার মুখে চোখে দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনবে কিনা ! কিন্তু তারপর !

ফতুমার জ্ঞান হলে তার লজ্জা নিবারণের পোষাক পাবে কোথায় ?

এখন যেমন ফতুমা অচৈতন্য হয়ে আছে বলে কোন সমস্যা নেই। জ্ঞান হওয়ার পর পোষাক চাইলে সে দেবে কেমন করে ? তার কাছে পর্যাপ্ত পোষাক কোথায় ? চামড়ার আবরণীটি তো ঢাকা দিয়ে দিয়েছে ফতুমার দেহের ওপর।

তাই মরুদ্যানের জলপানে বিরত থেকে আর ফতুমার জ্ঞান না ফিরিয়ে সে আবার সামনের বালুকাময় পথ অনুসরণ করলো।

লুতুফ কতদূরে কে জানে ? সে কি জানে না, আবেদীনের কান্ড ! তার কাছে হিন্দুস্তানই বড় হল, হানিফের আম্মার কোন মূল্য স্বীকৃত হল না ? কে জানে, বেটা কি ধাতুর আদমী ? তার ঔরসে হলেও আশনাইয়ের গর্ভের সন্তান যেন কেমন ভিন্ন স্বভাবের রূপ পেয়েছে।

ইস্রায়িল ভাবতে ভাবতে আরও পথ এগিয়ে চললো।

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আসমানের জমিনের\ নক্ষত্রের অদৃশ্য হওয়ার পালা শুরু হয়েছে।

ইস্রায়িল যখন এগিয়ে চলছিল, লুতুফ তখন আরো এক মাইল পথ দূরে।

কিন্তু তার যাওয়ার উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। কি হবে গিয়ে ? ফতুমা যখন নেই তখন সব উৎসাহ অস্তমিত। ফতুমাকে ভাল রাখবে, তাকে খুশি করবে, তাকে আনন্দে রাখবে, তাকে সুখ দেবে এই সব চিন্তা ছিল বলেই সে আরব ছেড়েছিল কিন্তু সেই ফতুমাই যখন হারিয়ে গেল তখন এই যাত্রা স্থগিত করা উচিত। ফিরে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তাছাড়া তার ভালও লাগছিল না। এ যাত্রায় তাদের মঙ্গল হয়নি। আব্বা কোথায় চলে গেল। কে জানে সে বেঁচে আছে কিনা ! দুটি রক্ষীকে সঙ্গী করে যাত্রা করেছিল, তারা বেইমানী করে নিজেদের দুর্ভাগ্য নিজেরাই ডেকে আনলো। মোস্তাফাকে হত্যা করতে সে চায়নি। এই মরুঅঞ্চলের দুর্গম পথে একটি লোক ক্ষয় হওয়া মানে অনেক ক্ষতি। কিন্তু মোস্তাফাই নিজের মৃত্যু নিজে গ্রহণ করলো। সে শুধু আত্মরক্ষার জন্যেই মোস্তাফার বুকে ছুরিকা নিক্ষেপ করলো। আবেদীনকে তখন যদি হত্যা করতো তাহলে হয়তো ফতুমাকে হারাতে হত না। কিন্তু ভুলই তখন সে করেছিল। ক্ষমা করে লোক ক্ষতি থেকে সে আবেদীনকে বাঁচাতে চেয়েছিল কিন্তু আবেদীনের মনে তখন অন্য উপসর্গ বাসা বেঁধেছে, সে কেমন করে জানবে ?

সেই ভুলই ফতুমাকে হারানোর প্রধান কারণ।

লুতুফ আলি কেমন যেন বার বার নিজের গালেই নিজে চড় মারতে লাগল। আবেদীনকে কেন সে মুক্তি দিল? মুক্তি দিয়েছিল ক্ষমা করার জন্য নয়। এই মরুসঙ্কুল বিজন পথে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে পরিহার করার জন্যে পুরুষের অবলম্বনই বিশেষ দরকার বিবেচনা করেই আবেদীনকে রেহাই দিয়েছিল কিন্তু তার ফল হল বিষময়।

এসব চিন্তা, এ সব আক্ষেপ আরো পরের।

পর্বতের বিশেষ বিশেষ অংশ অনুসন্ধান করে আসার পর যখন কোন সন্ধানই মিললো না, তখন ফিরে এসে ভেবেছিল। চোখে জলও তার এসেছিল। শুধু চোখে জল কেন বুকের হাহাকার সে থামাতে পারেনি।

উটের পিঠে সমস্ত সন্ধেটা সে আরোহণ করে পর্বত পরিভ্রমণ করলো। গিরি গুহার অভ্যন্তরগুলিও বাদ দিল না। কিন্তু কোথায় ফতুমা? কোথায় তার অতি আদরের পেয়ারী জোরু? শূন্যতার হাহাকার ছাড়া কোথাও নেই কোন মনুষ্যের চিহ্ন। এমন কি আবেদীনকেও সে দেখতে পেল না। লুতুফের মনে হয়েছিল; হয়তো ফতুমা পড়ে গিয়ে কোথাও অচৈতন্য হয়ে আছে। মন্দটা ভাবতে তার মনে লাগলো। মন্দটা যদি সম্ভব হয়ে থাকে তা চাক্ষুস প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ভাববে না বলেই লুতুফ মনটাকে তৈরী করল।

কিন্তু বহু সময় পর্বতের বিভিন্ন অংশ অনুসরণ করে যখন বিফল হল, তখন ভাবতে লাগলো নানান মন্দকথা। আবেদীনই ফতুমার সর্বস্ব লুণ্ঠন করেছে এবং সেই তাকে নিয়ে গেছে অন্য কোথাও। কিম্বা এই গিরিগুহারই কোথাও লুকিয়ে আছে, যার অনুসন্ধান তার সাধ্যের অতীত।

লুতুফ এই কথা ভেবে পশ্চাদ্ধাবন করলো কিন্তু তখন সে যদি শেষ পর্বতের শিখরটি একবার অনুসন্ধান করতো তাহলে ফতুমা ও আবেদীনের দেখা পেত। অবশ্য ফতুমাকে কলঙ্কহীন অবস্থায় পেত না। তখন আবেদীন গুহার মধ্যে ফতুমার দেহের ওপর ছিন্নবস্ত্র স্থাপন করছে। সেই সময় লুতুফ সেই গিরিগুহায় পেঁছিলে একেবারে নিজের সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেত এবং শাস্তি দিতে পারতো। অন্তত দুর্জনকে, জোরুর ইজ্জত গ্রহণকারীকে টুকরো টুকরো করে কেটে পর্বতের শিখরদেশ থেকে শূন্যে ছুড়ে দিত। লাভ কিছুই হত না। যা গেছে তা ফিরে আসতো না। তবু হয়তো কথঞ্চিৎ শান্তি মিলতো। আর দেখা পেত আব্বাজান ইস্রায়িলের। তখন ইস্রায়িল ঐ পর্বতেরই কোন এক অংশে।

ফতুমা যদি তখন জোরে চিৎকার দিত, তাহলে হয়তো সে আব্বাজানের সাহায্য পেত কিন্তু সে জোরে চিৎকার দেয় নি। যা দিয়েছিল তাও আবেদীন তার মুখ চেপে ধরে রোধ করে দিয়েছিল।

সে যাই হোক, ফতুমার ভাগ্যে যা ছিল তা হয়েছে। এখন পরবর্তী ঘটনা লক্ষ্য করবার মত।

লুতুফ আসি ঐ একটি পর্বতের গিরিগুহাগুলিই বাদ দিয়েছিল। যখন সে পরের পর পর্বত অন্বেষণ করে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তখন শেষ পর্বতটি বিরক্ত হয়েই অন্বেষণ ব্যতিরেকে স্বস্থানে ফিরেছিল। তার ধারণা হয়েছিল, ফতুমা এ তল্লাটে নেই আবেদীন তাকে নিয়ে দ্রুত দূরে গেছে।

একরকম আশা ছেড়ে দিয়েই সে আবার পর্বত থেকে সেই পরিত্যক্ত মরূদ্যানের কাছে ফিরেছিল। গিয়ে দেখলো, হানিফ বিরাট শূন্যতাকে ভরিয়ে দিয়ে উচ্চরোলে ক্রন্দন করছে। আশনাই তার পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু হানিফের কোন থামবার লক্ষণ নেই।

লুতুফ কাছে গেলে আশনাই জিজ্ঞেস করলো—বেটা লুতুফ, ফতুমার দেখা পেলি ?

কান্না তখনই কণ্ঠের কাছাকাছি এসে তার কণ্ঠরোধ করে দিল। উত্তর দিতে পারলো না। শুধু চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। মুহূর্তে দেহ হয়ে গেল দুর্বল। তারপর অনেক পরে বললো,—আম্মা চ ফিরে যাই। হিন্দুস্তানে যাওয়া আমাদের হবে না।

আশনাই তাড়াতাড়ি বললো,—না, সে হয় না বেটা। এত যখন কষ্ট হল, তখন আর আরবে নয়। হিন্দুস্থানের পথেই চল।

এখানে অবশ্য আশনাই মনের মধ্যে স্বার্থ নিয়ে কথা বললো। তার ধারণা, স্বামী তাদের ফেলে আরো এগিয়ে গেছে, তারা এগিয়ে গেলে একসময় স্বামীর দেখা পাবে।

এরা আগে কত ভাল ছিল কিন্তু এই মরূপ্রান্তরের পথে যেন কেমন সব বদলে যাচ্ছিল। কেমন যেন সব সহানুভূতিহীন স্বার্থপর। বাড়িতে বৌকে কত স্নেহ করতো আশনাই কিন্তু এই মরূপ্রান্তরে যেন বৌ তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গিয়েছিল। ফতুমার বিয়োগে তার মনে শোক তো দূরের কথা একটি সান্ত্বনার বাক্যও সে বেটাকে বললো না। শুধু বললো,—বেটা, যা হবার সে তো হয়েছে, এখন কিছু রান্না করি, খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে নে।

আহারের কথা লুতুফের যেন মনেই ছিল না। হঠাৎ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে লুতুফ চমকে উঠলো আম্মার কথায়। তার ফতুমা আজ দুদিন খানাপিনা না করে আছে, আর সে খানাপিনা করে জীবন ধারণ করবে ? তার চেয়ে এ জীবন বরবাদীতে শেষ হয়ে যাওয়া ভাল। তাই আতঙ্কিত হয়ে বললো,—না, না, আম্মা ! রান্না করার কোন দরকার নেই। তুই হানিফকে নিয়ে কিছু মেওয়া আহার করে জলপান করে নে। আমার কোন খানাপিনার তাড়া নেই।

আশনাই এবার কোমলস্বরে বললো,—বেটা লুতুফ নসীবে যা ছিল তাতো হয়েছে। তার জন্যে নিজের জানকে কষ্ট দেওয়া কি অন্যায় [illegible] !

হঠাৎ লুতুফ পাগলের মত ক্ষিপ্ত হয়ে চিৎকার করে উঠল,—তুই কি আমাকে পাথর মনে করেছিস্ ? কি ভেবেছিস্ [illegible]রা ? একটি লড়কী আমাদেরই

অসাবধানে হারিয়ে গেল, আর আমরা তার জন্যে কোন শোক না করে খানাপিনায় দেহ সুস্থ করবো ? না, না, না তোরা যদি তাকে ভুলে আনন্দ করতে পারিস, আমি পারবো না। আমি তার কোন কিছুই ভুলতে পারবো না। তার মহব্বত যখন আমাকে সুখ দিয়েছে, তার অন্তর্ধান আমার দেহ দগ্ধ করছে।

তারপর হঠাৎ কেমন যেন শোক সংবরণ করতে না পেরে পাগলের মত উন্মত্ত হয়ে নিজেকে রোধ করতে করতে লুতুফ ছুটে মরূদ্যানের দিকে চলে গেল।

নিবিড় অন্ধকারের প্রতিচ্ছায়া তখন অদৃশ্য হয় নি। আসমানে নক্ষত্রের উঁকিঝুঁকি। তবে তার রোশনাই প্রকৃতিতে আলোকিত করেনি। অন্ধকার তখনও নিবিড়।

সেই অন্ধকারের মধ্যেই লুতুফ নিজেকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে মরূদ্যানের জলাশয়ের মধ্যে গিয়ে মুখ লুকোল। কালো জলের দর্পনে নিজের অন্ধকার ছায়াটা দেখে সে কিছু ভাবতে চাইলো কিন্তু যখন কোন ভাবনাই এল না বরং চোখে নোনা-জল গিয়ে জলকুন্ডে মিশলো তখন সে দু'হাত ভরে ঠান্ডা জল মুখে চোখে দিয়ে শান্ত হতে চাইলো।

দুটো চোখ দিয়ে যেন কিসের জ্বালা। জ্বালা, জ্বালা, জ্বালা। দু'চোখ কেন দু'কান, নাক, মুখ, দেহের সমস্ত শিরা উপশিরায় যেন কি এক যন্ত্রণা! কি যে অনুভূতি যে উপলব্ধি না করেছে সে বুঝবে না। মুখেচোখে বহুক্ষণ ধরে বহু জলের ঝাপটা দিয়ে সমস্ত দেহ জলের স্পর্শে সিক্ত করলো, তারপর সে মরূদ্যানের ধারে কিছুক্ষণ বসে থাকলো।

তাতেও যখন ফতুমার দুঃখ এতটুকু উপশম হল না, উত্তরোত্তর বেড়েই চললো তখন লুতুফ উঠে দাঁড়ালো। মনে মনে ঠিক করলো এই জায়গাটায় থাকলেই তার শোক আরও বৃদ্ধি পাবে। ফতুমার স্মৃতি পশ্চাতের ঐ দীর্ঘ পর্বতমালার মধ্যে। সুতরাং এ জায়গা ছেড়ে গেলেই সে তার হৃতশক্তি আবার ফিরে পাবে। এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই লুতুফ স্বস্থানে ফিরলো এবং কালবিলম্ব না করে উটের পিঠে আম্মা ও বেটাকে সওয়ার করে নিজে উঠে বসলো।

সেই আঁধার পথে সম্মুখের সেই সীমাহীন বালুকাময় মরুভূমি আবার সে পার হতে লাগলো। শুধু পথ, আর পথ। বালি আর বালি। আর অন্ধকার তরল হতে হতে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

আবার আলোর মালায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হল। তিনটি প্রাণী সেই জনমান-হীন, পশুপক্ষীহীন পথে এগিয়ে চললো। শুধু বিস্তৃত পথ পরিক্রমা। আর কিছু নয়। লক্ষ্য হিন্দুস্তানের স্নিগ্ধ মাটি। সোনার দেশে পৌছনোর বাসনা।

কিন্তু নির্বিঘ্নে পৌছনোর যে অদম্য আশা লুতুফের মধ্যে ছিল এখন আর তা নেই। এখন যেন সব হারিয়ে কিছু পাওয়ার জন্যে তার উৎসাহ নেই। যেতে হবে বলেই যাচ্ছে। খাবার তার আর কোন ইচ্ছা নেই। ফতুমা চলে গেছে। আব্বাজান চলে গেছে। দুটি রক্ষীকে প্রহরায় নিযুক্ত করবার জন্যে সঙ্গী করেছিল,

তারাও বেইমানী করে চলে গেছে। অবশিষ্ট আছে, আম্মা আর তার বেটা। তারা আর আছে কেন? তারা গেলেই তো লুতুফ নিশ্চিন্ত হতে পারে! শেষকালে সে একা গিয়ে হিন্দুস্থানে পেঁছিবে। কোন সুলতান বাদশাহের সেনাবাহিনীতে চাকরি নেবে। আসবে দৌলত, হবে প্রাসাদ, মিলবে অনেক সৌভাগ্য। চাই কি ফতুমার চেয়ে খুবসুরত আওরতও মিলবে!

কিন্তু সে সময় লুতুফের এসব কথা কিছুই মনে আসছিল না। স্বার্থপর হতে তার মন সায় দিচ্ছিল না। শুধু ফতুমার কমনীয় মুখখানি, তার কোকিলের মত অমৃতময় সুধাকণ্ঠের ধ্বনি, তার সোহাগরঞ্জিত দু'বাহুর আলিঙ্গন, তার ঝরণা ধারার মত সংগীতময় হাস্যধ্বনি—এইসব তার বার বার মনে পড়ছিল।

কেউ জানে না, আজ এই উন্মুক্ত স্থানে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বীকার করতে বাধা নেই। ফতুমার জন্যেই সে এই আরব ত্যাগ করেছিল। ফতুমা কখনও তার অনাহারের কষ্ট প্রকাশ করতো না কিন্তু লুতুফ আলি কেমন যেন অনুভব করতো পেয়ারী জোরুর বেদনা। তাই রাত্রিবেলা শয্যাগ্রহণ করে তার দেহস্পর্শ করতে সংকোচ বোধ হত। 'যাকে আহার দিতে পারি না, বসন দিতে পারি না, তার দেহ গ্রহণ করবো?'

ফতুমা বুঝতে পারতো স্বামীর সঙ্কোচ। নিজেকে স্বামীর দেহের সঙ্গে জড়িয়ে নিবিড় করে তাকে সুখ দান করতো। ফিস ফিস করে বলতো,—মিঞা, সংকোচ কেন? মেহেরবান খোদা তোমাকে আমার মরদ নির্বাচন করেছে, আমি তোমার। সমস্ত চাহিদার বিনিময়ে তুমি আমার যৌবনের সোহাগ গ্রহণ কর।

লুতুফ আলি তাতেই কৃতার্থ হয়ে যেত।

আর সেই তো তার ভালবাসা! সেই তো তার মহব্বত! আর সেই ফতুমা কখনও তাকে অবহেলা করে, গোসায় গুনাহ সৃষ্টি করতে পারে?

আরও কত কথা, কত ইতিহাস। অতীতের কত সুন্দর সুন্দর স্মৃতি ভাবতে ভাবতে লুতুফ আলি পথ চলতে লাগলো। সঙ্গে যে তার আম্মা ও বেটা হানিফ আছে, তা তার মনেই থাকলো না।

কখন ভোর হয়েছে, আবার রাত্রি বিদায় নিয়ে দিন এসেছে, এসব কিছুই সে জানে না। যদি হিন্দুস্তানের ভোর হত তাহলে পাখি ডাকলে, চিল উড়লে, মানুষের কলগুঞ্জনে ভোরের বাতাস মুখরিত হলে, গাছের শুকনো পাতার মর্মরধ্বনিতে তার চেতনা ফিরতো কিন্তু এ মরুপ্রান্তর। নিঃশব্দে প্রকৃতি তার কার্য করে যাচ্ছে। এখানে পাখিও নেই। শুকনো পাতার মর্মরধ্বনিও নেই। আর মানুষের কলগুঞ্জন তো দুরাশা। তাই ভোর হবার পরও অনেকক্ষণ লুতুফের চেতনা সঞ্চার হল না। উট ছুটে চলছিল। আম্মা ও লড়কা সেই উটের পিঠেই মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তাদের আর চিন্তা কি? যত চিন্তা সব লুতুফের। হারিয়েছে কার সবচেয়ে বেশী? লুতুফ আলির। তাই লুতুফ আলির নিথর চক্ষু সম্মুখ পথে থাকলেও তার দৃষ্টি সম্মুখ পথে ছিল না। দৃষ্টি মেলা ছিল অন্তর্গভীরে। মনের তলে ডুবুরি হয়ে

আশ্রয় খোঁজা ছাড়া তার তখন কোনই চিন্তা ছিল না।

ঠিক এমনি সময়ে অশ্ব ছুটে আসার সঙ্কেত তার কানে আসলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত চেতনা সজাগ ও তীক্ষ্ন হয়ে উঠলো।

কে ? কে ?

পিছনদিকে সন্দিগধ হয়ে আগ্রহভরে তাকালো। দেখতে পেল দূরে থেকে একটি অশ্বারোহী ছুটে আসছে। কিন্তু কে সে বোঝা যাচ্ছে না। এমন কি কোন শত্রু কি না, তাও অনুমিত হচ্ছে না। শুধু একটি বিন্দুর মত একটি চলমান বস্তু ছুটে আসছে বালির ধুলো উড়িয়ে। সেই ভোরের আলোতেই কেমন যেন ধুলোর ঝটিকা আসমান ঘোলাটে করলো।

শত্রু হলে আবার বিপদ। আবার রক্তারক্তি। আবার হানাহানি চলবে। লুতুফ আলি উটের চলা থামিয়ে কোমর থেকে ছোরা বের করলো।

অশ্বারোহী দারুণ বেগে ছুটে আসছে। যেন একটি ক্ষিপ্ত হস্তী দুনিয়া লয় করবে বলে ধাবিত হয়েছে প্রচন্ড বিক্রমে। আরও কাছে অশ্ব এগিয়ে এল।

লুতুফ চিনতে পারল অশ্বারোহীকে। কে ? কে ? লুতুফের কন্ঠচিরে মহা বিস্ময়ের অস্বাভাবিক ধ্বনি বাইরে বেরিয়ে এল। না, ভুল নয়। তার বাপজান। তার পিয়ারী আব্বা ইস্রায়িল হালিম আলি খাঁ বাহাদুর।

লুতুফ চিৎকার করে আবেগজড়িত স্বরে ডাকলো,- আ—ব্বা !

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল—বে-টা লু-তু-ফ !

আরও যখন কাছে অশ্ব এসে পৌঁছলো, তখন সব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। কিন্তু একি ? একি স্বপ্ন ! মনে হচ্ছে একটি আওরতের দেহ আব্বার অশ্বপৃষ্ঠে। তবে এ কে ? যদি তার অনুমান ঠিক হয়, তাহলে আব্বা তাকে কোথায় পেল ?

অনেক প্রশ্ন, অনেক জিজ্ঞাসা সেই মুহূর্তে লুতুফের মনে ভিড় করে এল।

কিন্তু ইস্রায়িল আলি কাছে আসতেই, অশ্বপৃষ্ঠে তাকিয়ে লুতুফ বোকা হয়ে গেল। হ্যাঁ, সেই শরীর, সেই চুল, সেই সুন্দর শুভ্র মোলায়েম গাত্রবর্ণ, সেই পায়ের পাতা, পায়ের আঙুল, সেই হাঁটু, সেই নিতম্ব, সেই কোমর। মুখখানি শুধু দেখা যাচ্ছিল না, অনুমান করে নিল লুতুফ। অশ্বের ওপর ফতুমা শায়িত ছিল। তার নগ্ন দেহের ওপর ছিল ইস্রায়িলের চামড়ার আবরণী। বাতাসে স্থানচ্যুত হয়ে অনেক অংশ উন্মুক্ত করেছিল। সেইজন্যে লুতুফের দেখায় কোন কষ্ট হল না।

ইস্রায়িল আরো কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে বালিভূমে নেমে হঠাৎ অস্বাভাবিক চিৎকার করে বললো,—নে তোর জোরু নে। দিয়েছিলাম আব্বাসের বেটিকে বড় আদর করে তোর হাতে তুলে। তুই তাকে বাঁচাতে পারলি না। তুই তার ইজ্জত রক্ষা করতে পারলি না বেটা। তার কোরবানী হয়ে গেল। ঘরের লক্ষ্মী পথে এসে মান দিল তোরেই খামখেয়ালীর জন্যে। নে এবার কি করবি কর !

লুতুফ শুধু অর্থহীন চোখে বোবার মত বললে,—সে কি মারা গেছে ?

মারা গেলে তাকে আর এত দূর নিয়ে আসতাম না। ওখানেই ঐ পাহাড়ের

গুহাতেই তার কবর দিতাম। মৃত্যুর চেয়ে আওরতের যে সম্মান, সেই সম্মান তার গেছে। আমি সেই শয়তানকে শেষ করেছি কিন্তু জ্বালা মেটেনি। আরো, আরো প্রতিহিংসা আমার শিরায় শিরায় প্রজ্বলনশক্তি জাগিয়েছে।

ইস্রায়িল আর কথা বলতে পারলো না, চোখদুটোয় হাত চাপা দিয়ে টলতে টলতে কিছুদূর হেটে গিয়ে পিছন ফিরে বালির ওপর থেবড়ে বসে পড়লো।

লুতুফের তখন জিজ্ঞাসা অনেক। কিন্তু কে উত্তর দেবে? শুধু তার চোখ দুটো সেই অশ্বপৃষ্ঠে অচৈতন্য ফতুমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। এখন সে কি করবে? ফতুমার জ্ঞান ফেরাবে? ফতুমার নগ্নশরীর বসনাবরিত করবে? কি করবে? ফতুমার জ্ঞান ফিরে যখন তাকে দেখবে কি বলবে? সে কি ঘৃণা করবে! এমন মরদ তার জীবনে এসেছিল যে আওরতের সম্ভ্রম বাঁচাতে পারে না।

আশনাই হঠাৎ গায়ে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বললো,—বেটা, যা হবার সে তো হয়ে গেছে। ফতুমাকে অশ্বপিঠ থেকে নামিয়ে সুস্থ কর। আমি ওর কামিজ এনেছি হাতে করে। এই বলে সে লুতুফের হাতে কামিজ গুঁজে দিল।

লুতুফ কামিজ হাতে ফতুমার দিকে এগিয়ে গেল।

আর ঠিক সেইমুহূর্তে ফতুমা অন্যকথা ভাবছিল। শ্বশুর ও স্বামীর সব কথাই তার কানে গেছে। জ্ঞান তার এখন ফেরেনি, ফিরেছে শেষরাত্রে ইস্রায়িলের চলন্ত অশ্বপৃষ্ঠে। কিন্তু চোখ চেয়েই শ্বশুরের দিকে চোখ পড়তে আবার তাকে চোখ বন্ধ করতে হয়েছে। খানিকটা নিশ্চিন্ত। অন্তত প্রাণের আশঙ্কা নেই। কিন্তু এ প্রাণ রেখে কি হবে? আওরতের যা সম্মান, সেই সম্মান তো তার দুর্বৃত্ত কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে। এখন দয়ার ওপর নির্ভর। অনুগ্রহের ওপর জীবন। স্বামী ভালবাসতে গেলেই হয়তো সেই কথা স্মরণ করে পিছিয়ে যাবে। আর সেও নিবিড় করে স্বামীকে সঁপে দিতে পারবে না তার যৌবন। তার মনেও কাঁটা বিঁধবে।

কিন্তু এর জন্যে দায়ী কে? সে নিজে! জ্ঞান হবার পর তার মনে হয়েছিল, অশ্ব থেকে আছড়ে পরে নিজের জীবন আহুতি দেয়। কিন্তু তার ঐ কথা মনে হতেই সে প্রাণকে বাঁচিয়েছে। তাই লজ্জাকে ঢাকবার জন্যে নিজের নগ্নদেহের ওপর শ্বশুরের চামড়ার আবরণী সন্তর্পণে টেনে দিয়েছিল। শ্বশুর জানতেও পারেনি, তার জ্ঞান ফিরেছে। শ্বশুর জানতে পারলে তিনি লজ্জা পাবেন, এই ভেবেই সে অসার হয়ে থেকেছে। আর নগ্ন হয়ে থাকার লজ্জা থাকলো কোথায়? এখন তো সে বেওয়ারিশ সম্ভোগের ইচ্ছায় একটি বহুভোগ্য রমণী।

এইসব কথা যখন সে ভাবছে, লতুফ এসে তাকে কোলে করে নিচে নামালো। নামাবার সময় তাকে অতি আদরে একটি চুম্বন দান করে বালির ওপর শোয়ালো।

প্রকৃতি তখন নব সাজে সেজেছে। সূর্য তাপের ভান্ড নিয়ে পলে পলে তাপ বর্ধিত করেছে।

লুতুফ ত্বরিতপদে উষ্ট্রপৃষ্ঠে থেকে জলের ভান্ড নিয়ে এসে ফতুমার মুখে, চোখে সারা শরীরে জল প্রয়োগ করলো। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলো,—পিয়ারী ফতুমা,

মেরী ফতু।

ফতুমা জেগেই ছিল, শুধু চোখ দুটি বুজে ছিল। এবার চোখ মেলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললো,আমি জেগেই আছি। তারপর বললো,—আ ওর ত যদি [illegible] সহজে মরতো, তাহলে দুনিয়ার চেহারা বদলাতো।

ফতুমা, ফতুমাতুই অমন কথা বলিস্ না! আমার পৌরুষে [illegible] আমি তোর দুর্বল স্বামী। তোকে রক্ষা করতে পারি নি! তুই আমাকে ক্ষমা কর! লুতুফ কেমন যেন ফতুমার কাছে প্রার্থনার স্বরে নিজের আকুলতা প্রকাশ করলো।

ফতুমা বললো,তোমাকে আমি না হয় ক্ষমা করলাম কিন্তু আমাকে কে ক্ষমা করবে? আমার এই আওরত ইজ্জত লুণ্ঠিত হল, এর জন্যে দায়ী কে? তুমি কি আমার এই কোরবানী মেনে নেবে? আমাকে গ্রহণ করার সময় কি তোমার মনে কাঁটার মত কিছু বিঁধবে না!

না, না বিশ্বাস কর—ফতুমা তোকে ফিরে পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট। আর কোন জিজ্ঞাসা আমার মনের তলে চাপা নেই! আমি আর কোন কৈফিয়ত তলব করবো না! তুই আমার সেই পিয়ারী জোরু, তাই আছিস্।

তোমার মহানুভবতা। কিন্তু আমি কি ভুলতে পারবো? আমি কি আগের মত জোরুর ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবো? আমি যে একটি মুহূর্তে হারিয়ে গেলাম। আমি যে নষ্টা!

ফতুমা কাঁদতে লাগলো! ফতুমার দুই চোখের কোল বেয়ে অবরুদ্ধ অশ্রু নেমে চললো। সুন্দর গন্ড দুটি একরাত্রে কত পাণ্ডুর হয়ে গেছে। মনে হয় এক চুমুকে কেউ রক্ত শুষে নিয়েছে।

লুতুফ নিজের জ্বালাতেই কেমন যেন ছটফট করছিল। ফতুমার কান্নায় আরো কেমন যেন তলিয়ে গিয়ে কাতর হয়ে বললো,—ফতুমা রোনা মৎ। যা হবার সে তো হয়েছে। এখন কামিজ পরে খানাপিনা করে সুস্থ হও।

ফতুমা বালির ওপরেই শুয়েছিল। তখনও ছিল শ্বশুরের চর্ম আবরণীটা তার দেহের ওপর ঢাকা! উঠে বসে স্বামীর হাত থেকে পোশাক নিয়ে সে পরে ফেললো। অবিন্যস্ত চুলগুলি গুছিয়ে নিয়ে আবার সহজ মানুষ হবার চেষ্টা করলো কিন্তু চারিদিকে তাকিয়ে কেমন যেন নিজেকে আবার অসহায় মনে করলো। মনে করে আবার ক্রন্দভারে ভেঙে পড়ে মাটিতে বসে পড়লো।

শ্বশুর ও শাশুড়ী দূরে উপবিষ্ট। তারা যেন নিম্নস্বরে কি আলাপন করছে। মনে হচ্ছে যেন তারই বিষয়। হানিফটা অবাক হয়ে দূর থেকে তার আম্মাকে দেখছে। বুঝতে পারছে না কিছু। অবাক লাগছে তার। আম্মা তার এতদূরে কেন তার বোধগম্য হচ্ছে না। তাই নানীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এপাশে অভিমানী চোখে তাকিয়ে আছে।

এইসব দেখেই আবার সে বসে পড়লো।

হঠাৎ দূরে থেকে ইস্রায়িল চিৎকার করে বললো,—বেটা লুতুফ, সেমোম ঝটিকা আসার সম্ভাবনা। চেয়ে দেখ্ আসমান জমিনের পূর্বদিকে লোহিতাভার চিহ্ন। বাতাসেও সেই পরিচিত গন্ধ।

আসুক, আসুক যা আসে আসুক। দুনিয়া লয় হয়ে যাক্। বাঁচবার তার আর আকাঙ্ক্ষা নেই। বাঁচবার তার আর আগ্রহ নেই। সব ধ্বংস হয়ে যাক্। এই পরিবারের সমস্তগুলি প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক্। যে আশা তার ছিল, যে আগ্রহ তাকে এতদূর এনেছিল—আজ সব শেষ।

তার পৌরুষবীর্য আজ কলঙ্কিত হয়েছে। সে তার জোরুকে বাঁচাতে পারেনি। তারই জন্যে জোরুর ইজ্জত গেছে। তারই অসাবধানতায় এত বড় অন্যায় সাধিত হয়েছে। আজ তার বেঁচে থেকে লাভ কি? তাই আসুক ঝড়, আসুক তুফান—কোন ভয় নেই। দুনিয়া লয় হয়ে গেলে তারাও লয় হয়ে যাবে। সেই ভাল হবে। সেই শান্তি হবে। সেই সান্ত্বনা।

লুতুফ বিবশচোখে তাকিয়ে দেখলো। মরু শয়তানের ঝটিকা পূর্বকোণ থেকে লোহিতাভা নিয়ে আসছে। এই ঝটিকার কবলে পড়লে আর পরিত্রাণ নেই। আর মুক্তি নেই মৃত্যুর হাত থেকে। অন্যসময়ে হলে হয়তো লুতুফ আতঙ্কিত হত কিন্তু এ সময় সে নিস্পৃহ হয়ে বিবশ চোখে তাকিয়ে থাকলো।

মুহূর্তে মুহূর্তে উত্তাপ বেড়ে চললো! যেন বিরাট এক অগ্নিভান্ড জ্বালিয়ে কে যেন সমস্ত প্রকৃতিকে উত্তপ্ত করতে লাগলো। সূর্যের তাপের প্রভাবে উষ্ণতা সীমাহীন হয়ে উঠেছিল হঠাৎ এই লু-এর মত ঝটিকা বাতাস বয়ে মুহূর্তে মরুভূমির সেই উন্মুক্ত প্রান্তরকে ভয়াবহ ও বিভীষিকাময় করে তুললো।

রমণীরা চিৎকার করে উঠলো। রমণী বলতে আশনাই ও ফতুমা। আশনাই দেহের ওপর কেমন যেন চর্মগুলি দগ্ধ হচ্ছে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো। ফতুমা কিছু সময় চুপ করেছিল কিন্তু সেও আর পারলো না, তারও শরীরের চর্ম দগ্ধ হতে লাগলো, তখন সে পাগলের মত সবকিছু ছেড়ে দিয়ে নিজে ছটফট করে উঠলো।

লুতুফ তখনও সেই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে।

কিন্তু ইস্রায়িল দাঁড়িয়েছিল না।

আসমান যত লোহিতাভা ধারণ করতে লাগলো, উত্তাপ যত বাড়তে লাগলো, ঝটিকার প্রবলতা যত দ্রুত হল—ইস্রায়িল তত ক্ষিপ্ত হতে লাগলো।

সে চিৎকার করে বলতে লাগলো—আর পরিত্রাণ নেই। এবার সমস্ত দেহগুলি পচে স্ফীত হয়ে এই মরুপ্রান্তরের বালিতে চিরশয্যা গ্রহণ করবে। তখনই বলেছিলাম, ভয়ংকর এই মরুভূমি কখনও জীবিতাবস্থায় পথ পরিক্রমা করতে দেবে না। প্রাণ তাকে দিতেই হবে। রাক্ষুসীর মত এর ক্ষুধার শেষ নেই। এর বিরাট বড় হাঁ।

ইস্রায়িলের কথা আর শেষ হল না। সমুদ্রের মত গর্জন উত্থিত হল। কিছু-দূরে মরুভূমির সমস্ত বালুকা নিয়ে এক বিরাট দৈত্য কেশর ফুলিয়ে ছুটে আসতে

লাগলো।

হঠাৎ লুতুফের চেতনা ফিরলো আব্বার কান্ড দেখে। যে দিক দিয়ে ঝটিকা প্রবাহ বেগে অগ্নি ও গন্ধক সহযোগে ছুটে আসছিল, আব্বা সেইদিকে ছুটে চললো।

লুতুফ আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে উঠলো,—আব্বা, এ তুই কি করছিস্? ফিরে আয়, যাসনি। আমরা রয়েছি তুই কেন মরছিস্? চলে আয়।

কিন্তু ইস্রায়িলের কানে বোধহয় লুতুফ আলির চিৎকার পেঁছিলো না। সে দূরে ঝটিকার দিকে গেল পাগলের মত।

আর তাই দেখে আশনাই স্বামীকে বাঁচাবার জন্যে বা নিজে সহমরণে যাবার জন্যে ছুটলো স্বামীর পিছু পিছু।

ফতুমা হানিফকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে শুয়ে পড়ে চিৎকার করে উঠলো,—ওগো ওদের বাঁচাও। ওরা যে মৃত্যুর পথেই ছুটে চললো।

তখন ঝটিকা দারুণ বেগে বইতে শুরু করেছে। লুতুফ আলি নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ফতুমার কাছে এসে মাটিতে শুয়ে পড়লো।

এই উত্তপ্ত সেমৌম ঝটিকা লু-এর মত একটু ওপর দিকে বয়, তাই মাটিতে শুয়ে পড়লে অন্তত মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

ঝটিকা অসহনীয় গর্জন করে আগুনের শিখা নিয়ে পাগলের মত বইতে লাগলো, আর এরা তিনজন বালির ওপর শুয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো।

তখন ইস্রায়িল আর আশনাইয়ের কোন খোঁজ নেই।

আব্বা হঠাৎ এমনটি করবে লুতুফ আলি যেন পূর্ব থেকেই বুঝতে পেরেছিল। যখন সে তার জোরুর সঙ্গে মান অভিমানের অভিনয় করছিল, যখন তার নিজস্ব পৌরুষের মানদন্ড নিয়ে বিচার করছিল, দুর্বল হয়ে উঠেছিল ফতুমার আঘাতে—তখন তার কানে এসেছিল আব্বা ইস্রায়িলের বিক্ষিপ্ত কথাবার্তা। সে আম্মার সঙ্গে বার্তাচিত করছিল বটে কিন্তু কেমন যেন সমস্ত দুনিয়ার ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে গর্জন করছিল। তার কিছু কিছু ছিন্ন টুকরো লুতুফের কানে পেঁাচেছিল। তাতেই সে ভীত ছিল, আব্বা হয়তো এবার এমন কিছু কান্ড করবে, যা মৃত্যুরই সমান।

তারপরেই ইস্রায়িল চিৎকার করে লুতুফকে সতর্ক করলো—'সেমৌম ঝটিকা আসার সম্ভাবনা।'

কিন্তু তখন লুতুফ নিজের সত্তা হারিয়েছে। ফতুমার আঘাতে নয় নিজের অক্ষমতায় নিজেই আহত। তাই বিবশ অনুভূতি নিয়ে সে সমস্ত উপলব্ধির ঊর্ধ্বে উঠেছিল।

অবশ্য ইস্রায়িল হঠাৎ নিজের জীবন উৎসর্গ করবে, সে কথাও সে ঝটিকা আসার আগে ভাবে নি। মন তার খারাপ হয়েছিল সত্যি কথা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। আব্বাসের বেটির এই শোচনীয় পরিণামে তার মন কিছু করতে চাইছিল। ইচ্ছে করছিল তার নিজের একটি হাতই কেটে ফেলতে। সে

এখনও কেন বেঁচে আছে এই কথাই সে সহস্রবার ভাবছিল।

সবই সে সহ্য করতে পারছিল কিন্তু বেটার জিম্মায় ফতুমাকে ছেড়ে দিয়ে যখন সে লজ্জায় পিছন করে দূরে গিয়ে বসলো হঠাৎ কোমরের যন্ত্রণাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল—'আমি—আবার এসেছি।' আর সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

সেই সময় আশনাই এসে স্বামীকে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে ইস্রায়িল ক্রুদ্ধ হয়ে বললো,—বেটার সাথে ষড়যন্ত্র করে দিলি লড়কীটার সর্বনাশ করে?

আশনাই বিস্ময়ে বললো,—আমি? আমি বেটার সাথে ষড়যন্ত্র করে ফতুমার সর্বনাশ করলাম?

তা ছাড়া আবার কি? তোরা মা-বেটা দুটোই শয়তান। তোদের কাছ থেকে যখন সে লুঠ্ হল, তখন দায়ী তোরা দুজনেই।

আশনাই ক্রন্দন করে বললো,—আমি তো তখন ঘুমিয়েছিলাম।

ইস্রায়িল মুখ বিকৃত করে বললো,—সে ঘুম তোর ভাঙলো কেন? চিরদিনের মত তো ঘুমোতে পারতিস্!

আশনাই কাঁদতে কাঁদতে আকুল হয়ে বললো,—তুমি এসব কি বলছো গো? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?

এই সময় সেমোম ঝটিকার পূর্বাভাস আসমানে দেখা গেল। সমস্ত দিগন্ত আচ্ছাদিত করে লোহিত বর্ণের ভয়ংকর আভা প্রচারিত হয়ে উঠল।

ইস্রায়িল দেখলো আরব দেশের সেই মৃত্যু ঝটিকার সংকেত এসে পড়েছে। এই বিশ্রী অস্বাভাবিক ঝটিকায় নিজের প্রাণ বাঁচাতে গেলে অনেক কৌশল করতে হয়। না করলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু তার হঠাৎ মৃত্যুকে বড় ভাল লেগে গেল। কোমরের যন্ত্রণাটা আস্তে আস্তে বেড়ে উঠেছে, দেহের শক্তিও কেমন যেন শ্লথ। আর অশ্বপৃষ্ঠে উঠে লাগাম ধরতে পারবে কিনা সন্দেহ হয়। এই অবস্থায় বেঁচে থাকাই তো পাপ। আবার পরমুখাপেক্ষী হয়ে তাকে থাকতে হবে?

এছাড়াও তার মৃত্যুর আর একটি কারণ ছিল—আব্বাসের বেটির এই অবস্থা। ফতুমাকে বড় পেয়ার করতো ইস্রায়িল। নিজের বেটি ছিল না বলে বেটির অভাব সে ফতুমার মধ্যে দিয়ে পূরণ করেছিল। কেউ জানে না, আব্বাস যখন বেটিকে কবর দিতে চেয়েছিল, কেন ইস্রায়িল সেদিন ঐরকম প্রতিজ্ঞা করেছিল। আর নিজের বেটার সঙ্গে শাদী দেওয়া শুধু আব্বাসের বেটির সম্মান রক্ষার জন্যে। না হলে আইনত তার ধরে রাখার অধিকার নেই বলে ঐ কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। এসব গোপন তথ্য কে জানতো? কে জানতো এই কন্যা-স্নেহের ফল্গুধারা কোথায় প্রবাহিত?

তাই ফতুমার সর্বনাশে ইস্রায়িলেরই লেগেছিল বেশী। অন্তত ইস্রায়িল তাই মনে করে।

তবু মৃত্যুর কথা সেজন্যে ইস্রায়িল ভাবে নি। অবশ্য আরব ছাড়বার পূর্ব

থেকেই সে বিক্ষিপ্ত। মন তার এলোমেলো। তার যেন মনে হচ্ছিল এ যাত্রায় সুফল হবে না। সর্বনাশ মুখোমুখি। একে মরুভূমি পার হবার কথা মনে এলেই জিবের তালু শুকিয়ে যায়। মরুভূমি আরববাসীর যেন মৃত্যু। মৃত্যুর কথাই বার বার মনে এসে যায়। তাই প্রথম গর্দভটি প্রাণত্যাগ করতে ইস্রায়িল সেই মৃত্যুর ভয়াবহতাই দেখেছিল। আর সেইজন্যে সে শক্তি পেয়ে পালিয়েছিল দল ছেড়ে।

ফতুমার সর্বনাশে তার একই উপলব্ধি জেগেছিল। কিন্তু কি করলে তার মন শান্ত হবে ভেবে পায় নি। তার অশান্ত মন নিয়ে নিজের জোরুকেই দোষারূপ করেছিল।

তারপর হঠাৎ সে সেই ভয়ঙ্কর ঝটিকা দেখতে পেল। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, তাকে চায় ঐ ক্ষুব্ধ সেমোম ঝটিকা। যেন মৃত্যুদূত এসে ধূসরবর্ণ আকৃতি নিয়ে তাকে হাতছানি দিল। আর চিন্তা নয়, আর সংশয় নয়—অগ্নিবৎ সেই সেমোম ঝটিকা তেড়ে আসার আগেই সে গিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলো।

তারপরের ইতিহাস আরো পরের। কারণ সেই ঝটিকা আটচল্লিশ ঘন্টার আগে চলে গেল না।

আশনাই কেন মরলো? তার মনে কি বেদনা জাগলো?

আশনাই মরলো স্বামীর জন্যে। সে দেখলো স্বামী ছাড়া এই দুনিয়াতে তার বাসস্থান নেই। আগে যখন ইস্রায়িল তাকে ছেড়ে পালিয়েছিল, তখন সে বুঝতে পেরেছিল সে স্বামীছাড়া কত অসহায়া। পুত্রের কাছে তার কোন মূল্য নেই। স্বামীর কাছে সে আবদার করতে পারে, অভিমান করতে পারে, এমন কি স্বামী অবহেলা করলে কৈফিয়ত তলব করতে পারে কিন্তু পুত্রের কাছে সে কিছুই করতে পারে না, উপরন্তু পুত্রের অবহেলা তাকে বড় আঘাত করে। সেইজন্যে স্বামী মৃত্যুর পথে ছুটলে তাকে নিষেধ করবার জন্যে আশনাই এগিয়ে গিয়েছিল। মরতে হয়তো তার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু স্বামীর সঙ্গে মরতে পেয়ে তার কোন দুঃখ ছিল না।

অবশ্য এ সবই অনুমান।

আটচল্লিশ ঘন্টার পর যখন ঝটিকা অপসারিত হয়ে গেল তখন আবার সেই রাত্রিই এসে হাজির হল।

এই আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে মৃত্যুর মুখোমুখি থেকে বালির ওপর শুয়ে থাকা কী নিদারুণ—তা একমাত্র যে এই অবস্থায় পড়েছে সেই বুঝতে পারবে। অন্তত অন্যদেশের লোক আরবের এই মরু অঞ্চলের ঝটিকার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারবে না। সবসময়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে পথ চলতে হয়। মানুষ এই মরুঅঞ্চলে মৃত্যুরই সম্মুখে কম্পিত হয়ে অপেক্ষা করে। শুধু মানুষ কেন পশুর অবস্থাও একই।

লুতুফ প্রথমেই উঠে দেখলো, আবাজান যে ঘোড়াটিতে সওয়ার হয়ে এসেছিল সেটি বীভৎস দুর্গন্ধময় আকৃতি নিয়ে মরে পড়ে আছে। তার এমন চেহারা

হয়েছে, যা দেখে ফতুমা আঁতকে চিৎকার করে উঠলো।

ঘোড়ার দেহের মাংসগুলি উত্তাপে ঝলসে গিয়ে পচে গলে গলে পড়ে গেছে। শুধু কঙ্কালসার হাড়গুলি তাকিয়ে আছে বীভৎসতার ভয়াবহ সৃষ্টি করে। যেমন শুভ্র দাঁতগুলি বের করে ভয় দেখালে হয়, তেমনি ভয়াবহতা।

উটটি শুধু বেঁচে আছে কিন্তু সে মরুভূমির পশু বলে সে অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় আত্মরক্ষা করেছে। পাগুলি ওপর দিক করে শুয়েছিল, লুতুফেরা কাছে যেতে সে উঠে দাঁড়ালো। উটটি বেঁচে আছে দেখে লুতুফ আবার যাত্রা করতে পারবে বলে মনে মনে খুশি হল।

তারপর আব্বা ও আম্মার মৃতদেহ।

সেদিনও চাঁদ উঠেছিল আসমানে। সেই অঞ্চলের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ মুখর করেছিল আলোর মালায়। সেই আলোতে চতুর্দিক স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

লুতুফ-ফতুমাও হানিফকে নিয়ে এগিয়ে চললো।

কিছুদূর এগোনোর পর হঠাৎ ফতুমা লুতুফের হাত চেপে ধরে বললো,—না, তুমি যাও। আমি দেখতে পারবো না তাদের বীভৎস আকৃতি। এই বলে তার চোখের ওপর ভেসে উঠলো ঘোড়াটির বিকৃত চেহারা।

লুতুফ কিছু বললো না, শুধু ফতুমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর অনেক পরে ধরা গলায় বললো,—যাদের এতকাল ভালবেসে এলি, তাদের শেষ একবার দেখবি না!

না, না না আমি পারবো না। তাদের বীভৎস আকৃতি আমার দিল্ ছিঁড়ে নেবে! ফতুমা কেমন যেন আঁতকে চোখে হাত চাপা দিল।

লুতুফ কেমন যেন নাছোড়বান্দা। ফতুমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আবার বললো, —কিন্তু তুই নিশ্চয় জানিস্, বাবার এই মৃত্যু তোরই জন্যে!

আমার জন্যে? পরম বিস্ময়ে ফতুমা চোখ থেকে হাত সরিয়ে লুতুফের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো।

হ্যাঁ, তোরই জন্যে! আমি বুঝতে পেরেছি, আব্বা মৃত্যুবরণ করলো নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে।

একি তুমি বলছো?

ক্লান্তস্বরে লুতুফ বললো,—আমি ঠিকই বলছি ফতুমা! আব্বার স্নেহ ছিল তোর প্রতি অগাধ। তাই সে তোকে বাঁচাতে পারেনি বলে লজ্জায় ঝটিকার মাঝে আত্মসংবরণ করলো।

ফতুমা কান্নায় ভেঙে পড়ে সেখানেই বালির ওপর বসে পড়লো।

একটু সময় অপেক্ষা করে লুতুফ আবার বললো—নে ওঠ্ ফতুমা। যা হবার সে তো হয়ে গেছে। এখন দুজনকে কবর দিয়ে আমরা যাত্রা করি। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো,—জানি না, আর কি নসীবে লেখা আছে!

সে এক হাতে হানিফের হাত ধরে অন্যহাতে কোদালের মত একটি অস্ত্র নিয়ে

এগিয়ে চললো।

ফতুমা আর কি করবে? চোখ মুছতে মুছতে স্বামীকে অনুসরণ করলো।

স্বামী যা বললো,—সেকি সত্যি? তাই যদি হয়, তাহলে তো শ্বশুরের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী! শুধু শ্বশুরের মৃত্যুর জন্যে কেন শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর জন্যেও সে দায়ী। দু দুটো প্রাণ তারই জন্যে চলে গেল।

ফতুমা কেমন যেন আবার ছটফট করতে লাগলো। তার মনে হল, আবেদীন তার ইজ্জত নিয়েছে, তার জন্যে যত না যন্ত্রণা—তার চেয়ে এ যন্ত্রণা যেন আরও বেশী।

হঠাৎ সে ছুটতে ছুটতে লুতুফের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—তাহলে আম্মার মৃত্যুর জন্যে কে দায়ী?

লুতুফ নির্লিপ্তভঙ্গিতে বললো,—সেও ঐ একই ব্যক্তি। আব্বাকে অনুসরণ করে আম্মা প্রাণ দিল। আব্বা যদি না মরতো হয়তো আম্মা এ কাজ করতো না।

ফতুমা নিজের মনেই ফিসফিস করে বললো,—আমি তাহলে এত বড় রাক্ষুসী! দু দুটো জীবনকে নিজেই খুন করলাম!

লুতুফ তখন এক জায়গায় এসে থেমে পড়েছে। সে তাকিয়ে আছে নিথর হয়ে দু'দিকে। দুটি গলিত পিন্ড দুর্গন্ধময় মনুষ্যদেহ একটু ব্যবধানে দু জায়গায় পড়ে আছে। শুধু কঙ্কালসার দেহ, কিছু কিছু মাংসখন্ড শুধু গায়ে লেগে আছে। যেন কে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেহদুটি থেকে মাংস ছাড়িয়ে নিয়েছে। শরীরে কোন বসনের লেশমাত্র নেই। দুটি নগ্ন মৃতদেহ। এমনকি নারী, পুরুষ বলে সনাক্ত করাও মুশকিল। তবে সনাক্ত করা যায় তাদের কঙ্কালের আকৃতি দেখে। একটি ছোট ও একটি বড়।

ফতুমা সেই দেখে চোখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদছিল।

আর লুতুফ আলি পুত্রকে একপাশে দাঁড় করিয়ে সেখানেই বালির ওপর গর্ত খুঁড়তে লাগলো।

অন্ধকার ছিল না বলে চাঁদের আলোয় তাই সব স্পষ্ট। এই সময় যদি দিন হত তাহলে লুতুফ আলিকে নিশ্চিন্তে এই মেহনত করতে হত না। সে পারতো না পিতা মাতার শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে। ঐ অবস্থাতেই তাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে হত।

যা'হোক লুতুফের অনেক পুণ্যের জোর, তাই সে মাতাপিতাকে কবর দিতে পারলো।

অনেকক্ষণ মেহনত করে শেষ পর্যন্ত দুটি গর্ত খোলা হল এবং আব্বা ও আম্মাজানের দুটি বিকৃত কঙ্কাল নিজের হাতে লুতুফ আলি নামিয়ে দিল সেই গর্তের মধ্যে। তারপর আসমানের দিকে ঊর্ধ্বমুখ করে নামাজের ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসে চিৎকার করে বললো,—আব্বাজান, আম্মাজান তোরা বেহেস্তে গিয়ে আমাদের ক্ষমা করিস্। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বললো,—খোদা তোমার কাছে আমার

আব্বাজান ও আম্মাজানকে সঁপে দিলাম, তুমি তাদের দেখো।

তারপর আর লুতুফ আলি অপেক্ষা করলো না। গর্তের মধ্যে বালি ভরে দিয়ে মাথা নীচু করে হানিফের হাত ধরে ফিরে চললো।

ফতুমাও সেখানে দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে যেন কি বললো,—তারপর সেও মাথা নীচু করে স্বামীকে অনুসরণ করলো।

তারপর আবার যাত্রা। আবার বালুকাময় মরুভূমির অসীম প্রান্তর পার হওয়া। আবার সম্মুখ পথে ছুটে চলা।

রাত্রি আবার এগিয়ে চললো। আবার গভীর হয়ে এল। তিনটি প্রাণী সেই উটের পিঠে চেপে আবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে লাগলো। তিনটি নয় দুটি। একটি বাচ্চা আর কি স্বপ্ন দেখবে, সে শুধু কষ্ট হলে কাঁদছে। খিদে পেলে চিৎকার করছে—এইমাত্র। ভাবছে লুতুফ আলি। ভাবছে ফতুমা। এদের ভাবনা এখন অনন্ত।

অনেকদূর চলে আসার পর পিতামাতার বিয়োগ বেদনা মন থেকে মোছবার জন্যে লুতুফ আলি আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। সে মনে মনে বলতে লাগলো—'আমি তো জানতুম, অনেক দুর্ভাগ্য হাতে নিয়ে আরব ত্যাগ করতে হবে। যা ঘটেছে তার জন্যে তো নিজে তৈরী ছিলাম, তবু কেন এই অনুতাপ?' এই সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ফতুমার স্পর্শের অনুভূতি তাকে সজাগ করলো। এবং ফতুমার জন্যে তার দুঃখ হল। নিবিড় করে ফতুমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললো,—হানিফের আম্মা, তুই কিছু খানাপিনা কর। সেই কদিন ধরে একেবারে অনাহারে আছিস্, এরপর যে বেমারী ধরে যাবে!

হঠাৎ স্বামীর এই আচরণে ফতুমার সমস্ত সংযম খসে পড়লো। সে স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে আকুল স্বরে কেঁদে উঠলো।

লুতুফ স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে সান্তনা দিয়ে বললে,—কাঁদিস না। যা ঘটেছে তার জন্যে আল্লাই দায়ী। তুই আমি কে? কাঁদিস না। শোক সংবরণ কর। আমি বরং উটকে থামাই কিছু রান্না করে খানাপিনা কর! এখনও তো অনেক পথ। যখন এখনও বেঁচে আছি, তখন শেষ পর্যন্ত যাতে বেঁচে থেকে হিন্দুস্তানে পৌঁছাই তার মত ব্যবস্থা করতে হবে তো?

লুতুফ উটটিকে থামালো।

তারপর নিজে নেমে ফতুমাকে সস্নেহে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে নামালো।

সেখানে কিছু জ্বালানি দিয়ে আড়াল করে আগুন জ্বাললো, তারপর যবের রুটি বানাতে বসে গেল ফতুমা।

আর এদিকে লুতুফ করলো কি হঠাৎ সেই বালির ওপর একটা তাঁবু খাটিয়ে শয্যার ব্যবস্থা করলো। হেসে ফতুমাকে বললো,—কতরাত্রি ঘুম নেই, আজ একটু ঘুমোবো।

ফতুমার কিন্তু মুখে কোন কথা নেই, সে নিঃশব্দে কর্তব্য করে যেতে লাগলো।

কথা ফুটলো খেতে বসার পর।

লুতুফ বললো,—তোর খানা কই বিবি ?

ফতুমা বললো,—আমি খাব না।

খাবি না কেন ?

আমার খিদে নেই।

পরম আশ্চর্য হয়ে লুতুফ বললো,—তিন চারদিন ধরে অভুক্ত থেকেও খিদে নেই !

না !

তাজ্জব করলি তুই। তারপর ফতুমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,—যা হয়ে গেছে সে কথা ভুলে যা না !

তখন ফতুমা বললো,—ভুলতে পারি কই ? কিছুতে যে ভুলতে পারছি না। আমার জন্যে দুটো মানুষের মৃত্যু হল !

আবার ঐ সব কথা ! লুতুফ কেমন যেন ধমক দিয়ে পরিস্থিতিটা হালকা করতে চাইলো।

ফতুমা চুপ করে থাকলো কিন্তু আহারের জন্যে কোন তোড়জোড় করলো না।

তাই দেখে লুতুফ বললো,—তোরা আওরতেরা বড় একগুঁয়ে।

ফতুমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,—আমরা কি তা আমি জানি না। তবে আমাকে খানাপিনা করার জন্যে কোন কোশিশ কর না। আমি পারবো না। আমার জন্যে দুটি মানুষ আজ কেমন নৃশংসভাবে মৃত্যুকে বরণ করলো—তা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না ! তাদের সেই বীভৎস দগ্ধ কঙ্কালবৎ আকৃতিগুলি বার বার চোখের ওপর ভেসে উঠে আমাকে তক্‌লিফ দিচ্ছে।

লুতুফ একটু চুপ করে থেকে বললো,—তুই এমন করছিস, আঁর আমি যে নিজের হাতে সেই বীভৎস মৃতদেহ দুটি কবরের তলায় নামিয়ে এলাম। কই আমার তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না ! তবে আমি মনকে দৃঢ় করেছি এই বলে যে, পথে যখন বের হয়েছি, তখন এরকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে জেনেই বের হয়েছি। অনেক কিছু হারিয়েই আমাদের এই আরব ত্যাগ করতে হবে। এমন কি আবেদীনের সেই শয়তানীও আমি মেনে নিলাম শুধু এই কথা চিন্তা করে।

ফতুমা স্বামীর শেষোক্ত কথার উত্তরে বললো,—তুমি মরদ আদমী, তুমি যত সহজে সব মেনে নিলে। সহজ করে নিলে যত আবহাওয়া—আওরত তত সহজে মেনে নিতে পারে না বলেই আমার সঙ্গে তোমার এই তফাত।

তারপর ফতুমা বললো,—আর কোন বাতচিত এ সম্বন্ধে কর না। আমি হাজার চেষ্টা করলেও যেমন আবেদীনের সর্বনাশ ভুলতে পারছি না, তেমনি আব্বা ও আম্মাজানের মৃত্যু। সবই পারি, তার জন্যে সময় লাগবে। সেই সময় না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলতে পারছি না।

[আরও পরের খণ্ডে]

সরদানা

লুতুফ স্ত্রীর কথায় আর প্রতিবাদ না করতে পেরে উঠে গেল। যাবার সময় বলে গেল আহার না হয় নাই করলি, শুতে নিশ্চয় কোন বাধা নেই। রাত্রি বোধ হয় শেষ হয়ে এল। আর দেরি করিস্ না, একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার যাত্রা শুরু করতে হবে।

ফতুমা বুঝতে পারলো লুতুফের ইঙ্গিত কিন্তু তার মধ্যে কোন তাড়া এল না। সে আরো নিস্পৃহ, আরো নিরুৎসাহ হয়ে সেইস্থানে বসে থাকলো। শুধু ভাবনা চললো এলোমেলোভাবে মনের মধ্যে। স্বামী যেন হঠাৎ কেমন বদলে গেছে? হঠাৎ যেন পরিবর্তন! বললো—'আমি জানতাম অনেক কিছু দিয়ে তবে এ যাত্রা শেষ করতে হবে। তাই যা গেছে তার জন্যে কোন অনুতাপ নেই।' তাই যদি সত্যি হয়, তবে শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যুর পর তার ওপর কেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো? কেন বললো দুটো মানুষের মৃত্যুর জন্যে তুই দায়ী? হঠাৎ তার সেই ক্রোধ অপসারিত হল কেন? অপসারিত না হলেই যে সে স্বামীকে চিনতে পারতো।

এই হঠাৎ পরিবর্তনই তাকে বিস্মিত করলো। তারপর তার ইজ্জতহানির জন্যে স্বামী তাকে ক্ষমা করলো। এ অবশ্য তার অক্ষমতার জন্যেই স্বীকার করলো। না হলে সেও তো কৈফিয়ত তলব করতে পারে—তুমি একটি সক্ষম জোয়ান মর্দানা হয়ে তোমার জোরুকে রক্ষা করতে পারলে না? অসাবধানতাই আমার সর্বনাশের কারণ!

এ সব কথা সে সেই মুহূর্তে তুলেছিল কিন্তু স্বামী ক্ষমা চেয়ে নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন। না হলে তার কিছু বলার ছিল কিন্তু এখন কিছুই বলার নেই।

যেখানে বসে ফতুমা এসব কথা ভাবছিল, তার ঠিক পাশেই ছোট্ট তাঁবু। তার ভেতর থেকে লুতুফ আলি হঠাৎ ডাক দিল,—ফতুমা, রাত্রি যে শেষ হয়ে এলো!

ফতুমা হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তার মনে হল, এখুনি এখান থেকে পালাতে পারলেই মুক্তি। নতুবা মুক্তি নেই। লুতুফ আলি এখন আর তার স্বামী নেই, স্বামীরূপে একজন আওরতভোগী পিশাচ। ওকি জানে না, আওরতেরা দেহদানের চেয়ে মহব্বতের আকাঙ্খাটাই বেশী পছন্দ করে? এখন যদি ও কাছে ডেকে আদর করে কিছু সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে মনটা হালকা করে দিত, তাহলে যে সবচেয়ে সুখী হত সে। কিন্তু লুতুফ আলির স্বভাব তার আগেও জানা ছিল এখনও সে দেখছে। সে চরিত্রের লোক এ নয়। এ একেবারে ভিন্নধাতুর মানুষ। আবার এই মরুভূমিতে যেন আর একটু পালটেছে। এখন এর কাছ থেকে কোন দয়া চাওয়া মানে আরো নির্মম আচরণই কামনা করা।

তবে কি স্বামী ভেবেছে, এই মরুভূমিতে তার সর্বস্ব হরণ করে তাকে পরিত্যাগ করবে? তারপর হিন্দুস্তানে গিয়ে নতুন মানুষ হয়ে অন্য আওরত শাদী করে ভুলবে গতজীবনের ঘটনা! তাই যদি হয়, তাহলে এই রাত্রেই সে নিজের যথাসাধ্য শক্তি দিয়ে স্বামীর সহবাস-ক্ষুধা রোধ করবে। না, সে শস্তা হয়ে এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দেবে না। সে খেলার পুতুল নয়। যখন খুশি তাকে নিয়ে খেলবে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আগে যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন যখন স্বামী তার শক্তি প্রয়োগ করছে, তার ইচ্ছার যখন কোন দাম দিচ্ছে না তখন সেও রুখে

দাঁড়াবে।

কিন্তু আওরতের যদি সে শক্তি থাকতো!

হঠাৎ লুতুফ উঠে এসে ফতুমাকে কোলে করে নিয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকলো। আর ফতুমার যত প্রতিবাদ মনের মধ্যে শক্তি দিয়েছিল, তা কেমন করে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। সে একান্ত অসহায়ার মত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো কিন্তু লুতুফ আলি ত' দেখলো না।

তারপর আর কি।

আবেদীন যেমন আওরতের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে গ্রহণ করেছিল, লুতুফও তাই করলো। তবে আবেদীন পরপুরুষ ছিল বলে তার শাস্তি সে পেয়েছিল কিন্তু লুতুফকে শাস্তি দেবার কেউ নেই। তা'ছাড়া সে পরপুরুষ নয়, সামাজিক বন্ধনে সে সেই আওরতেরই পুরুষ।

কিন্তু তারপরের ঘটনা বড় মর্মান্তিক।

সেই রাত্রেই ফতুমার কেমন যেন অসুস্থতা শুরু হল। কেমন যেন সে বার বার জ্ঞান হারাতে লাগলো। লুতুফ পড়লো মহা বিপদে। এই মরুভূমিতে কোথায় হেকিম পাবে যাকে দেখিয়ে জোরুর রোগ নিরাময় করবে?

ফতুমার যখন জ্ঞান হতে লাগলো, সে চতুর্দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে আবার জ্ঞান হারাতে লাগলো।

লুতুফ তার মুখের কাছে গিয়ে বার বার বলতে লাগলো,—ডর কি ঁউ বিবি! আমি তোর মরদ, আমি লুতুফ!

লুতুফ পুত্র হানিফকে নিয়ে কাছে ধরতে লাগলো, যাতে তাকে দেখে ফতুমার চেতনা ফেরে। কিন্তু কোন কিছুই হল না।

রাত্রের শেষমুহূর্তটুকু এই অবস্থায় গেল। লুতুফের একবার অবচেতন মনে জেগে উঠলো, ফতুমাকে ফেলে গেলেই ভাল হয় কিন্তু ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আতঙ্কে নিজের মুখেই নিজে হাত চাপা দিল। না, না—একথা ভাবাও অন্যায়। তাহলে কি নিয়ে সে হিন্দুস্তানে পৌছবে? কার জন্যে হিন্দুস্তানে যাবে।

ভোর হল।

সেই একই অবস্থা। ফতুমার কোন পরিবর্তন নেই।

লুতুফ ছটফট করতে লাগল। এখুনি যাত্রা না করলে আরো অনেক বিলম্ব হবে হিন্দুস্তানে পৌছতে। এতদূর পথ এসে শেষপর্যন্ত যদি না পৌছানো যায়, তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু নেই।

লুতুফ আলি আবার বিপদের সম্মুখীন হয়ে অস্থির হয়ে উঠলো।

সে মনের অতল তলে ডুবুরী নামিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগলো, হঠাৎ কেন ফতুমার এই পরিবর্তন হল? কেন সে আতঙ্কিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো? তবে কি গতরাত্রে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে গ্রহণ করার মধ্যে কোন দোষ হয়ে গেল? তাই বা কেমন করে সম্ভব? এরকম বহুবার তো হয়েছে। কোন সময় তার ইচ্ছা হয়েছে, ফতুমার

ইচ্ছা হয় নি। আবার কোন সময় ফতুমার ইচ্ছা হয়েছে, সে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি। তাই বলে এইরকম ঘটনা তো একবারও ঘটে নি। তারা স্বামী স্ত্রী, তাদের উভয়ের এই মিলনই জগতের শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ!

তবে ফতুমার গত দুদিনের মানসিক অবস্থা একটু ভিন্ন রকমের। দুর্বৃত্ত কর্তৃক তার আওরত রত্ন লুণ্ঠিত হতে সে কেমন ধৈর্য হারিয়েছে। তারপর দারুণ নাটকীয় ভঙ্গিতে আব্বা ও আম্মার মৃত্যু। কোমল প্রাণ, নরম মনের মেয়ে সহ্য করতে পারবে কেন?

লুতুফের কেমন যেন মনে হল তাও ফতুমা সহ্য করে নিয়েছে। তার এই অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে এ সবের কোন যোগ নেই। তার অসুস্থ হওয়ার কারণ—। না, সে কথা মনেই থাক্, বাইরে প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই।

লুতুফ শুধু বিস্ময়ে ভাবল ফতুমা তাকে ঘৃণা করে?

ফতুমার এই মনের চেহারা লুতুফের কাছে ধরা পড়তে সে কেমন যেন নিজেকে অপরাধী মনে করলো। আর সেই জন্যেই সে ফতুমার সুস্থতার জন্যে সেই এক জায়গায় দুদিন অপেক্ষা করলো। ফতুমার সম্বন্ধে তার ধারণা পালটে গেল।

ফতুমাকে সেদিন বিশ্রামের জন্যে গ্রহণ করেছিল, এই নয় যে তার ওপর অত্যাচার করার জন্যে মন আগ্রহী হয়েছিল। এমন কি তার আদিম প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার জন্যেও এই আচরণ করে নি। মনটি বড় বিক্ষুব্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং মনটিকে শান্ত করবার জন্যেই স্বামীরূপে স্ত্রীর সঙ্গে মিলন। সে মিলন যে এমনি অশান্তির রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে কে জানতো? বরং তার ধারণা ছিল, ফতুমা ও সে উভয়ে একাত্মা। এই মিলনে আবার তাদের আকর্ষণ গভীর হবে এবং তারা উভয়ে শক্তিসঞ্চয় করে একসময় হিন্দুস্তান গিয়ে পৌছবে। আরো একটি কারণ, ফতুমা ইজ্জত হারাবার পর কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল, তার বোধহয় সংশয় ছিল, স্বামী তাকে গ্রহণ করবে কিনা! এটা অবশ্য লুতুফের অনুমান। তা ছাড়া সে রাত্রে দেখেছিল ফতুমা যেন কেমন অস্থির মন নিয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। তার এই অস্থিরতা কমাবার জন্যেই হঠাৎ বলপ্রয়োগ করে সে তুলে নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করেছিল।

কিন্তু তার ফল যে বিপরীত হবে কে জানতো? কে জানতো মনে মনে ফতুমা তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে? যদি একবারও সে অনুমান করতে পারতো, তাহলে কখনই সে রাত্রে ঐরকম আদিম প্রবৃত্তি সে প্রকাশ করতো না। আদিম প্রবৃত্তি ছাড়া আর কি বলবে? স্বামী স্ত্রীর উভয়ের মিলনে যে ঐশ্বরিক শুভেচ্ছা ঘোষিত হয়, সে শুভেচ্ছা এর মধ্যে কোথায়?

হানিফের আম্মা এই ফতুমাবিবি। কে বলবে লুতুফ আলি সেই পুত্রের বাপজান? এই অবস্থার পর মনে হচ্ছে, ফতুমাবিবি অন্য কারুর জোরু। লুতুফ আলি বলে এক দুর্বৃত্ত এই ফতুমাবিবির ইজ্জত হরণ করে তাকে রোগগ্রস্ত করে দিয়েছে।

তাছাড়া এ ফতুমাবিবি হলেও অন্য ফতুমা। আরবের রকুল অঞ্চলে ইস্রায়িল

হালিম আলির পুত্র লুতুফ আলির জোরু যে, সে এ ন । যদি সেই হয়, তাহলে সে মরুঅঞ্চলের বাতাসে এসে একেবারে প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে। না হলে সেই লুতুফ আলির জোরু কখনও এমনি ব্যবহার করতে পারে? স্বামীর বাহুবন্ধনে নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্যে যে সব সময় লালায়িত থাকতো, একটি সোহাগচুম্বনের জন্যে ওষ্ঠযুগলের কত আর্তি!

হানিফের জন্মের পর তাদের স্বামীস্ত্রীর মধ্যে একটু ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল।

হঠাৎ একদিন দুম্ করে ফতুমা অভিমানে মুখখানি রাঙা করে বললো,—তুমি কি আমাকে ত্যাগ করবে ঠিক করেছ?

লুতুফ বিস্মিত হয়ে বললো—একথা কেন?

ফতুমা আবার বললো,—লড়কার জন্ম দিয়ে যেন মনে হচ্ছে, আমি অপরাধ করেছি।

আমি বুঝতে পারছি না। তুই যা বলবি স্পষ্ট করে বল্।

ফতুমা মৃদু হেসে লজ্জায় রাঙা হয়ে বললো—তোমার বুদ্ধিটা বড় ভোঁতা। কোন কথা ইঙ্গিতে ধরতে পার না।

তবু লুতুফ হাঁ করে থাকলো।

তাই দেখে ফতুমা কপটরাগের ভান করে বললো,—কিছুই যেন বোঝে না। শাদী হয়েছে আজ দু'বরস। এর মধ্যেই কি আমাদের হিসাব নিকাশ হয়ে গেল?

তবু লুতুফ চুপ।

তখন রাগ করে ফতুমা বললো,—তুমি আজকাল ঘরে আসো না কেন?

এবার লুতুফ বুঝতে পারলো কিন্তু বুঝতে সে অনেক আগেই পেরেছিল শুধু বিবির মুখ দিয়ে আসল কথাটি শুনতে চাইছিল। তাই হঠাৎ শেষোক্ত কথায় খুশি হয়ে উল্লাসে ছুটে গিয়ে ফতুমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরলো। চুম্বনে চুম্বনে মুখটি রাঙা করে দিয়ে পরমবিস্ময়ে বললো,—মেরী বাদশাহজাদী, মেরী বেগমরাণী, তুই আমাকে এত কাছে চাস্?

সেই ফতুমা আজ পালটে গেল!

লুতুফের কণ্ঠচিরে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল।

তবে কি আব্বাজান ইস্রায়িলের কথাই ঠিক? অভিশপ্ত জীবনের কোনদিন মুক্তি নেই। তবে অভিশাপ কি? কে অভিশাপ দিল? পাপই বা করলো কি? তবে কি বংশের পাপ?

লুতুফ আলি সেই কথা ভেবে হঠাৎ মনটি দৃঢ় করবার চেষ্টা করলো। না, সে কোন বাধাই মানবে না। ইস্রায়িলের সাবধান বাণীও না বা বংশের অভিশাপ না। ফতুমা একটু সুস্থ হলেই সে আবার পাড়ি দেবে।

আর কত পথ? মাত্র আর দুদিন। তারপর আফগানিস্থানের মাটিতে পদার্পণ করবে। তখন আর তাকে পায় কে? কাবুলে যেতে পারলেই জঙ্গবাহাদুর আহম্মদ আলির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তারপর মোগল দরবার অথবা জাঠ দরবারে একটি চাকরি

মিলে যাবে। তখনও যদি ফতুমা অসুস্থ থাকে তাহলে বেশী মুদ্রা দিয়ে এক রাজ হাকিমকে আনাবে, সে নিশ্চয় ফতুমাকে ভাল করে তুলবে।

এমনি অনেক কথা ভাবতে ভাবতেই দুদিন গত হয়ে গেল। লুতুফ একা হানিফকে কোলে করে ফতুমার শিয়রে বসে থাকলো।

এমনি সময় হঠাৎ নিস্তব্ধ মরুপ্রান্তরে ঝড়ের গর্জন শোনা গেল। তখন বৈকাল। সূর্য ঢলে পড়েছে। সন্ধ্যার আবির্ভাব হচ্ছে।

লুতুফ আলি বিপদের সঙ্কেত চিন্তায় ভীত হয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল। তার ধারণা ছিল, সেই সেমৌম ঝটিকাই পুনরাগমন করছে। কিন্তু বাইরে এসে তাকে দ্রুত আবার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে যেতে হল এবং তাঁবুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার উটের দিকে ছুটতে হল। উটের কাছে ছুটে গিয়ে তিনটি মারণাস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালো। একটি বর্শা, একটি তীক্ষ্ণধার বৃহৎ ছুরিকা ও একটি সরু ফলার মত তরোয়াল।

আসছিল একদল দস্যু। বেদুইন দস্যু অথবা ইরানী দস্যু। কারণ এ অঞ্চল এখন ইরানের ভূমি। আর এই মরুভূমির নাম লুট। লুট মরুভূমিতে সাধারণত ইরান দস্যুই দেখা যায়।

অশ্বারোহীরা দলে বেশ ভারী। অনেক নিকটে তারা এসে পড়লো। বালির ধুলার ঝড়ে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে গেল। লুতুফ তারই মধ্যে হঠাৎ সেই বর্শাটি লক্ষ্যস্থির করে ছুঁড়ে মারলো। লক্ষ্য অব্যর্থ। আরববাসীরা অস্ত্রবিদ্যায় যে পারদর্শী লুতুফের এক আঘাতেই তা প্রমাণ হয়ে গেল। সেই অশ্বারোহীর মধ্যে থেকে কে যেন মাটিতে পড়ে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু তা বলে অশ্বারোহীরা থেমে গেল না। একসঙ্গে বীরবিক্রমে তেড়ে এল লুতুফের কাছে।

লুতুফ একা, তবু ভীত নয় বরং সে নির্ভীকভঙ্গিতে এক হাতে সেই তীক্ষ্ণধার ছুরিকা, অন্যহাতে তরোয়াল চেপে ধরলো।

অশ্বারোহীরাও অশ্বপৃঠ থেকে বর্শা ছুঁড়লো কটি। লুতুফ প্রস্তুত ছিল, তা প্রতিহত করলো। তারপর অশ্বারোহীরা ছুটে এল লুতুফের দিকে তরোয়াল হাতে।

লুতুফের হাতেও তরোয়াল। সেও কৌশলে প্রয়োগ করলো। কে যেন আহত হয়ে সরে পড়লো দূরে। আবার একটি, তাকেও জোরে আঘাত করলো লুতুফ আলি। সেও রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো।

লুতুফ যখন এক এক করে দস্যুগুলিকে আহত করছিল, এই সময় সে দেখলো অন্যদিকে উটের পিঠে লুণ্ঠন কার্য শুরু হয়েছে। তার যাবতীয় সংসারের সামগ্রী ঐ উটের পিঠে। কিন্তু এদিকে এদের প্রতিহত না করে যায় কেমন করে? যখন এমনি এক দোটানায় পড়েছে হঠাৎ শুনলো সেই উটের কাছ থেকে লুণ্ঠনকারীরা বেগে পালাচ্ছে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো, ফতুমা তার দিকে তরোয়াল হাতে ছুটে আসছে। তার মূর্তি দেখে একদিকে যেমন উল্লাস, তেমনি বিস্ময়। কিন্তু বেশীক্ষণ সে তা উপভোগ করতে পারলো না। একটি আঘাত এসে তার ডান হাতের

কব্জিটা নামিয়ে দিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে রণরঙ্গিণী মূর্তি নিয়ে ফতুমা এসে উপস্থিত। সে এসে তরোয়ালের আঘাতে দুটি অশ্বারোহীকে ধরাশায়ী করলো।

তারপর আর কি? দস্যুরা ভীত হয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। লোকক্ষয় তাদের এত হয়ে গেল যে, তারা আর সেখানে থাকা সমীচীন মনে করলো না। তাছাড়া ফতুমার তরোয়াল চালানোর কৌশলে তারা এত বিস্মিত হয়েছিল যে. মৃত্যু অবধারিত জেনেই পালালো। ফতুমার তরোয়াল চালানোয় আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। এমন কি সে একটি গোপনতত্ত্ব জানতে পেরে যারপরনাই আনন্দিত হল। ফতুমা এত ভাল তরোয়াল চালাতে জানে আগে তো বলে নি?

তাই দস্যুরা চলে গেলে সে ডানহাতের ক্ষতস্থান চেপে ধরে ফতুমার কাছে গিয়ে আবেগভরে বললো,—তুই এ বিদ্যা আয়ত্ব করেছিস্?

কিন্তু ফতুমা উত্তর দিল না। তাঁবুর মধ্যে গিয়ে জলপাত্র হাতে নিয়ে বাইরে এসে লুতুফের ক্ষতস্থানের শুশ্রূষা করতে লাগলো।

আর লুতুফ দুচোখে আনন্দাশ্রব সাথে বিস্ময় নিয়ে ফতুমার স্থির মূর্তিটি দেখতে লাগলো। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, এ জান আজ ফতুমার জন্যেই রক্ষা হল, সুতরাং এ জান ফতুমার। কিন্তু ফতুমাকে কিছু বলতে গিয়ে সে হোঁচট খেল তার মুখের দিকে তাকিয়ে। ফতুমার মুখ ভাবলেশহীন এক পাথরের প্রতিমূর্তি। মুখে কোন রেখার চিহ্ন নেই। অসুস্থতায় পাণ্ডুর মুখখানি কিন্তু কর্তব্যে দৃঢ়। হাতটির রক্তক্ষরণ বেশ সুপটু সেবাধাত্রীব মত বন্ধ করে তার ওপর বস্ত্রখণ্ডের আবরণী দিয়ে বেঁধে দিল।

তারপর যখন নির্লিপ্তভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে, লুতুফ থাকতে না'পেরে হাতটি আবেগে চেপে ধরে বললো,—আমার কথার উত্তর দিলি না?

কি উত্তর দেব?

এ বিদ্যা তুই গোপন করে রেখেছিলি কেন?

তবু কোন উত্তর নেই। চুপ করে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো ফতুমা। কেমন যেন তার অনিচ্ছা ফুটে উঠলো ভাবলেশহীন মুখে।

কিন্তু লুতুফ আলি এই জায়গায় সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের লোক। সে যদি তখন ফতুমাকে বিরক্ত না করতো, তাহলে হয়তো ফতুমার মনের পরিচয় সুন্দরভাবে পেত, আর সেই পেয়ে লুতুফ আলি সুখী হত কিন্তু আওরত নিয়ে ঘর করে সবাই, আওরতের মনের নাগাল ক'জন পায়? পুরুষ স্বার্থপর। সে নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ত যে অন্য কারও সুবিধা-অসুবিধা, ইচ্ছা-অনিচ্ছার জন্যে অপেক্ষা করতে চায় না। লুতুফ আলিও তাদের ব্যতিক্রম নয়। সে তখনই চঞ্চল হয়ে ফতুমার কাছ থেকে উত্তর চাইলো।

তবে উত্তর যা পেল, তাতে ভবিষ্যতে স্বপ্ন দেখার মত কিছু নয়। বরং যে আবেগ, যে উচ্ছ্বাস তার মধ্যে হঠাৎ প্লাবন জাগিয়েছিল, তা একটি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে গেল।

লুতুফ আলি যখন আবার পুনরাবৃত্তি করলো তার কথার, তখন ফতুমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো— ভয় করতো না! ডর আসতো না তোমার! এক আওরত বর্শা ছুঁড়তে

পারে, তরোয়াল চালাতে পারে, হাতের মুঠিতে ছুরি চেপে ধরতে পারে। এ সব জানলে যে তোমার পৌরুষে আঘাত লাগতো!

সেইজন্য গোপন করেছিলি?

হ্যাঁ, শুধু সেই কারণ। আব্বা শিখিয়েছিল শুধু আত্মরক্ষার জন্যে। আত্মবলিদানের জন্যে শেখায় নি!

তারপর বললো,—শিখিয়ে বলেছিল, দুনিয়াতে আওরতের বিপদ সব সময়। তোর ইজ্জত রক্ষার জন্যে এই বিদ্যায় পারদর্শী করে গেলাম তবে যত্রতত্র তা প্রয়োগ করিস্ না। ভুলিস্ না তুই আওরত। জেনানা। অসি ধরা তোর ধর্ম-বিরুদ্ধ। তোর ধর্ম নিয়েই তুই থাকবি শুধু প্রয়োজন বোধে—। কোনদিন প্রয়োজন হয় নি, তাই প্রকাশ করি নি। আজ প্রয়োজন হল তাই প্রকাশ করলাম।

লুতুফের তখনও কৌতূহল শেষ হয় নি, বললো,—আমার কাছে অন্তত প্রকাশ করতে পারতিস্। আজ যখন এমন আকস্মিক তুই চমকে দিলি—সে চমকানো অনেক আগেই সৃষ্টি করতে পারতিস্। আর আমারও সুবিধে হত, আমি তোকে আলাদা একটি তরোয়াল দিয়ে রক্ষী মনে করতাম।

তাতে কি তুমি সুখী হতে? ভয় করতো না আমাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে?

ভয় করবে কেন! বরং আমি তাতে গর্বিতই হতাম, আমার অক্ষম জোরু নয়, সে যেমন আত্মরক্ষাও করতে পারে, অন্যের প্রাণও রক্ষা করতে পারে। আবেদীন যখন তোকে বেইজ্জত করলো, তখন যদি সঙ্গে কোন হাতিয়ার থাকতো, তাহলে কি এগোতে পারতো? আমি জানলে আলাদা করে তোকে একটি অস্ত্র দিতাম।

কথাটা যে ভাল বলে নি, পরমুহূর্তে লুতুফ বুঝতে পারলো। ফতুমা তখন সেস্থান থেকে পলায়ন করেছে।

সেই ক্ষত জায়গায় হঠাৎ অসাবধানে লুতুফ আবেগের স্রোতে আঘাত হেনে বসলো। তাই ফতুমা চলে গেল অনুতাপে নিজে নিজেকেই আঘাত করতে চাইলো।

আজ ফতুমা তার প্রাণরক্ষা করেছে। কত বড় কৃতজ্ঞতা তার প্রাপ্য। তা না দিয়ে পরিবর্তে আবার আঘাত দিয়ে বসলো।

এখন সে কি করে বোঝাবে—সে সজ্ঞানে আঘাত করে নি! এ তার অসাবধানতার ফল। সে কথাও সে সাহস করে সেই মুহূর্তে ফতুমার কাছে গিয়ে বলতে পারে না। না, সে ক্রমে ক্রমে ফতুমার কাছে অনেক ছোট হয়ে যাচ্ছে। এ তার হল কি? তবে কি এই মরুপ্রান্তরেই জীবনের একটা হিসাব নিকাশ হয়ে যাবে? লোকালয়ে পৌছে আর কেউ কারুর দিকে চেয়ে দেখতে পারবে না? এমন কি নিজের দিকে তাকাতেই হয়তো লজ্জা করবে?

কিছু সময় পরে আবার ফতুমা বেরিয়ে এল এবং এসে বললো, তুমি কি এই মরুপ্রান্তরেই বাস করবে ঠিক করেছ? যাত্রা করবে না?

লুতুফ তাড়াতাড়ি চিন্তা থেকে সরে এসে চঞ্চল হয়ে বললো,— হ্যাঁ, হ্যাঁ এইবার যাত্রা করবো

এই জবাব পেয়ে ফতুমা আবার চলে যাচ্ছিল।

লুতুফ কাতর হয়ে বললো,—একটা কথার আমার জবাব দিবি ফতুমা! তুই কি আমাকে ঘৃণা করিস্?

ঘুরে দাঁড়ালো ফতুমা। কিছুক্ষণ স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বললো,—সেরকম কিছু কি দেখেছ?

আমি যেন অনুমান করছি। আমি যেন কেমন উপলব্ধি করছি, তুই আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছিস্। আগের সে মহব্বত আর তোর মধ্যে নেই।

আবার ফতুমা স্বামীর ব্যগ্রমুখের দিকে ভাবলেশহীন চোখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো। প্রায় এক যুগ। সে বোধ হয় তখন মনের তলে ডুবুরী নামিয়ে খুঁজছিল, সত্যিই সে স্বামীকে ঘৃণা করছে কিনা? কিন্তু তার মনে হল সে নিজেই নিজে কেমন দুর্বোধ্য হয়ে গেছে। তার কোন চেতনা নেই। শুধু ক্লান্তি, শুধু অবসন্নতা আর কি যেন এলোমেলো চিন্তা। মনে পড়লো তার গত দুদিন সে কেমন যেন অচৈতন্য ছিল। জ্ঞান যখনই হয়েছে কি যেন আতঙ্ক। আবার সেই আতঙ্কেই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। অথচ নিজের জন্যে যে এই আতঙ্ক সে জানে না। কাকে সে ভয় করে তাও জানে না। যখন এই রকম অবস্থার মধ্যে তার দুদিন কেটেছে, হঠাৎ বাইরে বহুলোকের ভিড় তার কানে গেছে। অমনি তার চেতনা সঞ্চার হয়েছে। তারপর এগিয়ে গেছে তরোয়াল নিয়ে। এই তরোয়াল নিয়ে যাওয়াও তার অজ্ঞানতার মধ্যে। স্বামীকে বাঁচাতে যাওয়ার মধ্যেও তার কোন পরিকল্পনা ছিল না। যদি তার জ্ঞান থাকতো তাহলে হয়তো এই তরোয়াল সে হাতে ধরতো না। আত্মরক্ষা বা প্রাণরক্ষার চেষ্টা অবশ্য অন্য কথা।

লুতুফ তার দিকে তখনও তাকিয়ে আছে দেখে একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো,—যাত্রা শুরু কর। এ জবাব হিন্দুস্তানে গিয়েই দেব। এখন আমি নিজেই জানি না, আমি কি ভাবছি?

সুতরাং লুতুফ সরে পড়লো। সরে পড়লো এক রকম ভয়েই। যদি আবার ফতুমা অসুস্থ হয়ে পড়ে!

তারপর আবার যাত্রা শুরু হল। আবার মরুপ্রান্তরের বালুকাময় পথ। রূঢ় কঠিন নির্মম প্রকৃতি। আবার উটের পিঠে আড়াই জনের চলা। এর মাঝে কটি মরূদ্যান পড়লো; তারা বিশ্রাম নিল, জলপান করলো, খানাপিনা করলো আবার চললো।

এমনি করে একদিন শেষ হল তপস্যার প্রতীক্ষা। অবশেষে মিললো আফগানিস্থান। তারপর কাবুল পৌঁছতে আর বেশী দেরি হল না।

কাবুল পৌঁছে লুতুফ আলি একেবারে জঙ্গবাহাদুর আহম্মদ আলির আস্তানা খুঁজে সেথনে গিয়ে উঠলো। এই আহম্মদ আলির ঠিকানা পেয়েছিল সে, যখন সে নাখলার এক সরাইখানায় গিয়েছিল। সেই সরাইখানার মালিক ইশা আলি এই আহম্মদ আলির ছোট ভাই। সেই বড় ভাইয়ের পাত্তা দিয়ে লুতুফকে আশ্বাস দিয়েছিল—বুড়ভাই আমার বহুত আচ্ছা আদমি আছে। তোমাকে সাহায্য করতে তার কোন

কসুর হবে না।

সেই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে লুতুফের এখানে আসা।

সব শুনে আহম্মদ আলি তাজ্জব হয়ে বললো,—এতো বহুত তাজ্জব কী বাত শোনালেন মিঞাসাহেব! সেই সুদূর আরব থেকে এসেছেন আমার দোয়া নিতে! আমি তাহলে এক্ বড আদমি আছি?

সত্যিই আহম্মদ আলি আচ্ছা লোক। সঙ্গে সঙ্গে ফতুমা ও হানিফকে অন্দরে পাঠিয়ে দিল ও লুতুফকে একদিন পুরো বিশ্রাম নেবার জন্য আয়োজন করে দিল।

মুখে বললো আহম্মদ আলি,—দো চার দিন এই গরীবের কোঠিতে থেকে আরাম করুন। তকলিফ্ তো কম হয়নি, তারপর ভেবে-চিন্তে যা করার হয় করা যাবে।

লুতুফ আলি কৃতজ্ঞতায় একেবারে মাটিতে বসে পড়লো,—খোদা আপনার মঙ্গল করবেন আলিজা। আপনার আশ্রয় না পেলে এই স্থানে কেউ দেখবার নেই।

তাড়াতাড়ি আহম্মদ আলি বাধা দিয়ে বললো,—ব্যস ব্যস আর বাত্ নয় লুতুফ সাহেব। খোদার ওপর যখন ভরসা করেছেন, তাতেই হয়ে যাবে।

লুতুফ তবু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো—কিন্তু আলি সাহেব, পুরো বিশ্বাস করতে পারলুম কই? বাড়ি থেকে যাত্রা, হিন্দুস্থানে পৌছান পর্যন্ত পুরো ইতিহাস বলে গেল। শুধু ফতুমার ইতিহাসটুকু বাদ দিল। ফতুমার ইজ্জতহানির, অসুস্থতা ও তরোয়াল চালনাটুকু বাদ দিয়ে বাকী ইতিহাস বলে গেল।

আহম্মদ আলি সব শুনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললো,—তবু আপনারা তো জিন্দা অবস্থায় চলে এসেছেন, সেই হচ্ছে আল্লার দোয়া। চিন্তা করবেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। খোদা কাউকে আহার না দিয়ে রাখেন নি। নোকরী একঠো মিলবেই।

কিন্তু যত তাড়াতাড়ি আহম্মদ আলি 'নোকরী একঠো মিলবেই' বলেছিল, কার্যক্ষেত্রে তা সম্ভব হল না। তখন নোকরী মেলা বড় মুসকিলই। তার ওপর পরদেশী। কে বিশ্বাস করবে পরদেশীকে?

সমস্ত হিন্দুস্তানে তখন চতুর্দিকে রাষ্ট্রবিপ্লব।

মোগল সাম্রাজ্যের বিরাট আধিপত্য প্রায় অস্তমিত। ঔরঙ্গজেব মারা গেছেন সতেরো শ সাত সালে কিন্তু তারপরের একটি দিন সিংহাসন শত্রুহীন হয় নি। মোগল বংশধরগণ শুধু ষড়যন্ত্র, রক্তারক্তি আর খুনোখুনি নিয়েই নিজেদের স্বার্থ কায়েমী করেছে। অবশ্য এই নিয়েই মোগল সাম্রাজ্যের ভিত একদিন সুদৃঢ় হয়েছিল। বাবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে শুধু একই নজির মেলে।

তবু এদের মধ্যে প্রতিজনেরই ছিল ভিন্ন একটি ব্যক্তিত্ব। প্রত্যেকেই স্ব স্ব মহিমায় এমন দৃঢ়চেতা ছিলেন যে, তাদের হটিয়ে আর কোন উত্তরাধিকারী সিংহাসন অধিকার করতে পারে নি।

যেমন এক ডাকে নামোচ্চারণ করা যায়—মহামতি আকবরের। তাঁর রাজত্বের কাল যেমন দীর্ঘ, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনধারা। মোগল রাজত্বের শেষপ্রদীপ নিভে যাবার পরও কখনও সেই দীপ্তময় মানুষের কীর্তি ম্লান হয় নি। ফুটে আছে আজও একখণ্ড রক্তগোলাপের মত অম্লান ও সুন্দর হয়ে।

সেই বংশের শেষ কীর্তিমান পুরুষ, ইসলামী গোঁড়া মুসলমান ঔরঙ্গজেব মৃত্যুর আগে মোগাল সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তাই ভীত হয়েই নিজের পুত্রদের মধ্যে রাজত্ব সমান অংশে ভাগ করে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হল কই ?

বংশের ধারা যাবে কোথায় ? ভাই ভাইকে খুন না করলে রাজত্ব করবার আনন্দ কোথায় ? শাহজাহানের চারপুত্রের ইতিহাস তো গোপন নয় ? জাহাঙ্গীরের পুত্রদের ইতিহাসও সকলেই জানে। তাই ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে লাগলো।

মোগল বাদশাহরা যখন এমনি হানাহানিতে মত্ত, সেই সময় হিন্দুস্তানে আবার কটি দল মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। যারা এক সময় মোগল শাসনে ঘুমিয়েছিল, তারা আবার জেগে উঠলো। বাদশাহদের দুর্বলতার সুযোগে দিল্লী পর্যন্ত হানা দিতে তারা ছাড়লো না। মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, শিখ, রোহিলা অনেক শক্তিশালী দল। যারা যেমন শক্তি প্রদর্শন করতে পারলো, তারা তেমন স্থান দখল করতে লাগলো ; তাদের তেমনি ক্ষমতা প্রকাশ হল। ঐশ্বর্যও তাদের তেমনি হল।

আর এদিকে মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহরা ক্ষমতালোভে এমনি অন্ধ হল যে, নিজেদের সমস্ত আধিপত্য একসময় শেষ হয়ে গেল, সেদিকে না দেখে বিলাস ও বৈভবে পঙ্গু হয়ে গুপ্তঘাতক কর্তৃক নিহত হতে লাগলো।

এমনি সময়ে অতর্কিতে সেই ইতিহাসবিখ্যাত চরিত্র নাদির শাহের ভারত আক্রমণ। শুধু নিজের দেশের লোকই নয়, দেশের বাইরের লোকেরও এদিকে নজর পড়লো। পড়বে না কেন ? একাধিকভাবে দুশো বছরের অধিককাল মোগলরা ভারতের শাসনদণ্ড ধরে আছে। ভিন্ন জাতিপুঞ্জও পররাষ্ট্রের সমস্ত আক্রমণ তারা প্রতিহত করে নিজেদের ক্ষমতায় অম্লান ছিল। সেই শক্তি যখন শেষ হয়ে আসছে তখন তো এই সুযোগ !

ফররুখশিয়ারের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহের দুজন পৌত্রের মৃত্যু হলে অন্য এক পৌত্র রোশন আখ্‌তার মুহম্মদ শাহের উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। এই মুহম্মদ শাহের সময়ই পারস্যরাজ নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

মহম্মদ শাহ যখন রাজত্ব করছিলেন সেই সময়ে কয়েকটি আভ্যন্তরিণ ক্ষমতা বিস্তারলাভ করেছিল। যেমন, তারই প্রধানমন্ত্রী নিজাম-উল-মুলক উপাধিধারী মীর কমরউদ্দীন চিন্‌কিলিচ খান সমরখন্দী নামে এক ব্যক্তি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদে

অধিষ্ঠিত থেকে এক স্বাধীন সুবিশাল রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা সাদৎ খান ইরানী ও বাংলার সুবাদার আলীবর্দী খানও তখন স্বাধীন। এ ছাড়া রোহিলা আফগানগণ আলী মুহম্মদ খান নামে একজন ধর্মান্তরিত হিন্দুর নেতৃত্ব স্বাধীন রোহিলখণ্ডের পত্তন করলো। পাঞ্জাবের শিখ ও ভরতপুরের জাঠগণের ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মধ্যভারতের রাজপুতরাও প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হল। মারাঠারা মালব ও গুজরাটে প্রাধান্য স্থাপন করে পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে বীরদর্পে দিল্লীর অভিমুখে অগ্রসর হল।

সেই সময় এই নাদীর শাহের আক্রমণ।

নাদীর শাহ একজন ভাগ্যবান শক্তিশালী পুরুষ। নিজের শক্তির প্রভাবেই বিরাট পারস্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। আফখানদের সঙ্গে পারস্যরাজা হুসেন সাফাবীর যুদ্ধ হলে নাদীর নামে এক নীচ বংশীয় সর্দার পারস্যরাজকে সাহায্য করে। পারস্য বাদশাহ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করেন। কিন্তু নাদীর নীচ বংশ সম্ভূত বলে রাজ দরবারের কটূক্তি ও শ্লেষবাক্য তাকে সহ্য করতে হয়।

এই শ্লেষই তার জীবনের শক্তি বৃদ্ধি করে। একদিন বাদশাহ হুসেন সাফাবীকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজে সিংহাসন লাভ করেন, তারপর আর কি—ঘটনা চলচ্চিত্রের মত দ্রুত চলতে থাকে। তিনি নীচ জাতির কলঙ্ক মোচনের জন্যে উচ্চকুলসম্ভবা সাফাবী বাদশাহজাদীকে বিবাহ করে বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

তারপর একটি বছর মাত্র গত হয়। নাদীর শাহ ভারত অভিযানের জন্য তোড়-জোড় করেন। দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর ও ধনরত্ন তাকে প্রলুব্ধ করে। তিনি একটি কারণ প্রদর্শন করে মুহম্মদ শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কারণটি হল, দিল্লীর দরবারে পারস্যের দূতের প্রতি যথোচিত মর্যাদা দেখানো হয়নি। রাজদূতের অপমান মানে রাজার অপমান, অতএব অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করা রাজার কর্তব্য। নাদীর শাহ এই কারণ প্রদর্শন করে দিল্লী যাত্রা করলেন।

কান্দাহারকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মোগলদের সঙ্গে পারস্যের সাফাবী রাজবংশের একশ বছর যুদ্ধ চলেছিল। সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করেই নাদীর শাহ বিনা বাধায় গজনী, কাবুল ও লাহোর জয় করলেন।

লুতুফ আলি এমনি সময় কাবুলে এসেছিল। সে পরদিন এই কাবুল শহর দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। একি শহর? এ যে প্রলয়ের পরেরই এক ছবি! সাজানো শহরের বিপণিগুলি লুণ্ঠনের দ্বারা লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। বাড়িগুলি অগ্নিদগ্ধে একেবারে মসিলিপ্ত। কোনটার দরজা আধখানা, কোনটার জানালা নেই, কোনটি একেবারে পুড়ে কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গৃহবাসী কেউ কেউ পথের ওপরেই ম্লান মুখে বাস করছে। কিন্তু কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। কেমন যেন নিস্তব্ধতার প্রতিচ্ছবি নিয়ে বিস্তৃত শহর মৃত্যুর মত শান্ত।

লুতুফ আলি নতুন লোক, জানতো না শহরের এমন অবস্থা কেমন করে হল? আর আহম্মদ আলিও সময় পায়নি অতিথিকে সাবধান করে দিতে। তাছাড়া আহম্মদ আলি

তখন নিজের জন্যে ভীত। নাদীর শাহের সৈন্য তার বাড়ি কখন আক্রমণ করে তার ঠিক নেই। দিল্লীর বাদশাহের সে একজন চর, কাবুল থেকে সব সংবাদ প্রেরণ করে। একথা জানলে নাদীর শাহ আর তাকে প্রাণে রাখবে না। সেইজন্যে সে আত্মগোপন করে নিজের পরিচয়ও অতিথির কাছে গোপন করেছিল।

লুতুফ আলি যখন আহম্মদ আলির বাড়ি অন্বেষণ করে প্রথম গিয়েছিল, তখন যদি সে চোখ মেলে দেখতো, তাহলেই দেখতে পেত শহরের ধ্বংস অবস্থা ; কিন্তু তখন তার আশ্রয় সন্ধানই বড় হয়েছিল, আর আহম্মদ আলিকে খুঁজে বের করাই তার প্রধান কাজ ছিল।

যাই হোক লুতুফ আলি শহরের অবস্থা দেখে আর কৌতূহল দমন করতে পারলো না, মৌনমুখ পথচারীকে জিজ্ঞেস করে বসলো ব্যাপারটা।

কিন্তু কে উত্তর দেবে ? উত্তর দিয়ে কি শেষকালে নতুন বাদশাহের কোপে পড়বে ? শহরের চতুর্দিকে তখন নাদীর শাহের সৈন্য টহল দিয়ে ফিরছে। তারা শহরবাসীর সামনেই রমণীগুলির ইজ্জত লুণ্ঠন করছে, শিশুদের বধ করছে। কে প্রতিবাদ করে প্রাণ হারাবে ?

এমনি জিজ্ঞাসা করতে করতে এক সময় লুতুফ আলি একদল সৈন্যের মাঝে পড়ে গেল। তারা বন্দুক তুলে লুতুফ আলিকে ভয় দেখিয়ে বললো,—কে তুমি ? কোথায় থাকো ?

লুতুফ আলি একাধিক সৈন্য দেখে ঘাবড়ে গেল।

আরব দেশের লোক। হিন্দুস্তানের রীতিনীতি কিছুই জানে না। বললো,—সত্যি কথাই। আহম্মদ আলির বাড়ির খোঁজও তারা পেল। তবে জানতো না তারা আহম্মদ আলির পরিচয়। নাদীর শাহ তখন কর্ণালের যুদ্ধে বাদশাহ মুহম্মদ শাহকে হারিয়ে তার সঙ্গেই দিল্লী রওনা হয়েছে।

সৈন্যদল লুতুফ আলিকে নিয়ে আহম্মদ আলির বাড়ী এল।

আহম্মদ আলি সৈন্য দেখেই নিজের কর্তব্য চিন্তা করে নিল। যেমন কর্ম তেমনি ফল। পরের জন্য নিজে কেন বিপদে পড়বে ? তাই লুতুফ আলিকে দিল্লীর বাদশাহের চর বলেই ধরিয়ে দিল।

সৈন্যদল আহম্মদ আলির আচরণে খুশি। তারা আর তলিয়ে কিছু ভাবলো না। লুতুফ আলিকে সঙ্গে করে অগ্রসর হল।

তখনকার দিনে আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মানুষ কি না করতো, এই আহম্মদ আলিই তার প্রমাণ।

সে হঠাৎ সৈন্যদলকে অপেক্ষা করতে বলে অন্তঃপুর থেকে ফতুমা ও হানিফকে এনে হাজির করলো। তারপর বললো,—এদেরও সঙ্গে নিয়ে যান। ঐ মিঞাসাহেবের এই জোরু ও বেটা।

ফতুমার দিকে তাকিয়ে লুব্ধ সৈনিকের চোখের তারা গোল হয়ে গেল। এমন একটি লুব্ধ বস্তুকে অতি অনায়াসে পাওয়া গেল দেখে সৈনিকরা পুলকিত হয়ে উঠলো।

আর মনে মনে লুতুফ আলি কম্পিত হল।

ব্যাপারটা সব অনুধাবন করে লুতুফ আলি হঠাৎ কাতর প্রার্থনায় সৈনিক সর্দারের পায়ের তলায় বসে পড়ে বললো,—আপনারা আমাকে নিয়ে যা খুশি হয় করুন, আমি তার জন্যে কিছু বলবো না, শুধু আমার জোরু ও বেটাকে মুক্তি দিন।

সর্দার হেসে বললো, তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন? তোমার সঙ্গে তোমার জোরু ও বেটা থাকবে না এ কখনও হয়?

তারা কোন প্রার্থনাই লুতুফ আলির শুনলো না, তিনজনকে নিয়ে আহম্মদ আলির বাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

তবে যাবার সময় পারসিক সৈন্য আহম্মদ আলির বাড়ী নজর রাখবার জন্যে লোক মোতায়েন করে গেল তারা বিদেশী কিন্তু মানুষ তো! আহম্মদ আলির আচরণে তারাও যেন কেমন সন্দেহ মনে পোষণ করলো। নিজের আওরত থাকা সত্ত্বেও এক আওরতকে যখন সৈনিকদের মাঝে ছেড়ে দিল, তখন কি চরিত্রের লোক সৈনিকদের বুঝতেও বাকী রইলো না।

যাই হোক পরবর্তী ঘটনা আরো দ্রুত ঘটলো।

লুতুফ আলি বাদশাহী চর জেনে সৈনিকরা তাকে প্রচণ্ড প্রহার করলো। কিন্তু তার কাছে যখন আসল কাহিনী শুনলো পারসিক সৈন্যরা বিস্মিত হল। এর মধ্যে আহম্মদ আলির আসল পরিচয় যোগাড় হয়েছিল কিন্তু তাকে বন্দী করতে গিয়ে তারা দেখালো, পাখীরা পিঞ্জর ছেড়ে পালিয়েছে।

কিন্তু যাবে কোথায়? নাদীর শাহের লোক চতুর্দিকে। একসময় আহম্মদ আলি ও তার চারটি বেগম ধরা পড়লো। তাদের যথাযোগ্য ব্যবস্থা হল।

লুতুফ আলি ছাড়া পেয়ে হাতে পেল শুধু হানিফকে। আর সৈনিক সর্দার জানালেন, তার জোরু আত্মহত্যা করেছে।

ফতুমা নেই?

লুতুফ আলি সমস্ত দুনিয়া অন্ধকার দেখলো।

সৈনিক সর্দার হঠাৎ যেন কেমন কর্তব্য ভুলে কোমল হয়ে গেলেন। অবশ্য এর পিছনে ছিল তাদের সেই আদিম প্রবৃত্তি। সর্দার নিজেই যে ফতুমার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হয়ে তাকে অধিকার করতে গিয়েছিলেন, সে কথা বললেন না। শুধু বললেন— তোমার জোরু তলোয়ার চালাতে পারে?

লুতুফ মাথা নাড়লো।

সেই আওরত দুজন সৈনিককে বধ করে তারপর নিজেকে হত্যা করেছে।

লুতুফ দু'চোখে জল নিয়ে বললো,—কারণ কি?

সৈনিক সর্দার হেসে বললেন,—কারণ আর কি? আওরত দেখে যেমন সৈনিকরা লুব্ধ হয়ে ওঠে তেমনি হয়েছিল। ব্যস, কাছে যেতেই সেই সাহসিকা একটি সৈনিকের খাপ থেকে তরোয়াল ছিনিয়ে নিয়ে দুজনকে ঘায়েল করলো।

লুতুফ মনে মনে ফতুমার প্রশংসা করলো। অবলা রমণী অক্ষম ক্ষমতা নিয়ে

নিজের ইজ্জত বলি দেয় নি, সাহসের পরিচয় দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করেছে।

লুতুফ এই শুনেই মনে মনে ফতুমায় প্রশংসা করলো কিন্তু যদি আসল কাহিনী শুনতো!

আসল কাহিনী সবার অন্তরালে থাকলেও যা ঘটেছিল তা অসত্য নয়।

ফতুমার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হয়ে সৈনিক সর্দারই তাকে নিয়ে ঘর বন্ধ করেছিল। ইচ্ছে ছিল আলাদা করে একটু উপভোগ করবে। ফতুমার আরবীয় দেহসৌন্দর্য যে হিন্দুস্তানের কোন মেয়ের সঙ্গে তুলনা হয় না, সেই জ্ঞানেই সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে তাকে বিলিয়ে না দিয়ে নিজের উপভোগের জন্যে তুলে এনেছিল।

এনে ফতুমাকে একটি ডিভানের ওপর বসিয়ে নিজে প্রচুর পরিমাণে সরাব পান করেছিল। তারপর আদিম প্রবৃত্তিটা বন্য পশুরমত মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে পুরুষ সিংহ এগিয়েছিল ধীরে ধীরে।

ফতুমার কিন্তু তখন মনে কোন ভয় ছিল না। আশ্চর্যভাবে সে নির্বিকার চিত্তে বসে বসে সৈনিক সর্দারের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করছিল। বোধ হয় সে মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছিল বা বাঁচবার কোন পথ খোলা নেই দেখে সৈনিকের কাছেই নিজেকে সঁপে দেবে মনে করে নিশ্চুপ হয়েছিল।

কিন্তু তাও যে নয়, তার প্রমাণ অল্প পরেই পাওয়া গেল।

সৈনিক যখন সরাব পান করে মাতাল হয়ে ফতুমাকে সরাব দিল এবং ফতুমা তা গ্রহণ না করে পরিবর্তে পাত্রটি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল, তাতেই বোঝা গেল, সে অন্য ভূমিকা নিতে চাইছে। এবং সে ভূমিকা একটি আওরতের জীবনে কখনও ঘটে নি।

পাত্রটি মাটিতে পড়ে গিয়ে শব্দ তুলতে সৈনিক পুরুষ আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। আগেই উন্মত্ত হয়ে দেখছিল দু'চোখের রঙিন্ দৃষ্টি নিয়ে ফতুমার লুব্ধ যৌবন, এবার সেই যৌবন সাপের ছোবল দিয়ে তুলে নেবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রচণ্ড বিক্রমে।

ফতুমা তৈরী ছিল। আবেদীন যেমন বিনা বাধায় তার ইজ্জত হরণ করেছিল, সে কোন বাধা দানের সুযোগ পায় নি। তাছাড়া তখন সে একজন অক্ষম আওরতের মত ভূমিকা নিয়ে প্রার্থনা পেশ করে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু তখন সে জানতো না, পুরুষ কখনও এই অবস্থায় ছেড়ে দেয় না।

আজ দ্বিতীয়বার তাই তার ইজ্জত যাবার উপক্রম দেখে, সে আগেই ভেবে নিয়েছিল—কি করবে? পিতা আব্বাসের কথা তার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, কেন তিনি অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিয়েছিলেন?

সৈনিক পুরুষ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সে একটু সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত মানুষটি সমতা না রক্ষা করতে পেরে মেঝের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লো।

ফতুমা আরো সতর্ক ছিল, সে ছুটে গিয়ে সৈনিকের কোষবদ্ধ থেকে তবোয়ালটি ক্ষিপ্রগতিতে বের করে নিল। নিয়ে শায়িত সৈনিকের বুকের ওপর ধরলো।

একটু নড়লেই বক্ষ বিদীর্ণ করে দেব।

সৈনিক তবু ভাবলো, বোধ হয় অপটু হস্তে অস্ত্র ধরা। তাই সে ওঠবার চেষ্টা

করতে গেল।

তা বুঝে ফতুমা বাতাসের বুকে কবার তরোয়াল আছড়ে সৈনিককে দেখালো, সে সহজ হাতে অস্ত্র ধরেনি, তার এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে।

সৈনিকের চোখের রঙিন নেশা ফিকে হয়ে এল। চতুর্দিকে তাকিয়ে পরিত্রাণের উপায় খুঁজে তারপর কাতর অনুনয় করলো,—বিবি, আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে উঠে দাঁড়াতে দাও। আমি তোমায় মুক্তি দিচ্ছি।

ফতুমা আবার ভুল করলো। সৈনিকের কথায় বিশ্বাস করে তাকে উঠতে দিল এবং ওঠার মুখেই ফতুমার অসাবধানে পায়ের জুতো দিয়ে আঘাত হেনে তরোয়ালটি হাত থেকে ছুটিয়ে দিল।

ছুটে গিয়ে ফতুমা আবার তুলে নিতে গেলে সৈনিক সর্দার পিছন থেকে গিয়ে তাকে আঘাত করলো। তাতেই সংজ্ঞা হারাল ফতুমা।

সেই সংজ্ঞাহীন তনুলতার দিকে তাকিয়ে সৈনিক সর্দার ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—দাঁড়াও, তোমার ইজ্জত কেমনভাবে উপভোগ করতে হয় দেখছি। আওরত হয়ে এক বড় সাহস আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধর!

তারপর ফতুমার সংজ্ঞাহীন দেহ নিজের এক্তিয়ারে বন্দী করে রেখে অপেক্ষায় থাকলো সংজ্ঞা ফেরার।

এরই মধ্যে লুতুফ আলি মুক্তি পেয়ে সৈনিক সর্দারের কাছে ঐ কাহিনী শুনে ক্রন্দন মুখরিত হয়েছিল। তারপর নিজের শোক সংবরণ করে চাইলো ফতুমার মৃতদেহ।

কিন্তু সৈনিক সর্দার তাকে হঠাৎ ধমক দিয়ে বললো,—মৃতদেহ নিয়ে কি করবে? মিছিল বের করবে নাকি? যাও, সে মৃতদেহ নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

তখনই লুতুফের ধারণা হল, ফতুমা বেঁচে আছে এবং সুস্থ আছে। তাকে নিয়ে এই সৈনিক সর্দারের কিছু মতলব আছে বলে ঐ কল্পিত কাহিনী শোনালো। আসলে ফতুমা তরোয়াল চালিয়ে কাউকে আঘাত করতে পারে কিন্তু সে এখনও আত্মহত্যা করে নি।

হঠাৎ ফতুমার জন্যে তার প্রাণটা বড় কেমন কেমন করতে লাগলো। মেরী পিয়ারী বিবি! কি কুক্ষণে যে হিন্দুস্তানে পাড়ি দিলাম?

চোখে তার আবার জল এলো। চোখের জল কোন রকমে রোধ করে সৈনিক সর্দারের কাছে ছুটে গিয়ে কাতরস্বরে বললো,—আমার জান নিয়ে আপনি আমার বিবিকে মুক্তি দিন। আপনিও মুসলমান, আমিও মুসলমান—আপনার ঘরে কি বিবি নেই?

সৈনিক হঠাৎ বাজখাই চিৎকার করে অনুচরদের ডেকে হুকুম দিল—এই উল্লুক কে বাচ্চে কো লাথ্ মারকে বাহার নিকাল দো।

অনুচররা তাই করলো।

তারপর লুতুফ আলি সহায় সম্বলহীনভাবে পুত্রের হাত ধরে পাগলের মত ঘুরতে লাগলো।

কিন্তু কাবুলের কেউই তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না।

সাহায্য করে কি শেষকালে মৃত্যু বরণ করবে? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে শাহের বিরুদ্ধে লাগবে! তখন দিল্লী রাজধানী থেকে এক একটি সংবাদ ছুটে আসছিল আর সমস্ত অধিবাসীদের প্রাণ শুকিয়ে যাচ্ছিল। দিল্লীতে রক্তের স্রোত বইছে, নাদীর শাহ কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। মৃতদেহের পাহাড় সৃষ্টি হচ্ছে পথের যত্রতত্র।

আরো কত নৃশংস কাহিনী। দিল্লীতে কোন সুন্দরী রমণীর আর ইজ্জত নেই। সবই নাদীর শাহ ও তার সেনাদল কর্তৃক লুণ্ঠিত। এমন কি বাদশাহ মুহম্মদ শাহ তাঁর হারেম উন্মুক্ত করে নাদীর শাহকে তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

বাদশাহ যখন নিজের জেনানাদের সম্ভ্রম লুটিয়ে দিলেন, তখন আর সাধারণ আওরতদের মূল্য কি?

তাই লুতুফ আলির কথায় কেউ কর্ণপাত করলে না। কেউ কেউ আবার তারই মধ্যে হিতৈষী বন্ধু সেজে উপদেশ দিল—বাপু, গেছে ভাল হয়েছে। হীরা জহরৎ ধরে রাখা যায় না তো আওরত! নিজের নসীব ফেরাও তারপর নতুন এক খুবসুরত আওরত লুঠে নিও। জোয়ান মর্দানা যখন হয়েছ, ভাবনার কি আছে? আমীরি ইজ্জত তৈরি কর, দেখবে হাজার খুবসুরত বেহেস্তর হুরীতে তোমার হারেম ভরে যাবে।

আবার কেউ একগাল হেসে বললো,—হাল তো তোমার দেখছি এই। ছেঁড়া পিরান, ময়লা পাৎলুন, মাথায় টুপি নেই—হয়তো দো মাহিনা খানাপিনা কর নি। তোমার যদি জোরুকে নিয়ে থাকে, ভালই করেছে। খুব ভাল করেছে। খুবসুরত আওরত নিয়ে তুমি কি করবে হে মোল্লা? এই বলে লোকটি হা হা করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

না, কোন সাহায্যই মিলবে না। কটূক্তি, শ্লেষ, তাচ্ছিল্য ছাড়া কোন সহানুভূতি নয়। তার যে কোন সুন্দরী যুবতী জোরু থাকতে পারে, এ যেন কেউ বিশ্বাস করে না। আর বিশ্বাস করলেও নাদীর শাহের বিরুদ্ধে কে লড়বে? কার ঘাড়ে কটি মাথা আছে?

এমনি করে সেই অপরিচিত কাবুলের সর্বত্র ঘুরে লুতুফ একটিও লোককে যোগাড় করতে পারলো না, যে তাকে সাহায্য ক ব ফতুমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করবে। অথচ, কত বিরাট বিরাট কাবুলি শক্তিওয়ালা লোক সে দেখলো তারা চওড়া বুকের ওপর হাত বুলিয়ে কেমন যেন দাড়ির ফাঁকে হাসি লুকোলো। 'মিঞাসাহেব পরে এস। একটু ভেবে দেখি।'

লুতুফ বুঝতে পারলো, হিন্দুস্তানে আসাই তার ভুল হয়েছে। এখানে মানুষ নেই, আছে শাসন। রাজা নেই, আছে শয়তান। শয়তানরাই দুনিয়ার সমস্ত ঐশ্বর্য ভোগ করে হিন্দুস্তানের রাজ তখতে বসে আছে। এখানে বিচার নেই, আছে অবিচার। আর সবচেয়ে যা সে আহম্মদ আলির কাছে থেকে পেল, বেইমানী। কত আশা নিয়ে

সে এই আহম্মদ আলির কাছে এসেছিল। কিন্তু এখানকার আদবকায়দা তার জানা ছিল না বলে এই বিড়ম্বনায় তাকে পড়তে হল। সে বুঝতে পারলো, ফতুমাকে বাঁচানোর সাধ্য নেই। ফতুমা হারিয়ে গেছে।

এবারেও সে তাকে রক্ষা করতে পারলো না। আবেদীনের সময় না হয় তার চেতনা ছিল না কিন্তু এবারে তো তার চেতনা পূর্ণমাত্রায় ছিল। তাছাড়া ফতুমা সেদিন রাত্রে গোপনে এসে সাবধান করে দিয়েছিল কিন্তু সে আহাম্মুকের মত বিশ্বাস করে নি। বলেছিল—তোর ভুল ধারণা বিবি, আহম্মদ আলির মত সাচ্চা আদমি দুটি পাবি না।

মেয়েরা যে অনেক আগেই লোকচরিত্র বিচার করতে পারে, এ বিশ্বাস যদি তখন লুতুফের হত ?

ফতুমা আর কোন কথা বলে নি, নিঃশব্দে আবার চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল।

লুতুফ অন্ধকারে আন্দাজে হাত ধরে ফেলেছে।

ছাড়ো, ছোড় দো। আহম্মদ আলির চার বেগম, চার বাঁদী, দো সাকী—এরা জানতে পারলে আবার খোয়াড করবে।

কেন, তুই আমার বিবি এ কথা বলিস্ নি ?

অন্ধকারে ফতুমা মাথা নেড়ে বলেছিল,—বলেছি, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নি। বললে, দেশ থেকে যখন পালিয়ে এসেছিস্, তখন কি সোয়ামী নিয়ে ভেগেছিস ? ও তোর নাগর।

লুতুফ আলিকে শয্যা থেকে উঠে বসতে হয়েছিল—বলিস্ কিরে ? এতদূর ? তাহলে লড়কাটা !

ফতুমা বললো,—আমি বলেছিলাম হাসুর কথা।

তার উত্তরে বললো,—মর্দানাটা নকল, লড়কাটা তোরই আছে।

এ সব ধারণা হওয়ার কারণ ?

ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে সেই চার বেগম আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল,—খবরদার, নাগরের সঙ্গে মিলবি তো ঘরে বন্ধ করে রেখে দেব।

তাজ্জব ব্যাপার তো ! কারণ কি ?

সম্ভবত তোমাদের আহম্মদ আলি আচ্ছা আদমি নয়।

আরো কথা হত কিন্তু কে যেন আসছে বলে ফতুমার মনে হতে সে আত্মগোপন করে পালিয়েছিল।

সেইকথা মনে হতেই লুতুফ আলির মনে অনুতাপ সৃষ্টি হল। ফতুমা তাকে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও সে সতর্ক হল না। পরদিন প্রভাতে সে কাবুল শহর দেখতে বেরোল, আর তার পরের ইতিহাসের জের এখনও চলেছে।

এই সময় খিদের জ্বালায় বাচ্চা লড়কাটা কোলের মধ্যে কেঁদে উঠলো। সে অল্প দাঁড়াতে শিখেছিল, অল্প কথা বলতে শিখেছিল। এতক্ষণ তার কথা লুতুফ আলির মনে

আসে নি। কোলে অবশ্য সেই সৈনিক সর্দারের ফেরত দেওয়ার পর থেকে ছিল কিন্তু মানসিক অবস্থা তার এমনি শোচনীয় ছিল যে, লড়কা কেন তার বাপজান এসে সামনে দাঁড়ালেও তার চেতনা ফিরতো না।

তাই হানিফ কেঁদে উঠতে সে বিরক্ত হানিফকে পথের ওপর সজোরে দাঁড় করিয়ে দিল। ছেলেটা সবে দাঁড়াতে শিখেছে. বাপের শক্তি সহ্য করতে পারবে কেন; টলে পড়ে গেল পথের ওপর।

লুতুফ রাগ করে বললো,—মর মর, জিন্দা আছিস্ কেন? আম্মা গেছে, তার সঙ্গে তুইও যেতে পারলি না? তুই থেকেই যত গণ্ডগোল করলি? না হলে এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ সৈনিক বেটার গলা টিপে ধরতাম।

লুতুফের এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারুণ এক শান্তি এল মনে। সত্যিই তো। হানিফ আছে বলেই তো সে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটাতে পারে না। বাচ্চা লড়কাটাকে যদি সে কোথাও জমা দিতে পারতো, তাহলে হয়তো একবার চেষ্টা করে দেখতো। অস্ত্র যা তার সঙ্গে ছিল, সবই আহম্মদ আলির জিম্মায় চলে গেছে। এখন শুধু দুই বাহু সম্বল। তা সে এই দু'বাহু দিয়েই সৈনিকটার গলা চেপে ধরতো। তারপর—। তারপর না, সে আর চিন্তা করে কি হবে!

যদি সে পারতো তাহলে তখনই এগিয়ে যেত। যখন ঐ উল্লুকটা তাকেই উল্লুককা বাচ্চা বলে অনুচর দিয়ে গলা ধাক্কা দিয়েছিল।

না, না একটা কিছু করতে হবে, একটা কিছু করতে হবে। হঠাৎ লুতুফ আলি ছটফট করে উঠলো। হিন্দুস্থানে এসে সে অনেক কিছু করবে বলে মনস্থ করেছিল কিন্তু হিন্দুস্তানের মাটিতে পা দিয়েই কেমন যেন বোবা হয়ে গেছে।

আব্বাজান সাধে তাকে শয়তান বলেছিল। নিজের দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে যে কিছুই করা যায় না, আব্বাজান আগেই বুঝেছিল। না, এর চেয়ে মৃত্যুই ভাল ছিল। মরুপ্রান্তরে তার মৃত্যু হল না কেন?

হানিফ তখনও মাটির ওপর বসে বসে কাঁদছিল। হঠাৎ লুতুফের মনে পিতৃস্নেহ জেগে উঠলো। মমতায় বুকের তল আর্দ্র। তাড়াতাড়ি লড়কাকে কোলের ওপর তুলে নিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলো। ফিসফিস করে বললো,—তোর খিদে পেয়েছে হানু! একটু অপেক্ষা কর, রাত্রিটা হোক্ চুরি করে এনে খাওয়াবো।

লুতুফ সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো—চুরি করবো? হঠাৎ একথা তার মনে এল? এতদূর সে নেমে গেছে? এ তার হল কি? এইজন্যেই কি তবে হিন্দুস্তানে এসেছিল? কিন্তু এছাড়া পথ কোথায়? এই অচেনা দেশে কে তার আপন? কোথায় পাবে সে খানা? সে না হয় উপোস করে থাকতে পারে কিন্তু এই বাচ্চা লড়কা?.... আহম্মদ আলির বাড়িতে যা তার সঞ্চয় ছিল সবই গেছে। ছিল মেওয়া, খেজুর, যব ও জনারের আটা। আরো অনেকরকম খাদ্য-সামগ্রী। সেগুলি এখন থাকলে আর এই ছেলেটা অনাহারে শুকোতো না।

এখন সেগুলি পাবারও উপায় নেই। আহম্মদ আলির বাড়ি পারসিক সেনারা

আগুন দিয়ে পুরিয়ে দিয়েছে।

রাত্রি নেমে এল। লুতুফ আলির জীবনের কালরাত্রি। এমনি রাত্রি আবেদীন যেদিন ফতুমাকে নিয়ে পালিয়েছিল, সেদিনও এসেছিল। সেদিনও এমনি অসহ্য মনে হয়েছিল। তবে সেদিন পর্বত অন্বেষণের পর আশা ছেড়ে দিয়ে আবার উটের পিঠে উঠে বসেছিল। আজ যেন আশা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। আজ যেন মনে হয়, ফতুমাকে তার একান্ত দরকার। তাকে পাওয়ার জন্যে তার কোশিষ করা উচিত। তার এমন কিছু করা উচিত যা স্বামীর পক্ষে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য হয়।

পথ একেবারেই পথচারীবিহীন ছিল। এমন কি আলো পর্যন্ত পথের কোথাও নেই। গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে কোন প্রহরারত সৈনিককেও লুতুফ পথে দেখলো না।

হঠাৎ তার মনটি ফতুমার উদ্ধারের জন্যে নেচে উঠলো। এই সুযোগ। এই অবসরে যদি সৈনিক কোঠীতে ঢুকতে পারে, তাহলে ফতুমাকে সে উদ্ধার করতে পারবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে চঞ্চল হয়ে উঠলো এবং তৎপর হয়ে উঠলো সাহসটা প্রকাশ করবার জন্যে।

চলতে চলতে সে সেই সৈনিকের আস্তানার কাছে এসে গিয়েছিল। হানিফ খিদের জালায় ছটফট করতে করতে কাঁধে মাথা দিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। খিদে কি লুতুফ আলিরও লাগে নি? আজ দুদিনের ওপর অনাহার। কে সহ্য করতে পারে? সেই দুদিন আগে একদিন রাত্রিবেলা আহম্মদ আলি ভাল রসুই দিয়ে আমীরি খানা বানিয়ে খাইয়েছিল। এখন এই দুদিন পর সেই খানা হজম হয়ে পেটের শিরা হজম হচ্ছে।

যাক্‌গে খানাপিনা পরে হলে চলবে। লুতুফ আলি আর অপেক্ষা করতে পারলো না।

ঘুমন্ত ছেলেটাকে একটি বাড়ির ছোট্ট চাতালের ওপর শুইয়ে সে অন্ধকারে মিশে গেল সৈনিক কোঠীর দিকে। মনে মনে চিন্তা করে নিল, একটি অশ্ব তাকে চুরি করতে হবে, একটি অস্ত্র তার দরকার। সেই অস্ত্র দিয়ে সে ফতুমাকে উদ্ধার করবে তারপর অশ্বপিষ্ঠে তুলে নিয়ে একেবারে কাবুল থেকে উধাও।

সৈনিক আস্তানার সামনে এসে অন্ধকারে দেখলো একটি অশ্ব দাঁড়িয়ে আছে। তার মনটি আনন্দে নেচে উঠলো। আল্লা তাহলে আছে।

আত্মগোপন করে আর একটু এগিয়ে গেল, দেখলো একটি সৈনিক খাপ থেকে তরোয়াল বের করে পাহারা দিচ্ছে। সামনের দরজা বন্ধ

আবার তার মনটি নেচে উঠলো। সে অন্ধকারের মাঝে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। তারপর পিছন থেকে অতর্কিতে সেই সৈনিকের হাত থেকে তরোয়ালটি কেড়ে নিয়ে তার মাথায় আঘাত করলো। লোকটি পড়ে যেতে লুতুফ তরোয়ালের অগ্রভাগ দিয়ে তার বক্ষবিদীর্ণ করলো। লোকটি আর কথা বললো না বা তার কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এবার পথ পরিষ্কার। সামনে দরজা। লুতুফ আর কালবিলম্ব না করে বিদ্যুৎ-গতিতে সেই দরজার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

সামনে একটি সরু গলিপথ। সারি সারি ঘর। হঠাৎ মেয়েলী চিৎকার সমস্ত নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করলো। লুতুফ আলি বুঝতে পারলো, এ তার পরিচিত আর্তস্বর। সে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। বাহুতে দ্বিগুণশক্তি সঞ্চার হল। আর কোন সৈনিকের দেখা বা বাধা না পেয়ে সেই আর্তস্বর অনুসরণ করে ছুটলো। আর বোধ হয় বিলম্ব করলে ফতুমার সর্বনাশ হবে, এমনি ধারণা হতে সে শুধু ঘরগুলির মধ্যে ঢুকতে লাগলো আর বেরুতে লাগলো.

কিন্তু কোথায়? সে গেল কোথায়? আর কেন চিৎকার শোনা যায় না?

এদিকে কোন প্রহরীও ছিল না, বোধ হয় শয়তান কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রাখতে চায় না বলেই সরিয়ে দিয়েছিল অন্যত্র। সম্পূর্ণ বাড়িটি লোকহীন এবং নিস্তব্ধ। কোথাও একটি বাতিদানে আলো জ্বলছে, সেই আলোর দ্যুতি পথকে স্বল্পালোকিত করেছে। কোথাও একেবারে আলোর লেশমাত্র নেই। ঘন অন্ধকার পথ।

লুতুফের চেনা পথ নয়। তবে তার অনুসরণ ঐ আর্তচিৎকার।

হঠাৎ আবার চিৎকার হল। এবার বেশ কাছে। আওরতের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, —না, না। তুমি আমার বাপজান, আমাকে মুক্তি দাও। আমাকে ক্ষমা কর।

সেই সৈনিকের গর্জন ভেসে উঠলো,—ক্ষমা করবো? আওরত হয়ে এতবড় স্পর্ধা, অস্ত্র ধরে হুমকি দেখাও।

আর না! আর না! এবার এর শেষ করতে হবে।

কিন্তু বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে লুতুফ হতবুদ্ধি হয়ে গেল কিন্তু পরক্ষণে তার চোখ গেল, ওপর দিকে একটি গবাক্ষ খোলা হয়েছে। সে আর দ্বিধা না করে দরজার একটি কোণায় পা দিয়ে গবাক্ষের উপরে উঠে গেল।

গবাক্ষের ঠিক নিচেই সেই সৈনিক সর্দার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরাব পান করছিল। ঘরে স্বল্প আলোর বিচ্ছুরণ। সেই আলোতে লুতুফ ফতুমাকে দেখে চোখে হাত চাপা দিল। আল্লা, এর জন্যেই কি আওরত পয়দা করেছিলে? তাদের সৃষ্টি কি এই কামপ্রপীড়িত দুর্জনদের জন্যে!

ফতুমার সমস্ত শরীর নগ্ন। তার কামিজ মোচন করে টেবিলের ওপর রাখা হয়েছে। তাকে একটি দেওয়ালের গায়ে লেপটে দাঁড় করিয়ে সমস্ত হাত পা দড়ি দিয়ে এক গবাক্ষের সঙ্গে বাধা হয়েছে।

লুতুফ নিজের স্ত্রী হলেও সেই নগ্নরূপ দেখে কেমন যেন বার বার চক্ষুদ্বয় বন্ধ করতে লাগলো। এমন করে তো সে কোনদিন ফতুমাকে দেখেনি! রমণী নগ্ন হয়ে প্রকাশ্যে দৃশ্যমান হলে এত বিশ্রী দেখতে লাগে? তবে কি এই সুন্দর?

লুতুফ সেই গবাক্ষের ওপর বসে হঠাৎ কোমরে গোঁজা একটি ছোট্ট ছুরিকা, যা সে পূর্বে সেই মৃত সৈনিকের কাছ থেকে উদ্ধার করেছিল, তুলে নিল। তারপর ছুরিটির অগ্রভাগ ধরে সৈনিকটির পিঠ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলো। গবাক্ষ থেকে সেই সৈনিকের

দূরত্ব অনেক। কিন্তু ব্যবধানে লুতুফের লক্ষভ্রষ্ট হল না। অব্যর্থ সংঘর্ষ। একটি আঘাতেই সৈনিকের ভূমিশয্যা। তবু কিন্তু সে উঠে দাঁড়াতে গেল।

লুতুফ ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে পড়ে নিজের খোলা তরবারী দিয়ে একেবারে সৈনিকের বক্ষ বিদীর্ণ করলো। রক্তস্রোত বইলো সৈনিকের কামিজ লাল করে।

লুতুফ আর অপেক্ষা করলো না, ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে গিয়ে ফতুমার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে পোষাক পরতে সাহায্য করলো, তারপর পোষাক পরা হয়ে গেলে শুধু চাপাস্বরে একবার বললো,—ফতুমা, তোর এই নির্যাতনের জন্যে তোর অধম স্বামীকে ক্ষমা করিস্।

ফতুমার তখন চেতনা প্রায় লুপ্ত হওয়ার মুখে এসে পৌঁচেছে। আর কিছু ভাবনা তার আসছে না। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ বেঁচে গেল দেখে তাই তার নির্যাতনের বেদনা সমস্ত দেহঘিরে তাকে কেমন যেন নিঝুম করে দিল। চরম শান্তির কোলে আশ্রয় নেবার জন্যে তাই স্বামীর কাঁধে মাথা দিয়ে চক্ষু বুজলো।

আর লুতুফ ফতুমার জন্যে কিছু করতে পেরেছে এই ভেবে, গর্বিত হয়ে আরো শক্তি ধারণ করে তাকে দুবাহু দিয়ে তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো।

তার তখন লক্ষ্য বাইরের সেই অশ্ব, আর তার বেটা হানিফ।

হানিফকে সে ঘুমন্ত অবস্থায় অপরিচিত বাড়ির চাতালে শুইয়ে এসেছে।

এ সব ভাবনা যত দ্রুত চললো, কাজ কিন্তু তার চেয়েও আরো দ্রুত সম্পন্ন হল।

লুতুফ আলি ফতুমাকে কোলে করে বাইরে এসে দরজার মুখে দাঁড়ালো। ভাবলো, এখুনি যদি সে এখান থেকে পালিয়ে না যায়, তাহলে আরো অন্যান্য সেনারা এসে পড়বে, তখন আর বাঁচবার উপায় থাকবে না। নাদীর শাহের আইনে অপরাধীর বাঁচবার কোন অধিকার নেই।

তাই সে আর বিলম্ব না করে ফতুমাকে সামনে বসিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল। একটু দূরে যেখানে হানিফকে শুইয়ে রেখেছিল, সেখান থেকে তাকে তুলে নিল।

পথ সে জানে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পথ, তায় অন্ধকার। তবু প্রাণের মায়া তো বড়। যেদিকে দু'চোখ যায়, থামলে চলবে না। ধরা পড়লে তিনটি প্রাণই বিনষ্ট হবে। তাই সে যেদিকে পথ পেল ছুটে চললো। অশ্বারোহী হিসাবে তার সুনাম একেবারে স্বল্প নয়। লাগাম চেপে ধরতে শহরের পথের ওপর অশ্বটি লাফিয়ে উঠলো, তারপর গতি হল প্রচণ্ড, সে গতি উল্কার মত।

আগেই বলা হয়েছিল, সমস্ত শহর সৈনিকদের লুণ্ঠনে ও অগ্নিসংযোগে বিধ্বস্ত। বহু মৃতদেহ পথের ওপর পড়ে থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়েছে। সেই দুর্গন্ধ নাকের মধ্যে গ্রহণ করতে করতে অশ্বারোহী ছুটে চললো।

আর এদিকে ভীত আতঙ্কগ্রস্ত শহরবাসী হঠাৎ এক অশ্বারোহীর অশ্বের প্রচণ্ড শব্দ নিস্তব্ধ রাত্রে শুনে দরজা ফাঁক করে উঁকি দিতে লাগলো।

তারা অবাক, কে সেই দুঃসাহসী যে নাদীর শাহের রক্তচক্ষু তুচ্ছ করে এমনি সাহস প্রকাশ করে।

পথ, পথ আর পথ। সেই আরবের মত পথ। তবে সে পথ ছিল মরুসঙ্কুল, আর এ পথ অন্য। মেঠো পথের ওপর দিয়ে অশ্ব দু'পাশের শ্যামল মাঠ পেরিয়ে চলেছে।

আলো নেই, তবে আলোর আভা ছিল। চাঁদ উঠেছে তবে সে মেঘের আড়ালে থেকে অভিসার করছিল। তাই সে চাঁদ একটু আলো প্রকৃতিকে আলোকিত করছিল, তাতেই লুতুফ আলি দেখলো, এ পথে চলতে কোন কষ্ট নেই। অন্তত ঝটিকা, বায়ু এসে ঝলসে দিয়ে যাবে না, কিংবা বেদুইন দস্যু এসে তার সর্বস্ব লুঠ করবে না। তবে বিপদ হয়তো আছে। সে অপরিচিত লোক। পথ তার অজানা। হয়তো ভুল পথেই চলেছে সে। হয়তো হঠাৎ কোন মোগল সৈন্যের হাতে পড়ে যাবে, কিংবা পারসিক। আবার সংঘর্ষ শুরু হবে, আবার রক্তারক্তি।

কিন্তু উপায় কি। জেনে শুনেই তো সে আরব থেকে হিন্দুস্তানে এসেছে। গেছে কম কিছু নয়। আরো হয়তো অনেক কিছু যাবে। কে জানে কি নসীবে আছে।

সম্মুখের পথ, বিপদের আশঙ্কা, অশ্বের গতি—বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে অনেকক্ষণ ঘোরাফেরা করে হঠাৎ তার চৈতন্যোদয় হল, ফতুমার মাথাটা যেন কেমন অশ্বের পিঠের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। সে একটি হাতের বেষ্টনে ফতুমাকে ও হানিফকে ধরেছিল এবং অন্যহাতে অশ্বের লাগাম। তাই ফতুমাকে কি করে কি করবে ভেবে না পেয়ে বিব্রত বোধ করলো। এদিকে অশ্বের গতিও মন্থর করতে পারে না। বিপদ এখনও পূর্ণমাত্রায় কেবলই মনে হচ্ছে, সেই পারশ্য বাদশাহের লোক পিছনে ছুটে আসছে।

ফতুমার অর্ধচেতন অবস্থা সে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিল, তার যেন কোন প্রাণ নেই, এমনি এক প্রাণহীন দেহ নিয়ে সে স্বামীর কাঁধের ওপর ভর করেছিল। তবে লুতুফ কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর না দিয়ে পারে নি। চাপাস্বরে উত্তর দিয়েছিল স্বামীর কথার।

সৈনিক তোর আর কিছু করেছিল?

ফতুমা চুপ করে থেকেছিল। শুধু তার চোখ দুটি দিয়ে জল গড়িয়েছিল।

তাতেই বুঝেছিল সৈনিক ফতুমার ইজ্জত না নিয়ে ছাড়ে নি। ইজ্জত নিয়ে তারপর নির্যাতনে ব্যাপৃত হয়েছে।

আমার ওপর তোর খুব রাগ, নয়?

ফতুমা স্বামীর মুখের ওপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তারপর নিঃশব্দে কপালে হাতটি স্পর্শ করে বলেছিল,—নসীব।

আমি অনেক চেষ্টা করেছি বুঝলি কিন্তু নাদীর শাহের ভয়ে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি। যদি সাহায্য পেতাম, তাহলে হয়তো তোর ইজ্জত রক্ষা হত কিন্তু অনেক পরে নিজেই ভাবলাম, কি হবে এই জান্ রেখে? তাই মৃত্যুকে পণ করে এগিয়ে গেলাম তোর উদ্ধারের জন্যে।

ফতুমা তার উত্তরে আর কোন কথা বলে নি। শুধু নিঃশব্দে স্বামীর কাঁধে মাথা দিয়ে চোখ বুজেছিল।

তারপর আর লুতুফের ফতুমার কথা মনে থাকে নি। শুধু পালাতে হবে, কাবুল

কেন আরো, আরো অনেক পথ ছেড়ে তাকে সরে যেতে হবে। তাই অশ্বের ওপর বসে সে দক্ষ অশ্বারোহীর মত দুর্দাম বেগে এগিয়ে চলেছিল।

কিন্তু আবার তাকে গতি মন্থর করে দিতে হল।

ফতুমা, ফতুমা—মেরী ফত্‌মাবিবি! মেরী পিয়ারী জোরু!

কিন্তু কে উত্তর দেবে? কোন সাড়া না।

লুতুফ পিছন দিকের ফেলে আসা পথের দিকে ভয়ে কবার তাকিয়ে একটু সরে গেল। সরে গেল সোজা পথের পাশের একটি সমতলভূমির কিনারে।

চাঁদ উঠছিল পূর্ণ আলোর রূপালী ধারা নিয়ে। তার রোশনাইতে চতুর্দিক আলোকিত। এমন কি কিছু দূরে কটি পাহাড়ের উচ্চশিখর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

লুতুফ সেই আলোতে ফতুমার মুখ দেখলো। ম্লান মুখখানি কেমন যেন ব্যথায় শুষ্ক। গায়ে হাত দিয়ে সে চমকে উঠলো—একি, দারুণ উত্তাপে দেহ পুঁড়ে যাচ্ছে! ফতুমা, ফতুমা!

হঠাৎ লুতুফ কেঁদে ফেলল। তোকে আমি জিন্দা রাখতে পারবো না। তুই মরে যা! তুই মরে গেলেই শান্তি পাবি! আওরতের যখন ইজ্জত গেল, তখন কি থাকলো? তোর ইজ্জত তোর অধম স্বামী রক্ষা করতে পারলো না। তুই মরেই যা।

লুতুফ যেন কেমন পাগল হয়ে গেল! এই অপরিচিত স্থান। তার নেই কিছু সম্বল। পিছনে শত্রু নাদীর শাহের সৈন্য। শুধু নাদীর শাহ কেন এই হিন্দুস্তানে এসে সে উপলব্ধি করেছে, এখানে অনেক শত্রু। রাজ্য নিয়ে, রাজত্ব নিয়ে সিংহাসনের জন্যে বহু দল। তারই মাঝে সাধারণ জীবন ধারণ করা খুবই কঠিন। বাঁচতে গেলে যে কোন একটি দলের মধ্যে ঢুকে বাঁচতে হবে। তার এখন লক্ষ্য দিল্লীর রাজপ্রাসাদ। সেখানে নাদীর শাহ কি করছে জানে না, তবে যে কেউ দিল্লীতে রাজত্ব করুক, সে একটি সৈন্যের চাকরি সেখানে গিয়ে নেবে।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে অশ্বের গতি দ্রুত করেছিল। দিল্লী কতদূর সে জানে না। আদৌ যে পথ দিয়ে সে যাচ্ছে, সে পথে দিল্লী পৌছানো যাবে কিনা তার জানা নেই। হয়তো এ পথ ভুল পথ। তবু এই ভুল পথ ধরেই সে যাচ্ছে এইজন্যে যে, নাদীর শাহের দৃষ্টি থেকে তাকে সরে যেতে হবে।

সে যাই হোক, এখন এই গভীর রাত্রে ফতুমাকে নিয়ে সে কি করবে? তার জ্ঞান নেই, তার শরীরে উত্তাপের আধিক্য প্রবল। এই অবস্থায় অশ্বপৃষ্ঠে করে নিয়ে যাওয়াও বিপজ্জনক। হঠাৎ লুতুফ চতুর্দিকে তাকিয়ে কোন গৃহস্থালীর ঘর পায় কিনা দেখতে লাগলো। কিন্তু কোথায় ঘর? দূরে পর্বতের সারি, তার [illegible] সমতল ভূমি। কিছু কিছু চাষের জমিও তার দৃষ্টিগোচর হল।

এই জনমানবহীন প্রান্তরে অসুস্থ ফতুমাকে নিয়ে অপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত নয়। আবার অশ্বপৃষ্ঠে তুলে নিয়ে যেতে গেলেও বিপদ। ফতুমার শরীরের যে রকম উত্তাপ, তাতে নড়াচড়াও বিপজ্জনক। তারপর নিজেই সমস্যার সমাধান সৃষ্টি করলো, মরার পর তো আর কোন সমস্যাই থাকবে না। এ রাত্রে এই নির্জন স্থানে থাকলেও মরবে,

আব্বার অশ্বপৃষ্ঠে করে নিয়ে গিয়ে কোন আস্তানা খুঁজতে গেলেও মরবে। সুতরাং দ্বিতীয়টা করা ভাল। অন্তত পথিমধ্যে যদি ভোর বেলা কোন সরাইখানা পাওয়া যায়, হয়তো বিশ্রাম নিলে ফতুমার রোগ আরাম হয়ে যেতে পারে। আর যদি তার আগে মরে যায়, তাহলে চিন্তার কিছু নেই।

লুতুফ তখন এমন এক অবস্থার মধ্যে এসে পৌঁচেছিল, যে ফতুমার মৃত্যুও তার কাম্য হয়েছিল। সে দেখলো, পথে আওরত নিয়ে বের হওয়াই দারুণ বিপজ্জনক। পথে যেমন ধনরত্ন নিয়ে চলা বিপজ্জনক, তেমনি আওরত। তবু ধনরত্ন খোয়া গেলে সান্ত্বনা আছে কিন্তু আওরতের ইজ্জত গেলে আর থাকলো কি?

তাছাড়া ফতুমার যে অবস্থা সেই সৈনিক কোঠীতে দেখেছে, তাতেই তার মানসিক স্থৈর্য লুপ্ত হয়েছে। সে স্বামী হয়ে ফতুমাকে নিয়ে যা কল্পনা করে নি, ঐ দুর্বৃত্তরা সেই কাজ করেছে। ফতুমার শুধু রমণীরত্ন লুণ্ঠিত হয় নি, আওরতের সম্ভ্রমও চিরতরে লুপ্ত হয়েছে।

সেই ফতুমা এখনও জিন্দা আছে। এইটাই এখন তার কাছে আশ্চর্য। একদিন আবেদীন অতর্কিতে তার সর্বনাশ করতে সে স্বীকার করেছিল কিন্তু আজ যেন এই মুহূর্তে ফতুমার মৃত্যুই চাইলো। ফতুমা আরো অনেকদিন জিন্দা থাকলে, আরো তার নির্যাতন হবে। আর সে তাকে বাঁচাতে পারবে না। এমন কি ভালবাসাও লুপ্ত হয়ে ঘৃণাই মনে জমে থাকবে। তার চেয়ে ফতুমা মরে যাক্। সেও বাঁচুক, ফতুমাও উদ্ধার পাক্। ওর জন্যে আজ দুঃখই হয়। আওরত হওয়াই ওর জীবনের অভিশাপ। শুধু আওরত হয়ে না, খুব সুরত সুন্দরী হয়ে।

অথচ এই সৌন্দর্যই একদিন লুতুফের কাছে কত রমণীয় ছিল। ফতুমাকে ভালবেসেই সে শাদী করেছিল। আব্বার দোস্তের বেটি এসে তাদের বাড়িতে থাকলে সে ফতুমাকে দেখে কেমন যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন সবে কৈশোরোত্তীর্ণ যৌবনের প্রথম পাদ-পীঠে অসামান্য রূপের স্নিগ্ধতা। যেমন দেহবর্ণের রোশনাই, তেমনি দুটি চোখের মিঠেল চাউনি। তার ওপর কুমারী তনুর অসামান্য রহস্য। লুতুফ দূরে থেকে ফতুমার অসামান্য বক্ষ সৌন্দর্য দেখে পাগল হয়ে গিয়েছিল।

আজ চিন্তা করতে কোন দ্বিধা নেই, লুতুফ শাদীর আগেই ফতুমার গর্ভে সন্তানের সৃষ্টি করেছিল।

একটি দিনের কথা আজও তার মনে পড়ে। ফতুমার দেহের সর্বত্র তখন আবির্ভাবের চিহ্ন। একদিন নিরালায় সে লজ্জারুণ হয়ে কপট রাগের ভঙ্গিতে বলেছিল,—তুমি একি করলে বলতো? আম্মা আমাকে বকছে!

লুতুফের আজও মনে আছে, সে বলেছিল, দোষের কি করলুম? শাদীর আগে পয়দা করেছি বলে এই তো! ধর, আমাদের শাদী হয়ে গেছে। তাহলে দোষ হল না।

ফতুমা আরো রক্তিম হয়ে বলেছিল,—ধরলে তো লোকে শুনবে না!

সেই ফতুমার আজ সে মৃত্যু চাইছে! খোদা, তোমার এই দুনিয়ায় এও সম্ভব হল?

একদিন যার জন্যে কত দিনরাত্রি ভেবেছি, আজ তার মৃত্যু চাইছি। আজ ফতুমার মৃত্যু না হলে আমার মানসিক যন্ত্রণা। একদিন মানসিক যন্ত্রণা হত,ফতুমার কোন অবহেলা পেলে। আজ মানসিক যন্ত্রণার এই যে পরিবর্তন, এর জন্যে দায়ী কে?

লুতুফ আর ভাবতে পারলো না। রাত্রির শেষ প্রহরের দিকে তাকিয়ে আবার সে ঘোড়ার ওপর উঠে বসলো। ফতুমার অচৈতন্য দেহ আগের মত হাতের বেষ্টনে জড়িয়ে ধরে আর ঘুমন্ত হানিফকে সাবধানে ধরে নিয়ে গতি দ্রুত করলো।

রাত্রের শেষ কতক্ষণ যে লুতুফ আলি অশ্ব চালিয়েছিল, মনে নেই। এমন কি সে আর বেটা হানিফ ও জোরু ফতুমার দিকে একবারও তাকিয়ে দেখে নি। হঠাৎ ভোরের আলো ফুটতে ও রাত্রি বিদায় নিতে সে চকিত হয়ে দেখতে পেল, দু'পথের মিলনস্থানে একটি ছোট্ট সরাইখানা।

সরাইখানাটি ছোট্ট হলেও পুষ্পোদ্যানের শোভা দিয়ে সাজানো। একটি কাঠের ছোট্ট দোতলা বাড়ি। নিচের দিকে খানাঘর। সম্ভবত অস্থায়ী লোকের জন্যে। উপরটি হয়তো বাসস্থানের জন্যে। লুতুফ অশ্ব নিয়ে সেখানে পৌছতে সরাইখানার ভেতর থেকে একটি পাগড়ী মাথায় বৃদ্ধ বেরিয়ে এল।

লুতুফ অশ্ব থেকে লাফিয়ে নেমে জিজ্ঞেস করলো,—আপনি কি এই সরাইয়ের মালিক?

বৃদ্ধ অমায়িক। বিনয়ে মোলায়েম স্বরে বললো,—হুজুর, ঐ নামেই আমায় সবই ডাকে।

তাহলে আমাকে কদিনের জন্যে একটা ঘর দিন, আর যদি এখানে কোন বদ্যি পাওয়া যায় তাকে একটু খবর দিন। আমার বিবি পথের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তার এখন শুশ্রূষার দরকার।

বৃদ্ধ মালিক হন্তদন্ত হয়ে 'আসছি' বলে সরাইখানার ভেতরে চলে গেল।

লুতুফ অশ্বের ওপর ঝুলে থাকা ফতুমার অচৈতন্য দেহের কা[illegible] সরে গেল। তারপর তার বুকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো, বুকের ধুক্‌ধুকুনিটা চলছে কিনা! চলছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সে চুপ করে মালিকের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলো। হানিফও পিছন দিকে অর্ধদেহ অশ্ব পিঠে দিয়ে ঘুমচ্ছিল, সেইদিকে তাকিয়ে লুতুফ ভাবলো, এই সরাইখানায় সে আশ্রয় নিচ্ছে বটে কিন্তু এদের ব্যয়ভার বহন করবার তার কোন সঙ্গতি নেই। যখন অর্থ চাইবে তখন তার অবস্থা কি হবে সে এখন ভাবতেই পারছে না। তবু এখন আশ্রয় না নিলে মৃত্যু অনিবার্য। ফতুমা নয় মরে যাবে কিন্তু সে কেন মরবে? তাকে বাঁচতেই হবে। তাই তার এখন বিশ্রাম দরকার। আর ক্ষুধাও প্রচণ্ড। না খেলে সে এক পাও চলতে পারবে না। হানিফও কদিন না খেয়ে আছে, তাকে আহার দিতে হবে। তাকে বাঁচাতে হবে। সে মানুষ হলে একদিন তার বৃদ্ধজীবনের সঙ্গতি।

এক রাত্রে সে অনেক পথ এসেছে। স্বাভাবিক অশ্বারোহণে যে দ্রুততা, তার চেয়েও সে বেশী দ্রুততা সৃষ্টি করেছে। মরুপ্রান্তরের অধিবাসী তারা, হিন্দুস্থানের মিষ্টি

আবহাওয়ায় সমতল ক্ষেত্রে চলতে তার কষ্টই হয় নি।

কিন্তু স্থানটির নাম কি? এখান থেকে দিল্লী কতদূর?

সেই সরাইখানার মালিকের সাথে একটি অল্পবয়সের বধূ এসে হাজির হল।

মালিক তাকে বললে,—এই বাবুজীর বিবি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে আরাম করতে হবে। তুই পারবি, না গেরাম্ থেকে বৈদ্য নিয়ে আসবো?

বধূ মাথার অবগুণ্ঠন আর একটু টেনে দিয়ে ফিসফিস করে বললো,—আগে দেখি বেমারী জব্বর কি না, তবে বলতে পারবো?

তাই শুনে লুতুফ বিস্ময়ে বললো—উনি বেমারী আচ্ছা করতে পারেন?

মালিক লজ্জিত হয়ে বললো,—থোড়া, থোড়া। তারপর বললো,—বাবুজী, আপনি একটু কোশিশ করে বিবিকে উপরে তুলে দিন তারপর শাওনী সব পারবে। ওর হাতে কত জেনানা আরাম হয়ে দেশ ঘর চলে গেছে।

লুতুফ শাওনীর দিকে আর একবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অশ্বের পিঠ থেকে ফতুমার অচৈতন্য দেহ তুলে নিল।

আর শাওনী নিজেই এগিয়ে এসে হানিফকে কোলে নিল।

তারপর উপরের একটি ছোট্ট ঘরে দুজনকে ছেড়ে দিয়ে লুতুফ নিচে এসে মালিকের সামনে আরাম করে বসলো।

বৃদ্ধ মালিকের বিনয় তখনও শেষ হয় নি। জিজ্ঞেস করলো,—বাবুজী, আপনি কোত্থেকে আসছেন?

লুতুফ কিছু ঢেকে সব বললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—এটা কোন জায়গা বলতে পারেন সর্দারজী?

বৃদ্ধ সর্দার তখন সিন্ধুর পঞ্চনদের নাম করলো। সিন্ধু, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, বিপাশা। আপনি এসেছেন বিতস্তার কিনারে। এখন থেকে মাত্র এক মাইলের মধ্যে বিতস্তার উপস্থিতি।

লুতুফ আলি আরবের লোক। এসব বুঝলো না, শুধু বুঝতে পারলো এখানে পাঁচটি বৃহৎ নদী আছে। এবং এক মাইল পথ গেলে একটি নদী দেখতে পাবে। সে জিজ্ঞেস করলো, দিল্লী এখান থেকে কতদূর সর্দারজী?

বৃদ্ধ সর্দার কপাল তুলে বললো,—বাস রে সেখানে আপনি কি যাবেন? এখান থেকে প্রায় বহু মাইলের পথ। আমি শুনেছি, সেখানে গেলে নাকি আর ফেরা যায় না। কে এক বিদেশী বাদশাহ দিল্লীর বাদশাহকে হারিয়ে সিংহাসন কায়েম করেছে। এখন দিল্লীতে তারই রাজত্ব। আর সে শয়তানের মত দিল্লীর সমস্ত মানুষের মুণ্ড ধড় থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। এমনটি আর কখনও শোনা যায় নি। আমি তো মোগল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবকেও দেখেছি, সে হিন্দুর ওপর কর বসিয়েছিল বটে কিন্তু এমনি নৃশংসভাবে কোতল করে নি।

লুতুফ জেনে নিয়েছিল, সরাইখানার মালিক জাতিতে শিখ এবং ঐ অল্পবয়সের বধূটি মালিকের বেটি নয়, ঘরবালী।

বেটি বলতে সর্দারজী লজ্জিত হয়ে বলেছিল, আমার চার নম্বর বিবি আছে বাবুজী। গুরুজীর দয়ায় আমার তিনটি বিবি স্বর্গে গেছে। একে শাদী করেছি শুধু এর গুণের জন্যে। এমন দাওয়াই বাতলাতে পারে যে, সব বেমার আরাম।

কিন্তু শাওনী এখানেই হার স্বীকার করলো। চারদিন গত হয়ে যাবার পরও ফতুমার জ্ঞান ফিরলো না। পাঁচ দিনের দিন শাওনী নিজেই সর্দারজীকে এসে বললো,—জল্‌দি গেরামে চলে যাও, সিংজীকে তুরন্ত নিয়ে এস।

সর্দারজী তার টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে দ্রুতই কোথায় যেন চলে গেল।

এদিকে লুতুফ তখন ফতুমার কথা ভাবছে না। ও কেমন করে যেন বুঝতে পেরেছে, ফতুমা বাঁচবে না। তাই তার কোন আশঙ্কা নেই। বরং যত শীঘ্র মারা যায় ততই মঙ্গল। অযথা বিলম্ব করে লাভ কি? এক রকম সে স্থির বিশ্বাসই করে ফেলেছে যে, ফতুমা মারা যাবে। আর হানিফকে সে এখানে শাওনীর কাছে রেখে চলে যাবে বাংলা মুল্লুকে। বাংলা মুল্লুকে কে যেন আলিবর্দি বলে এক তারই স্বজাতি মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেছেন। তিনি খুব দয়াবান লোক। গেলেই একটা যে কোন চাকরি দিয়ে দেবেন।

হঠাৎ তার বাংলায় যাওয়ার ইচ্ছা এমনিতে হয় নি, সে বাংলা কতদূর তাও জানে না। তারা আসবার দুদিন পরেই একজন অশ্বারোহী সরাইখানায় এসে উপস্থিত হল। শরীরে তার নবাব সৈন্যের পোষাক। মাথায় উষ্ণীষ, কোষবন্ধে তরবারী, উন্নতচেতা পুরুষ। বললে, জাতিতে হিন্দু। নাম বুলন্ত সিং।

লুতুফ তার সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো।

বুলন্ত সিংহ প্রথমে কোন কথা ফাঁস করলো না। বিশ্বাসী সৈনিক খবর নিয়ে দিল্লী গিয়েছিল কিন্তু দিল্লীর অবস্থা দেখে তাই ফিরছে। কাজ নিজের নয়, নতুন নবাব আলিবর্দী খাঁ বাহাদুরের। এদিক দিয়ে ফেরার কারণ, একবার নিজের বাড়িতে এসেছিল। সংবাদ পাঠিয়েছিল বিবির অসুখ কিন্তু গিয়ে দেখলো, বিবি বহালতবিয়তে খাচ্ছে, ঘুমচ্ছে। একটা রাত্রি থেকে চলে এসেছে। এখানে এসে ভাবছে, তুরন্ত মুর্শিদাবাদে ফিরবে, না বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করবে।

এসব কথা বুলন্ত সিং প্রথমে লুতুফ আলিকে বললো না। কারণ কোথায় কে গুপ্তচর বেশে লুকিয়ে আছে জানা নেই। শেষকালে পরিচয় দিয়ে কি বিপদে পড়বে?

কিন্তু লুতুফ আলি যখন নিজের পরিচয় দিল ও ভাগ্যান্বেষণে এদেশে এসেছে বললো. তখন বুলন্ত সিং আশ্বস্ত হয়ে লুতুফ আলির কাছে সব স্বীকার করলো। বললো,—আমি ভাবছি, এখন দিল্লী যাওয়া আমার যুক্তিযুক্ত হবে কি না! কারণ

আমি শুনে এসেছি, নাদীর শাহ স্বদেশে ফেরার জন্যে তোড়জোড় করছে। মুহম্মদ শাহ তাকে যথেষ্ট খাতির করে জামাই আদরে প্রাসাদে স্থান দিয়েছেন। আর দিয়েছেন সবচেয়ে খুবসুরত একশত রমণী, অঢেল দৌলত, যা এতদিন প্রাসাদের রত্নাগারে সঞ্চিত ছিল। পনের কোটি নগদ টাকা, পঞ্চাশ কোটি টাকার মণি-মাণিক্য ও অলঙ্কার। আর সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে, বাদশাহের পূর্বপুরুষ শাহজাহানের ভুবন-বিখ্যাত ময়ূরসিংহাসন ও প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ড কোহিনুর। কি করে যে মুহম্মদ শাহ নিয়ে যেতে হুকুম দিচ্ছেন? অবশ্য না দিয়েও উপায় নেই, নাদীর শাহের হাত থেকে প্রাণে বাঁচবার জন্যেই এগুলি দেওয়া।

তারপর বুলন্ত সিং খুব চাপাস্বরে বললো,—আমি দিল্লী আরো কেন গিয়েছিলাম জানো, নাদীর শাহের সৈন্যসংখ্যা কত দেখতে। কিন্তু বুঝতে পারলুম না।

লুতুফও চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলো,—উদ্দেশ্য?

একটু ইতস্তত করে বুলন্ত সিং বললো,—নবাব আলিবর্দীর একটি গোপন ইচ্ছে আছে। সে যাক্‌গে, আমাকেও যখন বলেনি, তখন অনুমান করা বৃথা। তাই আমার বড় মন খারাপ লাগছে, কোন কাজটা আমি হাসিল করতে পারলুম না। না পারলুম বাদশাহ মুহম্মদ শাহের সঙ্গে দেখা করতে, না নাদীর শাহের সৈন্যসংখ্যা জানতে। এ রকম কোনদিন আমার হয় নি। যত দোষ ঐ বিবির। তারই কথা মনের মধ্যে ছিল বলে সব কাজ পণ্ড হল। ভাবছি, আরো দু'চারদিন এই সরাইখানায় অপেক্ষা করে তারপর দিল্লী ঘুরে যাবো!

হঠাৎ লুতুফ সমর্থন করে বললো—তাই করুন সিপাহীজি। তাহলে হয়তো নাদীর শাহ চলে যেতে পারে। আর আপনি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে ফিরতে পারেন।

লুতুফেরও মনে মনে মতলব চলছিল, যদি এই বুলন্ত সিং যে কোন কারণে দু'পাঁচদিন আরো এখানে থাকে, তাহলে তার মধ্যে নিশ্চয় ফতুমা মারা যাবে। তখন এরই সাথে দিল্লী ঘুরে বাংলা মুল্লুকে যাওয়া যাবে।

ভেবেছিল মতলবটি পরে পেশ করবে কিন্তু মনের মধ্যে অদম্য এক আবেগ সৃষ্টি হতে লুতুফ আলি আর নিজেকে চেপে রাখতে পারলো না। বলে ফেললো,—একটা কথা বলবো সিপাহীজি! আমি ভাগ্যান্বেষণে এই হিন্দুস্তানে এসেছি। কিন্তু এসে দেখি, এখানে বহু আভ্যন্তরিণ গোলযোগ। বহু দল তার শক্তি বৃদ্ধি করে রাজ্য জয় করতে চাইছে। আমার ইচ্ছে, আমি একটি কোন দলে ভিড়ে সৈনিকের নোকরি নিই। ইচ্ছে ছিল, মোগল দরবারে গিয়ে নোকরি নেব কিন্তু মোগল দরবারে যে রকম হাল শুনছি, তাতে বেশীদিন মোগল বাদশাহ টিকবে বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর লুতুফ আলি থেমে বললো,—আপনি যদি কষ্ট করে আমাকে বাংলা মুল্লুকে নিয়ে যান, তাহলে বড় ভাল হয়।

বুলন্ত সিং হেসে বললো,—তুমি সৈনিকের নোকরি নেবে? কিন্তু এ নোকরিতে সর্বদা মৃত্যুরই সম্মুখীন হতে হয়। তোমার বালবাচ্চা আছে, বিবি আছে।

লুতুফ বললো,—বাচ্চা আমার একটি, তার আমি ব্যবস্থা একরকম পাকা করেছি। সে থাকবে এই সরাইখানার মালিকের বিবি শাওনীর কাছে। আর জোরুর যে অবস্থা সে বাঁচবে না।

বুলন্ত সিং হেসে বললো;—তুমি দেখছি সব পাকা করেই রেখেছ! শুনেছি তোমার বিবি বেশ সুন্দরী দেখতে। তা হঠাৎ তার মৃত্যু কামনা করছো কেন?

লুতুফ আলির ইচ্ছে করলো, ব্যাপারটা সব বলে। কিন্তু কাবুলের সেই ঘটনা, নাদীর শাহের সৈনিকের আক্রমণ সব চেপে গেল। বললে তারই তো দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়বে! তাই কথাটার অন্যভাবে উত্তর দেবার জন্যে বললো,—আওরত নিয়ে পথ চলায় অনেক বিঘ্ন। তার ওপর যদি খুবসুরত হয়। তাছাড়া যে বেমারীতে পড়েছে সে তা থেকে উদ্ধার পাবে বলে মনে হয় না। শাওনীবহিন তো দাওয়াই বাতলে নাজেহাল হয়ে গেল। হুঁশই ফেরে না তো দাওয়াই। তাই আমার মন বলছে, সে মারা যাবে।

বুলন্ত সিং তখন মনে মনে ভাবছিল, এই অপরিচিত লোকটিকে নিয়ে গেলে নবাব ক্ষুব্ধ হবেন কি না! তারপর ভাবলো, হয়তো খুশিই হবেন কারণ মারাঠারা সদলবলে বাংলা লুঠ করছে। এখন তার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া দরকার। আর তিনি গোপনে সেই সংখ্যাই বৃদ্ধি করে চলেছেন।

লুতুফ আলি দেখলো, বুলন্ত সিং যেন তন্ময় হয়ে ভাবছে, তাই সে সাগ্রহে বললো,—হুজুর কি মেহেরবানী করে আমাকে নিয়ে যেতে পারেন না?

বুলন্ত সিং লুতুফ আলির দিকে ফিরে বললো,—তুমি ঘোড়ায় চড়তে পারো?

লুতুফ আলি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—আপনি দেখেন নি, সরাইখানার পিছনে একটি অশ্ব রয়েছে, ওটি আমারই অশ্ব। আরবদেশের লোকেরা ঘোড়ায় চড়তে পারে না বললে লজ্জা দেওয়া হয়।

তুমি তরবারী চালাতে পারো?

হুজুরের যদি মেহেরবানী হয়, তাহলে একবার তরবারী দিয়ে পরীক্ষা দিতে পারি। তারপর লুতুফ গর্বের সঙ্গে বললো, শুধু আমি অস্ত্র চালাতে পারি না, আমার বিবিও পারে।

বুলন্ত সিং একবার সপ্রশংসদৃষ্টিতে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

লুতুফ তারপর আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলো—তাহলে আমার যাওয়া মঞ্জুর!

তারপর আরো তিনদিন চলে গেল। লুতুফ দিনরাত ভাবছে—হে আল্লা, ফতুমা না মারা গেলে বুলন্ত সিংয়ের সঙ্গে সে যেতে পারবে না। আর লক্ষ্য করছে, বুলন্ত সিং যাবার তোড়জোড় করছে কি না!

তারপর একদিন প্রত্যুষে সেই মুহূর্তটি এসে উপস্থিত হল। হয়তো আল্লা লুতুফের আর্জি শুনলেন। সর্দারজী ছুটলেন গেরাম থেকে বদ্যি আনতে।

ফতুমার জ্ঞান ফিরেছিল কিন্তু ফিরেই অন্য উপসর্গ শুরু হয়েছিল। চোখ দুটি ঘোলাটে হয়ে কেমন যেন মৃত্যুর মুখোমুখি পৌঁচেছিল। দেহের উত্তাপ এতটুকু কমেনি,

বরং উত্তাপের আধিক্য আরো প্রবল। সেই উত্তাপের মধ্যেই জ্ঞান এসেছিল কিন্তু শাওনীর ধারণা এ জ্ঞান, জ্ঞান নয়—বিকারের সৃষ্টি। তার ওপর সমস্ত শরীরটা নীল হয়ে বিকৃতাকার ধারণ করেছিল।

শাওনীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে লুতুফ মনে মনে উল্লসিত হল। আল্লা তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন। ফতুমা আর মরতে সময় নেবে না।

শাওনী চঞ্চল হয়ে বললো,—একবার চলুন ভাইসাহেব! হয়তো এ সময় আপনি কাছে থাকলে বহিনের আরাম হবে।

লুতুফ নিশ্চিন্ত হযে বললো,—কোন দরকার নেই বহিন। বরং আমি গেলে আবার মায়া বাড়বে। চলে যখন যাচ্ছে তখন মায়া বাড়লে আমার কলিজা ভেঙে যাবে। আমার ভবিষ্যৎ নষ্ট করে কাছে যেতে চাই না।

শাওনী এ কদিনে লুতুফ আলির অনেক কাছে চলে গিয়েছিল। দুজনের মধ্যে ভাইবোন সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছিল, শাওনী আগের মত অবগুণ্ঠনের আবরণ দিযে মুখ ঢাকে নি। কথাবার্তা প্রায় সোজাসুজি বলতো।

তাই বললো,—ভাইসাহেব, এ রকম বলতে হয় না। বহিন বাঁচবে না কে আপনাকে বললো? তার আরামের জন্যেই তো সর্দারজীকে গেরামে পাঠিয়েছি।

বলার সঙ্গে সঙ্গে লুতুফের মুখ শুকিয়ে গেল। বললো,—তাহলে ফতুমা বাঁচবে?

শাওনী লুতুফের মনের কথা বুঝলো না, বললো—বেমার কি কারুর হয় না? আপনি এত হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন কেন? আমি তো সর্দারজীকে প্রথম থেকেই বলেছিলাম। এতদিন গেরাম থেকে বদ্যি এলে কবে সারিয়ে তুলতো।

লুতুফ কেমন যেন দমে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সর্দারজীর পিছন পিছন বদ্যি এসে উপস্থিত হল।

বদ্যিকে দেখে আরো লুতুফ ক্ষিপ্ত হল এবং মনে মনে দারুণ দুর্বলতা অনুভব করলো। তাহলে তো ফতুমা বেঁচে যাবে? বৈদ্য সারিয়ে তুলবে ফতুমাকে। ফতুমা জীবিত হলে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। তার যাওয়া হবে না সৈনিকের সঙ্গে। বাংলার নবাবের সৈন্যবাহিনীতে নোকৃরি মিলবে না। ফতুমার বোঝা নিয়ে আবার তাকে মুসাফিরের মত দেশ দেশান্তর ঘুরতে হবে। আবার হয়তো কোনো লুব্ধ জোয়ান পুরুষ ফতুমার ইজ্জত হরণ করবে। আবার ফতুমাকে বাঁচানোর জন্যে তার শক্তি পরীক্ষা দিতে হবে। ... আবার সেই একই পুনরাবৃত্তি সারাজীবন ধরে করে যেতে হবে। কোন আশা, আকাঙ্ক্ষা কিছুই নেই। একটি পঙ্গু মরদের মত বৃদ্ধের ভূমিকা নিয়ে নষ্ট জোরুর মানভঞ্জন করতে হবে।

এইসব এতরকম ভবিষ্যতের কথা মনে করে কেমন যেন লুতুফের মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। সে যেন কেমন স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেল। হঠাৎ সে যেন বিসদৃশ আচরণ করে ফেললো।

সরাইখানার সর্দারের সঙ্গে বৈদ্যকে দেখে চিৎকার করে বলে উঠলো,—আপনি এসেছেন কেন বৈদ্যমহাশয়? যাকে দেখবেন সে আমার বিবি। সে ভাল হবে না,

আমি জানি। শুধু শুধু আপনি ক্লেশ অনুভব করবেন, ও রোগ সারবার নয়, ওর মৃত্যুই হবে।

বস্তি একটু মনে মনে ঘাবড়ে গেল। সর্দারজীর মুখের দিকে তাকিয়ে লুতুফ আলিকে বললো,—আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বেশ, রোগ যদি নাই সারে, দেখেই রায় দিয়ে চলে যাবো।

শাওনী চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসেছিল, সে লুতুফ আলির কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। নিজের স্ত্রীর প্রতি এমনি বিস্ময়কর আচরণের কোন হেতুই সে চিন্তা করতে পারলো না। তাই বস্তিকে গম্ভীরস্বরে বললো,—সিংজী, আপনি ওপরে আসুন। অযথা সময় নষ্ট করে রোগীর বিপদ ডেকে আনবেন না!

সিংজী শাওনীর আমন্ত্রণে নিশ্চিন্ত হয়ে এগোতে গিয়ে আবার বাধা পেল।

লুতুফ আলি গর্জে উঠলো,—খবরদার, বিনা হুকুমে আর এক পাও এগোবেন না। যদি এগোন তাহলে, এই বলে সে তরবারী বের করলো। আমার বিবি, আমি যা বলবো তাই হবে।

গোলমাল শুনে সেই বুলন্ত সিং আর থাকতে পারলো না, বেরিয়ে এলো। এসে এই পরিস্থিতি দেখে সে ব্যাপারটা একটু আন্দাজ করে নিল। সে সৈনিক, অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়ে তাকে জীবনে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই লুতুফ আলির স্বার্থপরতায় বিস্মিত হল না। শুধু লুতুফ আলির তরবারী উন্মোচিত হতে দেখে নিজে এগিয়ে এলো তরবারী উন্মোচন করে তারপর বজ্রগম্ভীরস্বরে বললো,—পরদেশী, তোমার ঔদ্ধত্য আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করেছে। তুমি সামান্য দুই বৃদ্ধ ও একটি জেনানার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে তরবারী উন্মোচন কর! তোমার স্পর্ধা দেখেই আমাকে বাধ্য হয়ে এগিয়ে আসতে হল, নাও, শক্তির পরীক্ষা দাও। এই বলে বুলন্ত সিং তরবারী ধারণ করে লুতুফ আলিকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করলো।

শাওনী আবহাওয়া আরো জটিল হয়ে উঠছে দেখে, আর দূরে থাকতে পারলো না, ছুটে এসে দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে বুলন্ত সিংকে মিনতি করে বললো,—সিপাইজী আপনার ভাইসাহেবকে ক্ষমা করুন। তাঁর মাথার ঠিক নেই বলে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে।

বুলন্ত সিং খুশি হয়ে সরে দাঁড়ালো।

আর লুতুফ আলি ভাবতে লাগলো, কাজটা বোধ হয় সে অন্যায় করে ফেললো। এরকম একটি ঘটনা যে ঘটতে পারে, একটু আগেও ভাবে নি। অত তলিয়ে যদি সে ভাবতো, তাহলে একবার চিন্তা করে নিত—গোপন ইচ্ছাটা প্রকাশ হয়ে গেলে সে অন্যের কাছ থেকে কি রকম আচরণ পাবে। নাহলে হঠাৎ তরবারী উন্মোচন করেই বা বস্তিকে ভয় দেখালো কেন? তখন তার মনের মধ্যে শাওনীর কথাগুলি ছিল বলেই এই আচরণ করেছে। শাওনী বলেছিল, 'বস্তি এলে দেখবেন ঠিক আপনার বিবি ভাল হয়ে উঠবে, এ মামুলি বেমার, ভাবনার কিছু নেই।'

কিন্তু লুতুফ আলির ভাবনা যে তা নয়, সেকথা শাওনী জানবে কেমন করে? যদি

তখন শাওনী বুঝতে পারতো, লুতুফ আলি সত্যি তার বিবির মৃত্যু চায়, তাহলে হয়তো শাওনী তখনই বিস্মিত হত।

কিন্তু এখন এই পরিস্থিতির উদয় হতে সকলেই জানলো। জানবার পর সকলেই তার দিকে ঘৃণামিশ্রিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে চলে গেল।

বদ্যিকে নিয়ে শাওনী ও সর্দারজী ওপরে চলে গেল। তারা এমনভাবে গেল যেন এই এতক্ষণ সময় একটি বাজে লোক নষ্ট করে দিল বলে বিরক্ত। ফতুমা যে লুতুফের কেউ হয়, তারা মনেই রাখলো না। এখন তাদের ফতুমাকে বাঁচানোই একান্ত কর্তব্য। একটি প্রাণকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করা।

লুতুফ আলি তা বুঝতে পারলো। বুঝতে পেরে মনে মনে অনুতাপ করে বললো,—হায় রে আজ সকলেই ফতুমার আপন হল। শুধু সেই হয়ে গেল পর। অথচ একদিন ছিল। সেদিন ছুনিয়ার সকলেই পর ছিল, আর লুতুফ আলি ফতুমার অতি আপন ছিল। আজ কেন ফতুমার মৃত্যু চাইছে, কেউ যদি বুঝতো? কেউ যদি জানতো, যা তারা প্রকাশ্যে জানলো তাই আসল নয়। লুতুফ আলি নিজের স্বার্থের জন্যেই শুধু জোরুর মৃত্যু কামনা করছে না।

লুতুফ আলির চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগলো। ফতুমার জন্যে সে অপমানিত হল। ফতুমার জন্যে আরো কত অসম্মান কপালে লেখা আছে, কে জানে?

বুলন্ত সিং দূরে দাঁড়িয়েছিল। লুতুফ আলির চোখে জল দেখে কাছে এল। তার কাঁধের ওপর একখানি হাত তুলে দিয়ে বললো, রোনামত আলিসাহেব। তোমার দুঃখ আমি বুঝি। কিন্তু তাই বলে তোমার বিবির মৃত্যু কামনা করা উচিত হয়নি। জিন্দা রনা ছুনিয়ায় মুশকিল হায়। তোমার বিবি যদি বাঁচে, তুমি তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পার না। হত্যাকারীর বেঁচে থাকা ছুনিযায় মুশকিল। তুমি হত্যাকারী হয়ে কাজও করতে পারবে না, শক্তিও পাবে না। মনের মধ্যে কেবল অনুতাপ এসে তোমার সব শক্তি কেড়ে নেবে।

বুলন্ত সিং সান্ত্বনা দিয়ে চলে গেল।

বাচ্চা লড়কা হানিফ অপটু পায়ে টলমল করে পিতার কাছে এসে দাঁড়ালো।

পরম সান্ত্বনার যেন আধার। এমনি হানিফকে মনে করে লুতুফ তাকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা পেতে চাইলো। কিন্তু আরো তার চোখের জল হুহু করে বেরিয়ে এল এবং বুকের ভেতরটা আরো আলোড়ন জেগে তার পাঁজরাগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে লাগলো।

এই সময় ওপর থেকে শাওনীর কান্না ভেসে এল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে বদ্যি নিচে নেমে এলো। এসে লুতুফের দিকে চেয়ে বললো—মশাই, আপনার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়েছে। রুগী মৃত্যুর দিকে পা বাড়িয়েছে। আর অল্পক্ষণ পরেই তার প্রাণ স্বর্গে চলে যাবে। যদি আর একদিন আগে খবর পেতাম

তাহলে হয়তো আওরতটি বেঁচে যেত। তারপর একটু ম্লান হেসে বললো,—আপনি তো তার জীবন চাননি, তাই হয়তো গুরুজী তাকে তুলে নিলেন।

বস্তির আঘাত তখন লুতুফের মন স্পর্শ করলো না। তখন তার মন চলে গেছে উপরের সেই কান্নার দিকে। খানিকটা অবাক, খানিকটা বিস্ময়, খানিকটা কেমন যেন উপলব্ধির বাইরের দুর্বোধ্য অনুভূতি। 'ফতুমা তাহলে সত্যিই চলে গেল?' এই কথাটা মনের মধ্যে আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে কেমন যেন তার চেতনা লুপ্ত হয়ে গেল। সে চেতনাহীন এক অন্য জগতে চলে গিয়ে ফতুমার কাতর সেই মুখখানা দেখতে লাগলো। ফতুমা কাঁদতে কাঁদতে বলছে, আলিসাহেব তুমি কি আমার কাছ থেকে কিছুই পাওনি? তবে আমার এই আওরতজীবনের পূজা কার কাছে নিবেদন করলাম? কে নিল আমার দেহভরা ঐশ্বরিক যৌবনের সুধা হরণ করে? কার জন্যে আমি এই দুনিয়ায় জন্ম নিলাম?......তবে কেন তুমি আমার মৃত্যু চাইলে? তবে কেন আমাকে তুমি হত্যা করলে? আমার যে পাপ সে তো তোমারই জন্যে। তুমি যদি ভাগ্যান্বেষণে অবরোধ প্রথা তুলে পথে এনে বের না করতে দুর্বৃত্ত কি আমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারতো? তুমি আমার রক্ষাকর্তা হয়ে তুমি আমাকে রক্ষা করতে পারলে না! আবার তুমিই আমার পাপের জন্যে আমাকে বধ করলে। বেশ, আমি চলে গেলাম। এবার তুমি শান্তিতে জীবন যাপন কর। ভাগ্য ফেরাও। দৌলতের সিংহাসনে বসে অন্য এক আওরতকে ঘরে নিয়ে এস। তাকে মহব্বত দিও। তার প্রতি কর্তব্য কর। আমার কথা ভুলে যেও।

লুতুফ শুনতে পেল দূর, বহুদূর থেকে ক্ষীণস্বরে কে যেন তাকে বলছে,—আমার কথা ভুলে যেও!

কান্নাটা যেন অনেক কাছে এসে গেছে। কানের মধ্যে প্রবেশ করে বুকের কোমল শিরাগুলোয় বীণার তারের মত ঝঙ্কার দিচ্ছে। আন্দোলিত হচ্ছে কুসুম শিরাগুলি। হঠাৎ তার ঝাপসা চক্ষুদুটি স্বচ্ছ হয়ে গেল।

সে দেখতে পেল ফতুমার শীর্ণ মুখখানি। যেন একখণ্ড রক্তগোলাপ অনাদরে শুষ্কপ্রায় হয়ে ম্লান হয়ে পড়ে আছে। বিছানার সঙ্গে কৃশকায় শরীর একেবারে মিশে গেছে। সেই পাঁচদিন আগে দেখা ফতুমা যেন এ নয়। এ অন্য একটি আওরত কিম্বা ফতুমার কঙ্কাল। এই পাঁচদিন সে একবারও আসেনি ওপরে। ঘরটি অবশ্য তাকেই দেওয়া, অথচ সে শুয়েছে নিচে মালিক সর্দারের পাশে। শাওনীকে বলেছে—'বহিন, রোগীর কছে আমাকে থাকতে বল না। ও আমার ধাতে সয় না। তাছাড়া তুমি যখন আছো, আমার ভাবনা কি?'

শাওনী তখন অন্যকিছু ভাবেনি। বরং এই ভেবেছে, রোগীর যে অবস্থা তাতে তার কাছে থাকাই উচিত। যখন তখন যে কোন ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। তাই পীড়াপীড়ি করেনি। কিন্তু এই পাঁচদিন ধরে যে একবারও সে ফতুমাকে দেখতে যায়নি, তা বোধহয় শাওনী লক্ষ্য করেছে। নিজের বিবিকে যে এমনি করে কেউ অবহেলা করে, এ দৃষ্টান্ত বিরল।

সে সব কথা এখন আর ভাবা অবান্তর। কারণ, এখন সবাই জানে সে আসলো কি চেয়েছিল?

ঘরে ঢুকতে শাওনী তার দিকে তাকিয়ে কান্না সংবরণ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হানিফকে পাশে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে গেল ফতুমার মরণোন্মুখ দেহের দিকে। ঘরে আর কেউ ছিল না। মাত্র একটি ছোট বিছানা ঘরের মেঝের ওপর পাতা। শুভ্র বিছানার ওপর শীর্ণ একটি কুসুম।

লুতুফ ফতুমার কাছে ঘন হয়ে বসলো। যেমনটি আগে স্ত্রীর পাশে স্বামী বসতো। প্রথম শাদীর আয়োজন সর্বজন সমর্থিত হবার পর যে নিশ্চিন্ত অভিসার রচনা হয়েছিল। সেই নিরুদ্বেগের অভিসার রচনার জন্যে যেন লুতুফ আলি আবার ফতুমার পাশে বসলো। কিন্তু শুধু একটু পরিবর্তন। একপক্ষ এগিয়ে গেল, অন্যপক্ষ এল না। অথচ আগে এই অন্যপক্ষই আরো প্রাণবন্ত, সজীব ও আগ্রহশীল ছিল। সে সময় হলে হয়তো এখুনি ফতুমা দয়িতের কণ্ঠাবেষ্টন করে গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করতো।

লুতুফ মুখের ওপর ঝুঁকে পড়তে কানের মধ্যে এক অস্বাভাবিক ঘড়ঘড় শব্দ শুনতে পেল। শুনতে পেল বুকের ওপর কান দিয়ে মৃত্যুর যন্ত্রণায় কাতর চঞ্চল স্নায়ুগুলির শেষ চলমান ক্রিয়া।

বোধ হয় স্পর্শেই হোক্ বা শেষ সময় হোক্—একবার মরণোন্মুখ রমণী ঘোলাটে চোখে চতুর্দিকে তাকালো। তারপর খুঁজতে খুঁজতে লুতুফের মুখের ওপর নিবদ্ধ হল। কি যেন বলতে চাইলো ফতুমা। থরথর করে ঠোঁটদুটি বলার চেষ্টায় কাঁপতে লাগলো। লুতুফ তার একটি কান ফতুমার মুখের কাছে নিয়ে গেল কিন্তু ফতুমা কোন কথা বলতে পারলো না, শুধু হাত দিয়ে পাশে দণ্ডায়মান হানিফকে দেখালো। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

লুতুফ বুঝতে পারলো, ফতুমা বলতে চাইছে, হানিফকে দেখবার জন্যে। সে একটু অনুচ্চস্বরে বললো,—আমি দেখবো।

হঠাৎ আবার কি যেন ফতুমা বলতে চাইলো। আবার তার ঠোঁটদুটি থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কিন্তু কথাও বেরোল না, আর সে ইশারাও করতে পারলো না। দারুণ একটি ঝাঁকি দিয়ে দেহটা হঠাৎ অনড় হয়ে গেল।

লুতুফ আছড়ে পড়লো মৃতদেহের বুকের ওপর। তার সমস্ত দেহ মথিত করে চিৎকার বেরিয়ে এলো,—ফতুমা, তুই সত্যিই চলে গেলি! আমি চেয়েছিলাম তোর মৃত্যু। সে কথা তুই কেমন করে বুঝলি? আমি তো তোকে কখনও বলিনি...! লুতুফ ফতুমার বুকের ওপর পড়ে লুটোপুটি খেতে লাগলো। যেন একটি বাঁধভাঙা সমুদ্রের কূল; আকুল জলস্রোতের মত্ত ধেয়ে এসে সমস্ত প্রান্তর ছাপাছাপি করে দিয়ে গেল। যেন একটি অবোধ শিশু, কান্নায় ভেঙে পড়ে তার ব্যাকুলতা জানাতে লাগলো।

হানিফ আব্বার কান্না দেখে নিজেও আম্মা, আম্মা বলে কাঁদতে লাগলো।

শাওনী এসে ঘরে ঢুকলো। সে নিঃশব্দে মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গিয়ে চাদর দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিল। তারপর বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললো,—ভাইসাহেব, বাহার

চলো। জোয়ান মর্দানার কান্না শোভা পায় না।

লুতুফ হঠাৎ কান্না রোধ করে নিল। তাই তো, কাঁদা উচিত নয়। সে কেন কাঁদছে? সবাই জানে, সে ফতুমার মৃত্যু চেয়েছিল। আজ ফতুমা মরেছে, তার জন্যে কান্না কেন? সে আজ মুক্তি পেয়েছে। তার আর কোন বাধা নেই। সে মুক্তপুরুষ। বিহঙ্গের মত। যেথায় খুশি সে চলে যেতে পারবে। যা খুশি সে করতে পারবে। হানিফকে কোথাও জমা দিয়ে নিরুদ্দেশের পথে চলে যাবে। ফতুমা শেষ সময় বলেছে, হানিফকে দেখতে। কে দেখবে ফতুমার সন্তানকে? ফতুমাই যখন তার অবহেলিত, তখন তার বেটার মূল্য কি?

হাঃ হাঃ হাঃ আজ উল্লাস, আজ উল্লাস—আজ আমার মত নিশ্চিন্ত কে? লুতুফ উঠে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করতে করতে বেরিয়ে গেল।

তাই দেখে শাওনী চিৎকার করে আঁতকে বললে—ভাইসাহেব, এ তুমি কি করছো? তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

মালিক সর্দার ছুটে এল, এসে তাড়াতাড়ি লুতুফের হাত ধরতে গেল।

লুতুফ আবার খুশিতে অট্টহাস করে বললো,—মেরে সর্দারজী, আজ আমি বহুৎ খুশ। আজ আমার বিবি সরে পড়েছে আমারই ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বলুন তো কি আনন্দ? আজ আমার ইচ্ছে করছে, আপনার সরাইখানায় দারুণ একটা ভোজ দিই। আপনি তার ব্যবস্থা করে দেবেন?

বুলন্ত সিং গোলমাল শুনে আবারও বেরিয়ে এল, এসে লুতুফের বিবি মারা গেছে শুনে লুতুফকে জড়িয়ে ধরে তার ঘরের দিকে নিয়ে গেলো।

লুতুফ তখনও কেমন যেন উল্লসিতস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলো,—সিপাহীজি এবার তো আমার যাওয়ার কোন প্রতিবন্ধক নেই! এবার নিশ্চয় আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন।

একটা লোক নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে কত কষ্ট করেছে, লুতুফ আলি তার জলন্ত দৃষ্টান্ত। যতগুলি মানুষকে বয়ে নিয়ে সে আরব ছেড়েছিল, সবাই চলে গেছে। এখন অবশিষ্ট সে নিজে ও একটি তিন বছরের বাচ্চা। তাই যদি তার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, তাতে কি খুব অন্যায় হয়েছে?

ফতুমার মৃত্যু সে পরে চেয়েছিল কিন্তু আগে চায়নি। অনেক পরে, যখন সে দেখলো, ফতুমাকে নিয়ে পথ চলায় অনেক বিড়ম্বনা। সুন্দরী বিবি যার আছে, তার এভাবে ঘরের বাইরে ঘুরে বেড়ানো যুক্তিযুক্ত নয়। মণিমাণিক্যের পাশে যখের প্রহরী হয়ে থাকলেও তাকে রক্ষা করা যায় না বরং রক্ষা করতে গিয়ে নিজের শক্তি ও সামর্থ্য ঐ কাজেই ব্যয় করতে হয়। অন্যচিন্তা ও সঙ্কল্প দূরে সরিয়ে দিতে হয়। তবু এসব স্বীকার করেও

লুতুফ আলি এগিয়ে চলতো। ঐ কারণের জন্যে ফতুমার মৃত্যু কামনা করতো না। ফতুমা আর জীবনীশক্তি, পাশে সে না থাকলে শক্তি সঞ্চয়ই হবে না, এই ধারণা বরাবর ছিল বলে প্রথম দুর্বৃত্ত কর্তৃক লুণ্ঠিত হতে সে নিজের প্রয়োজনের জন্যেই ফতুমাকে ক্ষমা করেছিল এবং তার অক্ষমতা প্রকাশ করে আবার তাকে আপন করে নিয়েছিল কিন্তু তার চৈতন্যোদয় হল, সৈনিকের কুঠিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভূমিকায় ফতুমাকে দেখে। তাই তার মনে হয়েছিল, তার জোরুকে সে যেমন ভাবে দেখেছিল, তাকে অন্য লোকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে দেখে। তাকে নিয়ে অন্য লোকে আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারে, সে পারে না—কারণ সে ফতুমার স্বামী। তার ভূমিকা অন্য। তার ভূমিকা জোরুর প্রতি মরদের কর্তব্য। সে ভালবাসতে পারে। মহব্বতের সুরভিতে রাঙা করে স্ত্রীকে দিতে পারে ঐশ্বরিক সুখ। পাশবিকতা চরিতার্থ করতে পারে না। বল-পূর্বক কিছু গ্রহণ করতে পারে না। বিবির ইচ্ছার ওপরই তার সুখের প্রাসাদ।

এও না হয় গেল স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের দেওয়া নেওয়া। তাও না হয় স্বীকার করে নিল। কিন্তু ফতুমা? তার অবস্থা চিন্তা করা যায় না। সে সেই হিন্দুস্তানে পৌঁছতে পৌঁছতে দুবার হস্তান্তরিত হয়ে গেল। আরো কতবার এমনি তাকে অত্যাচারিত হতে হত। আওরতের এই যে নির্যাতন, এও কম নির্মম নয়। ফতুমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে দেখেছে, কী বেদনা সেই সুন্দর মুখের সমস্তটুকু নীল করে দিয়েছিল। মুখের ভাষায় সে ব্যক্ত করতে পারে নি, কিন্তু অব্যক্ত সেই বেদনা কি লুকানো ছিল? আবে-দীনের পাশবিকতাও যেমন তাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তেমনি পরবর্তী সৈনিকের অত্যাচারও তাকে মাথা তুলতে দেয়নি। তাই শেষবারের ধাক্কায় তাকে একেবারে শয্যাশায়ী করেছিল। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত জ্ঞান তার ফেরেনি।

লুতুফ মৃত্যু কামনা করলেও মৃত্যুকে ঠেকিয়ে কেউ ফতুমাকে বাঁচাতে পারতো না। সরাইখানার লোকেরা কেউ ফতুমার অতীত ইতিহাস জানতো না বলে লুতুফকে দোষ দিয়েছে। যদি জানতো, যদি লুতুফ আলি বিবির স্খলনের ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারতো তাহলে হয়তো ফতুমার হিতৈষীরা বলতো, এ ভালই হয়েছে। না মরলেই বরং বেদনাটা আরো দেহ মথিত করতো।

কিন্তু বলতে পারেনি, বলতে পারা যায় না বলেই সরাইখানার অধিবাসীদের চোখে সে হেয়।

সে ছোট হয়েছে শুধু তার পরবর্তী আচরণ প্রকাশ করে। মরে যখন যাবেই তখন অযথা বিলম্ব কেন? লুতুফ আলি বুলন্ত সিং আসার পরেই এসব কথা ভাবতে শুরু করেছিল। তার ব্যগ্রভাবও এইজন্যেই জেগেছে। আর সেইজন্যেই সে বদ্যি আসতে অমন অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ করে শাওনির চোখে ছোট হয়ে গিয়েছিল।

. শাওনীর কাছে লুতুফ আলি ফতুমার মৃত্যুর চারদিন পরেও ছোটে হয়ে থাকলো। যে পরম আন্তরিকতায় অন্যধর্মের লোককেও ভাইসাহেব বলে সম্বোধন করেছে, সেই লোকের ব্যবহারে এত সে মর্মাহত হল যে, কদিন লুতুফ আলির সামনেই এল না। অথচ মাত্র একটি কাঠের ব্যবধান।

সেই কাঠের প্রাচীরের ওপাশ থেকে লুতুফের শোকসন্তপ্ত মনের অনেক কথাই শুনতে লাগলো। তার রোদনও কানের মধ্যে পৌঁছলো। তার ক'দিন ধরে অনাহারও সে স্বচক্ষে দেখলো। তবু গিয়ে বললো না—ভাইসাহেব, খানাপিনা করে নাও। যা হবার সে তো হয়ে গেছে!

সর্দারজী গিয়ে বলতে শাওনী ঘৃণাভরে বলেছিল—তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি ঐ বদমাইস লোকটাকে গিয়ে খোসামুদি কর, আমি করবো না। যে বিবির মৃত্যু কামনা করে মনে করেছ সে মানুষ? তোমরা, পুরুষরা সব পারো, সে আমি দেখতে পাচ্ছি। তারপর কান্নারোধ করে বলেছিল একটি ফুলের মত সুন্দর আওরত। আমি তার সঙ্গে কথা বলিনি। সে একটি কথাও আমার সঙ্গে বলবার সুযোগ পায নি। কিন্তু না বললেও তার মুখ দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, সে কত সরল! সে কত নিষ্পাপ! সেই সরল, নিষ্পাপ আওরতেরও শত্রু আছে, এ ভাবতে গেলেই কেমন যেন দিল ধড়ফড় করে ওঠে। আর সেই আওরতের ঐ স্বামী!

সর্দারজী বোঝাতে চেষ্টা করলো,—দেখ, শাওন, এসব ওদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমাদের তার মধ্যে মাথা না গলানোই ভাল।

শাওনী ক্ষিপ্ত হয়ে গর্জে উঠলো,—হ্যাঁ, ব্যক্তিগত হতে পারে। তবে মানুষের প্রত্যক্ষ আচরণের সমালোচনা করবার অধিকার সব মানুষেরই আছে। তুমি যখন ঐ আলি সাহেবের মুমূর্ষ বিবিকে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে তখন আমি কি বলেছিলাম, এসব ঝামেলা আমি গ্রহণ করতে পারবো না।

সর্দারজী হেসে বললেন—তোর কথা শাওন আলাদা। তুই আছিস বলেই তো এই সরাইখানা টিকিয়ে রেখেছি। এর মধ্যে তো কত লোক এসেছে, তাদের অসুখ করতে কি তুই ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তুলিস্ নি? তবে আজ কেন এত গোসা করছিস?

শাওনী একটু শান্ত হয়ে বললো,—আমার ঐ মৃত জেনানার জন্যেই দুঃখ হচ্ছে। সে কী সোয়ামী নিয়েই ঘর করতো? মেয়েটি মরে গেল তাই, নাহলে জিন্দা থাকলে আমি তাকে আমার কাছেই রেখে দিতাম। দিতাম না আর ঐ বদমাইস আদমির সাথে সাথে পথে ঘুরতে।

শাওনী সত্যিই রেগেছিল। তার রমণী মনের কোথায় যেন অপমানের জ্বালা সৃষ্টি হয়েছিল যার জন্যে সে কিছুতেই লুতুফ আলিকে বরদাস্ত করতে পারলো না।

লুতুফ আলি সেটা বুঝে আরো মর্মাহত হল।

একবার তার মনে হল, সে ছুটে গিয়ে শাওনীকে সব কথা বলে। বলে, তুমি রমণী হয়ে বিচার কর, আমার দোষ কতখানি! তারপর ভাবলো, লাভই বা কি এতে? শাওনীর ভুল ভাঙাতে গেলে ফতুমার ইতিহাস বলতে হবে। ফতুমার ইতিহাস শুনে যদি তার ধারণা পালটে যায়? ফতুমার সঙ্গে আলাপ না হতেই সে তার রমণী মন দিয়ে ফতুমাকে ভালবেসেছিল। এখন ইতিহাস শোনার পর যদি ফতুমার প্রতি তার ঘৃণা ঝরে পড়ে? মৃত রমণীটি শেষদিনে অনেক নির্যাতন সয়ে গেছে। যদি ভুল ধারনা নিয়ে একজনের মহব্বত পেয়ে থাকে, আর মরার পর কেন তাকে যন্ত্রণা দেওয়া! তাই

শাওনীর ধারণা পালটে ফতুমাকে ছোট করতে পারলো না।

ফতুমা আর যার কাছে যেমনিই ব্যবহার পাক্—তার একান্ত আপনার সে। সে, পরবর্তী সময়ে মৃত্যু চাইলেও পূর্বে কখনও অবহেলা করে নি। পূর্বে যেমন ছিল, মৃত্যুর পর সেই ভালবাসাটাই আবার ফিরে এসেছে।

তারই জন্যে আর কিছু ভাল লাগছে না। শাওনী যাই মনে করুক। সর্দারজী, বুলন্ত সিং, সর্দারজীর নফর হনুমান তাকে নিয়ে যত আলোচনাই করুক, সে বেশ ভাল করেই জানে, আজ তার মনের মধ্যে ফতুমার স্থান কতখানি ?

ফতুমা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বার পর তার শোকের রূপান্তর অন্যভাবে হয়েছিল। তার কিছু মনে ছিল না, বুলন্ত সিং বলেছিল, সে নাকি পাগলের মত অট্টহাসি হেসে সমস্ত দুনিয়া চৌচির করে দিতে চেয়েছিল।

সে কথা হয়ত মিথ্যা নয়। শোক কখনও অভিনয়ের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না, আঘাত না পেলে চোখে যেমন জল আসে না, আবার অনেক বেশী আঘাত পেলে মস্তিষ্কের হঠাৎ ক্রিয়াও পথ পরিবর্তন করে। তার সে সময় সেই অবস্থা হয়েছিল। ফতুমা মরে যেতে সে বুঝতে পেরেছিল, সে কি হারালো ? কি তার গেল ? কি সে আর কখনও ফিরে পাবে না।

তখন আর মনে আসে নি, সে বুলন্ত সিংয়ের সঙ্গে যাবে বলে নিঝঞ্ঝাট হতে চেয়েছিল। ফতুমার মৃত্যু চেয়েছিল তার স্খলিত জীবনের জন্যে। ফতুমার মৃত্যু চেয়েছিল সে আর আগের মত ফতুমার সঙ্গে স্বামীর কর্তব্য করতে পারবে না বলে।

তার জ্ঞান ছিল না। সে বুলন্ত সিংয়ের কাছে শুনেছিল কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় সে এমন আচরণ প্রকাশ করেছিল, যা কখনও বুলন্ত সিং দেখেনি। পরে হেসে বলেছিল, —আলিসাহেব তুমিই বিবির বিয়োগ বেদনায় দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করলে। এমন মোগল বাদশাহ শাহজাহানও পত্নীর জন্যে সৃষ্টি করতে পারেন নি।

জ্ঞান তার ফেরার পর ফতুমার কবরের জন্যে তাকে বলা হয়েছিল। সে ক্রন্দন-মুখরিত স্বরে বলেছিল, আমাকে মাপ করতে হবে সর্দারজী! আমি পারবো না। যে বিবিকে আমি মহব্বতের সোহাগ দিয়ে আলিঙ্গন করেছি, তাকে মাটি চাপা দিতে পারবো না।

তবু তাকে যেতে হয়েছিল। যেতে হয়েছিল সেই বিতস্তা নদীর কিনারে। নিজের হাতে কোদাল দিয়ে মাটি সরিয়ে গর্ত করতে হয়েছিল। তারপর যেমন করে সেই মরুভূমির বালি সরিয়ে আব্বা ও আম্মার ঝলসানো দেহ কবরে শুইয়ে দিয়েছিল, তেমনি করে শুইয়ে দিয়েছিল ফতুমার নিদ্রিত দেহটি। আব্বা ও আম্মার কবরের সময় ফতুমা পাশে ছিল, আর ছিল ফতুমার ওপর আক্রোশ। সেদিন সে বলেছিল—তোর জন্যেই এরা দুজন মরলো ? আজ ফতুমাকে শুইয়ে দিয়ে কিছুই বলতে পারলো না কিন্তু অবচেতন মনে এল, এর মৃত্যুর জন্যে দায়ী সে। কিন্তু কে দেবে তার শাস্তি ? ফতুমাকে রক্ষা করতে পারে নি বলেই আজ সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। নাহলে তারও কি বাঁচবার সাধ ছিল না ? তারও কি স্বামীর সাথে এসে হিন্দুস্তানে দৌলতের রানী হবে,

এ বাসনা ছিল না ?

কবরে শুইয়ে দিয়ে তাই সে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ ফতুমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সমস্ত শান্তির প্রলেপ মুখে মেখে নিয়ে পরম শান্তি পেয়েছে ফতুমা। আর সে দিয়ে গেছে তার দয়িতকে দারুণ এক তীব্র যন্ত্রণা। কে শাস্তি পেল ? ফতুমা না সে ! হৃদয় চিরে শুধু বার বার জাগতে লাগলো—সেই শাস্তি পেল। তার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।

তবু ফতুমা সুন্দর। তবু তার কাছে ফতুমার তুলনা নেই। সে যতদিন বেঁচে থাকবে ফতুমাকে ভুলতে পারবে না। শাদী করা বিবিকে যে ভোলে, তার মত আহাম্মক কি জগতে আছে ?

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সর্দারজী ও বুলন্ত সিং। তারা চেতনা সঞ্চার করতে তারপর সে মাটি ফেলে দিয়েছিল কবরের মধ্যে। তারপর মুসলমান ধর্মের যা যা করণীয় করে ফিরে এসেছিল সরাইখানায়।

সব শূন্য। দুনিয়া অসাড়। আসমানের যে রোশনাই, ফুলের যে সুরভি, প্রকৃতির যে রমণীয়তা—সবই কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। কেমন যেন নিজের সত্তাই সে আস্তে আস্তে ভুলতে বসেছে। আব্বা ইস্রায়িল আলির কথা বার বার মনে আসে, 'বেটা লুতুফ জিন্দগী তোর বরবাদ হয়ে যাবে। নিজের দেশ ছেড়ে কোথাও যাস্‌নি। পাবি না কিছু, হারাবি সব। তখন আর কেঁদে কূল পাবি না।' শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধের কথাই ফলেছে। জিন্দগী তার বরবাদই হয়ে গেছে। এখন আর বেঁচে থাকা কিম্বা মরে যাওয়া সবই সমান। আর কার জন্যেই বা বেঁচে থাকবে ? কিসের জন্যে বেঁচে থাকবে ?

এক লড়কাটা আছে। ঐ এক সান্ত্বনার আশ্রয়। ফতুমার স্মৃতি ওরই মধ্যে সঞ্জীবিত। কিন্তু তাতে লাভ কি ? হানিফকে বড় করতে গেলে তার যে কষ্ট করতে হবে, সে কষ্টের মাসুল কোথায় ? সে কষ্টের জন্যে প্রেরণা কে দেবে ? তবু মৃত্যুর সময় ফতুমার সেই ইচ্ছে, তাকে সারাজীবন ধরে পালন করে যেতে হবে। সে আর কোন আশা প্রকাশ করে নি, চায় নি সে কোন কৈফিয়ত। শুধু চেয়েছে নিজের সন্তানের জন্যে একটু আশ্রয়। আর তাতেই প্রকাশ পেয়েছে সন্তানের মধ্যে দিয়েই ফতুমার অভাব দূর হবে। হানিফের রক্তে আছে ফতুমার রক্তের মিশ্রণ। হানিফের স্বভাবে আছে ফতুমার স্বভাবের মমতা।

লুতুফ ঠিক করলো, হানিফকে নিয়েই সে এখান থেকে চলে যাবে। বুলন্ত সিংয়ের সঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনা সে বাতিল করে দিল। হানিফকে ফেলে সে বেহেস্তে গিয়েও সুখ পাবে না, এমনি তার ধারণা হল।

তাই একদিন সকালে সে সর্দারজীকে গিয়ে বললো,—সর্দারজী, আজ এখুনি চলে যাবো !

সর্দারজী বিস্মিত হয়ে বললো,—কোথায় যাবেন বাবুজী ? তবিয়ৎ আভিতক্ আচ্ছা নহী হুয়া। আউর কুছ দিন রহা যাইয়ে।

নেই সর্দারজী। আমার যেতেই হবে। আপনি হানিফকে শাওন বহিনের কাছ থেকে এনে দিন।

কোথায় যাবেন বাবুজী?

কিছু এখনও ঠিক করি নি।

আপনি যে সিপাহীজির সঙ্গে যাবেন ঠিক করেছিলেন?

সে পরিকল্পনা ত্যাগ করেছি।

সর্দারজী আর কোন কথা বলতে না পেরে অন্দরে চলে গেল। ফিরে এসে বললো, --শাওন, হানিফকে দেবে না। সে বললো, আপনি যেথায় খুশি চলে যান। হানিফ এখানেই থাকবে। একটু বড হলে তাকে নিয়ে যাবেন।

লুতুফ শাওনীর ঔদ্ধত্যে একটু গুম হয়ে থাকলো, তারপর বললো,—আমি শাওন বহিনের সঙ্গে দেখা করতে চাই?

সর্দারজী আবার চলে গেল ভেতরে। ফিরে এসে বললো, শাওন বললো, দেখা করার কোন দরকার নেই। তার ঐ একই জবাব।

লুতুফের চলে যাওয়ার কথা শুনে বুলন্ত সিং ছুটে এল। বিস্মিত হয়ে বললো,—আরো দোস্ত, আমি এতদিন তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি, আর তুমি না বলে চলে যাচ্ছ? ব্যাপারটা কি? হঠাৎ মতলব বদলালে কেন? বিবি তো মরে গেল! এবাব তোমার বাধা কিসেব?

লুতুফ আলি চুপ করে থেকে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বললো,—না সিংজী, আমি আপনার কাছ থেকে মাফি চাইছি, আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না।

কেন?

লুতুফ ইতস্তত করতে লাগলো। তাই তো, কেনর উত্তর তো দেওয়া যায় না। সে কি করে বলবে? ফতুমা হানিফকে দেখতে বলে গেছে। আর সেইজন্যেই সে হানিফকে ছেড়ে যেতে পারবে না।

কিন্তু কিছু বলার আগেই বুলন্ত সিং কাছে এসে লুতুফের কাঁধে হাত দিল। তারপর সান্ত্বনা দেওয়ার কণ্ঠে বললো,—আমি জানি তোমার মনের কি অবস্থা? তবু বলছি, তুমি আমার সঙ্গে চলো, অন্য দেশে, অন্য পবিবেশে গেলে তুমি তোমার বিবিকে ভুলতে পারবে। আর বিবিকে না ভুললে তোমার মরদের শক্তি লোপ পেয়ে যাবে। ভাগ্যবান পুরুষ কখনও এমনিভাবে নিজের সর্বনাশ করে না। তুমি ভাগ্যবান পুরুষ, চলো আমার সঙ্গে বাংলা মুল্লুকে। দেখবে তোমার দেহমনের সব পরিবর্তন হয়ে যাবে।

লুতুফ অস্ফুটস্বরে বললো,—কিন্তু আমার লডকা হানিফ!

তাকেও নিয়ে চলো। তারপর বুলন্ত সিং ভেবে বললো,—ওকে নিয়ে গেলে অবশ্য মুশকিল কিন্তু ওকে নিয়ে যাবে কেন? তোমার শাওনবহিন তো ওর ভার নিয়েছে।

লুতুফ ইতস্তত করে বললো,—নিজের বেটা পরকে দিয়ে আবার কি ওর অনাদর করবো?

বুলন্ত সিং তখন বিরক্ত হয়ে বললো,—তোমার মন সৈনিকের মত নয়। তুমি

বেটাকে নিয়েই থাক।

বুলন্ত সিং চলে যাবার অনেক পরে লুতুফ আলি আবার মন তৈরি করলো। ভাবলো, এই সুযোগে একবার ঘুরে এলে মন্দ কি ? বেশী বিলম্ব না করে পথগুলি চিনে চলে এলেই হবে, ততদিন হানিফ শাওনীর কাছেই থাকুক। শাওনী খুব যে অনাদর করবে, মনে হয় না। বরং শাওনী তার মাতৃস্নেহ দিয়ে হানিফকে বেশী পেয়ার করে। সন্তানহীনার আকাঙ্ক্ষাই এখানে প্রবল। অন্তত তার চেয়ে শাওনের আদরই হানিফকে পুষ্ট করবে।

বুলন্ত যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল, লুতুফ গিয়ে তার মনোভিপ্রায় জানাতে বুলন্ত বললো,—তৈরী হয়ে নাও। আমরা দিল্লী ঘুরে যাবো। নাদীর শাহ তার দল নিয়ে চলে গেছে খবর এসেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে দুই অশ্বারোহী সেই সিন্ধুর দোয়াব ত্যাগ করলো।

যাবার সময় শুধু লুতুফ আলি একবার শাওনীর দেখা চাইলো। কিন্তু শাওনী ভেতর থেকে খবর পাঠালো, হানিফ আমার কাছে থাকলো, যখন খুশি হবে যেন সে এসে নিয়ে যায়।

শাওনী দেখা করলো না।

লুতুফ মনে মনে কেমন যেন অসুখী হল। চলে যাচ্ছে, শেষবারও দেখা করলো না! সে এত অপরাধ করেছে যে ক্ষমা নেই!

তবু ইচ্ছে করলো অন্দরে সটান ঢুকে গিয়ে জোর করে শাওনীর সঙ্গে দেখা করে আসে। বলে আসে; তুমি আমাকে এতই ঘৃণা করলে, কিন্তু একদিন দেখবে এর জন্যে আপসোস করবে। তুমি রমণী হয়ে রমণীর অপমান সহ্য করলে না, আর আমি পুরুষ হয়ে যা সহ্য করেছি, তার তুলনা নেই।

কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতে লুতুফের কেমন যেন সরমে বাধলো। মনে করলো এতে নিজে ছোট হয়ে যাবে। বরং তার চেয়ে কিছু না বলাই ভাল। এই ভেবে আর সে দ্বিরুক্তি না করে অশ্বের ওপর সওয়ার হল। শুধু সর্দারজীকে বললো,—সর্দারজী, আদাব। আপনার যাবতীয় ব্যয়ভার দিয়ে যেতে পারলাম না, তবে আমার বেটা জমা থাকলো। একদিন হিসাব চুকিয়ে দিয়ে নিয়ে যাবো! বলে সে কেমন যেন সাফল্যের হাসি হাসলো।

সর্দারজী সেই প্রথম দিনের মতই বিনয়ী ছিলেন। তিনি বিনয়ে জিব বের করে বললেন,—এ কথা বলবেন না বাবুজী। আপনাদের সেবা করবার জন্যেই বসে আছি। যেদিন খুশি হবে আপনি আপনার দেনা চুকিয়ে যাবেন।

সর্দারজী স্থূলবুদ্ধির লোক, তাই ভিন্ন অর্থ না করে ঐ উত্তর দিলেন কিন্তু শাওনী

হলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে বলতো—নিয়ে যান আপনার বেটাকে। জামিন রাখতে হবে না।

কিন্তু শাওনী একবারও বাইরে এল না। এমন কি দরজার ফাঁক দিয়েও তার কৌতূহলী চোখের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হল না।

ওরা চলে গেল।

অশ্বখুরের ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল। শাওনী অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এল।

সর্দারজী বৌয়ের কাজের কোনদিন প্রতিবাদ করেন না। নীরবে তিনি সমর্থন ক.র যান। এদিনও সমর্থন করেছিলেন কিন্তু হঠাৎ শাওনীকে দেখে কেমন যেন তিনি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন—তুই বড় ঝামেলা করিস্ শাওন। কি দরকার ছিল আলিসাহেবের সঙ্গে তোর ঐ রকম ব্যবহার করার? তার বিবি সে যেমন ব্যবহার করুক, আমরা পর বৈ তো নয়! তার ওপর তুই তার লডকাটাকে ধরে রাখলি। একি ভাল হল?

শাওনী স্বামীর কথার কোন প্রতিবাদ করলো না। তখন মনে হচ্ছিল, মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশী হয়ে গেল। এতটা না প্রকাশ করলেই ভাল হত। সত্যিই তো পর ছাডা আর কে? তাদের এই সরাইখানায় কত লোক আসে, এও তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু যত গণ্ডগোল করলো রমণীব অসম্মান। ফতুমার মত একটি খুবসুরতেব নির্যাতন দেখেই সে পাগল হয়ে গিয়েছিল। আব সে যা কিছু করেছে জ্ঞানেই করেছে। তাই স্বামীর বিরক্তিতে প্রথমে একটু থমকে দাঁডালো। তাবপর সর্দারজীর হঠাৎ সাহস দেখে সে চমকিত হয়ে বললো,—তুমি যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বলতে এস না। সরাইখানার মালিক তুমি হতে পার কিন্তু আমারও যথেষ্ট অধিকার আছে। এই বলে শাওনী আর না দাঁডিয়ে দ্রুত সেস্থান ছেড়ে চলে গেল।

দুটি অশ্বারোহী চলেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। দুজনেরই হাতের লাগাম বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে ধরা। দুজনেরই পোষাকে রাজসিকতার স্পর্শ। মাথায় উষ্ণীষ, বক্ষে বর্ম, কোষবদ্ধে তরবারী। সে তরবারীর গায়ে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন।

লুতুফ আলিকে আর চেনাই যাচ্ছিল না। ফতুমা যদি বেঁচে থাকতো, তাহলে স্বামীর এই আকৃতি দেখে চমকিত হত। ঠিক যেন এক সাধারণ সৈনিক নয়। ক্ষমতাশালী একজন সেনাপতি। বুলন্ত সিংয়ের মত। বুলন্ত সিং নিজেই লুতুফ আলিকে সাজিয়েছিল বলে তার কৃতিত্ব বেশী। সে তার পোষাকের একপ্রস্ত লুতুফ আলিকে দিয়ে তাকে সৈনিক পদে উন্নীত করেছিল। অর্থাৎ উপযুক্ত সঙ্গী করে নিয়ে পথে বের হয়েছিল।

বুলন্ত সিংয়ের এমনি করার কারণ শুধু শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে। সে লুতুফ আলিকে যদি একজন নাগরিক হিসাবে সঙ্গে নিয়ে যেত, তাহলে পথচারীর কৌতুহলের সম্মুখীন হত। আর তার ফল হত সম্পূর্ণ বিপরীত। উত্তর ভারতের সর্বত্র যে-সব রাজ্যলিপ্সু জাতি জেগে উঠেছিল, তাদের কারো অনুচরের কানে গেলে

আর বুলন্ত সিংকে মুর্শিদাবাদে ফিরতে হত না। তার শাস্তি হত, নাগরিক কুশলে নিয়ে পালানোর জন্যে। সেইজন্যে বুলন্ত সিং লুতুফ আলিকে সৈনিকসাজে সাজিয়ে সঙ্গী করেছিল। এ ছাড়া আর একটি উদ্দেশ্য ছিল লুতুফ আলিকে দিয়ে কোন কৃতিত্ব প্রকাশ করলে নবাব বাহাদুর খুশি হয়ে তাকে নবাব সরকারে নোকরী দেবে এবং সেনাবাহিনীতে একটি দক্ষসৈনিক বর্ধনের জন্যে বুলন্ত সিং পুরস্কৃত হবে। নবাব বাহাদুর আলিবর্দীর সুনজরে আসার জন্যে বুলন্ত সিং এরূপ করলো। অবশ্য সুনজরে সে অনেকদিন ধরেই আছে। আলিবর্দী-বেগম নবাববাঈযের খাস খিদমৎগার। খিদমৎগার উপাধি তাকে কেউ দেয নি। তবে কোন কিছু প্রযোজন হলেই নবাব-বেগম তাকে ডাক পাঠাতেন। নবাব-বেগম পাথরের ঝালরের ওপাশ থেকে গম্ভীর-কণ্ঠে বলতেন—বুলন্ত সিং, আমি তোমার কাছ থেকে স্পষ্ট উত্তরই আশা করি। তুমি কি নবাবের শাসন ভয়ে ভীত হয়ে আছো? যদি না থাকো, তাহলে স্পষ্ট উত্তরই নিবেদন করবে। বলতেন,—নবাব অনেক জিনিসই চোখে দেখতে পায় না, তাছাড়া সিংহাসনের উঁচু আসনে বসে নিচের কিছু দেখা সম্ভবও নয়, এই বলে তিনি বলতেন একটি সৈনিকের কথা। সাধারণ সৈনিক। আমিনূর। তার গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি দেয়ার জন্যে নবাব-বেগম হুকুম করতেন। আর বলতেন —কিন্তু সাবধান, কেউ যেন জানতে না পারে? বুলন্ত সিং আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করি বলে তোমাকে এত গুরুতর কার্যভার দিলাম।

এমনি বহু কাজই বুলন্ত সিং করেছিল। আর করেছিল বলেই সে নবাবী ইজ্জতের অনেক গোপন কলঙ্ক জানতে পেরেছিল। সে থাকৃগে, তার জন্যে বুলন্ত সিং মনে কোন আস্থা পোষণ করে না। নবাব আলিবর্দীও জানেন তার অধিকার। সেইজন্যে বেগমের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি বুলন্তকেই দিল্লীতে পাঠিয়েছেন। কাজটা খুবই গোপন। একদিন মহম্মদ শাহ এক কথায় সরফরাজকে গতিচ্যুত করে আলিবর্দীকে সনন্দ দিয়েছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোন সাহায্য প্রয়োজন কিনা আলিবর্দী জানতে পাঠিয়েছিলেন। শুধু নাদির শাহ কেন অনেক বিদ্রোহীই আজ দিল্লীর সিংহাসন করায়ত্ত করতে চায়। যদি কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাহলে আলিবর্দী সসৈন্যে দিল্লী রওনা হবেন। অবশ্য আরো একটি গোপন উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার নবাব আরো অনেক দূরে এগিযে যেতে চান। আলিবর্দীর স্বপ্ন বাংলার নবাবী শুধু নয়, হিন্দুস্তানের রাজত্ব পর্যন্ত।

অথচ এদিকে মহারাষ্ট্রীয়রা তাঁর জীবন অতিষ্ঠ করে চলেছে। মুহুর্মুহুঃ চতুর্দিক থেকে আক্রমণ করে সমস্ত বাংলার শাসনই বানচাল করে দিতে চায। তার জন্যে আলিবর্দীর চিন্তার শেষ নেই। তাছাড়া আছে বিদ্রোহী জমিদাররা। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দিন দিন বড় মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। খাজনা দেওয়ার সময় প্রতিবারেই একটি হুজুক সৃষ্টি করবে। সেই ইংরেজদের কায়েমী করে বাণিজ্য করবার জন্যে কলকাতা প্রভৃতি গ্রামগুলি ছেড়ে দিয়েছে। ইংরেজরা নবাব শাসন উপেক্ষা করেই অবাধে বাণিজ্য করে বেড়াচ্ছে। চিন্তার শেষ নেই। তবু আলিবর্দীর স্বপ্ন এতটুকু পরাজয়

স্বীকার করতে চায় না। তাঁর গতিবিধি হিমালয় পর্যন্ত ধাবিত।

এ সব কিছুই বুলন্ত সিং জানে। জানে বলেই সে অনেক চেষ্টায় বাদশাহের সঙ্গে মোলাকাত করার অপেক্ষায় আছে। মহম্মদ শাহের এখানকার যে হাল, তাতে এই সুযোগ তাঁকে হয়তো উৎসাহিত করবে।

কি করবে কিছুই জানে না। শুধু বুলন্ত সিং বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে ফিরবে বলেই মনস্থ করেছিল। আর সেইজন্যে সে গোপনে এতদিন অপেক্ষা করলো।

বুলন্ত সিং চলতে চলতে হঠাৎ অশ্বের গতি লঘু করে লুতুফ আলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—দোস্ত কি ভাবছো ?

লুতুফ আলি অশ্বের গতি লঘু করে শুধু হাসলো। কোন উত্তর দিল না। উত্তর সে আর দেবে কি ? তার ভাবনার সঙ্গে নবাব বাদশাহের ভাবনার তুলনা কোথায় ? তার জগৎও যেমন সঙ্কীর্ণ, ভাবনাও ছোট। তবু তার সেই ছোট ভাবনার মধ্যেই সে একাত্ম হয়ে থাকতে চায়। তখনও মনের মধ্যে সেই পূর্বস্মৃতি। পূর্বস্মৃতি বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে, এমনি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি বলে সে তখনও সেই কথাই ভাবছিল। সেই শাওনীর কথা। ফতুমার মৃত্যু, হানিফের নিরাপত্তা। তারপর তার জীবন। কোথায় সে চলেছে ? কি হবে তার জীবনে ? সম্পূর্ণ নিরুদ্দিষ্ট পথে আবার তার কোন বিপদ আসবে না তো !

বিপদকে অবশ্য আর সে ভয় করে না। গেছে সবই। এখন মাত্র দুজন। সে আর হানিফ। হানিফের নিরাপত্তা হয়ত শাওনীর দ্বারা রক্ষা পাবে। কারণ, শাওনী তাকে যত ঘৃণাই করুক, মাতৃস্নেহ তার অগাধ। আর ফতুমাকে সে ভালবাসে বলেই তার পুত্রের কোন ক্ষতি সে সহ্য করবে না। ভাবনা তার নিজের জন্যে। চলেছে এক সৈনিক পুরুষের সঙ্গে। জানে না, সে সৈনিক কি স্বভাবের মানুষ। এই সূত্রে তার মনে পড়ে সেই কাবুলের আহম্মদ আলিকে। এমন বিশ্বাসঘাতক সে জীবনে দেখেনি। অতিথিকে আপ্যায়নের বদলে শত্রুর হাতে তুলে দেয়, এই প্রথম দেখালো সে। হিন্দুস্তানের লোকেরা এমনি স্বভাবের মানুষ জেনে তাই হতচকিত হয়েছিল। তাই বুলন্ত সিংহের ওপর তার সন্দেহ। বুলন্ত সিং যে উৎসাহ দিয়ে তাকে নিয়ে যাচ্ছে শেষপর্যন্ত তা রাখবে কিনা ! কিংবা আহম্মদ আলির মত আচরণ করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবে।

অবশ্য একটি কথা আজ সে বেশ ভাবতে পারে, সেদিন ফতুমা ছিল বলেই আহম্মদ অমনি বিশ্রী আচরণ করেছিল। কিন্তু আহম্মদ আলি ফতুমাকে ভোগ না করে পারসিক সৈন্যের হাতে তুলে দিল কেন ? তবে কি আহম্মদ আলি ফতুমার ওপর কোন অবিচার করেছিল ? তারপর ফতুমার সঙ্গে তার দেখা হয়নি, দেখা যখন হয়েছিল তখন সে মুমূর্ষু। অবশ্য আহম্মদ আলির বাড়িতে একদিন রাত্রের কথা স্মরণ করে সে কিছু অনুমান করতে পারে। লোকটির চার বিবি, চারটি বাঁদী, তারা নাকি ফতুমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করে হারেমে বন্দিনী করেছিল। একথা সেদিন রাত্রে ফতুমা চুপিচুপি বলে দিয়েছিল। তবে কি সেই চারবিবি ও চারটি বাঁদী ফতুমাকে জোর করে আহম্মদ

আলির কাছে সঁপে দিয়েছিল! মনে হচ্ছে তাই ঠিক। আর সেই রাত্রিবেলা গ্রহণের পর পরদিন সেই দুষ্কার্য থেকে রেহাই পাবার জন্যে আহম্মদ আলি ফতুমাকে সৈনিকের হাতে সঁপে দেয়।

এমনি যদি সে আগে কখনও উপলব্ধি করতো, তাহলে কখনও এই বিদেশে আসতো না। আর যদি আসতো তাহলে ফতুমাকে রেখে আসতো। অথচ তার তখন চিন্তা ছিল অন্য। সে যদি হিন্দুস্তানে গিয়ে ভাগ্য ফেরাতে পারে, তাহলে জোরু নিয়ে সে মহব্বতের খেলা খেলবে। তার জোয়ান তাগত এখনও ম্লান হয়নি। একটি জোয়ানী আওরতের দেহের আগুন তার শরীরকে পূর্ণ দগ্ধ করতে পারেনি শুধু অভাব ও অনটনের জন্যে। মনের মধ্যে এক দুর্বলতা নিয়ে সে ফতুমাকে জোর করেনি। ইচ্ছে ছিল হিন্দুস্তানে গিয়ে সে সেই অভাব পূর্ণ করবে। নিজে পূর্ণ হয়ে ফতুমাকেও পূর্ণ করবে। কিন্তু সব আশাই তার ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

বুলন্ত আবার তার চেতনা সঞ্চার করে দিয়ে বললো,—কি ভাবছ আলিসাহেব? অতীতকে ভুলে গিয়ে এগিয়ে চল সামনের পথে। দেখছ না সীমাহীন এই সুদূর পথ। এই বলে দীর্ঘ পথের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখালো। তারপর বললো তার চোখে এসে, আমরা গল্প করতে করতে যাই। পথও শেষ হবে, সময়ও কাটবে।

লুতুক আলি বললো,—তাই ভাল সিংজী। গল্পই কর। চুপ করে থাকলে মনে বড় ভাবনা ঢোকে। তারপর লুতুফ আলি জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা সিংজী, আমরা কি এখন দিল্লী যাচ্ছি।

বুলন্ত সিং বললো,—হ্যাঁ, শুধু দিল্লীতে নয়, যদি সম্ভব হয় তাহলে আমরা দিল্লীর প্রাসাদে প্রবেশ করে বাদশাহ মহম্মদ আলির সঙ্গে দেখা করবো। তারপর বুলন্ত সিং জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি কখনও দিল্লীতে গিয়েছ?

লুতুফআলি ম্লান হাসলো,—বললো, আমার হিন্দুস্তানে আসা এই প্রথম। সুতরাং দিল্লী কেন, কোথাও আমি যাইনি।

বুলন্ত সিং সান্ত্বনা দিয়ে বললো,—তার জন্যে দুঃখ কি? এবার শুধু দিল্লী কেন তামাম বাংলা মুল্লুক পর্যন্ত দেখবে। দেখবে আর বিস্ময়ে ভাববে, একি এক আজব দেশ! এখানকার মানুষও যেমন আজব, প্রতিটি জায়গাও তাই। মানুষ যেমন এক কথায় ছুরি শানিয়ে তোমার পিছন পিছন তাড়া করবে, তেমনি এক একটি স্থানের প্রকৃতির পরিবর্তন তোমাকে চমকিত করবে।

লুতুফ আলি মন দিয়ে কথাগুলো শুনলো, শুনে সে কোন কথার উত্তর দিল না।

বুলন্ত সিং বলতে লাগলো,—এই যে দিল্লীর বাদশাহের কথা শুনলে। এখন সেখানে মহম্মদ শাহ বসে আছেন। অথচ এই দিল্লীর সিংহাসনে আগে কে ছিলেন জানো, সম্রাট আকবর। আকবর নিজের বাহুবলে সমস্ত হিন্দুস্তানের একছত্র আধিপত্য পেয়েছিলেন। তিনি রাজপুতদের বশ করেছেন, তাদের রমণীদের হারেম-শোভা করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করেছেন। অবশ্য সমস্ত ধর্মের ওপর তার আস্থা ছিল। সহজে কারুর মনে কোন আঘাত না লাগে, সেইজন্যে তিনি কৌশলে সবার মনোরঞ্জন

করেছেন। অন্তুত এই বুদ্ধিমান সম্রাট ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ। যখন পৃথিবী ছেড়ে গেলেন, তারপর পর পর আরো বাদশাহ এই দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন। বসলেন জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব। প্রত্যেকেই সিংহাসন অধিকার করতে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছিলেন। এমন কি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী বেঁচে না থাকে, তার জন্যে ভ্রাতৃহত্যার রক্তোৎসব করতে তাঁরা ছাড়েন নি। সে যাই হোক, তবু তাঁরা কেউই অল্পদিন সিংহাসনে ছিলেন না। বহু বৎসর ধরে রাজত্ব করে, তারপর বহু বিদ্রোহীকে করায়ত্ত করে শুধু সাম্রাজ্যের ভিত অটুট রেখেছেন।

কিন্তু সম্রাট ঔরঙ্গজেব চলে যাবার পরই মোগল সাম্রাজ্যের ভাগ্যলক্ষ্মী বিদায় নিল। সেই পূর্ব রক্তের ধারা অনুযায়ী আবার উত্তরাধিকারীদের মধ্যে কাটাকাটি মারামারি ভ্রাতৃহত্যা প্রভৃতি শুরু হল, কিন্তু উপযুক্ত কেউই সিংহাসন অলঙ্কৃত করলেন না। সিংহাসনের দ্বন্দ্ব মোগল রাজবংশের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। ঔরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়াজ্জম ভাই আজমকে নিহত করে সিংহাসনে বসলেন। শুধু আজমকে নিহত করেই ক্ষান্ত হলেন না, কামবক্সকে নিহত করে রাজ্য নিষ্কণ্টক করলেন। তারই নাম ইতিহাসে শাহ আলম বা বাহাদুর শাহ। তিনি বিদ্বান ও রাজকার্যের অযোগ্য ছিলেন। সেইজন্যে লোকে তাঁকে 'শাহ ই বে খায়ের' বা অমঙ্গলের রাজা আখ্যা দিয়েছিল। এই বাহাদুর শাহের সময়তেই শিখনায়ক বান্দার অভ্যুত্থান। বাহাদুর শাহ এই শিখবীর বান্দাকে শায়েস্তা করে লৌহদুর্গে বন্দী করেছিলেন।

তারপর বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র জাঁহাদার শাহ আবার ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে লিপ্ত হলেন। আবার দিল্লীর প্রাসাদে রক্তের বন্যা বইলো। শোণিতস্নাত হল প্রাসাদ মর্মর অঙ্গন। তারপর তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করলেন। কিন্তু এই সিংহাসনলোভী বাদশাহরা কেহই সুশাসক ছিলেন না। আর এঁদের সিংহাসনের প্রতি বেশী লোভ ছিল বিলাস জীবন যাপনের জন্যে। জাঁহাদার শাহও সেই বিলাস জীবনের একজন প্রধান ছিলেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে বহু নির্গুণের অবস্থান ছিল। তিনি মদ্যপায়ী, নৃত্যগীতে আসক্ত ও অলস জীবনের প্রিয় ছিলেন। অপরূপ রূপ লাবণ্যময়ী নর্তকী লালকুমারী সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে দ্বিতীয় নূরজাহানের ভূমিকা গ্রহণ করে রাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়েছিলেন।

জাঁহাদার শাহ আওরতের বশীভূত হয়ে মরদের পৌরুষ হারিয়ে কিছুকাল রাজত্ব করবার পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখসিয়র কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

ফররুখসিয়রের সিংহাসন লাভের প্রধান সহায়ক ছিলেন সৈয়দ আবদুল্লা খান ও সৈয়দ হোসেন আলি খান নামক ভ্রাতৃদ্বয়! এবারেও সম্রাটের অযোগ্যতা দৃষ্ট হল। আর সুযোগ নিলেন সেই সৈযদ ভ্রাতৃদ্বয়। তাঁরাই রাজ্যের শাসক হলেন। তবে সম্রাটের অযোগ্যতার জন্যে এই ভ্রাতৃদ্বয়ের শাসনে মোগল সাম্রাজ্যের অনেক বিপদ রক্ষা পেয়েছিল।

ওমরাহদের আত্মকলহে রাজদরবার ষড়যন্ত্রক্ষেত্রে পরিণত হল। ওমরাহরা তিন ভাগে বিভক্ত হল, যেমন হিন্দুস্থানী, ইরাণী ও তুরাণী। বিভিন্ন দলের পরস্পর ষড়যন্ত্র ও

বিপদে সাম্রাজ্য দুর্বল হতে লাগলো। এদিকে মাড়বাররাজ অজিতসিংহ বিদ্রোহী হলেন, কিন্তু পরে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিলেন। আগ্রার পশ্চিমে ভরতপুরের জাঠনায়ক চূড়ামণি বিদ্রোহী হলে সৈয়দ আবদুল্লা তাঁকে আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করলেন। সৈয়দ হোসেন আলির সঙ্গে চুক্তির ফলে বালাজী বিশ্বনাথ দাক্ষিণাত্যের মোগল সুবা থেকে চৌথ আদায়ের অধিকার লাভ করলেন।

এদিকে বাদশাহ ফর্‌রুখসিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের আধিপত্যে শঙ্কিত হয়ে চক্রান্ত করতে লাগলেন কিন্তু সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বাদশাহের এই বিশ্বাসঘাতকতায় উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে পদচ্যুত ও নিহত করলেন। এরপরই সিংহাসনে বসলেন রোশন আখ্‌তার মহম্মদ শাহ।

কিন্তু মহম্মদের সিংহাসন প্রাপ্তির পথ দুর্গম ছিল, তিনি হঠাৎ সুগম করবার জন্যে জনসাধারণকে দেখালেন, বাহাদুর শাহের দুজন উত্তরাধিকারী পৌত্র অকালে মৃত্যুবরণ করেছেন। বাহাদুর শাহের পরবর্তী উত্তরাধিকারী পৌত্র তিনি নিজে, তাই তাঁর সিংহাসন পেতে কষ্ট হল না। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মহম্মদ শাহের প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন।

কিন্তু মহম্মদ শাহ পূর্ব বাদশাহের মত বিলাসী ও অকর্মণ্য ছিলেন না। তিনি সিংহাসন লাভ করেই স্বাধীনতা প্রয়াসী হলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে উচ্ছেদ করাই তার প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ তাঁদের রাজদরবারে এমন আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রকাশ্যে তাঁদের কোন কারণবশত দোষী সাব্যস্ত করলে অন্যান্য ওমরাহরা বিদ্রোহী হবে। সেইজন্যে মহম্মদ শাহ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলেন।

এই বলে বুলন্ত সিং থেমে লুতুফ আলির দিকে তাকিয়ে বললো,—দোস্ত, এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরেও বাইরে প্রকাশ কর না। মোগল বাদশাহরা আর কিছু না পারুক দু-চার হাজার চর চতুর্দিকে ছড়িয়ে রেখেছে। একবার শুনতে পেলেই আর দ্বিতীয় কথা না, তোমারও প্রাণ যাবে, আর আমারও প্রাণ যাবে। ওরা নিম্নশ্রেণীর লোক বধ করতে যত পটু, উচ্চশ্রেণীর লোককে ক্ষমা করতে তত উৎসাহী। এই হচ্ছে মোগল শাসন নীতির ধারা।

লুতুফ আলির উত্তরের অপেক্ষা না করেই বুলন্ত সিং অশ্বটিকে একটু কায়দায় ঘুরিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন—মোগল বাদশাহদের বেইমানী তাঁদের শরীরের মজ্জার সঙ্গে মিশ্রিত। অথচ এঁরাই বেইমানদের চরম শাস্তি দেন। যাক্‌গে, সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতাপ অবশ্য লুপ্ত হওয়া উচিত ছিল। এই সূত্রে অবশ্য মহম্মদ শাহের আচরণ অনুকূল পথই নিয়েছিল। হোসেন আলি যখন দাক্ষিণাত্য অভিযানে গমন করেছিলেন, সেই সময় তিনি গুপ্তঘাতক প্রেরণ করে তাঁকে পথিমধ্যেই নিহত করেছিলেন।

কিন্তু সেই সংবাদ গোপন রইল না। সৈয়দের অন্য ভ্রাতা আবদুল্লা খান ভ্রাতার মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রকাশ্যেই বিদ্রোহী হন। অনেক ওমরাহ তাঁর দলভুক্ত হলেন এবং আবদুল্লা বাহাদুর শাহের অন্যতম এক পৌত্র মহম্মদ ইব্রাহিমকে সিংহাসন দিতে চাইলেন।

বাদশাহ মহম্মদ শাহের সেইদিনই পরীক্ষা। তিনি চিন্তিত হলেও একেবারে হতোদ্যম নয়। কৌশলে আবদুল্লার দলভুক্ত লোকদের হাত করে আবদুল্লার সমস্ত দৌত্য হরণ করলেন ও তাঁকে পরাজিত ও বন্দী করলেন।

সেই বন্দী আবদুল্লা খানের নির্যাতন যদি শোনো, তাহলে তুমি শিউরে উঠবে। মহম্মদ শাহ একজন কত বড় শয়তান প্রকৃতির ব্যক্তি, তা তার এই নির্যাতনেই বোঝা গিয়েছিল। একচল্লিশ দিন মাত্র আবদুল্লাকে বাঁচতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এই একচল্লিশ দিন যে অত্যাচার সহ্য করেছিলেন, তার তুলনা নেই। সেদিন দিল্লী কেন তামাম হিন্দুস্তানের সমস্ত লোক শিউরে উঠেছিল। মহম্মদ শাহের নির্মমতা চতুর্দিকে প্রচারিত হয়ে তাঁর নাম মনুষ্যসমাজে এক নির্মম শয়তানরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

বুলন্ত সিং অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়ে বলতে লাগলো,—জানি সেই সৈয়দ আবদুল্লা খান অপরাধী কিন্তু সেই অপরাধের শাস্তি যে এত ভীষণ হতে পারে, তা প্রয়োগের আগে কেউ চিন্তা করতে পারে নি। বাদশাহদের পূর্বপুরুষ সম্রাট ঔরঙ্গজেব এক ধরনের বিষাক্ত সর্পের দ্বারা অপরাধীর শাস্তিবিধান করতেন। একটু একটু করে বিষের ক্রিয়া সমস্ত দেহ আচ্ছাদিত হয়ে গেলে নীল হয়ে যাবে। মৃত্যুও হবে বিষের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে। তবে এই ধরনের শাস্তিবিধান পরে সম্রাট ঔরঙ্গজেব বন্ধ করেছিলেন। ইসলামের ধর্মমতে মানুষের অপরাধের শাস্তি এত নির্মম নয়।

মহম্মদ শাহ কিন্তু আবদুল্লার মৃত্যু আরও ভিন্ন প্রক্রিয়ায় গ্রহণ করলেন। এবং সে প্রক্রিয়া যেমন ভীষণ, তেমনি অদ্ভুত। একটি শীতল জলের কূপের মধ্যে এক ধরনের হিংস্র জলীয় পোকা ছেড়ে দিলেন। সেই পোকার দংশন এমন মর্মান্তিক যে সহ্য করা যায় না অথচ মৃত্যু নিকটে নয়। বিষের ক্রিয়া দেহের রক্তের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে যন্ত্রণা দিতে দিতে মৃত্যু হবে। মৃত্যু হবে বহুদিন পরে।

আবদুল্লা খানের মৃত্যু হয়েছিল একচল্লিশ দিনের পর।

সেই শীতল কালো জলের কূপের মধ্যে প্রত্যহ ছ ঘণ্টা করে আবদুল্লাকে কোমরে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। একে বরফ জলের কূপ, সমস্ত শরীর অসাড, তার ওপর সেই অসাড দেহের ওপর বিষাক্ত পোকার কামড। যখন আবদুল্লাকে জল থেকে তোলা হত, তখন তার সমস্ত শরীর চুইয়ে রক্ত ঝরতো। অজ্ঞান, অচৈতন্য দেহ তবু মুক্তি পেত না। এক ধরনের লবণজাত দ্রব্য তার শরীরে মাখিয়ে দেওয়া হত। আর সঙ্গে সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণায় আবদুল্লা চিৎকার করে প্রাসাদ মুখর করতো।

মহম্মদ শাহ যেন কেমন শাস্তি প্রয়োগে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। সেই নৃশংসতা তিনি প্রজাদের উপলব্ধি করানোর জন্যে প্রাসাদ বহিঃপ্রাঙ্গণে আবদুল্লার বীভৎস দেহ দেখাতেন, প্রজারা দেখে শিউরে উঠতো। আর বাদশাহ উল্লাস অনুভব করতেন।

তারপর বুলন্ত সিং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো,—আর সেই মহম্মদ শাহ আজ নাদীর শাহের কাছে কাঠের পুতুল পরিণত হয়েছেন। কী বিচিত্র এই মহিমা!

বুলন্ত সিং থামলে লুতুফ আলি বললো,—আচ্ছা সিংজী, গোস্তাকি যদি মাফি হয়, তাহলে এক বাত জিজ্ঞেস করতে পারি?

বুলন্ত সিং তখন বোধ হয় বিগত স্মৃতির মাঝেই বিচরণ করছিল, লুতুফ আলির কথায় তার দিকে ফিরে বললো,—বলো আলিসাহেব।

আপনার বলার ধরণ দেখে মনে হচ্ছে, আপনি যেন সে সময় দিল্লীতেই ছিলেন।

বুলন্ত সিং ম্লান হেসে বললো,—অনুমান তোমার মিথ্যে নয় লুতুফ আলি। তবে সেদিন যদি আমার উমর এই আজকের মত হত, তাহলে একটা কিছু কাণ্ড আমি করতাম। আমার তখন সবে জন্ম হয়েছে, আমি শুধু মাতাজীর কাছে গল্প শুনেছি। সেই গল্পই আমার জীবনে আমাকে বাদশাহের শত্রুতে পরিণত করেছে। আর আজ দিল্লীর বাদশাহের সেনা না হয়ে বাংলার নবাবের সেনা হয়েছি, শুধু ঐ কারণের জন্যে!

লুতুফ আলি বিস্মিত হয়ে বললো,—শুধু গল্প শুনেই আপনি বাদশাহের শত্রু হয়ে গেলেন?

বুলন্ত সিং দম নিয়ে বললো,— শুধু গল্পই যদি হত তাহলে সারাজীবনটা আমার বরবাদ হয়ে যেত না। আজ বিশ বছর আগের ঘটনা, আমি তখন দু বছরের লড়কা। আজ এই বাইশ বছর বয়েসে সেই ঘটনা আমাকে বারবার দিল্লীতে টানে। বার বার আমার প্রবৃত্তি আমাকে দংশন করে বলে, 'যদি সুযোগ পাও তাহলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা ক'র না। ঐ সেই মহম্মদ শাহ, যে বৃদ্ধ আজ দিল্লীর সিংহাসনে বসে আছে সে মানুষের মধ্যে হিন্দুস্তানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ হলেও, আসলে সে হিন্দুস্তানের সেরা শয়তান।' সৈয়দ আবদুল্লা খান অপরাধ করলেও সর্দার বলবন্ত সিং কি দোষ করেছিল? চাকরির খাতিরে প্রভুর যেটুকু গোলামি দরকার, সেটুকুই সে করেছিল। আবদুল্লা খান যখন রাজদরবারের সর্বেসর্বা ছিলেন, তখন তো এ প্রশ্ন উদয় হয় নি! তখন বলবন্ত সিংয়ের কথারও মূল্য ছিল। মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর এমন কি খোজারা পর্যন্ত বলবন্ত সিংকে সমীহ করে চলতো। সেই শ্রদ্ধাই বোধ হয় পরবর্তীকালে মৃত্যুতে পরিণত হয়েছিল। আবদুল্লা বন্দী হবার সময় বলবন্ত সিংকে ত্যাগ করেন নি; বরং মৃত্যু যত নিকটে এসেছে তিনি বলবন্ত সিংয়ের হাত জড়িয়ে ধরেছেন। তাই বন্দী আবদুল্লার সাথে বলবন্ত সিংকেও বন্দী হতে হয়েছিল।

কিন্তু আবদুল্লার শাস্তি বলবন্ত সিংও পেল কেন? হঠাৎ বুলন্ত সিং কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে সেই পথিমধ্যে অশ্বের ওপর বসে কোষ থেকে তরবারী বের করলেন এবং চিৎকার করে বললেন,—মহম্মদ শাহ কি ন্যায় বিচার করেছিলেন? আবদুল্লা খানকেও যে শাস্তি প্রয়োগ করেছিলেন, ঠিক তেমনি শাস্তি বলবন্ত সিংকেও দিয়েছিলেন। অথচ শুনেছি বলবন্ত সিং বাদশাহকে বলেছিলেন—শাহনশাহ, আপনি আমার প্রভু। ভৃত্যের প্রতি আপনার এই নির্মম আচরণের কোন সমালোচনা নেই। তবু আপনি এত মহান ব্যক্তি হয়ে একটি ক্ষুদ্রকে প্রতিপক্ষ ভাবলেন কেমন করে? ভৃত্যকে বাঁচতে সুযোগ দিন, সে কাফের হলেও বাদশাহের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চায়। আবদুল্লা খানের নোকরী আমার ছিল বলে আমি প্রভুর নিমকের মান রেখেছি, এবার দিল্লীর সর্বেসর্বা বাদশাহ শাহনশাহ মহম্মদ শাহ আলি বাহাদুরের নোকরী দিন, আমি সেই একই আচরণ করবো।

বুলন্ত বললো,—কিন্তু সেই শয়তান মহম্মদ শাহ ভীত হয়ে প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না, উপরন্তু বলবন্ত সিং শাস্তি পেল প্রতিপক্ষ আবদুল্লা খানেরই মত।

বুলন্ত সিংয়ের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছিল।

লুতুফ আলি সেই দেখে অবাক।

বুলন্ত সিং আবার ধরা গলায় বললো—আর সেইজন্যে আমি বাংলা মুল্লুক থেকে নবাবী কাজ নিয়ে এই দিল্লীতে এসেছি। চেষ্টা করলে বোধ হয় নবাবের প্রয়োজন অন্য কারুর ঘাড়ে চাপানো যেত কিন্তু আমি দিল্লীতে এসেছি সুযোগ সন্ধানে। যদি নাদীর শাহের আক্রমণের মাঝে অলক্ষ্যে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারি। আর প্রহরীর চোখের পাশ দিয়ে খাসমহলে যেতে পারি, তাহলে আর কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না। মৃত্যু আমার হয় হোক্ কিন্তু বলবন্ত সিংয়ের হত্যাকারীর শাস্তি দিতে পেরেছি এই আনন্দে হাসতে হাসতে মারা যাবো। তাছাড়া নিজের শাস্তি ও মাতাজী জিজাবাঈয়ের কাছে প্রতিজ্ঞাও আমাকে চঞ্চল করে তুলেছিল।

কিন্তু দিল্লী শহরের এক মাইলের মধ্যে আমি প্রবেশ করতে পারলাম না। নাদীর শাহের সুশিক্ষিত পারসিক সৈনিক আমার পোষাক দেখে আমাকে বন্দী করতে চাইল কিন্তু আমি তার আগেই অশ্বের মুখ ঘুরিয়ে তীরবেগে পলায়ন করলাম।

হঠাৎ বুলন্ত সিং লুতুফ আলির দিকে ফিরে কাতরস্বরে বললো,—আলিসাহেব, তুমি হয়তো হঠাৎ আমার এই অদ্ভুত ইতিহাস শুনে অবাক হয়ে গেছ, তবে বিশ্বাস কর, আমি যা বললাম, তার একবর্ণ মিথ্যা নয়। এমন কি কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আমি তোমাকে এই কল্পিত কাহিনী শোনাই নি। তবে তোমার বিশ্বাস স্থাপনের জন্যে একটি চিহ্ন দেখাতে পারি, এই বলে বুলন্ত সিং নিজের কোমর বন্ধ থেকে একটি ছোরা বের করে লুতুফ আলিকে দেখালো। দেখিয়ে বললো, ছোরার হাতলের পাশে তাকিয়ে দেখো, সেখানে দিল্লীর বাদশাহের সাঙ্কেতিক চিহ্নসহ পাঞ্জার ছাপ আছে। আর লেখা আছে, 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'।

বুলন্ত আবার বললো,—এই ছোরাটি কি জানি কেন পিতাজী একবার দেশে গিয়ে মাতাজীকে দিয়েছিলেন 'বেটা বাদলা চাই। যে তোর পিতাকে হত্যা করেছে, তার রুধির। আজ মাতাজী নেই; আমি তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে চাই।'

বুলন্ত আবার কাতর হয়ে বললো,—তোমাকে আলিসাহেব একটি গুরুতর কাজের ভার দেব, আমি তোমাকে আমার পোষাক, তরবারী, শিরস্ত্রাণ সব দিয়ে যাব। যদি দেখ আমি প্রাসাদের ভেতর থেকে আর ফিরছি না, তখন তুমি তুরন্ত বাংলার পথে চলে যাবে, গিয়ে আমার পাঞ্জা দেখিয়ে নবাব ও নবাব বেগমের সঙ্গে দেখা করবে এবং আমার এই কাহিনী বলবে। তুমি সেখানে নোকরীও পাবে, আর আমার মত খাতিরও পাবে। দেখবে নবাববেগম তোমাকে কেমন পেয়ার করেন!

এই বলে বুলন্ত সিং থামলে লুতুফ আলি ভীত হয়ে বললো,—কিন্তু সিংজী, আমি এখানকার কোন পথই চিনি না। এই গুরুতর কাজ যদি না সম্পন্ন করতে পারি?

বুলন্ত সিং একটু চুপ করে থেকে বললো,—আমার কোন ক্ষতি নেই আমি যদি

বাদশাহকে হত্যা করতে পারি, তাহলে আমার জীবন শেষ। ধরা না পড়লেও আমি ফিরবো না। তোমাকে শুধু নবাব সরকারে যেতে বলছি এইজন্যে যে, তোমার একটু উপকার হবে, আর আমার সংবাদটা নবাব বেগম পাবেন। ওরা দুজনেই নবাব বলে নয়, মানুষের মত স্নেহ করেন। একটি গুরুতর কাজের ভার দিয়ে বিশ্বাস করে দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন, অবশ্য মহম্মদ শাহ নিহত হলে আর সে কাজের কোন মূল্য নেই, তবে যদি নিহত না হন, আর যদি আমি ধরা পড়ি, তাহলে আমি পরিষ্কার বলবো,—আমিই সেই বলবন্ত সিংয়ের পুত্র বুলন্ত সিং। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে এসেছি। হয়তো পিতার মতই শাস্তি পাব। তাই যদি পাই তাহলে পুত্রজন্ম আমার সার্থক। এই বলে বুলন্ত সিং লুতুফ আলির দিকে ফিরে বললো,—তুমি শুধু নবাব আলিবর্দীকে বাদশাহের উত্তরটুকু পেশ করবে।

বুলন্ত সিং অশ্বপিঠে চলতে চলতে চিন্তান্বিতস্বরে বললো,—তুমি, আমি অবশ্য দুজনেই দরবারে প্রবেশ করবো। আগে নবাব সরকারের সংবাদ দিয়ে ও উত্তর দিয়ে তারপর নিজের কাজ। আর সে কাজ হবে প্রকাশ্য দরবারে নয়। তার পরিকল্পনাও যেমন ভিন্ন, কাজও তেমনি গোপনে হবে।

লুতুফ আলি চুপ করে থাকলো। সে তখনো ভীত হয়ে ভাবছিল, এত ঘটনা এই সিংজীর মধ্যে লুকিয়ে আছে জানলে সে কখনও আসতো না। আসতে তো সে চায়নি! এই সিংজীই তাকে উৎসাহিত করলেন। তখন কি বোঝা গিয়েছিল, মানুষের সাহায্যের পিছনে নিঃস্বার্থ কোন উপকার নেই বরং স্বার্থ নিয়েই সাহায্যের ছদ্মবেশ ধরে চাতুরীর আশ্রয় নেয়। বুলন্ত সিংয়ের প্রতিশোধ হয়তো সত্য কিন্তু তিনি পূর্বে এ কথা প্রকাশ করলেন না কেন? করলে অবশ্য লুতুফ আলি এই ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চাইতো না, তবু বুলন্ত সিংয়ের চারিত্রিক শুচিতা প্রমাণিত হত। বুলন্ত সিংকে সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। অথচ এখন এই সব কথা শোনার পর লুতুফ আলির মনে হতে লাগলো, বুলন্ত সিংকে আর বিশ্বাস করা যায় না।

পাশাপাশি চলতে চলতে বার বার তার মনে হতে লাগলো বুলন্ত সিং ইচ্ছে করলে বাদশাহের ছুরিকাটি তারই বুকে বিদ্ধ করে দিতে পারে। কাবুলের সেই আহম্মদ আলিও যেমন লোক ছিল, বুলন্ত সিংও তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আহম্মদ আলির বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হয়েছে, বুলন্ত সিং এখনও সন্দেহজনক। কি যে তার মতলবে আছে, বোঝা যায় না।

যাই হোক, লুতুফ আলির ভয় একদিন গেল।

বুলন্ত সিংয়ের কাছ থেকে আর কোন আঘাত এল না। ওরা নির্বিঘ্নে দিল্লী পৌঁছে গেল। অবশ্য লুতুফ আলি দিল্লি চিনতো না, তাকে যে কোন একটি চাকচিক্য প্রাসাদ দেখিয়ে দিল্লী বললে সে বিশ্বাস করতো কিন্তু বুলন্ত সিং তা করলো না, সে যমুনার স্রোতের কিনারে দাঁড়িয়ে দিল্লী প্রাসাদ মিনার দেখিয়ে বললো,—আলি-সাহেব, এই আমাদের হিন্দুস্তানের ভাগ্যদেবতার ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিলাসমহল। এখানে

বাদশাহ মদের স্বর্ণভৃঙ্গার হাতে নিয়ে নর্তকীর সুঠাম দেহের যৌবন দেখেন, আবার রাজকার্যের প্রহসন করে, দুর্বলকে পদদলিত করে আনন্দ উপভোগ করেন, তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর। আল্লার আল্লা। ভগবানের পিতা হয়ে রাজসিক সিংহাসনে বসে আছেন।

লুতুফ আলি কোন কথা বললো না, শুধু অবাক বিস্ময়ে দূর থেকে সেই বিশাল প্রাসাদ চত্বর দেখতে লাগল। তার চোখে মুখে বিস্ময়ের ঘোর লাগতে লাগলো। রাজা, বাদশাহের ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদ সে কখনও দেখে নি, দেখেনি রাজসিকতার বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ শিল্পবৈভব। মনের মধ্যে তার যে বিদ্বেষ প্রতিদিন ধরে বুলন্ত সিংযের সম্বন্ধে তৈরি হয়েছিল, তা সেই মুহূর্তে অপসারিত হয়ে গেল। সে শুধু মনে মনেই ভাবলো, ঐ বিরাট প্রাসাদের মধ্যে তারা প্রবেশ করবে? বাইরে থেকে যার এত বিস্ময়, না জানে ভেতরে আরো কত বিস্মর আছে আরো কত চোখের সুখ চরিতার্থ করবার জন্যে দ্রব্যসম্ভারের চাকচিক্য।

বুলন্ত সিং লুতুফ আলির মনের অবস্থা বুঝে হেসে বললো,—চোখের বিস্ময়বোধ একটু সংযত কর আলিসাহেব, না হলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। বাদশাহের এই হচ্ছে মূল্য, তাঁরা সাধারণের চোখের উপর ঐশ্বর্যের রোশনাই জ্বেলে চোখ অন্ধ করে দেন, কিন্তু যদি সেই অন্ধত্ব তুমি জয় করতে পার, তাহলে দেখবে এই রোশনাইয়ের পিছনে নিঃস্ব শূন্যতা ছাড়া কিছু নেই। বাদশাহরা সর্বদা আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক পরিধান করে থাকেন কিন্তু একবার যদি তাদের পোষাক ছাড়া নগ্ন শরীর দেখতে পাও, তাহলে তোমার এই চোখের বিস্ময়বোধ আর থাকবে না।

লুতুফ আলির সেই মুহূর্তে মনে হল বুলন্ত সিং বড অতিবক্তা। বাদশাহদের ওপর তার বিদ্বেষ আছে বলেই সে ঐ মহান পুরুষদের সম্বন্ধে যত বাজে কথা ভাবছে। যদি সে ঐ ধরণের কোন ভাগ্যবান পুরুষ হত, তাহলে কি এই সব অসংলগ্ন কথা চিন্তা করতো?

যাই হোক লুতুফ আলির চোখে এক ভাবালুতা, বুলন্ত সিংযের চোখে এক। দুজনে সেই যমুনার স্রোতের কিনার দিযে অশ্বপিষ্ঠে এগিয়ে চললো। প্রাসাদ তাদের চোখের ওপর দৃশ্যমান হলেও তারা তখন দিল্লী থেকে অনেক দূরে। অনেক দূর থেকেই তারা যমুনার কিনার দিয়ে প্রাসাদের শীর্ষ গম্বুজ দেখতে পাচ্ছিল।

তখন ছিল প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর মালায বিভূষিতা ধরিত্রী। সূর্যকরজ্জ্বল প্রভা সমস্ত দিগন্ত বিস্তৃত করে দূরে মর্মরনির্মিত প্রাসাদের গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল করেছিল।

যাই হোক, তারা এগিয়ে এসে যখন দিল্লীর অভ্যন্তরে ঢুকলো, আরো বিস্ময় সেখানে সৃষ্টি হল। এতক্ষণ লুতুফ আলি ঐশ্বর্যের দৌলত মহলে প্রবেশ করে মণিমাণিক্যের ছটা দেখছিল এবার তার চোখের ওপর বিপরীত এক ধ্বংস—তৃপ্তিবোধ কেড়ে নিল সে আতঙ্কে ককিয়ে উঠে যতদূর পারলো চোখ বিস্ফোরিত করে তাকিয়ে থাকলো।

মহামারীর পর যেমন লোকালয়ের অবস্থা হয়, ঠিক সেইরূপ। প্রবল ঝড়বৃষ্টির ফলে সাজানো শহরের যে ভগ্নদশা সৃষ্টি হয়, সেইরূপ। কে যেন মুহূর্তে সাজানো শহরকে

ভেঙে-চুরে দুমড়ে একেবারে বিশ্রী করে দিয়ে গেছে। একদিনে সেই ধ্বংসকার্য সম্ভব হয়নি, দিনের পর দিন ধরে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। বহুদিন ধরে দিল্লীর রাজপথের দুপাশের সাজানো বাড়িগুলির শোভাকে নষ্ট করা হয়েছে। বেশীর ভাগ অট্টালিকা, রাজপ্রতিনিধি, আমীর ওমরাহ মনস্‌বদার প্রভৃতির। তাই সেই অট্টালিকাগুলির বাহির ও ভেতর ঐশ্বর্যমণ্ডিত। সেগুলি কে বা কারা যেন নিপুণ শয়তানের মত টুঁটি চেপে ধরে পথের ওপর আছড়ে মেরেছে। তার ফলে অট্টালিকা-গুলির দেয়ালগাত্র ভগ্ন, জানলা, দরজা তুলে নিয়ে কে যেন রসিকতা করেছে। ঘরের আবরু নষ্ট হয়ে ঘরই পথের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওদের মানসপটে দৃষ্টিগোচর হল সেই সব অট্টালিকার মধ্যে কেউ নেই। শুধু শূন্যতার হাহাকার নগ্নবসন পরে অট্টালিকার কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আর যাদের শায়েস্তা করতে আল্লা অক্ষম, সেই সব জীবেরা অবাধে অট্টালিকা মধ্যে বিচরণ করছে।

বুলন্ত সিং ও লুতুফ আলির দুজনের মধ্যে প্রশ্ন জাগলো—তাহলে এইসব অট্টালিকার অধিবাসীরা গেল কোথায়? কিন্তু উত্তর কে দেবে? পথে জনপ্রাণী চোখে পড়লো না। রাজধানী এই দিল্লী। মোগলরা দুশত বৎসর ধরে রাজত্ব করছে। আর দুশ বছর ধরে এই দিল্লী শোভামণ্ডিত করে আসছে। তামাম হিন্দুস্থানের এই একটি জায়গা যা অপরিচিতকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করে। তাই দেশবিদেশ থেকে লোক এসে নিজের ভাগ্য ফেরানোর জন্যে এই দিল্লীর রাজপথেই দাঁড়ায়। তাই দিল্লী রাজধানীতে কখনও লোকের সমাগম কমে নি। সর্বদাই নানাধরনের পরিচ্ছদ পরিহিত লোকের আমদানি।

বিশেষ করে দিল্লীর চকবাজারে এদের দেখা যেত। সেখানে যেমন রংবেরঙের বিপণি, তেমনি বহু তার খদ্দের। আর সেই সব খদ্দের নানান দেশবিদেশের আমীর ওমরাহ।

ওরা চলতে চলতে সেই চকবাজারের কাছে এসে পড়লো কিন্তু একি? আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান,ঔরঙ্গজেবের আমলের চকবাজার—তার এ হাল কেন? একটি বিপণিও ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি, সব লুঠপাট, লণ্ডভণ্ড। সমস্ত চকবাজার-টাই যেন কে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে।

একটি দরবেশ স্কন্ধে একটি ঝোলা নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে দুঃখের সংগীত পরিবেশন করছিল। এই ধ্বংসের সঙ্গে যেন সেই সংগীতের বড় মিল। মন কেড়ে নেয়। লুতুফ আলি দাঁড়িয়ে পড়লো। মনটা তার বিবাগী হয়ে গেল। সে জানে না, এখানে কত ঐশ্বর্য রোশনাই জ্বলে সমস্ত অঞ্চল মুগ্ধ করে রেখেছিল কিন্তু এই ধ্বংস-চিহ্ন তাকে বড় কাতর করলো। ডাকাত যেমন এক গৃহবাসীর সমস্ত লুণ্ঠন করলে কাতরতা জাগে, তেমনি বাদশাহের এই ক্ষতি তাকে মর্মাহত করলো।

বুলন্ত সিং কিন্তু সে সব কথা ভাবছিল না। তার মনে কোন করুণভাবের উদয় হয়েছেকিনা তাও মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল না আদৌ সে তখন কি ভাবছিল, তাও

বোঝা যাচ্ছিল না।

শুধু লুতুফ দাঁড়িয়ে পড়তেসে এগিয়ে গিযেছিল। লুতুফ আলি দেরি করতে সে বিরক্ত হয়ে সূর্যের দিকে তাকিয়ে হাঁক পাড়লো,—আলিসাহেব, আমাদের গন্তব্য স্থান দিল্লীর রাজপথ নয়, প্রাসাদ। জলদি সেখানে না পৌঁছলে দরবারের হাজিরা দিতে পারবে না।

লুতুফ আলি দরবেশের সেই বিয়োগ বেদনামধুব সংগীতে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার আবার নতুন করে মনে আসছিল প্রিয়জনের মৃত্যু। পিতা ইস্রায়িল, মাতা আশনাই। তারপর সবচেয়ে মনে আসছিল নির্যাতিতা ফতুমার কথা। এই সংগীতে যেন ফতুমাকে হারানোর ব্যথা লুকোনো আছে।

দরবেশ বেশ দরদভরা কণ্ঠে একটি ভগ্ন বিপণির গায়ে ভর দিয়ে গান গাইছিল। তার চোখদুটি নিমীলিত কিন্তু চোখের কোণ বেয়ে অশ্রুঝরছে। লুতুফ আলির চোখেও জল এল। বুকের তলে যেন কি এক আবেগ এসে তাকে মোহিত করলো।

হঠাৎ সেই সময় বুলন্ত সিং ডাক দিল।

লুতুফ আলির সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন বুলন্ত সিংকে শত্রু মনে হল। তার মনটি হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো, মনে হল, সে কি বুলন্ত সিংয়ের নোকর না হুকুমের দাস। আর সেইজন্যে সে চিৎকার করে কর্কশকণ্ঠে বললো, - দরকার তোমার সিংজী, আমার নয়। তুমি দরবারে উপস্থিত হবার জন্যে জলদি যাও। আমি তোমার সঙ্গী হব না।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বুলন্ত সিং চমকে উঠলো। লুতুফ আলির অস্বাভাবিক আচরণে বিস্মিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার সন্দেহ হল—আলিসাহেব নিশ্চয় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। তার গোপন কাহিনী সে জানে। হয়তো এই সুযোগে সে সরে গিয়ে বাদশাহকে সচেতন করে দিতে চায়।

এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুলন্ত সিং তীরবেগে চলে এল লুতুফ আলির কাছে। তারপর হুঙ্কার ছেড়ে কোষবদ্ধ থেকে অসি বের করে শূন্যে তুলে বললো,—খবরদার! বিশ্বাসঘাতক, বেইমান। তোমাকে আমি ভাল বলেই জানতাম। এখন দেখছি তোমার রক্তেও হিন্দুস্তানের শয়তানী বাসা বেঁধেছে। আর এক পা এগোলে তোমার মুণ্ড আমি ধড় থেকে নামিয়ে দেব।

লুতুফ আলি কিন্তু তরবারী বের করলো না। বরং পরমবিস্ময়ে বুলন্ত সিংযের আচরণ লক্ষ্য করে দুঃখিতস্বরে বললো,—সিংজী, মুণ্ড যদি তোমার ধড় থেকে নামানোর ইচ্ছে থাকে, নামিয়ে দাও। তবে দুর্নামের ভাগীদার কর না। আমি কোন বেইমানীর আশ্রয় নিয়ে তোমার সঙ্গ ত্যাগ করতে চাই না।

বুলন্ত সিং হঠাৎ যেমন তরবারী উন্মোচন করেছিল, তেমনি তা কোষবদ্ধ করলো। তারপর একটু কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,—তাহলে হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ কি?

কারণ যেটা লুতুফ আলির মনে জেগেছিল, সেটা বললেই সত্যি কথা বলা হত। বুলন্ত সিংয়ের সেই গোপন প্রতিহিংসার কথা শোনার পর থেকেই মনটা তার যেন কেমন বিগড়ে গেছে। একে সে বুলন্ত সিংয়ের সঙ্গে আসতে চায় নি। ফতুমার মৃত্যুর আগে

যে আশা ছিল,—আগ্রহ ছিল,—ফতুমার মৃত্যুর পর সে আগ্রহ বা আশা ফুরিয়ে গেছে। ভাগ্য পরিবর্তন করে কি হবে? কার জন্যে ভাগ্য পরিবর্তন? তাই পরিকল্পনাও পরিবর্তন করেছিল। তারপর বুলন্ত সিং এমনভাবে তাকে উৎসাহ দিল, যা তার সবকিছু পাল্টে গেল। বুলন্ত সিংকে একান্ত বিশ্বাস করে এই অভিযানে বের হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পথিমধ্যে বুলন্ত সিং তার এক গোপন পরিকল্পনা জানাতে সে সিংজীর ওপর বিশ্বাস হারালো। তখনই তার মনে হয়েছিল, জিজ্ঞেস করে—সিংজী, এই যদি তোমার মনবাসনা, তাহলে আগে আমাকে খুলে বলনি কেন? বললে আমি মনস্থির করতে পারতাম।

যাই হোক, তাও লুতুফ আলি সহ্য করে আসছিল কিন্তু দিল্লীর ধ্বংস ও তার সঙ্গে দরবেশের বেদনামধুর সংগীত শুনে তার সব সংযম ভেঙে গেল। তাই সে হঠাৎ বলে উঠেছিল,—আমি যাব না। কিন্তু এখন বুলন্ত সিং কৈফিয়ত চাইতে একবার ভাবলো।—সত্যি কথাই বলে, তারপর কি ভেবে ম্লান হেসে বললো,—কারণ কিছুই নেই সেনাসাহেব। আমি এমনি বলেছিলাম।

বুলন্ত সিং সহজ হয়ে এল, মৃদু হেসে বললো,—আমার গোস্তাকি মাফ কর আলিসাহেব। দিল্‌টা বড় ধড়্ ফড়্ করছে কিনা! তাই তোমার ওপর হঠাৎ বেসরম আচরণ করে ফেললাম।

লুতুফ আলি বললো,—কই কসুর নেই। এগিয়ে চল, রোশনী মাথার ওপর উঠছে।

তখনও দরবেশ সেই একই সুরে গান গাইছিল।

ওরা আবার অশ্বখুরের শব্দ জাগিয়ে এগিয়ে চললো।

শহরের মধ্যে যত তারা ঢুকতে লাগলো, পচা দুর্গন্ধের একটা ভ্যাপ্‌সা বাতাস চতুর্দিক থেকে ছুটে আসতে লাগলো। বিশ্রী গন্ধ, যেন মানুষের গলিত শবের দুর্গন্ধ। ঢুকলে বমনোদ্রেক হয়।

বুলন্ত সিং বেশ চিৎকার করে বললো,—আলিসাহেব বুঝতে পারছ, গন্ধটা কিসের?

লুতুফ আলির মনে পড়ছিল আব্বাজান ও আম্মাজানের শবের কথা। ঝলসানো দেহ থেকে এমনি দুর্গন্ধ সেদিন নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল। তাই নিঃসন্দেহ হয়ে বললো,—মানুষের দগ্ধদেহের গলিত শবের গন্ধ।

বুলন্ত বললো,—ঠিক তাই। মনে হচ্ছে, নাদীর শাহ নগরবাসীর যত দেহ দ্বিখণ্ডিত করেছে, তাদের কবর দেওয়ার জমির অভাবের জন্যে বাদশাহ তাদের জ্বালিয়ে ফেলবার হুকুম দিয়েছেন। এমনি কতদিন ধরে জ্বালানো হবে, কে জানে?

লুতুফ আলি বুলন্ত সিংয়ের কথা বিশ্বাস করলো এইজন্যে যে, প্রাসাদের এক অংশ থেকে সেই রশ্মি উজ্জ্বল দিনের মাঝে আসমানের ওপরে উঠে যাচ্ছে। আর সেই ধূমকুণ্ডলী আসমানে উঠে বাতাসে মিশে চতুর্দিকে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করছে।

বুলন্ত সিং হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললো,—নাদীর শাহ মরদের বাচ্চার মত দুনিয়ায় এক স্বাক্ষর রেখে গেল। দিল্লী এই হাল কখনও কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি। আজ

তা বাস্তবে পরিণত হল। সমস্ত হিন্দুস্তানে এমনি একটি দৃষ্টান্ত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লুতুফ আলি বললো—কিন্তু নাদীর শাহ দিল্লীবাসীর কাউকে জীবিত রাখেন নি? আওরত, মরদ, বালবাচ্চা সকলকে একেবারে নিঃশেষে বধ করেছেন? লুতুফ আলির মনে পড়লো কাবুলের ঘটনা। সেখানে নাদীর শাহ নিজে ছিলেন না বটে কিন্তু তার সিপাইরা শহরের হাল ফিরিয়ে দিয়েছিল। তবে দিল্লীর মত এমন নয়। পথে জন প্রাণী নেই। এমন কি এখানে যে কোনদিন লোক ছিল, দেখলে তাও মনে হয় না।

বুলন্ত সিংও বিস্ময়ে সেই কথা ভাবছিল, যুদ্ধশেষে ধ্বংসস্তূপ চতুর্দিকে বিদ্যমান কিন্তু কান্নার রোল ছিল না? মানুষের আর্তনাদ নেই? কে যেন রাতারাতি সব তুলে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে ফেলেছে। তারপর বললো, অবশ্য এ অনুমান; তবু মনে হয় এই ঠিক। বাদশাহ মহম্মদ শাহ বোধ হয় সমস্ত দুর্গতদের প্রাসাদের মধ্যে আশ্রয় দিয়ে নিজের দুর্বলতা ঢাকতে চেয়েছেন। সিংহাসনে থাকতে অপর এক বিজয়ী এসে তাঁর সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে যথেচ্ছাচার করে গেল, এ তো কম লজ্জার কথা নয়! তারপর হঠাৎ বুলন্ত সিংয়ের পূর্বস্মৃতি মনে পড়তে দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—মহম্মদ শাহের মৃত্যুর চেয়ে এই শাস্তিই যথেষ্ট। এ লজ্জা তাঁর ঢাকবার জায়গা নেই। এই সময়ে মৃত্যুই তাঁর প্রার্থনা। সেই মৃত্যু দিয়ে আমি তাকে চির শান্তির কোলে ঘুম পাড়িয়ে দেব।

প্রাসাদের কাশ্মীরী গেটের কাছে ওরা এসে গিয়েছিল।

হঠাৎ লুতুফ আলি অশ্ব থামিয়ে বুলন্ত সিংয়ের হাত চেপে ধরে বললো,—সিপাহীজি, এক বাত আমি পেশ করবো। তুমি যদি আমার কথা রাখ, তাহলে আমি বহুত খুশি হবো।

বুলন্ত সিংও দাঁড়িয়ে পড়েছিল, বিস্ময়ে ভুরুজোড়া কুঁচকে লুতুফ আলির দিকে তাকিয়ে বললো,—কৌন সেই বাত! জলদি পেশ কর।

তুমি বাত্‌লা নিও না। লুতুফ আলি একান্ত করুণভাবে বললো,—আমরা বাদশাহের সঙ্গে দেখা করে দুজনে এক সাথে বাংলা মুল্লুকে ফিরে যাব। যদি আবার কখনও আস, তখন না হয় পিতার প্রতিশোধ নিও। এখন, কি জানি মনে হচ্ছে, এদিন শুভ নয়, তোমার কাজ সফল হবে না। ধরা পড়ে যাবে।

বুলন্ত সিং হঠাৎ নির্ভীক ভঙ্গীতে বললো.—বেশ তো ধরা পড়লে ক্ষতি কি। আপসোস থাকবে না। তবু তো মনে শান্তি পাব, পিতার প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে।

লুতুফ আলি মাথা নেড়ে বললো,—বালবাচ্চার মত কথা বলো না সিংজী। প্রাণটা তোমার ছেলেখেলার জন্যে নয়। এখন জোয়ান বয়স, দুনিয়ায় তোমার অনেক কিছু করবার আছে, তাছাড়া জোরুর কথা একেবারে ভুলে গিয়েছ?

নিষেধের প্রবল শক্তি বিপরীতভাবে কার্য করে। লুতুফ আলির নিষেধ বুলন্ত সিংয়ের মাথায় যেন যেন আরো খুন চাপলো। সে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো,—সেই

সুদূর বাংলা মুল্লুক থেকে এখানে এসেছি কি ক্রীড়া দেখতে? এই সময়ে এখানে আসার অর্থ শুধু এই মতলবকেই চরিতার্থ করার জন্যে। এখন না করলে আর জীবনে কখনও সময় পাবো না। তাছাড়া আমি সৈনিক আলিসাহেব, মৃত্যুকে আমি ডরাই না। বাংলার নবাবের সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ চলছে, হয়তো ফিরে গেলে তাদের হাতেই প্রাণ যাবে। তার চেয়ে পিতার প্রতিশোধ নিয়ে পুত্রের কর্তব্য করাই উচিত? আর বিবির কথা বললে, তাকে আমি এবার গিয়ে বলে এসেছি। সে রাজপুত রমণী, আমার মনোভিপ্রায় শুনে নির্ভীক কণ্ঠে বললো,—তুমি সৈনিক, মৃত্যু তোমার যে কোন সময়ে হতে পারে। তাই বলে তোমাকে সন্তানের কর্তব্য করতে বাধা দেব, এ কথা কেমন করে ভাবলে? সুতরাং আমার পথ পরিষ্কার—নয় বাদশাহ মহম্মদ শাহ নিহত হবেন, নয় হাবিলদার বুলন্ত সিং বাহাদুর নিহত হবে।

লুতুফ আলি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো,—এ কথা তুমি যদি আগে বলতে তাহলে আমি আসতুম না।

বুলন্ত সিং হঠাৎ হো হো করে হেসে বললো,—আর তোমাকে সঙ্গী করবো বলেই তো আমি এতদিন ঐ সরাইখানায় অপেক্ষা করেছি। তোমার সাহায্য না পেলে যে এ কাজ সম্পন্ন হবে না।

লুতুফ আলি দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে সংবরণ করলো।

এই সময় প্রাসাদ ফটকের উঁচু খিলান থেকে পাহারাদারের হুঙ্কারধ্বনি ছুটে এল—উধার কৌন অশ্বারোহী! খবরদার! তফাত যাও।

বুলন্ত শুধু চাপাস্বরে বললো,—এসো, আমরা প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করি। এখন কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম দরকার। বিশ্রামের পর ভাবা যাবে কর্তব্য। তখন যদি মতলব পরিবর্তন হয়, তাহলে তোমার আর্জি স্মরণ করবো। এই বলে বুলন্ত আর অপেক্ষা না করে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে গেল।

লুতুফও উপায়ান্তর না দেখে বুলন্ত সিংকে অনুসরণ করলো।

এর পর তিন চারদিন গত হল।

কিন্তু এই তিন চারদিন লুতুফ আলি ও বুলন্ত সিংকে একরকম নির্ভাবনায় অতিবাহিত করতে হল। ভাবনা অবশ্য অনেক ছিল কিন্তু কিনারা ছিল না বলে অতিথিশালার পুরু গালিচার ওপর শুয়ে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাওয়া স্থির করল। লুতুফ আলি তাই করছিল। বাদশাহী খানার তীব্র আস্বাদে মুগ্ধ হয়ে নিজেকে বাদশাহের মত মনে করে, গভীর আয়াসের ঘুমে লুতুফ আলি রাত কাবার করে দিচ্ছিল। তার রাত্রি ও দিন প্রায় একাকার হয়ে কবে যে চারদিন গত হয়ে গেল, সে তা জানে না।

অথচ তারই পাশে বুলন্ত সিংয়ের মনে শান্তি নেই। তার চারদিন যেন চার যুগ

গত হয়ে গেল। আরো যে কতদিন গত হবে, সে তা জানে না। কারণ বাদশাহ দরবারে আসেন না। রাজকার্য করেন না। তার কথা কেউ জানে না। এমন কি খোজারা পর্যন্ত বলতে পারে না, তিনি কোথায় বা কি অবস্থায় অবস্থান করছেন? তবে তিনি আছেন; বেঁচে আছেন এবং সুস্থশরীরে আছেন, এ সবাই জানে। কারণ তা না হলে দরবারের আমীর ওমরাহরা বিদ্রোহ ঘোষণা করতো। রাজকার্যের সবই প্রতিদিন হয়। রাত্রির অন্ধকার ফিকে হয়ে এলে নহবতখানায় মিঞা কি মল্লার রাগে সানাই বেজে ওঠে। তারপর সেই সুর বিভিন্ন রাগ ও রাগিণীতে ঘোরাফেরা করে যখন ভোরের ভৈরবী রাগে এসে থামে, তখন দেখা যায় আসমানের পুবগগনের সোনার বর্ণ সপ্তরঙের বরণডালা নিয়ে উদয় হচ্ছে। ঠিক সেইসময়েই তোরণদ্বারে মাথার ওপর প্রহরীর কণ্ঠে শোনা যায় আজানের করুণ আর্তনাদ। সেই কণ্ঠের প্রার্থনা থামতে থামতে প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ থেকে লোকের সাড়া জেগে ওঠে মহলে মহলে দাসদাসী-দের সাড়া মেলে। তারপর গোসলখানা, বাবুর্চিখানায় সোরগোল ওঠে। তারপর পূর্ণ দিনের আলো প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহের নিয়মমাফিক কাজ শুরু হয়ে যায়। দফতরখানায় কর্মচারীরা মোটা খাতাগুলোর আড়ালে হারিয়ে যায়। আস্তাবলের অশ্বরক্ষকরা অশ্বের হিসাব মেলাতে মেলাতে গলদঘর্ম হয়ে যায়। হাতিশালার রক্ষকরা বুঝে উঠতে পারে না, রাতারাতি কয়েকটি হাতি লোপাট হয়ে গেল কেমন করে? সিংহদ্বার রক্ষক মান্দার আলিকে জিজ্ঞেস করতে লোক ছোটে, রাত্রে কবার ফটক খোলা হয়েছিল!

নিয়মমাফিক এ সব কাজ প্রত্যহের। তারপর দরবার বসবে। আমীর, ওমরাহ, মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর, কাজী মনসবদার, দেহরক্ষী, প্রহরী হাজির হবে। কুঁরচী নামক কর্মচারী মঞ্চের ওপর পতাকা হাতে দাঁড়াবে। নকিব চিৎকার করে জানাবে, খবরদার, হিন্দুস্তানের সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহ বাহাদুর হাজির!

মহম্মদ শাহ পিতৃপুরুষ শাহজাহানের মতই রাজকার্য সম্পন্ন করতেন। তাঁরও প্রত্যহের প্রভাতে সাড়ে সাত ঘটিকার সময় রাজকার্য শুরু হত। আগে তিনি দিওয়ান-ই-আমের কার্য সমাধা করতেন। দিওয়ান-ই-আমে প্রধানত বৈদেশিক রাজদূত অভ্যর্থনা, ফকীর, দরবেশদের দান, আমীরদের পদোন্নতি ঘোষণা, উপাধি ও রাজভূষণ বিতরণ প্রভৃতি সম্পন্ন হত। এই কাজ দু' ঘণ্টা অবধি করে সম্রাট সপারিষদ নব সংগৃহীত হস্তী ও অশ্ব পরিদর্শন করতেন। দিওয়ান-ই-আমের কর্মধারা ছিল আনুষ্ঠানিক।

দিওয়ান-ই-আমের কর্ম সমাপ্তির পর বাদশাহ মহম্মদ শাহ দিওয়ান-ই-খাসে উপস্থিত হতেন। সম্রাট শাহজাহান দিল্লী, আগ্রা উভয়স্থানেই দিওয়ান-ই-খাস নির্মাণ করে-ছিলেন। দিওয়ান-ই-খাসের কাজ ছিল বাস্তব ও বৈষয়িক। উজীর, উকিল, দেওয়ান, বক্সী, সদর, সিপাহশালার নির্দিষ্ট সময়ে বাদশাহের কাছে তাঁদের বক্তব্য পেশ করে আদেশ গ্রহণ করতেন। পাশে উপবিষ্ট ওয়াকিয়া-নবীশ বা সংবাদ লেখক সম্রাট

উচ্চারিত প্রতি অক্ষর লিপিবদ্ধ করতো।

দিওয়ান-ই-খাসকে লোক স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করতো। তাই লোকে বলত—

'আগর বর রু-এ জমিন ফিরদোস আস্ত্‌।

হামিন আস্ত্‌, হামিন আস্ত্‌, হামিন আস্ত্‌॥'

তারপর বাদশাহ বাদশাহজাদা ও পাঁচ জন কর্মচারিসহ শাহবুরুজ নামে গুপ্ত মন্ত্রণাগৃহে গমন করতেন। শাহবুরুজের গোপন সভায় রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধিপত্র, সুবাদার নিযুক্ত প্রভৃতির কাজ সম্পন্ন হত। এখানেও বাদশাহ মহম্মদ শাহ এক ঘণ্টা সময় অতিবাহিত করতেন। তারপর অন্তঃপুরে গিয়ে বিশ্রাম নিতেন। সেখানে বেগমদের আর্জি শুনতেন। প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন। প্রার্থীদের দানস্বরূপ অর্থ রাজকোষ থেকে দেবার জন্যে বলে বেরিয়ে আসতেন।

দিনের শেষে মহম্মদ শাহ আবার দিওয়ান-ই-খাস ও শাহবুরুজের গোপন মন্ত্রণাকক্ষে ফিরে যেতেন। সেখানে প্রয়োজনীয় কর্ম সমাধা করে রাজউদ্যানে পশুপক্ষীর যুদ্ধ, বাজিকরের খেলা কিংবা সংগীত উপভোগ করতেন। মহম্মদ শাহও সংগীতপিপাসু ছিলেন।

দিনের আলো শেষ হলে মশালের আলোয় রাজপ্রাসাদের চার পাশ প্রজ্বলিত হত। প্রাসাদের প্রতি কক্ষ বিচিত্র বর্ণের ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠতো, কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে আলোর অপরূপ অলঙ্কার দ্যুতি ঝলমল করে উঠত—রাত্রের এই রহস্যময়ী রূপে বিচিত্র প্রাসাদের আবহাওয়া এতই মনোরম ছিল যে- রাত্রের দৃশ্য চোখের ওপর ভাসলে দিনের কথা মনেই থাকতো না। আর বাদশাহের ছিল ভিন্ন একটি বেহেস্তের মত মহল, তার নাম শিসমহল। এই শিস্‌মহলের গঠনপ্রণালী যেমন বিচিত্র, তেমনি এর আবহাওয়া। বাদশাহ এই শিস্‌মহল রাত্রের অনেক সময় অতিবাহিত করতেন। এই শিস্‌মহলের প্রাচীর গাত্র বিচিত্র ও পাথরের ঝালরের দ্বারা আবৃত ছিল, আর কক্ষের মধ্যে এক মানুষ সমান দেয়াল পরিধিতে দর্পণের প্রতিফলন ছিল। সেই দর্পণের প্রতিফলনের যেমন একটি আলোর স্তম্ভ বহু আলোর সৃষ্টি করতো, তেমনি একটি লাস্যময়ী অপরূপ যৌবনবতী নর্তকী নৃত্য করলে বহু নর্তকীর প্রতিবিম্ব দেখা যেত।

এখানেই রাত্রের অনেক সময় অতিবাহিত করে তারপর বাদশাহ নৈশভোজন কক্ষে প্রবেশ করতেন। সেখানেও সুগন্ধ খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করতে করতে আর এক নৃত্য ও সংগীত উপভোগ করতেন। অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রজালের অন্তরালে নৃত্যকক্ষের নূপুর নিক্কণ সুকণ্ঠ সংগীতে উজ্জ্বল হয়ে এসে তার চিত্ত খাদ্য ও পানীয়ের সাথে মুগ্ধ করতো।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁর পূর্বপুরুষ শাহজাহানকেই অনুসরণ করেছিলেন। সেইজন্যে তাঁর প্রত্যহের কাজ শাহজাহানের অনুকরণেই সম্পন্ন হত।

শাহজাহানের জীবনে যে জাঁকজমক ও আড়ম্বর ছিল, মহম্মদ শাহের জীবনেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু কর্নালের যুদ্ধেই তাঁর সব শেষ হয়ে গেল। শুধু দেওয়ান-ই-আমের সৌন্দর্য ময়ূর-সিংহাসন ও মুকুটের শোভা কোহিনূর নয়, গেল তার ইজ্জত, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি। তাঁর চেয়ে যদি নাদীর শাহ গলাটা কেটে তাকে মুক্তি দিয়ে

যেত, তাহলে তাঁকে এই লজ্জা পেতে হত না।

প্রাসাদের অনেকেই জানে, নাদীর শাহ যখন ময়ূর-সিংহাসনে বসে বাদশাহের কোহিনূর মুকুট মাথায় দিয়ে রাজকার্য করতেন, তখন মহম্মদ শাহ কাতর হয়ে বলেছিলেন;—পারস্যরাজ, পরাজিতকে মৃত্যু দেওয়াই বীরের কর্ম। আপনি আমার শিরচ্ছেদ করে মহানুভবতার পরিচয় দিন।'

তার উত্তরে নাদীর শাহ বলেছিলেন,—না, মোগল বাদশাহকে এত সহজে মৃত্যু দেওয়া পারস্যরাজের ইচ্ছা নয়। তারপর অট্টহাসি হেসে বলেছিলেন,—আমি যদি আপনাকে সিংহাসন চ্যুত করে হত্যা করি তাহলে পরবর্তী রাজ্য-পরিচালনা করবে কে? আপনি আমার বশ্যতা স্বীকার করেছেন এতেই আমি কৃতার্থ হয়ে গেছি। আমার উদ্দেশ্য রাজ্যপরিচালনা নয়, ধনদৌলত সংগ্রহ করা। তা যখন আমার সংগ্রহ হয়ে গেছে, তখন এই ঝঞ্চাটের প্রস্তর সিংহাসনে আপনি বসে অপরাধীর বিচার করুন।

কর্নালের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মহম্মদ শাহ প্রাণভিক্ষা করেছিলেন এবং নাদীর শাহ তা মঞ্জুর করেছিলেন কিন্তু তখন বুঝতে পারেন নি, এই প্রাণ তার একদিন তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে জীবন নিঃশেষ করবে।

আজ সেই অস্থির জীবন তার মৃত্যু প্রার্থনায় বসেছে। এ লজ্জা তিনি কোথায় লুকোবেন। নাদীর শাহ আজ চলে গেছেন কিন্তু মনে হচ্ছে, এখনও তিনি যেন সমস্ত দিল্লী ঘুরে তাণ্ডব করে চলেছেন।

প্রাসাদ, দরবার, সিওয়ান ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, শাহবুরুজ রত্নাগার, তোষাখানা সব গেছে তার জন্যে দুঃখ নেই। দুঃখ নেই অল্পবয়েসেই যুবতী বিবিদের নাদীর শাহ নিয়ে গেছে বলে। তাদের নরম গালে টুসকি মেরে বাদশাহকে ব্যঙ্গ করে বলে গেছে,—'বুড়া আদমী হয়ে নওজোয়ানী আওরতের অঙ্গারের তাপ সহ্য করতে পারবেন না শাহজী, তাই এগুলিকে নিয়ে যাচ্ছি।' এই বলে নয়া আমদানি খুবসুরত একডজন বিবি নাদীর শাহ বগলদাবায় পুরেছে। এমন কি কত খুবসুরত রমণী প্রস্ফুটিত প্রসূনের মত বর্ণসুষমা নিয়ে বসে ইরান, পারস্য, আফগানিস্থান, কাশ্মীর, বাংলা থেকে এসে মজুত হয়েছিল, তাদের উপঢৌকনস্বরূপ চেয়ে বসে নাদীর শাহ সমর্থনের অপেক্ষা না করেই নিজের খাস মহলে নিয়ে চলে গেছেন—তাতেও মহম্মদ শাহ কিছু বলেন নি। বলবেন আর কি – তার বলবার সব জোরই তো কর্নালের যুদ্ধে শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু প্রাণভয়ে সমর্থন করা। না করলে প্রাণ যাবে। তাছাড়া প্রতিবাদের ভাষা কোথায়?

শুধু বেগমমহল, শিসমহল, নাচমহল, বাঁদীমহলই নাদীর শাহ নষ্ট করেন নি। এক ধরনের কুমারী মেয়েদের অন্তঃপুর ছিল বাদশাহের প্রাসাদের অভ্যন্তরে। সেই আওরতগুলি মহম্মদ শাহ নিজের ব্যয়ে মানুষ করতেন। ছোট থেকে তারা বড় হয়ে উঠতো সেই অন্তঃপুরে, তারপর তাদের উপযুক্ত রাজপুরুষ দেখে শাদী দিয়ে দিতেন। অধিকাংশ এই সব রমণীরা ছিল গরীব ঘরের সুন্দরী মেয়ে। এই মহৎ কাজটি মহম্মদ

শাহ নিজের মস্তিষ্কের দ্বারাই সৃষ্টি করেছিলেন। এই সব রমণীদের তিনি কখনও চাক্ষুষ দেখতেন না বা তাদের কাউকে নিজের ভোগের জন্যে আশা করতেন না। শুধু শাদীর দিন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আশীর্বাদ করতেন, বলতেন,—সুখী হও।

এর জন্যে বাদশাহ মহম্মদ শাহের অনেক প্রশংসা হত। এটি একেবারে নিজের কল্পিত বলে তিনি নিজে খুব গর্ব অনুভব করতেন। আর সুখী দম্পতিরা তাঁর দ্বারা জায়গীর পেয়ে চলে গেলে নিজের গর্বে তিনি নিজেই আনন্দ করতেন।

হঠাৎ নাদীর শাহ প্রাসাদের সমস্ত ইজ্জত কেড়ে নিয়ে এই মহলের ওপর দৃষ্টি দিলেন। তখন আর মহম্মদ শাহের চেতনা থাকলো না। তিনি প্রাণপণে বাধা দিয়ে সেই মহলের ফুলের মত নিষ্পাপ আওরতগুলিকে বাঁচাতে চাইলেন। কাতর হয়ে বললেন,—পারশ্যরাজ, আপনি সবই নিয়েছেন, আমি কোন কিছুতে বাধা দিই নি—শুধু এই নিষ্পাপ আওরতগুলিকে মুক্তি দিন। ওরা একটি ঘর, একটি পুরুষ, বালবাচ্চার স্বপ্ন নিয়ে আমারই ভিন্ন অন্তঃপুরে বড় হয়ে উঠছে। ওদের আমি কসম খেয়ে কবুল করেছি, ওদের ইজ্জত বাদশাহের ইজ্জত। ওদের ইজ্জত গেলে আমার আম্মার ইজ্জত যাবে। আপনি আমার মুখ চেয়ে ওদের না ক্ষমা করেন, আপনার আম্মার মুখ চেয়ে ওদের মুক্তি দিন।

নাদীর শাহ উল্লাসে হেসে বললেন,—আপনার আম্মা তো একজন, আপনি সেই একজন কে বলুন? তাকে ছেড়ে দিচ্ছি, বাকীগুলি সব আমার। এই বলে মহম্মদ শাহের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করেই সেই কুমারী-অন্তঃপুর উজাড় করে আওরতগুলিকে নাদীর শাহ নিজের খাসমহলে নিয়ে গেলেন. তারপর বেছে বেছে দু একটিকে নিজের এক্তিয়ারে রেখে বাকীগুলিকে উচ্চপদস্থ সৈনিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

নাদীর শাহের নিজের জন্যে যে দু একটি ছিল, তার মধ্যে গুলবানু নামে একটি যুবতী হঠাৎ একদিন রাত্রে প্রাসাদ প্রকম্পিত করে চিৎকার করে উঠলো।

সে চিৎকার আজও প্রাসাদের অধিবাসীর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। নাদীর শাহের আগমনের পর প্রত্যেকেরই মুখের কথা হারিয়ে গিয়েছিল। শুধু প্রাণ ছিল, প্রাণের স্পন্দন শোনা যেত না। কলের পুতুলের মত আদেশ পালন করে যেতে হয় বলে সবাই যেত। আর ভয়ে ভয়ে থাকত, কখন কার ঘাড়ের মাথা যায়।

তাই গুলবানুর এই চিৎকারে সকলে সচকিত হয়ে উঠল। আর একটি প্রাণ বুঝি তার সমস্ত রোশনী হারিয়ে মাটির তলায় চলে যায়।

নাদীর শাহ যে এই গুলবানুকে খাসমহলে নিয়ে গিয়েছিল, সকলে জানতো। তাই পরিণতির কথা ভেবে কম্পিত হল।

আর গুলবানুকে চিনতো সবাই। অঙ্গুরী বাগের গুলাবী পুষ্পের মত একটি সদ্য ফোটা প্রাণরত্ন। যেমন বর্ণ তেমনি চঞ্চল হরিণীর মত দুটি চোখে রাজ্যের স্বপ্নদ্যুতি। সে স্বপ্ন দেখত বাদশাহ মহম্মদ শাহের মত একটি ভাগ্যবান নওজোয়ান যুবককে। তা'বলে সে বৃদ্ধ মহম্মদ শাহকে আকাঙ্ক্ষা করত না। বরং বাদশাহকে নির্ভয়ে বলতো—বাদশাহ দাদু, আমার যে পুরুষ হবে সে তোমার মতই সুন্দর কিন্তু তা'বলে তুমি

যেন কখনও আমাকে তোমার হারেমে আশা ক'র না। সেইরকম যদি কখনও প্রবৃত্তি হয়, তার আগে বলো, আমি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবো, এই বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতো গুলবানু। তার হাসিতে চাঁদের সুষমা ঝরে ঝরে পড়ে মহম্মদ শাহকে পুলকিত করতো।

শুধু মহম্মদ শাহ কেন অন্তঃপুরের সকলের এই প্রগল্ভ রমণীটির উচ্ছল জীবনের আনন্দ অনুভব করতো। তার গতি ছিল অবারিত। অন্তঃপুরের সব মহলেই তার যাতায়াত ছিল! খোজা প্রহরীদের সে মস্করা করতো। বাঁদীরের সে জ্বালাতন করতো। বেগমদের কোলের ওপর শুয়ে বলতো—মালেকা, তোমার কোলটা কি রকম নরম, যেন মখমলের ঘেরাটোপ পরানো একটি তুলোর বালিশ। শুয়ে থাকলে আপনা থেকে নিদ্ এসে চোখ জড়িয়ে ধরে।

মহম্মদ শাহ মনে মনে এমন কাউকে খুঁজতেন, যে এই গুলবানুকে শাদী করে তাকে খুশি করবে।

ঠিক এমনি সময় নাদীর শাহের দিল্লীতে আগমন।

আর তার পরেই গুলবানুর কোরবানী।

তাই সে-রাত্রে গুলবানুর চিৎকারে শুধু প্রাসাদ কাঁপলো না, অন্তঃপুরের সব মানুষ-গুলি কাঁপলো। এমন কি নির্যাতিত খোজারা পর্যন্ত ছটফট করে আল্লাকে ডাকলো—হে আল্ল', এর বিচার কর।

আর মহম্মদ শাহ সেদিন সবচেয়ে বেশী অস্থির হলেন। সবচেয়ে বেশী তিনি উন্মত্ত হলেন। সবচেয়ে বেশী তার লজ্জা সমস্ত শরীরের শোণিতের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি করলো। তিনি নিজের আরামকক্ষে ডিভানের ওপর অর্ধশায়িত হয়ে কান দুটি চেপে ধরলেন। বুকের ওপর হাত চেপে ধরে নিজের স্পন্দন থামাতে চাইলেন। চোখ দুটি দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি নিজের সব হারিয়েও অশ্রুত্যাগ করেন নি কিন্তু গুলবানুর জন্যে তার কলিজা ভেঙে যেতে লাগলো।

রাত্রিতে আরো কবার চিৎকার উঠেছিল, তারপর সব স্তব্ধ। আর আর্ত চিৎকার শোনা যায় নি। তবে সারা রাত্রি ধরে নিস্তব্ধ প্রাসাদের মর্মর দেয়ালের কঠিন ব্যূহ ভেদ করে বিনিয়ে বিনিয়ে কান্না বেহাগ সুর ধ্বনিত হয়েছিল।

সকলেই বুঝেছি গুলবানুর কি হয়েছে? শয়তান নাদীর শাহ রাত্রের অন্ধকারে কি তার কেড়ে নিয়েছে। সেদিন রাত্রে সবার মনে যেন কেমন আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। একটি কুমারী আওরতের অভিশাপ কখনও বিফল হবে না। একটি কুসুমকে দলিত করার শাস্তি অবশ্যই আল্লা দেবেন।

কিন্তু আল্লা কি তা কখনও দিয়েছিলেন?

বরং পরদিন প্রভাত হতে এক নাটকীয় ঘটনা সৃষ্টি হল, যা আরো স্মরণীয়, আরো রেখাঙ্কিত হয়ে থাকলো ঐ দিল্লীর প্রাসাদের আকাশে ও বাতাসে।

গুলবানু কোথা বেরিয়ে এল পাগলিনীর মত। এক মাথা আলুলায়িত কেশদাম, অবিন্যস্ত পোষাক। একরাত্রে তার ফুলের মত নিষ্পাপ মুখের জৌলুস কে যেন কেড়ে

নিয়েছে। রক্ত নেই সারামুখে। কোটরে চলে গেছে চোখ দুটি। সারা রাত্রি ধরে কান্নার জন্যে গালের ওপর জলের পিছিল দাগ।

ডান হাতের মুষ্টিতে একটি শাণিত ছুরিকা নিয়ে সে মাতালের মত বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলো। খোজা প্রহরীরা ছুটে এল, তাকে বাধা দিল কিন্তু ধরে রাখতে পারলো না। তখন তার শরীরে অসীম বল। সে যেন মত্ত হস্তীর বল পেয়েছে এমনিভাবে বেগে মহম্মদ শাহের কক্ষে প্রবেশ করলো।

তারপর কোন ভণিতা না করে, চিৎকারে কক্ষ বিদীর্ণ করে অশ্রুজলে বললো,—দিন দুনিয়ার মালিক খোদাবন্ বাদশাহ, গুলবানুর ইজ্জত তুমি রক্ষা করতে পারলে না! একটি ফুলের মত নিষ্পাপ আওরতের তুমি স্বপ্ন কেড়ে নিলে! এর জন্যে দায়ী তোমা-কেই করবো। তোমাকেই অভিশাপ দেব যেন তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখের না হয়। তুমি যেন আমার মত যন্ত্রণায় তিল তিল করে শেষ হয়ে যাও।

তারপর আবার ভেঙে পড়ে বললে—আজ আমি তোমার সামনেই নিজের প্রাণ বধ করবো, যেন আমার মৃত্যুর বিভীষিকা তোমার চোখে চিরকাল জেগে থাকে। তুমি যেন শান্তি না পাও।

এই বলে গুলবানু যেমন অল্পকথায় ঝরণাধারার মত হেসে গড়িয়ে পড়তো, তেমনি দ্বিধা না করে সেই শাণিত ছুরিকা নিজের বুকে আমূল বিদ্ধ করে গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

আজ সেকথা প্রাসাদের সবার কাছে গল্প।

বুলন্ত ও লুতুফ সে কাহিনী শুনে মনে মনে আহত হল। তাই শুনলো—বাদশা-হের মানসিক কষ্ট অনেক, তিনি কি আর মানুষ আছেন যে, নাদীর শাহ চলে গেছে বলে আবার নিশ্চিন্তে এসে দরবারে বসবেন?

নাদীর শাহ চলে গেছে কিন্তু রেখে গেছে যে চিহ্ন, তার কোন হিসাব নেই। দিল্লীর রাজপথে কেউ নেই, তেমনি প্রাসাদের মধ্যে অনেক লোক: অনেক আর্ত চিৎ-কারের প্রতিধ্বনি। সুশৃঙ্খল জীবনে বিশৃঙ্খলার কোন পরিমাপ নেই। বুলন্ত সিং ও লুতুফ আলি পাঁচদিন ধরে সেই বিশৃঙ্খলাই দেখলো। লুতুফ আলি জানতো না তাই ভাবলো, বাদশাহের প্রাসাদ বলে বুঝি এমনি বিশৃঙ্খলা, এমনি কলরবের হাটই থাকে। কোথাও কোন শৃঙ্খলা নেই। এমন কি কোথাও কাজের তাড়া নেই। যেন প্রত্যেকে নিজের স্বাধীনতা পেয়ে খুশি মত চলতে শিখেছে।

প্রথম দিন ঢুকেই তাই ওরা দেখেছিল, রক্ষীরা নিজের নিজের নোক্‌রী বজায় রাখতে স্ব স্ব ভূমিকায় দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু তাদের কাজের মধ্যে যেন কেমন ঢিলেঢালা অবস্থা। কারো রক্তচক্ষুর হুমকি নেই বলে তারা বেশ স্বাধীন আলোচনার মধ্য দিয়ে চাকরি বজায় রাখছেন। এমন কি বুলন্ত সিংকে নিজের প্রয়োজন জানাতে লোক খুঁজে বেড়াতে হল। সে যে বাদশাহের সঙ্গে দেখা করবে এবং তার আর্জি পেশ করবে এই কথা শুনে অনেকেই হেসে বললো,—সোজা অতিথিশালায় গিয়ে কিছুদিন আরামে কালিয়া কোপ্তা খাও, তারপর যদি দরবারে বাদশাহ আসেন, তখন গিয়ে

আর্জি পেশ করো।

বুলন্ত সিংকে শেষপর্যন্ত নিজেকেই অতিথিশালা খুঁজে নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিতে হল। কিন্তু অতিথিশালার যে মর্যাদা, সে মর্যাদা আর ছিল না। সেখানে অনেক লোক। অনেক দুর্গতের সমাবেশ হয়েছে। সমস্ত দিল্লীবাসী নাদীর শাহের হাতে প্রহৃত হয়ে এসে অতিথিশালা পূর্ণ করেছে। শুধু অতিথিশালা নয়, অনেক অস্থায়ী আস্তানা সৃষ্টি করে তার মধ্যে অনেক উদ্বাস্তুর সংসার আশ্রয় নিয়েছে। অধিকাংশ সংসারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিটি খোয়া গেছে, অর্থাৎ নাদীর শাহের আক্রমণ থেকে মরদটি রক্ষা পায় নি।

এরই একটি স্থানে বুলন্ত সিং ও লুতুফ আলি আশ্রয় নিয়েছিল।

আর তারা আরো দেখেছিল, আসবার সময় যে ধূমকুণ্ডলি আকাশমার্গে আচ্ছাদিত ছিল, তারই পুনঃ প্রকাশ, এবং তারা যে অনুমান করেছিল, তাই ঠিক—সমস্ত মৃতদেহের পাহাড় একত্রিত করে প্রত্যহ জ্বালানো হচ্ছে। আর সেই প্রজ্বলনের ধূমশিখা সমস্ত প্রাসাদকক্ষ আমোদিত করে এক জোরালো গন্ধের মাতন সৃষ্টি করেছে। কদিন ধরে প্রাসাদের আবহাওয়া যেন কেমন বিষাক্ত হয়ে থাকলো। কত মৃতদেহ প্রত্যহ দগ্ধ হচ্ছে কে জানে কিন্তু তার যেন শেষ নেই। যেন একটি চিরস্থায়ী শ্মশানক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল দিল্লীর প্রাসাদ অভ্যন্তর। এই অগণিত মৃতদেহ দগ্ধ করার জন্যে কে হুকুম দিল? তবে কি এ বাদশাহের আদেশ? কিন্তু বাদশাহ এই সংখ্যাতীত মৃতদেহগুলকে যমুনায় ভাসিয়ে দিলেন না কেন? বেশ যেত মানুষের মৃতদেহের মিছিল নদীবক্ষে সাঁতরে দেশ দেশান্তরে! অবশ্য এতে অন্যান্য স্থানের লোকেদের মনে বিভীষিকা সৃষ্টি হতো বলেই মহম্মদ শাহ তাঁর লজ্জার চিহ্ন একেবারে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। তাতে কি বিনষ্ট হবে সব? মৃতদেহগুলি নয় দগ্ধ হবে কিন্তু তাদের পরিবারের দীর্ঘশ্বাস কোথায় লুকোবে? সেই দীর্ঘশ্বাসের আবহাওয়ার বাতাস ভারী থাকবে না!

মহম্মদ শাহ যতই কিছু লুকোতে চান, কিছুই তিনি লুকোতে পারবেন না। এক যারা জেনে ফেলেছে, তাদের যদি তিনি নির্মমভাবে হত্যা করতে করতে যান, তাহলে হয়তো একদিন নিশ্চিহ্ন হবে তাঁর অপমান।

কর্নালের যুদ্ধে হেরে গিয়ে নাদীর শাহের কাছ থেকে প্রাণভিক্ষা করেছিলেন। সেই পারস্যাধিপতি তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন কিন্তু প্রাণটি রক্ষা করে যা কেড়ে নিয়েছেন, তা দুনিয়াতে দুর্লভ।

প্রাসাদ আজ প্রাসাদই আছে, তবে তার জৌলুস নেই। শুধু মর্মরময় কক্ষগুলি নিষ্প্রাণ জীবনের তপস্যা করছে।

নহবতখানায় আর রাত্রিশেষে মিঞা কি মল্লার রাগে সানাই বাজে না। মান্দার আলি আর আজানের প্রার্থনা ভোরের আলোর বুকে চুম্বন দিয়ে ঘোষণা করে না। খোজা প্রহরীরা আর দিনের শুরুকে অভিনন্দন করে চিৎকারে বাদশাহের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করে না। অথচ তারা সকলেই আছে। যা দু'একজন নাদীর শাহের কোপে পড়ে জীবন দান করেছে, সে জায়গায় অন্য লোক নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু তারা কেমন

যেন কাজ করতে ভুলে গেছে।

হাতিশালায় হাতি নেই। অশ্বশালায় অশ্ব নেই। যা আছে তা পরিত্যক্ত বলেই পড়ে আছে। হাতিরক্ষক, অশ্বরক্ষক গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসেছে, তাদের চাকরি থাকবে কিনা!

শুধু রন্ধনশালায় যা একটু সোরগোল। কারণ আজ প্রাসাদের প্রতিটি ইঞ্চি পরিমাপ জায়গায় অগণিত মানুষ। তাদের আহারের জন্যে এই সোরগোল। সরকার বাদশাহের আদেশ পালিত হয়ে চলেছে। শুধু এখন আহার্য বস্তু সংগ্রহতেই রাজকর্মচারীরা ব্যস্ত।

বাদশাহ হঠাৎ অতিথি সৎকারে এত মনোসংযোগ করলেন কেন, এ উত্তর বোধ হয় সেই চিরাচরিত মনোরঞ্জন। এই অগণিত দুর্গত দিল্লীবাসীকে খুশি করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। বাদশাহ এখনও যে ভবিষ্যৎ ভাবছেন, সেই অনুমান করে লজ্জা জাগে। যে অক্ষম বাদশাহ নিজের আশ্রিতদের বাঁচাতে পারে না, তাঁর এই সাহায্য প্রার্থনা পৃথিবীর ইতিহাসে আরো লজ্জাজনক বলেই মনে হয়। তবু বাদশাহ এই উদ্বাস্তু প্রতিপালন করেই চলছেন।

লুতুফ আলির কোন চিন্তা নেই। সে কার্পেটের ওপর গা ঢেলে দিয়ে শুধু মাঝে মাঝে বুলন্ত সিংকে জিজ্ঞেস করে—দোস্ত, বাদশাহের দেখা পেলে?

বুলন্ত সিংয়ের শুধু নিরুৎসাহের মত উত্তর—পেলুম আর কই? আসলে যে বাদশাহ কোথায় আছে কেউ জানে না। এমন কি বাদশাহের খাসভৃত্যকে পাকড়াও করে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে বললো,—বাদশাহ এখন বেগমমহলের কোন্ কক্ষে আরাম করছেন জানি না। বাদশাহের খাসভৃত্যও অনুমান করতে পারলো না।

এমনি করে চলে আরো দিন কয়েক।

একদিন হঠাৎ বুলন্ত সিং এসে লাফাতে লাফাতে খবর দিল—আলিসাহেব, বহুত জোর খবর আছে, বাদশাহ মহম্মদ শাহ আবার দরবার করবেন। তবে তিনি দিওয়ান-ই-খাস বা দিওয়ান-ই-আমে বসবেন না, তিনি নিজের খাসমহলে বসে দেওয়ান, বক্সী মারফত রাজকার্য চালাবেন।

লুতুফ আলি নিস্পৃহকণ্ঠে বললো,—তাতে তোমার কি সুবিধে হবে? তুমি দেখা করতে পারবে?

বুলন্ত সিং বললো,—আমি বক্সী মারফত এত্তেলা পাঠিয়ে দিয়েছি, দেখা হতেও পারে। বাদশাহ আলিবর্দীর কথা শুনলে কি চুপ করে থাকতে পারবেন?

বুলন্ত এই কথা বলার পর যেমন উর্ধ্বশ্বাসে এসেছিল, তেমনি উর্ধ্বশ্বাসে চলে গেল।

আরো দু'একদিন এমনিভাবে চলবার পর আবার একদিন বুলন্ত সিং এসে বললো, —বাদশাহ আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর করেছেন।

লুতুফ আলি বললো,—তাহলে চলো পাততাড়ি গুটিয়ে বিদায় হই।

এই কথায় হঠাৎ বুলন্ত সিং রক্তচক্ষু করে বললো,—এত সহজে? বাদশাহের সঙ্গে দেখা না করেই আমি চলে যাব! তুমি আমাকে চেনো না আলিসাহেব, আমার নাম বুলন্ত সিং, আমি যা বলি তাই করি। বুলন্ত সিংয়ের মুখের ওপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন ফুটে উঠলো।

তারপর সে আবার বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু এবার খবর নিয়ে এল—কোন উপায় নেই আলিসাহেব। বাদশাহ বাইরের লোকের সঙ্গে একেবারেই দেখা করবেন না বলে ঢালাও হুকুম দিয়েছেন।

তাহলে উপায়!

উপায়যে বুলন্ত সিং ভেবেই এসেছে, তা পরক্ষণে বোঝা গেল। তাড়াতাড়ি লুতুফ আলির অতি কাছে সরে এসে চতুর্দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললো,—আলিসাহেব, তুমি আমার পোষাক পরে ও নবাবী পাঞ্জা সঙ্গে নিয়ে বাংলায় চলে যাও, গিয়ে নবাব-সাহেবকে এইসব ঘটনা বলবে। আমি উপস্থিত এখানে থাকবো।

লুতুফ আলি বুঝতে পারলো,—বুলন্ত সিং কেন থাকতে চায়। তাই সে কাতর হয়ে বললো,—সিংজী, এদিকের হালচাল দেখে ও মতলব ত্যাগ কর। যদি ধরা পড়ে যাও তাহলে আর প্রাণে বাঁচবে না। বাদশাহের এখন যে ক্রোধ সঞ্চিত আছে, সব তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

বুলন্ত সিং ম্লান হেসে মৃদু তিরস্কার করে বললো,—তুমি সৈনিক নও আলিসাহেব। তোমার মনে যথেষ্ট কাপুরুষতার লক্ষণ বিদ্যমান। আমি যা বললাম, তা করবে কিনা সেই কথা বলো। এখন আমার প্রতিজ্ঞা দৃঢ় হয়ে গেছে, তুমি অযথা বাধা দান করে বিরাগভাজন হয়ো না।

তখন লুতুফ আলি অপ্রতিভ হয়ে বললো,—বেশ, দোস্ত হিসাবে যা বলেছিলাম, আমি সংশোধন করে নিচ্ছি। কি আদেশ আছে বলো, আমি পালন করতে প্রস্তুত।

বুলন্ত আবার তার পূর্বকথার পুনরাবৃত্তি করলো। বললো,—নবাব ও বেগমকে সবই বলবে। এবং আমার নাম করে বলবে, সে বলেছে যেন তারই পদটি তোমাকে দেন। এই বলে বুলন্ত সিং নবাবের দেওয়া তরবারীটি লুতুফ আলিকে দিয়ে তার তরবারীটি নিজের কোমরে ঝুলিয়ে নিল। তারপর উষ্ণীষটি আলির মাথায় পরিয়ে দিয়ে বললো,—এখুনি বেরিয়ে পড়ো, পথ যদি চিনতে কষ্ট হয়, তাহলে পথচারীকে জিজ্ঞেস করে নেবে। আর কেউ পরিচয় চাইলে পরিচয় দেবে না কারণ শত্রু সর্বদা ওত পেতে আছে। পরিচয়ের বদলে অসির ঝনঝনানিতে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করবে, যদি দেখো পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তাহলে মৃত্যুবরণ করবে, জীবিত অবস্থায় ধরা দেবে না। এই হচ্ছে আসল সৈনিকের ধর্ম। অশ্বের গতি দ্রুতগামী করবে, সহজে কোথাও বিশ্রাম নেবে না। যদি খুব ক্লান্ত হয়ে যাও, তাহলে নিরাপদ স্থান দেখে অশ্ব থামাবে।

বুলন্ত সিং থামলে লুতুফ আলি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, —আমার গোস্তাকি মাপ কর সিংজী। আমার জন্যে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। আমি যদি নবাবের কাছ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারি তবে তোমার কোন ক্ষতি করবো না। শুধু আমি এইটুকু ভাবছি, আমার নসীব কি? যেই আমার জীবনে সঙ্গী হয়, তাকেই আমি কোন কারণবশত হারিয়ে ফেলি। দেশ থেকে যখন যাত্রা করেছিলাম, সঙ্গে ছিল অনেক লোক, আজ মাত্র বাচ্চা লড়কা ছাড়া আর কেউ নেই। অথচ সে থাকলে আমি মরতেও ভয় পেতাম না। শুধু ঐ বাচ্চাটির জন্যে আমাকে মরতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। কী বিচিত্র এই আল্লার মতলব। আজ তুমিও সঙ্গী হয়ে এতদূর পথ সঙ্গে এলে। ভেবেছিলাম, তোমাকে অবলম্বন করে জীবনের পরিবর্তন আনবো কিন্তু তুমি ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছো!

বুলন্ত সিং হঠাৎ লুতুফ আলির পিঠ চাপড়ে বললো,—জীবন বড় কঠিন আলি-সাহেব। অত অল্প আঘাতে ভেঙে পড়লে হয় না। যাই হোক, আমি তোমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবো আলিসাহেব, যাতে তুমি শান্তি পাও।

আস্তাবলে গিয়ে লুতুফ আলি অশ্বের পিঠে উঠলো। তারপর বুলন্ত সিংয়ের কাছে বিদায় নিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

অশ্ব প্রাসাদের বক্ষ কাঁপিয়ে লোকজনের শরীর বাঁচিয়ে পথ করে চললো। হঠাৎ ফটকের কাছাকাছি এসে লুতুফ অশ্বের লাগাম চেপে ধরলো। অশ্বটি এক মানুষ সমান লাফিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

লুতুফ আলি চমকে উঠলো, হঠাৎ তার অন্যমনস্কতার সুযোগে বিবেকের এই স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজে। সে দাঁড়িয়ে পড়লো কেন ভাবতে গিয়েও বিস্মিত হল। সে ভাবছে মহম্মদ শাহের কথা। দিল্লীর বাদশাহ। যাঁকে সে কখনও দেখে নি, যাঁর নামই সে শুধু শুনেছে। এখন সে তাঁর জান্ বাঁচানোর কথা ভাবছে! নিজেকে সে সংযত করার চেষ্টা করলো। না না এ অন্যায়, হোক্ তিনি সমস্ত হিন্দুস্তানের বাদশাহ! লুতুফ আলি ভিন্‌দেশের লোক। দিল্লীর বাদশাহ তো তাকে কোন সাহায্য করে নি! তবে কেন দোস্তি হতে যাবে! তবু মন বলতে লাগলো, তুমি মানুষ। মানুষের ধর্মই পালন কর। একজন লোকের প্রাণ যাবার কথা শুনেও তুমি চলে যাবে! জীবনে ভাল কাজ তো কখনও কর নি। একটি না হয় ভাল কাজ করলে। বাদশাহ মহম্মদ শাহের জীবন তুচ্ছের জীবন নয়। তার জীবনের মূল্য সারা হিন্দুস্তানের দৌলত। এই প্রাসাদে যত লোক আছে, সব লোকের বিনিময়ে এই বাদশাহের জীবন। তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিও না। যদি বুলন্ত সিং পিতার প্রতিশোধ সত্যিই নেয়, তাহলে ব্যাপারটা কি হবে বোঝ? একটি লোকের বিহনে সমস্ত হিন্দুস্তানের আবহাওয়া পালটে যাবে। দিল্লীর রাজপথে যে শূন্যতা দেখে এসেছ, প্রাসাদের মধ্যে সে শূন্যতা নেমে আসবে। যে দুর্গতরা এখানে বাঁচবার জন্যে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা নিরাশ্রয় হবে। বুঝে দেখ, তুমি কত বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছ?

তবু লুতুফকে থমকে দাঁড়িয়ে আরো ভাবতে হল! আরো গভীরভাবে চিন্তা।

কিন্তু বুলন্ত সিংকে সে ধরিয়ে দেবে, এ কথাই বা তার মনে এল কেমন করে? না, বুলন্ত সিংকে সে ধরাবে না, বাদশাহ মহম্মদ শাহকে বাঁচাবে। একটি অমূল্য জীবনের রক্ষা সে করবে। এর জন্যে যদি বুলন্ত সিংয়ের কোন ক্ষতি হয়, তবে সে নাচার!

হঠাৎ লুতুফের প্রতিজ্ঞা যেন কেমন দৃঢ়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হল। কিছুক্ষণ আগে যে কথা তার একবারও মনে আসেনি হঠাৎ সেই কথা তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে বসলো। তার মনে থাকলো না যে সে কিছুক্ষণ আগে বুলন্ত সিংয়ের জন্যে কাতরতা প্রকাশ করেছিল। বুলন্ত সিংয়ের প্রাণ রক্ষার জন্যে তার আগ্রহ সীমাহীন ছিল। সব ভুলে গিয়ে সে একান্ত আগ্রহভরে অশ্ব থেকে নেমে ইতস্তত তাকালো।

আবার রাজকার্য শুরু হয়েছিল বলে আবার প্রাসাদের শৃঙ্খলা প্রায় ফিরে আসছিল। অন্তত সান্ত্রী পাহারাদার আবার সতর্ক হয়ে সঙ্গীন তুলে পাহারা দিতে শুরু করেছে। ওপাশে দফতরখানায় আবার ভিড় লেগে গেছে। আমীর, ওমরাহরা তাঁদের রাজসিক পোষাক পরে অশ্ব সওয়ার হয়ে আসছে, যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ইরাণ প্রহরীর কণ্ঠের হুঁশিয়ার ধ্বনি।

নহবতখানায় মাঝে মাঝে বেজে চলেছে সানাইয়ের মধুর রাগিণী।

লুতুফ আলির আসমানের দিকে চোখ ছিল না, যদি থাকতো তাহলে সে দেখতে পেত একদল সাদা পায়রা বাদশাহ মহম্মদ শাহের প্রতিনিধি হয়ে আসমানের ঐ উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কে ঘুরে ঘুরে তাঁর মঙ্গল কামনা করছে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে অঙ্গুরীবাগে ও রোশনীবাগে আবার রক্তগোলাপ ফুটে উঠেছে। খুসবু আতরের ছড়াছড়ি চতুর্দিকে। আবার কস্তুরী সুরভি ও লোবাণের মিষ্টি গন্ধ চতুর্দিক আমোদিত করে চলেছে।

লুতুফ আলি অশ্বটি একটি থামের গায়ে বেঁধে রেখে এগিয়ে গেল।

লোকজন আজ বেশ ব্যস্ত। অন্তত সবারই হাতে পায়ে ব্যস্ততার লক্ষণ। এতদিন বাদশাহ অন্দরমহলে লুকিয়ে ছিলেন বলে সকলেই কাজে ঢিলে দিয়েছিল। এবার বাদশাহ দরবার করতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

পাশ দিয়ে একটি ভিস্তি তার জলের চামড়ার ব্যাগটি নিয়ে চলে যাচ্ছিল। সে বেশ দ্রুতই যাচ্ছিল হঠাৎ লুতুফ আলির তাকেই যেন কথাটা বলার ইচ্ছে জাগলো। তাই সে এগিয়ে গিয়ে ভিস্তিকে দাঁড় করিয়ে বললো,—হ্যাঁ হে, বলতে পারো বাদশাহের কাছে একটা জরুরী সংবাদ পেশ করতে গেলে কি করতে হয়?

ভিস্তি দ্রুত যাচ্ছিল। তার মহলে মহলে জল পৌঁছে দেওয়াই কাজ। কিন্তু আজ জল পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। খোজা কিম্মদ আলি হয়তো গোসা করে বসে আছে কিংবা দেওয়ানের কানে কথাটা তোলবার জন্যে বক্সীর সাহায্য নিয়েছে। এই সব ভেবেই সে দ্রুত যাচ্ছিল। হঠাৎ পথের মাঝখানে একটি বেকুবের পাল্লায় পড়তে তার সমস্ত রাগ চড়ে গেল কিন্তু সে ভাব দমন করে গম্ভীর মেজাজে বললো,—জরুরী কথাটা কি শুনি বাপু? তুমি কি মহম্মদ শাহের কোন হারানো বেগমের খোঁজ নিয়ে এসেছো?

লুতুফ আলি অপ্রতিভ হয়ে বললো,—না সে ধরনের কিছু নয়। তারপর চতুর্দিকে

তাকিয়ে চাপাস্বরে বললো,—তার চেয়ে অনেক জরুরী খবর। এই বলে সে ইতস্তত করতে লাগলো।

তার ইতস্তত ভাব দেখে ভিস্তি গেল আরো চটে। বললো—তুমি দেখছি বড় বেয়াদপ আদমী আছো। যা বলতে চাও টক্ করে না বলতে পারো, পথটি ছেড়ে দিয়ে আমাকে যেতে দাও। ওদিকে অন্দরমহলে এখনও পানি দেওয়া হয়নি। পানি অভাবে হয়তো কুসুম বেগম এখন হাত পা ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে বসেছে। তার আবার যমুনার পানিতে ভীষণ ঘেন্না!

লুতুফ আলি বললো,—ভিস্তি সাহেব, তুমি যখন অন্দরমহল পর্যন্ত যাও, তাহলে আমার কথাটা সেখানে পেশ করে দাও। দেখবে, বাদশাহ্ তোমাকে বহুত নজর দেবে।

ভিস্তি আবার বিরক্ত হয়ে বললো,—কথাটা দয়া করে বললেই তো বুঝতে পারি যে সে কথাটা বলা যাবে কিনা। তবে অন্দরমহল পর্যন্ত যাবার আমার হুকুম নেই, আমি শুধু কিস্মদ আলির হাতে ব্যাগটি দিয়ে দিই, সে খালি করে এনে আমাকে ফেরত দেয়। হঠাৎ ভিস্তি লুতুফ আলির আরো কাছে সরে এসে চাপাস্বরে বললো,—তবু জানো, কুসুম বেগমকে দেখেছি। আর মাইরি সে যা সুরত। আমার দিল্ বেবাক খারাপ হয়ে গেছে। আমি বুড়বাক্ বনে গেছি। আর ভাবতেও কি ভাল লাগে? ঐ খুবসুরত বেহেস্তের হুরী আমারই দেওয়া পানি দিয়ে গোসল সারে, শরীরে আমারই দেওয়া পানি ঢালে।

লুতুফ অল্প একটু হেসে বললো,—এই যে তুমি বললে, তুমি অন্দরমহলে ঢুকতে পাও না, তাহলে তুমি বাদশাহের জেনানাকে দেখলে কেমন করে?

ভিস্তি মাথার টুপিটি নামিয়ে আবার চতুর্দিকে তাকিয়ে তারপর চাপাস্বরে বললো,—নসীব আমার বহুত সেদিন ভাল ছিল। আমি কিস্মত আলির হাতে জলপাত্রটি দিয়ে প্রত্যাহের মত বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ কানে গেল রমণীকণ্ঠ। খুব কাছেই সেই কণ্ঠের আওয়াজ। মনে হল মাত্র একটি দেওয়াল ব্যবধান। মনটি হঠাৎ কেমন বেবাক হয়ে গেল। ব্যস্, আল্লা বোধ হয় আমার প্রার্থনা শুনলেন।

কিস্মৎ আলি দরজাটি বন্ধ করে গিয়েছিল কিন্তু খিল দেয়নি, একটু ঠেলা দিতেই খুলে গেল। আর আমি অমনি ভডাক করে দুটি চোখ সেই দরজায় ফাঁকে চালিয়ে দিলাম। ভিস্তি তারপর বললো,—তোমার জরুরী খবর বল। যদি আচ্ছা খবর হয়, তাহলে বাদশাহের কাছে পেশ করবার জন্যে চেষ্টা করবো।

লুতুফ আলি তাড়াতাড়ি বললো,—কিন্তু ব্যাপারটা সবাই জানুক, এ তো আমি চাই না। তাছাড়া সান্ত্রী পাহারাদারকে বললে সে বিশ্বাস করবে না, বরং আমাকেই সন্দেহ করবে।

ভিস্তি বললো,—তাহলে জলদি গোপন ব্যাপারটা বলে ফেল। আর দেরি ক'র না।

লুতুফ আলি আবার চতুর্দিকে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললো,—এক দুশমন আদমী

এসেছে এই প্রাসাদের মধ্যে—সে বাদশাহকে খুন করতে চায়।

কেন?

তার বাপজানের হত্যার বদলা নিতে এসেছে।

রক্ষীবাহিনী কথাটা জেনে'ছ! বাদশাহের খাস দেহরক্ষী বাহিনী!

লুতুফ মাথা নেড়ে বললো,—সে কাউকে চেনে না বলেই জানাতে পারেনি।

তুমি জানলে কেমন করে?

তখন লুতুফ আলি বুলন্তের সম্বন্ধে যা জানতো বললো।

ভিস্তি সন্দিগ্ধ হয়ে বললো,—তুমি দোস্তকে ধরিয়ে দিতে চাও কেন? তোমার উদ্দেশ্য?

আমার উদ্দেশ্য বাদশাহের প্রাণ বাঁচানো!

ভিস্তি হেসে বললো,—এই উপকারের কোন প্রত্যুপকার!

লুতুফ আলি ইতস্তত করে বললো,—কোন প্রত্যুপকারের আশা না করেই আমি বাদশাহের প্রাণ বাঁচানোর কথা ভেবেছি। বাদশাহের প্রাণ লক্ষপ্রাণের চেয়ে অমূল্য বলেই এই আগ্রহ।

ভিস্তি মনে মনে কি ভেবে নিল, তারপর বললো,—লোকটি আছে কোথায়?

সম্ভবত অতিথিশালায়।

দেখাতে পারবে?

লুতুফ আবার ইতস্তত করে বললো,—দেখাতে গেলে সে যদি আমাকে দেখে ফেলে তাহলে সে আমার মতলব বুঝতে পারবে। তখন আমাব জান্ বাঁচানো মুশকিল হবে।

হঠাৎ ভিস্তি এক কাণ্ড করলো, তার কাঁধের জলের থলি মাটিতে রেখে জোবে হাততালি দিয়ে উঠলো।

তার হাততালিতে একদল পাহারাদার ছুটে এল।

ভিস্তি লুতুফ আলিকে দেখিয়ে বললো,—দুশমন আগন্তুক বাদশাহকে হত্যার চেষ্টায় এই প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। একে বন্দী কর।

লুতুফ আলি হঠাৎ দারুণ বিস্ময়ে হতচকিত হয়ে গেল। চিৎকার কবে বললো,—বিশ্বাস কর তোমরা, আমি বাদশাহকে হত্যা করতে চাইনি।

কিন্তু কে তার কথা শুনবে?

সান্ত্রী পাহারাদাররা লুতুফ আলিকে শৃঙ্খলিত করলো।

আর ভিস্তি লুতুফ আলির দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে তার গমনপথের দিকে চলে গেল।

দু'তিনদিন পর।

স্থান, বাদশাহের খাসমহল।

মহম্মদশাহ বিচারের আসনে উপবিষ্ট।

লুতুফ আলিকে কয়েদ-ঘর থেকে সেখানে আনা হল। সে এসে দূরে বুলন্ত সিংকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হল। বুলন্ত সিংও তাকে দেখলো কিন্তু তার চোখে ছিল দারুণ ঘৃণা। সে ঘৃণা মিশ্রিত চোখে লুতুফ আলির দিকে তাকিয়ে মাথা নত করলো।

এই সময় মুফতি চিৎকার করে বললো,—আসামী বুলন্ত সিং তুমি বাদশাহকে হত্যার চেষ্টা করেছিলে কেন? কি তোমার অভিযোগ বাদশাহের বিরুদ্ধে?

বুলন্ত সিং কোন উত্তর দিল না।

মুফতি আবার বললে,—শুনেছি তুমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চাও। কিন্তু কে তোমার সেই পিতা? কেন তাকে হত্যা করা হয়েছিল? এসব জানবার জন্তে বাদশাহ আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

বুলন্ত সিং তবু কোন কথা বললো না।

মুফতি এবার একটু অনুচ্চকণ্ঠে বললো,—তোমার যদি কোন বক্তব্য থাকে তাহলে পেশ কর, হয়তো বক্তব্য শুনে বাদশাহ তোমার সাজা লঘু করতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে যেন বিনামেঘে বজ্রপাত হল। বুলন্ত সিং গর্জে উঠলো,—অনুগ্রহ! আমি স্বনামধন্য বাদশাহের অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়ে এখানে আসি নি। আমি প্রতিশোধ নিতে এসেছিলাম কিন্তু বেইমানকে বিশ্বাস করে ধরা পড়ে গেছি। কবুল করছি, শাস্তি নিতেও প্রস্তুত। শাস্তি দিতে আজ্ঞা হোক্। এইমাত্র প্রার্থনা। বিচারের প্রহসন করে নিজেকে লঘু না করলেই খুশি হব।

সমস্ত দরবার মুহূর্তে বিচলিত হয়ে উঠলো। বাদশাহের রক্তিম মুখেও আরো রক্তিমতার ছোঁয়াচ পড়লো। তিনি পারিষদের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করলেন। বাদশাহের মনে যে কোন শান্তি ছিল না, তাঁর চেহারাই তা প্রতীয়মান করলো। দেহে ছিল মূল্যবান রাজসিক পোষাক। পোষাকে ছিল হীরা-চুনির রোশনাই। কণ্ঠে ছিল বৃহৎ মুক্তার মালা। যে সিংহাসনে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, তারও ঔজ্জ্বল্য দিল্লীর দৌলত তুল্য। তবু যেন সব ম্লান মনে হচ্ছিল। বাদশাহের মস্তকে ভাগ্য-বানের মুকুট শোভা পাচ্ছে কিন্তু তার ঠিক নিচে যে দুটি চোখ সর্বদা খুশি সৃষ্টি করে রোশনাই ছড়াতো, সেই চোখে ছিল না কোন আলোর দ্যুতি। সূর্য যেন বিদায় নিয়ে বাদশাহের চোখে ধূসর মেঘের সৃষ্টি করেছে। আর সেই মেঘের বুকে জলের বিন্দু। যেন এখুনি ঝরঝর ধারায় ঝরে পড়বে।

লুতুফ আলির সেই মুহূর্তে মনে পড়লো গুলবানুকে। তবে কি বাদশাহ সেই কিশোরী গুলবানুর ইজ্জতহানিতে অমনি মর্মাহত হয়েছেন? কিন্তু তাই বা কেন? তিনি কি জানতেন না নিজে নাদীর শাহের শিবিরে গিয়ে সন্ধি প্রস্তাব মঞ্জুর করেছেন। সন্ধি করলে যে পৌরুষ জলাঞ্জলি যায়, এ কথা জেনেই তো প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আর এও কি জানতেন না, প্রাণ হয়তো তাঁর থাকবে কিন্তু প্রাণ ছাড়া যে সম্ভ্রম হারাবেন, তার মূল্য কখনও তিনি ফেরত পাবেন না। তাই গুলবানু কিংবা কোন খুবসুরত আওরত খোয়া গেলে তাঁর দুঃখ করা শোভা পায় না। জেনে-শুনে যে সর্পের

ঝাঁপিতে হাত দিয়েছেন, যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হবে।

তারপরের কথা আর লুতুফ ভাবতে পারলো না। শুধু মনে মনে বললো,—নবাব বাদশাহদের আর কিছু জানার মত অভিজ্ঞতা তার এখনও হয়নি। শুধু মানুষ হিসেবে মানুষের যে ধর্ম, সেটুকু সে ভাবতে পারে।

আবার মুফতির কণ্ঠ সেই দরবার কক্ষে সোচ্চার হয়ে উঠলো,—আসামী, বাদশাহের অভিমতে তোমার মন দেওয়া উচিত। সম্রাট শাহনশাহ বলছেন, তুমি অপ্রকৃতস্থ, তুমি হয়তো জানো না, তুমি কি করতে চেয়েছিলে? এখন যদি তোমার পিতার নামটি কবুল কর, শাহনশাহ তোমায় মুক্তি দেবেন।

আসামী বুলন্ত সিং ক্ষণিক মুহূর্তে চুপ করে থেকে হঠাৎ বললো,—বাদশাহ মহম্মদ শাহের বোধ হয় স্মরণ আছে, তিনি সৈয়দ ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁকে বন্দী করে কি নির্মম অত্যাচারে তার প্রাণবধ করেছিলেন!

সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট বাদশাহের ভ্রূ রেখায় কুঞ্চন সৃষ্টি হল। তিনি বিচলিত হলেন। স্মরণ পড়লো তাঁর সৈয়দ ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁকে। যাঁরা সম্রাট ফররুখশিয়রকে হত্যা করে সিংহাসন নিয়ে যথেচ্ছাচারে মন দিয়েছিল। হুসেন আলিকে ও আবদুল্লাকে হত্যা না করলে তাঁর সিংহাসন অরক্ষিত হত কিন্তু সে কাহিনী তো বহুদিন আগে শেষ হয়ে গেছে! আজ থেকে বিশ বৎসর পূর্বে যখন তিনি প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, তখন ঘটেছিল। আজ আবার তার পুনরাবৃত্তি কেন? এই যুবক কে? নাম বললো, বুলন্ত সিং। জাতিতে রাজপুত। তাহলে সেই সৈয়দ ভ্রাতাদের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি? হঠাৎ বাদশাহ পারিষদবর্গের মধ্যে বসেও কেমন যেন ভীত হয়ে উঠলেন।

তিনি স্থান কাল ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন নিজের পদমর্যাদা। হঠাৎ তিনি নিজেই আর্তস্বরে জিজ্ঞেস করে উঠলেন—কে তুমি যুবক? সেই দুশমনদের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

বুলন্ত সিং সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীককণ্ঠে উত্তর দিল,—বাদশাহের এই স্মরণে আমার জন্যে সৈনিক বুলন্ত সিং তাঁর তসলিম পেশ করছে। এই বলে সে হাত তুলে সেলাম করতে গেল কিন্তু শৃঙ্খলের জন্যে তার সে সেলাম মাঝপথেই বাধা পেল। তাই দেখে বুলন্ত ম্লান হেসে বললো,—জনাব, কসুর মাফি করবেন।

হঠাৎ বাদশাহ মহম্মদ শাহ প্রহরীকে হুকুম দিলেন,—ঐ যুবকের শৃঙ্খল মোচন কর।

এবার বলো, তোমার পিতা কে?

বুলন্ত সিংয়ের সাহস দেখে সমস্ত পারিষদবর্গ কেমন যেন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ভাবছিলেন, এবার বোধ হয় বাদশাহ এই ঔদ্ধত্যের জন্যে মৃত্যুই আজ্ঞা দেবেন কিন্তু তার পরিবর্তে বাদশাহ তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করতে সকলেই হতচকিত হয়ে গেল। এবং তারা ভাবলেন, বোধ হয় বাদশাহ নাদীর শাহের কাছে পরাজিত হয়ে নিজের ঔদ্ধত্য বিস্মৃত হয়েছেন। তাঁরা মনে মনে বিরক্ত হলেন। এমন কি গুঞ্জনও সৃষ্টি হল দরবার কক্ষের মধ্যে।

আর লুতুফ আলি মনে মনে ভাবছিল, বুলন্ত সিংয়ের সত্যিই সাহস আছে। সৈনিকের মতই নির্ভীক। মৃত্যুর জন্যে তার এতটুকু ভয় নেই। এই সাহসী সৈনিককে সে ধরিয়ে দিল? কাজটা যে খুবই অন্যায় হয়েছে, তা সে স্বীকার করে। কিন্তু সে তো বুলন্তকে ধরাবার জন্যে এ কাজ করে নি! বাদশাহকে বাঁচাবার জন্যে এই সাহস প্রকাশ করেছে। অথচ এই দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তার ভেতরে এত কম্পন আসছে কেন? তবে কি সে মনে প্রাণে সত্যিই ভীরু! নাকি বুলন্তের যত সাহস প্রকাশ হচ্ছে, সে তত ভবিষ্যৎ চিন্তায় পাগল হয়ে উঠছে! বুলন্ত যদি মুক্তি পায়, আর তাকেও যদি বাদশাহ ছেড়ে দেন, তাহলে উভয়ে এক জায়গায় মিলিত হবে, তখন বুলন্ত প্রতিশোধ নিতে নিশ্চয়ই কার্পণ্য করবে না! এইসব কথা ভেবেই বোধ হয় তার কম্পন আসছে।

লুতুফের ভাবনা স্থগিত হল। বুলন্ত সিংয়ের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হল—আমার পিতার নাম বলবন্ত সিং। সৈয়দ আবদুল্লা খাঁর প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন। আমি তারই অধম পুত্র।

মহম্মদ শাহের কণ্ঠ হঠাৎ গর্জন করে উঠলো,—তুমি সেই শয়তান বলবন্ত সিংয়ের পুত্র! সেই বেইমান একদিন অতর্কিতে আমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করে, আমাকে হত্যা করতে এসেছিল!

হ্যাঁ, আর আপনি তারই শাস্তিস্বরূপ তাকে আবদুল্লার মত নির্মমভাবে বরফ কূপে চুবিয়ে বিষাক্ত পোকার কামড়ে নিঃশেষ করে দিয়েছেন।

মহম্মদ শাহ দাঁতে দাঁত চেপে অস্থির হয়ে বললেন,—তার সেই শাস্তি যথেষ্ট হয় নি। সেদিন আমি যুবক ছিলাম, মনে ছিল উচ্চাশা, তাই তার শাস্তি লঘু করেছিলাম। আজ পেলে তাকে আরো নির্মম শাস্তি দিতাম। আমি বেইমানকে আরো চরম দণ্ড দিই। মোগল সাম্রাজ্যের বিচারের কানুনে লেখা আছে আরো চরম-দণ্ড। সে শুধু বেইমান ছিল না, তার মনে মনে ইচ্ছা ছিল সে সিংহাসন অধিকার করবে। হঠাৎ বাদশাহ প্রচণ্ড রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে হুংকার করে প্রহরীকে হুকুম দিলেন—এই যুবককে কারাগারে নিয়ে যাও। এর ঔদ্ধত্য ক্ষমাহীন। আর একে ছেড়ে দিলে সেও দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করবার জন্যে চক্রান্ত করবে।

প্রহরী বুলন্তকে আবার শৃঙ্খলিত করলে বুলন্ত ব্যঙ্গ করে বললো,—দিল্লীর বাদশাহের স্বরূপ চিনতে তামাম হিন্দুস্তানের আর কারুর বাকী নেই। অক্ষম এক যুবককে পেয়ে বাদশাহের বিচার নির্মম হল কিন্তু নাদীর শাহের কাছে তিনি কত ভীরু, তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

ঠিক দুর্বলস্থানে চাবুকের আঘাত। মহম্মদ শাহ আগেই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, এবার আরো সপ্তমে উঠে পুনরায় বজ্র গম্ভীরস্বরে হুকুম দিলেন—এই মুহূর্তে এই দুশমনকে ঘাতকের কাছে প্রেরণ কর। এর জোরালো বাত্ দিলের দর্দ আনে। এর বাত্ যাতে আর শুনতে না হয় তার ব্যবস্থা কর।

প্রহরীরা বুলন্তকে নিয়ে চলে গেল।

বাদশাহ মহম্মদ শাহ এবার লুতুফ আলির দিকে ফিরে বললেন,—তুমি পরদেশী, মোকাম তোমার আরবে! তুমি বাদশাহের জান্ বাঁচানোর জন্যে ইনাম গ্রহণ কর। তুমি বেকসুর খালাস পেয়ে এই বাদশাহেরই পার্শ্বচর নিযুক্ত হবে।

এই বলে মহম্মদ শাহ আর অপেক্ষা করলেন না, দরবার ছেড়ে প্রস্থান করলেন।

হঠাৎ নয়। মনে হয় যেন সুপরিকল্পিতভাবে লুতুফ আলি তার সৌভাগ্য গ্রহণ করেছে। অথচ সে কিছুই জানতো না। কোন পরিকল্পনাই সে গ্রহণ করে নি। এমন কি বাদশাহকে বাঁচানোর আগে সে ভাবে নি, বুলন্ত সিংয়ের এমনি অবস্থা হবে। তাই বুলন্ত সিং নিহত হতে, আর তার সৌভাগ্য উদয় হতে সে কেমন যেন ছোট হয়ে গেল।

কেমন যেন তার সমস্ত মনটি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এই জন্যেই কি তবে সে আরব থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিল?

রাজসিক বাসস্থান, রাজসিক আহার, রাজসিক পোষাক সব সে পেল। কিন্তু কেমন যেন তার মনটি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সে কিছুতে বুলন্ত সিংয়ের মৃত্যু ভুলতে পারলো না। তার মনে হল, বুলন্তের মৃত্যুর জন্যে যেন সম্পূর্ণ সে দায়ী। দায়ীই তো! সে না জানলেও অন্য কেউ নিশ্চয় জানতো, বাদশাহকে বাঁচানো মানে বাদশাহের নজরে পড়া। আর নজরে পড়ার অর্থ সৌভাগ্য অর্জন করা। লুতুফ আলি না জানলেও অন্য সকলে জানে। তাই একজন একদিন রসিকতা করে বললো,—'বেশ মতলবটি ঠাউরে ছিলে বাপু! এক ঢিলে দু পাখী বধ। তবে সময়টি ছিল মন্দ বলে বাদশাহ তোমার বেইমানী সহ্য করে পুরস্কার দিলেন। তা নাহলে বেইমানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য হত।'

বেইমানের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড! হ্যাঁ, লুতুফ আলি বেইমানীই করেছে! বুলন্ত সিংকে ধরিয়ে দিয়েছে। বুলন্ত সিংয়ের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী। একটি প্রাণ বাঁচানোর ক্ষমতা তার নেই কিন্তু নিতে সে আগ্রহী। নিয়েছে সে অদ্ভুত বিস্ময়কর স্বভাবের পরিচয় দিয়ে। কদিন ধরে তাই সে নতুন সৌভাগ্য পেয়েও আনন্দিত হতে পারলো না। পুলকিত হয়ে নিশ্চিন্ত আশ্রয় প্রাপ্তিতে নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারলো না। মখমল-শোভিত শুভ্র শয্যার গহ্বরে শুয়ে ঘুমোতে পারলো না। বাদশাহী খানায় রসনা তীব্র করে সুখকর পরিতৃপ্তিতে চোখ বুজতে পারলো না। বরং শয্যা হল তার কণ্টকসমান। যেন কাঁটা ফুটে রক্তাক্ত করে দিল দেহ। খানার আস্বাদন তিক্ত হয়ে গ্রহণ থেকে তাকে নিবৃত্তি করলো।

বার বার তার সেই এক কথাই মনে হতে লাগলো। বুলন্ত সিংয়ের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী। অথচ এই বুলন্ত সিং তাকে নবাব সরকারে চাকরির জন্যে কত যে নত করে বাংলা মল্লুকে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। এই পাঠানোর মধ্যে বুলন্তের কোন দুষ্ট মতলব

ছিল না। যদি থাকতো তাহলে নবাবী পাঞ্জা, মস্তকের উষ্ণীষ, কোষবদ্ধ তরবারী—তারপর সৈনিকের পোষাক পরিবর্তন করিয়ে সে পাঠাতো না। সে সব সম্পত্তিগুলি আজ কাছে নেই, কারাগারে নিক্ষেপের সময় কারারক্ষক কেড়ে নিয়েছে। থাকলে বুলন্ত সিংয়ের স্মৃতি তাকে আরো পীড়া দিত। আরো সে অস্থির হয়ে ছটফট করতে করতে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াতো।

অথচ এই দিল্লীর প্রাসাদ অভ্যন্তরে ঢোকবার পর কত বিস্ময় কত রোশনাই, কত বিচিত্র জীবনের চলাফেরা সে দেখছে। কিন্তু তার মন বর্তমানে সেখানে ছিল না। তার মন অন্তরের মধ্যে সেই একই কথার যোজনা করছে। এর চেয়ে যদি বাদশাহের বিচার তাকে খণ্ডবিখণ্ড করতো শান্তি মিলতো। আর ভাবতে হত না কোন কথা। ঘাতকের খড়্গের তলায় দেহ দ্বিখণ্ডিত হলে নিস্পন্দ দেহে রক্তাপ্লুত হয়ে বধ্যভূমিতে পড়ে থাকতো! তারপর শকুনের ঝাঁক এসে ছিন্নভিন্ন করে ছড়িয়ে দিত সর্বত্র। সেই ভাল হত। সেইরকম কিছু হলে আর এই অনুতাপ তাকে দগ্ধ করতো না। এই রকম তার মানসিক অবস্থা হত না। আজ শুধু বুলন্তের মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী নয়। আব্বাজান ইস্রায়িল, আম্মাজান আশনাই, বিবি ফতুমার মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী।

না, এ সৌভাগ্য তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে আসে নি, অভিশাপ নিয়ে এসেছে। সে বাদশাহী সুকোমল শয্যায় শুয়ে দিন কাটাতে পারবে না, তাকে পালাতে হবে।

এমনি সময় একদিন তার কানে গেল, বুলন্ত সিং তার সংবাদে বাদশাহ অনুচর কর্তৃক ধরা পড়ে নি, সে সত্যিই বাদশাহকে হত্যা করতে গিয়েছিল। প্রহরীদের সতর্কদৃষ্টির বেষ্টনী ছেড়ে, বাদশাহের দেহরক্ষী বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে একেবারে বাদশাহের খাসকামরায়।

শুনেই লুতুফ শিউরে উঠলো। মনে মনে বললো,—সাহস ও শক্তি বুলন্তের ছিল অপরিসীম।

বাদশাহের খাসমহলে প্রবেশ করা বড় সুবিধের কাজ নয়। বুলন্ত সেই কাজ সম্পন্ন করেছিল। বুলন্তকে না জানলে হয়তো লুতুফ আলি বিশ্বাস করতো না। জানতো বলেই বিশ্বাস করলো। এখন সে বাদশাহের অনুচর। অনুচর মহলে তার বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে কিন্তু সে কোনদিন বাদশাহের খাসমহলে যেতে পারলো না। সেখানে হুকুম ছাড়া প্রবেশ নিষেধ। এক দেওয়ালের বাইরে আর এক দেয়ালে যেতে গেলেই হুকুম দরকার। যেখানে এত কড়াকড়ি সেখানে বুলন্ত সিং কি করে গেল? তাজ্জব হয়ে শুধু ভাবা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করা যায় না।

তবে বুলন্ত সিংয়ের এই সাহসের কথা প্রাসাদের বিরাট রাজ পরিবারের মধ্যে তুচ্ছ হলেও কোন কোন লোকের মুখে গল্প কথার মত ছড়িয়ে পড়েছিল। হত্যা করে নি সত্যি কথা কিন্তু হত্যার এই যে চেষ্টা, এতেই দিল্লীর কঠিন প্রস্তরময় প্রাসাদের মজবুত ভিত আন্দোলিত হয়েছিল। তাতেই লোকমুখে বুলন্ত সিং একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তি হিসাবে প্রচারিত হয়েছিল। তাছাড়া আরও একটি কারণ, সেই সময় পারস্যরাজ নাদীর শাহ বাদশাহের প্রাণটি ছাড়া দিল্লীর সমস্ত ঐশ্বর্যই লুণ্ঠন করে একটি বিশৃঙ্খলার

সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। এমন কি প্রাসাদের বিরাট বিরাট গম্বুজের গাত্রে যে মূল্যবান প্রস্তরখণ্ড খোদিত ছিল, তাও হরণ করতে নাদীর শাহ কার্পণ্য করে নি। নাদীর শাহের ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্যই ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন করা। সেই ধনরত্ন সংগৃহীত হতে তিনি আর একমুহূর্ত অপেক্ষা করেন নি, ঊর্ধ্বশ্বাসে স্বদেশে পলায়ন করেছেন।

নাদীর শাহের পরিত্যক্ত দিল্লী প্রাসাদের যে ছন্নছাড়া অবস্থা হয়েছিল, তা স্ব-অবস্থায় আনতে অনেকদিন সময় লেগেছিল। সে যাক্‌গে, উৎপীড়িত দিল্লীবাসী বাদশাহের এই অক্ষমতায় নিজেদের বিপন্ন প্রাণের জন্যে মনে মনে বাদশাহের মৃত্যু চেয়েছিল। যে পিতা তার সন্তানের রক্ষার জন্যে ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে না, সে পিতার মূল্য কি? বরং সে পিতার মৃত্যুই হওয়া উচিত। তাই সকলেই মহম্মদ শাহের উচ্ছেদ চেয়েছিল। কিন্তু কেউই সাহসী হয় নি, নিজে হাতে বধ করতে। তবে ষড়যন্ত্র যে চলে নি, তা নয় কিন্তু কার্যে পরিণত হয় নি। সেই কাজ বুলন্ত সিং করেছে। হত্যা করতে পারে নি বটে কিন্তু হত্যার চেষ্টাতেই উৎপীড়িতদের আনন্দ হয়েছে।

অন্তত বাদশাহ মহম্মদ শাহ বুঝুন তিনি একজন কত বড় অকর্মণ্য পুরুষ!

লুতুফ আলি আরো শুনলো, যখন বুলন্ত সিং বাদশাহের খাসকামরার দরজার প্রহরীর পাহারা ভেদ করে ভেতরে ঢুকেছিল, তখন বাদশাহ তাঁর রক্তবর্ণের স্বর্ণনির্মিত ডিভানে বসে আরাম উপভোগ করছিলেন।

সময়টা ছিল সন্ধ্যার পূর্বক্ষণ। অন্যান্য সময় হলে বাদশাহ শিসমহলে গিয়ে নর্তকীর নৃত্য উপভোগ করতেন। কিন্তু নাদীর শাহ আসার পর তাঁর সব বিলাসব্যসন, নিয়মকানুন লুপ্ত হয়েছিল। তিনি সর্বদা নিজের খাসকক্ষে বসে হাতের আঙুলে কপালটি টিপে ধরে চোখ বুজে ভাবতেন অনেক কিছু। কিন্তু কি যে ভাবতেন, বোঝা যেত না।

ঠিক তেমনি একদিন বাদশাহ মহম্মদ শাহ ডিভানের ওপর অর্ধশয়ান হয়ে চোখ বুজে কপালের রগ দুটি টিপে ধরেছেন। পরনে কোন পর্যাপ্ত পোষাক ছিল না। ছিল একখানি শ্বেতবর্ণের মূল্যবান পিরাম। কণ্ঠে আগে সর্বদা থাকতো একটি বৃহৎ মুক্তার মালা। নাদীর শাহ আসার পর একদিন বাদশাহের কণ্ঠ থেকে সেই মালা নাদীর শাহ কেড়ে নিতে আর তিনি মালা কণ্ঠে ধারণ করেন নি। এমন কি কোন অলঙ্কারই তাঁর শরীরে ছিল না। একটি হীরকখচিত স্বর্ণবলয় তাঁর ডান হাতে সর্বদা শোভা পেত। এটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সামগ্রী। সেই স্বর্ণবলয়টি এমন এক কারিগর দিয়ে

তৈরি, যা বাদশাহের জিনিস বলে প্রতীয়মান হয়। সেই বলয়ের চতুর্দিকে শুধু হীরকখণ্ডই নয়, রক্তবর্ণের চুনি, নীলবর্ণের পান্নাও শোভা পেত। নাদীর শাহের কাছে সম্ভ্রম হারিয়ে তাও তিনি হাত থেকে খুলে ফেলেছিলেন।

পরবর্তীকালের অনেকগুলি দিন পর্যন্ত তাই তিনি কোন বিলাসবস্তু স্পর্শ করেন নি।

যাহোক, সেই বাদশাহ শ্বেতবর্ণের পিরান পরিধান করে একান্ত দীনের মত ডিভানের ওপর অর্ধশয়ান হয়েছিলেন।

কক্ষের মধ্যে মৃদু আলো প্রজ্বলিত ছিল। স্বভাবত বাদশাহদের মহলে মহলে জোরালো আলোরই ব্যবস্থা থাকে। বোধ হয় মহম্মদ শাহের হুকুমেই এই মৃদু আলোর ব্যবস্থা। কক্ষের একটি দেয়ালের ঘুলঘুলিতে স্বর্ণবর্ণের এক বাতিদানে মৃদু আলোর স্বপ্নাভা। সেই স্বপ্নসম্ভব পরিবেশে একটি ছায়া ছায়া রূপ সৃষ্টি হয়ে কক্ষটিকে রহস্যময় করে রেখেছিল।

বুলন্ত সিং প্রহরীর সতর্কদৃষ্টি ভেদ করে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নাতিদীর্ঘ কক্ষের মধ্যে বুলন্ত সিংকে একপাশে লুকোতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তাছাড়া বাদশাহ মহম্মদ শাহ একাই সে কক্ষে ছিলেন। আর ছিলেন চক্ষু বুজে। পদশব্দ শোনার উপায় নেই, কারণ, হর্ম্যতলে পুরু কার্পেট পাতা। তাই নিঃশব্দে বুলন্ত সিং ছুরিখানা হাতের মুঠিতে উদ্যত করে অপেক্ষায় থাকলো।

এই বিলম্বটাই বুলন্তের ভুল হয়েছিল। সে যদি কক্ষে প্রবেশ করেই কার্য সমাধা করতে, তাহলে আর পরবর্তী ঘটনার সম্মুখীন হতে হত না।

সে অপেক্ষা করেছিল বোধ হয় নিজের সাহস সঞ্চয়ের জন্যে। এত বড় একটি সাংঘাতিক কাজ এত সহজ হয়ে যাবে বলেই কেমন যেন মনে মনে সে অবিশ্বাস করেছিল। এ ছাড়া এই বিলম্বের আর কোন কারণ চিন্তা করা যায় না।

যাহোক, এই বিলম্বেই হঠাৎ সেই কক্ষে একজন রাজপুরুষ এসে বাদশাহকে তসলিম করলো।

বাদশাহ চক্ষু উন্মীলন করতেই চোখে পড়লো তাঁর ছুরিকা হস্ত বুলন্ত সিংকে। কারণ বুলন্ত সিং দেওয়ালের ধার দিয়ে দিয়ে একেবারে বাদশাহের ডিভানের কাছে এসেছিল। তবে রাজপুরুষ দেখতে পায়নি কারণ তিনি ছিলেন বুলন্ত সিংয়ের দিকে পিছন করে। বাদশাহ আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠতেই বুলন্ত সিং ঝাঁপিয়ে পড়লো বাদশাহের ওপর কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছুরিকা মেঝেতে পড়ে গেল. আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজপুরুষ তার কোষবদ্ধ থেকে তরবারী বের করে বুলন্ত সিংয়ের বুকের ওপর ধরলো।

বাদশাহের চিৎকারে কয়েকজন খোজা প্রহরী ছুটে এল; তারা বুলন্ত সিংকে শৃঙ্খলিত করলো।

তারপরের কথা সকলেই জানে।

বুলন্ত সিং কে? কোথা থেকে এল? কি দরকারে সে প্রাসাদে অবস্থান করছিল, এসব জানবার আর কারুর দরকার হল না। উৎপীড়িত দিল্লীবাসী শুধু হায় হায় করে উঠলো। এতদূর এগিয়েও সেই সাহসী অক্ষম বাদশাহকে হত্যা করতে পারলো না!

তারপর আরও কাহিনী ছড়ালো।

বুলন্ত সিং যখন জল্লাদের সামনে নতজানু হয়ে মুণ্ড নামিয়ে দিয়েছিল, তখন নাকি তার মুখ দিয়ে কটি কথা বের হয়েছিল। 'বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের আয়ু এখনও অনেক দিন স্থায়ী হবে। না হলে আমার হাতের ছুরিকা কেন তাকে বধ করতে বিলম্ব করলো?'

সেই কথাগুলি প্রাসাদের মধ্যে ছড়াতে আরো সকলে হায় হায় করে উঠলো। এই দুর্বল শাসনকর্তার অধীনে আর অধিককাল থাকলে না জানি আরো কত উৎপীড়ন সহ্য করতে হবে।

বুলন্ত সিংয়ের প্রাণবধের পর আরো একমাস কাল ধরে এই একই কথা প্রাসাদের আনাচে-কানাচে গুঞ্জন তুলেছিল। আনাচে-কানাচে কেন উন্মুক্ত স্থানেই বিশেষ রাজ-প্রতিনিধিরা আলোচনা করতো। তারা বলতো, মোগল বাদশাহের সেই অমিততেজও স্বাভাবিক শক্তি এখন অতীত ছাড়া কিছু নয়। এই দিল্লীর সিংহাসনে একদিন আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব ছিলেন, এ যেন ইতিহাসই। আজ যাঁরা আছেন, তাঁরা তাঁদের বংশধর হলেও তাঁদের রক্তে সে তেজ নেই। বিলাস, ব্যভিচার রমণীর চিন্তায় সমস্ত জীবন ব্যয়িত করে বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছেন। বাদশাহের যে শক্তি, শাসকের যে ক্ষমতা, ঔরঙ্গজেবের পরে যাঁরাই সিংহাসনে বসেছেন, তাঁদের কারুর ছিল না।

লুতুফ আলি এই সময়ই শুনলো, এই দিল্লীরই আর একজন বাদশাহ জাঁহাদার শাহের কৌতুহলদ্দীপক জীবন কাহিনী। ভারী তার ভাল লাগলো এবং বাদশাহের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত হল।

এই বাদশাহের আগে যিনি ছিলেন তাঁর নাম ফররুখশিয়র। তাঁর আগের জন এই জাঁহাদার শাহ। জাঁহান্দার শাহ ছিলেন বাহাদুর শাহের পুত্র। তিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন, হিন্দুস্তান শাসন করতে নয়, রাজদরবারে নর্তকীর নৃত্য করাতে। দেওয়ান-ই-খাসে রাজকার্য হত না, নৃত্য করতো সেরা নর্তকী সমিনা। সমিনার রূপ ছিল ঠিক দেওয়ান-ই-খাসের অত্যুজ্জ্বল সিংহাসনের মত। সিংহাসনের রূপ যেমন সাধারণকে বিমোহিত করতো, ঝলকে দিত চোখের দৃষ্টি শোভা, তেমনি সমিনার রূপ।

বাদশাহ জাঁহদার শাহ দেওয়ান-ই-খাসের রাজসিক সিংহাসনে বসে সাকির হাত থেকে গুলাবী সরাবপূর্ণ পানপাত্র নিতেন আর সমিনার স্বল্প বসনে অর্ধনগ্ন যৌবন তনুর নৃত্য দেখতেন খোশ মেজাজে। দেখতে দেখতে কামনা তাঁর কণ্ঠ অবধি পূর্ণ হয়ে উঠতো, তিনি এক আবেগের স্রোতে ছুটে গিয়ে সামিনাকে জড়িয়ে ধরতেন। ভুলে যেতেন সেই নাচমহলে আরো অনেক তাঁর ইয়ার আছে, যাদের সামনে তার একটু সংযত হওয়া উচিত।

এমনি একদিন এক পরিবেশে বাদশাহের প্রিয়মন্ত্রী জুলফিকর খাঁ একটি গুরুতর সংবাদ নিয়ে জাঁহাদার শাহের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। এদিকে জাঁহাদার শাহ

তখন স্ব-অবস্থায় ছিলেন না। তাঁর মাথার মধ্যে তখন দারুণ উত্তাপ। কামনার আগুন। চোখের মধ্যে মদিরার ঘন আমেজ। শরীরের শিরার মধ্যে চঞ্চল রক্ত-স্রোতের যাতায়াতে আর নিজেকে স্থির রাখতে না পেরে অস্থির হয়ে সমিনার হাত চেপে ধরেছিলেন। আর সমিনা প্রগল্ভ রমণীর মত খিলখিল করে হেসে কাট গেলাসের ঝাড়ের বুকে দোলন জাগিয়ে পালিয়ে যেতে চাইছিল। ঠিক এমনি সময় জুলফিকর খাঁ এসে সামনে দাঁড়ালেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে জাঁহাদার শাহের মদির চোখের দৃষ্টিতে ভ্রূকুটি ফুটে উঠলো। তিনি অসময়ে বেরসিক বৃদ্ধ মন্ত্রীকে দেখে রূঢ়স্বরে বললেন,—খাঁসাহেব, এটা আমার বিলাস মহল। এখানে আপনার হঠাৎ অনাহূতের মত প্রবেশ কেন?

বৃদ্ধ জুলফিকর খাঁও দুর্বল মনের মানুষ নয়। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীককণ্ঠে উত্তর দিলেন,—জানা সত্ত্বেও আসতে বাধ্য হয়েছি শুধু বাদশাহের মঙ্গলার্থে। যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে, কসুর মাপ করে আমার আর্জিটুকু শুনুন!

জাঁহাদার শাহের মনের অবস্থা তখন কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্যে লালায়িত ছিল না। এমন কি সেই মুহূর্তে কেউ যদি তাঁর সাম্রাজ্য কেড়ে নিত, তাহলে তিনি তাঁকে অনুরোধ করে বলতেন—'বেশ বাবা, যা নিয়েছ, বেশ করেছ,—শুধু এই বিলাস মহল ও সমিনাকে আমার জন্যে রেখে দিয়ে সরে পড়।'

জুলফিকর খাঁয়ের এই কথাবার্তার মাঝে দেওয়ান-ই-খাসের যন্ত্রসংগীত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমিনার সখীরা স্তব্ধ হয়ে বেরসিক মন্ত্রীর আগমনের গুরুত্ব পরিমাপ করছিল। যে সাকিটি সরাব পরিবেশন করছিল, সে সরাবের ঘ্রাণ নিয়ে ঝিম্ হয়ে বসেছিল।

সময়টা ছিল মধ্যাহ্নের পূর্বক্ষণ। তাই রাত্রির আলোর প্রয়োজন ছিল না। বাইরের দিনের আলোর উজ্জ্বল শোভা কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্যে কৃত্রিমতার ব্যবস্থা ছিল। তাই দিনের আলোই প্রচুর এসে পড়েছিল সেই সৌন্দর্য বিলাসী অত্যুজ্জ্বল কক্ষের হর্ম্যতলে।

জাঁহাদার শাহ মন্ত্রীর কথায় বিরক্ত হয়ে বললেন,—আঃ কেন আপনার আর্জি শোনাতে এ সময়ে এসেছেন? জানেন, আমার মেজাজের একটা মূল্য আছে!

জুলফিকর খাঁ একটু রূঢ়স্বরে বললেন,—আপনি তো সব সময় ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু এই সমস্যাটুকু না শুনলে আপনার সমূহ বিপদ হবে।

হঠাৎ জাঁহাদার শাহ হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে বললেন—কি বিপদ হবে মন্ত্রী খাঁ সাহেব! সিংহাসনে বসবার সময় তো সব কটা ভ্রাতাকেই কোতল করে বসেছি, আবার কি কোন ভ্রাতা গোপনে আমার কোন শত্রু-আলয়ে লালিত হচ্ছে?

জুলফিকর খাঁর ইচ্ছা করছিল, সেই মুহূর্তে বাদশাহের মুণ্ডটা ধড় থেকে নামিয়ে দেন কিন্তু কোনরকমে সংযম ধারণ করে বললেন,—না হুজুর, সে সম্ভাবনা আর নেই। অনুসন্ধান করে জেনেছি, আপনার পিতা সম্রাট বাহাদুর শাহের আর কোন পুত্র কোথাও নেই?

তাহলে কি জন্তে আমার রসভঙ্গ করতে এলেন ?

হুজুর, শিখনায়ক বান্দাকে আমাদের একজন অনুচর দিল্লীর কাছ দিয়ে যেতে দেখেছে।

হঠাৎ জাঁহাদার শাহ কেমন যেন চিৎকার করে মন্ত্রীকে ধমকে দিয়ে উঠলেন,—কে এক বান্দার জন্তে আপনি এই অমূল্য মুহূর্ত আমার নষ্ট করে দিলেন ! আপনার এই দুঃসাহসের জন্তে ক্ষমা করলাম শুধু আপনার ওপর কৃতজ্ঞতার জন্তে। ভবিষ্যতে যদি আর কখনও এইরকম স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন, তাহলে আর ক্ষমা করবো না।

তবু অপমান সহ্য করেও মন্ত্রী খাঁসাহেব বললেন, – আপনি নিশ্চয় ভুলে যান নি, আপনার পিতা এই বান্দাকে পরাজিত করতে কত ক্লেশ অনুভব করেছিলেন। তাকে যাও বা তিনি বন্দী করেছিলেন, তাও বেশীদিন কারাগারে রাখতে পারেন নি।

জাঁহাদার শাহের সহ্যের সীমা অতিক্রম করলো। চোখের মদির নেশা ছুটে গিয়েছিল। সমিনা ও আর যারা হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, তারাও কেমন যেন প্রাণহীনের মত দাঁড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ আগে যে এই আসরে আনন্দের বন্যা বইছিল, সুখের ভোমরা গুনগুনিয়ে চতুর্দিকে ফিরছিল, তা যেন আর মনেই হয় না।

সব কিছু হারাতে জাঁহাদার শাহ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। একটি মৌতাত জমতে কত সময় নেয় কিন্তু ছুটে যেতে একমুহূর্তও যায় না। সেই মৌতাত ছুটে গিয়েছিল বলে তিনি মন্ত্রীকে ঘাতকের কাছে পাঠাবেন কিনা ভাবছিলেন। অন্য কেউ হলে হয়তো কখন ঘাতকের কাছে চলে যেত। সেই মন্ত্রীর কাছ থেকে আবার উপদেশের বাণী আসতে তিনি একেবারে ফেটে পড়লেন।

হঠাৎ চিৎকার করে বললেন—এই, কে আছিস্ ?

জুলফিকর দেখলেন আর অপেক্ষা করা সমীচীন নয়। তিনি দ্রুত প্রস্থান করলেন। তবে তিনি এ অপমান কোনদিন ভোলেন নি। একদিন এর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন। যেদিন নতুন বাদশাহ এসে জাঁহাদার শাহকে পরাজিত করেছিল, সেদিন তিনি নিজে হাতে জাঁহাদার শাহকে নতুন বাদশাহ ফররুখশিয়রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

যাহোক্, জাঁহাদার শাহ যে সিংহাসন রক্ষার জন্যে সিংহাসনে বসেছিলেন, তা নয়। পিতৃসম্পত্তির দৌলতের ওপর বিলাসের স্রোত প্রবহণের জন্যে সিংহাসনে বসেছিলেন।

জুলফিকর খাঁ একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন বলেই জাঁহাদার শাহের রাজত্ব কাল এক বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। জাঁহাদার শাহ কিছুই দেখতেন না, দেখতেন সবই জুলফিকর খাঁ। অথচ এই মন্ত্রীকে পদে পদে বাদশাহের কাছ থেকে অপমান সহ্য করতে হত। বাদশাহের বিলাসজীবনের এতটুকু বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হলে তিনি মন্ত্রীর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। একটি বেতনভোগী বাঁদী শ্রেণীর নর্তকী যদি দরবারের শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তিকে অপমান করে, তাহলে কে শান্ত হয়ে থাকে ?

অথচ এই বাদশাহ সাধারণ মেয়েলোকের কথা যত শুনতেন, একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজপুরুষের কথা ততো শুনতেন না। বরং আওরতের কথাকেই গুরুত্ব দিতেন বেশী।

রাজ্যের সমস্যাকে তুচ্ছ মনে করে রাজকর্মচারীকে অবহেলা করতেন।

লালকুয়র নাম্নী এক খুবসুরত রমণী মায়াবিনীর মত বাদশাহকে ঘিরে ছিল। সেই রমণী শুধু রঙমহলের শোভার জন্যে দিল্লীর প্রাসাদে আসে নি। এসেছিল আরো অনেক উচ্চাশা নিয়ে। জাঁহাদার শাহের অনেক বেগম ছিল কিন্তু তারা হারেমে থেকেই যৌবন ক্ষয় করে যেত। লালকুয়র জাঁহাদার শাহের বেগম ছিল না কিন্তু এমন একজন ছিল, যাকে বাদশাহ কোন অবস্থাতেই অস্বীকার করতে পারতেন না।

লালকুয়রের এই প্রাসাদে আগমন তাও কেমন যেন ধূমকেতুর মত। একদিন জাঁহাদার শাহ চারটি দেহরক্ষী নিয়ে প্রাসাদের বাইরে গিয়েছিলেন। একদিন পরে ফিরলেন তাঁরই অশ্বের ওপর সওয়ার করে লালকুয়রকে নিয়ে।

এই রমণী কে? কোত্থেকে এল? কি তার পরিচয়? এসব কোন কথাই কেউ জানতে পারলো না। অথচ এই রমণী প্রাসাদে আসতে বাদশাহ জাঁহাদার শাহ কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলেন। তারপরের ইতিহাস আরো চমকপ্রদ।

মোহিনী সেই রমণী কি যেন যাদু করে জাঁহাদার শাহকে নিয়ে কক্ষের দরজা বন্ধ করলো। তারপর যখন সে দরজা খুললো, সকলে দেখলো বাদশাহ আর বাদশাহ নেই। কেমন যেন সেই রমণীর গোলামে পরিণত হয়েছে। তার কথা ছাড়া বাদশাহ কারুর কথাকেই প্রাধান্য দেন না। অন্য কেউ অন্য কোন কথা বলতে গেলে অযথা ক্ষিপ্ত হয়ে তাড়িয়ে দেন। একটি খোজা প্রহরী সেদিন একটু বেয়াদপি করেছিল বলে একেবারে ঘাতকের কাছে। তার কোন অনুনয়েই বাদশাহ কর্ণপাত করলেন না।

পরে জানা গেল, এই লালকুয়রই ঐ খোজাটির শাস্তি প্রয়োগে উৎসাহী ছিল। কারণ তার ক্ষমতা পরিমাপের জন্যেই এই দৃষ্টান্ত সে প্রকাশ করেছিল।

জুলফিকর খাঁ মনে মনে বিব্রত বোধ করতে লাগলেন।

বাদশাহ জাঁহাদার শাহের রাজত্ব আর অধিককাল স্থায়ী হলে সবারই বিপদ কিন্তু উপায় কি?

জুলফিকর খাঁ ভাবতে লাগলেন উপায়। এই বাদশাহকে দি' ' যে আর রাজত্ব হবে না, সে তিনি বুঝতে পারছেন বরং আরও কিছুকাল থাকলে আমীর, ওমরাহ, রাজকর্মচারী, সৈনিকরা যেরকম বাদশাহকে অনুসরণ করছে, তাতে সমস্ত দিল্লীর প্রাসাদটি একটি নাচমহলে পরিণত হবে। তাতেও কোন দুঃখ ছিল না, দুঃখ হল যখন বড় বড় আমীর ওমরাহের বেটির দিকে বিলাসীদের চোখ পড়লো।

কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী আর কি করবেন, তিনি শুধু নিরুপায় হয়ে বাদশাহের হুকুম তামিল করতে লাগলেন।

রাজকোষের প্রচুর অর্থে লালকুয়রের ভিন্ন মহল তৈরি হল। সে মহলের এমন কারুকার্য হল, যা প্রাসাদের মধ্যে আর কোথাও দেখা যায় না। রাজকোষের অর্থে লালকুয়রকে বার্ষিক দু' কোটি টাকার বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হল। তাছাড়া প্রত্যহ বিলাসের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় উপকরণ, মণিমুক্তা, হীরাজহরৎ, বসনভূষণের ব্যয় এতবেশী যেতে লাগলো যা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

লালকুয়র কোথাকার রমণী কেউ জানতো না। তবে তার রূপ ছিল দেখবার মত। খোজা প্রহরীরা বলতো, আসমান-কী রোশনী, বিজলী কা চমক। অম্বুরী বাগিচার সেরা গুলাব। বে-হোঁশ মহলের আতর কা খসবু। কেউ কেউ তাকে বলতো, লাল কুমারী। সত্যিই তার সবকিছু ছিল রক্তবর্ণের। দেহের বর্ণ যেমন রক্তাভ ছিল, তার বসনও ছিল লাল। রক্তবর্ণের মসলিনের বসন ছাড়া সে পরতো না। আর অলঙ্কারের মধ্যে বিশেষ করে ব্যবহার করতো লাল চুনি। লাল চুনির স্বর্ণালঙ্কার পরে তার দেহ-বর্ণের রূপে আরো লালের সৃষ্টি করতো।

লালকুয়রের মহল তৈরি হয়েছিল রক্তবর্ণের প্রস্তর দিয়ে।

প্রেয়সীর এমনি রক্তবর্ণ পছন্দ দেখে বাদশাহও ঢালাও হুকুম দিয়েছিলেন—তাঁর যেন সব পোষাকই লাল হয়। তাই এক সময় লালকেল্লায় শুভ্রবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণের কোন খাতির ছিল না।

লালকুয়র যদি শুধু বিলাসের উপকরণ অনুযায়ী প্রাসাদে অবস্থান করতো, তাহলে হয়তো কারুর কিছু বলার থাকতো না। বাদশাহের ওপর যেমন প্রভাব বিস্তার করে-ছিল, তাতেই সন্তুষ্ট থাকলে হয়তো ভবিষ্যৎ অন্যরকম হত।

কিন্তু তা হল না। কেউ সুযোগ পেলে আর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলে কি ছেড়ে দেয়? লালকুয়র বিলাসিনী রমণী হলেও খুব চতুর ছিল। সে বাদশাহকে বশ করে শুধু বে-হোঁশ মহলে বে-হোঁশ হয়ে থাকতে চাইলো না। তার মনে মনে আরো উচ্চাশা জাগলো। সিংহাসন কায়েম। হিন্দুস্তানের শাসনকর্ত্রী হতে হবে।

দৃষ্টান্ত ছিল জাহাঙ্গীরের প্রেয়সী নূরজাহানের। লালকুয়র দ্বিতীয় নূরজাহান হতে চাইলো। তবে অসুবিধা হল, নূরজাহান ছিলেন জাহাঙ্গীরের শাদী করা রাজ-মহিষী। তাঁর অধিকার ছিল। তাছাড়া তিনি বড় বংশের আওরত। তাঁর পিতা, ভ্রাতার পরিচয় মোগল দরবারে যথেষ্ট প্রতিপত্তিসম্পন্ন। সে জায়গায় লালকুয়র নিতান্ত নগণ্যা।

প্রথমত তাকে জাঁহাদার শাহ শাদী করেন নি। পরিচয়হীনাকে শাদী করার বিশেষ ব্যাঘাত জেনেই ক্ষান্ত হয়েছেন। নাহলে বাদশাহ পীরসাহেবকে হুকুম দিয়ে-ছিলেন, শাদীর ব্যবস্থা করতে কিন্তু মোগল আইনে পরিচয়হীনাকে শাদী করতে পারে না বলেই রাজ্যবিধান হুকুমনামা প্রদর্শন করেছিল। তবে বাদশাহ যদি জোর করতেন, কানুন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেত। সে যাকগে, লালকুয়র রক্ষিতা রূপেই প্রাসাদে অবস্থান করলো। আর সেই পরিচয়হীনাই তার ক্ষমতা মেলে দিয়ে রাজ্যের শাসনদণ্ড হাতে নিতে চাইলো।

আর একটু গভীরে ঢুকে গেলে দেখা যায়, লালকুয়র প্রতিশোধ নেবার জন্যেই এমনি আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সে জানতো, সকলে তাকে ঘৃণা করে। আর সেই ঘৃণাই তাকে ক্ষমতা আহরণে সাহায্য করেছিল। বাদশাহ যখন তার করায়ত্ত, তাকে কে অবজ্ঞা করে?

এই বাদশাহ তার করায়ত্ত ছিল বলেই সে একজন সামন্য রমণী হয়ে অসামান্য হতে

চাইলো। সে দ্বিতীয় নূরজাহান হয়ে দরবারে আসন গ্রহণ করলো। আর বাদশাহ তাকে খুশী করার জন্যে তার ক্ষমতালাভে সাহায্য করলেন।

সংঘাত বাধলো, মন্ত্রী জুলফিকর খাঁ ও তাঁর দলীয় লোকের সঙ্গে। সে সংঘাত মিটলো পরবর্তী বাদশাহ ফররুখশিয়রের আক্রমণে। আজিমউশ্বানের পুত্র ফররুখশিয়র তখন বাংলাদেশে রাজত্ব করতেন। তিনি রাজধানী অধিকার করবার জন্যে এগিয়ে এলে বাদশাহ জাঁহাদার শাহের সঙ্গে এলাহাবাদে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অবশ্য মন্ত্রী জুলফিকর খাঁ বাদশাহের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন।

কিন্তু হলে কি হবে? বাদশাহ জাঁহাদার শাহ নিজের অযোগ্যতায় এত শত্রু বৃদ্ধি করেছিলেন যে, আমীর, ওমরাহেরা অত্যধিক অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা বাদশাহকে বিশেষ সাহায্য করলেন না। এমন কি বাদশাহের হস্তী পর্যন্ত ক্ষেপে উঠলো। তিনি আর উপায়ান্তর না দেখে রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। পালাবার সময় তাঁর হৃদয়ের একান্ত আপনজন সেই আসমান কী রোশনী লালকুয়রকে নিয়ে যেতে ভুললেন না।

জাঁহাদার শাহ প্রসঙ্গ এখানে শেষ হলেই হয়ত ভাল হত কিন্তু তা হল না। পরে আরো কাহিনী ছিল।

ফররুখশিয়র রাজধানী দিল্লী অধিকার করে জাঁহাদার শাহকে জীবিতাবস্থায় ধরবার জন্যে দু'শত দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিযুক্ত করে দিলেন। উদ্দেশ্য, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। জাঁহাদার শাহ যদি বেঁচে থাকে তাহলে রাজধানী শত্রুমুক্ত হবে না। আবার রাজ্য অধিকারের জন্যে নতুন আক্রমণ হবে। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিল্ সেই লালকুয়র। সেইজন্যে ফররুখশিয়র জীবিতাবস্থায় জাঁহাদার শাহকে ধরতে চেয়েছিলেন।

জাঁহাদার শাহ ধরাও পড়লেন। এলাহাবাদ থেকে তিনি বিহারের দিকে পলায়ন করছিলেন। যুদ্ধের সাতদিনের মধ্যে তিনি ধরা পড়লেন। সঙ্গে সেই প্রেয়সী লালকুয়র।

বন্দীদের রাজধানী দিল্লীতে আনা হল।

জাঁহাদার শাহের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হল।

কিন্তু ফররুখশিয়র লালকুয়রকে নিয়ে মত্ত হলেন। রঙমহল সাজানো হল। ফুলে ফুলে চতুর্দিক ভরিয়ে দেওয়া হল। রংবেরঙের মসলিনের বাহার দিয়ে রঙমহল সজ্জিত হল। আতরের খসবু, গুলাবের নির্যাস, তার ওপর রমণীদের যৌবনতনুর ছটায় রংমহলের অভ্যন্তর-ভাগে যেন চাঁদের সুষমা নেমে এল।

সরাবের পান-পেয়ালার তুফানের ফোয়ারা ছুটলো। এসরাজ, সেতার, সারেঙ্গীর সাথে নূপুরের নিক্বণ। সে যে কি এক আশ্চর্য মুহূর্ত—না দেখলে বোঝানো যায় না।

নতুন বাদশাহ নতুন সাজে সেজে পাশে ঘন হয়ে বসে লালকুয়রের সাথে নাচ উপভোগ করতে লাগলেন।

এদিকে নাচ পুর্ণোদমে চলতে লাগলো, অন্যদিকে সরাবের পাত্রও নিঃশেষিত হতে

লাগলো। বাদশাহকে নিজের হাতে সরাব পান করাচ্ছিল লালকুয়র। তাকে দেখলে মনেই হবে না যে সে এতদিন জাঁহাদার শাহকে পেয়ার করত। সম্পূর্ণ অন্যমানুষ। অন্য চেহারা। সেজেছে অদ্ভুত এক মোহিনীরূপ সৃষ্টি করে। এ সাজ বুঝি সে আর কোনদিনও করেনি! সম্পূর্ণ অভিনব সে সজ্জা। সেই রক্তাক্ত বসান। সেই শোণিত স্নাত রুধির রাঙা আবীর বর্ণ। তার ওপর বক্ষের কৌস্তভরত্নে স্বল্প বসনের ঘেরাটোপ। এমন তনুশোভা বুঝি আর কোনদিন সে সৃষ্টি করেনি। এমন অভিসার বুঝি তার এই প্রথম।

মনেই হয় না জাঁহাদার শাহর মৃত্যুতে সে শোকার্ত। বরং নতুন বাদশাহের আহ্বানে আবার তার নতুন ভূমিকা। নতুন রূপ।

ফররুখশিয়রের কণ্ঠালিঙ্গন করে নৃত্য উপভোগ করতে করতে নিজে হাতে সে বাদশাহকে সরাব পান করিয়ে চলেছে। সাকি পাত্র পূর্ণ করে দিচ্ছে। আর সে সেই পাত্র বাদশাহের মুখে তুলে দিচ্ছে।

বাদশাহ তরুণ। অভিজ্ঞতা স্বল্প। কাঁচা সবুজ বর্ণের হৃদয়ের ওপর এই আকস্মিক উত্তাপ তাঁকে যেন কেমন আবেগের শেষসর্গে নিয়ে গেল। তিনি লালকুয়রের কাছে হেরে গেলেন। লালকুয়রের যৌবনের উত্তাপ, তার সোহাগের নিবিড় স্পর্শ তাঁকে কোন এক নতুন লোকে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিত। তাই তিনি কেমন যেন পৌরুষ হারিয়ে রমণীর গোলাম হয়ে গেলেন।

এদিকে নাচ পূর্ণোদ্যমে চলেছে। নতুন নতুন নর্তকী, নতুন নতুন পোষাকের বাহারে, নগ্নতার সৌন্দর্যে রঙমহলের ঝাড়লণ্ঠনের অত্যুজ্জ্বল আলোকে অন্ধ করে দিয়ে নেচে চলেছে। রাত্রি পা পা করে এগিয়ে চলেছে গভীরতার দিকে। তা যাক্, প্রাসাদের রঙমহলে কোথাও রাত্রির গভীরতা নেই। বরং রাত্রি নিজেই সলজ্জ হয়ে থমকে এই রঙমহলের মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

বাদশাহ বিশেষ কাউকে নিয়ে এই রঙমহলের আসর বসাননি। এ মহফিল তার একান্ত নিজের॥ তাই ঘনিষ্ঠ দু চারজন ছাড়া আর কেউই প্রবেশের অধিকার পায়নি। সেই দু'চারজন ওমরাহ বাদশাহের পাশে বসে লালকুয়রের আচরণ দেখে কেমন যেন হতবাক হয়ে গিয়েছে। লালকুয়র তাদেরও নিজের হাতে সরাবের পানপাত্র এগিয়ে দিচ্ছিল। সুন্দর চাঁপাকলির মত আঙুলের বন্ধনে কোন রমণী যদি সরাব পরিবেশন করে তার আস্বাদন ভিন্ন রকমই হয়। তাই সেই আস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে বাদশাহের ঘনিষ্ঠরা কেমন যেন আমেজের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল।

এই সময় তাদের মধ্যেই একজনের তীব্র চিৎকার। বিষ, বিষ, আমার কলিজা ফেটে গেল। বলতে বলতে সেই বিশালকায় পুরুষ ফরাসের ওপর শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো। তারপর শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল।

মুহূর্তে আমেজের পরিবেশ কেমন যেন বজ্রপাত হল। সমস্ত রঙমহল সরাবের নেশায় ঝিম্ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এই ঘটনায় সকলে সচকিত হয়ে উঠলো।

বাদশাহ লালকুয়রের আলিঙ্গন ত্যাগ করে হুঙ্কার ধ্বনি দিলেন,—কে এ কাজ

করলো, কবুল কর। কবুল করলে শাস্তি লঘু হবে!

হঠাৎ লালকুয়র ভীত হয়ে 'আমি আসছি' বলে ছুটে পালিয়ে যেতে গেল। কিন্তু বাদশাহের হুকুমে প্রহরীরা তাকে ধরে ফেললো।

লালকুয়র কেঁদে ফেললো। বাদশাহের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কাতর হয়ে বললো,—আমায় কোতল কর না বাদশাহ। আমার উদরে আছে জাঁহাদারের বাচ্চা।

বাদশাহ ফররুখশিয়র পৈশাচিক আনন্দে চিৎকার করে বললে,—ও, সেইজন্যে বুঝি আমার সঙ্গে অদ্ভুত ব্যবহার করে জাঁহাদার শাহের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলে।

লালকুয়র তাই চেয়েছিল। প্রতিশোধের জন্যেই নতুন বাদশাহের রঙমহলে নতুন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু একটু অন্যমনস্কতার সুযোগে সব ওলোটপালোট হয়ে গেল। বিষপূর্ণ সরাব পাত্রটি বাদশাহের মুখে ঢেলে দিতে গিয়ে কেমন যেন পালটে গেল। পালটে গিয়ে পরিকল্পনা সব বানচাল করে দিল। আর পরিণতি হল বিপরীত। কোথায় বাদশাহ ফরাসের ওপর শুয়ে চোখ বুজবেন, না তার একজন ওমরাহ চোখ বুজলো।

লালকুয়র কাতর হয়ে কবুল করলো—জাহাঁপনা, আপনিই বলেছিলেন, কবুল করলে শাস্তি লঘু হবে। আমি লঘু শাস্তি চাই না, শুধু বাদশাহের বাচ্চাকে দুনিয়ার আলোক পেতে দিন্। সে পয়দা হলেই আমি আপনার শাস্তি গ্রহণ করবো।

বাদশাহ একসময় এই রমণীর স্পর্শে বিমোহিত হয়েছিলেন কিন্তু সেই স্পর্শ যে সর্পের আলিঙ্গন এ কথা মনে হতেই তিনি আরও নৃশংস হয়ে উঠলেন। আর তা ছাড়া যে ওমরাহটি মারা গিয়েছিল, সে একজন বড় যোদ্ধা। জাতিতে রাজপুত। নাম, জহর সিং। এই জহর সিং এলাহাবাদে জাঁহাদার শাহের সঙ্গে যুদ্ধে অদ্ভুত শক্তির পরীক্ষা দিয়েছিল।

তাই বাদশাহ ফররুখশিয়র ক্রোধান্ধ হয়ে দন্তঘর্ষণ করে বললেন, কোন আর্জিই তোমার পালন করা হবে না কুলটা রমণী! তোমার উদরে যে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ভ্রূণকে টেনে বের করতে সর্বপ্রথম উদর ছিন্ন করা হবে, তারপর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করে শকুনের আহারের জন্যে উন্মুক্ত ক্ষেত্রে বিতরিত হবে।

লালকুয়র পাগলের মত চিৎকার করে সেই রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করলো। না না না, আমাকে বাঁচতে দিন বাদশাহ। আমি মুক্তি চাইছি। আমি অধম রমণী। আমার সুরত, আমার দিল্, আমার জান বাঁচাতে সাহায্য করুন বাদশাহ!

কিন্তু বাদশাহ শুধু অট্টহাস্য করে পৈশাচিক আনন্দে লালকুয়রের কাতর প্রার্থনা লয় করে দিলেন।

রঙমহলের এই ঘটনা শুনে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন আলি ও আবদুল্লা খাঁ ছুটে এলেন। তারা বললেন,—ওসব কিছুর দরকার নেই, এই রমণীকে জ্যান্ত কবর দেওয়া হোক্। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাস্তিই হল এই।

কিন্তু শেষপর্যন্ত বাদশাহের শাস্তিই বলবৎ থাকবো।

তারপর সেই রাত্রিতে রঙমহলের আর এক আসর বসলো জল্লাদের বধ্যভূমিতে। আর বিলম্ব করলে পাছে লালকুয়র পলায়ন করে এই ভেবে সেই শেষরাত্রেই নারকীয় দৃশ্যের সূচন হল।

লালকুয়রের অপরূপ দেহসুষমা রুধিরাক্ত করে তার দেহের বসন কেড়ে নেওয়া হল। বাদশাহ এই রমণীর শাস্তির সঙ্গে যোগ করেছিল আসুরিক ধর্ষণ। নিজেই তিনি ইচ্ছা করেছিলেন এই রমণীকে গ্রহণ করতে। কিন্তু তাঁর ভয় হল যদি বন্দিনী তাঁর প্রতি অন্য কোন অন্যায় আচরণের আশ্রয় নেয়? তাই সে আশা ছেড়ে দিয়ে এক সৈনিককে দিয়ে তার ওপর ব্যভিচারের আদেশ দিলেন। এবং সে ব্যভিচার যেন সুখের জন্যে না হয়, সমস্ত যন্ত্রণার সীমাহীন সর্গে উপনীত হয়ে রমণী যেন অস্থির হয়ে ওঠে। তেমনি এক ভীষণাকায় সৈনিককে পাঠালেন লালকুয়রের জন্যে। তাকে দেখে যেন সে আতঙ্কিত হয়।

আদেশ পালিত হল। লালকুয়রের কুসুমতনুতে যন্ত্রণার রঙ লাগলো। সে অস্থির হয়ে তার ঈশ্বরের কাছে মুক্তির প্রার্থনা করলো। কিন্তু মুক্তি বোধ হয় পেল না, না হলে অমন পাগলের মত চিৎকার করতে লাগলো কেন?

তারপর সেই ব্যভিচারের পর দুজন ঘাতক মিলে তাকে শৃঙ্খলিত করে তার জননী জঠর তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে দু'ফাঁক করে ফেললো। যেন বৈদ্য অস্ত্রপ্রচার করে মৃত ভ্রূণটি দুহাতে তুলে নিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য লালকুয়র বেঁচেছিল। তার প্রাণ যেন শেষদৃশ্য দেখবার প্রত্যাশায় তখনও অপেক্ষমান। এরপর ঘাতকেরা তাকে টুকরো করে কাটলো। তার দেহের প্রতিটি অংশ আলাদা করে রেখে দিল প্রভাত হওয়ার অপেক্ষায়। প্রভাত হলে শকুনের জন্যে ছড়ানো হবে বলে বাদশাহের আদেশ ছিল।

এমনি করে লালকুয়রের শেষদৃশ্য সৃষ্টি হলে প্রায় অনেকদিন পর্যন্ত প্রাসাদের কোন রমণী আর বেয়াদপির আশ্রয় নেয় নি। কেমন যেন ত্রাস, কেমন যেন ভয় সমস্ত প্রাসাদ চত্বরে গড়িয়ে গড়িয়ে বহুদিন ধরে বীভৎসতার সৃষ্টি করেছিল। লালকুয়রের সেই রক্তবসনের রক্তাক্ত বীভৎস দেহ যেন গভীর রাত্রে প্রাসাদের মহলে মহলে ঘুরে ঘুরে কেঁদে ফিরতো। আর কাতর হয়ে বলতো, আমি মুক্তি চাই। আমি ধ্বংস চাই। আমি প্রতিশোধ চাই। আমি বাঁচতে চাই।

কতদিন কত খোজা প্রহরী ছুটতে ছুটতে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে আতঙ্কে বলেছে—ঐ সেই লাল প্রেতিনী. ছুরি নিয়ে ছুটে আসছে। আমাকে চিৎকার করে বললো—জানিস্ কে আমার রমণীরত্ব কলঙ্কিত করেছে? কারা আমার মা হওয়ার পথ চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছে! কোথায় আছে জানিস্ আমার সেই এতটুকু দুধের বাচ্চা!

একদিন বাদশাহ হঠাৎ খাসকামরা থেকে গভীররাত্রে চিৎকার করে উঠলেন,— রক্ষী, প্রহরী।

তারপর প্রহরীরা তার ঘরে যেতে দেখলো, বাদশাহ অজ্ঞান, অচৈতন্য হয়ে পালঙ্ক

থেকে ছিটকে এসে মেঝের ফরাসের ওপর পড়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য, পাশে একটি ছুরিকা। এ ছুরিকা এল কোথেকে? বাদশাহের কক্ষে তো কোন মারণাস্ত্র থাকে না!

যাহোক্, বাদশাহের জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হল। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে আতঙ্কে যা বললেন, সেই লালকুয়র মরে নি।

সে এই গভীররাত্রে সেই লাল বসন পরে শাণিত ছুরিকা নিয়ে আমাকে হত্যা করতে এসেছিল। সে চায় প্রতিশোধ। আর সেই প্রতিশোধে চায় আমাক হত্যা করতে। সে ছুরিকা উত্তোলন করেছিল কিন্তু আমার চিৎকারে পলায়ন করলো।

তারপর রাত্রে বাদশাহের শয়নঘরে প্রহরী নিযুক্ত হল। তারা সমস্ত রাত্রি ধরে এক অনাগত আক্রমণের জন্য সতর্ক হয়ে থাক্‌লো কিন্তু আর কোনদিনও সেই রমণীর প্রেতাত্মা প্রতিশোধ চরিতার্থ করবার জন্যে বাদশাহের কক্ষে আসে নি।

তবে অনেকদিন পরে যে দুজন ঘাতক লাল্‌কুয়রের জঠর ছিন্ন করেছিল, তাদের মধ্যে একজন একদিন নিজের কৃপাণ দ্বারা নিজেই হত হল। তবে সকলে বলে, সে আত্মহত্যা করেছিল। যদি সে আত্মহত্যাই করে থাকে তাহলে লালকুয়রকে যে সৈনিক বাদশাহের আদেশে ধর্ষণ করেছিল, সেই সৈনিকের নিম্নাঙ্গ কে কর্তন করলো? অদ্ভুতভাবে কে একদিন গভীররাত্রে সেই সৈনিকের পুরুষাঙ্গ ছিন্ন করে নিয়ে চলে গেল।

ফররুখশিয়রের হত্যা পর্যন্ত এই বীভৎসতা কখনও লুপ্ত হয় নি।

লুতুফ আলির দিনগুলি বেশ চলে যেতে লাগলো।

প্রাসাদের গল্প যেন তার কাছে রূপকথার গল্পের মত মনে হতে লাগলো। লালকুয়রের জীবন ও মৃত্যু তার কাছে নতুন এক অভিজ্ঞতার প্রসাদ দান করলো। সে পুলকিত হয়ে বাদশাহী খানা খেয়ে আয়াসে এই সব গল্প শুনতে লাগলো। কাজ তো কিছু নেই। উপাধি বাদশাহের পার্শ্বচর কিন্তু দু'মাস গত হবার পরও বাদশাহের দেখা একদিনও মিললো না। একদিন এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করেছিল,—হুজুর, আমার কি কোন কাজ নেই?

সেই কর্মচারী বলেছিল,—কাজের ভাবনা কি? এখন আয়াস করে নাও। তারপর যখন কাজ পাবে, নিশ্বাস ফেলতে পারবে না।

তাই লুতুফ আলি আয়াস করে বাদশাহী রাজসিক শয্যায় শুয়ে ও ভাল ভাল খানা খেয়ে অবসর জীবন যাপন করতে লাগলো। আর শুনতে লাগলো দু'শ বছরের কত উত্থান পতনের ইতিহাস। দিল্লীর এই প্রাসাদেই একদিন ছিলেন মোগল শাহজাদীরা। ছিলেন হুমায়ুন ভগিনী গুলবদন। আকবর মহিষী যোধাবাঈ। জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহান। শাহজাহানের প্রিয়তমা মমতাজ বেগম। মমতাজ

বেগমের সমাধি তাজমহল রচনা করে শাহজাহান বাদশাহ অমর হয়েছেন। লুতুফ আলি সেই আগ্রার তাজমহলের কথা শুনে তা দেখবার জন্য উৎসুক হল! যদি কোন-দিন সে আগ্রায় যায়, তাহলে তাজমহল নিশ্চয় দেখবে। জোরুর জন্যে এতটা ত্যাগ স্বীকার কখনও সে দেখেনি, দেখে বুঝবে শাহজাহান সম্রাটের মহিমা।

ফতুমার জন্যে সে কিছুই করতে পারে নি। সিন্ধুনদের তীরে মাটি চাপা দিয়ে রেখে এসেছে। যদি সম্ভব হয়, তাহলে সে সেখানে একটি সমাধি তৈরী করে দেবে। তবে সে হয়তো শাহজাহানের তাজমহলের মত হবে না। না হোকগে, তার ক্ষুদ্র সামর্থে যেটুকু সম্ভব তাই দিয়ে তার মহব্বতের রাণীকে অমর করে রাখবে। হৃদয়ের আবেগ তো সেই পত্নীপ্রাণ সম্রাট শাহজাহনের চেয়ে তার কম নেই? ফতুমাকে সে দারুণ পেয়ার করে। সেই পেয়ারের জন্যেই তাকে অক্ষয় করে রাখবে।

বাদশাহ জাঁহাদার শাহের প্রেয়সী লালকুয়রের শেষ পরিণতির কথা শুনে তার চোখে জল এসে পড়েছিল। আওরতটি যথার্থ না ভালবাসলে প্রতিশোধ নিতে চায় নি। ফররুখশিয়রকে সুস্থ মনে গ্রহণ করলেই কি সে ভাল করতো? না করত না। তাতে পরিণতি যাই হোক্, আওরতটির বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণিত হত। ভালবাসার কাছে এই বিশ্বাসখাতকতার কোন মূল্য নেই।

লালকুয়র শেষে বাঁচতে চায় নি। চেয়েছিল তার সন্তানটিকে বাঁচাতে। জাঁহাদার শাহের সন্তান বলে সে বাঁচাতে চায় নি। নারীমনের আকাঙ্ক্ষিত জননীর পদপ্রাপ্তির জন্যে রূপসী লালকুয়র সন্তান রক্ষার জন্যে কাতর হয়েছিল। এই সূত্রে লুতুফ আলির মনে পড়ে যায় ফতুমার কথা। ফতুমাকে হারিয়ে যেন ফতুমার উপস্থিতি তার সবসময় মনে পড়ে যায়। ফতুমা যেন ছায়ার মত পিছে পিছে ঘুরছে। সে মরবার সময় আর কোন প্রার্থনা করে নি, বলেছিল,—আমার হানু রইলো, তুমি তাকে দেখো। হানিফের পিতা সে। হানিফকে দেখা তার কর্তব্য। কিন্তু তবু ফতুমা তার হানিফকে দেখতে বলে গেল। এতেই প্রমাণ হয়, নারীমনের সহজাত আকাঙ্খা।

সেই ফতুমার মন নিয়ে আর একটি রমণী লালকুয়রকে সে ভাবে। লালকুয়রের নৃশংস মৃত্যু হয়তো উল্লেখযোগ্য নয়। অন্তত সে এসে শুনেছে, বাদশাহ এর চেয়ে অনেক নির্মম শাস্তি প্রয়োগ করেন। কিন্তু তার জঠরের সঞ্চিত রক্তপিণ্ডটি, যেটি একদিন পূর্ণ হলে মানুষরূপে দুনিয়াতে উপস্থিত হত - সেটি উদর চিরে বের করে ফররুখশিয়রের রাজত্বে এক ইতিহাস সৃষ্টি করলো।

অবশ্য আরো নাকি এর চেয়ে নৃশংস ঘটনা সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলে সৃষ্টি হয়েছিল। তবে সে সব কাহিনী লুতুফ আলির অগোচর বলে সে সব কথা ভাবলো না।

এই আওরতদের কথা ভাবতে গিয়ে লুতুফ আলির বার বার স্মরণ হতে লাগলো, সেই সরাইখানার মালিক সর্দারজীর বিবি শাওনীকে। ফতুমার মৃত্যুর জন্যে যেন শাওনী তাকেই দায়ী করলো। অবশ্য সে শেষকালে একটু অন্য স্বভাবের পরিচয় দিয়েছিল বলে শাওনীর অশ্রদ্ধা পেল কিন্তু শাওনী যদি একবার তার কোমল মন দিয়ে

বিচার করে দেখতো, তাহলে নিশ্চয় প্রমাণ পেত—সে যে আচরণ প্রকাশ করেছে, আসলে সে প্রকাশই তার সব নয়। ফতুমা তার শত্রু নয়, বরং এমন একজন, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাহোক্, সে কথা বোঝাবার সুযোগ শাওনী তাকে দিল না। তবু একটু আকর্ষণ থাকলো, না হলে মনে খেদ থেকে যেতে। শাওনী হাজার অবহেলা করলেও হানিফকে বুকে তুলে নিয়েছে। হানিফকে তার জননীস্নেহ দিয়ে বুকের সীমিতে চেপে ধরেছে।

যে বক্ষ রমণীর সোহাগের ইস্তেজারে দয়িতের জন্যে লালিত হয়, সেই বক্ষের সুধায় পরবর্তীকালে সঞ্চিত হয় মাতৃ আকাঙ্খা। শাওনীর বক্ষে এখন দয়িতের জন্যে শুধু সুধা ছিল না। ছিল সন্তানের জন্যে অমৃত সুধার ভাণ্ড। সেই অমৃত সুধা দিয়েই সে অপরের সন্তানকে বুকে তুলে নিয়েছে।

সেখানেও সেই আত্মার আকর্ষণ। শাওনী, লালক্ৃয়র, ফতুমা যেন একই রক্তধারা থেকে নিঃসৃত হয়ে তারা জীবন ধারণ করেছিল। লুতুফ আলি যেন আস্তে আস্তে এই সব রমণীদের মনের একটি চেহারা দেখতে পাচ্ছে। হয়তো আরো অনেক রমণীকে সে দেখলে সেই একই স্বভাবের পরিচয় পাবে।

রমণীর সম্বন্ধে হঠাৎ উৎসুক হল কেন চিন্তা করতে গিয়ে বাদশাহের হারেমের কথা তার স্মরণে এল।

এই প্রাসাদের মধ্যে বাস করে শুধু কদিন ধরে শুনছে অন্দরমহলের কথা। অথচ শুনেছে, এখান থেকে অন্দরমহল যেতে গেলে বেশ সময় ব্যয়িত হয়। খুব কাছে মনে হলেও খুব কাছে নয়। অনেক পরিখা, অনেক ব্যবধান। অনেক বাধা অতিক্রম করলে তবে সেই অন্দরমহলের সিংহদরজার কাছে পৌঁছানো যায়। আর তার অভ্যন্তরে যে হাজার রহস্য আছে, সেই রহস্যের ঢাকনা উন্মোচন করতে গেলে খোদার হাতে প্রাণটি সমর্পণ করতে হয। তবু সে অন্দরমহলের আলোচনাই কর্মচারীদের মুখে সর্বদা শুনতে লাগলো।

অবশ্য অন্দরমহলের কঠিন অবরোধ আর অবরোধ থাকেনি। নাদীর শাহের আসার পর তার অত্যাচারে সব শালীনতাটুকু নষ্ট হয়েছিল। বাদশাহের যেটুকু একান্ত গোপন সম্পত্তি ছিল, তা হরণ করে, নষ্ট করে নাদীর শাহ নিজের চরিত্রের বিজয় ঘোষণা করেছে। কোন যুবতী, খুবসুরত রমণী তাঁর ভোগ থেকে পরিত্রাণ পেযে পবিত্র থাকতে পারে নি। তাই নাদীর শাহ চলে যাবার পর অন্দরমহলের দরজা আবার বন্ধ করতে তা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নি। একটু শিথিল হয়ে গিয়েছিল বন্ধ দরজার কঠিন অবরোধ।

তার ওপর গুলবানুর স্মৃতি বড় মর্মন্তুদ হয়ে বাতাসে হাহাকার সৃষ্টি করেছিল। সেই গুলবানুকে উপলক্ষ করেই যেন যত বিশৃঙ্খলা। মহম্মদ শাহ নিজের সুনাম অর্জনের জন্যে যে সব কুমারীদের নিজের হেফাজতে রেখেছিলেন, তারা ইজ্জত হারাতে কেমন যেন সব মস্তিষ্ক বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে গেল। অল্প বয়েসের ফুটন্ত গোলাপগুলি কত স্বপ্ন নিয়ে নিজেদের শাদীর জন্যে তৈরী করছিল। বাদশাহ তাদের উপযুক্ত রাজ-

পুরুষ খুঁজে দেবেন। তাদের জায়গীর দেবেন। তারা সুখে সংসার করবে। এমনি এর আগে অনেক রমণীর শাদী হয়েছিল বলে তাদের কল্পনা অমূলক নয়। কিন্তু শয়তান নাদীর শাহ এসে তাদের নষ্ট করে গেল।

তাই তারা সবচেয়ে বেশী আঘাত পেল।

কিন্তু তারা যদি আঘাত পেয়ে চুপ করে শয্যায় কাঁদতো তাহলে কোন সমস্যা থাকতো না, তারা অন্দর মহলের পবিত্রতা নষ্ট করে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের জন্যে অন্দর-মহলের বাইরে চলে আসতে লাগলো। মরদ খুঁজতে লাগলো। পুরুষ পেলে তারা সমস্ত নিয়ম চূর্ণ করে তারা অন্দরমহলে নিয়ে গিয়ে ব্যভিচারে লিপ্ত হল।

বাদশাহ মহম্মদ শাহের কাছে সংবাদ গেল কিন্তু তিনি শুনে দু'হাতের তালুতে মুখ লুকোলেন। আর প্রাসাদের ওমরাহরা সেই দুর্বলতায় নিজেরা এগিয়ে গেল। দিল্লীর প্রাসাদের মধ্যে সেদিন যেন নতুন এক ব্যভিচারের প্রতিষ্ঠা হল।

এমনি সময় একদিন এক প্রহরী এসে লুতুফ আলিকে বললো,—জনাব, আপনার সঙ্গে আমার থোড়া বাতচিত আছে। লুতুফ আলি বিস্ময়ে বললো,—পেশ কর।

না, এখানে নয়। একটি আলাদা জায়গা দরকার। যেখানে কেউ আমাদের বাতচিত শুনতে পাবে না। জানেন এখানে দেয়ালেরও কান আছে!

এই বলে তাতার প্রহরী তাকে নিয়ে গিয়ে একটি বাগিচা উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করলো। সেই উদ্যানের বিচিত্র পুষ্পশোভাকে অতিক্রম করে তারা এক প্রস্তরনির্মিত বিশ্রামাগারে গিয়ে পৌছলো।

হ্যাঁ জায়গাটা সত্যিই নির্জন। দূরে দেখা যাচ্ছে রক্তবর্ণ স্বর্ণজ্যোতি আসমানের ঢেউ মেঘের কোলে ছড়িয়ে আছে।

এই ধরনের উন্মুক্তস্থানে লুতুফ আলি প্রাসাদে প্রবেশ করবার পর আসে নি। সে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতেই সর্বদা থাকে। একটু অন্য জায়গা যাবার কথা মনে এলেই তার ভয় করে। তার মনে হয়, ষড়যন্ত্র চতুর্দিকে। প্রাসাদের বড় বড় থামের আড়ালে যেন ষড়যন্ত্র ওত পেতে অপেক্ষায় আছে। সুবিধে পেলেই বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে।

তাই লুতুফ আলির ইচ্ছে থাকলেও বাইরে বের হয় নি।

সেইজন্য উদ্যান বীথিকায় প্রবেশ করে সে এক বুক নিশ্বাস গ্রহণ করলো। অজস্র হরেক রঙের ফুলের তনু থেকে বিচিত্র সুরভি নির্যাস বাতাসে দোল খাচ্ছিল। তার ঘ্রাণ মনের মধ্যে নিয়ে লুতুফ আলি কেমন যেন হালকা হয়ে গেল। শঙ্কাগ্রস্ত মনটিতে নেমে এল এক দারুন প্রশান্তি।

সে সেই প্রশান্তি নিয়েই সাহসের সঙ্গে রক্ষী সিপাহীকে বললো, কি আর্জি আছে পেশ কর!

রক্ষী মৃদু হেসে বললো,—এক আওরত আপনাকে বহুত পেয়ার করে।

হঠাৎ সাপ দেখার মত চমকে উঠে লুতুফ আলি বিস্ময়ে বললো আওরত! কিন্তু আমি তো কখনও আমার মহলের বাইরে যাইনি।

তাতে কি হয়েছে জনাব? এখানে না দেখলেও পেয়ারের কোন অসুবিধা হয় না।

লুতুফ আলি আরো বিস্ময়ে বললো,—বাঃ বাদশাহের প্রাসাদে সবই তাজ্জব ! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না হে !

রক্ষী তখন হেসে বললো,—কিছু বুঝতে হবে না হুজুর। আপনি শুধু হুকুম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি কি হুকুম করবো ? বাদশাহের জেনানা স্পর্শ করে কি শেষকালে কোতল যাবো ?

না হুজুর কোতল হবেন না। যে আওরত আপনার কথা বলছে, সে খুব জবরদস্ত আওরত আছে। যেমন সুরত, তেমনি দিল্। আর ক্ষমতাভী বহুত আছে। আপনি একবার হুকুম করলেই আপনাকে রাত্রে এক প্রহরের সময় ঠিক জায়গায় পৌছে দেব।

আর যখন কেউ জানতে পারবে ?

হুজুর কেউ জানতে পারবে না। আর যদি জানতে পারেও কবুল করবে না। সোনী বাঁদীর হাতে আপনাকে সঁপে দেব। আবার সোনী বাঁদীর কাছ থেকে আপনাকে নিয়ে জায়গায় পৌছে দেব। এরকম আজকাল হরবকত হচ্ছে হুজুর। কোন গুনাহ হচ্ছে না, আর আপনি বলছেন শাস্তি পেতে হবে।

তবু লুতুফ আলি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো। আকস্মিক এই প্রস্তাবে তার যেন সমস্ত ভাবনা-চিন্তা লোপ পেল। সে ভাববে কি ? ভাবনা তার এলোই না। এ প্রস্তাবে কি ভাবনার কিছু থাকে ? তাকে কোন এক আওরত চেয়েছে। আর তার ফরমাইস মত এই প্রস্তাব এসেছে। তবে কি তাকে এখানে বাদশাহ পুষেছেন, ঐ দুরূহ কাজের জন্য ! সে হবে অসংখ্য আওরতের একরাত্রের নাগর !

কিন্তু যদি এই অপরাধের জন্যে বাদশাহের খড়গ তার ওপর নেমে আসে ?

না, না সে রমণী-সম্ভোগের জন্যে লালায়িত নয়। ফতুমাকে হারানোর পরে তার কামনার আকর্ষণ সে সংবরণ করেছে। এই প্রস্তাব সে লোভের আকর্ষণ বলে গ্রহণ করবে না। তবু যেন তার মনে এক কৌতূহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। যদি এই সুযোগে অন্দরমহলটা দেখা হয়ে যায় মন্দ কি ? আর কে সেই আওরত, যে তাকে না দেখেই ভাল বেসেছে, তাকে একবার চাক্ষুষ দেখবে। যদি সুযোগ পায়, তাহলে অপমান করে বুঝিয়ে দিয়ে আসবে, যে লুতুফ আলি সৈনিকের মত অত সস্তার নয় ! তার একটা আলাদা মন আছে।

রক্ষী নীরবতা ভঙ্গ করে বললো,—হুজুর, আপনি যদি যেতে না স্বীকার করেন, তাহলে অন্য বিপদও আশা করতে পারেন।

লুতুফ আলি বিস্ময়ে তাকিয়ে বললো,—কি রকম ?

সেই আওরত বাদশাহের কাছে অন্যভাবে আপনার নামে অভিযোগ এনে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

আমার কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও !

অপরাধ কি ? অপরাধ তৈরী করে নিতে কতক্ষণ !

ঝুটবাত সাচ্ হয়ে দাঁড়াবে!

ক্ষতি কি? আপনার ওপর গোসা হলে ঝুট সাচ্ হবে, সাচ্ ঝুট হবে।

লুতুফ আলি আতঙ্কে চোখ মুখ বিস্ফোরিত করে শুধু রক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকলো। অর্থহীন প্রলাপের মত মনে হল তার রক্ষীর কথা।

তারপর সেই রক্ষীকে সে বিদায় দিয়ে নিজের কক্ষে ফিরে এল। শুধু রক্ষীকে বললো,—বেশ আমি যাবো। নসীবে যা লেখা আছে ঘটবে। তুমি যথাসময়ে এসে আমাকে নিয়ে যেও।

রক্ষী সম্ভ্রমে কুর্নিশ করে বললো,—মনে রাখবেন আজকে রাত্রি এক প্রহরের সময় আসবো।

লুতুফ আলি থমকে দাঁড়িয়ে বললো,—দু একদিন পরে গেলে হয় না।

রক্ষী হেসে বললো,—হুজুর তাহলে আপনি বিপদকে বরণ করবেন। যে আপনাকে চেয়েছে, সে সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে চেয়েছে। বিলম্ব করলে তার প্রবৃত্তিতে লাগাম পরানো হবে। আর তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে আপনার প্রাণ সংশয় ঘটাবে।

রক্ষী চলে গেলে লুতুফ আলি হতবুদ্ধির মত হয়ে নিজের কক্ষে এল। তার যেন আর এক জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আর সে জগৎ তাকে যে পুরস্কার দিল, তা তার জীবনে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। ভাবলো এখুনি পালিয়ে গেলে কেমন হয়? এই প্রাসাদ ছেড়ে, এই দিল্লী ছেড়ে অনেক দূরে। এই হিন্দুস্তানে আসার জন্যে সে কত ক্লেশ স্বীকার করেছিল। নিজের সমস্ত প্রিয়জনকে হারিয়ে সে নিঃস্ব হয়ে গেছে। বুলন্ত সিংয়ের ওপর বেইমানী করে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। এখনও রক্তাক্ত বক্ষের ক্ষত তার সজীব হয়ে আছে। বাদশাহ পুরস্কার দিয়ে নিজের পার্শ্বচর করে রেখেছেন। অথচ তার কোন কাজ নেই। খানা, শয্যা আর ঘুম।

সম্পূর্ণ আরামের জীবন যাপন করে সে অলস হয়ে গেছে। তার শরীরে এখন বাদশাহী রাজসিক পোষাক। পেটে কালিয়া কোপ্তার জোয়ালো মসলা। ঘ্রাণে আতরের সুবাসের মৃদুমন্দ খুসবু। শয্যায় নরম কোমল বিছানার আচ্ছাদন। শুলেই কেমন যেন আনন্দ জাগে মনে।

কিন্তু তারপর একি? কে এক আওরত তাকে না দেখেই ভাল বেসেছে। তবে কি এখানে মোহরের যেমন মূল্য নেই, ভালবাসাও তেমনি মূল্যহীন? সে আরো তলিয়ে ভাববার চেষ্টা করলো, তার কথা সেই আওরত জানলো কেমন করে? তবে কি এই অন্দরমহলের মধ্যে বিরাট দর্পণ আছে? সেই দর্পণের ওপর প্রতিফলিত হয়ে ওঠে প্রাসাদের সমস্ত বহির্ভাগ! এখানে যা কথা হয়, সব কোন শব্দযন্ত্রের ওপর ধরে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়? তা না হলে কোন এক অপরিচিতা অন্তঃপুরিকা তাকে না দেখে ভাল বাসলো কেমন করে? হয়তো সেই অন্তঃপুরিকা বাদশাহের কোন বেগম। কিংবা বেগম হবার জন্যে বাদশাহের আশায় দিন গণণা করছে। বাঁদী হলে, বা ক্ষমতাহীনা হলে বাইরের পুরুষ নিয়ে রাত্রি অতিবাহিত করতে কখনও সাহস করত না।

লুতুফ আলির চিন্তাশক্তি লুপ্ত হল। সে শুধু সেই মুহূর্তে আল্লার কাছে নিজের বিপদের কথা নিবেদন করে নিঃশ্বাস রোধ করলো। সে যদি সে না হত, তাহলে এই আমন্ত্রণে অনেক পুরুষ নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতো কিন্তু তার যে সমস্ত জীবনটাই কেমন অন্যখাদে পরিচালিত হচ্ছে।...তার যে জীবনে অনেক উত্থান পতনের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস সে ভুলবে কেমন করে? হানিফ একজন অনাত্মীয়ার কাছে গচ্ছিত আছে। তার ভাগ্য পরিবর্তনের কোন পথ এখনও তৈরী হয় নি। সে বিরাট সমুদ্রের ওপর খড়কুটো ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

আবার পরক্ষণে কে যে তাকে বললো, অতো ভাবনার কি আছে? তুমি বলিষ্ঠ জোয়ান পুরুষ বলেই এক যুবতী আওরত তোমাকে এক রাতের জন্যে চেয়েছে। যাবে, আনন্দ করবে, স্পর্শ দেবে, সোহাগ নেবে—তারপর ভোগ করে চলে আসবে পরদিন প্রভাত হলে, তা স্বপ্ন বলেই পরিত্যাগ করবে। জোয়ান পুরুষ লক্ষ আওরতের দেহ ভোগ করে চরিত্রবান হয়। তোমার অতো চিন্তার কি আছে? বাদশাহকে দেখেও কি তোমার চেতনা হয় না? সুখের জন্যে প্রয়োজন। আনন্দে সুরার চেয়ে মাদক দ্রব্য জোয়ানী খুবসুরত আওরত। আওরত স্পর্শে যে নেশা হয়, অন্য কোন আনন্দ বস্তুতে কি তা হয়? সেই জন্য কোন কথা না ভেবে ডুবুরীর মত নেমে পড় অসীম অন্ধকারের সীমাহীন অতলে। সেখানে পাবে যে সুখ, সে সুখের আবেদন তোমাকে নতুন এক দুনিয়ার খোঁজ দেবে। এ শাদী করা জোরু নয়। যাকে দিনের পর দিন ভোগ করলে একঘেয়েমি জীবনের টানপোড়েনে চিত্ত বিক্ষুব্ধ হবে। এ নতুন এক হঠাৎ উদ্ধার করা বিজলীর চমক। বিজলী চমকে যে শোভা হয়। সে শোভা এই নতুন উপভোগ।

লুতুফ আলি আর ভাবলো না। অতীতের বসন খুলে ফেলে সে দয়িতের নতুন বসন পরে প্রস্তুত হয়ে নিল রক্ষীর আসার অপেক্ষায়। সাজলো বেশ সুন্দর করে। মুখের চুল দাড়ি গোফ প্রাসাদে আসার পরই ত্যাগ করেছিল। এখন মুখখানি গুম্ফহীন হয়ে কেমন যেন রমণীর মত সুন্দর হয়েছিল। সেই সুন্দর মুখের সঙ্গে মানানসই করে তার বলিষ্ঠ দেহে সুন্দর চুমকি দেওয়া পিরান ঝুলিয়ে দিল। কণ্ঠে ঝোলালো একটি মুক্তার মালা। চোখে পরলো সুরমা। হাতে এঁটে নিল হীরার আংটি। তারপর সারা শরীরে গুলাবী আতরের খুশবু ছড়িয়ে লুতুফ আলি অপেক্ষা করতে লাগলো।

আস্তে আস্তে রাত্রি নিশুতি হয়ে এল। নেমে এল প্রাসাদের মহলে মহলে নিস্তব্ধতা। কোলাহলমুখর রাজপ্রাসাদের কলরবও স্তিমিত হয়ে এল। শুধু জেগে থাকলো, তোরণদ্বারের ওপর প্রহরের সুমধুর ঘোষণা, আর টহলদার প্রহরীর সতর্কদৃষ্টি।

এত বড় বিস্তৃত প্রাসাদ। প্রাসাদের চতুর্দিকে কত মহল। মহলে মহলে দিনের বেলা গুঞ্জন। কিন্তু রাত্রিবেলা সে গুঞ্জন কোথাও নেই! লুতুফ আলি বসে বসে সেই কথাই ভাবলো। তবে শুনেছিল, নাদীর শাহ আসার আগে এই প্রাসাদের মহলে মহলে রাত্রি নামতে বিলম্ব হত তখন রঙমহলের আসর ভাঙতে একেবারে দু'প্রহর শেষ

হয়ে যেত আর যন্ত্রসংগীতের রেশ থামতে আরো এক প্রহর। তখন বাদশাহ ও মোসাহেবদের অবসন্ন দেহ তুলে খোজারা নিয়ে যেত যার যার আরাম কক্ষে। আর নর্তকী, বাঁদী ও খুবসুরত মেয়েলোকদের শয্যা হত ঐ রঙমহলেরই ফরাসের ওপর। তাদের আর নিয়ে যেতে কেউ সাহস করতো না। সরাবের পানপাত্রের সঙ্গে তারা সারারাত গড়াত।

এই বাদশাহ যখন অধিক রাত্রি পর্যন্ত প্রাসাদ জাগিয়ে রাখতেন, তখন সমস্ত প্রাসাদের লোকও বাদশাহের মত বিভিন্ন আনন্দ নিযে নিদ্রার আকর্ষণ ভুলতো। সে বেশ মন্দ হত না। রাত্রির মোহিনী আকর্ষণে নারী পুরুষের উচ্ছল আনন্দ নতুন এক প্রেরণার উৎস যোগাত। তাতে এই রাত্রিকেই উপলক্ষ করেই সমস্ত দিনগুলি কর্মমুখর হয়ে উঠতো।

নাদীর শাহের আক্রমণের পর সব শেষ। এখন বাদশাহ দিনরাত চিন্তায ক্লিষ্ট। আর তাঁর সঙ্গে প্রাসাদের সব লোকও ম্রিযমাণ। বাদশাহ সকাল সকাল বিশ্রাম নিতে যান। তার সঙ্গে প্রাসাদও ঘুমে নিঝুম হযে আসে।

এই নিস্তব্ধ মুহূর্তেই সেই পরিচিত রক্ষী নিঃশব্দে আবির্ভূত হল। চাপাস্বরে বললো,—হুজুর, এক প্রহর শেষ হয়ে গেছে, এবার যাত্রা করতে হবে।

লুতুফ আলি বললো,—আমি প্রস্তুত কিন্তু তুমি আর একবার সত্যি করে বলো, এই যাত্রায় কোন অপরাধ হবে না তো! আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, যে এই যাত্রার পিছনে কোন ষডযন্ত্র লুকানো আছে।

রক্ষী হেসে বললো,—আপনি ভাগ্যবান পুরুষ মিঞাসাহেব। যে আপনাকে মহব্বত দিয়েছে, সে আওরতকে কখনও কোন ওমরাহ বশ করতে পারে নি। আপনি তার সঙ্গে পরিচিত হলেই মালুম পাবেন। আর ষডযন্ত্রের কথা বলছেন, দুশমন পারস্য বাদশাহ প্রাসাদ অধিকার করতে সব ষডযন্ত্র এখন ঠাণ্ডা পানি খেযে অন্ধকাবে মুখ লুকিয়েছে।

লুতুফ আলি তার পর নিশ্চিন্ত হযে বললো,—চলো, তাহলে অযথা বিলম্ব কবে দরকার নেই।

রক্ষী সামনে পথ দেখিযে এগিয়ে চললো আর লুতুফ তাকে অনুসরণ করে চলতে লাগলো।

লুতুফের সব পথই অপরিচিত, তাই তার চোখে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময সৃষ্টি হতে লাগলো! এ রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের দেযাল গাত্র মর্মরনির্মিত। সেই মর্মর গাত্রে নানাবর্ণের মূল্যবান প্রস্তর খোদিত। সেই চুনি, পান্নার গাযে মশালের আলোর ঝলমল। গলির পর গলি। সোপানের পর সোপান। কোথাও চডাই, কোথাও উৎবাই। কোথাও পাতালের নিচে নেমে যেতে হচ্ছে, কোথাও অনেক উপরে একেবারে মিনারের শীর্ষে উঠতে হচ্ছে। শুধু স্থানে স্থানে স্বর্ণবাতিদানে মশালের জোরালো আলো। কিন্তু সেই আলোও পর্যাপ্ত নয়। কেমন যেন ম্লান মনে হচ্ছে। কেমন যেন বিরাট উন্মুক্তস্থানে একটুকরো আলোর মত মনে হচ্ছে।

অথচ সেই আলোর উজ্জ্বলতা দেয়ালের প্রস্তরগাত্রে পড়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। দর্পণের প্রতিফলন সমস্ত কক্ষপথ আলোকিত করছে। কোথাও অনেক আলো। আবার কোথাও চাপ চাপ অন্ধকার। আর সেই অন্ধকার দেখলেই কেমন যেন লুতুফ আলির ভয় জাগছে। এই বুঝি কেউ অন্ধকার থেকে দৈত্যের মত বের হয়ে ছুরি উত্তোলিত করে।

কুসুম সুরভিত উদ্যান দেখা গেল। চাঁদের রশ্মি পড়েছে সেই উদ্যানে। বাতাসে কুসুম সুবাস। সুবাসে নেশার আমেজ। লুতুফ আলি ভেবেছিল একটু সরাব পান করবে। কারণ সরাব পান না করলে, নেশা না হলে সে সেখানে গিয়ে কোন আনন্দ দিতে পারবে না। তার মনের ভেতরটা কেমন যেন শুষ্ক, কেমন যেন নিরস। সরাব দিয়েই সে রসসিক্ত করবে বলে মনে করেছিল কিন্তু সরাব না পাওয়ার জন্যে তার মনে কোন আবেগ সৃষ্টি হতে পারে নি। সেইজন্যে মনটি সরাবী করার জন্যে সেই কুসুম সুবাসের আঘ্রাণ প্রবলভাবে নিতে লাগলো।

উদ্যানের পর উদ্যান। আসমানের চওড়া বক্ষটা যেন এখানে দারুণ লোভাতুর। আসমানের জমিনে হীরার টিপ্ জ্বলছে। অনেক নক্ষত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে রাজসিকতা প্রতিপন্ন হচ্ছে। যেন রাজসভা বসেছে ঐ রাতের আসমানের নীলিম বুকে।

রক্ষীর সঙ্গে লুতুফ আলি আরো এগিয়ে যেতে লাগলো। তারা বাদশাহের খাসমহল পাশে রেখে এগিয়ে চললো। এই বাদশাহের খাসমহলের পাশেই অন্দরমহলের দরজা। তবে বাদশাহের খাসমহলের তলায় সুড়ঙ্গ আছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়েও বাদশাহ জেনানা মহলের চতুর্দিকে ঘুরতে পারেন। তবে তিনি বড় একটা সুড়ঙ্গ ব্যবহার করেন না, কারণ তার গোপনতা কিছু নেই। তিনি হুকুম করলেই তাঁর সব কিছু পায়ের তলায় এসে যায়। তবে সুড়ঙ্গ প্রয়োজনের উপকারিতা ছিল। বাদশাহ সুরা পান করে মত্ত হলে তাঁর যদি গোপনে কোন রমণীর সঙ্গে মিলতে ইচ্ছে হত, তাহলে তিনি এই সুড়ঙ্গ পথেই তার মহলে গিয়ে উপস্থিত হতেন। তবে এই তুচ্ছ কারণের জন্যেও সুড়ঙ্গ তৈরী হয় নি।

সুড়ঙ্গ তৈরির আসল কারণ, রাজপ্রাসাদ শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে বাদশাহ এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই অন্দরমহলে পৌছতে পারতেন, আর সেখান থেকে তাঁর প্রিয়জনদের নিয়ে আবার এক সুড়ঙ্গ পথে নৌকায় করে যমুনা দিয়ে পলায়ন।

বাদশাহ ফররুখশিয়র সৈয়দ ভ্রাতার দ্বারা নিহত হবার আগে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করেছিলেন।

বহুকালের তৈরি এই রাজপ্রাসাদ কত বাদশাহ তাঁর আত্মীয় পরিজন সমভিব্যাহারে এই প্রাসাদে কাটিয়ে গেছেন। তাঁরা আজ কেউ নেই কিন্তু আছে তাদের স্মৃতি। আছে বড় বড় আঁকা ছবিতে তাদের প্রতিনিধি। কত বিচিত্র নক্সায় অঙ্কিত জলাধার পড়ে আছে অবহেলিত হয়ে উদ্যানের পাশে। বর্তমান বাদশাহ ব্যবহার করেন না বলে তার কোন মূল্যই আজ নেই। বিলাসের বিচিত্র উপকরণ চতুর্দিকে থরে থরে সাজানো।

চাঁদের রশ্মি চতুর্দিকে পড়ার জন্যে সব দৃশ্যমান, সব স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপর ভেসে

উঠেছে। একটি সুন্দর কারুকার্যময় মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ লুতুফ আলি থমকে দাঁড়ালো। রক্ষীকে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলো, —এ মহলটি এমনি পরিত্যক্ত কেন?

অন্ধকার মহলের কোথাও আলো নেই। কেমন যেন অপরিষ্কার। অবহেলিত হয়ে যেন কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে।

রক্ষী চাপাস্বরে বললো,- শাহজাহান বাদশাহের পেয়ারের বেটা দারা শিকোর এই মহলটি তার এক বিবির জন্যে বানিয়েছিলেন। কিন্তু তা আর তার ভোগে হয় নি। তারপরেই তো সংবাদ ঘোষিত হল, সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ। আর সঙ্গে সঙ্গে পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে কাটাকাটি লেগে গেল।

তারপর রক্ষী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,—কত ইতিহাস, কত কান্নার উচ্ছ্বাস গাঁথা আছে এই প্রাসাদের মর্মরগাত্রে। কত রক্তও যে এই মর্মরগাত্রের বুক কলঙ্কিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

রক্ষী আর কথা বললো না। হঠাৎ লুতুফ আলির চোখ একটি কালো কাপড় বেঁধে দিয়ে বললো,—হুজুর, কসুর মাপ করবেন। অন্তঃপুরে প্রবেশের আগে চোখে পট্টি বাঁধাই রীতি।

লুতুফের হাত ধরে এবার রক্ষী নিয়ে যেতে লাগলো।

আর লুতুফ আলি রুদ্ধ চোখে সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে গুণে গুণে পা ফেলতে লাগলো। তার মনে এক অদম্য জিজ্ঞাসা, অস্বাভাবিক এক কৌতূহল। চোখ বাঁধা কিনা, তাই মনশ্চক্ষে সে দেখতে লাগলো, তারা ভরা সুষুপ্তিময় জ্যোৎস্নালোকিত আসমান। আর সে সেই আসমানের বুকে সবচেয়ে উজ্জ্বল্যমান এক সিংহাসনে বসে কিন্নরীদের গান শুনছে। কি মধুর সে গান! কি সুন্দর প্রাণ মাতানো সুর। সেই সুরে তার মন প্রাণ কেমন যেন মাতাল হয়ে যাচ্ছে। দেহের শিরা-উপশিরায় কেমন যেন শিহরণ।

হঠাৎ তার চিন্তা হোঁচট খেল। একটি রাতজাগা পাখী যেন কোথায় কর্কশ স্বরে ডেকে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সুরবাঁধা হৃদয়যন্ত্রের সুর কেটে গেল। কিন্তু সে এতক্ষণ যে স্বপ্ন দেখেছিল, আসমানের সিংহাসনে বসে কিন্নরীদের গান শুনছিল, সে গান কিন্নরীদের নয়, খুব কাছ থেকে ভেসে আসছে। স্বপ্ন নয়, এ বাস্তব। সে চলেছে চোখ বাঁধা অবস্থায় কোন এক আওরতের আহ্বানে। আর সে এসে পড়েছে অন্তঃপুরের অতি কাছে। সম্ভবত সেই অন্তঃপুর থেকে গান ভেসে আসছে। কিন্তু কে গান গাইছে? অন্তঃপুরে হঠাৎ এত আনন্দের উৎস এল কোত্থেকে? যেখানে বাদশাহ সমস্ত আনন্দ হারিয়ে লজ্জা ও অপমানে স্তব্ধ, সেখানে তাঁর অন্তঃপুরে এই আনন্দ কেন? তবে কি অন্তঃপুরিকারা বাদশাহের এই লাঞ্ছনায় খুশি। তারা সেইজন্যে খুশির জলসা বসিয়ে বাদশাহকে অপমান করছে। কিন্তু বাদশাহ কেন এই অবমাননা সহ্য করছেন? তারই খোরপোষে যারা মানুষ তাদের তিনি চাবুক দিয়ে শায়েস্তা করতে পারেন না!

হঠাৎ সে চোখ বাঁধা অবস্থায় একটি রমণীকণ্ঠের স্বর শুনতে পেল।

সে চাপাস্বরে বললো, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর, বিবিজী ছেড়ে দিলে আমি এনে জমা দিয়ে দেব।

রক্ষী অল্প হেসে বললো,—কতক্ষণ থাকবো? বিবিজী কখন ছাড়বে, তার ঠিক আছে?

লুতুফ আলি চোখ বাঁধা অবস্থায় অনুমান করলো, সেই রমণী ঠোঁট উলটে বললো, - কে জানে মর্জি! হয়তো রাত শেষ করেই ছেড়ে দেবে। তবু তুমি থাক বাপু সিপাই, না হলে আবার আমি এই সম্পত্তি নিয়ে কার দোরে ধন্না দেব?

হঠাৎ লুতুফ আলি অনুভব করলো, একটি রমণীহস্ত তার একটি হাত সবলে চেপে ধরলো। হাতটি কেমন যেন উত্তপ্ত। নেশা ধরে যায়। নেশাও ধরে গেল লুতুফ আলির। সে নিজেই এবার সেই রমণীটির হাতটি সবলে চেপে ধরলো।

রমণীটি হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠলো,—ওহে এ যে আমার হাত। এমন করে চাপ দিও না, আমি বিপদে পড়বো।

লুতুফ অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের হাতটি শিথিল করে দিল।

রমণীটি আহত হয়ে বললো,—গোসা করছো কেন বাপু? ধরেছ যখন, তখন চেপেই ধর। বিবির ঘরের কাছে গিয়ে ছেড়ে দিও। চোখ বাঁধা অবস্থায় যাবে কেমন করে?

এবার লুতুফ কথা বললো,—চোখের পট্টিটা খুলে দাও না, তাহলে তো আমি নিজে যেতে পারি!

রমণীটি মুখের একরকম শব্দ করে বললো,—ইস্, তা দিলে যে তুমি হারেমের সব দেখে ফেলবে। তারপর নিজেই খিলখিল করে হেসে বললো,—আর আমাকে দেখলে যদি তোমার পছন্দ হয়ে যায়? না বাপু, মহব্বতের জন্যে প্রাণ হারাতে রাজী নই। জানো, এখানে মহব্বতের জন্যেই অনেক রেষারেষি হয়!

ওরা কথা বলতে বলতে চলেছিল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে দুজনে থেমে গেল।

লুতুফ অনুভব করলো, তারা একটি দরজার মুখে এসে থেমে পড়েছে। তারপর দরজা খোলারও শব্দ শুনলো।

এবার সেই রমণীটি বললো—তুমি অন্যদিকে তাকিয়ে থাকবে, আমি পট্টি খুলে চলে যাবো। আমাকে দেখলে, বিবি আমাকে রক্ষে রাখবে না।

রমণীটি তাই করে অন্যপথ দিয়ে অদৃশ্য হলে লুতুফ চোখ খোলা অবস্থায় দেখলো, সামনে দরজার ওপর বিরাট একটি রক্তবর্ণের পর্দা ঝুলছে। আর কেউ নেই সেখানে।

এইসময় ভেতর থেকে কে যেন মিহিসুরে ডাকলো'—আইয়ে জনাব। অন্দর আইয়ে।

দু একবার ইতস্তত করে লুতুফ আলি ভীরুমনে পর্দা সরালো।

কিন্তু ওকি? পর্দার ওপাশে যেন কেমন এক বেহেস্তের অপরূপ দৃশ্য। প্রথমেই তার চোখ পড়েছিল কক্ষের মেঝের ওপর। যেন একটি তুষার শুভ্র আসমান জমিনের ওপর এক গুচ্ছ বসোরাই গুলাব কে এলোমেলো ভাবে রেখে দিয়েছে। ভাল করে দেখা

যায় না, চোখের ওপর অনেক আলো, অনেক রোশনাই। অনেক জাঁকজমকের মধ্যে হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

লুতুফ আলি জীবনে কখনও এই পরিবেশ দেখে নি। ঐশ্বর্যের এই বর্ণাঢ্যের মধ্যে বেহেস্তের হুরীর অবস্থান। বেহেস্তের স্বপ্ন তার কল্পনাই ছিল, অনুমান যা ছিল, তার সঙ্গে এই পরিবেশের কোন মিল নেই। তাই সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল।

সমস্ত কক্ষটির মধ্যে আভিজাত্যের এক অপূর্ব সমাবেশ হয়েছে। যেন দিল্লীর সুলতানের রত্নাগার এই কক্ষের মধ্যে আছে। আছে মোহরের ছড়াছড়ি, মণিমুক্তার ঝলমল। হীরা, চুনি, পান্না যেন মেঝের ওপর পড়ে অবহেলায় কাঁদছে। আর তার ওপর অত্যুজ্জ্বল আলোর সীমাহীন বর্ণাঢ্য। মসলিনের রকমারী কাপড় দিয়ে কক্ষটি সাজানো। সেই রকমারী কাপড়ের বুকে সলমা চুমকির বুটি। আলো পড়ে সেই সলমা চুমকির বুকে যেন তারার ঔজ্জ্বল্য।

বৃহৎ দর্পণের অবস্থান দেয়ালগাত্রে। সেই দর্পণের প্রতিবিম্বে মেঝের ওপর যে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তাকে দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ লুতুফ আলি লজ্জা পেল, রমণীটির অবস্থান চিন্তা করে। রমণীটি সম্ভবত বিবস্ত্র ছিল। শুধু তার গায়ের ওপর একখানি মেরুন রঙের চাদর ঢাকা দেওয়া। চাদরের সবটুকু এমনভাবে অবহেলায় রাখা, যে পিঠের অনেক অংশই উন্মুক্ত। গোলাপীবর্ণের মসৃণ পিঠ থেকে চোখ দুটি নামিয়ে নিয়ে লুতুফ রমণীটির হাতের পাশ দিয়ে আরো ভেতরে দেখলো। রমণীটির লোভার্তুর বক্ষের এক অংশ দেখা যাচ্ছে। বক্ষের সুউন্নত যৌবনপ্রবাহ শয্যার ওপর পিষ্ট। মনে হয় রমণীটি ইচ্ছে করেই এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে। সে আসবে জানতো বলেই এই কৌশলের অবতারণা। কিংবা এরা অত্যধিক সরমহীন হয়ে থাকতে ভালবাসে বলেই আছে।

অপরিচিতা দুটি হাত সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে খুসবু সরাব পাত্রে ঢেলে পান করছে। হঠাৎ সুন্দর তার দন্তরাজি মেলে হেসে বললো,—আইয়ে জনাব। সঙ্কোচ না করে অন্দরে এসে আসন গ্রহণ করুন।

মেয়েটি এমন এক দৃষ্টিতে তাকালো, লুতুফের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো।

হ্যাঁ, মেয়েটির চোখ দুটি অসামান্য সুন্দর। এ চোখের সঙ্গে তুলনা মেলে, এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই। দুটি সুরমা আঁকা মদির চোখ। চোখের মধ্যে রাজ্যের আমন্ত্রণ। চোখ দুটি যেন পুরুষকে ডাকবার জন্যে সৃষ্টি। পোড়াবার জন্যে তৈরি। হারিয়ে দেবার জন্যে দৃষ্টিশোভা মেলে ধরলো।

লুতুফ কেমন যেন নিজের সত্তা বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে গেল। তারপর নিজের অজান্তে গিয়ে মেঝের ওপর সেই তুষার ধবল মখমলের শয্যার রমণীটির মাথার কাছে বসে পড়লো।

মায়াবিনী সেই রাতের রহস্যলোকে জয় করলো একটি পুরুষের হৃদয়। ঘরের মধ্যে ইত্তাম্বুলের প্রাণমাতানো চিত্তোন্মাদকর সুগন্ধ। লোবানের বিচিত্র মধুর গন্ধ। তার ওপর গুলাব পুষ্পের সৌরভ। সব গন্ধকে ছাড়িয়ে লুতুফের নাকে আসতে লাগলো

সুরার জোয়ালো খুসবাই।

মেয়েটি শুয়ে শুয়ে হঠাৎ পানপাত্র পূর্ণ করে এগিয়ে দিল লুতুফের দিকে। মৃদু হেসে বললো,—নাও মুসাফির। বহুত আচ্ছা চিজ! পান করলে দিল্ মন সব বিলকুল বদল হয়ে যাবে। আমি কেন পান করি জানো? এই চিজ পান করলে ভুলে যাই বিলকুল সব জমানা। আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি, আর কি হব এই সব বড়ী বড়ী বাত আর মনে আসে না। মনে হয়, আমি সম্রাজ্ঞী, আমি সুলতানের হৃদয় জয় করে সমস্ত হিন্দুস্তানের দৌলত জয় করেছি। আমি এখন যা ভাববো, যা করবো, সব ভাল, সব আচ্ছা। তাই এই সরাব পান করে মরদের আশায় বহুদিন ধরে উপোসে দিন কাটাচ্ছি। কিন্তু এই এত বড় প্রাসাদে যে মরদের দুর্ভিক্ষ লেগেছে আগে ভাবিনি। আমি যখন আগে কাউকে চাইনি, তখন কত নওজোয়ান আমার কাছে এত্তেলা পাঠিয়েছে, আজ চাইছি, কেউ এদিকে ফিরে চায় না।

তখনও সেই রমণীর হাতে সুরাপাত্র ধরা ছিল, লুতুফ আলি কোন কথা না বলে তা গ্রহণ করলো। লুতুফ আলি সেই চাঁপাকলির মত আঙুলের বেষ্টনে ধরা পানপাত্রটি নিতে গিয়ে দেখলো, সেই হাতের আঙুলগুলি কাঁপছে। সে বিস্মিত হল এই ভেবে যে, তবে কি এই রমণী সাহস প্রকাশ করলেও মনে মনে দুর্বল, এর আগে তার জীবনে কোন পুরুষ আসে নি?

আস্তে আস্তে লুতুফের সবকিছু সয়ে আসছিল। এই পরিবেশ, এই রমণী, এই ঐশ্বর্য এই রোশনাই,—তারপর রাত্রের রহস্যময়তা সব মিলিয়ে তার চিত্তে অন্য এক ভাবাবেগ সৃষ্টি করলো। সে পানপাত্র শেষ করে এবার কথা বললো,—তুমি আমার কথা জানলে কেমন করে?

রমণী হঠাৎ হেসে বললো,—কেন তুমি কি তা জানো না? তারপর থেমে বললো, জানবেই বা কেমন করে? বাদশাহের এই যে অন্তঃপুর। এখানে যেমন সূর্যালোক ঢোকে না কিন্তু আর ঢোকে সবই। তোমরা অন্তঃপুরের বাইরে বসে যাই কর না কেন সব সংবাদই এখানে আসে। তেমনি করে তোমার সংবাদ আমি যোগাড় করেছি। তারপর খিল খিল করে হেসে বললো,—জানো, আমাকে এখানে সবাই ভয় করে বলে আমার শয্যায় কেউ আসতে চায় না। একবার বাদশাহকে হত্যা করতে গিয়েছিলাম, সেই থেকে সবারই ভয় আমার ওপর। আমি নাকি মরদকে ভোগ করে বধ করতে পারি।

লুতুফ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো,—কেন বাদশাহকে হত্যা করতে গিয়েছিলে?

হঠাৎ রমণীটি সেই চাদরটি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে বসলো। তারপর বললে,—কেন গিয়েছিলাম? বলতে বলতে তার চোখের তারা দুটি ঘুরতে লাগলো। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ কেমন যেন পরিবর্তন সৃষ্টি হল। কেমন যেন ভয়ঙ্কর। কেমন যেন তীক্ষ্ণ। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বললো,—ঐ দুশমন বাদশাহকে হত্যা করাই উচিত। যদি কখনও আবার সুযোগ পাই তাহলে জান বিলকুল নিয়ে নেবো। আমার জীবনটা বরবাদ করে দিল। দিল না সুখ, দিল না সোহাগ। নিয়ে এলো ধরে মা-বাপের

কাছ থেকে। নিয়ে এসে এই হারেমের শোভা করে রেখে দিল। একটি আওরতের কাছে এই আশাহীন জীবন কত বিশ্রী একবার ভাবতে পারো। যৌবনের অঙ্গার নিয়ে আমি এই হারেমে দগ্ধ হতে লাগলাম। আর বাদশাহ তাঁর চরিত্র নিয়ে:আমাকে এড়িয়ে থাকলো। তাই একদিন সুযোগ পেয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, বললাম তুমি আমাকে সোহাগ দাও, নতুবা তোমার জান্ আমি নিয়ে নেব।

কিন্তু ঐ মহম্মদ শাহ আমাকে সোহাগও দেয়নি, আর আমি তার জান্ও নিতে পারি নি।

রমণীটি চোখে জল লুকোলো না। দুটি গোলাপী গণ্ডবেয়ে মুক্তাবিন্দু নেমে এলো।

লুতুফ আলি সান্ত্বনা জানাতে গেল কিন্তু রমণীটি বাধা দিয়ে আবার বললো,—এখানেই শেষ হল না ঐ বাদশাহের শয়তানী। নাদীর শাহ প্রাসাদ অধিকার করবার পর একদিন আমার খাসবাঁদী সোনী এসে চুপি চুপি জানালো,—মালেকা, একটা কথা বলবো, অপরাধ নেবেন না! বাদশাহ নাদীর শাহকে আপনার কথা বলে আপনাকে তাঁর মহলে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে।

শুনেই আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠলো। কিন্তু ক্রোধ সৃষ্টি হলেও সে ক্রোধ প্রকাশের উপায় ছিল না। কি করবো? কি করে বাদশাহ ও নাদীর শাহের কবল থেকে উদ্ধার পাবো, এই কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়লাম।

সেদিন সোনীবাঁদী আমার অনেক বড় উপকার করেছিল। তাকে আমি কখনও জীবনে ভুলবো না। সে অন্তঃপুরের কোথায় মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, এবং সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে গুপ্তকক্ষ আছে, তার সন্ধান নিয়ে এসে জানালো। নাদীর শাহ পঞ্চান্ন দিন প্রাসাদে থেকে তাণ্ডব করে গেছে কিন্তু আমি সেই গুপ্তকক্ষের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রক্ষা করেছি। সোনী আরও কাজ করেছে, আমার শুধু আদেশ পালন করেনি, সে আমাকে এই পঞ্চান্ন দিন ধরে বসন ভূষণ, খানা সরাব প্রয়োজনীয় সবকিছু লুকিয়ে পরিবেশন করেছে। আর তার পরিবর্তে কি পুরস্কার পেয়েছে জানো? নাদীর শাহ চলে যাবার পর ঐ ভয়ঙ্কর বাদশাহ তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছে, আমাকে সে রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল কেন? সেই অপরাধে সোনীর পিঠে চাবুকের আঘাত পড়েছে।

তারপর সেই রমণী শ্বাস গ্রহণ করে বললো,—বাদশাহ আমাকে আর কিছু বলে না কিন্তু আমি জানি সে আমাকে ভয় করে? সে জানে, যদি তার কখনও মৃত্যু হয়, তাহলে আমার দ্বারাই হবে।

লুতুফ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো,—তুমি তাহলে জেনে শুনে এই বিশ্রী জীবন গ্রহণ করছো কেন?

রমণী কিছুক্ষণ একদৃষ্টে লুতুফের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর ভুরু কুঁচকে বললো,—বিশ্রী জীবন কাকে বলছো? বিশ্রী জীবন বলতে তোমাকে ধরে এনে আমি আমার যৌবনের উত্তাপ কমাতে চাইছি বলে? তারপর ম্লান হেসে বললো,—তুমি জানো নাম্নমুসাফির, এই বাদশাহের হারেমে এর চেয়ে কত ব্যভিচারের স্রোত প্রতিদিন

বয়। কত ঘৃণ্য জীবন বাদশাহের বেগমেরা গ্রহণ করেন। তুমি কি শুনেছ মুসাফির, —আওরত আওরতের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়? তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বললো, —থাক্ তোমার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়ে বীভৎসতা সৃষ্টি করতে চাই না।

লুতুফ বাধা দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললো,—না তুমি বলো বিবি; তোমাদের হারেম সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হচ্ছে।

রমণী এবার লজ্জায় মুখখানি রাঙা করে বললো,—না, সে বলতে পারবো না। কোন আওরত সেই ব্যভিচারের দৃশ্য নিজের মুখে বলতে পারে না।

এই সময় হঠাৎ প্রাসাদ তোরণ দ্বারে প্রহর ঘোষণার শব্দ উচ্চারিত হল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই রমণী খিলখিল করে হেসে নিজের দেহের আবরণ চাদরখানি ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝলসে উঠলো একটি আসামান্য নগ্ন শরীর। রমণীর রমণীয় ঐশ্বর্য উজ্জ্বল আলোর শিখায় কেমন যেন কুসুম সৌন্দর্য মেলে ধরলো। রক্তবর্ণের এক কামনা সেই রাতের রহস্যলোকে লুতুফ আলিকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো।

লুতুফ আলি পালাতে গিয়েও পালাতে পারলো না। সরে যেতে গিয়েও সরে যেতে পারলো না। কেমন যেন রমণীর সেই নগ্নসৌন্দর্য তাকে সবলে কাছে টেনে নিল।

রমণীটি তখন হাসছিল। তার চোখের তারায় সেই কামনামদির উত্তাপ। দেহের প্রতিটি রমণীয় খাঁজে কি নিদারুণ আকর্ষণের আমন্ত্রণ। বক্ষের সুউন্নত চূড়ায় রক্তগোলাপের ইশারা। রমণীর মনে কোন লজ্জা নেই। সে যেন নগ্ন হয়ে থাকবার জন্যেই জন্মেছে। তাই নগ্নরূপ নিয়ে সে কামনা উদ্দীপ্তস্বরে বললো,—মুসাফির, আর বিলম্ব কর না। তুমি আমার প্রথম পুরুষ। তুমি আমাকে প্রাণভরে সোহাগ দাও। আমার তৃষিত হৃদয়ের কামনার আগুন গ্রহণ করে আমার যৌবনের সোহাগ তুলে নাও। মুসাফির, আমি বুভুক্ষু। প্রভাত হওয়ার আর বেশী বিলম্ব নেই।

হঠাৎ সেই রমণী ছুটে গিয়ে উজ্জ্বল বতিকাগুলি নিভিয়ে দিল সমস্ত কক্ষটিতে অন্ধকার নেমে এল। নিঃসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুতুফ আলি অনুভব করলো দুখানি কোমল বাহু। বাহু দুটি এসে তার কণ্ঠটি সাপের মত জড়িয়ে ধরলো। তারপর একটি উত্তপ্ত অধরের সুধা স্পর্শ দিল তার বলিষ্ঠ অধরে। বলিষ্ঠ অধরে দুর্দমনীয় আকর্ষণ ছিল, তীব্র স্পর্শে তার অধর যুগল দগ্ধ করে দিতে লাগলো।

তারপর অন্ধকারেই সেই রমণী লুতুফ আলির বসনগুলি একটি করে উন্মোচন করে দিল। দুটি পুরুষ ও রমণী সেই অন্ধকার কক্ষ অন্ধকারের মাঝে অতলে তলিয়ে গেল।

রমণী বলেছিল প্রথম, তাই তার উন্মত্ততা সীমাহীন ছিল কিন্তু লুতুফ আলি সজাগ হয়ে প্রতিটি অনুভূতি সে পরিমাপ করলো। রমণীর কামনা উদ্দীপ্ত দেহের প্রবল আকর্ষণ সে সহ্য করতে পারলো না। সেই মুহূর্তে সে একবার ফতুমার কথা ভাবলো। ফতুমা কি এমনি ছিল? এমনি অস্থির হিংস্র, উন্মত্ত। প্রকৃতির তাড়নে বিক্ষুব্ধ চিত্ত।

সেই রমণী যেন ভুলে গেল সে রমণী। তার শক্তি পুরুষের শক্তির নিচে নিদ্রিত। পুরুষ ভোগ না করলে তার তৃপ্তির কোন উপায় নেই। পুরুষ সোহাগ না দিলে তার

সোহাগ লাভের কোন আশা নেই। সব ভুলে গিয়ে সেই যুবতী সুন্দরী অতৃপ্ত হৃদয় নিয়ে কেমন যেন নিজেই পুরুষের ভূমিকা গ্রহণ করলো। সে লুতুফকে দিয়ে ভোগ করিয়ে নিল।

তারপরের কথা আর লুতুফ আলির মনে নেই। রমণী সুধা পান করে বেঘোর মাতাল হয়ে কখন যে নিজের আস্তানায় ফিরে এল, সে তা জানে না। জ্ঞান যখন হল তখন প্রভাত নয়, দিনের সূর্য মধ্যগগনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শয্যায় শুয়ে অনুভব করলো সারা শরীরে কিসের যেন অবসাদ। তারপর গতরাত্রের কথা মনে আসতে বিস্ময়ে ভাবলো সে কি স্বপ্ন? কিন্তু নিজের দেহের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সে গতরাত্রে সুন্দর পোষাক পরেছিল। আর সেই পোষাকের জেবে আছে—এই ভেবে সে জেবের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটি রুমাল বের করে আনলো। সুন্দর একটি আতর মাখানো মসলিনের রুমাল। এবং দিয়েছিল সেই গতরাত্রের অভিসারিকা। তখন তার আর স্বপ্ন বলে কিছু ভ্রম হল না। গতরাত্রের সব ঘটনাই যে সত্যি এই ধারণা তার বদ্ধমূল হল! আর হতেই সে অবাক হয়ে গেল।

তবে কি গতরাত্রে কারুর দ্বারা বশীভূত হয়েছিল? বশীভূত না হলে সে ঐ জঘন্য কাজ করতে পারলো কেমন করে? জঘন্য কাজই সে বলবে। কারণ গতরাত্রে তার পুরুষ অহমিকা চূর্ণ হয়ে গেছে। আর চূর্ণ করেছে এক অপরিচিতা আওরত। আওরত তাকে দিয়ে যে কাজ করিয়ে নিয়েছে, এই দিনের আলোয় তার অনুভূতি বড় জঘন্য। হারেমের খুবসুরত অপ্সরীকে ভোগ করে মনে পুলক সঞ্চারই হওয়া উচিত। বাদশাহ যাদের ভোগ করেন, তাদেরই একজন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে তার জীবনে এসে গেছে। অন্য কেউ হলে হয়তো কত স্বপ্ন রচনা করে এতক্ষণে মনে সুখের প্রাসাদ সৃষ্টি করতো। কিন্তু তার মনে সে সব কিছু না, সম্পূর্ণ ঘৃণার ভাব।

যতই সে রাত্রের সেই সব কথা ভাবলো, তার মনে ঘৃণার ভাব জেগে উঠলো। আর হারেমের জেনানা সম্বন্ধে তার এক অন্য অভিজ্ঞতা সৃষ্টি হল। ওরা দুনিয়ার সেরা সুরত পেয়েছে বটে কিন্তু পায় নি সংযম। সংযমের মধ্যে যে নতুন মহব্বতের জন্ম হয়, ওদের তা জানা নেই। ওরা শুধু ব্যভিচারিণী হতে পারে, আর ব্যভিচার রচনা করে সুখ লাভ করতে চায়। কিন্তু সত্যিই কি ওরা সুখ পায়? গত রাত্রের রমণী বলল, তার জীবনে এই ভোগ প্রথম। হয়তো সত্যি। কিন্তু প্রথম ভোগের যে আনন্দ, সে আনন্দ তার মধ্যে কি সৃষ্টি হয়েছিল? বুভুক্ষু মনে যৌবনের কান্না ছিল সে কান্না কি এই সম্ভোগের মাঝে স্তব্ধ হল?

লুতুফ আলি কেমন যেন দার্শনিকের মত অনেক কথা ভাবলো। ভাবতে ভাবতে তার মধ্যে ঘৃণার সঞ্চার হল। আর অভিজ্ঞতা হল, প্রাসাদের বাদশাহ হারেমের সম্বন্ধে। জৌলুসের রোশনাই চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে এই প্রাসাদের হারেম শোভা করেছে, সে জৌলুস আসল জহরতের নয়। সব মেকী, সব ঝুট্। কঙ্কালের ওপর রক্তবর্ণের মসলিনের ঘেরাটোপ। সেই ঘেরাটোপ উন্মোচিত হলে বিশ্রী এক কঙ্কাল বেরিয়ে পড়ে। গতরাত্রে সে এক কঙ্কাল দেখে এসেছে। আর সে সেই কঙ্কালের

সঙ্গে ব্যভিচার করে এসেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সে দেখলো, বাদশাহের দরবারের জন্যে সকলে সাজগোজ করে চলে গেছে। শুধু অলিন্দের মাঝে মাঝে একটি করে রক্ষী উন্মুক্ত কৃপান হাতে পাহারা দিচ্ছে। লুতুফ আলি ভাবলো, দরবার যখন বসেছে তখন বাদশাহের কাছে গিয়ে গতরাত্রে ঘটনা বললে কেমন হয়? বাদশাহ যখন সেই রমণীকে শাস্তি দেবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছেন, তখন হেতু পেলেই বিচারের আসনে বসবেন। কিন্তু তারপরই লুতুফ ভাবলো, এতে হয়তো বিপরীত বিচারই শুরু হয়ে যাবে। হয়তো বাদশাহ সে রমণীর কোন বিচার না করে তারই বিচার শেষ করবেন। এবং বাদশাহের হারেমে প্রবেশ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেবেন।

সেই কথা ভেবে লুতুফ আলি আবার নিজের কক্ষে চলে এল। এখান থেকে আসমান অনেক দূর। দেখতে গেলে রক্ষীর হুকুম নিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে। বিনা হুকুমে কোন কাজ করলে কৈফিয়ত তলবের সম্ভাবনা বেশী। এখানে সন্দেহটা যেন খুব বেশী পরিমাণে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। সকলের চোখের তারাতেই সন্দেহের ছায়া। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সন্দেহ করে ছুরিকা শানায়, সেইজন্যে কারুর সঙ্গে কারুর দোস্তি নেই।

তাছাড়া বুলন্ত সিংহের ঘটনার পর বাদশাহের খাসমহলে যেন পাহারার ভিড় লেগে গেছে। বাদশাহ আর অন্যমনস্ক নয়, সর্বদা সতর্ক! প্রাণভয়ে সচেতন। এবং সেইজন্যে তিনি চতুর্গুণ পাহারার ব্যবস্থা করেছেন। এবং রক্ষীদের তিনি পরীক্ষা করে তবে পাহারায় নিযুক্ত করেন।

সারাদিনটা কেমন যেন তার অবসাদে কাটলো। অখণ্ড সময়, কোন কাজ নেই। বাদশাহ কেন যে তাকে কোন কাজ দিলেন না, সে এক রহস্য। অথচ সেই উন্মুক্ত দরবারে তিনি তাকে পার্শ্বচররূপে ঘোষণা করলেন। বড় উপাধিই তাকে দিয়েছেন। পুরস্কার। কিন্তু সেই পুরস্কারের পরবর্তী কার্যধারা কি এই? এই একটি জোয়ান মরদকে বসিয়ে রেখে তাকে অলস করে দেওয়া, একি পুরস্কারের পরিণাম? না, বাদশাহ এইভাবে তাকে শাস্তি দেবার জন্যে অলস জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। কিছুই বোঝবার উপায় নেই। কোন ভাবনারই কুল-কিনারা মেলে না। সব যেন মনে হয় ধোঁয়াটে।

বাদশাহের নিয়মকানুন তার জানা ছিল না বটে কিন্তু এই দীর্ঘদিন ধরে এখানে অলস জীবন যাপন করে লুতুফ আলি এইটুকু বুঝেছিল এখানে যত শৃঙ্খলা, ততই বিশৃঙ্খলা।

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া প্রাসাদের জাফরির ভেতর দিয়ে এসে সঙ্কেত করলে হঠাৎ লুতুফ আলির কাছে সেই রক্ষী এসে উপস্থিত হল।

তাকে দেখে লুতুফ আলি চমকে উঠলো। নিজেই বিস্মিত হয়ে বললো,—সিপাই, আবার কি সংবাদ নিয়ে এলে?

রক্ষী মৃদু হেসে চাপাস্বরে বললো,—সোনী বাঁদী পাঠিয়ে দিল আমাকে। আপ-

নাকে নিয়ে যাবার জন্তে বিবির আবার হুকুম হয়েছে। এবার একটু সকাল সকাল যেতে হবে। এই বলে রক্ষী আবার হাসলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে লুতুফের মনে হল, ঠাস্ করে চড় মারে এই নির্লজ্জ রক্ষীকে। এই লোকটি যত জঘন্য হুকুম নিয়ে তার কাছে আসছে। কিন্তু সে ভাব গোপন করে ক্ষুব্ধ হয়ে বললো,—আমি যাবো না। আমি কি তোমাদের ঐ বিবি গোলাম? হুকুম করলেই তামিল করতে হবে!

হুজুর, আপনি আমার ওপর গোসা করছেন। আমি কি করবো, হুকুম তামিল ছাড়া কিছুই করি না। আর যদি না করি তাহলে শাস্তির জন্তে তৈরী হতে হবে।

লুতুফ আলি সংযত হয়ে বললো,—বেশ, আমি শাস্তির জন্তে তৈরী। তবু ঐ বেস-রম আওরতের কাছে গিযে হুকুম তামিল করতে পারবো না।

রক্ষী লুতুফ আলির দিকে তাকিযে বললো,—তাহলে, আমি এইকথা গিয়ে বলি।

লুতুফ আলি মনে মনে একটু কেঁপে উঠলো কিন্তু গতরাত্রের কথা ভেবে আবার তার মন দৃঢ় হয়ে উঠলো। বিস্ময়ে সে মনে মনে বললো, - তাই বলে সে পুরুষ হয়ে একটি আওরতের হুকুমে নিজের পৌরুষত্ব বিলিযে দেবে? আর সেই আওরত তাকে দিযে ভোগের আনন্দ গ্রহণ করবে? না, না এর চেয়ে মৃত্যুও যে ভাল। একটি ফকিরের যে ইজ্জত আছে, তার নেই। ফকিরের অর্থ নেই বটে কিন্তু আছে চরিত্রের দৃঢ়তা। আর তার চরিত্রের দুর্বলতা আছে, অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই। তবু সে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করে রক্ষীর কথার জবাব দিল—তুমি গিযে বলবে, যেন সে অন্যপুরুষের আশা করে। আর যদি তার আদেশ অবমাননার জন্তে ক্রুদ্ধ হযে শাস্তির ব্যবস্থা করে, সেই শাস্তি গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত।

রক্ষী তবু বললো,—হুজুর আর একবার ভেবে দেখুন। এই আওরত খুব ভাস্কর স্বভাবের জেনানা। তিনি বাদশাহকে পর্যন্ত হত্যা করতে গিয়েছিলেন।

লুতুফ আলি হঠাৎ ধমক দিযে বললো, যা বলছি তুমি তাই কর। আমি বেশ সজ্ঞানেই তোমাকে ফিরে যেতে বলছি।

রক্ষী একান্ত অনুগতের মত করে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এসে বললো, - সোনীবাঁদী একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

কেন তার কি দরকার?

তারপর হঠাৎ সোনীর গতরাত্রের আচরণের কথা মনে পডতে লুতুফ আলি জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা বলতে পারো সিপাই—এই সোনীবাঁদী গতরাত্রে আমাকে তার আকৃতি গোপন করে লুকিয়ে থাকলো কেন? এই সোনীবাঁদীর সম্বন্ধে তার মনিব অনেক প্রশংসা আমার কাছে পেশ করেছিল।

রক্ষী ইতস্তত করে বললো,—আমি কিছু ঘটনা এ সম্বন্ধে জানি। কিন্তু আমি নোকর আদমী আছি হুজুর। আমার মুখ দিয়ে এসব কথা কি শোভা পাবে?

লুতুফ আলি সাহস দিয়ে বললো,—তুমি আমাকে চুপিচুপি বলো, আমি কাউকে না বললেই তো তোমার গুনাহ বাইরে প্রকাশ পাবে না।

হুজুর, সোনী বাঁদী ছিল না, ভাগ্যদোষে বাঁদী হয়েছে। সোনীর যা রূপ আছে, সে সমস্ত হারেমের খুঁজলে একটিও মিলবে না। সেই রূপই তার কাল হল। তাই বাঁদী হয়েও তার নিস্তার নেই। এই বিবির অনেক উপকার এই সোনী করেছে। অথচ একবার একটি মরদকে বিবির জন্যে সোনীর সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই মরদ সোনীকে দেখে ভুললো, সে কিছুতে ঐ বিবির কাছে গেল না। তখন বিবি গেল ক্ষিপ্ত হয়ে। সোনীকে হুকুক দিল তার রূপ পুড়িয়ে ফেলতে। কিংবা বিকৃত করতে যেমন উপায়ে হোক্।

সেই থেকে সোনী বোরখা ব্যবহার করে আসছে। আর আপনাকে নিয়ে যাবার সময় সে সাবধানতা অবলম্বন করেছিল।

লুতুফ আমি জিজ্ঞেস করলো,—এখন সোনী ডাকছে কেন ?

রক্ষী একটু থেমে বললো, আমি ঠিক জানি না। তবে মনে হয়, সে আপনাকে অনুরোধ করবে আসবার জন্যে। আপনি না গেলে যে তার লাঞ্ছনা, সে বোধহয় সেই কথাই বলবে।

সোনীর কি লাঞ্ছনা ?

বিবি সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে কামনার বহ্নিতে অস্থির হয়ে উঠবে, তার মরদ না পেলে সোনীর দেহে চাবুক চালাবে। কতদিন যে সোনী চাবুক খেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

লুতুফ অবাক হয়ে অস্ফুটস্বরে বললো,—কিন্তু সোনীর প্রশংসাই তো গতরাত্রে সেই বিবি করলো।

হুজুর, কাল আপনাকে পেয়ে সেই বিবি খুশি হয়েছিল বলে তাই প্রশংসা করেছে। কিন্তু আজ যদি তার চাহিদা না মেটে, তাহলে সোনীর অবস্থা কল্পনা করা যায় না।

লুতুফ একটু মনে মনে কি ভাবলো। সোনীর জন্যে তার মনে অনুশোচনা জাগলে কিন্তু সোনীর জন্যে তাকে আবার সেঞ বিবির কাছে যেতে হবে চিন্তা করে সে বেঁকে দাঁড়ালো। না, সেই কাল ভুজঙ্গিনী সর্পের ছোবল নিতে সে তার অভিসারে যাবে না। সোনী তার কে ? বাদশাহ হারেমে বহু ঘৃণ্যজীবনের স্রোত প্রবাহিত। তার জন্যে সে কি করবে ? সে বরং এখান থেকে পালাবে। না পালালে তার উদ্ধার নেই। এই আওরত যখন তাকে একবার আক্রমণ করেছে, পৃথিবীর কোন শক্তি নেই, তাকে এই প্রাসাদে শান্তিতে ধরে রাখে।

লুতুফ গম্ভীরস্বরে বললো,—রক্ষী, সোনীকে আমার আশ্বাস দান কর। এছাড়া আমার আর করবার কিছু নেই। তার লাঞ্ছনায় আমার মন হয়তো কাঁদবে কিন্তু তাই বলে সেই আওরতের আহ্বানকে মেনে নিয়ে ক্রীড়নক হতে পারবো না।

আর লুতুফ ভাবতে লাগলো, কি করে এই প্রাসাদের বেষ্টনী ছেড়ে সে পালাবে। রাত্রি যত গভীর হতে লাগলো, প্রাসাদের তোরণদ্বারে প্রহর ঘোষণা যত এগিয়ে চলতে লাগলো, লুতুফের মাথা ততো উত্তপ্ত হতে লাগলো। না পালালে প্রভাতেই হয়তো তার পরিণাম শুরু হবে। আর সে পরিণাম বড় ভীষণ।

এই রাত্রে পালাতে গেলে রাজপ্রাসাদের সিংহদরজা তাকে পেরোতে হবে। কিন্তু সিংহদরজা রাত্রের মত বন্ধ হয়ে গেছে। আর তাতার প্রহরীরা যেরকম করে পাহারা দেয়, তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশী। রাত্রে পালানো একেবারেই যাবে না। পালাতে গেলে দিনেই পালাতে হবে। দিনের বেলা প্রাসাদে অনেক বাইরের লোক আসে, তাদের সঙ্গে মিলে গিয়ে পালাতে হবে।

কিন্তু সে সময় পাবে কি?

লুতুফের অনুমানই সত্য।

পালানোর সময় সে পেল না। প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখী ডাকার মুহূর্তে একদল প্রহরী এসে তাকে শৃঙ্খলিত করে কয়েদ কক্ষে নিয়ে গেল। সে বিস্ময় প্রকাশ করতো কিন্তু করলো না। কারণ সে জানতো, এমনটি হবে। এই বাদশাহের রীতি। তাই অন্ধকার কারাকক্ষে গিয়ে সে মৃত্যুর অপেক্ষাই করতে লাগলো।

নিজের জীবনের ওপর তার দারুণ ধিক্কার এল। এর জন্যেই কি সে স্বদেশ ছেড়েছিল? এর জন্যেই কি আব্বাজানের সাবধানবাণী না শুনে হিন্দুস্তানে এসেছিল? আরবে থেকে সে শুনেছিল, হিন্দুস্তানের মাটিতে আছে দৌলত। সেখানে লোক অনাহারে থাকে না। সে অবশ্য হিন্দুস্তানে পা দিয়ে কোন দিনও অনাহারে থাকে নি। কিন্তু এখানে শুধু অনাহার নেই, আছে নানান ভয়ঙ্কর সমস্যা। সেই সমস্যাগুলি সমাধান করতে গিয়ে তার প্রাণ যায়। সর্বদা তাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হচ্ছে। মৃত্যু যেন হাতছানি দিয়ে তাকে সর্বদা ডাকছে।

এই প্রাসাদে প্রবেশ করে সে দু'বার কয়েদ হল। একবার অবশ্য বড় অসম্মানের কয়েদ হয়েছিল। সে বেইমানী করে বন্দী হয়ে কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সে-দিন মনে বড় অনুশোচনা জেগেছিল। অনুতাপের বহ্নি সমস্ত মন পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আজ মনে অনুতাপ নেই। বরং কারাকক্ষে বসে তার মনে বড় গর্ব হল। আজ এক রমণীকে অবজ্ঞা করে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে কারাকক্ষে এসেছে। মৃত্যুদণ্ড ছাড়া কি? বাদশাহ বিচার করে ঘাতকের কাছেই প্রেরণ করবেন। অপরাধের যে ফিরিস্তি খাতায় লেখা হবে, তার মধ্যে থাকবে 'এই বেতমিজ অপদার্থ আদমী কামোন্মত্ত হয়ে হারেমের কৌলিন্য নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল। সেইজন্যে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল।'

আচ্ছা, বাদশাহ এ শাস্তি দেবেন কেন? সেই আওরতের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বাদশাহ সেই আওরতের চক্রান্ত বিশ্বাস করবেন কেন? তিনি কি কালভুজঙ্গিনীর চরিত্রের নাড়ীনক্ষত্র জানেন না? জেনেও তাকেই সমর্থন করে একটি লোকের

জীবন নিয়ে নেবেন ?

লুতুফ আলি তারপর ভাবলো, হয়তো বাদশাহ অন্য আর এক কৌশলের ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁর আগোচর কিছু নেই। তিনি জেনে-শুনেই এই ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। কারণ পরিণতি তাঁর জানা বলেই তিনি চুপ করে সব লক্ষ্য করছিলেন। নাহলে এত তাড়াতাড়ি তাকে ধরবার জন্যে প্রহরীরা ছুটে এলো কেমন করে ? রাত-টুকু শেষ হতেই আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করল না বাদশাহের লোকেরা। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, বাদশাহ নিজের অক্ষমতায় ম্রিয়মাণ থাকলেও তাঁর শকুনের মত দুটি চোখ এদিকেই মেলা থাকে। আজ বাদশাহ তাকে শাস্তি দিয়ে সেই আওরতকে বুঝিয়ে দেবেন, তোমার পরমায়ু এবার শেষ হবার দিন আগত।

কিংবা এসব কিছুই হয়তো নয়। বাদশাহ তাকেই শাস্তি দেবার জন্যে জাল পেতেছেন। তার সেই বেইমানের শাস্তি। বিশ্বাসঘাতকতার শেষ পরিণাম। সেইজন্যে তিনি পার্শ্বচরের চাকরি দিয়ে প্রাসাদে অবস্থান করিয়েছেন। তারপর এক রমণীর সাথে ব্যভিচারের ফাঁদ সৃষ্টি করে আবার কারাগারে পুরে দিলেন। এবার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সেই বেইমানের শাস্তি সমাপ্ত করবেন। এই যদি হয়, তাহলে লুতুফ আলি বলতে চায়, এ সবের কোনই দরকার ছিল না। সে দোষ করেছে, সে আগেই জানতো। তাই শাস্তি সেই বুলন্ত সিংয়ের সঙ্গে দিলেই খুশি হত। অন্তত বুলন্ত সিং জেনে যেত, লুতুফ আলি অপরাধ করে মুক্তি ভোগ করে নি।

আবার ভাবলো, এসব কথা তার দুর্বলতা বলেই সে ভাবছে। আসলে বাদশাহ অতো ছোট নয়। এত তুচ্ছ জিনিষ ভাবার মত তার সময় নেই।

শুধু হারেমের তাতার প্রহরিনীর কাছ থেকে যে সংবাদ শুনেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে আদেশ প্রচার করেছেন। তার মনেও নেই কে এক লুতুফ আলি তাঁর পার্শ্বচর নিযুক্ত হয়ে প্রাসাদে অবস্থান করছে। আর তাকে শাস্তি দেবার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়ে আছেন।

অনেক কথাই লুতুফ আলি সেই অন্ধকার কারাকক্ষে বসে ভাবতে লাগলো।

অখণ্ড সময়। নির্জন কারাকক্ষ। আলোর লেশমাত্র নেই। দিনও রাত্রির কোন প্রতিফলনই এ কারাকক্ষে সৃষ্টি হয় না। তাই চোখ বুজে পাথরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুধু ভেবে চলল।

মাঝে মাঝে সান্ত্রী পাহারাদারদের ভারী পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগলো। আর কোন শব্দ নেই। নেই কোন প্রাসাদের অহেতুক কোলাহল। এখানে দারুণ স্তব্ধতা। মৃত্যুর মত স্তব্ধতা। যেন এই অন্ধকারে মৃত্যু ওৎ পেতে ছুরি শানিয়ে অপেক্ষায় আছে।

কে জানে এই কারাকক্ষে কত অপরাধীর কান্না জমা হয়ে আছে। কত মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অপরাধীর দীর্ঘশ্বাস। দিল্লীর প্রাসাদের অনেক অতীত ইতিহাস আছে। আছে সিংহাসন নিয়ে বহু উত্তরাধিকারীর হানাহানি। এই কারাকক্ষে হয়তো কত ভাবী বাদশাহ বন্দী হয়ে এক যুগ থেকেছেন। তাঁদের কাছে তার জীবনের কোন মূল্য

নেই। মূল্যহীন তার জীবন। তারা কেউ বাদশাহ হলে হয়তো হিন্দুস্তানের অন্য এক ইতিহাস তৈরী হত। কিন্তু তার মৃত্যুতে কোন ইতিহাস তৈরী হবে না। বধ্যভূমিতে ঘাতক নিয়ে গিয়ে কৃপাণের দ্বারা দেহ দ্বিখণ্ডিত করে দেবে। তারপর আর কি? দেহ নিঙড়ে শোণিত ধারায় রাঙা হবে বধ্যভূমির বিস্তৃত প্রাঙ্গণ।

তবু যেন শান্তি। তবু যেন তৃপ্তি। মৃত্যু তো একদিন হতোই আজ এ মৃত্যু যেন তার গর্বের মৃত্যু হল। আব্বাজান, আম্মাজান, ফতুমার মৃত্যু সে দেখেছে। কেমন যেন নির্যাতনের মৃত্যু তারা গ্রহণ করেছে, সে মৃত্যুতে কোন গর্ব নেই। একান্ত দৈন্যের মত মৃত্যু। কিন্তু তার মৃত্যুতে দারুণ এক তৃপ্তির আস্বাদন।

সে যদি এই মৃত্যুকে ভয় করে গত রাত্রে আবার সোনীর হাত ধরে সেই অভিসারিকা নাগিনীর কক্ষে গিয়ে ঢুকতো, আর তার ক্রীড়নক হয়ে তার আদেশে পুরুষের কর্ম সম্পাদন করতো, তাহলে তার এই গর্ব কোথায় থাকতো? আবার তার শরীরে ঘৃণার পঙ্কিল কর্দম লেগে সমস্ত শরীর মলিন করে দিত। তার চেয়ে এ বেশ ভালই হয়েছে। অন্তত পৌরুষটুকু রক্ষা পেয়েছে। আর সেইজন্যেই তার তৃপ্তি।

আচ্ছা, বাদশাহী হারেমের এই জেনানারা এমনি ব্যভিচারের জীবন যাপন করে কেন? সুলতান নিজে যাদের খোরপোষ দিয়ে বদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে ধরে রেখেছেন, তাদের সুন্দর জীবনের সৌন্দর্য ভোগের উৎসবে রাঙা না করে তাদের কুসুম সুরভিত দেহে অভিশাপ পরিয়ে দেন কেন? যদি হাজার রমণীদের উপভোগ করতে তিনি সমর্থ না হন, তবে হাজার হাজার রমণীকে হারেমে স্থান দিয়েছেন কেন? কেন এই বিলাস? কেন এই রাজসিকতা? এই রাজসিক বিলাসের যে পরিণতি ভয়ঙ্কর, একি তিনি জানেন না? না, পূর্বপুরুষদের নিয়মরক্ষার জন্যেই এই সহস্র আওরত পরিবৃত হারেম বজায় রেখে চলেছেন!

উত্তর কেউ দেবে না। উত্তর কেউই বোধহয় জানে না। জানে অনেকে, হারেমের মধ্যে ব্যভিচারের স্রোত বয়। শুধু বয়। এই বহমান স্রোত আবহমান কাল ধরে বয়ে আসছে বলে এও বাদশাহের খাতায় নিয়ম হয়ে গেছে। তাই বাদশাহী অন্তঃপুরের অন্তঃপুরিকারা রাত্রের প্রহরে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করলে কেউ কিছু মনে করে না। আর গোপনে পুরুষ প্রবেশ করে সেই অন্তঃপুরিকার শয্যায় শয়ন করলে লোকে তাকে নিয়ম বলেই মেনে নেয়। কোন পাপ মনে করে না। শুধু বাদশাহ জানতে পারলে পুরুষকে শাস্তি দেন, হারেমের রমণীকে দেন না। দেন তখনই যখন জানতে পারেন কোন রমণী বাইরের পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে। তখন তিনি সেই রমণীর শাস্তি রাজ্যের নিয়মে যা লেখা আছে, সেই নিয়ম শুধু পালন করেন। খাজাঞ্চীখানার খাতায় লেখা আছে, অন্যপুরুষের দ্বারা গর্ভবতী অন্তঃপুরিকার শাস্তি জীয়ন্ত কবর। নতুন কিছু নয়। এই নিয়ম আকবরের আমল থেকে চলে আসছে, সেই নিয়ম শুধু বাদশাহের আদেশে প্রহরীরা পালন করে। গর্ভবতী রমণীটিকে নগ্ন করে প্রাসাদের উত্তর পশ্চিম কোণে নিয়ে গিয়ে মাটি খুঁড়ে জীয়ন্ত কবর দিয়ে দেয়। তবে যদি কেউ গর্ভবতী হয়ে সংবাদ লুকিয়ে রাখতে পারে, তাহলে অন্যনিয়ম। একবার সন্তান ভূমিষ্ঠ

করতে পারলেই তার মুক্তি। তখন হারেম ত্যাগ করে যদি সে যেতে চায়, তাহলে তাকে কেউ বাধা দেবে না।

লুতুফ আলি এই ক'মাসে অনেক কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল। এ প্রাসাদ নয়, যেন আর একটি বিচিত্র দুনিয়া। এখানে যেমন দিনের সূর্য ওঠে রক্তবর্ণ মূর্তি নিয়ে। তেমনি রাত্রের অসামান্য চন্দ্রিমা জ্যোৎস্নার রূপালী ধারা নিয়ে ওঠে বিরাট এক রহস্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সেই রূপো রঙের রাত্রে যেমন অনেক গোপন অভিসার রচনা হয়, তেমনি দিনের সোনা রঙের আলোয় রক্ষী শাণিত কৃপাণ তুলে শাসায় -'খবরদার, এতটুকু বেচাল কারুর দেখলে আর রক্ষে নেই।' অদ্ভুত এক দুনিয়া এই দিল্লীর প্রাসাদের অভ্যন্তর ভাগ।

কত বিশৃঙ্খলা। একটি ক্ষুদ্র কীটের অনধিকার প্রবেশে কত রক্ষী শাণিত কৃপাণ নিয়ে তার পিছনে ছোটে অথচ কত গুপ্তচর ওদিকে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের ধরবার কোন তাড়া নেই।

লুতুফ একান্ত নির্জন কারাগারে বসে এই সব কথা ভাবতে লাগলো! বাধা দেবার কেউ ছিল না বলে তাই ভাবনার স্রোত সমানভাবে বয়ে চললো।

এরই মধ্যে দুবার তার খানা রক্ষী দিয়ে গেল। সে নিঃশব্দে তা দেখলো। শুধু একবার ভেবে নিল, দিনের ও রাত্রের আহার তার এসে গেল। সুতরাং এখন বাইরের সময়—রাত্রির মুহূর্ত। এবার সে নিঃশব্দে নিদ্রা যেতে পারে। আজ রাত্রে অন্তত সুলতান তার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচার করবেন না। সে নিশ্চিন্তে আজকের রাত্রিটা কাটিয়ে দিতে পারে। আচ্ছা, আজ সকালে কেন দরবারের সময় তার বিচার হল না? তবে কি তার বিচার অন্যভাবে হবে? না, একেবারে বিচার না করে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে খড়েগর নীচে ফেলবে?

এই যখন সে ভাবছে, এই সময় হঠাৎ সেই স্বল্পালোকিত কারাকক্ষের লৌহ দরজা ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গেল। কক্ষে একটি মৃদু আলোর বর্তিকা জ্বলে। খানা দেবার সময় রক্ষী দয়া করে দিয়ে গিয়েছিল। বোধ হয় রাত্রে মৃদু এই আলোর বর্তিকা দেওয়া—কারাকক্ষের নিয়ম।

সেই মৃদু আলোয় হঠাৎ একজন বোরখা পরিহিত রমণীকে আসতে দেখে সে বিস্মিত হয়ে গেল। কে?

রমণীটি একেবারে তার অতি কাছে এসে দাঁড়ালো।

চাপাস্বরে বললো,—আপনি মুক্তি চান মিঞাসাহেব!

মুক্তি! লুতুফ আলি অবাক বিস্ময়ে বললো,—কে তুমি?

বোরখার মধ্যে থেকে দুটি চোখ শুধু দেখা যাচ্ছে কিন্তু তাতে কিছুই অনুমান করা যায় না। রমণী বললো,—যেই হই আমি। আপনি যদি মুক্তি পেতে চান তাহলে আমাকে শীঘ্র অনুসরণ করুন।

তুমি কি সোনী বাঁদী?

হঠাৎ সেই রমণীটি চমকে উঠলো।

লুতুফ আলির লক্ষ্য এড়ালো না।

রমণী ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বললো,—আমি যেই হই, আপনি মুক্তি চান কিনা বলুন।

হঠাৎ লুতুফ দৃঢ়স্বরে বললো,—না, আমি মুক্তি চাই না।

কেন চান না ?

আমি কাপুরুষ নই।

জানেন, আপনার শাস্তি কি হবে ?

জানি না। তবে অনুমান করতে পারি।

আপনার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হবে।

লুতুফ আলি নিস্পৃহকণ্ঠে বললো,—সম্ভব। আমারও ধারণা তাই।

তাহলে আপনি পালাতে চাইছেন না কেন ?

কাপুরুষ নই বলে। তাছাড়া যে জন্যে আমাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, সে শাস্তি গর্বের বলে আমি মরতে চাই। অন্তত একটা দৃষ্টান্ত থেকে যাবে।

কিন্তু আপনার শাস্তি তো সে জন্যে দেওয়া হচ্ছে না। আপনার অন্য অপরাধ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সে মিথ্যে। অন্তত কেউ না জানুক, আমি তো জানি।

তাহলে মুক্তি চান না !

লুতুফ আলি দৃঢ়স্বরে বললো,—না।

তখন সেই রমণী কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে কাতর হয়ে বললো,—এরকম ছেলেমানুষি করবেন না ! এই মুক্তির জন্যে আজকে আপনার বিচার কত কষ্ট করে ঠেকিয়ে রেখেছি জানেন। আজকে বিচার হলে আর এতক্ষণ আপনি থাকতেন না। বধ্যভূমিতে আপনার দ্বিখণ্ডিত দেহ গড়াগড়ি যেত। শুধু আপনাকে মুক্ত করবো বলেই এই বিচার স্থগিত করে রেখেছি। আর এই বিচার স্থগিত করার জন্যে আমাকে মেহনত করতে হয়েছে কম নয়।

লুতুফ আলি পরমবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো,—কেন করলে ? আমার জন্যে তোমার কেন এই দরদ ?

তখন রমণী আবার চুপ করে গেল। তারপর বললো,—কেন করলাম, সে যদি বলতে পারতাম !

লুতুফ বললো,—তুমি যদি সেই গোপন কথা বলতে পারো, তাহলে আমি মুক্তি নিতে পারি ?

হঠাৎ রমণীটি অস্থির হয়ে বললো,—না না—সে কথা বলতে আমাকে অনুরোধ করবেন না, আমি তা বলতে পারবো না। আপনি দয়া করে এখান থেকে পালান, এই আমার অনুরোধ। আমি অনেক বিপদ বরণকরে আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

কিন্তু কেন ? লুতুফ আবার দৃঢ়স্বরে বললো,—আমার প্রাণের জন্যে তোমার মমতা কেন ?

(পরের খণ্ডে শেষ)

সরদানা

তখন সেই স্বল্প আলোয় রমণী বোরখাটি উন্মোচন করলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে লুতুফ চমকে উঠলো।

এক ঝলক জৌলুস স্বল্প আলোয় প্রতিফলিত হয়ে অন্ধকারকে বিদূরিত করলো। রূপ নয় যেন আগুনের দীপ্তি। রমণী নয় যেন একখণ্ড হীরার ঔজ্জ্বল্য। যৌবন নয় যেন স্নিগ্ধ এক কুসুম কোমলের অস্বাভাবিক প্রতিফলন। এ উপমাও ঠিক নয়। লুতুফ আলি তার অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে জহুরীর মত সেই রমণীর রূপের বিচার করলো। কিন্তু বিচার করতে পারলো না, চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল। মনে পড়লো সেই বিগত রাত্রের সেই আর এক সুন্দরী আওরতের কথা। যে নগ্নরূপ নিয়ে বিকৃত মনে কামনার বহ্নি জ্বালিয়ে তাকে কাছে টেনে নিয়েছিল। যার অস্বাভাবিক দীপ্তির পরশে তার শরীরে ঘৃণার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। সে নারী যদি এমনি করে তার ভোগের চাহিদা মেলে না দিত, তবে লুতুফ আলির মনের শ্রদ্ধা সে পেত। লুতুফ আলি তাকে দেখে যেমন দূর থেকে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল, তেমনি বিস্ময় নিয়েই সে থাকতো। বিস্ময় নিয়ে সে সেলাম জানিয়ে বাদশাহী হারামের অসামান্য জৌলুসের কথা ভাবতে ভাবতে প্রাসাদে তার কক্ষে ফিরে আসতো। কিন্তু তা সেই রমণী হতে দেয় নি। রমণীর রূপের তলায় যে কালো বর্ণের কামনা ছিল তা বাইরে বের হয়ে তাকে কালি-মালিপ্ত করেছিল।

যে রমণী সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে আরো সুন্দরী। রূপ তার আরো চোখের তৃপ্তি আনে। মনের মধ্যে আরো এক বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এমন রূপ বুঝি এই মর্ত্যালোকে সম্ভব নয়। কিন্তু হঠাৎ লুতুফ আলি চমকে উঠলে, একটি কথা স্মরণ হতে। তবে কি এ রমণী এসেছে, এই কারাকক্ষেই অভিসার রচনা করতে? তাকে দিয়ে শেষ আর এক অধ্যায় সৃষ্টি করে মৃত্যুর গহ্বরে পৌঁছে দেবে? কিন্তু কেন? এরা তাকে নিয়ে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কেন? বাদশাহের অন্তঃপুরের সব কটি সুন্দরী রমণী কি আজ ক্ষিপ্ত হয়ে তার পিছনে ধাবিত হয়েছে? আর তারা তাদের বহুদিনের সঞ্চিত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে দিয়ে নিবৃত্তি করিয়ে নিতে চায়? মনে হচ্ছে, সমস্ত প্রাসাদের কোথাও বুঝি একটিও মরদ নেই। সে এই এক জেনানা প্রাসাদে হঠাৎ অতর্কিতে এসে পড়েছে। আর তাকে দিয়ে তারা আদিম প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিয়ে নেবে বলে রেষারেষি করছে। এই রেষারেষিতে তার প্রাণ যায় যায়।

সেই স্বল্প আলোর দ্যুতিতে আবার তাকালো লুতুফ আলি সেই রহস্যময়ী রমণীর দিকে। রমণীর সজ্জায় কোন বাহার নেই। রূপের কোন জৌলুস সৃষ্টিতে তার মাথা-ব্যথা নেই। ঠিক বাঁদীর মত পোষাকে বাঁদীই হয়ে আছে। কিন্তু বাঁদী যে তার রূপ ঢেকে বাঁদী হতে পারে নি, বেগমের চেয়েও তার নিরাভরণের সৌন্দর্য আরো খোলতাই, আর চমকপ্রদ—সেটুকু যেন সগর্বে প্রকাশ হয়ে পড়ছে।

মনে পড়লো সেই রক্ষীর কথা। একবার এই সোনী বাঁদীকে এক পুরুষ দেখে সে সোনীর মনিবের কাছে যেতে চায়নি। কেন চায়নি, এই সামনেই তার প্রমাণ। হয়তো সোনীকে আগে দেখলে লুতুফ আলিও যেতে চাইতো না, বলতো—সোনী

তোমার কক্ষে আজকের অসহ রাত্রিটুকু আমাকে কাটাতে দাও ?

লুতুফ আলি তাই অস্ফুটস্বরে বললো,—তুমিই তাহলে সোনী ! সোনার মত বর্ণ নিয়ে এই বাদশাহী হারেমে দীনা হয়ে আছো !

সোনী নিম্নস্বরে উত্তর দিল,- হ্যাঁ আছি সাহেব। এ ছাড়া আমার উপায় নেই বলেই আছি।

কেন নেই সোনী ? তুমি তো ইচ্ছে করলে নিজের অসামান্য রূপের রোশনাই দিয়ে বাদশাহের মন কেড়ে নিতে পারতে ?

সোনী বিচলিত হয়ে বললো,---পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়। আমার নোকরী এখানে প্রতিজ্ঞা করার পর মিলেছে। সে প্রতিজ্ঞা আমি ভাঙতে পারবো না বলে রূপের ধ্বংসই চাই কিন্তু আল্লার অদ্ভুত ষড়যন্ত্র। রূপ আমার ধ্বংস না হয়ে আরো জৌলুস সৃষ্টি করে চলেছে। যৌবন আরো দাহ সৃষ্টি করে দেহের স্তরে স্তরে প্রদীপের শিখা জ্বেলেছে। আমি নিজেকে নিয়ে কি করবো বলতে পারি না মুসাফির।

হঠাৎ লুতুফ ভাবাবেগে বললো, - তুমি আমার সঙ্গে যাবে সোনী ? আমি তোমায় ভালবাসবো। মহব্বত দেবো। তোমার রূপের ইনাম দিয়ে আমি তোমায় আমার রাণী করবো।

না, না, না। এ কথা বলো না মুসাফির। এ লোভ আমাকে দেখিও না। আমি বাঁদী, আমি সামান্য। আমার জীবন দীনার জীবন। আমার প্রতিজ্ঞা তুমি এমনি করে ভেঙে দিও না। আমি বেগম মহিষীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলাম যে আমার রূপের মূল্য আমি চাইবো না। আমি বাঁদী হয়েই থাকবো। কিন্তু বেইমান মন আমার সে প্রতিজ্ঞা কিছুতেই রাখতে দেয় না।

লুতুফ আলির কেমন যেন সোনীকে এক মুহূর্তে ভাল লেগে যাচ্ছিল। এক রমণী তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, আর এক রমণীকে সে সর্বস্ব দিতে চাইছে, সে নেবে না। তাই সে দৃঢ়স্বরে বললো,—তবে আমাকে বাঁচাতে চাও কেন ?

সোনী একমুহূর্তের জন্যে একটু থমকে গেল, তারপর সলজ্জভঙ্গিতে বললো,—আওরত হয়ে সে কথা উচ্চারণ করতে সরম আসে। তবু বলছি, আমি তোমাকে ভালবাসি মুসাফির। ভালবাসি বলে আমি তোমাকে বাঁচাতে চাই। ফুলবিবির কাঙালপনা আমি জানি। সে না পাওয়ার জন্যে যেমন বিক্ষুব্ধ, আবার পাবার জন্যে সে উন্মত্ত। তুমি তার আহ্বানে সাড়া দাও নি বলে সে তোমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই এই অন্যায়কে প্রতিরোধ করবার জন্যেই আজকের বিচার স্থগিত রেখেছি। অনেক ক্লেশ গ্রহণ করে আমি বক্সীকে দিয়ে এই বিচার একদিনের জন্যে বন্ধ করেছি। আর তার বিনিময়ে আমাকে ইজ্জত দেবার অঙ্গীকার করতে হয়েছে। তবে ইজ্জত আমি দেবার আগে মৃত্যুবরণ করবো, তুমি শুধু পালিয়ে গেলে। অন্তত একজনকে বাঁচাতে পেরেছি, যাকে হঠাৎ ভালবেসে ফেলেছি, এই সান্ত্বনায় আজ মরতেও আমার দ্বিধা নেই।

তারপর সোনী আরো কাছে সরে এসে বললো,—হঠাৎ আমি কেন এমন আচরণ

করছি ভেবে হয়তো আশ্চর্য হচ্ছ ? কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমাকে এক লহমায় দেখে আমার মন উধাও হয়ে গেছে।

লুতুফ হঠাৎ কেমন যেন আশ্চর্য হযে অভিভূত হয়ে গেল। এ যে সেই ফতুমার প্রতিধ্বনি ! সোনীর মাঝে ফতুমা যেন ভর করে এসেছে। ফতুমাকে সে হারিয়েছে কিন্তু সোনী তার সামনে আছে। সোনীকে সে যদি এই বিশৃঙ্খল জায়গা থেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে, তাহলে তাকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধবার কথা ভাবা যায়। সোনীকে শাদী করলে জীবনে সুখ বৈ দুঃখ আসবে না। সোনীর মত আওরত পেলে যেন লাখো লাখো শাদী করা যায়। এমনি ধারণা হতে লুতুফ আলি দৃঢ়স্বরে বললো,—সোনী, যদি আমাকে বাঁচাতে চাও, তাহলে এই বাদশাহী প্রাসাদ ছেড়ে চল আমরা চ'লে যাই এখান থেকে বহুদূরে। যেখানে রাজ্য নেই, রাজপ্রাসাদ নেই, হারেমের বীভৎসরূপ সেখানে আমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। তেমনি এক সাধারণ লোকালয়ের মধ্যে দুজনে ঘর বেঁধে মহব্বতের আসমান রচনা করি।

সোনী হঠাৎ কানে হাত চাপা দিয়ে বললো,—না, না· এসব কথা বলো না। আমি শুনতে পারছি না। তুমি চলে যাও। তুমি চলে যাও মুসাফির। আমি তোমায় বিনীত অনুরোধ করছি, তুমি চলে যাও। বাইরে তোমার জন্যে আমার বিশ্বস্ত সিপাই আছে, সে তোমাকে গুপ্ত পথ দিয়ে একেবারে প্রাসাদের বাইরে নিয়ে যাবে, তারপর তোমার জন্যে সেখানে একটি অশ্ব নিয়ে লোক থাকবে, সেই অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে তুমি চলে যাবে।

সোনী এই কথা বলে অবরুদ্ধ অশ্রুকে রোধ করতে করতে দেহে আবার সেই বোরখার আবরণ ঢেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

আর লুতুফ আলি বাধা দিতে গিয়েও বাধা দিতে পারলো না। সোনী উল্কার মত আবার অন্তর্হিত হল। শুধু মাঝে সৃষ্টি করে গেল এক বিয়োগান্ত অধ্যায়। এক বিশ্রী আবহাওয়ার করুণ সংগীত শেষ হয়ে গেলে বাতাসে তার রেশ আ[illegible]া কান্নার হিমেল পরশ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তেমনি সেই কারাকক্ষে সোনী সৃষ্টি করে গেল অদ্ভুত এক হারানোর বেদনা। লুতুফ আলি হঠাৎ যেন মনের মাউকে হাতের কাছে পেয়েছিল, নাগালের বাইরে চলে যেতে তার সমস্ত দেহ কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল। সে সেই কারাকক্ষের মেঝের ওপর বসে পড়লো একান্ত অসহায়ের মত। একদিন এমনি হয়েছিল,—ফতুমা মরে গেলে। ফতুমার সেদিন চক্ষু দুটি বুজে এলে তার মনে যে অনুভূতি জেগেছিল, ঠিক বর্তমানে সেই অনুভূতি।

লুতুফ আলি সেই বেদনার মধ্যেও নিজের সত্তাকে কল্পনা করে ভাবতে চাইলো। হঠাৎ সে সোনীর ওপর এত আকর্ষণ অনুভব করলো কেন ? সোনী তার কে ? সোনীকে হঠাৎ অদ্ভুত সুন্দরী দেখে কি ভালবেসে ফেললো ? অবশ্য পুরুষ খুবসুরত আওরত দেখে ভালবাসার স্বর্গ রচনা করবে. এ স্বাভাবিক। তবে কি সেই তুচ্ছ চোখের দেখাকে সার্থক করবার জন্যেই তার এই আবেগ ? লুতুফ আলি নিজের মনেই ম্লান হাসলো। বয়স তার আজ এমন কিছু কম নয়। তার মনে তরুণ বয়সের কোন

ভাবোচ্ছ্বাস নেই। সুন্দরী দেখলেই তাকে ভালবাসার কল্পনা করতে হবে, এমনি ভাবালুতা আর নেই।

সোনীকে সে অন্য এক আসনে বসিয়ে অবচেতন মনে অনেক আগেই স্থান দিয়েছিল। রক্ষীর সেই সোনীর সম্বন্ধে বলা, তার আত্মত্যাগ, তার কাতরতা—কেমন যেন লুতুফ আলির মনে ভালবাসার স্বর্গরচনা করেছিল। 'জহুরী যেমন আসল হীরা দেখলে বহুমূল্য দিয়ে কিনতে চায়। তেমনি লুতুফ আলি আসল একটি মন পেয়ে সেই মনটি অধিকারের জন্যে লালায়িত হল। তাই কাছে পেয়ে আর ছাড়তে চাইলো না। বলে ফেললো,—আমি তোমাকে চাই।

লুতুফ বোঝাতে চাইলো সেই স্বর্গীয় প্রেমের কুসুম সুরভি তার মনের মধ্যে রক্তের চঞ্চলতা এনেছে। সে দুর্দমনীয় এক ভালবাসার আবেগ জয় করেছে শুধু এই বীভৎস হারেমে অন্য এক রমণীর দেখা পেয়ে। এক রমণী ফুলবিবি। অন্য রমণী তারই বাঁদী সোনী। সোনী ভাগ্যদোষে বাঁদী হয়েছে। না হলে ফুলবিবির মতো লাখো আওরত তারই বাঁদী হত। সেই ফুলবিবির কামোন্মত্ত স্বভাবের চেহারা দেখে তারই বিপরীতে সোনীকে তার হঠাৎ সব দিতে মন চাইলো। এবং দিতে চাইল সহজ মনে, কোন মদিরোচ্ছ্বাসের আবেগে নয়। কিন্তু সোনী তা নিল না। সোনীর যেন কোথায় বাধা আছে। সে বললো,—সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কেন সে ঐ প্রতিজ্ঞা করলো? যার অসামান্য রূপ আছে, যার সুরভিতে চতুর্দিক আমোদিত। সুন্দর মন আছে, যার পুষ্পসৌন্দর্যের কোমলতার ছোঁয়াচে সবার মন আপ্লুত। সেই রমণী কিসের ভয়ে এক অসম্ভব প্রতিজ্ঞা করলো? কেমন যেন রহস্যময় এক চরিত্রের মন সে পেতে চেয়েছিল।

লুতুফ আলি মনে করলো, সোনী একটি আসমানের নক্ষত্র। রমণীর রাত্রির অভিসার প্রহরে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে থাকে, আবার কোন সময় আঁধারের বুকে হারিয়ে যায়, কেউ জানে না। সেইরকমই একটি নক্ষত্র হঠাৎ এই কারাকক্ষে উজ্জ্বল এক আলো জ্বেলে চলে গেল। সে চলে গেল কিন্তু রেখে গেল যে স্মৃতি—সে স্মৃতি ভোলবার নয়। অবিস্মরণীয় সে স্মৃতি। লুতুফ আলি সোনীর জন্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো।

লুতুফ আলি মনে করলো, সোনী একটি আসমানের নক্ষত্র। রমণীয় রাত্রির অভিসার প্রহরে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে থাকে, আবার কোন সময় আঁধারের বুকে হারিয়ে যায়, কেউ জানে না। সেইরকমই একটি নক্ষত্র হঠাৎ এই কারাকক্ষে উজ্জ্বল এক আলো জ্বেলে চলে গেল। সে চলে গেল কিন্তু রেখে গেল যে স্মৃতি—সে স্মৃতি ভোলবার নয়। অবিস্মরণীয় সে স্মৃতি। লুতুফ আলি সোনীর জন্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলো।

এইসময় একজন রক্ষী এসে বললো,—হুজুর রাত্রি দু'প্রহর অতীত হয়েছে, এসময় না গেলে প্রাসাদের লোকজন উঠে পড়বে।

লুতুফ আলি তাকালো সেই রক্ষীর দিকে।

রক্ষী সেলাম করলো।

হঠাৎ লুতুফ আলির মনে ইচ্ছে জাগলো, সে যাবে না। কেন যাবে? মৃত্যু তো সে চেয়েছিল। মৃত্যুর জন্যেই তো সে এই কারাকক্ষে বসে অপেক্ষা করছিল। সে

গর্বের সঙ্গে জীবনটা উৎসর্গ করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল কিন্তু সোনী এসে তাকে আবার বাঁচবার মন্ত্র দিল। সে সোনীর উপস্থিতির সময় বাঁচবার আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়েছিল। কিন্তু এখন আর তার কোন বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা নেই। বরং মৃত্যুর মধ্যে যে আনন্দ, সেই আনন্দে সে নিজের দ্বিখণ্ডিত দেহের ভয়াবহ ছবি পরমসুখের ছবির মত দেখতে লাগল। আর সেইসময় রক্ষী এসে জানালো,—হুজুর রাত্রি শেষ হতে আর অধিক বিলম্ব নেই। অর্থাৎ পলায়ন না করলে আর পালানোর সময় পাওয়া যাবে না। লুতুফ আলি হঠাৎ সেই রক্ষীকে বললো,—তুমি যাও সিপাই, আমার যাবার কোন বাসনা নেই।

রক্ষী এই কয়েদীর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। পালানোর জন্যে কত কয়েদী মেহনত করে, আর এর পালানোর সব ব্যবস্থা তৈরী, অথচ পালাবে না। তাই অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললো,—হুজুর সোনীবিবি আপনাকে বাইরে পৌছে দেবার জন্যে আমার ওপর ভার দিয়ে গেছে।

লুতুফ গম্ভীর হয়ে বললো,—তুমি গিয়ে বল, তোমার কাজ তুমি করেছ, তিনি পালাতে রাজী হলেন না।

রক্ষী স্তব্ধ দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর সে ইতস্তত করে বললো,—হুজুর আপনার কাল গর্দান যাবে।

লুতুফ আলি হঠাৎ হেসে বললো,—আমি জানি সিপাই।

তখন রক্ষী আর কোন কথা না বলে সেলাম করে বিদায় নিয়ে গেল।

রক্ষী যখন কারাকক্ষের শেষপ্রান্তে চলে গেছে এমন সময় লুতুফ চিৎকার করে ডাকলো,—সিপাই আমি যাবো। আমি পালাবো। আমার বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা আছে। আমি মরতে চাই না। আমি এক সুন্দর আওরতের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবো। যে আমাকে পুনর্জন্ম দিল, তার জন্যে বাঁচবো।

নিস্তব্ধ কারাকক্ষের পাষাণ দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে সে চিৎকার মুখর হয়ে উঠলো।

রক্ষী এসে সামনে দাঁড়ালো। তার ঠোঁটের কোণে লুকানো হাসির ঝিলিক। লুতুফ দেখতে পেল না। পেলে হয়তো লজ্জিত হত। রক্ষী অবশ্য হেসেছিল কোন বড় কথা চিন্তা করে নয়, সে হেসেছিল লুতুফ আলির অবস্থা দেখে। যারা কয়েদ ঘর থেকে পালানোর জন্যে পাগল হয়, এ যে তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এই কথা ভেবেই হেসেছিল।

রক্ষী বললো,—চলুন হুজুর। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

লুতুফ আর কোন কথা বললো না। শুধু রক্ষীকে অনুসরণ করলো। ওরা বেরিয়ে এলো কারাকক্ষ থেকে।

তারপর অন্ধকার পথকে অতিক্রম করে অনেক সোপান অনেক গলির সীমানা পার হয়ে একসময় তারা এসে থামলো বাইরের মুক্ত আলোয়। কোথা দিয়ে, কত দুর্গম অচেনা পথকে তারা অতিক্রম করলো, লুতুফ আলি তা জানে না। লুতুফ আলি শুধু সেই বিশ্বস্ত অনুচরকে অনুসরণই করলো কিন্তু অনুচর জানে, সে কি করলো। দিল্লীর

কারাকক্ষ থেকে যখন কাউকে পালাতে সাহায্য করা হয়, তখন অনেক কৌশলের অবতারণা করা হয়। একে কঠিন অবরোধ। প্রহরার সুকঠিন ব্যূহ। সেই প্রহরার মাঝে সঙ্গীন হাতে প্রহরীর সতর্ক দৃষ্টি গোপন করে পালাতে যাওয়া মানেই মৃত্যুর আরো সম্মুখীন হওয়া।

রক্ষী কতবার থমকে গেল, কতবার পথ পরিবর্তন করলো। কত পঙ্কিল, দুর্গন্ধময় পথ দিয়ে লুতুফ আলিকে নিয়ে গেল। সে শুধু চাপাস্বরে বললো,—হুজুর, বহুত সামলে এ পথ দিয়ে আসবেন। এ পথে চলায় ভীষণ বিপদ।

রাতের শেষ প্রহরের থমথমে আকাশ। আকাশের মাথায় বল্লমে গাঁথা আলোর ফুলকি। যেন সারি সারি মশাল হাতে প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার সিংহাসনের দিকে সুলতান এগিয়ে যাবেন, তার জন্যে আলোর মালায় পথকে আলোকিত করা হয়েছে। তাই আলোছায়ার খেলা চলেছে রাতের শেষপ্রহরে।

ওরা যে পথ দিয়ে চলছিল, সে পথে নেই কোন কুসুম সুগন্ধের মাতোয়ারা। নেই কোন রাজসিক সম্ভাষণের তোড়জোড়। প্রাসাদের যত পঙ্কিল পথ হয়, যত গোপনতা সৃষ্টি করা যায়, তেমনি গুপ্তপথ দিয়েই তারা চলছিল।

তারও মধ্যে মাঝে মাঝে এক একটি অলিন্দ থেকে মুক্ত কৃপাণ হাতে রক্ষীর গুরু গম্ভীর স্বর শোনা যাচ্ছে, কে যায় উল্লুক ক্যা বাচ্চা? জান্ খতম কর দুঙ্গা।

কত কড়া প্রহরার ব্যবস্থা এই রাজপ্রাসাদের মধ্যে। একটি কীটের পর্যন্ত অনধিকার প্রবেশ নেই। তাদেরও হুকুম নিয়ে প্রবেশ করতে হবে।

একটি জায়গায় রক্ষী এসে চাপাস্বরে বললো,—হুজুর, সামনে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্রের চতুর্দিকে মহলের ছাদ। আমাদের এই উন্মুক্ত ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে যেতে হবে! সেখানে গেলে একটি ছ'মানুষ সমান প্রাচীর। সেই প্রাচীর টপকাতে পারলে অপর পারে যমুনার তীর।

এই যমুনার তীরে যেতে পারলে আর কোন ভয়ই নেই।

লুতুফ আলি চাপাস্বরে উত্তর দিল, কিন্তু যাবে কেমন করে সিপাই? যদি ধরা পড়ে যাই!

রক্ষী খুব সাহসী পুরুষ। সে অন্ধকারে হেসে বললো,—ডর করবেন না হুজুর। যদি ধরা পড়ে যান, তবে আমার জান্ দিয়ে আপনাকে বাঁচাবো? সোনী বিবিকে আমি বাত দিয়েছি, আপনার কোন বিপদই হতে দেব না। আপনি শুধু কোশিশ করে এই উন্মুক্ত ক্ষেত্রটির জমিনে শুয়ে হেঁটে পথটুকু পার হবেন।

এই বলে সিপাই আর বিলম্ব না করে হামাগুড়ি দেওয়ার মত নীচু হয়ে পথ অতিক্রম করতে লাগলো। লুতুফ উপায়ান্তর না দেখে তাই করলো।

একটি মাঠ। বেশ দীর্ঘ ময়দান। ময়দানটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। স্বল্প আলো-ছায়ার মধ্যে চাপা একটি গম্ভীর ভয়াবহতা সেই মাঠটিকে ঘিরে। এ মাঠটি প্রাসাদের মধ্যে কেন লুতুফ জানে না। কেমন যেন গা ছমছম করে। কেমন ত্রাসের ক্ষেত্র এই প্রেতলোকের মাঠ।

লুতুফ কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই সেই সিপাই ঘাসের জমিনে গড়াতে গড়াতে বললো,—হুজুর, ডর পাবেন না। এই উন্মুক্ত ক্ষেত্রটি একেবারে প্রাসাদের পিছন দিকে অবস্থিত। এখানে যে সব অপরাধীর শিরচ্ছেদ করা হয়, তাদেরই মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় এখানে শকুনের মেলা বসে। শকুনগুলো পরস্পর পরস্পরকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কিরকম ভাবে আক্রমণ করে তা বেশ দেখবার মত।

লুতুফ আলি শিউরে উঠে নিজের কথাটা ভাবলো। তাকে যদি উদ্ধার করা না হত কিংবা এখুনি যদি সে ধরা পড়ে যায় তাহলে তারও দেহটা এমনি ছিড়েখুঁড়ে শকুনেরা খাবে। সেই কথা মনে হতে সে একবার ঘাসের জমিনে মাথাটা নামিয়ে দিয়ে নিজেকে সামলে নিল। হায়, সোনী তার কত বড় উপকার করলো। এই বিরাট প্রাসাদের মাঝে আপন বলতে কেউ ছিল না, হঠাৎ এক মুহূর্তে এই রমণীটি তার কত আপন হয়ে গেল। ঠিক আপন জোরুর মত। তার চেয়েও বোধহয় আপন; জোরুও এক একসময় নিজের স্বার্থপরতা প্রকাশ করে কিন্তু সোনা তা করে নি। সোনী এক লহমায় সমস্ত মন কেড়ে নিয়ে সে তার মহব্বত দিয়ে গেল। সে দিয়ে গেল, নিলও না কিছু। এমন কি নিজের নিরাপত্তাটুকুও সে প্রার্থনা করলো না।

হঠাৎ লুতুফ আলি চাপাস্বরে সেই রক্ষীকে জিজ্ঞেস করলো,—সিপাই, তোমার সেই সোনীবিবি যে এই কাজ করলো; যখন বাদশাহ জানতে পারবেন, তখন তার অবস্থা কি হবে?

রক্ষী বললো,—জানতে পারলে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পুরস্কারই মিলবে না। তারপর বললো,—তবে সোনীবিবি মৃত্যুকে ভয় করে না। তাকে যতদিন থেকে জানি, তার মত সাহসিনী আওরত আর কোথাও দেখিনি তাই মৃত্যুর জন্যে তার কোন পরোয়া নেই। হয়তো বাদশাহ জানতে পারলে ঘাতকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। সোনীবিবি নিশ্চিন্তে চলে যাবে ঘাতকের কাছে। এতটুকু কাতরতা প্রকাশ করবে না।

হঠাৎ এই সময় ময়দানের একটি কোণ থেকে কে যেন গুরুগম্ভীর স্বরে চিৎকার করে উঠলো – উধার কৌন হ্যায় রে।

রক্ষী তাড়াতাড়ি লুতুফের হাত চেপে ধরলো। আপনি ঘাবড়াবেন না হুজুর। প্রহরী কাউকে দেখতে পায়নি। আসলে ঐ হুঙ্কার সে অন্ধকারে ছুঁড়ে দিয়ে শত্রুকে শাসাচ্ছে। যদি কেউ লুকিয়ে থাকে, তাহলে ঐ হুঙ্কারে ভয় পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে। তারপর রক্ষী হেসে বললো—তাছাড়া সারারাত্রি ধরে প্রহরা দিলে নিদ্ আসে সেই নিদকে তাড়াবার জন্যে এই চিৎকার।

লুতুফ আশ্বস্ত হয়ে আবার বুকে হাঁটতে লাগলো।

পথ অনেকদূর। এত পথ বুকে হাঁটা খুবই কষ্ট। কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে এ কষ্ট কিছু নয়। লুতুফ আলি এখন বাঁচবার আশায় সে কষ্টকে কষ্ট মনে করলো না। এখন সে বাঁচবার আশাই করছিল। যত সে মুক্তির দিকে এগিয়ে চলছে; তত যেন আনন্দ তার কণ্ঠের ওপর উঠে আসছে। কণ্ঠের ওপর যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আনন্দের রঙিন বন্যা।

এদিকে আসমানে প্রভাত আলোর পূর্বাভাস। সোনার বর্ণের রক্তাভাস কে যেন যুবতী রমণীর গণ্ডের ল'জ্জরক্তিম বর্ণের মত মেলে ধরেছে। পাখীদের কলরব দূর থেকে ভেসে আসছে। পেঁজা তুলোর মত মেঘের ঢেউ স্থানে স্থানে পর্বতের বিশালতা সৃষ্টি করেছে। এখন চাঁদের আলো নেই। যা আছে তা খুব পর্যাপ্ত নয়। মনে হয় চন্দ্রিমা অভিসারের পর দুর্বল হয়ে ম্লান মুখের শেষ প্রদীপ জেলে বিদায় নেবার জন্যে বসেছে। তার মুখ ম্লান হলেও জ্যোতি স্নিগ্ধ। সেই স্নিগ্ধ জ্যোতির শেষ রশ্মি নিয়ে সে সূর্যকে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছে।

ওরা বুকে হেঁটে সেই ছ'মানুষ সমান প্রাচীরের সামনে এসে গেল।

লুতুফ প্রাচীরের দীর্ঘতা দেখে বললো,—সিপাই, চলো ফিরে যাই। এ প্রাচীর টপকে যাওয়া মানুষের অসাধ্য।

রক্ষী একটু কৌতুক করবার জন্যে হেসে বললো,—প্রাচীরের ওপর হুজুর সাপ ছাড়া থাকে। বিষধর গোখুরো সাপ। তারা প্রাচীরের ওপর ওত পেতে শুয়ে থাকে, কেউ উঠলেই ছোবল দিয়ে শেষ করে দেয়।

লুতুফ শুনেই আঁতকে উঠে বললো,—না, না মুক্তি আমার দরকার নেই। সাপের ছোবল খাওয়ার চেয়ে ঘাতকের হাতে প্রাণ দেওয়া অনেক ভাল। চলো ফিরে যাই।

রক্ষী গম্ভীর হয়ে বললো,—এত পথ এসে তা আর সম্ভব নয়। এই প্রাচীর পার হতেই হবে। এই বলে সে তার জেব থেকে একটি রেশমী দড়ি বের করলো। বেশ মজবুত দড়ি। সেই দড়ির মুখে একটি ধারালো ছুঁচোলো যন্ত্র। যন্ত্রটি প্রাচীরের ওপর ছুঁড়ে দিল রক্ষী। সেই যন্ত্রটি প্রাচীরের ওপরে গিয়ে আটকে গেল।

রক্ষী বললো,—উঠে পড়ুন হুজুর। আর বিলম্ব করলে আলো ফুটে উঠবে।
লুতুফ মাথা নেড়ে বললো,—না, আমি উঠবো না সিপাই। যদি সাপ থাকে তাহলে ছোবল দেবে।

তখন রক্ষী বিরক্ত হয়ে বললো,—হুজুর সাপ থাকলে তা ঐ যন্ত্রের গায়ে লেগে শেষ হয়ে যেত। তবে মনে হচ্ছে, কিছু নেই। আমি আপনাকে দিল্লাগী করার জন্যে ঐ কথা বললাম। সাপ আগে থাকতো বর্তমানের বাদশাহ আর অতো কড়া পাহারার চেষ্টা করেন না।

তবু লুতুফ আলি সেই রেশমীর দড়ি ধরে উঠলো না দেখে সেই রক্ষী তর তর করে উঠে গেল। উঠে সে ওপর থেকে চিৎকার করে বললো,—হুজুর, আর বিলম্ব করবেন না। পূবদিকে তাকিয়ে দেখুন, দিনের রোশনাই আসমান জোড়া করে জেগে উঠছে।

লুতুফ আলি পূবদিকে তাকিয়ে দেখলো। সমস্ত আসমান জুড়ে লাল আবীর ছড়িয়ে গেছে। এখন আর রাত্রি বলা চলে না। বরং ভোরের পূর্বক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, দূর থেকে ভোরের মধুর সানাই। সানাই বাজছে, প্রাসাদ তোরণদ্বারে। প্রাসাদের যে ঘুম ভাঙছে, এ তারই পূর্বাভাস।

লুতুফ আলি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে সেই রেশমীর দড়ি ধরে প্রাচীরে উঠে গেল। দু

একবার পিছলে গেল সে, কিন্তু সিপাই ধরে তুলে নিল সেই বৃহৎ প্রাচীরে। সেই প্রাচীরের ওপর থেকে ওপাশে লুতুফ আলি তাকাতে তার চোখ জুড়িয়ে গেল।

ওপাশে যমুনার নিকশ কালো জল। তারই ওপরে সূর্যের প্রথম আলো পড়েছে। কে যেন সোনার মুকুট পরে যমুনার জলের ওপর বসে আছে। তার রূপের আলোয় সমস্ত কালো জলের বুক আলোকিত। শুধু আলো নয়, অপূর্ব এক সিঁদুর বর্ণের আলোর বিচ্ছুরণ। এদৃশ্য প্রাসাদের প্রতিটি মহলে কোথাও দেখা যায় নি। অথচ প্রাসাদে কত রোশনাই। কত হীরা, জহরৎ, চুনি, পান্নার জৌলুস।

লুতুফ মুক্তির কথা ভুলে গিয়ে সেই প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে প্রকৃতির রাজবৈভব দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে সে অভিভূত হয়ে গেল। বাদশাহের এত দৌলত, দৌলতের কতরকম রোশনাই দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ সাজান কিন্তু প্রকৃতির এই সৌন্দর্যের সঙ্গে তার তুলনা কোথায়? রাজপ্রাসাদের হারেমে কত আওরত। ফুলের মত তাদের বিকশিত যৌবন। যৌবনের রূপে সমস্ত অন্তঃপুর আলোকিত। লুতুফ আলি দুটি মাত্র আওরতকে দেখেছে, তাতেই তার অন্তঃপুর সম্বন্ধে ধারণা হয়ে গেছে। সুলতানের যেমন মণিমুক্তার প্রতি লোভ, মণিমুক্তার জৌলুসে চতুর্দিক উজ্জ্বল, তেমনি আওরতের জৌলুসে চতুর্দিক আলোকিত। বিলাসের এই সজীব উপকরণ বাদশাহের ইজ্জতের মত। সেই ইজ্জতের কাছে এই প্রকৃতির ইজ্জত যেন আরো সজীব, আরো প্রতিফলিত।

হঠাৎ সেই রক্ষী লুতুফ আলির চেতনা সঞ্চারের জন্যে দেহস্পর্শ করলো। হুজুর, রেশমী দড়ি নিচে নামিয়ে দিয়েছি, আপনি নেমে পড়ুন।

লুতুফ আলি কোন কথা না বলে সেই ঝুলন্ত দড়ি বেয়ে নিচে নেমে পড়লো। তারপর সেই রক্ষী নামল। ওরা নেমে সেই যমুনার পাড় দিয়ে কিছু দূর এলো। একটি লোক একটি অশ্ব নিয়ে অপেক্ষা করছিল। সে লুতুফ আলির হাতে অশ্বের লাগামটি ধরিয়ে দিয়ে এক বিরাট সেলাম পেশ করে অদৃশ্য হল।

পূর্বের রক্ষী তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে বললো,—হুজুর, এবার আমাকে বিদায় দিন।

লুতুফ কি যেন ভাবছিল, হঠাৎ চমকে উঠে বললো—ও তুমি যাবে, না! আচ্ছা বেশ যাও। তারপর হঠাৎ সম্বিৎ ফিরতে বললো,—তোমার কোন বিপদ হবে নাতো! কোন্ পথ দিয়ে যাবে?

রক্ষী সেলাম করে বললো,—এবার আমি সামনের সিংহদরজা দিয়ে যাবো হুজুর! রাত্রে বাইরে কোথায় ছিলে, কেউ সন্দেহ বশে জিজ্ঞাসা করলে?

রক্ষী হেসে বললো,—জিজ্ঞাসা করলে বানিয়ে বলবো। সে আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক চলে যাবো।

এই বলে রক্ষী পিছন পথ দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লুতুফ আর কিছু বললো না। তার তখন বড় বেশী সোনীকে মনে পড়ছিল। সোনী ঐ প্রাসাদের মধ্যে কোন্ অবস্থায় কে জানে? হয়তো তার দুষ্কার্য প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই ফুলবিবি তার ওপর চাবুক লাগিয়ে বাদশাহের দরবারে আর্জি পেশ করেছে। আর বাদশাহ্ তার শাসন তখতে বসে এক অবলা রমণীর প্রাণদণ্ডের খতিয়ান লিখছেন।

'সোনীর প্রাণদণ্ড হবে? না, না—আল্লা, মেরে খোদা, মেহেরবানী করে সোনী বিবির প্রাণ ফিরিয়ে দাও। সে লাঞ্ছনা বিহীনভাবে প্রাসাদে অবস্থান করুক। তার মত দয়াবতী রমণী বড় কম পাওয়া যায়। তার কোন ক্ষতি কর না। তার সঙ্গে আমার মাত্র অল্প সময়ের জন্যে দেখা কিন্তু এই ক্ষণিক মুহূর্ত যেন যুগযুগান্তরের পরিচয় সৃষ্টি করেছে। হে খোদা, সে যেন আমার জন্মজন্মান্তরের কেউ ছিল। না হলে তার জন্যে এই মনে এত করুণা সঞ্চার হচ্ছে কেন। কাতর হচ্ছে কেন মন?

লুতুফ আলি নিজের অগোচরে কখন সেই যমুনার ধারে বসে নামাজের ভঙ্গিতে খোদাকে ডাকতে শুরু করেছে, সে জানে না।

সম্মুখে রঙের নৈবেদ্য নিয়ে অমিতশালী সূর্যের প্রতিফলন। ধরিত্রী সেই রঙের অলঙ্কারে বিভূষিত। আসমান থেকে যমুনার জলেও তার ছায়া ক্রীড়া করে চলেছে।

লুতুফ আলি যেন সূর্যকে বন্দনা করতে বসেছে। এমনি সে সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে দুচোখে অশ্রুবিন্দু নিয়ে অশ্বপিঠে সওয়ার হয়ে যমুনার পার হতে ছুটে চললো।

মনটা কেমন যেন বিক্ষিপ্ত। কি যেন তার হয়েছে, কিছু জানে না। অথচ শূন্যতায় ভরে গেছে বিশাল বুকটি। এমন কেন হল? আজ সে মুক্ত। মুক্ত ঐ যমুনার মাথার ওপরে দিগন্তে উড়ে যাওয়া বিহঙ্গের মত। সোনী তাকে মুক্তি দিয়েছে। বিশাল এক দুর্ভাবনার মরুভূমি থেকে সে মুক্ত করে মুক্তির আনন্দ বুকে পুরে দিয়েছে। আর প্রাসাদের ঐ মেকী আড়ম্বরের মাঝে থাকতে না দিয়ে বের করে দিয়েছে বাইরে যে অনাবিল আনন্দ, স্নিগ্ধ বাতাসের পরশ তারই মাঝে। প্রাসাদে আছে গুলাবী আতরের গন্ধময় সুবাস। লোভাতুর আওরতের মেকী বিলাস যৌবন, তার ওপর ভাল খানা, সুকোমল শয্যা, সুখের অন্ন পাওয়ার আনন্দ থেকে সরিয়ে নিয়ে তাকে বিরাট আনন্দের মাঝে ছেড়ে দিয়েছে।

সোনীর ঋণ শোধ করবার মত নয়। অপরিশোধ্য সে ঋণ। তবু কেন শূন্যতা এই মনটি ঘিরে বিষাদের সৃষ্টি করলো?

লুতুফ আলি সেই অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে বহুদূর চলে গেল। চলে গেল একেবারে প্রাসাদের সীমানার বাইরে। যেখানে লোকালয় নেই, মনুষ্যের কলরব নেই, আছে

প্রকৃতির রাজপ্রাসাদ। প্রকৃতির লীলাভূমি। প্রকৃতি যৌবনের অসামান্য তনুশোভা কামনার রঙে রাঙা করে চোখের তৃপ্তি আনে, তেমনি এক কলকাকলি মুখর বিহঙ্গের মাঝে যমুনার কুলুকুলু স্রোতের কিনারে অশ্বের গতি মন্থর করে সে নেমে পড়লো।

অশ্বটিকে একটি বৃক্ষের পাশে বিশ্রামের জন্যে ছেড়ে দিয়ে সে গিয়ে বসলো যমুনার জলের ধার ঘেঁষে। অশ্বটিকে ত্যাগ করবার আগে হঠাৎ সে দেখতে পেল। অশ্বের লাগামের পাশে একটি পুঁটুলী। রেশমী বস্ত্রের পুঁটুলী। কৌতূহলী হয়ে তাড়াতাড়ি সে পুঁটুলী খুলে দেখলো তার মধ্যে বেশ কিছু মোহর ও খাদ্যদ্রব্য।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠলো দাতার মনের কথা ভেবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে আশ্চর্য হয়ে বসে পড়লো অসহায়ের মত সেই ঘাসের জমিনে।

ভালবাসলে কি এমনি করে পরিশোধ করতে হয়? এমনি করে নিঃশেষে সর্বস্ব সমর্পণ করে নিজের মনের তৃপ্তি আনতে হয়? এ যে চিন্তা করাও যায় না। সোনী দিল কিন্তু পেল কি? কিছু না। তবু দিল। তাকে মুক্তি দিল। তাকে আশ্রয় দিল। তাকে বেঁচে থাকা রসদ সঙ্গে দিয়ে বুঝিয়ে দিল মহব্বতের পিছনে কোন স্বার্থ-পরতার আকাঙ্ক্ষা নেই। ব্যভিচারের কোন প্রত্যাশা নেই। দেহকামনার কোন জৈবিক তাড়না নেই। প্রেমের রূপ স্বর্গীয় স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের রঙে আচ্ছাদিত, প্রেমের দান নিঃস্বার্থের মত শুধু দিয়েই যায়। গ্রহণ করে না কিছু। তাই বুঝি সোনী গ্রহণ করলো না কিছু। সে যদি সেদিন কারাকক্ষে বলতো, প্রিয়তম, আমার অধরে একটি রক্তরাগ চুম্বন এঁকে দাও। তাহলে কি লুতুফ আলি তা করতো? করতো না। বরং সে সেই ফুলবিবির মত ঘৃণা করে, অপমানে জর্জরিত করে সোনীকে তাড়িয়ে দিত। এবং সে ভাবতো, বাদশাহের অন্তঃপুরে শুধু শোভার জন্যে মেকী জৌলুসের সঙ্গে এই আওরত গুলিও আছে। সৌন্দর্য এদের বেহেস্তের সৌন্দর্যকেও হার মানায় কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বিবর্ণ সৌন্দর্য নিয়ে শুধু সুরার মাতোয়ারায় সুখের ক্ষণিক মুহূর্ত সৃষ্টি করে। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

যাহোক, সোনী তাকে উপলব্ধি দিল। সোনী তাকে বুঝিয়ে দিল বাদশাহের হারেমেও আছে আসল হীরার ঔজ্জ্বল্য।

ভুলতে চেয়ে সোনীর স্মৃতি আরো যেন জড়িয়ে গেল মনের পরতে পরতে, দেহের পাকে পাকে। আর সেইজন্যেই লুতুফ হঠাৎ ভাবলো, সোনীকে বাঁচানোর জন্যে তার কিছু করা উচিত।

লুতুফ আলি দুচোখ ভর্তি জল নিয়ে সোনীর কথা ভাবতে লাগলো। সোনীকে

বাঁচানোর জন্যে তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে এক হাহাকার উঠে এল, কিন্তু এখন সোনী কোথায় ?

সোনী হয়তো অনেক অপরাধের শাস্তি ভোগের জন্যে মৃত্যুদণ্ড পেয়ে ঘাতকের কাছে প্রেরিত হয়েছে। ঘাতক চোখে হিংস্র এক জিঘাংসার রক্ত নিয়ে সোনার চোখে কালো কাপড়ের ঢাকনা পরিয়ে দিয়েছে। খড়্গ দিয়ে দেহ দ্বিখণ্ডিত করবার আগে পাছে অপরাধীর আতঙ্ক সৃষ্টি হয়, সেইজন্যে মোগল শাসনের নিয়মে মাথার ওপর দিয়ে একটি টুপির মত কালো ঢাকনা কণ্ঠ পর্যন্ত নামিয়ে দেবার রীতি ছিল—সোনীর ঘাতক মাথার ওপর সেই কালো আচ্ছাদন নামিয়ে দিয়ে খড়্গ হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আর ওদিকে মৃত্যুপথযাত্রী সোনী মনে মনে উৎফুল্ল হয়ে আল্লার কাছে শেষ প্রার্থনা জ্ঞাপন করছে।

তার আর কোন আক্ষেপ নেই। রমণীর যে রত্ন পাওয়ার কামনা, সে রত্ন তার পাওয়া হয়ে গেছে। সেইজন্যে তার মৃত্যুতে কোন দুঃখ নেই, বরং তৃপ্তির আস্বাদন মনের দৃঢ়তা এনেছে। বেগম কর্ত্রীর প্রতিজ্ঞা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে, কোন মরদকে প্রলোভিত করে সে ব্যভিচারের স্রোত সৃষ্টি করে নি। তার রূপের অগ্নি-দীপ্তিতে পতঙ্গের মত দগ্ধ করে নি কাউকে। অথচ যা সে করেছে, তার এই সহস্র রমণীপরিবৃত অন্তঃপুরের কেউ পারে নি। সেইজন্যে সে অসাধ্যসাধন করে দৃঢ়তার মাঝে অজেয় হয়েছে, তাই মরতে তার ভয় নেই। মৃত্যুর মধ্যে যে আনন্দ আছে, সেই আনন্দ সে জয় করেছে।

ফুলবিবি সেই আনন্দের কিছু বোঝেন নি বলেই সোনীর কাছে কৃতজ্ঞ হয়েও নিজের স্বার্থের জন্যে সোনীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিলো। ফুলবিবি ভাবলো, তাঁর পুরুষকে কেড়ে নিয়ে সে নিজের অতৃপ্ত কামনারই আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে। কারাকক্ষের অন্ধকারে বন্দীর কাছ থেকে সোহাগ গ্রহণ করে তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

তাই সেদিন শেষরাত্রে যখন সে কারাকক্ষ থেকে ফিরে গেল, ফুলবিবি অত্যধিক সুরাপানে মত্ত হয়ে তারই প্রতীক্ষা করছিল। তারপর সে কক্ষে প্রবেশ করলে সেই বিবস্ত্র মানবী নিজের বীভৎস মনের নগ্নতা মেলে ধরে চিল চিৎকার করে ব্যঙ্গকণ্ঠে বললো,—সোনী বাঁদীর অভিসার শেষ হল ! কেমন তৃপ্তি পেলে অভিসারিকা রূপসী কলঙ্কিনী ?

সোনী বাঁদী এ তিরস্কারের কোন উত্তর দিল না। শুধু ম্লান হেসে বললো,—বিবিজী, আপনি শান্ত হোন্।

ফুলবিবি ক্ষিপ্ত হয়ে বললো,—জানিস্ এখুনি আমি হুকুম করলে তোর গর্দান যেতে পারে ?

তাই করুন বিবিজী। তবু এমনি বেসরম বাত্ আওড়াবেন না। ওতে আপনার সম্মান রক্ষা হয় না।

ফুলবিবি অপ্রকৃতস্থ ছিল। কিন্তু তার চেতনা ছিল, তার বাঁদী তারই মরদকে কেড়ে নিয়েছে। এ যে সহ্যাতীত। তাই অত্যাধিক ক্রোধে সবকিছু প্রবৃত্তিকে বশ

করে সে উঠে বসলো শয্যার ওপর। দেহে আজও কোন বসন ছিল না। ছিল না তার রমণী সম্ভ্রমের ওপর কোন আবরণের খোরাটোপ। তাই বসে তাড়াতাড়ি এক-খানি মূল্যবান বসনে নিজের তনুটি জড়িয়ে নিয়ে চিৎকার করে ডাকলো,—এই কে আছিস্ !

একটি তাতার প্রহরিণী ছুটে এসে সেলাম করে দাঁড়ালো।

ফুলবিবি হুকুম করলো,—একখানি মজবুত চাবুক নিয়ে আয়।

তাতার প্রহরিণী আবার সেলাম করে চলে গেল।

আর ফুলবিবি ক্রোধে ফুলতে ফুলতে দাঁতে দাঁত চেপে বললো—আমার অনেকদিনই উচিত ছিল তোর রূপের রোশনীর গতিরোধ করা কিন্তু একদিন তুই আমার ইজ্জত রক্ষা করেছিলি বলে আমি তা করিনি। সেইজন্যে তোর স্পর্ধা সীমা লঙ্ঘন করেছে। এবার দেখ্, সেই কৃতজ্ঞতার জবাব কেমনভাবে দিই।

এই বলে রাগে ফুলতে ফুলতে সমস্ত কক্ষময় ফুলবিবি পায়চারি করতে লাগলো।

আর যার কাছে আস্ফালন, সে কিন্তু নিরুদ্বেগ। তার মুখের ওপর কোন রেখা সৃষ্টি হল না। শুধু একবার চোখ বুজে চাবুকের যন্ত্রণাটা অনুভব করতে চাইলো। কিন্তু আরো যন্ত্রণা তার দেহের মধ্যে ছিল বলে সে সেই নতুন যন্ত্রণার বশীভূত হল না। তাই একান্ত নিরুদ্বেগে অনাগত ভবিষ্যতের জন্যে আশঙ্কাহীন চিত্তে অপেক্ষা করতে লাগলো।

প্রহরিণী চাবুক দিয়ে গেল। ফুলসম কোমলাঙ্গী সেই ফুলবিবি, উন্মত্ত এক বিকৃত আকৃতি নিয়ে চাবুক হাতে রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ করল। তারপর ছুটে গিয়ে সোনীর বসন মুক্ত করতে গেল। উদ্দেশ্য, নগ্ন করে চাবুক চালিয়ে রক্তাক্ত করবে মসৃণ গাত্রচর্ম। সোনীর রূপের ওপর কালো দাগের সৃষ্টি করে তার রূপের বিকৃতি আনবে।

কিন্তু সোনী বসন মুক্ত করতে না চেয়ে এবার বাধাদান করে বিরক্ত হয়ে বললো,—বিবিজী, তোমার মত আমি রমণী সম্ভ্রম হারিয়ে বসনমুক্ত হতে চাই না। যা কিছু করবার হয় কর, তবে বসন মুক্ত করতে পারবে না। আর তা হইলে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রোধ করবো!

ফুলবিবি থমকে গেল। সে বেশ ভালভাবেই জানতো, সে সোনীর চেয়ে দুর্বল। তাই দাঁতে দাঁত চেপে সোনীর বাধাকে প্রশ্রয় দিয়ে হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে চাবুক চালালো।

সমস্ত শক্তি দিয়ে চাবুকের এক বর্ষণে সোনীর মুখের একপাশ রক্তাক্ত হয়ে উঠলো। সোনী যন্ত্রণায় উঃ বলে মেঝের কার্পেটের ওপর বসে পড়লো।

ফুলবিবির তখনও আক্রোশ কমে নি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,—কেমন আমার মরদকে আর ছিনিয়ে নিবি? প্রথমবার তোকে ক্ষমা করেছিলাম কিন্তু তখনই আমার ভুল হয়েছিল। বেতমিজ কমবক্ত।

এবার ফুলবিবি এলোপাতাড়ি চাবুক চালাতে লাগলো। কেমন যেন নিজে জ্ঞানহারা হয়ে একটি নির্জীব পদার্থের ওপর আঘাত হেনে চললো। যদি একবার বাধা আসতো, কিংবা কেউ জোরে কেঁদে উঠতো তাহলে হয়তো সে নিবৃত্তি হত কিন্তু সে সব কিছু সৃষ্টি না হতে যতক্ষণ তার শরীরে শক্তি থাকলো সে শ্রম করে গেল তারপর যখন

শক্তি নিঃশেষিত হল, তখন সে চাবুক ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে আঘাত প্রাপ্ত বস্তুটির দিকে তাকিয়ে দেখলো।

দেখেই সে শিউরে উঠলো। খুন? আতঙ্কে তার কণ্ঠনালী শুখিয়ে গেল মুহূর্তে। সোনীর সুন্দর দেহের কামিজ ফেটে গিয়ে রক্ত বের হয়ে পড়েছে। মুখ, চোখ ভুরু, ঠোঁট—যে সমস্ত জায়গা অনাবৃত ছিল তা আর চেনা যায় না। রূপের ওপর যে কলঙ্কের ছাপ ফেলবার প্রত্যাশা ছিল, তা যেন সার্থক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে আতঙ্কিত হল এই ভেবে যে, রমণী হয়ে সে নিজের হাত কলুষিত করে খুন করলো! একদিন অবশ্য বাদশাহকে খুন করতে গিয়েছিল, তবে সে খুন এ খুনের মধ্যে পার্থক্য আছে। সে খুনের মধ্যে সার্থকতা ছিল, এ খুনের মধ্যে আছে নিজের দুর্বলতা। সে নিজের এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধ্বংস করতে চেয়েছে। কিন্তু সে যে কত বড় ভুল সে তা জানে। সোনী তাঁর বাঁদী হলেও সে বেশ ভালভাবে জানে, সোনীর রূপের কাছে শুধু নয়, মনের কাছেও সে ছোট। সোনীর মন উদার না হলে সেদিন সে ঐ দুশমন পারস্যাধিপতির কবল থেকে তার ইজ্জত রক্ষা করতো না। শুধু ইজ্জত রক্ষা করে নি, পক্কান্নদিন ধরে গোপনে ব্যবহার্য বস্তু প্রেরণ করে সে রমণীর আসল স্বভাব প্রকাশ করেছে।

ফুলবিবি কেমন যেন আবার দুর্বলতার অতলে ডুবে যাচ্ছিল কিন্তু নিজেই চিৎকার করে, না, না বলে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করলো,—সোনী যতটুকু উপকার করেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি করেছে। সুতরাং তার প্রতি কোন দুর্বলতা নয়। সে মরুক সে ধ্বংস হয়ে যাক্,—এই সে চায়।

তবু সন্দিগ্ধ হয়ে টলতে টলতে ফুলবিবি এগিয়ে গেল ফরাসের ওপর সোনীর নিস্পন্দ দেহের দিকে। গিয়ে তার বুকে হাত দিয়ে হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে কিনা পরীক্ষা করে নিশ্চিন্ত হল।

না, মরে নি। তার দুর্নাম প্রচারিত হয় নি। সোনী বেঁচে থেকে তাকে দুর্নামের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

সেই আওরত পরম নিশ্চিন্তে সোনীর নিস্পন্দ রক্তাক্ত দেহের দিকে তাকিয়ে আনন্দে এক পাত্র সুরা পান করলো।

আর সোনী তখন সমস্ত যন্ত্রণার উর্ধ্বে উঠে পরমশান্তির কোলে ফরাসের উপর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকলো।

রাত্রি এগিয়ে চললো শেষ রাগিণীর সুরে বীণাবাদন বাজাতে বাজাতে। কক্ষের স্বর্ণবাতিদানের আলোর বর্তিকা কাঁপতে কাঁপতে নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগলো।

ফুলবিবি ক'পাত্র আবার সুরা পান করে সতেজ হয়ে নিয়ে আবার ভাবতে লাগলো, তার এই প্রতিদ্বন্দ্বীর আরো কিছু শাস্তির ব্যবস্থা হওয়া দরকার। সে যদি এমনি করে তার পুরুষদের কেড়ে নেয়, তাহলে তার বাঁচবার পথ কোথায়?

ফুলবিবি সেই মুহূর্তে তাই আবার ভাবলো সোনীর জন্যে আরো চরমদণ্ড।

রমণী যে নিজের স্বার্থের জন্যে কত হিংস্র হতে পারে সেই মুহূর্তে ফুলবিবির চিন্তাই

তার প্রমাণ।

না, রমণী রমণীর প্রতিদ্বন্দ্বী হলে তাকে ক্ষমা করা যায় না। বিশেষ করে এ রমণী যখন পদমর্যাদায় তার চেয়ে ছোট। এই কথা ভেবে হিংস্রদৃষ্টিতে একবার সোনীর নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকিয়ে ফুলবিবি উঠে দাঁড়ালো। তারপর বসনভূষণ ঠিক করে নিয়ে কক্ষ থেকে বের হয়ে গেল।

ফুলবিবি স্খলিত বসনে সুরাসক্ত দেহে টলতে টলতে অন্তঃপুরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো। স্বল্পালোকিত গলি পথ দিয়ে চলতে চলতে বার বার তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। মাথাটা ঠিক মত বহন ক্ষমতা নিয়ে চলতে চাইছে না, অথচ তাকে যেতে হবে। না গেলে উপায় নেই। সুরাপান করে কোনদিন সে এমনি বাইরে বের হয় নি। সুরাপান করে সে এতদিন শয্যায় শুয়ে থেকেছে। আজই প্রথম সে বেরোল। আজ তার প্রথম অভিজ্ঞতা হল, মাদক দ্রব্য সেবন করে বাইরে বের হওয়া যায় না। কক্ষের আরাম কেদারায় শুয়ে থাকতে হয়।

তাই মাথাটা ঠিক করে পথ চলতে গিয়ে বার বার তাকে সচেতন হতে হল।

গলির মাঝে মাঝে মহলের দরজা। সেই দরজার সামনে উন্মুক্ত কৃপাণ হাতে তাতার প্রহরিণী পাহারা দিচ্ছে। রাতের শেষ প্রহরে তাদের চোখে ঘুম এসে গিয়েছিল, হঠাৎ অলিন্দের মর্মর হর্ম্যতলে পদশব্দ উত্থিত হতে তারা সচেতন হয়ে উঠলো। ঘুম তাদের ছুটে গেল। শত্রুর আশঙ্কায় তারা কৃপাণ হাতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো।

কিন্তু পরিচিত জেনানাকে এত রাত্রে বাইরে দেখে তারা নিশ্চিন্ত হল। তবু তারা ভাবলো, গোসলখানার পথ তো এদিকে নয়, তবে এই আওরত এতরাত্রে কোথায় যাচ্ছে ?

যাহোক, তাদের অবাক করে দিয়ে ফুলবিবি এগিয়ে চললো গলির পর গলি; অলিন্দের সোপান থেকে মহলের দালানের পাশ দিয়ে, উষ্ণজলের প্রস্রবণ টপকিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ অন্য একটি মহলে।

এই মহলে থাকেন বেগমকর্ত্রী। সুলতান মহম্মদ শাহের পেয়ারের বিবি। বয়েসে যেমন প্রৌঢ়া, স্বভাবে তেমনি দৃঢ়। মোগল রাজত্বের নিয়ম অনুযায়ী হারেমের কর্তৃত্ব ভার সুলতান প্রধানা বেগমকেই দিয়েছিলেন। পূর্বপুরুষের এই নিয়ম তিনি খণ্ডন করেন নি।

ফুলবিবি সেই বেগমকর্ত্রীর দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। একবার দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে ভাবলো, তারপর সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। দরজা দিয়ে ঢুকলেও আরো পথ। আরো দালান। আরো অনেক কক্ষ পেরিয়ে তারপর প্রধানা বেগমের আরাম কক্ষ।

ফুলবিবি একাই সেই পথকে অতিক্রম করে গিয়ে বেগমকর্ত্রীর আরাম কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়ালো।

বেগমকর্ত্রী একদিক দিয়ে খুব সুমিষ্ট স্বভাবের আওরত। ব্যবহারের মধ্যে এমন একটি মোলায়েম ভাব আছে; যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু সকলেই

জানে, এই ব্যবহারটুকুই বেগমকর্ত্রীর সবচেয়ে ধূর্ততা। কখন যে কাকে মোলায়েম ব্যবহার দান করে জল্লাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন, তার ঠিক নেই। তাই সকলেই এই মানুষটির কাছে আসতো ভয়ে ভয়ে। আর মনে মনে শঙ্কিত হতো কোন অপরাধ হয়ে যাচ্ছে কিনা।

ফুলবিবিও সে কথা জানতো। জানতো বেগমকর্ত্রীকে এই শেষরাত্রে বিরক্ত করার ফল শুভ নয়, তা জেনেও সে না এসে পারলো না। আর এও জানতো, সোনীর সম্বন্ধে বেগমকর্ত্রী সর্বদা রূঢ় হয়ে থাকতেন। কেমন যেন ক্ষমতার সবটাই প্রয়োগ করবার জন্যে উন্মুখ। আর তিনি ফুলবিবিকে বলেই দিয়েছিলেন, সোনীর যদি কোন বেয়াদপি দেখিস তুই, তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবি।

কেন যে এই বেগমকর্ত্রী সোনীর ওপর এত ক্রুদ্ধ, ফুলবিবি তা জানে না। ফুলবিবি সেইজন্যে সোনীকে বাঁচাবার জন্যে এতদিন ধরে সব বেয়াদপি গোপন করে রেখেছে। রেখেছে শুধু সোনীর কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে। না হলে কবে যে বেগমকর্ত্রী জ্ঞাত হয়ে শাস্তির যূপকাষ্ঠে তুলে দিতেন, কে জানে?

সেই ফুলবিবি আজকে বেগমকর্ত্রীর সাহায্য নিতে চললো। আর তাতেই বোঝা গেল, সোনীর চরমদণ্ড গ্রহণের সময় আসন্ন।

তবু ফুলবিবি সেই রাতে, শেষ প্রহরে আর একবার থমকে দাঁড়ালো। স্মরণ করলো চাবুকে জর্জরিত সেই সোনীর নিস্পন্দ রক্তাক্ত দেহ। কিন্তু স্মরণ হতেই তার প্রবৃত্তি আরো সজাগ হল। উন্মত্ত হল প্রতিহিংসার আক্রোশে। আর সেই আক্রোশেই সে আরাম কক্ষের সামনে গিয়ে সাহস সঞ্চয় করে প্রহরায় নিযুক্ত বাঁদীকে বললো,— আমি বেগমকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বাঁদী বিবির স্পর্ধা দেখে বিস্মিত হল। তারপর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো,—মালেকা বেগমকর্ত্রী এইমাত্র আরাম করতে গেলেন। এই সময় তাঁকে বিরক্ত করা কি উচিত হবে?

ফুলবিবির তখন ভালমন্দ বিচার করার মত মন ছিল না। দৃঢ়স্বরে বললো,—তাঁকে গিয়ে তুমি বলো, ফুল এসেছে সোনীর সম্বন্ধে কিছু সংবাদ দিতে।

বাঁদী তবু একটু সাহস প্রকাশ করে বললো,—প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। একটু অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হবে?

ফুলবিবি রাগ চড়ে গেল। তবু সংযতকণ্ঠে বললো,—হ্যাঁ, ক্ষতি হবে? তুমি সত্বর আমার বক্তব্য পেশ কর।

বাঁদী বললো,—তিনি যদি নিদ্ গিয়ে থাকেন।

ফুলবিবির আসল স্বভাব বের হয়ে পড়লো, সে একবার রক্তচক্ষুতে বাঁদীর দিকে তাকিয়ে নিজেই বেগম কর্ত্রীর আরাম কক্ষের দরজার পর্দা সরিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো।

ফুলবিবি কক্ষে ঢোকবার সময় শুনতে পেল, বাঁদী অসহিষ্ণুকণ্ঠে বলছে, বেগমসাহেবা আরাম করতে যাবার সময় বলে গেছেন কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে। শরীরটা বিশ্রাম না পেলে আর চলবে না। তাই আমি বাধা দিয়েছি। না হলে আমার কি?

ফুলবিবির কানে বাঁদীর সব কথাগুলিই গেল। কিন্তু সে তখন আরাম কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করেছে। করেই মেহগনি পালঙ্কের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় চোখ নত করলো। বেগমসাহেবা তাঁর সমস্ত বসন ইতস্তত চতুর্দিকে টান মেরে ফেলে দিয়ে নগ্ন অবস্থায় পালঙ্কের সুকোমল শয্যায় শুয়ে আছেন। কক্ষের মধ্যে স্বর্ণবাতিদানে স্বল্প আলোর বর্তিকা। সেই স্বল্প আলোতেও বেগমসাহেবার দুধসাদা নগ্ন শরীরটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ফুলবিবি প্রত্যহ সুরাপান করে নগ্ন হয়ে থাকে, নিজের নগ্নতায় এত লজ্জা করে না কিন্তু বেগমসাহেবার নগ্নরূপ দেখে তার বড় লজ্জা করতে লাগলো। সে কক্ষত্যাগ করবে বলে পিছন ফিরলো।

এই সময় বেগমসাহেবা চক্ষু উন্মীলন করে সুমিষ্টস্বরে ডাকলেন,—ফুলবিবি, চলে যাচ্ছিস্ কেন?

ফুলবিবির আর ফেরা হল না।

বেগমসাহেবা চোখ বুজে থাকলেও দেখতে পেয়েছিলেন ফুলবিবির অবস্থা। তাই মৃদু হেসে উঠে বসলেন পালঙ্কের ওপর। তারপর জড়িতস্বরে বললেন,—আমার কাছে এসে এই কেদারায় বস্।

ফুলবিবি ইতস্তত করে এগিয়ে গেল বেগমসাহেবার পালঙ্কের কাছে। সে স্পষ্ট দেখতে পেল একটি বিগতযৌবনা প্রৌঢ়ার নগ্নদেহ। বেগমসাহেবা উঠে বসেছিলেন বলে তাঁর বক্ষের স্তনযুগল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হল ফুলবিবি। বিগতযৌবন বেগম সাহেবার শিথিল দেহচর্মের ওপর দুটি কুসুম স্তম্ভ যেন সত্তপ্রাপ্ত কোন কুমারীর মত। রক্তাভ দুটি ডালিম ফল যেন শত আকর্ষণের আমন্ত্রণ নিয়ে উন্মুখ। ফুলবিবি আশ্চর্য হয়ে ভাবলো, এ কেমন করে সম্ভব? তারও যে বক্ষের উন্নত ভাব শিথিল হয়ে ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে নেমে চলেছে। পুরুষ তার জীবনে আসে নি সত্যি কথা, কিন্তু যখনই যন্ত্রণা হত, তখনই যে সে নিজে কতদিন বক্ষের কৌস্তভরত্নে নিজের হাতে স্পর্শ সৃষ্টি করেছে! যন্ত্রণা অবশ্য খুব কমেনি, পুরুষের স্পর্শে যে পুলকানন্দ, সে আনন্দ জাগে নি, তবে সুখানুভব হয়েছে। এই সান্ত্বনার আরামেই তাকে চুপ করে থাকতে হয়েছে। আবার কতদিন নিজের স্পর্শে তিক্ততা জেগেছে, সেদিন বাধ্য হয়ে সোনীকে ডেকেছে। সোনীকে অনুরোধ করেছে বক্ষের যৌবন প্রবাহে স্পর্শ দিতে, পেষণ দিতে, ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত করতে।

এমনি একদিন সোনী তাকে বিরক্ত হয়ে স্পর্শ দিচ্ছিল হঠাৎ সে আনন্দিত হয়ে তীব্র শিহরণের মাঝে সোনীর কামিজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

সোনী সর্পদংশনের মত চমকে উঠে তার হাত সরিয়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল।

সোনীটা সত্যি বড় এক বোকা। আনন্দের কোন আস্বাদন বোঝে না। কেমন যেন।

যাহোক্ তেমনি করেই তার বক্ষের উন্নতভাব শিথিল হয়ে গেছে এখন আর তার বক্ষ সৌন্দর্য দেখে নিজেরই ভাল লাগে না। তার যখন তরুণ বয়েসে এই অবস্থা, তখন এই প্রৌঢ়া বেগমসাহেবা কেমন করে এই ডালিমের মত বক্ষ স্তম্ভ সুন্দর করে ধরে

রাখলেন ?

ততক্ষণে বেগমসাহেবা জাফরানী রঙের একখানি মূল্যবান চাদর বুকের ওপর মেলে ধরেছেন।

ফুলবিবি আবার তাকাতে দেখলো বেগমযাহেবা নিজের লজ্জা ঢেকে মৃদু মৃদু হাসছেন, হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস্ করলেন,—ফুলবহিন, হঠাৎ এ রাত্রে তোর কি প্রয়োজন রে? আমার কাছে কি জন্যে এসেছিস্ ?

তখন ফুলবিবি সোনীর সম্বন্ধে আন্তোপান্ত সব বললো।

শুনতে শুনতে বেগমসাহেবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তাঁর চোখের মধ্যে ফুটে উঠলো দারুণ এক ক্রূর ভাব। ভেসে উঠলো বহুদিন আগের একটি দৃশ্য। ঐ সুলতান মহম্মদ শাহ, হ্যাঁ ঐ পুরুষই একদিন এই সোনীকে তার কাছে এনে দিয়ে বলেছিল,— কুলসম, হারেমে তো অনেক বালবাচ্চা মানুষ হচ্ছে, এটাকে তার মধ্যে রেখে বাঁচতে দিও। মেয়েটি বড় দুঃখী।

দুঃখী? সোনীর চেহারার দিকে তাকিয়ে বেগমসাহেবা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন। দুনিয়ায় আওরতের শরীরে আল্লা আরো কত রূপ দিতে পারেন, সেই কথাই এই মুহূর্তে ভেবেছিলেন। কিন্তু সুলতানের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গস্বরে বলেছিলেন,—একে কি ভাবী বেগমের মত মানুষ করবো ?

সুলতান সঙ্গে সঙ্গে আহত হয়ে বলেছিলেন,—এ কি বলছো কুলসম? যে বেটির মত। বেটি ছাড়া যাকে কিছু ভাবা যায় না। তার সম্বন্ধে এমনি বেসরম বাত উচ্চারণ কর না।

কিন্তু বেগমসাহেবা তবু সুলতানকে পরীক্ষা না করে ছাড়েন নি। বলেছিলেন,— তোমরা তো আওরত দেখলেই ভোগের প্রদীপ জ্বালাও। আর এ যখন বহুত সুরত নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে। সুলতানকে কি আমি আজকে দেখছি ?

সুলতান তখন সত্যি কথাটাই বেগমকে বললেন। উপায় নেই দেখেই বললেন। কুলসম, সোনী আমার বেটিই। তুমি জানো না, ওর আম্মাকে আমি একবার লাহোরে গিয়ে কদিনের জন্যে আপন করেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে কুলসম ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন,—তাহলে বেআইনি বিবি? ইয়া আল্লা। তোবা তোবা। এমন না হলে তোমরা সুলতান ?

তারপর কুলসমের মুখ কঠিন হয়ে উঠেছিল। কঠিন দৃঢ়তায় সম্রাজ্ঞীর মত। গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন,—বেশ, তোমার দুঃখী বেআইনি বেটিকে হারেমে স্থান দিতে পারি, তবে তার পরিচয় গোপন করে। কারণ তার পরিচয় গোপন না করলে আমাদের সম্ভ্রম হানি।

সুলতান বলছিলেন,—বেশ, এতে আমার কোন অসম্মতি নেই।

কিন্তু তাকে বাঁদীর জীবন যাপন করতে হবে।

সুলতান চমকে উঠেছিলেন,—একি বলছো কুলসম ?

হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। কুলসমের স্বর গম্ভীর শুনিয়েছিল।

তুমি কি উন্মত্ত হয়ে গেলে ? সামান্য একটি বাচ্চা লড়কী !

বাচ্চা ! কুলসমের চোখের মধ্যে কৌতুক নেচে উঠেছিল। তারপর শুভ্র দাঁতগুলি মেলে খিলখিল করে হেসে বলেছিল,—তোমার ঐ বেটির যৌবন সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে দেখেছ ? কত মরদের রক্তে সে আগুন জ্বালাতে পারে জানো ? তোমার যদি বেটি না হত, তাহলে তুমিও উন্মত্ত হতে। তবে বেআইনি বিবির যখন বেটি, তখন বেআইনিভাবে ভোগ করলেও কাজির বিচারে কোন গুনাহ্ হবে না। নিজের রক্তের জিনিস, নিজের সম্ভোগের মাঝে মিশিয়ে দিতে পারো !

হঠাৎ শান্তস্বভাবের সুলতানের কণ্ঠে তিরস্কারের ঝাঁজ ফুটে উঠেছিল,—কুলসম, বেসরম ! বেয়াদপিরও একটা সীমা আছে ?

কুলসম তাতে এতটুকু দমেননি। হেসে বলেছিলেন, ধমকাচ্ছো কেন ? সত্যি কথাটা শুনতে যখন ভাল লাগছে না, বলবো না। তা যাকৃগে, তোমার ঐ বেটি আমার হারেমে থাকবে বাঁদীর নোকরী নিয়ে। তুমি যদি এতে রাজী থাক, তাহলে অন্দরে খোজার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।

সুলতান অসহিষ্ণুকণ্ঠে বললেন,—এটা কি ভাল দেখাবে ? তাকে অসম্মান করলে খোদা আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন ?

তার উত্তরে কুলসম বললেন,—এতে অসম্মানের কি আছে ? তোমার বেটি অন্তঃপুরের মাঝে সম্রাজ্ঞীর মত জীবনযাপন করলেই তো লোকে জিজ্ঞেস করবে, এ কে ? তখন কি বলবো ? বলবো এ সুলতানের বেআইনি বিবির পয়দা ! তার চেয়ে আমার ব্যবস্থাটা মেনে নাও। তোমারও সম্মান, আমাদেরও ইজ্জত দুই বজায় থাকবে।

সুলতান তারপর নিস্পৃহকণ্ঠে বলেছিলেন,—বেশ, যেটা ভাল বোঝ কর। তবে দেখো, তার যেন কোন অযত্ন না হয়।

কুলসম সুলতানকে বুঝিয়েছিলেন এক, কিন্তু তার মনে মনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল। উদ্দেশ্য অবশ্য সন্তান আকাঙ্খার প্রতিহিংসা। কুলসম বেগমের কোন সন্তান পেটে আসে নি, আর সোনী ছিল কে এক অপরিচিতা অজ্ঞাত আওরতের গর্ভের সন্তান। আর সুলতান তাকে স্নেহ দিয়ে এনে হারেমে পুরলেন। এইসব কারণের জন্যে কুলসমের মনে সোনীর স্থান হল না। আর একটি সবচেয়ে প্রধান কারণ, সোনীর অসামান্য রূপ। যে রূপ হারেমের হীরা-জহরতের দ্যুতিকেও ম্লান করে। বেলোয়ারী ঝাড়ের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিকেও নিষ্প্রভ করে, সেই রূপ নিয়ে সোনী কুলসম বেগমের ঈর্ষা বর্ধিত করলো।

কুলসম বেগম সেইজন্যে সোনীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন,—বুঝলে, হারেমে থাকবে, কোন বেলেল্লাপনা করবে না। কোন মরদের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করবে না। আজ থেকে তুমি জানবে, তুমি বাঁদী। এখানকার বেগম, খুবসুরত জেনানা এদের খিদমৎ খাটবে। বিলাসিতা করবে না। আর রূপের ওপর ঢাকনা পরিয়ে রাখবে। যেন তোমার ঐ আগুনের মত রূপ দেখে কেউ ঈর্ষা প্রকাশ না করে। বাদশাহের দরবার যেমন শান্তির জায়গা, তেমনি হারেমের শান্তি বজায় রাখতে

আমাকে অনেক মেহনত করতে হবে। আমি এই হারেমের কর্ত্রী। আমার হাতে যে ক্ষমতা আছে, বাদশাহের হুকুম ছাড়াই তা মেলে ধরতে পারি। বাদশাহের কর্তব্যের চেয়ে আমার কর্তব্য অনেক বেশী। তাঁকে সমস্ত রাজ্যের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয় না, তিনি কর্মচারীর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। আমার কিন্তু তা হবার জো নেই। আমাকে সর্বদা কঠোর হস্তে এই হারেমের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়। তাই কারো কোন বেয়াদপি দেখলে আর তাকে ক্ষমা করি না, একেবারে ঘাতকের কাছে পাঠিয়ে দিই কারণ একের দোষে বহুজনের প্রাণহানি আমি পছন্দ করি না।

ভীরু চোখে সেদিন শুধু সোনী একমনে বেগমকর্ত্রী কুলসমের কথাগুলি শুনে গিয়েছিল। সেদিন বুঝতে পারে নি, এই বেগম কথাগুলি যেমন বলছেন, কাজ কতটুকু করবেন! কিন্তু পরে বুঝেছিল, ইনি কথার ওপর যত গুরুত্ব দেন কাজের সময় আরো কঠোর, আরো নির্মম। সে না মিশলে কেউ বিশ্বাস করবে না।

তারপর সোনী সেই হারেমে বাঁদী হয়েই ছিল। চোখে সুরমা নয়, ঠোঁটে তাম্বুল রঙ নয়, চুলের কোন বিন্যাস নেই, সাধারণ পোষাকে মুখের হাসিটুকু মনের মধ্যে লুকিয়ে তাকে শুধু হুকুমের দাসী হয়ে থাকতে হল। এমন বাঁদীদের মহলেই তার স্থান হল। বাঁদীর মত আহার, বাঁদীর মত পোষাক—কে বলবে এই মেয়েটি বাদশাহ মহম্মদ শাহের বেটি। নসীবের তার দোষ, না হলে শাহজাদী হয়ে তার স্থান হল শেষপর্যন্ত বাঁদীদের মহলে!

তবু তার রূপ চাপা থাকলো না। চোখে সুরমা নেই, গালে কোন বিলাস দ্রব্যের স্পর্শ নেই—তবু যেন অসামান্য সে রূপ। চোখের তীব্র জ্যোতিতে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক। ঠাণ্ডা মিষ্টি হাসিতে যেন নদীর কুলুকুলু তান। চুলের কোন বিলাস নেই কিন্তু তাতে কি হয়েছে, রেশম চুলের আপন বিন্যাসে আপনি যেন সংযত।

বাঁদীর যে পোষাক দেওয়া হত, তার চেয়েও নিকৃষ্ট পোষাক পেল সোনী, কারণ তার যে রূপ, সে রূপে ভাল চমকদারী পোষাক পরলে আরো খোলতাই হবে, সেই জন্যে তাকে অতি সাধারণ এক পোষাক দেওয়া হল এবং সেই পোষাক পরে সোনী রূপসী হল।

বাঁদী মহলে বাঁদীরা বললো,—বহিন তোমার এই রূপ! তুমি একবার সাহস করে বাদশাহের দৃষ্টিতে পড় না। দেখবে তোমার জমানা পালটে যাবে।

কিন্তু কে জানতো, বাদশাহ সোনীর কে?

বাদশাহ সেই সোনীকে হারেমে এনে পৌছে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এতেই হয়তো সোনীর ওপর কিছু কর্তব্য করা হল। তারপর আর কোন খবর রাখেন নি।

তারপর রাজ্যের ওপর দিয়ে অনেক উত্থান, পতন ঘটে গেছে। রাজ্য নয় তো, একটি সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্যের বহু ভাল মন্দের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের ভাল মন্দ নির্ধারিত। কেউ আমীর হয়েছে, কেউ ফকির। কেউ যুদ্ধে নিহত কেউ বা জয়লাভ করে পুরস্কৃত হল। কিন্তু হারেমের কোন নিয়মভঙ্গ হল না। সেখানে প্রত্যহ যেমন সূর্য

উঠতো, অস্ত যেত; চন্দ্র উঠতো, রহস্যময় রাত্রির কোলে বিলাসিনীরা সুরার পাত্র নিয়ে বসতেন, তেমনি তাঁরা বসলেন। তারপর সুরাপান করে কামনায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রবৃত্তির তাড়নায় নগ্ন হয়ে নৃত্য করলেন, তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে শয্যার কোলে ঢোলে পড়লেন।

এমনি সময় একদিন ফুলবিবি ফুলের মত তনুলাবণ্য নিয়ে হারেমে এসে উপস্থিত হল। সোনী আগে অনেকের খিদমৎ খাটতো। ফুলবিবি আসতে তার খাস বাঁদীতে পদোন্নতি হল। সেই থেকে সোনী ফুলবিবি সেবা করে আসছে।

এই হচ্ছে সোনীর জীবন।

ফুলবিবির সঙ্গের পরবর্তী কাহিনীটুকু সকলেই জানে। নাদীর শাহের আক্রমণ থেকে ফুলবিবিকে সোনী কেমন করে বাঁচিয়েছিল, তার ইতিহাস কম চমকপ্রদ নয়।

কিন্তু তা হলে কি হবে? বেইমানের জগতে বেইমানী করলেই যোগ্য সম্মান পাওয়া যায়। সোনী বেইমানী করে নি বলেই তার নির্যাতন।

সোনী এসেছে আজ কম দিন নয়। তবু বেগমকর্ত্রী সোনীকে মন থেকে কিছুতে মুছে দেন নি। বরং তার এতটুকু ক্ষতি করতে পারলেই তিনি যেন মনে মনে তৃপ্তি পান। এমন কি সোনী যদি কোন মারাত্মক অপরাধ করে, আর তার যদি তিনি প্রাণদণ্ড দিতে পারেন, তবেও বুঝি তাঁর আনন্দ হয়।

একবার তিনি চর মুখে শুনেছিলেন, একদিন রাত্রে ফুলবিবির জন্যে আনা মরদ সোনী ফুসলিয়ে নিজের মহলে নিয়ে গিয়েছিল।

পরদিন তিনি ফুলবিবিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সে এসে বললো,—কই নাতো! তেমন ধরনের কোন ঘটনা ঘটেনি!

বেগমকর্ত্রী ফুলবিবিকে আশ্বাস দিয়েছিলেন—বহিন, সরম করছিস্ কেন? তোর ঘরে মরদ আসবে না তো সোনীর ঘরে আসবে? আমাকে সাচ্ বাত বল, আমি কিছু বলবো না।

তবু ফুলবিবি সেদিন বলে নি। বলে নি বোধহয় সোনীকে ক্ষমা করবার জন্যে। কিংবা কৃতজ্ঞতা।

আজ সেই ফুলবিবির কাছ থেকে সোনীর বেয়াদপির সংবাদ পেয়ে তাঁর বহুদিনের সঞ্চিত প্রতিহিংসাটাই জ্বলে উঠলো। তিনি আর কোন চিন্তা না করে হাততালি দিয়ে বাঁদীকে ডাকলেন। বাঁদী এলে সরোষে হুকুম দিলেন,—এখুনি এই মুহূর্তে সোনী বাঁদীকে বন্দী করে জল্লাদের কাছে দিয়ে এস। তারপর প্রভাত হলেই মৃত্যু পরোয়াণা বাদশাহকে দিয়ে সই করিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

বাঁদী সেলাম করে চলে গেলে ফুলবিবি উঠে দাঁড়ালো।

ফুলবিবি নিজের কক্ষে চলে এল বিজয়িনীর মত। মনবাঞ্ছা তার পূর্ণ হল। তৃপ্তি এল মনে। আত্মপ্রসাদ লাভ করলো এই ভেবে, যে এত সহজে কাজটি সম্পন্ন হবে, সে ভাবেনি। তার মনের আক্রোশের চেয়ে যে বেগমকর্ত্রীর আক্রোশ বেশী, সে কথা ভেবেই সে বিস্মিত হল। ভাবলো,—সোনী বেগমসাহেবার কি ক্ষতি করেছে? যার জন্যে

এই চরমদণ্ড দিতে তাঁর এতটুকু হাত কাঁপলো না।

নিজের কক্ষে এসে দেখলো, সোনীর নিস্পন্দ রক্তাক্ত দেহ আর সেখানে পড়ে নেই। যে জায়গাটিতে পড়েছিল, সে জায়গাটি শূন্য হয়ে পড়ে আছে। হঠাৎ কেমন যেন ফুলবিবির মনে অনুশোচনা জাগলো। আহা, মেয়েটি তার অনেক উপকার করেছিল। তাকে এমন শাস্তি না দিলেই বোধ হয় ভাল হত। তাছাড়া মৃত্যু হলে তো তার যন্ত্রণা ফুরিয়ে গেল। সোনী মরে গিয়ে আর কি শাস্তি পেল? কিন্তু এখন আর উপায় নেই। বেগমকর্ত্রীর হাতে সোনীর জীবন চলে গেছে। সোনীকে এখন আর বাঁচাতে গেলেও সে পারবে না। বরং বেগমকর্ত্রী তাকেই এক শাস্তি দিয়ে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করবেন।

ক্লান্ত হয়ে ফুলবিবি মনের এক যাতনা নিয়ে নিজের শয্যার ওপর দেহকে গড়িয়ে দিল। তারপর চোখ বুজে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাবল,—তাদের আওরত জীবনের পরিণাম এমনি করে শেষ হয়ে যাবে। সোনী গেল। সেও হয়তো যাবে। বাদশাহের হারেম শূন্য করে সব আওরতই হয়তো একদিন ঘাতকের খড়্গের তলায় মাথা নামিয়ে দেবে।

তারপর প্রভাত হল।

সোনীর মৃত্যুর পরোয়ানায় বাদশাহ সীলমোহর করতে গিয়ে চমকে উঠলেন। মনে পড়ে গেল তাঁর সেই দুঃখী বেটিকে। যে এসে তার পরিচয় দিয়ে একটু আশ্রয় চেয়েছিল। যাকে নিজে একদিন হারেমের কর্ত্রীর হাতে সঁপে দিয়েছিলেন। যার মায়ের শেষ চিঠিতে ছিল শুধু কাতর প্রার্থনা। মৃত্যুর আগে যে শত অনুরোধ করে বাদশাহের কাছে একটি ভিক্ষা চেয়েছিল।

মহম্মদ শাহ সে চিঠির একটি কথাও ভোলেননি। মনের মধ্যে যেন রক্তে অঙ্কন সৃষ্টি করেছিল। বাদশাহের ব্যস্ত মনেও হঠাৎ সেই মৃতার চিঠিখানি কি এক ব্যথার বাহক হয়ে এসেছিল।

'আমি আপনার কাছে নিজের অধিকারের কোন দাবি করবো না। আপনি যে অনুগ্রহ করে আপনার সুন্দর স্পর্শ দিয়ে আমাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন তার জন্যে এই মৃত্যুর সময় পর্যন্ত আমি সহস্রবার কৃতজ্ঞ। শুধু একটি আমার সবিনয় অনুরোধ। কোন দাবি নয় প্রার্থনা। আপনার হারেমে তো অনেক বাঁদী আছে, আমার জীবনের সম্বল খোদার দান আমার সোনীকে যদি বাঁদীর মত হারেমে স্থান দেন, তাহলে আমি কবরে গিয়েও শান্তি পাব। সোনীর পিতৃ পরিচয়ে আপনাকে আমি লজ্জিত করবো না। আপনি বাদশাহ। তামাম হিন্দুস্তানের আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। কত লোকের জীবনমৃত্যুর দায়িত্ব নিয়ে আপনার অমূল্য জীবন ব্যয়িত হয়। সেই বাদশাহের কাছে একটি দীনা রমণীর শেষ প্রার্থনা। আমার সোনীকে পাঠালাম। তার প্রাণরক্ষা ও মৃত্যু সবই আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আরও একটি কথা—বেটি আমার আগুন জ্বালা রূপ পেয়েছে। জানি না, এ রূপ সে কোথা থেকে পেল? আমার যে রূপ পায়নি, আশা করি নিশ্চয় আপনি বুঝতে পারবেন। তবে যদি আপনার সঙ্গে তার

কোন সাদৃশ্য থাকে, নিজগুণে ক্ষমা করবেন।'

এই পত্রটি হাতে করেই সোনী এসে দরবারে দাঁড়িয়েছিল।

আর বাদশাহ পত্রটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে চলে গিয়েছিলেন পনেরো বছরের আগে লাহোরের এক আমীর আদমীর কক্ষে। হ্যাঁ, সোনীর আম্মা সেই রূপসী রমণীকে সেদিন দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন নি। গোপনে মিলেছিলেন প্রায় অনেক-বার। তারপর দিল্লী থেকে ডাক পড়তে তিনি চলে এসেছিলেন। আসবার সময় তাকে কোন আশ্বাস দানও করে আসেননি।

অবশ্য সেদিন আশ্বাস জানাবারও কিছু ছিল না। বাদশাহ এই বলে তিনি নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, তার অধিকৃত সাম্রাজ্যের যে কোন রমণীর অধিকার তাঁর। তিনি কোন অন্যায় করেন নি বলেই তাঁর মনে হয়েছিল।

তারপর এই পনের বছরের ব্যবধান।

কিন্তু পত্রখানি তাঁকে অদ্ভুত পরিবর্তন এনে দিল। তিনি আরক্তিম মুখে হঠাৎ সোনীর পিতৃত্ব স্বীকার করে বসলেন। নিয়ে গেলেন নিজে সঙ্গে করে সোনীকে বেগম-কর্ত্রীর কাছে। সোনীকে অন্তঃপুরে প্রতিষ্ঠা করে মনে তাঁর তৃপ্তি এসেছিল। তিনি ভেবেছিলেন,—অন্তত মেয়েটি তার যোগ্য আসন পেল।

কিন্তু তারপর আর তাকে মনে থাকে নি। ভুলে গিয়েছিলেন। এমনি কি নামটি পর্যন্ত স্মৃতির মণিকোটা থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ এতদিন পর মৃত্যুর পরোয়ানায় সীলমোহর করতে গিয়ে তিনি চমকে উঠলেন। একি এ যে সেই তাঁর বেটি। সেই লাহোরের বুলবুল সোনী।

আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিৎকার করে রক্ষীকে ডাকলেন, রক্ষী এলে বললেন,—জলদি উজির সাহেবকে এত্তেলা দাও।

উজির এলে বললেন,—খাঁসাহেব, এক বেগুণা আওরতের গর্দান যাচ্ছে। আপনি জলদি আমার ফরমাইস দিয়ে এই হুকুম বন্ধ করুন। বাদশাহের কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল।

উজির সমসের খাঁ হুকুমনামা নিয়ে বধ্যভূমিতে ছুটলেন। কিন্তু গিয়ে দেখলেন,—বাদশাহের হুকুমনামার আগেই সোনীর শিরচ্ছেদ হয়ে গেছে।

অবশ্য বেগমকর্ত্রীর ক্ষমতা ছিল, তিনি তাঁর অন্তঃপুরের জন্যে যে কোন আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন, তা বাদশাহের অজ্ঞাতবশে হতে পারে। শুধু পরে বাদশাহের দ্বারা সীলমোহর করিয়ে নিলেই হয়। বেগমকর্ত্রী সোনীর বেলা সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

উজির গিয়ে বাদশাহকে যথার্থ ঘটনা লিপিবদ্ধ করতে বাদশাহ কেমন যেন শিউরে উঠলেন। কেমন যেন তাঁর রাজসিক গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে গেল। তিনি ক্রুদ্ধভঙ্গিতে বললেন,—হারেমটা যদি এক তোপে উড়িয়ে দেওয়া যেত তাহলে রাজ্যে শান্তি বর্ধিত হত।

এই বলে তিনি এক মুহূর্ত আর অপেক্ষা করলেন না, খোজা প্রহরীকে বললেন,—অন্তঃপুরে গিয়ে বেগমকর্ত্রীকে সংবাদ দাও, বাদশাহ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।

খোজা সেলাম করে চলে গেলে তিনিও এগিয়ে চললেন অন্তঃপুরের দিকে। সোনীকে তিনি ভুলেছিলেন সত্যি কথা কিন্তু একবার তাঁর মনে পড়েছিল। একবার তিনি এই রমণীটির আচরণে চমকে উঠেছিলেন। গুলবানুর নাটকীয় ভঙ্গীতে আত্ম-হত্যার পর তাঁর মনের মধ্যে অসোয়াস্তির দংশন শুরু হয়েছিল সেই সময় তিনি সংবাদ পেলেন, ফুলবিবি নামে এক আওরতকে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশ্য নাদীর শাহ আরো খুবসুরত, আরো জোয়ানী আওরত চাইতে তিনি এই ফুলবিবিকে নির্বাচন করেছিলেন। কিন্তু সেই রমণীকে পাওয়া না যেতে নাদীর শাহ এগারোটি বাঁদীকে নগ্ন করে সর্বসমক্ষে তাদের ওপর সৈনিক দিয়ে পাশবিক অত্যাচার চালালেন। তারপর তাদের দ্বিখণ্ডিত দেহ বধ্যভূমির স্বল্প পরিসরে রক্তাক্ত বীভৎসতা নিয়ে শকুনের লোভ বর্ধিত করলো। তবু ফুলবিবির সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাদশাহ মনে মনে বিস্মিত হয়ে এই ফুলবিবির সন্ধানে লোক নিযুক্ত করেছিলেন। উদ্দেশ্য, নাদীর শাহের হাতে সঁপে দেওয়া নয়, হারেমের অবরোধ থেকে কি করে জেনানা পালিয়ে যায়, নিছক কৌতূহল চরিতার্থ করা। অনেক অনুসন্ধান করে তারপর খবর পেলেন, বাদশাহী প্রাসাদ ও অন্তঃপুরের মাঝামাঝি অংশের মাঝে একটি গুপ্ত প্রাচীরের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে। আর সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে গেলে অনেক দূরে যমুনার কিনারে ক'খানি সুপরিকল্পিত কক্ষ আছে, সেই কক্ষের মধ্যে আত্মগোপন করে যুগ যুগ ধরে বাস করলে কেউ তার সন্ধান পাবে না। যদি কেউ সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করে তাকে বন্দী করতে যায় তাহলে যমুনার ওপর দিয়ে নৌকো করে পালিয়ে যেতে পারে। বাদশাহ আরো শুনলেন, এই সুড়ঙ্গ ও সুড়ঙ্গের কক্ষগুলি সুপরিকল্পিত ভাবে তৈরী করিয়েছিলেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব। যখন তার মন বিক্ষিপ্ত হত তিনি লোকালয় পছন্দ করতেন না। খোদাকে ডাকবার জন্যে একাগ্রতা তাঁর প্রয়োজন হত তখন এই সুড়ঙ্গের মাঝে তিনি নেমে যেতেন। মন্ত্রীকে জানিয়ে যেতেন তিনি কয়েক দিনের জন্যে অন্যত্র যাচ্ছেন কিন্তু আসলে এই সুড়ঙ্গের কক্ষে নেমে এসে তিনি দৃষ্টি মেলে রাখতেন প্রাসাদের প্রতিটি মানুষের গতিবিধির ওপর। তার অবর্তমানে কে চাপাস্বরে ষড়যন্ত্রের দানা বাঁধছে কে বিদ্রোহী হবার জন্যে ছুরিকা শানিয়েছে; এই সব জেনে আবার উঠে আসতেন। খোদাকে নির্জনে ডাকা আর তাঁর হত না।

মহম্মদ শাহ বাদশাহ হবার অনেকদিন পর্যন্ত এই সুড়ঙ্গের খোঁজ পান নি। তিনি হঠাৎ এই সুড়ঙ্গের খোঁজ পেয়ে অনুসন্ধানকারীকে জিজ্ঞেস করলেন,- এই সুড়ঙ্গটি প্রথম কে আবিষ্কার করলো?

অনুসন্ধানকারী খোজা বললো,—হুজুর, অন্দরমহলের এক বাঁদী, তার নাম সোনী। ফুলবিবির খাস বাঁদী হয়ে আছে হুজুর। সেই এই সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে তার মনিবকে তার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে।

সোনী বাঁদী! মহম্মদ শাহ মনে মনে তাঁর সেই বেটিকে স্মরণ করলেন। তারও তো নাম, সোনী! তবে কি তাঁর সেই বেটি এই অসাধ্য সাধন করেছে? গর্বে তার

বুক ফুলে উঠলো। যে বেটির শরীরে তার রক্ত আছে, সে তো এমনি মহৎ কাজই করবে। তখনই তাঁর ইচ্ছে হয়েছিল—বেটিকে ডেকে বেশ ভাল একটি পুরস্কার দিয়ে দেন। কিন্তু তখন তিনি নিরুপায়। নাদীর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসে রাজত্ব করছেন। তিনি কাঠের পুতুলের মত তার হুকুম তালিম করছেন মাত্র। কোন স্বাধীনতা নেই তাঁর।

এই অবস্থায় তাঁর বেটি যে ক্ষমতা প্রকাশ করেছে, তিনি পিতা হয়ে অনেক ক্ষমতার বাদশাহ হয়েও তাঁর এক অংশ পারলেন না। একটি আওরতের ইজ্জত নয়, একটি কোহিনুরের জৌলুস। নাদীর শাহ তো অনেক আওরতের সম্ভ্রম নষ্ট করেছেন। একটি আওরত যদি পালিয়ে গিয়ে বাঁচলো, তাতেও যে অনেক সার্থকতা।

হঠাৎ তিনি সেই সোনীকে চাবুক লাগাবার হুকুম দিয়ে বসলেন। কেন যে বসলেন আজও তিনি জানেন না। তারপর তার মনে দারুণ কষ্ট এসেছিল। সোনীকে তাই তিনি তারপর থেকে ভোলেন নি। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন, এবার ক্ষমতার অধীশ্বর হলেই তিনি সোনীর একটি যোগ্য ব্যবস্থা করবেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় দু হাজারী মনসবদার জাফরের সঙ্গে তিনি সোনীর শাদী দেবেন।

কিন্তু সেদিন আর এল না। সোনীর কথা তিনি আবার বিস্মৃত হয়েছিলেন। দরবারের এত ঝামেলা. তারপর পারস্যাধিপতি চলে যাওয়ার পর সমস্ত অত্যাচারিত দিল্লীবাসীর জন্যে আহার বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে করতেই তাঁর সময় চলে গেল। তাছাড়া বিশৃঙ্খল এই রাজত্বকে আবার বশে আনতে গেলে মেহনতের দরকার। কিন্তু তাঁর মানসিক অবস্থা এমনি পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে যে নতুন করে তাঁর কিছু ভাবতে ভাল লাগছিল না।

তাই সোনীর হঠাৎ মৃত্যু পরোয়ান। হাতে পেয়ে দারুণভাবে চমকে উঠেছিলেন।

বেগমকর্ত্রী কুলসম প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তিনি জানতেন বাদশাহ তাঁর কাছে আসবেন। এবং এসে তাঁর বেটির মৃত্যুর জন্যে কৈফিয়ত চাইবে। তাই তিনি মনে কৈফিয়ত তৈরী করে বাদশাহের আসার অপেক্ষা করছিলেন।

এমনি সময়ে একটি তাতার রক্ষিণী ছুটে এসে সংবাদ দিয়ে গেল,—শাহনশাহ আপনার কক্ষে আসছেন বেগম সাহেবা!

কুলসম মাথা নেড়ে সায় দিয়ে নিজের পোষাকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। হাঁা, তিনি সোনীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হবার পর বহুদিনের প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ায় আর অধিক বেলা পর্যন্ত নিদ্রা যান নি। ফুলবিবি চলে যাবার পর তিনি স্নানাগারে গিয়ে বেশ ভাল করে সমস্ত দেহ ধৌত করেছেন। সমস্ত গ্লানি শরীর থেকে মুক্ত করে নিজের কক্ষে ফিরে এসে বাঁদীকে হুকুম দিয়েছেন, সবচেয়ে জমকালো পোসাকে তাঁকে ভূষিত করতে। এবং এমনভাবে তাঁকে বিলাস দ্রব্য দিয়ে সাজাতে—যে কখনও আর কেউ করে নি।

বাঁদী হুকুম তামিল করেছিল।

বয়েসের ভারে অবনত শিথিল যৌবনের ম্লান বহ্নি নিয়ে কুলসম বেগম কি এক

উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার জন্যে সম্রাজ্ঞীর মত, অভিসারিকার মত সাজ করে অলিন্দের সামনে দাঁড়িয়ে রক্তবর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বিগত দিনের অনেক সুখ দুঃখের ছবি তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠলো। তিনি বাদশাহের কাছ থেকে সন্তান চেয়ে বিফল হয়ে এক মরদকে একদিন তাঁর কক্ষে নিয়ে এসেছিলেন। জৈবিক ক্ষুধা চরিতার্থ করবার জন্যে আনেন নি, এনেছিলেন একটি সন্তানের জন্যে। অন্তত একটি সন্তান তাঁর গর্ভে এলে।তিনি বাদশাহের সন্তান বলে প্রচারিত করবেন।

কিন্তু কেমন করে যেন, বাদশাহ সেই সংবাদ রাত্রিবেলাতেই পেয়ে গেলেন। আর তার পরবর্তী ঘটনা বড় মর্মন্তুদ। রক্ষী সিপাই এসে সেই মরদকে বন্দী করে নিয়ে চলে গেল আর তার শেষ যবনিকা পড়লো ঘাতকের একটি মাত্র আঘাতে। সেই থেকে কুলসম বাদশাহকে কিছুতে ক্ষমা করতে পারেন না। প্রতিশোধের আশায় শুধু অন্বেষণ করে চলেছেন। একবার তিনি উত্তরাধিকারী পুত্র আহম্মদ শাহের ওপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর ষড়যন্ত্র সফল হয় নি। আহম্মদ শাহ নিজেই সেই ষড়যন্ত্র ভেঙে নিজের পথ করে নিয়েছিল। তাই তিনি সুযোগের সন্ধানের অপেক্ষা করেছিলেন। বহুদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহের কলিজায় এই সোনীর আসন ছিল বলে তিনি শয়তানের মত ওত পেতে ছিলেন। এই সোনীকে সরাতে পারলে যে সেই প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যেমনই তিনি ফুলবিবির প্রতিহিংসা নিজের প্রতিহিংসা মনে করে সোনীকে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিয়ে দিলেন।

তারপর আবার বাদশাহের অপেক্ষায় নিজেকে তৈরী করলেন। মনে মনে বললেন, —বাদশাহ এসে কৈফিয়ত চাইলে, তিনিও বাদশাহকে জিজ্ঞেস করবেন,—আপনি কেন আমার সেই মরদকে ঘাতকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন? কৈফিয়ৎ যদি তলব করেন, তাহলে আমার কৈফিয়তের উত্তর আগে পেশ করবেন। আমিও তো সন্তানের জন্যে বুভুক্ষু। আপনার সন্তানের বেদনা যদি উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে আমার সন্তান না পাওয়ার বেদনা উপলব্ধি করবেন। আর জাঁকজমক সজ্জার কারণ, তিনি যে দীনা নন, তাঁর যে ক্ষমতা বাদশাহেরই মত এইটুকু প্রকাশ করবার জন্যেই এই কৌশল।

যাহোক, নিঃশব্দে বাদশাহ এসে কুলসমের সামনে দাঁড়ালেন। কুলসমের বেশভুষা দেখে তিনি একটু চমকিত হলেন। তারপর ক্লান্তস্বরে বললেন,—কুলসম, এ তুমি কি করলে? একটি নিরপরাধিনী আওরতকে তুমি ঘাতকের কৃপাণের তলায় পাঠিয়ে দিলে?

কুলসম ভেবেছিলেন, বাদশাহ ক্রুদ্ধস্বরে কৈফিয়ত তলব করবেন? কিন্তু তা না করে বিপরীত আচরণ করতে একটু দমে গেলেন। কি বলবেন তাই একটু সময় নিলেন ভাবতে। কিন্তু বলবার মত কোন কথা তাঁর যোগালো না। কেমন যেন তিনি সব কথা হারিয়ে ফেললেন। একবার তাঁর খিলখিল করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো। নিরপরাধিনী আওরত ঐ সোনী! এই সোনীকে একবার বাদশাহ বাচ্চা

বলেছিলেন। কিন্তু কেমন যেন কোন কথাই তাঁর মুখে যোগালো না।

বাদশাহ আবার কাতর স্বরে বললেন,—সোনী যদি তোমার বেটি হত, তাহলে কি তাকে তুমি এমনি জল্লাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতে?

হঠাৎ কুলসমের মনে শক্তি ফিরে এল, গর্জে উঠে বললেন,—হ্যাঁ পারতাম। বেটি যদি অমনি অপরাধী হত, কঠোর দণ্ড দিতে আমার হাত কাঁপতো না।

বাদশাহ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—সোনী কি এমন অপরাধ করেছিল?

অনেক, অনেক অপরাধ করেছিল। সে এক বন্দীকে মুক্তি দিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সে আমারই এক জেনানার সোহাগ কেড়ে নিয়ে নিজে ব্যভিচারিণী হয়েছিল।

বাদশাহ আরো বিস্মিত হয়ে বললেন,—সোনী এই সব বেআইনি কাজ করেছিল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার সোনী—হুজুর শাহনশাহ! সোনীর আরো অনেক অপরাধ আছে এই মুহূর্তে আমার তা মনে আসছে না। তুমি যদি একটু অপেক্ষা কর, তাহলে ফুলবিবি নামে এক আওরতকে খবর দিই।

বাদশাহ হাত তুলে বললেন,—না থাক্! অপরাধ যদি করে থাকে, তার শাস্তি সে পেয়েছে। অপরাধীকে ক্ষমা করবার ক্ষমতা স্বয়ং খোদারও নেই। এই বলে বাদশাহ কেমন যেন নিরুৎসাহের মত বেগমের কক্ষ থেকে টলতে টলতে বিদায় নিলেন।

আর সেই মুহূর্তে কুলসম বেগমের বুকের তলায় কেমন যেন হাসির উৎস ঢেউ সৃষ্টি করলো। তিনি ঝাড়ের আলোর মত ঝলমলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে ফরাসের ওপর দুলে দুলে হেসে উঠলেন।

রমণী যখন ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসা হৃদয়ে ধারণ করে তা চরিতার্থ করে—পৃথিবীতে তাঁর সেই আচরণের তুলনা বোধ হয় কোথাও নেই। কুলসমের সেই মুহূর্তের বিকৃত আকৃতি দেখলে বোধ হয় বাদশাহ মহম্মদ শাহ ভয়ে প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যেতেন।

এদিকে লুতুফ আলি সোনীকে বাদশাহের হারেম থেকে উদ্ধার করবার জন্যে অনেক পরিকল্পনা চিন্তা করতে লাগলো। সে প্রাসাদের বাইরে একবারও ভাবলো না,—সোনীর কোন বিপদ হতে পারে। শুধু বিপদ নয়, সে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেতে পারে! অবশ্য লুতুফ কেমন করে সে কথা চিন্তা করবে,—সোনীর ... সে কিছুই জানতো না। শুধু একবার দেখা পেয়েছিল। এবং একবার আচরণেতেই মনপ্রাণ দিয়ে দিয়েছে। এখন মনপ্রাণ তাকে না হলে আর স্থির থাকবে না। সোনী যেন এক লহমায় কত যুগের আত্মীয়তা সৃষ্টি করেছে। কত নিবিড় ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে। যেন মনে হয় তার হৃদয়ের সমস্ত চিত্রটি লুতুফের হৃদয়েরই প্রতিচ্ছবি। ফতুমার সঙ্গে তবু যদি কোন পার্থক্য থাকে কিন্তু সোনীর সঙ্গে নেই। সেই কারাকক্ষে এতটুকু লজ্জা প্রকাশ করলো না, স্পষ্ট

স্পর্ধিত ভঙ্গিতে বললো,—আমি তোমাকে ভালবাসি মুসাফির।

কি অদ্ভুত সুন্দর শুনিয়েছিল সেই কথাটি। এমন করে কোন রমণী মহব্বতের সুন্দর সুস্বর প্রকাশ করতে পারে লুতুফ আলির আগে জানা ছিল না। হিন্দুস্তানে শুধু ভাল আহার, ভাল বাসস্থান পাওয়া যায় শুনেছিল। আরামের অনেক মাদকদ্রব্য প্রাওয়া গেলেও এমন সুন্দর স্নিগ্ধ আতরের খুসবুর মত কিংবা কুসুমের স্নিগ্ধ সুরভির মত মিষ্টি আওরত পাওয়া যায়, সে শোনে নি। তাই সোনীর কথা তার যতই মনে এল, মনটা কেমন যেন বাতাসের মত এলোমেলো হয়ে গেল। তখনই মুহূর্তে মনে পড়লো ফুলবিবিকে। ফুলবিবিও রমণী, সোনীও রমণী। কিন্তু কত পার্থক্য! একজন পিশাচিনীর মত আল্লার দেওয়া রূপসী শরীর নগ্ন করে, ব্যভিচারের স্রোত সৃষ্টি করে। আর একজন হুরীর মত মূর্তিময়ী মহব্বতের গান রচনা করে, জৈবিক প্রবৃত্তির লাগাম চেপে ধরে শুধু বেদনার উর্ধ্বে স্থান নির্বাচন করে। পাওয়ার যে ক্ষণিক সুখ, সেই সুখকে পরিহার করে না। পাওয়ার যে আস্বাদন তার মাঝেই বেঁচে থাকতে চায়।

না, না সোনীকে কিছুতে ভোলা যায় না। সে চায় না, তাকেই যে চাওয়ার জন্যে মন উদ্‌গ্রীব হয়।

লুতুফ আলি নিজের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ভুলে শুধু সোনীর কথাতেই বিভোর হয়ে থাকলো। যমুনার কূলে বসে তার সমস্ত মনটি সেই অজানা হারেমের জৌলুসে ভরা অলিন্দে অলিন্দে ঘোরাফেরা করতে লাগলো। বার বার সে বিবশ চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগলো দূরের সেই দিল্লীর অজেয় প্রাসাদকে। যে প্রাসাদের উপস্থিতি সগর্বে ঘোষিত হয়ে শুধু অতীতকেই মনে পড়িয়ে দেয়।

যমুনার কূলে ঐ প্রাসাদ। যেমন দীর্ঘ আকাশ-ছোঁয়া, তেমনি বিস্তৃত তার বিশালতা। কত মিনার, গম্বুজ, প্রাচীর তার ইয়ত্তা নেই। সূর্য যেন এই প্রাসাদের শীর্ষে ধরা পড়ে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে। আসমানের ছোঁয়া পেয়ে প্রাসাদের শেষচূড়া যেন গর্বিত হয়ে আরো উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। এদিকে যমুনার মৃদুমন্দ স্রোত দীর্ঘপ্রাচীরের গাত্রে স্পর্শ করে শিহরিত।

লুতুফ প্রাসাদের আর কোন কথা ভাবতে চাইলো না। তার প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে ভাবনা, হারেম এর মধ্যে কোথায়? আর সেই হারেমের মধ্যে কোথায় সোনী আছে? তারপর লুতুফ ছেলেমানুষের মত ভাবলো, সে যদি ঐ হারেমের মধ্যে পাখী হয়ে উড়ে যেতে পারতো তাহলে বড় ভাল হত। তাহলে সোনীকে সে দেখতে পেত।

এই সময় কটি শকুন সেই প্রাসাদের প্রাচীরের ওপাশ দিয়ে উড়ে এসে লুতুফের সামনে একটি বৃক্ষের ডালে বসলো। তাদের মুখে রক্তের ডেলা। লুতুফ বুঝলো, শকুনেরা প্রাসাদের বধ্যভূমি থেকে কারো দ্বিখণ্ডিত দেহের রক্তকণা তুলে আনলো। তাজা রক্তের একটি একটি ডেলা। মনে হয়, কিছুক্ষণ আগেই কারো দেহ ঘাতকের দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, তারই রক্তবিন্দু এই শকুনদের মুখে।

লুতুফ এইটুকু ভাবলো। লুতুফ যদি অন্তর্যামী হত, তাহলে আরো অনেক কথা ভাবতে পারতো। ভাবতে তাকে হত না, সে শকুনের মুখের রক্ত দেখেই শিউরে

উঠতো। যে সোনীর জন্যে তার চিন্তার অবধি নেই, সেই সোনীর শাস্তি হয়ে গেছে।

কিন্তু লুতুফ আলি অন্তর্যামী নয় বলেই, সে সব কথা ভাবতে পারলো না। সে শুধু শকুনদের চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ও তাদের ঠোঁটের তীক্ষ্ণতা দেখে—মনে মনে তাদের সৃষ্টির কথা ভাবলো। ভাবলো, মানুষ যখন এই শকুনের স্বরূপ পায়, তখন কিরকম আকৃতি দেখতে হয়? ঠিক এমনি বীভৎস কি?

যমুনার কিনারে জলের ওপর পা দুটি ডুবিয়ে দিয়ে লুতুফ বসেছিল। স্রোত এক মনে বয়ে চলেছে। গানের সৃষ্টি হচ্ছে সেই স্রোতের কণ্ঠ থেকে! কি গান গাইছে যমুনা? সে কি আনন্দের গান গাইছে? দূরে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে কটি বজরা। সম্ভবত এই বজরায় বাদশাহের প্রাসাদের প্রয়োজনীয় জিনিস আসে। আসে কত দেশবিদেশের উজান ভেঙে।

হঠাৎ এই সময় একটি অশ্বক্ষুরের ধ্বনি লুতুফের কানে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার মনে হল, কোন বাদশাহী সৈনিক তাকে ধরবার জন্যে ছুটে আসছে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ত্বরিতপদে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে গিয়ে অপেক্ষমান অশ্বটিকে নিয়ে পিছনে ঘন বৃক্ষের অন্তরালে লুকিয়ে গেল।

যমুনার কিনার দিয়ে বাদশাহী সড়ক। দীর্ঘ সমান পথ। এ পথ দিয়ে বহুদূর একেবারে রাজস্থান পর্যন্ত পাড়ি দেওয়া যায়। লুতুফ আলি তা জানতো না, সে শুধু সীমাহীন বহুদূরের পথটির দিকে চেয়ে লুকিয়ে থাকলো।

অশ্বারোহী উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল, ছুটে চলে গেল সামনে দিয়ে প্রচণ্ড শব্দের ঐক্যতান তুলে। লুতুফ আলি বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছাড়লো।

তারপর সে আর সেখানে অযথা বিলম্ব না করে সোনীকে উদ্ধারেরর আশায় অশ্বের ওপর উঠে বসলো। এখন তার প্রথম কাজ, সোনীকে উদ্ধার করা। মানুষের অসাধ্য তো কিছু নেই। হয়তো সে চেষ্টা করলে সোনীকে উদ্ধার করতে পারবে কিন্তু কেমন করে পারবে সে তা জানে না। ঐ দুর্গম প্রাসাদের ব্যূহ ভেদ করে তারপর সূর্যহীন সেই হারেমের ভেতর থেকে কেমন করে আনবে সোনীকে মুক্ত আলোর মাঝে! সমস্যা অনেক, বাধা সীমাহীন। হয়তো এর জন্যে সে আবার ধরা পড়বে। ধরা যদি পড়ে তাতে কোন ক্ষতি নেই। সে অকপটে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বাদশাহকে বলবে—হুজুর, আমি অপরাধী সত্য কথা কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আপনি সমঝদার আদমী। মহব্বত কি আপনার দিলে নেই? আমি সে মহব্বতের জন্যে এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি। এই বিচারে আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন। তবে এটুকু চিন্তা করবেন, আপনার সমস্ত প্রাসাদ ঘিরে যে জৌলুস উজ্জ্বলতা নিয়ে জ্বলে আছে, তা কৃত্রিম। রমণী পুরুষের ভালবাসার অনির্বাণ শিখা কৃত্রিম নয়, যদি সে ভালবাসার মধ্যে কোন ব্যভিচার না থাকে। আমি সোনীকে ভালবেসেছি দৈহিক ক্ষুধায় প্রলোভিত হয়ে নয়, তার সুন্দর মনের কুসুম কোমল আকৃতি দেখে আমার মন আপন থেকে তার দিকে ধাবিত হয়েছে। এই দুটি মনের ওপর যদি আঘাত সৃষ্টি করে আপনি আনন্দ পান, তাহলে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দিন। আর কোন প্রতিবাদ করবো না। হাসতে হাসতে

ঘাতকের কৃপাণের তলায় চলে যাব।

এরপরও যদি বাদশাহ মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেন, সে মাথা পেতে তাই নেব। এই সব কথা ভেবে তার মনের মধ্যে বেশ আত্মতৃপ্তি এল।

কিন্তু তবু সে ধরা না দিয়ে কি করে সোনীকে উদ্ধার করতে পারা যায়, তার চিন্তা করতে লাগলো। আর এই জন্যে সে, প্রাসাদের দিকে অশ্ব না ছুটিয়ে দিল্লীর শহরের দিকে অশ্ব ছুটিয়ে দিল। যে শহরের ওপর দিয়ে বুলন্ত সিংয়ের সঙ্গে এসেছিল, লুতুফ আলি এখন একা সেই শহরের দিকে ছুটে চললো। তার উদ্দেশ্য কি বোঝা গেল না, কিন্তু সে যে চিন্তার মাঝে দৃঢ় সঙ্কল্প, সেটুকু তার মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়ে উঠলো।

ক্ষুধা তার পাচ্ছিল কিন্তু খেতে তার ইচ্ছা করলো না সোনীর দেওয়া খাবার। সোনী পুঁটুলী করে খাবার দিয়েছে, পথচলার রসদের জন্যে দিয়েছে আসরফি, মোহর। আর নিজের বিপদকে মোতির হার করে অন্যকে দিয়েছে প্রশান্তি কিন্তু সে শান্তি যে কত নির্মম, সোনী যদি একবার জানতো তারই প্রেমাস্পদ অনুতাপের অনলে দগ্ধ হতে হতে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে! অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছে তারই মুক্তির উপায়!

রক্তবর্ণ আসমান। মাথায় ওপর সূর্যটা যেন প্রহরীর চোখের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। শরীর দিয়ে ঘর্ম নির্গত হচ্ছে। চোখ দুটি ঝাপ্সা হয়ে আসছে। একি গণ্ড বেয়ে কি নেমে চলেছে? চোখের দু'কোনায় হাত দিয়ে দেখলো, চোখ দিয়ে নোনাজল বেরিয়ে আসছে। কখন যে তার চোখ দুটি থেকে অশ্রু আপন খুশিতে নেমে এসেছে, সে জানে না। হঠাৎ যে আশ্চর্য হল, চোখের ও মনের এই স্বাধীনতায়। তারাও যে তার চেয়েও সোনীর জন্যে পাগল হয়েছে, তা সে বুঝতে পারলো।

তবে কি সোনীর জন্যে এখুনি এমন কিছু কাণ্ড সে করবে? যা তার প্রকৃতির বিরুদ্ধে। কিন্তু কি সে করতে পারে? প্রাসাদের সিংহদ্বারের কাছে গেলেই সান্ত্রী পাহারাদার সন্দেহের চোখে দেখবে। তারপর যদি তার বিশ্বাস স্থাপন করে ভেতরে ঢুকতে পায়, তখন রক্ষী সিপাই আর ছাড়বে না। বন্দী পালিয়েছিল এই অজুহাতে তাকে শৃঙ্খলিত করে আবার কারাগৃহে ঠেলে দেবে। সোনী জানতেও পারবে না, তার কি হল? সোনীর অজান্তেই তার গর্দান চলে যাবে।

না, এই জন্যেই সে নিজে আর প্রাসাদের মধ্যে ঢুকবে না। অন্য কাউকে বশীভূত করে এই প্রাসাদের মধ্যে থেকে সোনীর সংবাদ সংগ্রহ করবে। তারপর অন্যের দ্বারাই সোনীকে অন্তঃপুর থেকে বের করে নিয়ে এসে এদেশ ত্যাগ করবে। এই দিল্লী থেকে এবার সে রাজস্থানের দিকে পাড়ি দেবে। মারাঠা রাজপুতেরা শুনেছে ভাল লোক। অন্তত অতিথি সৎকারে তাদের মন আছে! সেইখানে সোনীকে নিয়ে গিয়ে ঘর বাঁধবে। তারপর সেই সিন্ধুনদের ধার থেকে হানিফকে আনবে।

মনে মনে একবার হাসলো লুতুফ। ম্লান হাসি। মানুষের চিন্তাগুলি কত সুন্দর। এই চিন্তার মত যদি কাজগুলি সহজ হত? সোনীকে পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই, তার সঙ্গে ঘর করার স্বপ্নও সে দেখে ফেললো। হয়তো সোনীর কাছে যখন সে প্রার্থনা দিয়ে লোক পাঠাবে, সে বিস্ময়ে প্রতিনিধিকে বলবে—বন্দী অদ্ভুত স্পর্ধা গ্রহণ

করেছে তো ! কোথায় কবে কি অবস্থায় কি বলেছি, অমনি সে ধরে নিয়েছে তার সঙ্গে আমি এই হারেম ছেড়ে পালাবো ?

কিন্তু এইটুকু রক্ষা। এই ধরনের কথা সোনী বলতে পারে না। লুতুফের যদি এতটুকু রমণী-স্বভাব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে তাহলে তার ধারণাই ঠিক। হয়তো সোনী নাও আসতে পারে কিন্তু একমুহূর্তে দেখে চিনেছিল, সে আঘাত দিয়ে কোন কথা কাউকে বলতে পারে না। সুতরাং কোন মন্তব্যই সে তার লোককে করবে না। অবাক হয়তো হবে। লুতুফের অসম্ভব আর্জি জ্ঞাত হয়ে হয়তো মনে মনে বলবে—মুসাফির, এখনও এই রাজধানীতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে ! বিস্মিত হবে কিন্তু মুখে কিছু বলবে না। মোলায়েম হাসিটি ঠোঁটে ঝুলিয়ে তার লোককে শুধু জানাবে—মুসাফিরকে বলো, সে এ শহর ছেড়ে যত শীঘ্র পারে যেন চলে যায়।

সেই নিরাপত্তার জন্যে আকুলতা। পরের জন্যে বেদনা।

আবার লুতুফের চোখে জল দেখা দিল।

কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ সোনীর চিন্তায় আর সময় কাটাতে হল না। হঠাৎ সে দারুণভাবে চমকে উঠলো। একাধিক লোক যেন কয়েকটি জয়ঢাক নিয়ে এসে তার কানের কাছে পেটাতে লাগলো। উঃ কী অসম্ভব অস্বাভাবিক শব্দ ! যেন কানের শ্রবণশক্তি চিরতরে নষ্ট করে দেবে।

হঠাৎ তাকে কে যেন ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। সে অশ্বসুদ্ধ টাল সামলাতে সামলাতে একেবার অনেকখানি সরে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।

এবার তার চেতনা ফিরে এলো। চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হল।

তাকিয়ে যা দেখতে পেল, তাকে সে অবাক হয়ে গেল। বহুলোক, বহু পালকী, বহু অশ্বারোহী, আর তার সঙ্গে বিচিত্র সাজপোষাক পরিহিত তিন-চার দল বাজনদার। তাদের সঙ্গে নানান ধরনের বাদ্যযন্ত্র। জয়ঢাক, কাড়ানাকড়া, দুন্দুভি—সানাই করতাল—আরও কত কি !

প্রথম যারা তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিল, তারা দলের প্রথমেই আছে। সামনে মোগলী পতাকা ধরে তারা অশ্বারূঢ় হয়ে চলেছে। তারপর পদব্রজে একদল কৃপাণ হাতে রক্ষীর দল। তাদের কৃপাণের ফলায় সূর্যরশ্মি পড়ে রজতের মত ঝলমল করছে। এর পর সারিতে আছে একটি অদ্ভুত সুন্দর চল্লিশ ঘোড়ার চার চাকাওয়ালা গাড়ি। গাড়িটি রকমারী সব ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। তাছাড়া এই গাড়িটিকে উপলক্ষ করেই যেন যত আয়োজন। গাড়িটির অন্যান্য উন্মুক্তস্থানে রক্তবর্ণের ভেলভেট কাপড়ের ঘেরাটোপ্।

এই গাড়িটি লুতুফের সামনে দিয়ে চলে যেতে তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করলো জোরালো সৌরভ। এ সৌরভ লুতুফের চেনা। লুতুফ আলি বাদশাহের প্রাসাদে এই ধরণের সৌরভ অনুভব করেছে। গুলাবী আতর, ইস্তাম্বুলের চিত্তোন্মাদকর সুগন্ধ, লোবানের তীব্র মধুর গন্ধ। তাছাড়া নানান ধরণের পুষ্পের সৌরভ।

সে গাড়িটি চলে যেতে তারপর দেখা গেল, দু'দল বাজনদার। তারা বাদ্যযন্ত্র

বাজাতে বাজাতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। এর পর হরেক ধরনের তাঞ্জাম, পালকী ও চতুর্দোলা। সেগুলির গবাক্ষ রুদ্ধ অবস্থায় দলের সঙ্গে এগিয়ে চললো। লুতুফ ভাবলো, সম্ভবত এর মধ্যে আছে আমীর লোকের জেনানা।

সেগুলি চলে গেলে আবার একদল বাজুনা। বাজনার সঙ্গে কিছু বাজি ফাটার পরিত্রাহি চিৎকার। সোঁ সোঁ করে কতকগুলি আগুনের পিণ্ড ওপরে উঠে গেল, সূর্যের আলোতেই ধূসর ছায়ার দুজন যোদ্ধা তলোয়ার খেলায় মত্ত হয়ে উঠলো।

লুতুফ আলি কোনদিন এসব দেখেনি। দেখে সে কৌতুক অনুভব করলো।

আবার একটি বাজি ওপরে উঠে গেল। একটি পরমাসুন্দরী আওরত সবার দিক তাকিয়ে তাকিয়ে সেলাম পেশ করতে লাগলো।

তারপর পিছনে দুটি বৃহৎ কামানের গাড়ি। সে দুটির পর আর কিছু ছিল না। শুধু সেই কামানের মাথার ওপর মোগল বাদশাহের পতাকা।

সেই শোভাযাত্রাটি চলে যেতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় নিল।

এই শোভাযাত্রার জন্য সাধারণ পথচারীরা দলে দলে রাজপথের ধারে দাঁড়িয়েছিল। শোভাযাত্রা চলে গেলে তারা আবার পথে নেমে এল। সাধারণ লোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। মন্তব্য শোনা গেল;—রাজা বাদশার শাদী, একি সহজে মেটে বাপু! কত রোশনাই জ্বলবে। কত বাজি পুড়বে। কত ঘাগরা ঘুরবে। আতরের খুসবুতে দু দশ মাস বাতাস ভারী হয়ে থাকবে,—তবে তো শাদী।

লুতুফ আলি জীবনে এমনি ধরনের রাজসিক শোভাযাত্রা দেখেনি, তাই বিস্ময় নিয়ে এগিয়ে এসে একটি পথচারীকে জিজ্ঞেস করলো,—কার শাদী মশাই? কোথায় যাচ্ছে এই শোভাযাত্রা দল বেঁধে?

পথচারী লুতুফের মুখের দিকে চেয়ে বিরক্ত হল, হাজার নতুন লোক যে আজকাল রাজধানীতে আসছে এই ভেবেই সে বিরক্ত হল। কারণ নতুন লোক এসে এখানকার অধিবাসীর অনেক সুযোগ লুটে নিচ্ছে। আর অধিবাসীরা কপাল চাপড়ে নসীবের খেল্ বলে দিলের দর্দ নিয়ে অন্ধকার ঘরে মুখ লুকোচ্ছে।

সেই কথা ভেবেই পথচারী লুতুফের মুখের দিকে চেয়ে সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললো,—মিঞাসাহেব বুঝি নতুন রাজধানীতে পদার্পণ করেছেন?

লুতুফ ইতস্তত করে অশ্ব থেকে নেমে কুর্নিশ করে বললো,—জী, হ্যাঁ। সে মিথ্যে কথা বললো এইজন্যে যে, পথচারী যদি কোন গুপ্তচর হয়!

পথচারী বললো,—এখানে বাস করতে এসেছেন, না কোন প্রয়োজন মেটাতে এসেছেন!

লুতুফ আলির ইচ্ছে করলো জিজ্ঞেস করে, তুমি কে হে বাপু? এত খোঁজ নিচ্ছ কেন? কিন্তু তা সে বললো না, শুধু হেসে বললো,—যদি সুযোগ হয়, তাহলে এখানে থেকেই যাবো!

পথচারী আবার জিজ্ঞেস করলো,—এখন তোমার গন্তব্যস্থল কি প্রাসাদের দিকে.

লুতুফ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো,—না।

পথচারী বললো,—কেন নয়? প্রাসাদে গেলেই তো তোমার সব সুযোগ মিলবে।

লুতুফ বললো,—না। ঐ রাজসিক প্রাসাদে গেলে আমি সব হারিয়ে ফেলবো।

পথচারী হেসে বললো,—তুমি দেখছি বড় ভীতুলোক। তা এখানেই বা কোথায় থাকবে ঠিক করেছ?

লুতুফ মাথা নেড়ে বললো,—এখনও কিছু ঠিক করি নি।

এবারে পথচারী একটি কাণ্ড করলো। হঠাৎ বললো,—তুমি বাপু প্রাসাদের দিকেই এগিয়ে যাও। শুনেছি, বাদশাহের একটি অতিথিশালা আছে, আর সেখানে খানা সরবরাহ করা হয় বড় চমকদার। এই বলে লোকটি আর কোন কথা না বলে বিপরীত দিক দিয়ে একরকম ছুটে চলে গেল।

লুতুফ আলি হঠাৎ তার অবস্থা দেখে কৌতুক অনুভব করলো। চিৎকার করে বললো,—আমার উত্তর তো আপনি দিয়ে গেলেন না? ঐ শোভাযাত্রা কোথায় গেল? কার শাদীর জন্যে এই শোভাযাত্রা!

কিন্তু তখন লোকটি অনেকদূরে চলে গেছে। তার কানে লুতুফের স্বর পৌছালো কিনা সন্দেহ। লোকটি কেন চলে গেল, কথাটি ভেবে লুতুফ নিজের মনে একচোট হাসলো। লোকটি ভাবলো, হয়তো এই আগন্তুক তার বাড়িতে অতিথিহবার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে, এই কথা ভেবেই সে অমনি উর্ধ্বশ্বাসে পালালো।

রাজধানীর অধিবাসীর মানসিক অবস্থা দেখে যারপরনাই সে বিস্মিত হল। কিন্তু সে বিস্ময়ের চেয়ে আবার তার পূর্বের কথা স্মরণ হল। তাহলে ঐ শোভাযাত্রা কি প্রাসাদের মধ্যেই গেল? তাই যদি হয়, তাহলে তো সে দলে ভিড়ে পড়তে পারতো।

এই সময় আর একটি পথচারী সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, লুতুফ আলি তাকে জিজ্ঞেস করলো,—মশাই, ঐ শোভাযাত্রা কোথায় গেল?

লোকটি কোন ভণিতা না করেই বললো,—কেন তুমি জান না আজ আমীর দলীপ সিংয়ের বেটির শাদী? ঐ শোভাযাত্রা কন্যাকে নিয়ে বাদশাহের নজর দিতে গেল। এ দিল্লীর বাদশাহের আমীর ওমরাহদের সবারই নিয়ম। তাঁরা তাদের উৎসবে বাদশাহকে একজন সহায়ক মনে করে প্রাসাদে বাদশাহের আশীর্বাদ নিতে যায়। আর তার সঙ্গে দিয়ে আসে কিছু মোহর একটি স্বর্ণনির্মিত রেকাব, একটি আতরদান। দুখানি মূল্যবান বস্ত্রখণ্ড, আর একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব।

হঠাৎ লুতুফ আলি জিজ্ঞেস করলো,—যদি না দেয়।

তাহলে বাদশাহ বুঝবেন, এই ওমরাহটি তার পদানত স্বীকার করে না। আর তাকে শাস্তি দেবেন দিল্লী থেকে সেই মুহূর্তে বহিষ্কার।

লোকটি চলে গেল।

লুতুফ আলি আবার অশ্বপিঠে উঠে চললো। তার কিছু ভাল লাগছিল না, সোনাকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত কিছুই তার ভাল লাগবে না। অথচ উদ্ধারের পথও তার জানা নেই। কি করবে? একবার ভাবলো, ঐ দলের সঙ্গে চলে গেলে হত। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে সোনীর উদ্ধারের ব্যবস্থা করলে মন্দ হত না কিন্তু যায় কি

করে? গেলে বিপদ হবার সম্ভাবনাই বেশী। যদি রক্ষীর চোখে পড়ে যায় তাহলে আর বাঁচার কোন উপায় থাকবে না।

এই কথা ভেবে লুতুফ আলি সারাদিন ধরে অশ্বে চড়ে রাজপথে ঘুরে বেড়ালো। প্রচণ্ড ক্ষুধা সহ্য করতে না পেরে খেল সোনীর দেওয়া পুঁটুলীরই খাবার। তারপর এক সময় রক্তবর্ণ সূর্যরশ্মি স্বর্ণবর্ণের জ্যোতি নিয়ে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লো। তারপর গোধূলি থেকে সন্ধ্যার ধুসর ছায়া।

লুতুফ আলি চক বাজারের বিপণির মেলাতে অশ্ব থেকে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। চক বাজারের বিপণিতে বিপণিতে তখন আলোর অত্যুজ্জ্বল শিখা। ক্রেতা ও বিক্রেতার ভিড়ও ছিল। ছিল নানান দেশের লোক। জাদুকরের ভোজবাজির চিৎকারও গগন বিদীর্ণ করেছিল। অন্ধকারের অপ্সরীরা ওড়নায় মুখ ঢেকে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। দু একজন লুতুফকে দেখে সুর্মা চোখের দৃষ্টিও হানলো।

লুতুফ আলি একবার তাই দেখে নিজের বুকে হাত দিল। সোনীর দেওয়া মোহরের পুঁটুলীর কথাও তার মনে পড়লো। হঠাৎ এই সময়ে তার একটি পরিকল্পনা মনে আসতে সে আরো দু'পা এগিয়ে গেল।

একটু অন্ধকারের কুহেলী। আলো সেখানে প্রায় একেবারেই নেই। বরং দূরে আলোর ঔজ্জ্বল্য থাকার জন্যে সামনের অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠেছিল। এবং একটু নির্জনতাও তাই এই অংশে ছিল।

লুতুফ এসে দাঁড়ালো সেই নির্জন জায়গাটিতে।

একটি রাতের অপ্সরী ওড়নায় মুখ ঢেকে লুতুফের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছিল। তারপর মনে মনে হেসে ওড়নার আবরণটি সরিয়ে দিয়ে, তাম্বুলরঞ্জিত অধরে হাসি নিয়ে লুতুফের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

লুতুফ মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল, রাত্রি সহচরী কাছে আসতেই সরাসরি জিজ্ঞেস করলো,—তোমার আস্তানা কোথায়?

রমণীটি বললো, — মাত্র দু কদম পথ।

লুতুফ বললো,—আমার সঙ্গে যে বাহন আছে!

রমণীটি হেসে বললো,—তার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি, এই বলে সে দ্রুত এগিয়ে গেল দূরে একটি বিপণির দিকে। তারপর সেখান থেকে একটি ছোকরাকে সঙ্গে নিয়ে এসে লুতুফের অশ্ব তার কাছে জমা করে দিল।

রমণী বললো,—আপনি ফিরে এসে দূরে ঐ কার্পেটের বিপণিতে বলবেন, তাহলে আপনার অশ্ব ফেরত পাবেন।

লুতুফ তখন অশ্বের কথা ভাবছিল না। ভাবছিল, এই রমণীকে দিয়ে কার্য উদ্ধার হবে তো! নাকি এ বেঁকে বসবে! অবশ্য এ রূপজীবিনী খুব চতুর। যদি এ স্বীকার হয়, তাহলে ঠিক কার্য উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু স্বীকার করানোই মুস্কিল। অর্থের লোভ দেখিয়ে একটি রমণীকে উদ্ধার করবে বলে মনে হয় না। লোভ দেখাতে হবে এমন দুর্লভ বস্তু, যা এই রূপজীবিনীর চিন্তার বাইরে। সুতরাং এর স্বভাবের

অন্তরাল পর্যন্ত পরীক্ষা করে নিতে হবে।

লুতুফ সেইজন্যে সন্তর্পণে অগ্রসর হওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার নাম কি বিবি ?

মেয়েটি চলতে চলতে লুতুফ আলির দিকে চেয়ে বললো,—সোনী।

সোনী ! লুতুফ আলি হঠাৎ চমকে উঠে অস্বাভাবিক চিৎকার করে উঠলো। না না, ও নাম তোমার হতে পারে না।

রমণীটি বিস্ময়ে বললো,—কেন ? সোনী হওয়ায় অপরাধ কি হল ?

তখন লুতুফ আলি নিজেকে সংযত করে নিয়েছে। এতটা বিস্ময় প্রকাশ করা যে উচিত হয় নি, সেই কথা ভেবে সে শান্তস্বরে বললো,—না, অপরাধ কি ? আমারই অন্যায় হয়েছে, আমাকে মাপ কর।

রমণী হেসে বললো,—না না,—এতে মাপ করার কি আছে ? আপনার কোন প্রিয়জনের যদি নাম হয়, তাহলে আমাকে অন্যনামে ডাকবেন।

তখন লুতুফ আলি স্বপ্নাবিষ্টের মত বললো,—না, ডাকলে অবশ্য কোন ক্ষতি নেই। তবে আমার যে পরিচিত সোনী ছিল, তার স্বভাবের সঙ্গে এমন কি তার নামের সঙ্গে কারো মিল থাক্‌—আমি কখনও মনেপ্রাণে চাই নি। তাই একটু চমকে উঠেছিলাম। সে যাক্‌গে, তোমাকে সোনী ডাকতে আমার কোন ক্ষতি নেই।

এই সময় ওরা এসে একটি ছোট্ট ঘরের সামনে দাঁড়ালো। তারপর সোনী সেই ঘরের বন্ধ দরজার তালা খুলে ঘরে প্রবেশ করলো। অন্ধকার ঘরে সোনী ঢুকে আলো জ্বেলে লুতুফকে ডাকলো। লুতুফ আলি একটু থমকে দাঁড়িয়ে তারপর ঘরে প্রবেশ করলো।

ছোট্ট একটি ঘর কিন্তু পরিপাটি করে সাজানো। ঘরে খুব একটা আসবাব নেই সত্যি কথা, কিন্তু যা ছিল তা মানানসই।

লুতুফ আলি ঘরে প্রবেশ করতে সোনী ভেতর থেকে দরজার আগল বন্ধ করে দিল। তারপর বললো,—আপনি পালঙ্কে বসুন।

লুতুফ আলি পরিচ্ছন্ন একটি শয্যার ওপর বসে স্বল্প আলোর মাঝে সোনীর দিকে তাকিয়ে থাকলো। সে ভাবতে লাগলো কিভাবে তার প্রস্তাবটি পেশ করে সোনীকে রাজি করাবে ?

কিন্তু সোনী তখন খদ্দেরকে খুশি করার জন্যে লুতুফের সামনেই নিজের বাইরের পরিচ্ছদ পরিবর্তন করতে লাগলো। রমণীটি নিলর্জ্জভাবেই তার বসন খুলে ফেললো তারপর খুব স্বল্প বসনে উন্মুক্ত যৌবন আরো প্রকট করে এসে দাঁড়ালো লুতুফের সামনে। খিল খিল করে প্রগল্‌ভার মত হেসে কাছে এসে বললো,—আমার কিন্তু দশটি মোহর চাই।

লুতুফ কোন কথা না বলে তার জেব থেকে পুঁটুলীটি বের করে তা থেকে দশটি মোহর এগিয়ে দিল সোনীর দিকে।

সোনী হঠাৎ বিস্ময়ে অবাক হয়ে বললো,—একি, আগাম দিচ্ছেন কেন ? তাছাড়া

এতও আমাকে দিতে হবে না। দুটি মোহর দিলেই আমি সন্তুষ্ট। আমার মূল্য তার চেয়ে বেশী নয়।

লুতুফ আলি সোনীর হাতটি ধরে আরো পাঁচটি যোগ করে পনেরোটি মোহর গুঁজে দিল।

সোনী বোধ হয় জীবনে এতগুলি মোহর একসঙ্গে দেখেনি। আরো বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে বললো,—একি করছেন? আপনি আমাকে কেন এত দিচ্ছেন?

লুতুফ আলি আওরতটির বিস্ময়ভরা মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ কপট সোহাগের ছলে বললো,—তোমাকে আমার বড় ভাল লেগে গেছে বিবি। তুমি আমার এক রাতের প্রেয়সী নয়, জন্ম জন্মান্তরের। এসো কাছে এসো। তোমাকে আমি আরো দেব। আমার অনেক আছে।

সোনী লুতুফ আলির সান্নিধ্যে ঘন হয়ে এগিয়ে আবেগের স্বরে বললো,—আরো দেবেন? ইয়া আল্লা, আমি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম!

লুতুফ আলি সোনীকে বুকের মাঝে জড়িয়ে নিয়ে তার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে নিবিড় করে বললেন,—আমার ঘরবালী করবো। তুমি এই জঘন্য ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে আমাকে শাদী করে পবিত্র জীবন যাপন করবে।

কোন রূপজীবিনীকে যদি এ কথা বলা যায়, তাহলে তার অবস্থা কি হয়? যে দেহবিক্রি করে দিনের পর দিন দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, তার কাছে এই প্রলোভন যেন প্রবঞ্চনার মতই মনে হয়। তাই প্রথমে অবাক হয়ে সোনী বিশ্বাস করলো না। লজ্জিতস্বরে বললো,—দিল্লাগী করছেন কেন সাহেব? দু'দশদিন যদি আমার ঘরে থাকেন, তাহলে আমি ধন্য হয়ে যাবো। কেউ চিরকাল থাকবে, এ আমি প্রত্যাশা করি না। সোনীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো।

লুতুফ আলি তাই দেখে আরো কপটতার আশ্রয় নিয়ে সেই স্বল্প আলোতে সোনীর মুখখানি তুলে ধরলো, তারপর বললো,—তোমাকে আমি ঝুট্‌বাত বলছি না প্রেয়সী। সাচ্‌বাত। আমি কসম খেয়ে বলছি একথা।

তখন সোনীর চোখের জল আর বাধা মানলো না। সে হঠাৎ লুতুফের বুকে আনন্দে মুখটি গুঁজে দিয়ে বললো,—সত্যি!

হ্যাঁ, সত্যি প্রেয়সী। আমি তোমাকে ভালবেসেছি। তুমি রূপজীবিনী সত্যি কথা কিন্তু তোমার মত মন কোন আমীরের অন্তঃপুরে নেই? তোমার সোনী নাম সার্থক।

তখন সোনী হঠাৎ তার হাতের মুঠিতে ধরা পনেরোটি মোহর লুতুফের হাতে দিয়ে বললো,—তবে এগুলি আপনার কাছে রেখে দিন। আপনি যখন আমার কাছেই থাকবেন, তখন এগুলি আমার কাছে রেখে কি হবে?

লুতুফ আলি হেসে বললো,—বেশ তাই যদি তোমার ইচ্ছে হয়, থাক্। এই বলে লুতুফ আলি আবার সেই পুটুলীতে মোহরগুলি রেখে দিল।

তারপর সোনী হেসে বললো,—আমি এবার আপনাকে তুমি বলতে পারি?

লুতুফ আলি হেসে বললো, নিজের দয়িতকে কেউ আপনি বলে না, তুমি নিশ্চয় জানো।

সোনী তখন শাশ্বত রমণীর মত আচরণ করতে লাগলো। যেন চিরকাল ধরে সে কোন পুরুষের শাদী করা জোরু হয়ে আছে, এমনি অদ্ভুতভাবে সে কথা বললো,—তোমার নিশ্চয় কোন খানাপিনা হয় নি। একটু অপেক্ষা কর, আমি সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

লুতুফ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললো,—না না, সে সবের কিছু দরকার নেই। তুমি কাছে থাকো, তাহলেই আমার সব ক্ষুধা নিবৃত্তি হবে।

সোনী হেসে বললো,—আমি তো তোমারই আছি। তোমার যদি চলে যাবার তাড়া থাকতো, তাহলে না হয় কাছেই থাকতাম কিন্তু যখন চলে যাচ্ছো না, তখন একটু অপেক্ষা কর। সোনী আবার হেসে বললো,—রাত খুব বেশী হয় নি।

লুতুফ আলি দেখলো তার অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছে। কিন্তু শেষরক্ষা হয় না দেখে সে চিন্তিত হল। তাই তাড়াতাড়ি বললো,—সোনী তুমি যেও না। তোমাকে কাছ ছাড়া করে আমি একমুহূর্ত থাকতে পারবো না। তুমি আমার কাছে এসো।

সোনী বুঝলো, তার নতুন নাগরটি তার দেহের আগুনে দগ্ধ হয়েছে। তাই মৃদু হেসে লুতুফের প্রসারিত বাহুবন্ধের মধ্যে ধরা দিল। চাপা স্বরে বললো,—বাব্বাঃ তুমি দেখছি বড় অস্থির লোক।

লুতুফ আলি সোনীকে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে গাঢ়স্বরে বললো,—মরদ যদি হতে তাহলে বুঝতে মরদের কি যন্ত্রণা। সেইমুহূর্তে লুতুফ আলি একবার ভেবে নিল, এই জায়গায় যদি এই সোনী না হয়ে সেই সোনী বাঁদী হত! সেই সোনী হলে এই অভিনয়ের প্রয়োজন হত না। এই বাহু তখন আরো নিবিড় হোত, আরো সোহাগের সৌধ রচনা করতো।

না, সে বুঝি স্বপ্নই!

লুতুফ আলি আবার বর্তমানে ফিরে এসে গাঢ়স্বরে বললো,—সোনী, আমার সোনী-বিবি। একটা কাজ করে দেবে?

সোনী নির্লিপ্তভাবে বললো,—কি কাজ প্রিয়তম?

লুতুফ আলি একটু থেমে বললো,—তুমিই পারবে সোনী। তার আগে বলো, আমি যেমন তোমাকে মহব্বত দিয়েছি তুমিও আমাকে দিয়েছ!

সোনী আবেগভরে বললো,—একথা কেন প্রিয়তম? আমার আচরণের মধ্যে কি কোন গলদ পেয়েছ?

লুতুফ বললো,—না, তবে জিজ্ঞেস করছি এই জন্যে যে, আমাকে যখন ভালই বেসেছ, তখন আমার সুখদুঃখের অংশ নিশ্চয় তুমি নেবে?

সোনী বিস্মিত হয়ে বললো,—নিশ্চয়। সুখ যখন নেব, দুঃখও নেব বৈকি!

তাহলে আমার মন একটি দুঃখে দগ্ধ হচ্ছে, তুমি নিশ্চয় তোমার প্রাণ দিয়ে সেই দুঃখ মোচন করবে।

সোনী আরো বিস্মিত হয়ে বললো,—আমার অসাধ্য না হলে নিশ্চয় করবো।

লুতুফ বললো,—তোমার অসাধ্য কিছুই নয়। শুধু তুমি একটু কষ্ট করলেই আমার দুঃখ লাঘব হবে।

সোনী বললো,—বেশ, তোমার দুঃখটি আমার কাছে পেশ কর।

তখন লুতুফ আলি ব্যাপারটা লঘু করে বললো,—এমন কিছু নয়। শুধু তুমি একবার এই রাত্রে কৌশলে প্রাসাদের হারেমে প্রবেশ করবে। সেখানে একজন বাঁদী আছে, সেই বাঁদীকে গিয়ে বলবে, তুমি যাকে মুক্তি দিয়েছিলে সে দিল্লীর চক-বাজারে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তুমি অবিবম্বে হারেম ত্যাগ করে তার কাছে এসে উপস্থিত হও, নতুবা তার মৃত্যু হবে। সে দারুণ অসুস্থ।

সোনী হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো,—সেই বাঁদী কাকে মুক্তি দিয়েছিল?

লুতুফ সবদিক চিন্তা করেই কথাগুলি বলেছিল, তাই না ভেবেই বললো,—আমি যার কথা বলছি, সে আমার দোস্ত।

সোনী একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললো,—তা দোস্তের জন্যে তোমার দুঃখ কেন?

লুতুফ আলি বললো,—দুঃখ হবে না! আমার বাচ্চাবেলার দোস্ত। এক সঙ্গে আমার আম্মা পেলেছেন দুজনকে। আজ সে দুখ নিয়ে পুড়ছে, আর আমি চুপ করে থাকবো? তাছাড়া আমি মহব্বত পছন্দ করি। আমার দোস্ত মহব্বতের জন্যে বেমা-রীতে মারা যাবে, আর আমি বসে বসে দেখবো?

সোনী বললো,—সেই বাঁদী কি তোমার দোস্তকে পেয়ার করে?

জরুর। সেই জন্যেই তোমাকে এই মিলনের সাহায্য করতে বলছি।

সোনী ইতস্তত করে বললো,—কিন্তু প্রাসাদের হারেমে গিয়ে সেই বাঁদীকে সংবাদ দেওয়াও তো মুশকিল। শুনেছি, অসংখ্যক প্রহরী ব্যূহ ভেদ করে তারপর হারেমে ঢুকতে হয়। যদি ধরা পড়ে যাই?

লুতুফ দৃঢ়স্বরে বললো,—আমি জানি তুমি ধরা পড়বে না। তাছাড়া আমার পেয়ারের কি কোন গুণ নেই? এই বলে লুতুফ আলি এমন তৃপ্তির হাসি হাসলো যে সোনীর মনের সব সংশয় কেটে গেল।

সোনী তখন মনে মনে অনেক কথাই ভাবছে, ভাবছে লোকটিকে কি সে বিশ্বাস করতে পারে? না, তার কার্যোদ্ধারের জন্যে মিঠি মিঠি বাত আউড়িয়ে দিলটা বিগড়ে দিয়ে চলে যাবে। সন্দেহ হতে সে সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললো,—আমি যদি তোমার দোস্তের দুখ মোচন করে দিই, তাহলে তুমি যে কসম খেয়ে কবুল করলে তা রক্ষা করবে! না, কাজ হাসিল হয়ে গেলে আমার দিল বরবাদ করে দিয়ে চলে যাবে?

লুতুফ আলি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো,—আমার জবানে কি তোমার বিশ্বাস হয় না? বেশ, তোমার বিশ্বাসের জন্যে আর কি করতে হবে বল—আমি তা করবো।

লুতুফ আলি এমনভাবে কথা বললো যে আর সোনীর কোন সন্দেহ থাকলো না। ম্লান হেসে বললো,—আমি বড় দুঃখী সাহেব। তোমার কাছে এইটুকু আমার আর্জি। যদি মনে কোন সংশয় থাকে, তাহলে আমাকে আশা দিও না। আশা যদি ভেঙে

যায়, তাহলে এই বেঁচে থাকাটুকুও আমার চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। আওরত নিজের দেহ বিক্রি করে কেন জীবনধারণ করে, আশা করি নিশ্চয় বোঝ।

আবার সোনীর চোখদুটি চিকচিক করে উঠলো। আরপর বললো,—তোমাকেও আমি একমুহূর্তে ভালবেসে ফেলেছি মুসাফির। আওরত যখন মহব্বত দেয়, তখন সে দয়িতের জন্যে সব করতে পারে। বেশ এবার বলো, আমাকে কি করতে হবে? যত অসাধ্য কাজই হোক্‌, আমি আমার সাধ্যমত তা করতে এতটুকু দ্বিধা করবো না।

লুতুফ নিজের সাফল্যে মনে মনে হাসলো। আর পরের কথা পরে ভাববে বলেই সে নিশ্চিন্ত হয়ে সোনীকে সব বোঝাতে লাগলো। তোমাকে রাত্রিবেলা যেতে বলছি এইজন্যে যে, গভীর নিশীথে প্রহরীরা ঘুমে অচেতন হয়ে থাকে, তুমি বোরখায় আপাদ-মস্তক ঢেকে খুব সহজেই হারেমে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। কারণ রাত্রিবেলা এমনি অনেক বাঁদী ও বেগম প্রহরীদের প্রলোভিত করে বাইরে যায়। তুমি সেই সুযোগ গ্রহণ করবে। তাছাড়া—লুতুফ একটু হাসলো। কোন প্রহরী যদি গণ্ডগোল করে, তাহলে তোমার সুরত দেখিয়ে তার দিল জয় করতেও দ্বিধা করবে না। তারপর হারেমের মধ্যে প্রবেশ করে কৌশলে ফুলবিবির মহলটি জেনে নেবে। সেই ফুলবিবির খাসবাঁদী এই সোনী।

এইসময় সোনী বিস্মিত হয়ে বললো,—তাহলে এরই নাম সোনী!

লুতুফ আলি প্রসঙ্গটি পরিবর্তনের জন্যে ম্লান হেসে বললো,—হ্যাঁ এরই নাম সোনী। আমার দোস্ত এতবার এই নামটি উচ্চারণ করেছিল যে তোমার মুখে সেই নাম শুনে চমকে উঠেছিলাম।

সোনী আর কোন কথা বললো না।

লুতুফ আলি আবার বলতে লাগলো,—ফুলবিবির মহলের কাছে কাছেই তাকে পাবে। দেখবে খুব সুন্দর আওরত। মিঠি মিঠি বাত বলে। আর হাসে যখন তার মুক্তোর মত দাঁতগুলি থেকে জৌলুস বেরোয়। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে, বাঁদীর পোষাক তার শরীরে থাকলেও ঠিক তাকে বাঁদীর মত দেখতে মনে হয় না। তাকে চিনতে পারলে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলবে—তুমি যে বন্দীকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছিলে, সে তোমার জন্যে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে। তার জান্‌ যখন তুমি বাঁচিয়ে দিলে তবে মৃত্যুর দিকে কেন তাকে ঠেলে দিলে? যদি তুমি তাকে আবার জীবন দিতে চাও তাহলে শীঘ্র প্রাসাদ অন্তঃপুর ছেড়ে চলে এস। নতুবা তুমি জানবে, এক নিরপরাধ পুরুষের মৃত্যুর জন্যে তুমি দায়ী।

সোনী তারপর জিজ্ঞেস করলো—সেই রমণী যদি আসতে রাজী না হয়!

লুতুফ আলি একটুখানি চুপ করে থেকে বিমর্ষকণ্ঠে বললো,—রাজী না হয় তোমার কাজ তুমি করে চলে আসবে। কিন্তু একজনের কথা তোমায় বলে দিই, তার নাম ফুলবিবি। বাদশাহের নির্বাচিত আওরত। ভীষণ অহঙ্কারী ও জেদী এই রমণী। এই রাত্রিবেলায় সে হর্ম্যতলের শয্যার ওপর নগ্নশরীরে শুয়ে সুরাপানে উন্মত্ত হয়। তার সামনে যদি কোন অবস্থায় পড়ে যাও, তাহলে কোন কথা কবুল করবে না। সে

হয়তো তোমায় অনেক জেরা করবে কিন্তু তুমি মৃত্যুকে গ্রহণ করবে তবু নিরুত্তরের ভূমিকা নেবে।

লুতুফ আলি তারপর বললো,—এমনভাবে যাবে যেন রাত্রি একপ্রহরের আগেই সেখানে গিয়ে পৌছতে পার। প্রহরীদের চোখে সেইসময় প্রথম নিদ্ আসে। আমি এখানেই তোমার অপেক্ষায় থাকলাম। কাজ হাসিল হলেই সত্বর এখানে চলে এস। তারপর দুজনে মিলে এবাসা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাব। এই বলে লুতুফ আলি মৃদু হাসলো।

সোনী বললো,—বেশ, আমি এই দণ্ডেই এখান থেকে বেরিয়ে পড়ছি। তার আগে তোমায় কিছু খানা এনে দিই, তুমি আহার করে আমার শয্যায় শুয়ে বিশ্রাম নাও।

লুতুফ বাধা দিয়ে বললো,—না পেয়ারী, খানা আমার চাই না। এই কাজটি উদ্ধার করে আমার দোস্তকে বাঁচাও, তাহলে আমার সমস্ত তক্‌লিফের অবসান হবে। বেচারী দোস্ত দিল্ কোরবানী দিয়েই জান্ বিলকুল হারালো। তার জন্যেই তিনচার রোজ ধরে ভেবে ভেবে মরে যাচ্ছি।

সোনী খুসি হয়ে বললো, – আর তোমায় ভাবতে হবে না প্রিয়তম। তুমি আমার কথা রেখে থোড়া খানা খেয়ে নিদ্ যাও—আ ম এলাম বলে। এই বলে সোনী আর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি পোষাক পরিবর্তন করে উঠে দাড়ালো। বললো,—রাত প্রায় অনেক হল, আমি বাজারের এক সরাইখানায় তোমার খানার জন্যে বলে যাচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর। আর আমার যদি ফিরতে বিলম্ব দেখ, তাহলে তুমি ঘরের তালা বন্ধ করে চাবিটা ঐ কার্পেটের দোকানে দিয়ে যেও।

লুতুফ আলি বিদায় জানিয়ে হেসে বললো,—কোন দুশ্চিন্তা কর না। তুমি ঠিক কাজ উদ্ধার করে আসবে।

কিন্তু সোনীর যেন কেমন মনে হল, সে ফিরবে না। সে ধরা পড়বে। তার মৃত্যুদণ্ড হবে। পরবর্তী সুখ আর তার জীবনে জুটবে না। এই আগন্তুক তার মনে যে আশা প্ররোচিত করছে, সে আশা শুধু আশারই ছলনা। তার চোখে হঠাৎ হুহু করে জল এসে পড়লো। দেহের মধ্যে কান্নার উদ্বেল ঢেউ তাকে আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। সে আর নিজেকে রোধ করতে পারলো না। ছুটে গিয়ে লুতুফ আলির কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, তোমাকে ছেড়ে যে আমার যেতে ইচ্ছে করছে নাগো! এমন করে দিলের মধ্যে আশা পুরে দিলে কেন? কেন আমাকে নতুন জীবনের ছবি দেখালে? আমি রূপজীবিনী, আমি কসবী। পথ বিলাসিনী। পথচারীকে প্রলোভিত করে দেহবিক্রী করাই আমার ব্যবসা। এই জীবন ছাড়া তো আমি আর কোন কিছু চাই নি!

লুতুফ আলি কি বলবে, শুধু সস্নেহে সান্ত্বনা দেওয়ার মত সোনীর পিঠে হাত বুলোতে লাগলো। সোনীর চুলগুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে সোহাগ জানালো।

আর সোনী চোখের জলে লুতুফ আলির বুক ভিজিয়ে নিজের বুকের ভার লাঘব করতে লাগলো। হঠাৎ সোনী কান্না রোধ করে বললো,—একটা কথা বলবো—এই

বিদায়ের সময় তুমি আমাকে এমন কিছু দাও—যা আমার চলার পথে শক্তি হয়ে দাঁড়াবে।

লুতুফ আলি সোনীর মনের অভিপ্রায় বুঝে মনে মনে চমৎকৃত হল কিন্তু পরক্ষণে সে ভেবে নিল—সোনী যা চাইছে তা দিতে তার ক্ষতি নেই। ফুলবিবিও তো তার কাছে জোর করে কেড়ে নিয়েছে। আর এ তার কাছ থেকে প্রার্থনা করছে। বরং এ বারবনিতা হলেও স্বভাবের দিক দিয়ে অনেক সুন্দর। ভদ্র। তাছাড়া বিনিময়ে দিচ্ছে অনেক বেশী।

লুতুফ আলি প্রস্তুত হয়ে সোনীকে শয্যার ওপর তুলে নিল। তারপর কোন দ্বিধা না করে পুরুষ যেমন তার অধিকৃত রমণীকে নিবিড়ভাবে সোহাগ দান করে, তেমমি করে কানায় কানায় পূর্ণ করে দিল সোনীর অতৃপ্ত হৃদয়। সেই মুহূর্তে যেন যমুনার শান্ত স্রোতধারায় প্রবল ঢেউয়ের প্লাবন জাগলো। আকাশ, বাতাস, সব একাকার হয়ে কেমন যেন উন্মত্ততার কেশর ফুলিয়ে গর্জন করে উঠলো। একজন দিল, তার বিনিময়ে একটি বিরাট স্বার্থকে গ্রহণ করার জন্যে। আর একজন নিল, সে তার দয়িতের কাছ থেকে একটি সোহাগের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে। জানে না. সে ফিরবে কিনা! তাই সন্দিগ্ধ হয়ে একটু সোহাগের শেষ সম্বল বক্ষের সীমিতে ধরে রমণীর রমণীত্বে মহিয়সী হয়ে উঠলো।

সোনী আর অপেক্ষা করলো না, একটি বোরখায় আপাদমস্তক ঢেকে সে চলে গেল।

আর লুতুফ আলি একান্ত নিরুদ্বেগে সোনীর শয্যার ওপর শুয়ে সেই আর এক সোনীর কথা ভাবতে লাগলো। সেই সোনীর জন্যে সে যে আজ কত করছে. এই কথা সে যদি আসে তাহলে তাকে বলবে। বলবে,—তুমি আমাকে কি করে দিয়েছ জানো না সোনী! আচ্ছা, সে যখন সংবাদ পাবে—সে কি আসবে? কে জানে, সে কথা এখন এইমুহূর্তে আর ভাবাও যায় না।

তবু একবার শেষ চেষ্টা। অন্তত মনের মধ্যে কোন আক্ষেপ থাকবে না। লুতুফ আলি আর কিছু না ভেবে শয্যায় শুয়ে আরামে চোখ বুজলো।

আবার সেই রাত্রি নেমেছে মোহিনীরূপ নিয়ে। আসমানের জমিনে রূপোরঙের বিস্তার। নক্ষত্র নিশুতি রাত্রের প্রহরী হয়ে সলমা চুমকির বুটি জেলে অভিসারে বসেছে। বাতাসের মৃদুমন্দ চলাফেরা। সে যেন চুপিসাড়ে এই গভীররাত্রে কি করতে চায়। দূরে দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের আকাশ-ছোঁয়া শীর্ষগম্বুজ। তার ওপর চাঁদের আলো পড়ে বিচিত্র এক রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

সোনী একা সেই প্রাসাদের গম্বুজ লক্ষ্য করে পথ চলছিল। নির্জন পথ। কোথাও কোন জনমানবের সাড়া নেই। শুধু পথের দু'ধারে সারি সারি সাইপ্রাস ও

দেবদারু বৃক্ষ। যমদূতের মত তারা পথের দু'পাশে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির আলোকে আবরিত করেছে। সেজন্যে বেশ ঘন অন্ধকার। সেই অন্ধকারে মাঝে মাঝে জোনাকিদের টিপ টিপ আলো আর ঝিঁঝি পোকার ঐকতান।

সোনীর সেইসব দেখে আরো ভয় করছিল। একা এই গভীর রাত্রে কখনও সে বের হয় নি। রাত্রের এই নিস্তব্ধ জনপ্রাণীহীন পথের সঙ্গে তার কোনদিন পরিচয় ছিল না। নেই বলেই তার ভয় স্বাভাবিক। তার মনে হচ্ছিল, কে যেন ঐ দীর্ঘ সাইপ্রাস বৃক্ষের পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে আছে। এখুনি সামনে লাফিয়ে তার কণ্ঠনালি চেপে ধরবে। ঝিঁঝিদের ঐকতানের মধ্যে সে শুনতে পেল কোন অশরীরীর কান্না। কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পথিককে হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

একটি বিরাট মসজিদের সামনে এসে সোনী দাঁড়ালো। মসজিদের অসংখ্য সোপান শ্রেণী। অনেক উঁচুতে এক ফকির সাহেব বসে বসে গান গাইছেন। বড় মিঠা গীত। বড় দরদভরা কণ্ঠ। ভাষা সোনী বুঝতে পারলো না বটে কিন্তু করুণ মিনতি বুঝতে পারলো। আর বুঝতে পারলো বেদনা। বেদনার করুণ দীর্ঘশ্বাসে চুবানো কণ্ঠের আকুতিতে কত প্রার্থনা। তবে কি ফকিরসাহেব খোদাকে পাবার জন্যে এই গীত পেশ করছেন? না, প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা নিয়ে এই অতন্দ্র নিশীথে প্রার্থনায় বসেছেন! কোন্‌টা যে ঠিক সোনী সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলো না।

তবে তার মনে তখন যা হচ্ছিল, তারই ভাষায় সে ফকিরের গীতের অর্থ করলো। আগন্তুক তাকে সোহাগ দিয়েছে, আর সে বিনিময়ে দিতে চলেছে জান্। জান দেবার কথা মনে হতে তার মনে বেশ তৃপ্তি আসছে। এতদিন কত মরদের দিলে ক্ষণিক সুখের মোহ জাগিয়ে তার দেহ বিক্রি করেছে। কোনদিন কোন মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার কথা মনে হয় নি। নিছক বেঁচে থাকার জন্যে সে অর্থ উপার্জন করেছে! আজ সে অনুভূতি তার অপসারিত হয়েছে। আজ এইমুহূর্তে সে জান্ দিতে চলেছে মহৎ কাজের উদ্দেশ্যে। প্রাণ যে তার যাবে সুনিশ্চিত কারণ ঐ প্রাসাদে ঢুকলেই মৃত্যুদূত তাকে বন্দী করে প্রাণসংহার করবে। তবে তার আগে যদি সোনীবাঁদীকে খুঁজে পায় বড় ভাল হয়। তাহলে তার উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হবে। আর সেই আগন্তুকের কাজটি করে দিতে পারবে। আগন্তুকের কাজটি করলে তার কোন লাভ নেই। তবে জীবনে একটি ভাল কাজ করতে পারলো ভেবে মনে তৃপ্তি আসবে। আর আসবে পূর্ণতা ঘৃণ্যজীবনের জন্যে। ঘৃণ্যজীবনের ক্লেদাক্তে নিজেকে আহুতি দিয়ে সে বরবাদী জীবন যাপন করেছিল। অন্তত মরবার সময় এই ভেবে মরবে সে, তার জীবনে একটি মহৎ উদ্দেশ্যের ছায়াপাত হয়েছে।

আর আগন্তুক দিয়েছে তাকে সুখ। যে সুখ তার জীবনের আকাঙ্খা ছিল, অন্তত রমণীর কাম্য সেই দয়িতের সোহাগ একটিবার সে পেয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীরা যেমন পায়। আর সেই পাওয়াতেই তার যত সাহস। সেই সাহস নিয়েই সে বেরিয়ে পড়েছে এই প্রহরীবেষ্টিত প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করতে।

সোনী ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল। ভাবনা এসে মনের অলিগলি পূর্ণ করে

দিয়েছিল বলে তার ভয়ভাব অন্তর্হিত হয়েছিল।

তাই যখন সে শুনলো, প্রাসাদের তোরণদ্বারে প্রথম প্রহরের ঘণ্টাধ্বনি—তখন সে সচকিত হয়ে চতুর্দিকে তাকালো। দেখলো সে চলে এসেছে একেবারে সেই কাশ্মীরী তোরণদ্বারের সামনে। দূরে দেখা যাচ্ছে পাহারাদারদের। তারা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করে পায়চারি করছে চতুর্দিকে।

সোনী একবার বোরখাটি ভাল করে পরীক্ষা করে নিল। না, আবরণ তার ঠিকই আছে। মনে মনে কাকে যেন ডেকে বুকে সাহস সঞ্চয় করে সোনী এগিয়ে গেল সেই ফটকের দিকে। দুপাশে পাথরের বিরাট প্রাচীর। মাঝখান দিয়ে পথ। পথ নয় যেন গুহা। দিল্লীদুর্গের এই গুহা ভেদ করতে গেলে যথেষ্ট কৌশলের ভূমিকা নিতে হয়। সোনীর কিছুই জানা ছিল না। শুধু মনে ছিল সাহস। সে হঠাৎ মতলব করে নিল।

নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একটি পাহারাদারের সামনে দাঁড়ালো।

পাহারাদার হঠাৎ বিস্ময়ের চিৎকার করে হুঙ্কারধ্বনি ছাড়লো,—এই কৌন হ্যায় রে!

সোনী কথা বললো না হঠাৎ চোখে মোহিনীরূপ সৃষ্টি করে পাহারাদারের সামনে তার মুখের আবরণ মোচন করলো। চাপাস্বরে বললো, দিল্ চমকায় না?

বিস্ময়ে অবাক হয়ে পাহারাওয়ালা আবার চিৎকার করতে যাচ্ছিল কিন্তু দূরে অন্য সঙ্গীর দিকে চেয়ে সে মুখ বন্ধ করলো। শুধু লুব্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপাস্বরে বললো,—আরে বাসরে, এ যে বিজলী কা চমক? ক্যায়া মাংতা হ্যায় বিবি!

সোনী হেসে চোখে আবার বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলো কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

এ ক্যায়া হ্যায়! দিল্লাগী! এই বলে পাহারাওয়ালা হিহি করে হাসতে লাগলো। তার দু'চোখ দিয়ে কি যেন ঝরে পড়তে লাগলো।

তখন সোনী হঠাৎ পাহারাওয়ালার হাত ধরে ফেলে বললো,—সাচ বাত মেরে জী। আমি তোমার জন্যেই এই এতরাত্রে এসেছি।

পাহারাওয়ালা একেবারে বিগলিত হয়ে সোনীর ধরা হাতখানির দিকে তাকিয়ে রইলো।

এই সময় অন্য একটি পাহারাওয়ালা সেখানে এল। এসে আওরত দেখে সে আর সরতে চাইলো না। তাই দেখে সোনী বললো,—এই, তোমার ঐ দোস্তকে এখান থেকে চলে যেতে বলো না। আমার বুঝি সরম লাগে না!

প্রথম পাহারাওয়ালা সোনীর কথা শুনে হঠাৎ চটে গিয়ে পরের পাহারাওয়ালাকে ধমক দিয়ে বললো,—ক্যায়ারে, ক্যা দেখ্‌তা হ্যায়। ভাগ যাও হিঁয়াসে। আমার জেনানাকে দেখতে তোমার সরম লাগে না?

দ্বিতীয় পাহারাওয়ালা হি হি করে হেসে বললো,—তা জেনানাকে নিয়ে ঘর যাও না। এই মোহিনী রাত্রে ডিউটি নিয়ে কি ফটকেই মহফিল করবে ঠিক করেছ?

তুম্‌হারা ক্যায়া। যাও, ভাগ যাও। এই বলে প্রথম পাহারাওয়ালা আবার ধমক দিল।

দ্বিতীয় পাহারাওয়ালা একবার সোনীর দিকে চোখের বিদ্যুৎ হেনে অন্যত্র চলে গেল।

সোনী তাই দেখে অভিমানকণ্ঠে বললো,—দেখলে জী, তোমার দোস্ত কেমনভাবে তাকিয়ে গেল ?

শালা উল্লুকা বাচ্চা।

প্রথম পাহারাওয়ালা এবার সোনীকে সেখানেই আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে গেল।

সোনী দুপা সরে গিয়ে বললো,—এখন না জী। আমার একঠো কাম আছে। একবার জেনানা মহলে যেতে হবে। তুমি কোশিশ করে একটু জেনানা মহলের পথ দেখিয়ে দাও। তারপর আরো চাপাস্বরে বললো,—বেগমসাহেব এক খুবসুরত নওজোয়ান চেয়েছিল সেই খবরটুকু দিয়ে এসেই তোমার আশা পূরণ করবো।

এ সংবাদ নতুন নয়। জেনানামহলের এ সংবাদ গোপনীয় হলেও সবার জানা। তাই পাহারাওয়ালা বিশ্বাস করে বললো,—কিন্তু তুমি আসবে তো! শেষকালে দিল্ বিগড়ে দিয়ে চলে যাবে না!

সোনী কসম খেয়ে হেসে বললো,—কি যে বলো সিপাইজী? সে কখনও হয়। তোমায় দেখে যে আমারও দিল্ ধড়ফড় করছে। দিলের চাহিদাতেই আমি আবার তোমার কাছে আসবো। আর দেখছো না আসমানের দিকে তাকিয়ে! চাঁদনী রোশনী কেমন আলো ফেলে চতুর্দিক বিভোর করেছে, এ রাতে কি আর কিছু ভাল লাগে?

এই কথায় সিপাই কেন স্বয়ং বাদশাহ পর্যন্ত অনুগত হয়ে যেত। তাই সিপাই আবার বিগলিত হয়ে হেসে বললো,—তবে তুমি একটু দাঁড়াবে বিবি। আমি একটি অন্য সঙ্গীকে এখানে মোতায়েন করে দিয়ে যাচ্ছি।

পাহারাওয়ালা স্থানত্যাগ করলে সোনী মনে মনে একচোট হাসলো। কার্যোদ্ধার হতে তার আর বিলম্ব নেই। এখন বেগমসাহেবার মহলের কাছ পর্যন্ত যেতে পারলে সেই ফুলবিবির মহলে যেতে অসুবিধা হবে না। তারপর ফুলবিবির মহলে গিয়ে সোনীবাঁদী।

আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলো সোনী। নীলের চাদর বিছানো জ্যোৎস্না-লোকিত মধুময় আসমান। আসমানের জমীন নির্মেঘ। কোথায় থেকে বাতাসের সঙ্গে কুসুম ভেসে আসছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের মত বিরাট ফটক। ভেতর দিয়ে দেখা যায় নিবিড় অন্ধকারের কুহেলি! সেই অন্ধকার ভেদ করে ওপাশে কি আছে কিছুই কল্পনা করা যায় না।

এই সময় প্রথম পাহারাওয়ালা এসে বললো,—চলো বিবি! বেশী দেরি কর না যেন। বেগমসাহেবাকে কথাটি জানিয়েই চলে আসবে। এদিকে কেউ জানতে পারলে দু'জনেরই গর্দান যাবে।

সোনী কোন উত্তর না দিয়ে আবার বোরখার আবরণ ফেলে দিয়ে পাহারাওয়ালাকে অনুসরণ করলো।

দু'জনে সেই ফটকের নিবিড় অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চললো।

সোজাপথের চেয়ে ঘুরপথই বেশী। ইচ্ছে করে এই গোলকধাঁধা সৃষ্টি করবার জন্যে যেন ঘুরপথ।

সোনী যত এগোতে লাগলো. তত বিস্ময়ে হতবাক্ হতে লাগলো। এখানে যে সে কিছুতে একা আসতে পারতো না, সেই কথাই বার বার স্মরণ করতে লাগলো। কত দালান, কত বাগিচা কত দরজা, কত গলি, তার ইয়ত্তা নেই। পাথর, পাথর আর পাথর। হর্ম্যতলে পাথরের জমি। পাশের প্রাচীরে পাথরের ঘেরাটোপ। তারপর বড় বড় থামের সারি। রাত্রিবেলা তাদের যেন এক একটি বিরাট দৈত্যের মত মনে হতে লাগলো।

সোনী যেন এক বিরাট রাজসিকতার মধ্যে হারিয়ে গেল। একটি ফুলবাগিচার পাশ দিয়ে তারা চলছিল। চন্দ্রের আলো পড়ছে সেই প্রস্ফুটিত রঙবেরঙের পুষ্পস্তবকে। দোল খাচ্ছিল বাতাসে সেই পুষ্পগুলি। এ সৌন্দর্য সোনীর অজানা। তাই সে পুলকিত হল। আরো পুলকিত হল যখন মর্মরখচিত স্ফটিকস্তম্ভের ওপর আতর সুবাসিত ফোয়ারা দেখলো। সুন্দর গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত হয়ে উঠেছে! হৃদয়ে যেন আপনা থেকে কি এক মাতনের সাড়া জাগে। শরীরে যেন কি এক শিহরণ।

সোনী পুলকিত, চমকিত হয়ে বার বার বাধা পেতে লাগলো। যত সে বাধা পায় তত তার আরো বিস্ময় চোখের তারায় রোশনাই জ্বালে।

এক সময় সিপাই থমকে দাঁড়িয়ে বললো,—এবার তোমায় নিজেই জেনানামহলে যেতে হবে। সেখানে কোন মরদের প্রবেশ নিষেধ। তারপর হেসে বললো,—তবে বেআইনি মরদের সবসময়ে অবারিত দ্বার।

এই বলে সেই সিপাই আরো কাছে সরে চাপাস্বরে বললো.—কিন্তু কাজ ফতে হলে যেন পালিয়ে যেও না। আমার নাম বুর্বাক আলি। যে কেউ ফটকের কাছে ডিউটি দেবে, তাকে আমার নাম বলবে, সেই তোমাকে আমার কাছে নিয়ে যাবে।

সোনী মাথা নাড়তে সেই সিপাই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর সোনী পড়লো বিপদে। সামনেই একটি বৃহৎ দরজা। এই দরজার ওপারে আছে জেনানামহল। অর্থাৎ বাদশাহের হারেম। সোনী ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে দেখলো কিন্তু তাতেও সে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লো। দরজা দরজা আর দরজা। কোথাও অনেকখানি ফাঁকা জায়গা নেই। খণ্ড খণ্ড করে কেটে প্রাচীর ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এক অংশ থেকে অন্য অংশের যোগসূত্র একটি দরজা। সেই দরজা বন্ধ করে দিলে আর কোন সম্বন্ধ নেই। এমনি কৌশল করার কারণ বোধহয় অপরিচিতের বাধা উপস্থিত করার জন্যে। কেউ হঠাৎ প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে পড়লে পথ ঠিক করতে পারবে না বলেই এই পরিকল্পনা। যেমন সোনীর অবস্থা হল। পাহারাদার তাকে নিয়ে এসেছিল বেশ। বন্ধ দরজার গায়ে টোকা দিয়ে দরজার মুখে প্রহরীকে পরিচয় দিয়ে প্রবেশ করেছিল। আর নিরুদ্বেগে সোনী পাহারাদারকে অনুসরণ করে এ পর্যন্ত এসেছিল।

কিন্তু তারপর এই জেনানামহলের প্রথম দরজার সামনে ছেড়ে দিয়ে যেতেই তার উদ্বেগ শুরু হল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে সেইজন্যে ভাবলো, একদৃষ্টে উন্মুক্ত নীল আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখলো, নিস্তব্ধ প্রাসাদপুরীর বুকে কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করলো। তারপর মনে মনে বললো,—আমি তো মরবার জন্যেই এসেছি। তাহলে আমার ভয় জাগছে কেন? মরবার আগে যদি সেই দুর্লভ মুসাফিরের কাজটি করতে পারি, তাহলে মরা আমার সার্থক হবে। অন্তত সেই মুসাফির জানবে, সে কসবী হলেও বেইমান নয়। রমণীর মনের আসল ধর্ম প্রকাশ করে সে মৃত্যুকে বরণ করতে জানে।

এই সব কথা ভেবে তার মনে সাহস এল। সে আর বিলম্ব না করে সম্মুখের সেই বৃহৎ দরজায় টোকা দিল। টোকা দিতে দরজাটি খুলে গেল, সামনে এক খোজা প্রহরী।

সোনী চাপাস্বরে বললো,—বেগমকর্ত্রীর মহলে যাবো।

কি প্রয়োজন?

প্রয়োজন গোপনীয়।

খোজা প্রহরী আর কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করলো না। বেগমকর্ত্রীর লোক ভেবে সে পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালো।

সোনী ঢুকে গেল কিন্তু কয়েক পা গিয়ে সে একটা মতলব করে থমকে দাঁড়ালো।

খোজা প্রহরী রমণীকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে জিজ্ঞেস করলো,—কি ব্যাপার? দাঁড়ালে কেন?

সোনী ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললো,—ফুলবিবির মহলটা একবার দেখিয়ে দেবে? ফুলবিবিকে সঙ্গে নিয়ে বেগমকর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে হবে। আমি ফুলবিবির মহলটা জানি না বলে তোমায় এই তক্‌লিফ দিতে চাইছি।

খোজা প্রহরী এই কথায় কিন্তু সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এল না। হঠাৎ সন্দেহের চোখে সোনীর দিকে তাকিয়ে বললো,—তুমি ফুলবিবির বাদী না বেগমকর্ত্রীর বাঁদী, স্পষ্ট করে বলো।

সোনী প্রহরীর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলো এবং বুঝতে পারলো, ফুলবিবি এখানে খুব সম্মানের স্ত্রীলোক নয়। তাই সে বুদ্ধি করে হেসে বললো,—আসলে বেগমকর্ত্রীর কাছেই যেতে চাই। তবে ফুলবিবিকে সঙ্গে নিতে এইজন্যে যে ফুলবিবির বিরুদ্ধে আমার কিছু আর্জি আছে।

প্রহরী বিশ্বাস করলো এবং সে পরমুহূর্তে হেসে বললো,—তোমার আর আর্জি পেশ করতে হবে না বিবি। ফুলবিবি সব আর্জির শেষ করে দিয়ে আজ বাদশাহের হুকুমে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

সোনী শুনে গালে হাত দিয়ে বললো,—আরে বাসরে, সে কি কথা? ফুলবিবি হঠাৎ বাদশাহের রোষে পড়লেন কেন?

প্রহরী চতুর্দিকে তাকিয়ে আরো চাপাস্বরে বললো,—সে এক বিশ্রী কাণ্ড! বেগম

সাহেবা ফুলবিবির এক খাস বাঁদী সোনীর প্রাণদণ্ড দিয়ে বসলেন। পরে জানা গেল, সেই বাঁদী বাদশাহের বেটি ছিল। শুধু এখানে ছদ্মবেশে ছিল এইজন্যে, বাদশাহের শাদী করা বেগমের পয়দা ছিল না বলে। যাহোক বাদশাহ মৃত্যু পরোয়ানায় সই করতে গিয়ে ব্যাপারটা জানতে পারলেন। আর তারপর বেগম কর্ত্রীকে কিছু না বলতে পেরে ফুলবিবির গর্দান নিয়ে বসলেন। কারণ ফুলবিবির আর্জিতেই এই সোনী শাস্তি পেল, একথা বাদশাহ শুনেছিলেন।

তারপর প্রহরী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললো,—তাই বলছি বাপু, দিনকাল বড় ভাল নয়। দু'দুটো রমণীর প্রাণদণ্ড হয়ে গেল। বাদশাহ এবার ঢালাও হুকুম দিয়েছেন, তিনি জেনানা মহলের কর্তৃত্ব নিজের হাতেই নেবেন। তা তুমি এই নিশীথে বেগম কর্ত্রীকে যা জানাবার চটপট জানিয়ে সরে পড়। বাদশাহের বেগম কর্ত্রীর ওপরও কোন আস্থা নেই।

সোনী তখন মনে মনে ভাবছিল, সে যে কাজের জন্যে এসেছিল, সে কাজ তো তার শুরুতেই সাঙ্গ হয়ে গেল। সুতরাং এখানে থেকে আর কি হবে! সোনী গেছে, ফুলবিবিও গেছে। মনে পড়লো তার সেই মুসাফিরের দোস্তের কথা। দোস্ত এই সোনীর জন্যে বেশারীতে পড়ে আছে। এখন এই সংবাদ যখন শুনবে, তখন কি হবে?

যাহোক সংবাদটা যে ঝুট্ নয় সে বুঝলো, বুঝে সে প্রাসাদ থেকে চলে যাবার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সোনীকে ফিরতে দেখে প্রহরী বললো,—একি তুমি বেগমসাহেবার মহলে যাবে না?

সোনী অনিচ্ছা প্রকাশ করে বললো,—থাক গে, হারেমের যখন এমনি গণ্ডগোল শুনলাম তখন গিয়ে আর কাজ নেই। শেষকালে প্রাণটা কি খোয়া যাবে বাদশাহের হুকুমে?

খোজা প্রহরী হঠাৎ একটি কাণ্ড করলো, জোরে হাতের তালি বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলো।

সোনী বুঝতে পারলো ব্যাপার। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ছুটে পালিয়ে যেতে গিয়েই কয়েকজন খোজার হাতে বন্দী হয়ে গেল।

সোনী ভয়ে চিৎকার করে বললো,—একি তোমরা আমাকে বন্দী করছো কেন? আমাকে ছেড়ে দাও আমি চলে যাচ্ছি। আমি আর কখনও এখানে আসবো না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। প্রহরীরা তাকে সবলে ধরে টানতে লাগলো নিয়ে যাবার জন্যে। আর পূর্বের প্রহরীটি দাঁত বের করে হাসতে লাগলো।

সোনী আবার আর্তস্বরে বললো,—তোমরা নিশ্চয় পাহারাদার বুর্বাক আলিকে চেনো? বুর্বাক আলির আমি জোরু। আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।

কিন্তু অপর পক্ষ থেকে আর কোন উত্তর এল না।

শুধু সেই প্রাসাদের নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সোনীর আর্ত চিৎকার বাতাসে প্রতি-

ধ্বনি তুললো।

তাকে টানতে টানতে প্রহরীরা নিয়ে চললো কারাকক্ষের দিকে।

সোনী কাঁদতে লাগলো। চোখের জলে তার বুক ভেসে যেতে লাগলো। সে স্মরণ করলো লুতুফ আলিকে। মেহমান মুসাফির হয়তো তার আশায় প্রহর গণনা করছে। তার একটি সংবাদে দোস্তের জীবন বাঁচবে কিন্তু সে সংবাদ সে নিয়ে যেতে পারলো না। মৃত্যু তার হবে। বাদশাহ তাকে বিনা হুকুমে প্রবেশের জন্যে চরম শাস্তি দেবেন। মৃত্যুর জন্যে সে ভয় করে না। এক মুসাফির হঠাৎ তার জীবনের শেষ মুহূর্তে রমণীর সম্মান দান করেছে। আর তার জন্যে কিছু করতে পেরেছে বলে মনে তৃপ্তির আস্বাদ এসেছে। সুতরাং মৃত্যু তার আশীর্বাদ। আর কান্না তার চোখে অন্য কারণের জন্যে। সে হঠাৎ কান্না থামিয়ে স্থির হয়ে প্রহরীদের সঙ্গে চলতে লাগলো।

দিল্লীর বুকে প্রভাত নেমে এলো।

প্রভাতের অসামান্য রোশনীতে বিহঙ্গদের কলকাকলি শোনা গেল।

দিল্লীর চক বাজারের বিপণিতে বিপণিতে আবার সাড়া জেগে উঠলো। মনুষ্য কলরবে মুখরিত হল বিস্তীর্ণ চক মহল।

লুতুফ আলি সেই সোনীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার মনটি দারুণ চঞ্চল। কেবলই কান পেতে শুনতে লাগলো সোনীর পায়ের শব্দ। শুধু সোনী নয় তার সঙ্গে আর একজন স্ত্রালোকের সে আশা করতে লাগলো। প্রত্যাশা তার এখনও শেষ হয় নি। আশা এখনও দুরাশায় পরিণত হয় নি।

সারা রাত্রিই সে সেই অপরিচিতার ছোট্ট বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। ঘুম তার এসেছিল। ক্লান্ত শরীরে নরম বিছানার কোলে শুয়ে তার চোখে আমেজের ঘোর নেমেছিল। কিন্তু যতবারই তার চোখ দুটি বুজে গেছে, মনটি অতলে নেমে গিয়ে নিস্তেজ হয়ে গেছে ততবারই সে চমকে জেগে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি বড় হয়ে গেছে। কান দুটি সজাগ হয়ে কি শোনবার চেষ্টা করেছে। সোনীর পায়ের শব্দ শোনার জন্য মনপ্রাণ একাগ্র হয়ে গেছে। কিন্তু তাকে প্রতীক্ষার পল গুণে শেষ পর্যন্ত বিফল হতে হয়েছে। আশা যত নিরাশার মধ্যে শেষ হয়েছে, উৎসাহ তার তত স্তিমিত হয়ে গেছে।

তবু সে মনকে প্রবোধ দিয়েছিল এই ভেবে যে, যাকে সে পাঠিয়েছে, সে বেইমানী করতে পারে না। সে কার্যোদ্ধার করে ঠিক ফিরবে। চতুরা রমণী ঠিক প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করে যোগ্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করবে, তারপর হয়তো তাকে সঙ্গে নিয়েই ফিরবে। সঙ্গে নিয়ে ফেরার জন্যেই এত দেরী হচ্ছে। তা হোক্ গে।

বিলম্বে যদি আনন্দের পরিণতি সৃষ্টি হয়, সে বিলম্ব যত পারে অস্থির করে তুলুক। সেই কথা ভেবেই লুতুফ আলি সোনীর বিছানায় শুয়ে সারারাত্রি কাটালো। সোনী চলে যাবার পর চক বাজারের সরাইখানা থেকে তার খানা দিয়ে গিয়েছিল। বেশ উত্তম খানা। সোনী যে অতিথির জন্যে ভাল ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছে, তা তার সেই-মুহূর্তে খানার বহর দেখে বুঝেছিল। আর মনে মনে লুতুফ আলি হেসেছিল এই ভেবে, যখন এই আওরতটি তার দ্বারা দুর্ব্যবহার পাবে, তখন কি তার অবস্থা হবে?

লুতুফ আলির দুর্ব্যবহার করতে মনে লাগবে। তবু উপায় কি? দুনিয়ার নিয়মই এই। স্বার্থসিদ্ধি করার জন্যে লোকে যেমন অন্যকে ঠকায়, সে তেমনি করেছে। এর জন্যে নিয়মই দায়ি সে নয়। তবু সোনীর জন্যে সে একটু ভাববে। যদি সেই আর এক সোনী আসে তাহলে তাকে নিয়ে ঘর বেঁধে এই সোনীকে বাঁদী করবে। রূপজীবিনীকে আর কি সম্মান দেওয়া যায়? যার জীবন ভাগ্যদোষে ঘৃণ্য হয়েছে, তাকে তো আর উচ্চাসনে স্থান দেওয়া যায় না।

তবে এ সব কথা পরের বলে লুতুফ এ সব চিন্তা পরে ভাববে বলেই রেখে দিল। শুধু সে ভাবতে লাগলো সেই হারেমের কথা। তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে সোনীর কিছু হয় নি তো! কোন বিপদ! ফুলবিবি যে ধরণের রমণী, তার অসাধ্য কিছু নেই। তবে সোনীও ফুলবিবির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তারও যথেষ্ট শক্তি আছে সেই মুহূর্তে লুতুফ বুঝেছিল। শক্তি না থাকলে কখনই সে লুতুফ আলিকে কারাগার থেকে বাইরে বের করে দিতে পারতো না।

অন্ধকার ঘর। লুতুফ আলি ইচ্ছে করেই স্বল্প আলোর বর্তিকাটি আলোহীন করেছিল। অন্ধকার ঘরে ভাবনার হাতপাগুলি বেশ সহজ ভাবে চলাফেরা করে। বেশ স্বাধীনভাবে শান্তমনে ভাবা যায়। তাছাড়া অন্ধকার করার আর একটি কারণ ছিল, সোনীর এই ঘৃণ্য ঘর ও ঘৃণ্য শয্যা। এখানে কত পুরুষের পদধূলি পড়েছে কে জানে? কত ব্যভিচারের ক্লেদ এই ঘরের বাতাসে ছড়ানো আছে তার ইয়ত্তা নেই। তাই অন্ধকার করে লুতুফ আলি সেই ঘৃণা ভুলতে চায় সে এক বারবনিতার শয্যায় শুয়ে রাত কাটাচ্ছে। সোনীকে প্রয়োজন না হলে সে এই বাজারের মেয়ে-লোকের ঘরে রাত কাটাতো না। দিত না তার হৃদয়ের সোহাগ। নিত না কোন ঘৃণ্য ক্লেদসর্বস্ব দেহের তৃপ্ত আস্বাদন।

যাহোক সবই অমৃতের মত মনে হবে, যদি সে তার চাওয়া বস্তুকে পায়। তাই সারারাত্রিই সে নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রতীক্ষা করতে লাগলো। সেদিনের তার সে প্রতীক্ষা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

একদিন একটি সুন্দরমনের আওরতের জন্যে লতুফ আলি বলে এক আরববাসী দিল্লীর চক বাজারের এক মেয়েলোকের শয্যায় সারারাত্রি কাটিয়েছিল।

এই কথাগুলিই জ্বলন্ত হয়ে থাকবে।

আর কি কিছু থাকবে না?

লুতুফ আলি বোধ হয় ভাবে না কিন্তু থাকবে আর একটি মেয়েলোকের এক নিঃস্বার্থ আত্মদান! চক বাজারের পিছনের অংশে যে রূপসীরা বাস করে, তাদের জীবন হয়তো অনেক পণ্যের। তারা দেহবেসাতি করে ক্ষুদ্র জীবন নির্বাহ করে, এক বিশ্রী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তারপর জীবন আহুতি দেয়। সেই অন্ধকার অংশের আর কোন ইতিহাস নেই কিন্তু ইতিহাস তৈরী হল সেদিন, যেদিন লুতুফ আলি সেখানকারই এক মেয়েলোকের ঘরে সারারাত্রি কাটালো। আর সেই মেয়েলোকের সামান্য একটু পাওয়ার বিনিময়ে দিল অনেক বড় প্রতিদান।

নিজের প্রাণ।

লুতুফ আলি তারপরের ঘটনা আর কিছু জানতে পারলো না, কিন্তু যদি জানতে পারতো?

লুতুফ আলি শুধু ভাবতে ভাবতে ভোরের মুহূর্তে এসে থামলো। গবাক্ষ দিয়ে দিনের আলো এসে ঘরের অন্ধকার বিদূরিত করলো। আর সঙ্গে সঙ্গে লুতুফ আলি পালঙ্ক থেকে নিচে নামলো।

আর এখানে নয়। অনেক হয়েছে। সে আর আসবে না। একটি রাত্রি বিদায় নিল। কয়েকটি ঘণ্টা দুনিয়া থেকে চলে গেল।

প্রত্যাশার দীপ জ্বলে জ্বলে শেষ হয়ে গেল।

লুতুফ আলি সোনীর ঘরের দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে পড়লো। তার মনে থাকলো না, বার বার করে সোনী বলে গিয়েছিল, তার আসতে যদি দেরী হয়, যেন ঘরে তালা বন্ধ করে চাবিটি কার্পেটের বিপণিতে দিয়ে যায়। কত মেহনত করে এই আসবাবপত্রগুলি সে করেছে। মেহনতের মূল্য, খোয়া গেলে প্রাণে লাগবে।

সোনী হয়তো থাকবে না কিন্তু তার মহামূল্য সম্পদ যোগ্য কাজে লাগলে তার আত্মার মুক্তি হবে। এই অনুমানেই হয়তো সে বার বার করে লুতুফ আলিকে ঘরটি বন্ধ করে যেতে বলেছিল।

কিন্তু লুতুফ আলির মনের অবস্থা তখন এমনি যে তার সে কথা স্মরণে থাকলো না। থাকলেও হয়তো সে সোনীর আসবাবের নিরাপত্তার জন্যে ভাবতো না। সোনীর উপর তার সমস্ত আস্থা চূর্ণ হয়েছে। সে ভাবতে শুরু করেছে, মেয়েলোকটি তাকে প্রবঞ্চনা করে সরে পড়েছে। আসলে তাকে সারারাত্রি ঘরের পাহারাদার করে অন্য কোথাও গিয়ে আনন্দ লুটেছে। সে ভুলই করেছিল। যাদের কোন চরিত্র নেই, তাদের কথায় বিশ্বাস না করাই উচিত ছিল। বরং লাভবান হয়েছে সেই কসবীই। সে তার কাছ থেকে আনন্দ গ্রহণ করেছে, আর অন্য কোথাও গিয়ে আবার উপরি পাওনা নিয়েছে। এখন যদি ফিরে এসে একটি বানানো গল্প বলে তাও হয়তো সে বিশ্বাস করবে।

তাই সে তাড়াতাড়ি কটি মোহর থলি থেকে বের করে বিছানার ওপর ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল। তার মনে এক দারুণ আফসোস এল। আগে যদি সে এ কথা ভাবতো, তাহলে নিশ্চয় এই কৌশল গ্রহণ করতো না। সে চালাকী করতে গেল,

উলটে আর একজন তাকে ঠকিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। যাকগে, নসীবের বিরুদ্ধে তো কিছু বলার নেই। যা হবার হয়ে গেছে।

লুতুফ এসে দাঁড়ালো আবার সেই চকবাজারের চৌমাথার মুখে।

গত সন্ধ্যার সময় এসে সে চকবাজারের আর একরূপ দেখেছিল, এবার দেখলো অন্যরূপ। সূর্যের প্রথম স্নিগ্ধ আলো এসে পড়েছে বিপণিগুলির রকমারী দ্রব্যসম্ভারের ওপর। এক একটি লোভাতুর দ্রব্যের ওপর সূর্যের আলো পড়ে আরো রোশনাই ছড়িয়েছে। যেন প্রাসাদে নাচমহলের দর্পণে দেয়ালগাত্রে আলোর প্রতিফলন। যেন হারেমের সারি সারি যৌবনবতী রমণীরা এই বিপণিগুলিতে এসে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে।

লাসা, নাখলা, বগদাদের বাজারও দেখেছে লুতুফ আলি কিন্তু এই দিল্লীর বাজার যেন পৃথিবীর সমস্ত বাজারকে ছাড়িয়ে গেছে।

আরো হয়তো প্রাণভরে এইসব দ্রব্যসম্ভারের জৌলুস উপভোগ করতো। সওদাও করত দু চারটে কিন্তু সে সময় মনটির এমন অবস্থা যে, লুতুফ আলি অন্যকিছু ভাবতেই পারলো না।

তখনও সে সতৃষ্ণনয়নে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। একবার সেই সোনীকে দেখতে পেলে হয়! দূরে প্রাসাদের উঁচু গম্বুজের দিকে তাকিয়ে দেখলো লুতুফ আলি। এখান থেকে প্রাসাদের শীর্ষগম্বুজ অনেক দূর। তবু আকারে ছোট দেখালেও একেবারে অদৃশ্য নয়।

লুতুফ আলি সেই দূরবর্তী প্রাসাদের মাথার ওপর কটি শকুনকে এই সকালেই চক্রাকারে ঘুরতে দেখলো।

হঠাৎ তার চোখদুটি কেমন ঝাপসা হয়ে এল। কেমন যেন বিবশ। চোখের তারাগুলি বড় বড় হয়ে কেমন যেন স্থির হয়ে গেল। কেমন যেন সে অসুস্থ হয়ে শুধু মাতালের মত সেই কার্পেটের বিপণিওয়ালার কাছে গেল, তারপর অশ্বটি গ্রহণ করে তার ওপর সওয়ার হয়ে বসলো।

সম্মুখে একটি দীর্ঘ পথ। লুতুফ আলি সেই বিবশ চোখেই কেমন যেন অচেতন অবস্থায় অশ্ব ছুটিয়ে দিল। অশ্ব তীরবেগে সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ছুটে চললো। লুতুফের মনে আর কোন পিছনের আকর্ষণ থাকলো না। সে প্রাসাদের বিপরীত পথধরেই ছুটে চলছিল। তাই পিছন ফিরে সে একবারও প্রাসাদের দিকে তাকালো না। তাতেই বোঝা গেল সে সব আকর্ষণ কাটিয়ে অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

সোনায় মোড়া আসমানের বক্ষ। তার প্রতিফলন পথের বুকেও। আবার সেই যমুনা। যমুনার কলস্রোত। সোনার রঙ সেই স্রোতের ঢেউতেও। কিন্তু লুতুফ আলির সে সব দিকে খেয়াল নেই। তার গতি দুর্বার। ঝড়ের সঙ্গেই সে গতির মিল হয়।

কিন্তু লুতুফ কোথায় চলেছে? কোন্ নিরুদ্দেশের পথে তার আবার জীবন পরিক্রমা। কোন পরিকল্পনা তো সে করলো না! কোন সঙ্কল্প তো সে নিল না!

তবে এই চলা কোথায় গিয়ে থামবে ! তবে কি সে হারিয়ে যাবার জন্যেই এই ঝড়ের গতি গ্রহণ করলো ? কিন্তু কেন সে হারিয়ে যাবে ?

'হানিফ আছে। তার একমাত্র স্মৃতি। সে এক অনাত্মীয়ার কাছে আছে। তার জন্যে লুতুফ আলি একবার ভাববে না !

তারপরে এ কাহিনীর পট উন্মোচন হল চারবছর পরে।

সেই বিতস্তার কাছে শিখসর্দারজীর সরাইখানা। সেদিন তখন মেঘলা রোদের ক্লান্ত আমেজ প্রকৃতিকে আচ্ছাদিত করেছিল। জলভরা আঁখিতে ছলছল চাউনি নিয়ে মেঘের স্থির অবস্থান।

এক ফকির মুসাফির একমাথা চুল ও একমুখ দাড়ির জঙ্গল নিয়ে ছিন্ন ও অপরিচ্ছন্ন পোষাকে সেই সরাইখানার সামনে এসে দাঁড়ালো। তার চোখদুটি কেমন যেন নিষ্প্রভ, মুখখানি উৎসাহহীন। শরীরটি বয়ে চলতে হয়, তাই সে চলছে—এমনি তার অবস্থা।

সরাইখানার দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে একটি বালক তাকে দেখে ভ্রূকুটি করলো। তারপর কাছে গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে বললো,—এখানে কিছু হবে না। মাপ কর।

ফকির ছেলেটির কথা শুনে অল্প হাসলো। তারপর সস্নেহে বললো, আমি ভিখ্ মাঙতে আসি নি বেটা। সর্দারজীকে একবার ডেকে দেবে, আমি সর্দারজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

ছেলেটি ব্যাপারটা ঠিক অনুধাবন করতে পারলো না। তাই একটু সন্দিগ্ধ হয়ে বললো,—সর্দারজী বলে এখানে কেউ নেই। তুমি ভুল করেছ ফকিরসাহেব। দোসরা সরাইখানায় যাও। এখানে আমি, আমার বাচ্চা বহিন ও আম্মা থাকি। আমি এই সরাইখানা তদারক করি, আর আম্মা ছোট বহিনকে নিয়ে ভেতরে থাকে। আম্মা কখনও এই সরাইখানায় আসে না, কোন বিশেষ প্রয়োজন হলে তবে এখানে আসে।

ফকিরসাহেব ছেলেটির কথায় কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গেল। তবে কি সে ভুল করলো ? কিন্তু ভুল তো হবার কথা নয় ! সেই কাঠের বাড়ি। সেই সামনের ছোট্ট ফুলের বাগান। নিচের সরাইখানার পাশ দিয়ে উপরে যাবার সিঁড়ির পাশের ঘরেই তার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হয়েছে। যেখানে সে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সেখানে একটি কাঠের কেদারা থাকতো, তার ওপর সর্দারজী অতি বিনয়ে চুপ করে খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। আজ সেখানে সেই কেদারাটি নেই। নেই বলেই কি ভাবতে হবে, সব পরিবর্তন হয়ে গেছে ! তারপর ওপাশের ঘরে সেই সৈনিক থাকতো, এখন দেখা যাচ্ছে সে ঘরটি ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে। দরজার পাশে

একটি ভাঙা পাল্লা অবহেলায় বাইরের দেয়ালে ঠেসান দিয়ে রাখা আছে।

না, এ হতে পারে না। সে ভুল করে অন্য জায়গায় আসেনি। এই সরাইখানার ছবিটি সে কিছুতে ভুলতে পারে না। এখানে তার জীবনের শেষ সম্বল গচ্ছিত রেখে গেছে। ওপাশে ঐ সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়েই সে সর্দারজীর কাছে অনুরোধ করেছিল—শাওনীকে একবার দেখা করার জন্যে। আর শাওনী অন্তঃপুর থেকে উত্তর পাঠিয়েছিল, দেখা হবে না।

সবই সেই আছে। শুধু মানুষগুলি যেন পালটে গেছে। সেই সর্দারজী নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার কেদারাটিও অদৃশ্য হয়েছে। পরিবর্তে একটি বাচ্চা লডকা সরাইখানা তদারক করছে। হঠাৎ তার মনে হল, সর্দারজী কি সরাইখানা বিক্রি করে দিয়ে গ্রামে চলে গেছেন? কি যে হয়েছে সে কিছুই আর অনুমান করতে পারলো না। চার বছর গত হবার পর এই পরিবর্তন যেন তাকে বিস্মিত করলো। শুধু এই সরাইখানাই পরিবর্তন হয়নি, যেখানেই তার পরিচিত জায়গায় গেছে, সেখানেই দেখেছে আমূল পরিবর্তন। যেন জগৎটা এই চার বছর ধরে একলাফে খোলস পালটে ফেলেছে।

ছেলেটি আবার কাছে এগিয়ে এসে বললো,—তুটি খানা খাবে? আম্মা বললো তোমাকে তুটি খানা খাইয়ে বিদায় দিতে।

ছেলেটি যে এর মধ্যে অন্তঃপুরে ঘুরে এসেছে, সেই কথা ভেবে ফকির বিস্মিত হল, বললো,—তোমার আম্মা তো বেশ দয়ালু রমণী।

ছেলেটি আম্মার প্রশংসায় বিগলিত হয়ে বললো,—আমার আম্মা বহুত আচ্ছা আছে।

ফকির মনে মনে হাসলো,—সন্তানের কাছে কার আম্মা না ভাল হয়? শুধু আব্বাই যত দোষ করে।

ছেলেটি আবার বললো,—তাহলে খাবে তো! তুমি বললে আবার ভাত রাঁধতে হবে কিনা!

ফকিরসাহেব মাথা নেড়ে বললো,—না।

ছেলেটি হঠাৎ চটে গেল। বিরক্ত হয়ে বললো,—না কেন? তুমি বুঝি ভাবছো, ভিখ্ মেঙে খাবে বলে আমরা তোমাকে লজ্জা দেব? সে সব ভেব না। আমরা মাঝে মাঝে এমনি অতিথি সৎকার করি। আম্মাজী মেহমানের কথা শুনলেই তার খানা দিয়ে দেয়।

ফকির বললো,—তোমার আম্মাকে বলো, খোদা তার ভাল করবে। আমি ভিখ্ মেঙে কোথাও খাই না।

ছেলেটি হঠাৎ ছেলেমানুষের মত বললো,—তাহলে তুমি এই দুপুরবেলা কি খাবে? অভুক্ত থাকবে তো!

ছেলেটির কথায় ফকির মৃদু হাসলো। হঠাৎ তার মনটি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। তারও লড়কাটি যদি বেঁচে থাকে, তাহলে সেও এমনি হয়েছে। এমনি

দরদভরা মন ? এমনি পরের জন্যে মনের মধ্যে দুখ্ !

ফকিরসাহেব হঠাৎ সেই ছেলেটির থুতনি ধরে আদর করে বললো,—আমি ফকির আছি বেটা ! খোদার ওপর ভরসাই আমার জীবন। খানার জন্যে আমার কোন কষ্ট করতে হয় না।

ছেলেটির বোধ হয় মন মানলো না, সে ছুটে একদৌড়ে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। এবং সঙ্গে নিয়ে এলো একটি রমণীকে। রমণীটির মুখটি আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত ছিল বলে ফকির তার মুখ দেখতে পেল না কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনেই সে বিস্মিত হয়ে গেল।

রমণীটি কাছে এসে বললো,—আপনি মেহমান আদমী ? এই দুপুরবেলা আহার না করে যাবেন না !

সেই কণ্ঠ। না, এ কিছুতে ভুল হবার নয়। ফকির হঠাৎ একটি অসমসাহসিক কাজ করলো। অপরিচিতা জেনানার কাছে সরে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বললো,—বহিন শাওনী !

রমণীটির অবগুণ্ঠন খসে পড়লো। সে বিস্মিত হয়ে বললো,—কে তুমি ? এ যে মনে হচ্ছে আমার সেই ভাইসাহেবের কণ্ঠস্বর ! সে বিস্মিত দু' চোখে ফকিরের দিকে সন্দিগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকলো।

ফকির বললো,—হ্যাঁ শাওনী, আমিই তোমার সেই ভাইসাহেব, লুতুফ আলি।

শাওনী বললো,—কিন্তু তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ? আর এই অবস্থাই বা তোমার হয়েছে কেন ?

লুতুফ আলি হেসে বললো,—সে এক বিরাট কাহিনী। অল্পসময়ে বলা সম্ভব নয়।

ছেলেটি এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের কথা শুনছিল। হঠাৎ কাছে এসে বললো,—তাহলে এবার আমাদের এখানে থাবে তো !

লুতুফ আলি হেসে শাওনীর দিকে তাকালো। শাওনী হেসে বললো,—তোমার বেটা ভাইসাহেব।

আমার হানিফ ! দারুণভাবে উল্লসিত হয়ে ছুটে গিয়ে লুতুফ আলি ছেলেটিকে কোলে তুলে নিল। তারপর এপাশে ফিরে বললো,—বহিন, সবার সঙ্গেই তো দেখা হল, সর্দারজী কোথায় ? তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না !

একথায় শাওনী মাথা নত করলো। তারপর চোখদুটি যখন সে তুললো, দু'চোখে শ্রাবণের ধারা। রুদ্ধকণ্ঠে বললো,—তিনি চলে গেছেন লুতুফ ভাই।

লুতুফ আলি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলো না। বিস্ময়ে বললো,—চলে গেছে, কোথায় ?

শাওনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো,—মারা গেছেন লুতুফ ভাই। তুমি চলে যাবার একবছর পরে সর্দারজী হঠাৎ একদিনের অসুখে মারা গেছেন ! তিনি শুধু চলে যান নি, যাবার সময় এমন এক বন্ধন দিয়ে গেছেন, যা ছাড়িয়ে আমি কোনদিন পালাতে পারবো না। তুমি আজ এসেছ, হয়তো তুমি আজ হানিফকে নিয়ে যাবে

কিন্তু আমাকে আমার বন্ধন নিয়ে এই সরাইখানায় মরবার দিন পর্যন্ত থাকতে হবে।

লুতুফ আলি ভাবতে লাগলো, সেই শাওনী। কত জেদী, আর কত অহঙ্কারী ছিল, আজ তার কি অবস্থা হয়েছে? মানুষের জীবন যে চিরকাল একভাবে যায় না, এই তার প্রমাণ। এই শাওনী একদিন তাকে কত অবহেলায় ত্যাগ করেছিল। এমন কি যাবার সময় পর্যন্ত একবার দেখাও করেনি। অপরাধ, ফতুমার মৃত্যুর জন্যে যেন সেই দায়ী। তখন শাওনী ছিল স্বামী গরবে গরবিনী। রমণীর সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী। কোন অন্যায় সে দেখলে বিশেষ করে রমণীর ইজ্জত লুন্ঠিত হলে সে মাত্রাজ্ঞান হারাতো। ফতুমা তার কেউ নয় কিন্তু আওরত। সেই আওরতকে তার স্বামী অবহেলা করতে ভাইসাহেব বলে লুতুফ আলিকেও সে ক্ষমা করেনি। অথচ এই শাওনী সেদিন ভাই-জান বলে লুতুফ আলিকেও কম শ্রদ্ধার চোখে দেখত না।

আজও দেখে। তাকে হঠাৎ এই দুঃসময়ে কাছে পেয়ে কেমন যেন তার অবরুদ্ধ অশ্রু ঝরে পড়লো। লুতুফ আলি কি বলে সান্ত্বনা দেবে ভাষা খুঁজে পেল না। শুধু সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, এই চারবছরের কত পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবীর বয়স যখন আরো চার বছর বাড়লো, তার হানিফ যখন বড় হয়ে গেল তখন এই পরিবর্তন। না, সব জিনিসেরই পরিবর্তন আছে, এতে অবাক হবার কিছু নেই, শুধু তারই হয়নি। সে আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে। এখনও তার মন একইভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। মেলেনি শান্তি, মেলেনি স্বস্তি। শুধু চিত্ত অস্থির হয়ে অন্ধকারের মাঝে পথ খুঁজে ফিরেছে। সে সত্যিই ফকির হয়ে দরবেশের বেশ ধরে মসজিদে পড়েছিল।

বিশ্রাম নেবার পর সে শাওনীকে সেই কাহিনীই শোনালো।

কিছু গোপন করলো না। বললো বুলন্ত সিংয়ের ওপর তার অবিচার। সেই মোগল হারেমের সোনীবাঁদীর কথা। এমন কি বাজারে গিয়ে এক রূপজীবিনীকে সেই হারেমে পাঠিয়েছিল, সে কথাও বলতে দ্বিধা করলো না।

তারপর বললো, এই পর্যন্ত ইতিহাসের হয়তো একটি অর্থ আছে। কিন্তু তার পরের কাহিনীর কোন অর্থ তার জানা নেই। বিক্ষুব্ধ মনটি নিয়ে সে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়েছিল। দিকনির্ণয় ছিল না। শুধু উন্মুক্ত পথের ওপর দিয়ে চেতনাহীন ভাবে নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছিল। সঙ্গে ছিল তখনও অবশিষ্ট সেই সোনীর দেওয়া খাদ্য, আর কিছু মোহর ও আসরফি।

কিন্তু সে খাদ্য ও মোহর, আসরফিতে যে হাত দেয়নি, তা বেশ মনে আছে। কত-দিন ধরে যে সে পথ চলেছে, তা জানে না। পৃথিবীতে দিন এসেছে, রাত্রি নেমেছে আবার দিন এসেছে। এমনি করে দিন রাত্রি আবর্ত সৃষ্টি করে চলে গেছে, কতদিন ধরে তাও তার জানা নেই।

যখন তার জ্ঞান হল, সে দেখলো তার মুখের ওপর সতর্কদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন এক দরবেশ সাধু। একমুখ শুভ্র দাড়িতে প্রশান্তির স্নিগ্ধ চোখে তিনি তার চেতনা

সঞ্চার লক্ষ্য করছেন।

সেই দরবেশ সাধুই বলেছিলেন, তার পরবর্তী কাহিনী। 'তুমি পড়েছিল এক জীবনমৃত অবস্থায় মাঠের মাঝখানে। তোমার যে দেহে প্রাণ আছে, প্রথমে মনে হয় নি। এত ক্ষীণ ছিল তোমার প্রাণশক্তি যে অনেক ওষুধপত্তর প্রয়োগ করতে তবে জ্ঞান ফিরে এসেছিল।'

লুতুফ বিস্ময়ে জজ্ঞেস করেছিল, একটি অশ্বকে কাছাকাছি কোথাও দেখেন নি?

দরবেশ উঠে গিয়ে একটি পুঁটুলী নিয়ে এসে বলেছিলেন, এইটি তোমার কাছে ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।

তারপর সুস্থ হলে সে দেখেছিল একটি দরগার মাঝে সে অবস্থান করছে। এখানে অনেক সাধু, ফকির, দরবেশ বাস করেন। তাঁরা আল্লার কাছে দিনরাত প্রার্থনা করে জীবন যাপন করেন। তাঁদের কোন সংসার নেই। সমস্যা, অশান্তি কিছুই নেই। ভিক্ষার মধ্যে দিয়ে তাদের জীবন যাপন হয়। আর মুক্তপুরুষ হয়ে তারা সমস্ত কামনা বাসনার উর্ধ্বে উঠে আল্লার কাছেই সব নিবেদন পেশ করেন।

তখন তার মন এমনিই ছিন্নভিন্ন ছিল যে, সংসারের আর কিছু ভাল লাগছিল না। কেমন যেন সব ছেড়ে দিয়ে নিরবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করছিল। তাছাড়া সেদিন সে বুঝতে পেরেছিল, তার দ্বারা কিছু হবে না। সে একটি অপদার্থ। হিন্দুস্থানে সোনা ফলে সত্যি কথা। এখানে বুদ্ধি খেলালে শুধু আহার, বাসস্থানই ভাল মেলে না, মেলে ধনদৌলত। আর জীবন সুখের করার জন্যে অনেক দুর্লভ বস্তু। সেই লোভেই সে সেই দুর্গম মরুপ্রান্তর পার হয়ে এই দেশে এসেছিল। সেই আসার জন্যেই হারালো সব। বাপ, মা, জোরু। মনের যে বিরাট উৎসাহ তাকে প্রলোভিত করেছিল, স উৎসাহ তার একে একে প্রদীপের শিখার মত নিভে গেল।

তারপর, আজ বলতে কোন দ্বিধা নেই। ফতুমা মনে যে দাগ দিয়েছিল, সোনীর দেখা পেতে আবার তার মনে আবার উৎসাহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সোনীকে না পেতেই তার হৃদয় হাহাকারে ভরে গেল। প্রদীপের শিখা একেবারে নির্বাপিত হল। আর তারই পরিণতি এই।

লুতুফ আলি শাওনীকে বলতে লাগলো।

আর শাওনী মনোযোগী শিক্ষার্থিনীর মত একমনে শুনতে লাগলো।

দরবেশ বলেছিলেন, বেটা তুই সংসারের মধ্যে ফিরে যা, ভোগে ইচ্ছা থাকলে এজীবনও শান্তির হবে না। কিন্তু এই এতদিন ধরে সে এই চেষ্টাই করে এল। শান্তির জন্যে সে একমনে দরগার অন্ধকার ঘরে আল্লাকে কত ডেকেছে। নিষ্ঠার মধ্যে জীবন আহুতি দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। কিন্তু শুধু কষ্টই করেছে, কষ্টের কোন সুফল তার মেলেনি। শুধু রূঢ় দিনগুলিই ক্ষয় করেছে, দিনের কোন আনন্দ সে সংগ্রহ করতে পারেনি।

শাওনী সব শুনে বললো,—ভাইজান, তাহলে এখন তুমি কি করবে ঠিক করেছ?

লুতুফ আলির চোখে তখনও সেই দরগার ঘুলঘুলিগুলি ঘোরাফেরা করছে। প্রত্যহ

সকালে সেই দরগার উঠানে ঝাঁকে ঝাঁকে কবুতর আসতো। লুতুফ আলির কাজ ছিল, সেই কবুতরদের মাঝে দানা ছড়ানো। সে এক একমুঠি দানা ছড়াতো, আর লুব্ধ-দৃষ্টিতে সেই ক্ষুধার্ত কবুতরগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতো। থাকতে থাকতে তার মনে হত, আল্লার জীব এরা, এদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে, তার মধ্যে নেই। প্রত্যহ এই কাজ করে করে একদিন সে কবুতরের মতই দরগা থেকে উড়ে পালালো। ভেসে গেল ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে পথে পথে। তারপর এই সরাইখানায়।

কিন্তু ভাবছে সে, সরাইখানায় না এলেই বুঝি ভাল হত। কি দরকার ছিল এখানে আসবার! হানিফের জন্যে তো সে কোন চিন্তাই করে নি। হানিফের আকর্ষণে যে সে এখানে এসেছে, তাও নয়। অথচ কেন যে সে এল, তা জানে না। তবে এখন মনে হচ্ছে, হানিফের জন্যেই সে এসেছে। তার জীবনের শেষ সম্বল এই রক্ত মাংসে গড়া এক বংশধর, তার জন্যেই তার এখানে আসা। তাকে কেন্দ্র করে আবার সংসার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবার জন্যে মনে প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছে।

কিন্তু কি ভাবে আবার জীবন শুরু করবে! প্রতিবারেই তো শুরু করার উপায় খুঁজতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। শুরু আর হয়নি। শুরুর আগে শেষের ঘণ্টা বেজেছে।

তাই শাওনীর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে চুপ করে রইলো। উত্তর দিতে পারলো না।

শাওনী বোধ হয় বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। একটু চুপ করে থেকে বললো,—তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমি একটি প্রস্তাব দিই। দিল্লী থেকে কয়েক মাইল দূরে মীরাট প্রদেশে কোটানা বলে একটি গ্রাম আছে সেই গ্রামে সর্দারজীর একটি জায়গা আছে। সেখানে গিয়ে যদি চাষবাস করে জীবনযাপন কর, তাতে তোমার মঙ্গল হবে। ছোট বহিন বলে ক্ষমা কর। তোমার সৈনিক হবার জীবন নয়। সৈনিক হতে যে মন দরকার, সে মন তোমার মধ্যে নেই। তোমার মন চায় একটি ঘর ও পরিচ্ছন্ন আশ্রয়।

লুতুফ আলি কোন কথার উত্তর দিল না।

শাওনী বললো,—সেই ব্যবস্থাই ভাল ভাইসাহেব। হানিফকে নিয়ে তুমি ওখানেই যাও।

হঠাৎ লুতুফ বললো,—তুমি?

শাওনী নিজের কথা যে না ভেবেছে তা নয়। অহরহ সেই কথাই ভাবে। একা এই সরাইখানায় একটি শিশুকে নিয়ে সে কেমন করে থাকবে? হানিফ যখন ছিল, তখন তবু একটি ভরসা ছিল। অন্তত একটি মরদ তার প্রহরাধীনে আছে। হোক সে মরদ শিশু, তবু আওরতের কেমন যেন ভরসা। কিন্তু এইদিনটির কথা সে অনেক আগে ভেবেছে। ভেবেছে, হানিফ গচ্ছিত সম্পত্তি। তার ডাক এলেই সে চলে যাবে। তখন সে এই জনপ্রাণীহীন সরাইখানায় কেমন করে থাকবে? আর ব্যবসাই বা পর্দা-নশীন হয়ে চালাবে কেমন করে? আরো, নিত্য এই সরাইখানায় খদ্দের আসে না।

দুর্গম পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি বিশ্রামের প্রায়োজন মনে করে, তখন সে এই পান্থনিবাসে দু' পাঁচদিনের জন্যে আশ্রয় নেয়। তখনই লোকের কণ্ঠস্বরে মুখর হয় সরাইখানা। নতুবা সঙ্গীহীনের মত এই সরাইখানা লোকালয়হীন পথের মাঝখানে দিনের পর দিন পড়ে থাকে। অথচ সর্দারজী যখন ছিলেন, শাওনীর একবারও এই নির্জনতা খারাপ লাগেনি। সর্দারজী চলে যাবার পর যেমন সে অবলম্বন হারিয়েছে, তেমনি একান্ত অসহায়া হয়ে গেছে। কেমন যেন দিনরাত সে ভয়ে ভয়ে অতিবাহিত করে। সেই আগের শাওনী যেন এই ভয়েই কেমন শান্ত হয়ে গেছে।

আজ তাই লুতুফ শাওনীর মনের একান্ত প্রশ্নটি উত্থাপিত করে তাকে আবার চমকে দিল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়ে ম্লান হেসে বললো,—আমি আর কোথায় যাবো? স্বামীর ব্যবসা আঁকড়েই পড়ে থাকবো।

কিন্তু! লুতুফ থমকে গেল। প্রস্তাবটি শোভন কিনা সে ভেবে পেল না। অথচ বলবার জন্যে মনটি আকুলি বিকুলি করে উঠলো। বললো,—বহিন, আমার প্রস্তাবটি তোমার রমণী সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করবে কিনা জানি না। তবু বহিন বলেই বলছি। ভাইসাহেবের সাহায্য নিতে কি তোমার সম্মান লাগবে?

শাওনী বললো,—কি বলতে চাও লুতুফভাই?

এই সরাইখানা ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে সেই কোটানা গ্রামে চলো। আমরা দুটি ভাইবহিন মিলে দুটি বাচ্চাকে মানুষ করে তুলবো। তুমি ঘরের কাজ করবে, আমি বাইরের কাজ করবো। বলতে বলতে লুতুফ আলি বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অবশ্য দুজনের জাত আলাদা। শুধু যদি সেই জাতের বাধা আমরা ত্যাগ করি, নিশ্চয় এই বাসস্থান আমাদের সুখের হবে।

শাওনী কোন চিন্তা না করেই বললো জাতের জন্যে নয় ভাইসাহেব। এ হয় না। তোমার সাহায্য আমাকে আনন্দিত করছে কিন্তু নিতে আমি পারি না।

লুতুফ আলি বিস্ময়ে বললো,—কেন নয়?

শাওনী মাথা নত করে বললো,—সে তোমাকে বোঝাতে পারবো না। তাছাড়া এই সরাইখানা ছেড়ে আমার যাওয়া চলবে না। সর্দারজী এই সরাইখানার জন্যে প্রাণপাত করেছেন, আমি এককথায় তা ধ্বংস করি কেমন করে?

কিন্তু এ সরাইখানায় আছে কি? ছ'মাস-নমাসে একটি একটি খদ্দের আসে। তারও কোন ঠিক নেই। এর উপর নির্ভর করে কি এই লোকালয়হীন জায়গায় থাকা যায়? তাছাড়া তুমি জোয়ান রমণী, অন্য বিপদের কথাও ভাবা দরকার।

শাওনী দৃঢ়স্বরে বললো,—সবই আমি ভেবেছি ভাইসাহেব। তুমি আমার জন্য ভেব না। আমার যদি মন দুর্বল না হয়, তাহলে কেউ আমার সম্মানহানি করতে পারবে না। তবে একটি আমার অনুরোধ, মাঝে মাঝে আমাদের সংবাদ নিও। সর্দারজীর বেটিটিকে যদি মানুষ করতে না পারি, তাহলে তুমি তাকে মানুষ করে তার শাদী দিয়ে দিও।

শাওনী অন্যদিকে তাকিয়ে বললো,—কি জানো লুতুফ ভাই, আমি বৃদ্ধ জেনেই সর্দাজীকে শাদী করেছিলাম। কিন্তু তখন আমি জানতাম, আমি ঠকিনি। সর্দার-জী বৃদ্ধ বটে কিন্তু কোন নওজোয়ানের চেয়ে তিনি কম নয়। যেমন মনটি উদার, তেমনি তার গভীর ভালবাসা। তিনি তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা দিয়েই আমাকে গর্বিতা করেছিলেন। সবচেয়ে চমক লাগলো, তিনি যখন চলে গেলেন। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তাই হঠাৎ কেমন হারিয়ে গেলাম। তখনই আমার মনে হল, আমি ঠকেছি। বৃদ্ধকে শাদী না করলে বুঝি আমার এই দুরবস্থা হত না।

অবশ্য যাবার সময় সর্দারজী অনেক চোখের জল ফেলেছিলেন, তিনি জেনেই গিয়ে-ছিলেন আমার গর্ভে এতদিন পর বাচ্চা এসেছে। তাই মরবার সময় বলেছিলেন,—এ আমি কি করে গেলাম শাওন? আমি যে অনুতাপ প্রকাশেরও সময় পেলাম না।

শাওনী আবার বলতে লাগলো,—তার এই অনুশোচনা আমার এই বিড়ম্বিত জীবনে কোথায় যে কাজ করবে জানি না। যতই ভাবি, যত দিনগুলি দুর্বহ মনে হয়, তত আমার তাঁর ওপর রাগই হয়। তাঁকে বার বার ক্ষমা করি। নিজের ভাগ্যের জন্যে নিজেকেই অপরাধী করি কিন্তু মন মানে না। মনে হয়, এ সমস্ত বন্ধন ত্যাগ করে কোথাও চলে যাই! সর্দারজীর বেটি পড়ে থাক্ এই লোকালয়হীন সরাইখানায়। কিন্তু শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে আচরণ করতে মায়া হয়। শিশুটি যেন সর্দারজীর বিনয় ও আমার চোখের চঞ্চলতা নিয়ে কাতর হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তারপর হেসে বললো,—যাক্‌গে, আমার জীবনের দুঃখ আর শুনে আর কি হবে? একদিন তোমাকে জোরুর প্রতি অবিচারের জন্যে অপমান করেছিলাম। ছোট বহিন বলে তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর।

লুতুফ তখন ভাবছিল, কি বিচিত্র এই জগৎ? তারপর শাওনী থামলে বললো,—এ অবস্থায় তোমাকে ফেলে যেতে আমাকে নির্দেশ দিও না। অন্তত সর্দারজীর বেটি মানুষ করা পর্যন্ত আমার সাহায্য নাও। কারণ সর্দারজীর ওপর আমারও তো কৃতজ্ঞতা আছে?

শাওনী ম্লান হাসলো, কোন উত্তর দিল না।

লুতুফ দেখলো, শাওনীর যেন হঠাৎ অনেক বয়স বেড়ে গেছে। আগের চঞ্চলতা ছিল, এখন সে জায়গায় প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে বয়সের ছাপ পড়েছে। আগে কোন কিছু না ভেবেই অহঙ্কার প্রকাশ করতো, এখন গম্ভীর হয়ে বুঝে তারপর দৃঢ়প্রত্যয় প্রকাশ করে। এর কাছে এখন কোন শক্তি প্রয়োগ করা মানে শক্তিহীনের পরিচয় দেওয়া। তবু মেয়েটির জন্যে কাতর হয়েই সে বললো,—শাওনী বহিন, তবে আমিও এখানে থাকি। থেকে এখানে তোমাকে যতটুকু পারি সাহায্য করি। সর্দারজীর বহুত মেহনতের যখন সরাইখানা, তখন সরাইখানাকেই লক্ষ্য করে আমাদের কটি জীবন আবর্তিত হোক্।

শাওনী সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে,—না। তুমি এখানে থাকলে লোকে

তোমার নামে দুর্নাম করবে। তোমার আমার মধ্যে ভাই বহিনের সম্বন্ধ থাকলেও বাইরের লোকে তা বিশ্বাস করবে না।

এদিকের কথাটা লুতুফ আলি একবারও ভাবেনি। তাই অকপট সত্য কথাটা শুনে সে বিস্মিত হয়ে শাওনীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

তাই দেখে শাওনী মাথা নত করে নিম্নস্বরে বললো,—তুমি হয়তো রাগ করলে ভাইসাহেব কিন্তু কথাটা যে আমি অন্যায় বলিনি, নিশ্চয় বুঝতে পারছ। ভবিষ্যতের কথা কোনদিনই আমি ভাবিনি, আজ শুধু ভাবছি এইজন্যে যে সর্দারজী আমাকে ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে শিখিয়ে গেছে। সেইজন্যে ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তোমাকে আমি আঘাত দিলাম।

এরপর আর কোন কথা বলা যায় না। এত সহজ ও স্পষ্ট করে একটি গুরুতর বিষয় প্রকাশ হবার পর কোন অনুযোগই চলে না। শাওনীকে সে যে কোনদিন অন্য কোন অর্থে আকাঙ্ক্ষা করতে পারে না, এ কথাও হলফ করে বলতে পারে না। হয়তো একসঙ্গে বাস করতে করতে—। না থাক্। অন্তরালের কাহিনী অন্তরালেই থাক্। হয়তো শাওনীও কোন দুর্বলতার সম্মুখীন হয়ে কোন কিছু অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারে। এই কিছুক্ষণ আগেই সে বলেছিল, 'আমার যদি মন দুর্বল না হয়, তাহলে কেউ আমার সম্মান হানি করতে পারবে না।' দুর্বল যে একদিন হতে পারে, এ তারই উল্লেখ। শাওনী যে সর্দারজীর সোহাগে পূর্ণ হয় নি, তারই এই নমুনা। এখনও মনের পরতে পরতে বাসনার আর্তি, তা তার কথায় স্পষ্ট প্রকাশ হল।

কিন্তু সে একান্ত নিজের ব্যক্তিগত প্রশ্ন শাওনীর। সেখানে সে বড় ভাই বলেও কোন বাধা দিতে পারে না। তাই অগত্যা সেই কোটানাতে চলে যাবার জন্যই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। শেষ পর্যন্ত একটি অনুরোধই করলো লুতুফ,—শাওনী, তবে হানিফকে তোমার কাছে রেখে দাও। সে থাকলে নিশ্চয় তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

লুতুফ আলি যে তাকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করলো, সে কথা ভেবেই শাওনী অপ্রতিভ হল। তারপর নিজেকে প্রকৃতিস্থ করে বললো,—তুমি মাঝে মাঝে আমার সংবাদ নিও। তাহলেই হবে। হানিফকে আমার প্রয়োজন হলেও তোমার প্রয়োজন আমি সবচেয়ে অনুভব করি। তোমার কাছে তোমার সন্তান থাকলে আর কোন মানসিক চঞ্চলতা আঘাত হানতে পারবে না। শুনেছি, কোটানা গ্রামের অধিবাসীরা খুব সজ্জন। তাদের সঙ্গে দোস্ত সম্বন্ধ পাতিয়ে চাষবাস কর। ইক্ষুর চাষ সেখানে খুব ভাল হয়। আর তাতে মুনাফাও প্রচুর। তুমি একটু গুছিয়ে নিয়ে একটি শাদী কর।

তারপর অল্প হেসে বললো,—শাদীর সময় আমাকে নিয়ে যেও, আমি খুশি হব। তখন নতুন ঘর-সংসার সাজিয়ে দিয়ে কদিন বাস করে আসবো।

লুতুফ আলি কোন উত্তর দিল না। সে তখন আবার ভাবছিল, এই শাওনীই একদিন ফতুমার মৃত্যুর জন্যে ক্ষিপ্ত হয়েছিল। আজ সেই শাওনীই তাকে শাদী করবার জন্যে অনুরোধ করছে।

তারপর বিদায়ের দিন এসে গেল।

হানিফ কিছুতে যাবে না। ক্ষিপ্ত হয়ে সে পিতাকে বললো,—তুমি ফকির নও, তুমি ডাকু। তুমি আব্বা না ছাই। আমি আম্মাকে ছেড়ে কিছুতে যাব না।

শাওনী তাকে বুকের কাছে চেপে ধরে চোখের জল রোধ করতে পারলো না। সস্নেহে হানিফের মাথায় হাত বুলিয়ে বললে,—ছি, বেটা,—উনিই তোমার আব্বা হন। পিতাকে এমনি করে বলতে হয় না।

জ্ঞান হবার পর হানিফ শাওনীর স্নেহেই বড় হয়ে উঠেছিল। তাই সে কিছুতে এই বিয়োগ সহ্য করতে পারলো না।

লুতুফ আলি একসময় শাওনীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হানিফের হাত ধরে কোটানা গ্রামের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল।

মীরাট।

এর ও কোল দিয়ে একদিন যমুনা নদী প্রবাহিত হত। দিল্লীর মত এরও বক্ষ ধৌত হত যমুনার শান্ত জলে। যমুনার উপত্যকা ভূমিতে মোগল বাদশাহরা সদলে আসতেন মৃগয়া করতেন। তবে সে আজ ইতিহাস। দিল্লীর গৌরবও যেমন মোগলদের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত তেমনি মীরাটের মৃগয়া ক্ষেত্র। হরিণ শাবক আর ভীত চোখে বর্শার ভয়ে ইতস্তত ছুটে পালায় না। বন্য গণ্ডার ও হাতির ডাক শোনা যায় না। এখন সেই মৃগয়া ক্ষেত্র মৃগহীন হয়ে নিঃশব্দে পড়ে আছে। নিঃশব্দে সে অর্থব বৃদ্ধের মত শুনছে, বনমর্মরের ধ্বনি, বিহঙ্গদের সুসংগীত। যমুনা এখন অনেকদূরে সরে গেছে। সরে গেছে কালের আঘাতের যন্ত্রণায় পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে।

তবু মীরাটে এখন যা আছে, তার তুলনা হয় না। আছে হীরকোজ্জ্বল এক অনির্বাণ স্মৃতি। যার ক্ষয়ও নেই, বিনাশও নেই।

এই দেশ একদিন পাণ্ডবের রাজধানী ছিল। মহাভারতের সেই ত্রেতাযুগের মানুষেরা এখানে বিচরণ করে বেড়াতেন। হস্তিনাপুর নাম ছিল আগে। হস্তিনাপুরের ধ্বংসাবশেষ কিছুই নেই। নেই কোন প্রাচীন কীর্তি। তবে গল্প আছে। আর আছে গর্ব। গর্বের দেশ এই বর্তমান মীরাট।

আর আছে একটি সুদীর্ঘ স্তূপ। যাকে কেন্দ্র করে লোকে বলে, হস্তিনাপুর রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। বুড়ী গঙ্গার প্রাচীন খাত বর্তমান নদীগর্ভ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। এরই তীরে ছিল সেই পাণ্ডব রাজধানী। আর তারই ধারে একটি স্তূপকে কেন্দ্র করে অধিবাসীরা গল্প গাঁথে নানান কাহিনীতে।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এই স্তূপকে হস্তিনার ধ্বংসাবশেষ বলেই স্বীকার করেছেন।

সে যাই হোক্ মীরাট যে খ্রীষ্টজন্মের পূর্বের এক প্রাচীন নগরী, তার অনেক ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

বর্তমানে রাজনীতির ক্ষেত্রে মোগলদের সময়ে মীরাটে শান্তিরাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। তারপর মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পর রাষ্ট্রবিপ্লবের ঢেউ মীরাটে এসেও লাগে। রাজ্যলোলুপ শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দের উন্মাদ-নর্তন আরম্ভ হয়। উত্তর দোয়াব জাঠ ও রোহিলারাও উপদ্রব শুরু করে।

তবু মীরাটের গৌরব আজও অবিচলিত।

সেখানকার অধিবাসীদের গর্বই শুধু ঐটুকু। তারা বিভিন্ন লোকপ্রবাদে মীরাটের নানা নামকরণ করেছে। সবচেয়ে প্রাচীন নাম মীরথ বা মীরঠ। মহী নামে এক স্থপতি ইন্দ্রপ্রস্থরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তখন রাজা প্রীত হয়ে এই মীরথ গ্রাম দান করেন। মহী স্বনামে এই নূতন জনপথের নাম করেন মহারাষ্ট্র। তার নির্মিত অন্দরকোট দুর্গ আজও বিদ্যমান। আবার জাঠরা বলেন, মহীরাষ্ট্র গোত্রীয় কোন উপনিবেশিক এই মীরথ নগর স্থাপন করেছিলেন। আবার কেউ বলেন, প্রাচীনকাল থেকে মহিদন্ত-কা-খেরা নামে পরিচিত ছিল। তা থেকেই মীরথ। মহিদন্ত-কা-খেরা বৌদ্ধযুগের প্রাধান্যসূচক।

গঙ্গা ও যমুনার ঠিক মধ্যস্থলে মীরাট নগরী অবস্থিত। কালী নদী, হিন্দন নদী ও গঙ্গাখাল এর মধ্যে প্রবাহিত। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সৈকতভূমিতে অবস্থিত বলে এই সমতল বিভাগের উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুসলমানাধিকারে এই স্থানকে লোক দোয়াব বলে। বিস্তীর্ণ শ্যামল শস্যক্ষেত্র ছাড়া সবুজ বনরাজি দৃষ্ট হয়। অনেক জায়গায় সুবিস্তৃত মনোরম আম্রকানন, প্রকৃতির লীলা কৌশলের পরিচয় দিচ্ছে। গঙ্গা ও যমুনার বালুকা বেলাভূমিতে বিশেষ চাষবাস নেই। প্রবল বাতাস বইলে বালুকা-স্তূপ ইতস্তত সঞ্চালিত হয়। তারপর একস্থান থেকে অন্যস্থানে উড়ে গিয়ে পড়ে।

শুধু হিন্দন। এই নদীর কল্যাণে যা কিছু উন্নতি। বর্ষা ঋতুতে এই নদী পরিপূর্ণ হয়। কলকল নিনাদে বয়ে চলে সর্বক্ষণ। আর বহু পণ্যবাহী নৌকা পণ্য নিয়ে গমনাগমন করে।

আর আছে কতগুলি বালুকাময় অববাহিকা। বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয়, অন্যসময়ে শুষ্ক খাতমাত্র পড়ে থাকে। ঐ সব নদী, ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ও গঙ্গা-যমুনার কাটাখাল দিয়েই যা কিছু কৃষিকার্যের উন্নতি।

এ তো গেল প্রকৃতির দান। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা। মানুষের দানের ও এখানে সীমা নেই।

ধর্মের ওপর ভিত্তি করে এখানে বহু মন্দির ও মসজিদ আকাশচুম্বী হয়ে সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে।

সূর্যকুণ্ড অথবা সীতাকুণ্ড। দু'নামই এখানে পরিচিত। ভরতপুরের জাঠসম্রাট জওয়াহির মল্ল এই স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করেন। পূর্বপুরুষ সূর্যমল্লের নামে এই স্মৃতিস্তম্ভ মীরাট নগরের দুমাইল দূরে অবস্থিত। দর্শনার্থী শুধু এই অপরূপ স্মৃতিস্তম্ভ দেখতে যায় না, মন্দিরে পূজা দিতে যায়। শুভ্র প্রস্তরের এই স্মৃতিস্তম্ভকে বেষ্টন করে বহু মন্দির,

ধর্মশালা ও সতীস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের পাশ দিয়ে একটি বিরাট দীর্ঘিকা ও সেই দীর্ঘিকাকে বেষ্টন করে একটি মনোরম উদ্যান বীথিকা আরো সৌন্দর্য বর্ধিত করেছে।

স্তম্ভের মধ্যে প্রবেশ করলে বিরাট অন্ধকারের আকাশচুম্বী উচ্চতা। মধ্যবিন্দুতে একটি প্রস্তরময় স্মৃতিস্তম্ভ। তাকে পাহারা দিচ্ছে একটি প্রস্তরময় কৃষ্ণমূর্তি। আর আছে একটি মড়ার মাথা, বৃহৎ তরবারী ও জপের মালা। হিন্দু ও মুসলমান এই প্রতীক চিহ্ন দেখে ভীত হয়ে তাকিয়ে থাকে।

মোগলদের পর উত্তর পশ্চিম ভারতে এই জাঠরা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী শাসনকর্তা। মীরাটের এই স্মৃতিস্তম্ভই জাঠদের দাম্ভিকতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাছাড়া আরো আছে, মনোহর শাহের মন্দির। এ মন্দিরও সূর্যকুণ্ডের চেয়ে আরো প্রাচীন। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল। আরো আছে, বিশ্বেশ্বরনাথের মন্দির ও মহেশ্বর মন্দির। বিশ্বেশ্বর মন্দির মুসলমান আক্রমণের আগে সৃষ্টি হয়েছিল। মহেশ্বর মন্দির পাণ্ডববংশীয় কোন ভূপালের দ্বারা সৃষ্টি।

এছাড়া আছে, লালা দয়ালদাসের প্রতিষ্ঠিত তলাও মাতবল দীর্ঘিকা। কুতুবউদ্দীন প্রতিষ্ঠিত নোবস্তী মহল্লার দরগা, নূরজাহান প্রতিষ্ঠিত শাহপীরের দরগা। গজনিপতি মামুদের উজীর কাসনমহদী নির্মিত জামি মসজিদ, মখতুম শাহ তিলায়তের দরগা, আবু মহম্মদ কম্বোর মকবাড়া সালর মসাউদ গাজীর মকবাড়া।

মীরাটের খ্রীষ্টধর্মেরও গির্জা ছিল। আর তার উচ্চচূড়া হিমালয়ের বহিঃপ্রান্তস্থ শিখরভূমিতে দাঁড়িয়ে দৃষ্টিগোচর হয়।

লুতুফ আলি হানিফকে নিয়ে এসে এরই মধ্যে পড়লো। সকাল ও সন্ধ্যা এই সব মন্দির ও মসজিদ দেখতে দেখতে দিন অতিবাহিত হয়ে যেতে লাগলো।

কোটানা গ্রামের অধিবাসীরাও বেশ ভাল লোক। তারা সর্দারজীর জায়গায় লুতুফ আলিকে পেয়ে কোন বিদ্বেষ প্রকাশ করলো না। বরং হিন্দু-মুসলমান মিলে তাকে সমাদরে গ্রহণ করে ঘর বানিয়ে দিল। উপদেশ দিল এখানকার মহাজনের গদিতে চাকরি করে কিছু জমিয়ে তারপর ব্যবসা করতে। কিম্বা একখানা নৌকো তৈরি করিয়ে হিন্দন নদীতে ভাড়া খাটাতে।

লুতুফ আলি তাদের উপদেশগুলি মন দিয়ে শুনলো। কদিন কোটানা থেকে বেরিয়ে মীরাটের অনেক অঞ্চল ঘুরলো। দেখলো সূর্যকুণ্ড, মনোহর শাহের মন্দির। শাহপীরের দরগায় গিয়ে নামাজ পড়লো। আবু নালার পাশ দিয়ে বহুদূর পর্যন্ত হেঁটে গেল। হিন্দন নদী দেখলো। সেখানকার মাঝিদের সঙ্গে আলাপ করলো। ইক্ষুর চাষের ক্ষেত্রে গিয়ে ইক্ষু চাষ দেখলো। গরু, মহিষের ব্যবসাও মীরাটে ছিল। খাটালে গিয়ে গরু, মহিষ দেখলো।

তারপর অনেক রাত্রি হলে ছেলেটিকে পাশে নিয়ে শুলো। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলো পরিকল্পনা। সঙ্গে আছে তার সেই সোনীর দেওয়া কটি মোহর। এই তার মূলধন। তার মধ্যে একটি ব্যয় করে দুজনের গৃহস্থালীর জিনিসপত্তর সওদা করেছে। হানিফ খানা পাকায়। নুন ও ঝালের একটু তফাত হয় বটে কিন্তু একেবারে খাওয়ার

অযোগ্য হয় না। হলেই বা ক্ষতি কি? অল্প বয়েসের একটি ছেলের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়? তবু হানিফ শাওনীর কাছ থেকে এমন একটি দৃঢ় মন পেয়েছিল. যা সচরাচর দেখা যায় না। আট বছরের সেই দৃঢ় মন নিয়েই সে ঘরের যাবতীয় কাজ করে এবং পিতাকে বলে—ঘরের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি বাইরের কথা ভাবো। আম্মা, সরাইখানার সব ভার আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

সেইজন্যে লুতুফ ঘরের কথা ছেড়ে বাইরের কথাই ভাবছিল। সারাদিন ধরে ঘোরে, আর রাত্রিবেলা মেঝের ওপর চেটাই পেতে শুয়ে হানিফকে পাশে নিয়ে ভাবে। প্রত্যহ ভাবে। কি করবে। মোহরগুলি খুইয়ে ব্যবসা করবে? না, চাকরি করে টাকা জমিয়ে ব্যবসা করবে। ব্যবসাই সে করবে। স্বাধীন ব্যবসা। পরের গোলামীর চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা ভাল! কারুর কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে না।

কিন্তু আবার ভাবলো, এখন তার অভিজ্ঞতা কম। ব্যবসায় লাভলোকসান আছে। মূলধন মাত্র ঐ কটি মোহর। শাওনী আসবার সময় কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল, সে নেয় নি। শাওনীর এখন যা অবস্থা, তাতে তাকেই দেওয়া উচিত। এই ভেবে সে নেয়নি। ওরা অনেক দিয়েছে। হানিফের জন্যে অনেক করেছে। তাই লুতুফের মনে মনে ইচ্ছা, তার কিছু টাকা হলে সে শাওনীকে দেবে।

সোনীর দেওয়া মোহরগুলি হাতছাড়া করতে প্রাণে লাগে। বেদনার এক সোহাগসঞ্চিত স্মৃতি। কিন্তু মেয়েটি কত চিন্তা করে ঐ মোহরগুলি দিয়েছিল। তাকে যে কিছুতে ভোলা যায় না। যখনই মোহরের কথা মনে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কাতর মুখখান মনে পড়ে।

এমন কেন হয়? যাকে মাত্র একটিবার দেখা। কটিমাত্র কথার আদান-প্রদান। আর সে হয়তো যে কথাগুলি বলেছে, না ভেবেই বলেছে। কিংবা সময়ের দ্রুততায় আবেগের মূর্ছনা সৃষ্টি করেছে। হয়তো সে কথা তার মনের কথা নয়। কারাকক্ষ থেকে বেরিয়ে সে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে। কিন্তু আফসোস করে নি। হারেমে কত আলোকিত ঘটনাই তো ঘটে এও বোধহয় সেই রকম কিছু

কিন্তু সোনী যাই ভেবে থাক্ সে অন্যকিছু ভাবতে পারে নি। যখনই তাকে মনে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনের ভেতর ওঠানামা শুরু হয়েছে। আর মনে হয়েছে কত কথা, কত গুঞ্জন। নদীর স্রোতের কলগুঞ্জনের মত কি এক অনুভূতি যেন তাকে পাগল করছে। আজও করে। কত কাল যে এমনি তাকে বেদনায় বিহ্বল করবে কে জানে?

তারপর অনেকগুলি দিন ও রাত্রি ব্যয় করে লুতুফ আলি ঠিক করলো, সে সোনীর দেওয়া মোহরগুলি নষ্ট করবে না। তার স্মৃতি যতদিন থাকে থাক্ তারপর যে কোন এক সময় মন থেকে মুছে ফেললেই হবে। অন্তত বাঁচবার জন্যে এই ধরনের স্মৃতি নিস্পৃহ মনের সাহস বাড়ায়। ফতুমার সঙ্গে সে অনেককাল বসবাস করেছে। মহব্বতও সে কম দান করে নি। ফতুমার জন্যে তার কাতরতা আছে। তবু ফতুমা তার জোরু

ছিল। সেই জন্যেই হয়তো ফতুমার বিয়োগের স্মৃতি তাকে আর কাঁদায় না। অন্তত সোনীর মত তো নয়ই। অবশ্য সে তার মনের অবস্থা দেখেই এ কথা ভাবছে। সোনীকে একবার দেখে কত কথা ভাবছে, আর ফতুমাকে নিয়ে কতদিন ধরে ঘর করছে, একবারও তার কথা মনে আসে না! এমন কেন হয়?

সোনীকে বুকের মধ্যে ধরেই লুতুফ একদিন একমহাজনের গদিতে গিয়ে হাজির হল।

গিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। কোটানা গ্রামের বহু পুরুষ এখানে কাজ করে। চতুর্দিকে ভিড়। আক মাড়াই হচ্ছে। রস বের করে উনুনে জ্বাল দিয়ে চিনি বানানো হচ্ছে। আর এই সব কাজ করছে বহু লোক। শুধু কোটানা নয়, চক্রধি, মহুয়া, বেনেতোল আরো আরো মীরাটের বহু গ্রামের লোক সেখানে।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে কারখানা। মীরাটে যে সব ইক্ষুর চাষ হয়, তার প্রায় অংশই অধিবাসীরা এখানে বিক্রি করে। শুধু এখানে একটি কারখানা নয়, এরকম বহু কারখানা। কারখানাগুলির মালিক অন্যদেশের লোক। অধিকাংশ দিল্লীর রাজস্থানের। আরো জানা গেল, এই মীরাটের ইক্ষু বাইরে যাবার উপায় নেই। জাঠ সরকার আইন করে এই মালিকদেরই প্রভুত্ব দিয়েছে। তাই আইনের বলিতে মালিকরা প্রভু ও চাষীরা ভৃত্য।

সেইজন্যে মালিকরা সর্বদা রক্তচক্ষু বের করে নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখে। আর এইজন্যে অত্যাচারও কম করে না।

লুতুফ চোখের সামনেই দেখলো সে অত্যাচার। একটি লোককে তার কোমরে দড়ি বেঁধে একটি ঘোড়ার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে। ঘোড়াটিকে বেত্রাঘাত করে ক্ষিপ্ত করছে একজন। ঘোড়াটি প্রাণপণে ছুটছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। আর লোকটি তার সঙ্গে মাটিতে পড়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলছে। মাটিতে আছে কত ইট, পাথর; লোহার টুকরো। তার ওপর লোকটির দেহ পড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে হরদম। রক্ত ছুটছে সেই ছিন্ন অংশ দিয়ে। লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

লুতুফ ভীত হয়ে একজনকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলো,—ভাইসাহেব, এর এই অবস্থা কেন?

লোকটি চুপিসাড়ে উত্তর দিল—আনোয়ার ভেতরে ভেতরে দল পাকিয়ে বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেছিল। তাই মালিকরা জানতে পেরে এই শাস্তি দিচ্ছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ এমনিভাবে থাকলে তো লোকটি মারা যাবে!

উত্তরদাতা বললো,—মালিকেরা তাই চায়।

তাহলে একেবারে কোতল করে দিচ্ছে না কেন?

কোতল করলে তো এক কোপে শেষ হয়ে যাবে। তাহলে অন্যান্যরা শাস্তির ভয়াবহতা অনুভব করবে কেমন করে? আনোয়ারকে দেখিয়ে আমাদের বোঝানো হচ্ছে, তোমরা যদি মাথা তুলতে যাও, তাহলে তোমাদেরও এমনি অবস্থা হবে।

হঠাৎ লুতুফ সেই প্রহৃত ব্যক্তিটির দিকে আবার অবাক হয়ে তাকলো। একটি

লোক সেই প্রহৃত ব্যক্তিটির রক্তাক্ত ক্ষতের ওপর লবণ ছড়াচ্ছে। রক্তাক্ত ক্ষতে লবণ! চিন্তা করলেই কেমন যেন শিউরে উঠতে হয়। আর সেই অপরাধী গগন ভেদ করে চিৎকার করছে। এইসময় একটি লোক হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

লোকটির পোষাক একটু মার্জিত। কারখানার কর্মীদের সঙ্গে মেলে না। মাথায় বিরাট পাগড়ী, গায়ে ঢোলা পিরাণ, সরু খাঁচের পায়জামা! মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। কিন্তু সেই দাড়িগোঁফে মেহেদী রঙের ছোপ। কিন্তু লোকটি যে ভীষণ ক্রূর ও শয়তান—তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। লোকটি যে মালিক পক্ষের কেউ, সে তার কথা শুনেই বোঝা গেল।

প্রহৃত আনোয়ার তখনও জ্ঞান না হারিয়ে পাগলের মত যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল। তার গায়ে জামা নেই, এমন কি কোমরের একখণ্ড লজ্জাবস্ত্র পর্যন্ত ছিন্ন। সমস্ত গাত্রচর্ম ছিঁড়ে রক্ত ঝরে বীভৎসতার সৃষ্টি করেছে। কি ভয়ানক যে সে দৃশ্য কল্পনা করা যায়।

হঠাৎ সেই লোকটি কাছে গিয়ে আনোয়ারকে ধমক দিয়ে বললো,—চোপরাও বেতমিজ।

কিন্তু আশ্চর্য, আনোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল।

সেই লোকটি বললো,—আর কখনও এমন হবে? যদি কবুল কর তাহলে মুক্তি দিতে পারি।

আনোয়ার কি বললো এতদূর থেকে বোঝা গেল না। কিন্তু তার পরেই সেই লোকটির নির্দেশে তাকে অশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করা হল এবং আনোয়ার নিজেই রক্তাক্ত শরীর নিয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে অন্যত্র চলে গেল।

হঠাৎ সেই মালিকের দৃষ্টি লুতুফের দিকে পড়লো। লোকটি দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে মুখটি কুঞ্চিত করে হুঙ্কার দিয়ে বললো,—এই তুমি কৌন্ হ্যায়! হিঁয়া ক্যায়া করতা।

লুতুফের তখন ইচ্ছা করলো লোকটিকে ঠাস্ করে চড় মারে। লোকটি যেন নোকর পেয়ে মানুষকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু তার ভয় লাগলো, যদি বেয়াদপি করলে ঐ আনোয়ারের মত অবস্থা হয়? এই ভেবে সে ভীত চোখে ভারু মনে বিনয়ে কাঁচুমাচু হয়ে উত্তর দিল,—হুজুর, আমি নয়া আদমী আছি। বড় গরীব। রুটি যোগাড় করতে পারি না। কামও কিছু হাতে নেই। তাই যদি কোন কাম পাই, এই সাহসে এখানে এসেছি।

লোকটি জ্বল জ্বল চোখে লুতুফের দিকে তাকালো। এমনভাবে তাকালো যেন ভস্ম করে দেবে। তারপর আবার হুঙ্কার দিয়ে বললো,—কোথাকার আদমী তুমি? এখানে এসেছ কেন?

হুজুর বড় গরীব আমি। ঢুঁড়তে ঢুঁড়তে এই মীরাটে এসে পড়েছি। লুতুফ আলি প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে কথাগুলি বললো।

এসেছ কোথা থেকে?

হুজুর, আরবের রকুল অঞ্চলে আমার বাস।

হঠাৎ লোকটি ক্ষেপে গিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললো,—আরব থেকে হিন্দুস্তান! ভেবেছ, হিন্দুস্তানে এলেই তোমার দুঃখ ঘুচে যাবে? যাও ভাগ যাও। হিন্দুস্তানে এলেই বাঁচবার পথ পাবে? যত সব বেতমিজ আদমী। কোন কাম মিলবে না!

লুতুফ আলি হাত জোড় করে বললো—হুজুর, আমি বহুত গরীব আদমী। পয়সা অভাবে আমার জোরু অনাহারে মারা গেছে। আমার আব্বা, আম্মাজানও বেঘোরে মরেছে। শুধু একটি বাচ্চা লড়কাকে নিয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরছি। একঠো নোকরী, দুটি খানার জন্যে আমি যে কোন কাম করতে রাজী আছি।

লোকটি বললো,—দিল্লীতে গেলে না কেন? সেখানে বহুত পরদেশী লোক রুজি-রোজগার করে বেঁচে আছে। বাদশাহের শহর। সেখানে হরেক রকমের কাম আছে।

হুজুর, সেখানে গিয়েছিলাম কিছু মিললো না। তাছাড়া সে শহর আমীর ওমরাহদের জন্যে। সেখানে সব বড় বড় কাম, বড় বড় আদমীরা করে। আমি গরীব হুজুর, আমার কাম সেখানে মিলবে কেমন করে? মেহনতের দাম কি সেখানে পাওয়া যায়!

মালিক তারপর কি ভেবে বললো—আচ্ছা, একটা কাম তোমাকে দিতে পারি। ঘোড়ায় করে যে সব আক মাড়াই ঘরের কাছে যায়, সেই আক নামিয়ে গুনতি করা। কিন্তু গুনতিতে ভুল হলে চলবে না। তোমার গুনতির ওপর চাষীদের রূপেয়া নির্ভর করছে। ঘাট্‌তি হয়ে গেলে রোজগার কাটা যাবে। এই কাম যদি কর তাহলে দিতে পারি।

লুতুফ রাজী হয়ে গেল। ক্ষতি কি? তাকে তো ঘর থেকে এনে ঘাটতি পূরণ করতে হচ্ছে না।

মালিক তারপর তাকে ডেকে নিয়ে দপ্তরখানায় গেল, সেখানে গিয়ে তার নাম লিখিয়ে ছেড়ে দিল। বললো,—আগামী কাল থেকে চলে আসবে। ডিউটি ভোর ছটা থেকে বারটা। একঘণ্টা খানাপিনার ছুটি তারপর একটা থেকে বিকাল পাঁচটা।

লুতুফ হানিফকে এনে দিল শুভ সংবাদটা। বললো,—হানিফ বেটা, পড়ালিখা শিখতে হবে। শহরে গিয়ে কিছু কেতাব এনে দেব। একজন মৌলবীকে ঠিক করে দেব মানুষ হয়ে নিবি।

হানিফ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বললো,—রেখে দাও তোমার পড়ালিখা। আমি আম্মার কাছে যাবো।

কদিন ধরে হানিফের মনটা বেজায় খারাপ। একা একা ঘরের মধ্যে বসে থেকে তার আম্মার জন্যে মনটা বার বার হাহাকার করেছে। কেবলই মনে হয়েছে, আম্মা তাকে ডাকছে। শাওনী দুধের বাটি নিয়ে আগে যেমন সুর করে ডাকতো,—বে-টা-হা-নু-মি-ঞা, দু-ধ পিকে যা-ও। সেই সুর, সেই ডাক। হানিফ যেন কোটানায় বসেই বার বার সেই ডাক শুনতে পেল। অন্যমনস্ক মন কানের মধ্যে এই ডাক পৌছতেই সে চমকে তাকিয়েছে। পিতা লুতুফ সারাদিন বাইরে থাকে। সঙ্গী-সাথী কেউ নেই। সঙ্গী বলতে সামনের আমগাছটার ডালে একটি কাঠবিড়ালী ও

কটি চড়ুই পাখী।

হানিফ একা একা দাওয়ার বসে উন্মুখ দৃষ্টি নিয়ে কাঠবিড়ালীটির খেলা দেখে। আর কাঠবিড়ালীটি হানিফকে দর্শক ভেবে প্রত্যহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমগাছটির তলা থেকে ওপর পর্যন্ত ডালপালার চতুর্দিকে এমনভাবে ছোটাছুটি করে যা দেখবার। সোঁ করে উঠে গিয়ে ডালপালার এদিক ওদিকে নাচতে নাচতে একেবারে শেষ ডালের মাথায়। তারপর সেখান থেকে আকাশের দিকে পিটপিট করে তাকিয়ে নিচে নেমে আসে। এসে হানিফের দিকে জুলজুল চোখে তাকায়।

হানিফ মৃদু হাসিটি ঠোঁটের কোণে জাগালে সে আবার ওপরে উঠে যায়। এমনি ভাবে কতবার যে সে ওঠা-নামা করে তার ইয়ত্তা নেই। হানিফের প্রত্যহের কাজ এই কাঠবিড়ালী সঙ্গীর সঙ্গে ক্রীড়া। দুজনের এমনি খেলা সারাদিন চলবার পর সন্ধ্যা থেকে যে কাঠবিড়ালীটা কোথায় উধাও হয়, সে জানে না। কতদিন ভেবেছে, কাঠবিড়ালীটা সন্ধ্যার পর কোথায় যায়, একবার যদি জানতে পারতো। ও যদি কথা বলতে পারতো, তাহলে বেশ ভাল হত।

কথা বলতে ও পারে না, একদল চড়ুই পারে কিন্তু ওরা যে কি ভাষায় সারাদিন ধরে কথা বলে, হানিফ জানে না। ওরাও হানিফের আশে পাশে কুঁড়েঘরের মাথায় চালে কিচিরমিচির শব্দ করতে করতে সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়ায়। হানিফ তার ছোট্ট দুটি চোখ দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে আর ভাবে, কি বলে এরা ? ওদের কি কথাবার্তা একটুও বোঝা যাবে না। ওরা যদি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারতো বেশ ভাল হত। তাহলে ওদের সঙ্গে কথা বলে নিঃসঙ্গ মনের ভার লাঘব হত।

তবু প্রথম প্রথম ওদের সঙ্গই হানিফকে আনন্দ দিয়েছিল কিন্তু দিন যত যেতে লাগলো সে আনন্দও শুকিয়ে আসতে লাগলো। কেমন যেন সঙ্গহীন মন, কেমন যেন একা একা ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। কাঠবিড়ালী, চড়ুই, গাছ, পাতা, আকাশ বাতাস সবই অন্য জগতের। তাদের সঙ্গে হানিফের কোন মিল নেই।

যখন তার মনটি সম্পূর্ণ ফাঁকা হয়ে যায় তখনই মনের মধ্যে এসে বাসা বাঁধে শাওনীর কথা। আম্মার কথা। সে জানতো, শাওনীই তার আম্মা। কোনদিন আম্মা বলেনি সে তার আপন কেউ নয়। ফকির আসার পরই সে জানতে পারলো, শাওনী তার কেউ নয়। ঐ ফকিরই তার সব। তার আব্বাজান। গচ্ছিত রেখে ভাগ্যান্বেষণে গিয়েছিল।

হোক্ তার আব্বাজান। তবু লুতুফের ওপর হানিফের রাগ। কেন ঐ লোকটি তার আব্বাজান হল। শাওনী কেন তার আম্মাজান হল না ? শাওনী আম্মা আর ঐ লোকটি আব্বাজান হলেও বা ক্ষতি কি ছিল ? এমনি যখন ছোট্ট মনের অবস্থা সেই সময় লুতুফ এসে তাকে আনন্দের সংবাদ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কিশোর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

লুতুফ আলি হানিফকে ভুল বুঝলো। তলিয়ে দেখলো না বেটার মনের অবস্থা।

হঠাৎ হানিফের গালে ঠাস্ করে চড মেরে বললো,—আর যদি এমন কথা বলবি তাহলে তোকে দূর করে দেব।

হানিফ আব্বাজানের হাতের শক্ত চড খেযে গালে হাত দিযে বসে পড়ে কাঁদতে লাগলো।

আর লুতুফ আলি ঘরময তর্জন গর্জন করতে করতে পাযচারি করতে লাগলো। আর যদি কখনও এমন কথা বলবি, তাহলে গলা টিপে মেরে শেষ করে দেব। আমি তোর জন্যে এত করলাম, আর তুই আম্মাজানের পেযারে মশগুল হযে গেলি! ওকি তোর আপন আম্মা, যে এত দরদ? আমি ভাগ্যান্বেষণে গিযেছিলাম বলে তাই তোকে জমা দিযে গিযেছিলাম। যদি জানতাম, তুই আমাকে ছাডাই মানুষ হতে পারবি, তাহলে কি আবার এই সংসারের মধ্যে ফিরতাম? এই কোটানাতে আসা, ঘর বানানো, মহাজনের গদিতে চাকরি নেওযা এ যে তোরই জন্যে? আমি তোর জন্যে এত করলাম, আর তুই তার উত্তরে আমাকে এমনি আঘাত দিলি?

বলতে বলতে হঠাৎ লুতুফ আলি থেমে পডলো। স্মরণে এলো তার আব্বা ইস্রাফিলকে। সেও তো অমনি তার আব্বাকে কত আঘাত দিযেছে! আব্বা কত দুঃখ পেযেছে, আর সে কত আনন্দ পেযেছে আব্বাকে দুঃখ দিযে। আজ বুঝতে পারছে। আজ তার বালক সন্তান সেই প্রতিশোধ নিচ্ছে।

লুতুফ আলি হানিফের দিকে তাকিযে দেখলো। হানিফ তখন কান্না ভুলে যেন বড বড চোখ করে তাকিযে আছে। কেমন যেন সিংহের মত চোখ পাকিয়ে কেশর ফুলিযে বাবাকে আক্রমণ করবার ফন্দি আঁটছে। লুতুফ আলির তাই দেখে মাথার মধ্যে আবার উত্তাপ সৃষ্টি হতে লাগলো। কিন্তু উত্তপ্ত হযে উঠলেও সে বিচক্ষণের মত নিজেকে সংযত করে পুত্রের কাছ থেকে অন্যত্র সরে পড়লো। এবং সেই মুহূর্তে সে বুঝলো, তার পুত্র পিতার রক্তেরই ধারা পেযেছে। সেও ছোটবেলায় আব্বাকে এমনি জ্বালাতন করতো।

পিতা চলে গেলে বালক হানিফ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো, সুযোগ পেলেই সে যেমন করে হোক আম্মার কাছে চলে যাবে। আম্মা আসবার সময বলে দিয়েছে, যদি কোন অসুবিধা হয, আব্বা যদি তোকে অবহেলা করে তাহলে আমার কাছে চলে আসবি। তারপর আসবার সময ঘরের একান্তে নিযে গিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কত কেঁদেছিল। তার কান্না দেখে হানিফও কান্না রোধ করতে পারে নি। শাওনী সান্ত্বনা দিতে পারে নি। তার ইচ্ছে করেছিল আম্মার চোখের জল মুছিয়ে দেয। কিন্তু সে যে ছোট, বডর মত তো কিছুই করতে পারে না।

শুধু বলেছিল আম্মা, ঐ লোকাটার সঙ্গে আমি যাবো না।

শাওনী সেই কথা শুনে হানিফের দিকে তাকিযে অবাক হযে বলেছিল,—লোকটা কি রে? ও যে তোর বাপজান। তোর আসল আম্মা এখানে মারাযাবার পর, তোর আব্বা ভাগ্যান্বেষণের জন্যে তোকে এখানে রেখে গিযেছিল। তুই আসলে আমার কেউ নয়।

তখন সেই কিশোরের মুখে এসে গিয়েছিল,—তবে সে কথা তুমি জ্ঞান হলে বলনি কেন? আজই বা আমাকে বিদায় দেবার সময় চোখের জল ফেলছো কেন! মুহূর্তে তাঁর শাওনীর ওপর বড় রাগ হয়েছিল।

কিন্তু তবু যেন তার মনটা সেই শাওনীর জন্যেই কেমন কেমন করছিল। না হোক্ তার আসল আম্মা তবু সেতো জ্ঞান হবার পর থেকে আম্মা বলে জানে। ঐ আব্বা আসবার আগে পর্যন্ত তো সে আম্মা ছাড়া কিছু ছিল না। আজ একটি কথাতেই কি সব তার শেষ হয়ে যাবে?

তাই সে আব্বা নামধারী ফকিরের সঙ্গে চলে গেলেও সেই শিশুমন দিয়ে গেল শাওনীর কাছেই আর তারই জন্যে এই এতদূর থেকেও সেই আম্মার ডাক সে শুনতে শুনতে পাচ্ছে।

হানিফ সেদিন কেন তারপর থেকে অনেকদিন পর্যন্ত পিতাকে সে কিছু বললো না। কিন্তু না বলেও যা অব্যক্ত থাকে তা গোপন করা যায় না। হানিফের আচরণই তা প্রকাশ পেতে লাগলো। হানিফ নিঃশব্দে যা করে যায় তা ভালই হোক্ তবু লুতুফের কাছে কেমন যেন অত্যাচার মনে হতে লাগলো।

এমনি করেই চলতে লাগলো দিনগুলি।

এমনি করে চলে গেল কয়েক বছর।

লুতুফ আলি কোটানা গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উঠলো। কোথা দিয়ে যে দিনগুলো তার কেটে গেল সেই জানে না। কেমন করে যে তার দিনগুলি গেল সেও বোধহয় কোনদিন ভেবে দেখে নি। দেখলে হয়তো অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াতো। দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাতো অতীতের দিকে। অতীতের সেই দুঃখময় দিনগুলির কথা কথা ভেবে সম্মুখপথে আর এগোতো না কিন্তু সে বোধহয় অতীতের কথা ভুলেই সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলছিল। এগিয়ে চলে ভাল করেছিল তাই তার বেঁচে থাকার দিনগুলি সুখের হল। হ্যাঁ, সুখের হল বলতে হবে বৈকি? তাকে নিয়ে কোটানা কেন আশেপাশের অন্যান্য গ্রামের লোকেরাও আলোচনা করতো।

সে নাকি দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের দৃষ্টান্ত হয়েছিল। তাকে দেখিয়ে লোকে বলতো, দেখ দিকিনি, লোকটা এই সেদিন এল, অথচ কেমন উন্নতি করলো, কোটানার কোন হিন্দু-মুসলমানই এতটা উন্নতি অতো অল্পসময়ের মধ্যে করতে পারে নি

সত্যিই অল্প সময়।

লুতুফ আলি নিজেই জানে না, এই উন্নতি কেমন করে এত সহজে সম্ভব হল? অবশ্য কোটানায় এসে সে মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিল, যেমন করে হোক্ ভাগ্য পরিবর্তন করতেই হবে। কিন্তু মনের সঙ্কল্প কাজে পরিণত করার মধ্যে অনেক বাধা, অনেক বিপত্তি। সে সেই বাধা বিপত্তি জয় করেই এই সম্ভব করেছে। কৃতিত্ব তার এইটুকু। এতদিনে সে স্বীকার করলো, না, আল্লা আছে। খোদা সত্যিই মেহের-

বান। কিন্তু এই সুখের সময়ে এক এক সময় তার মনটা বিমনা হয়ে যেত আব্বা, আম্মা ও জোরুর জন্যে। ওরা আজ যদি থাকতো বড় ভাল হত। আব্বা বৃদ্ধ বয়েসে দুটি পেটপুরে খেয়ে বাঁচতো। আম্মা কোনদিনও সুখের মুখ দেখে নি, সে সুখের মুখ দেখতো। ফতুমার জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল। বরবাদ না হলে সে সুখ পেত কিন্তু কেউই বেঁচে থাকলো না। তবে এই সুখ ভোগ করবে কে? হানিফ আর সে? কিন্তু হানিফের মতিগতি দেখে লুতুফ দিনদিন কেমন মুষড়ে পড়েছে। হানিফের ওপর কোন ভরসা নেই। পড়া লিখা শিখলো না। বাবাকে কোন সাহায্যই করলো না। শুধু দুটি খানা বানায় আর চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। শোনা যায় সে এই বয়সে হিন্দনে গিয়ে সাঁতার কাটে।

সে কাটুক গে। যদি মরে কোনদিন মরবে, তার জন্যে লুতুফ ভাবে না। ভাবে, এই ছেলে বড় হলে সে বেঁচে থাকবে তো? ভরসা কম। এই জন্যে যে, সে আব্বাকে কোন কিছুতেই তোয়াক্কা করে না। বেবাগ যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। আব্বার হুকুম পর্যন্ত মান্য করে না।

ইদানিং আবার এক ফিকির ধরেছে একটি ঘোড়া করে দিতে হবে।

ঘোড়া কি হবে রে বেটা?

হানিফকে একথা জিজ্ঞাসার একটি অর্থ মনে মনে লুতুফের আছে। কারণ সে আজও ভাবে, হানিফ তার পাতানো আম্মাকে কিছুতে ভোলে নি। এখন একটু বড় হয়েছে, কোন্‌দিন সে সেই শাওনীর কাছে গিয়ে হাজির হবে। শাওনীর এ ক'বছরের কোন খবর অবশ্য সে রাখেনি। সেদিন এক লোক এসে তাদেরই খবর দিয়েছিল শাওনীর। শাওনীর সেই সরাইখানায় সেই লোকটি কদিন আশ্রয় নিয়েছিল, তার কাছে বলে পাঠিয়েছে শাওনী তাদের কথা। লোকটি যখন লুতুফ আলিকে শাওনীর কথা বলছিল, তখন সেখানে ছিল হানিফ। সে অবাক দুই চোখ দিয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে লোকটির কথা শুনেছিল। লোকটি বললো,— আওরত বহুত শরীফ, দিল্‌ ভী আচ্ছা। বাচ্চা একটি লড়কী আছে। লড়কী ভী বহুত আম্মাকে মাফি সুরত পায়া হ্যয়।

সেই আওরত আপনাদের কথা বললো। বললে,—পরদেশী আপনি মীরাটে যাচ্ছেন। যদি মেহেরবানী করে একবার কোটানা গ্রামে যান তাহলে ভাল হয়। আমার লুতুফ ভাই, বেটা হানিফের কোন সংবাদ অনেকদিন পাই নি। তাদের সংবাদের জন্যে মনটা বড় কদিন থেকে খারাপ যাচ্ছে। তার কথাতে আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

আরো অনেক কিছু হয়তো লোকটি বলতো কিন্তু লুতুফ আলি হানিফের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ লোকটিকে অন্য কথায় ঘুরিয়ে দিল।

তারপর লোকটি চলে যাবার পর লুতুফ যা ভেবেছিল, তাই হল। হানিফ তার পর থেকেই অশ্বের জন্যে বায়না ধরলো।

লুতুফ ভেবে নিল, হানিফ অশ্ব চায়, তার সেই আম্মার কাছে যাওয়ার জন্যে।

অথচ কেন যেন লুতুফেরও শাওনীর ওপর একটা আক্রোশ জমে উঠেছিল। সন্তানটি যত তার দূর সরে যেতে চায় সে তত তাকে আঁকড়ে ধরতে লাগলো। সন্তান যে তার, সন্তানের ওপর পুরো অধিকার যে তার আছে, এই প্রমাণের জন্যেই সে শাওনীর ওপর অযথা বিদ্বেষ পোষণ করছিল না হলে আর শাওনীর ওপরে আক্রোশ কিসের! বরং শাওনী তো তাদের অনেক উপকারই করেছে। এই গ্রামের জায়গাটুকু উপহার না দিলে তার এই উন্নতি হত কোথা থেকে! সোনীর মোহরগুলি দিয়ে যেমন সে অনেক কিছু করেছে, তেমনি শাওনীও জায়গাটুকু দিয়ে। দুটি রমণী তাকে নিঃশেষে দান করেছে। পরিবর্তে প্রতিদান চায় নি। সেই জন্যে সে কৃতজ্ঞ।

শাওনীর কাছে সেইজন্যে সে কৃতজ্ঞই আছে। তবু হানিফের জন্যে তার আক্রোশ এই জন্যে যে, শাওনী হানিফকে কেড়ে নিয়েছে বলে। ছেলেটির মনের গতিবিধি এই ক'বছর ধরে সে কাজের ফাঁকে সর্বদা লক্ষ্য করেছে। তাকে পাতানো আম্মার কথা বলতে নিষেধ করলেও সে সর্বদা সেই আম্মার কথাই ভাবে। সেইজন্যে লুতুফ আলির রাগ।

তাই ঘোড়া সওদা করে দিতে বলতে লুতুফ আলি ভাবলো, এখন হানিফ অনেক বড় হয়ে উঠেছে এখন ইচ্ছে করলে সে অশ্বের ওপর সওয়ার হয়ে বহু পথ অতিক্রম করতে পারে। পারে কেন, একদিন এক প্রতিবেশীর অশ্বে চড়ে সে মীরাটের এক শহরে গিয়েছিল। শোনার পর লুতুফ আলি খুব রাগ করেছিল। রাগ করেছিল শুধু ঐ ভয়ের জন্যে। যদি এই মীরাট ছেড়ে কোনদিন ঐ ছেলে সেই বিতস্তার তীরে গিয়ে সরাইখানায় ওঠে। তাহলে এই সম্পত্তি, এই ঘরবাড়ি কার জন্যে রাখবে? হানিফ যে সরাইখানায় গেলে আর ফিরবে না, এই তার বিশ্বাস।

আজ অশ্ব চাইতে তাই সে আঁতকে উঠলো।

কিন্তু কথাটা সে রাগতস্বরে জিজ্ঞেস করলো না। স্নেহজড়িতস্বরে জিজ্ঞেস করলো,—অশ্ব কি হবে রে বেটা?

অশ্ব কি হবে কথাটা সে অন্যকারণ হলে হয়তো জিজ্ঞেস করতো না। তারা আরববাসী। পায়ে হেঁটে চলার চেয়ে অশ্বকেই বেশী পছন্দ করে।

হানিফ কিন্তু উত্তর দিল একটু ঝাঁঝালো স্বরে। চাইছি, দেবে। অতো কৈফিয়ত তলব করবে কেন?

তবু লুতুফ রাগ প্রকাশ করলো না, সে আগের মেজাজেই বললো,—কৈফিয়ত চাইছি না। তোর বয়স তো এখনো বেশী হয় নি। পেশীগুলো একটু মজবুত হোক। কলিজায় জোর আসুক।

হানিফ বুকের কলিজা মেলে ধরে বাপকে তাচ্ছিল্য করে বললো,—ওসব বাজে কথা রেখে রূপেয়া দাও আমি সওদা করে নিয়ে আসছি।

লুতুফও ইস্রায়িল হালিম আলির ছেলে। বুকের কলিজায় কম জোর নেই। রক্তেও সমান তাণ্ডব আছে। হঠাৎ ছেলেকে মেজাজ দেখাতে দেখে সেও মেজাজ নামিয়ে রাখতে পারলো না। চড় চড় করে উত্তাপ মাথার উপর কোষগুলিতে উঠে

পড়লো। সে চিৎকার করে বললো,—এত মেজাজ দেখাচ্ছিস্ কি? রূপেয়া কি তোর বাপের? যা বেরো. বেরো বলছি।

লুতুফ আলি পুত্রস্নেহের জন্যে যে মেজাজ এতদিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, অনেক সংযত করে রেখেছিল ছেলের জন্যে কিন্তু আজ যেন সেই ঘুম পাড়ানো মেজাজ হঠাৎ জেগে উঠে সব লয় করে দিতে চাইলো।

হঠাৎ সে জোয়ান গায়ে হাত দিয়ে বসলো। ঠেলে দিল বাইরের দিকে। চোখ ছুটি রক্তবর্ণ করে ছেলের এতদিনের অত্যাচারের সে প্রতিশোধ নিতে চাইলো।

একপক্ষ শক্তিপ্রয়োগ করলে আর একপক্ষ দুর্বল হয়ে যায়। হানিফেরও এখানে সেই অবস্থা হল। সে আব্বার রাগের কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে আব্বার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর কোন কথা না বলে মাথা হেঁট বাড়ি থেকে চলে গেল।

লুতুফের চৈতন্য ফিরলো অনেক পরে।

চৈতন্য ফিরতে সে তখন চতুর্দিকে তাকিয়ে কেমন যেন শূন্যতা অনুভব করলো শূন্য শূন্য, শূন্য। এতদিন ধরে এই মেহনত করে যে এত সম্পত্তি করলো, সব নিরর্থক। কেউ ভোগ করবার নেই। কারো সুখের জন্যে এসব কাজে লাগবে না। বরং সেই ভাল ছিল যখন তার কিছুই ছিল না। ফকিরের বেশ ধরে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াতো। তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হত, তবু তার মধ্যে শান্তি ছিল। হ্যাঁ, আজ মনে হচ্ছে সেই শান্তি। বর্তমানের অশান্তির চেয়ে সেই শান্তি। কিছু না থাকার মাঝে যন্ত্রণা কম, সমস্যা নেই। আর কিছু থাকার মধ্যে যন্ত্রণা অনেক। ভোগ করার কেউ না থাকলে এই দৌলতে লাভ কি?

লুতুফ আলি দু'চোখে জল নিয়ে সমস্ত পরিবেশটি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। ছোট জায়গাটি শাওনী তাকে দান করেছিল। হ্যাঁ, খুবই ছোট্ট জায়গা। দুখানি ঘর, একটি খাটাল, একটি বাগান করলেই শেষ হয়ে যায়। মহাজনের গদিতে আকমাড়াইয়ের কারখানায় কাজ করতে করতে হঠাৎ একদিন সেই পাগড়ী পরা মালিকের মুখেই শুনলো আর একটি ব্যবসার পরিকল্পনা। ইক্ষুর চাষের প্রাধান্য এদেশে থাকলেও অন্য কিছু চাষ করা যায় এ জমিতে। সাধারণত বর্ষাকালে আর্দ্র মাটিতে ইক্ষুর চাষ হত, আর হিন্দন নদীর জলের দ্বারা সেই চাষের উন্নতি হত কিন্তু হিন্দনেও জল আসতো বর্ষার সময়। তাই সেই মালিক হঠাৎ জওয়ার, বাজরা ও রাগীর চাষের জন্যে পরিকল্পনা ঠিক করলো। এইগুলি চাষের জন্যে প্রচুর জলের দরকার নেই। অল্প বৃষ্টিপাতেই শস্য ফলানো সম্ভব।

সেই পাগড়ীপরা মালিক লুতুফ আলিকে সে কথা বলছিল না। বলছিল অন্য এক মহাজন মালিককে।

হঠাৎ লুতুফ আলির সেই পরিকল্পনাটি ভাল লেগে গেল। এবং লেগে যেতে দুঃসাহসিকভাবে মালিকের সামনে গিয়ে বললো,—হুজুর, আমার যদি গোস্তাকি মাপ করেন, তাহলে একটি বাত্, আমি বলতে পারি।

মালিক কোন কথা না বলে লুতুফ আলির দিকে সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

লুতুফ আলি ভয় না করে বললো,—হুজুর, আমার কিছু মূলধন আছে। আমি ব্যবসা করতে চাই। আপনি যে ব্যবসার কথা বললেন, আমি সে ব্যবসাটি ভাল মনে করি। হুজুর, আমি যদি সেই ব্যবসায় আমার মূলধন খাটাই নিশ্চয় আমার মুনাফা হবে।

মালিক তবু উৎসাহ না প্রকাশ করে বললো,—কত তোমার মূলধন আছে?

লুতুফ আলি জোড়হাত করে বললো,—কিছু মোহর আছে হুজুর। আমি যখন দিল্লীর বাদশাহের দপ্তরখানায় নোকরী করতাম, তখন বাদশাহ আমাকে উপহারস্বরূপ কিছু মোহর দিয়েছিলেন।

তারপর আর কি? সেই মালিকের পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হল। ইক্ষুচাষের জমিতে ইক্ষু চাষ হয়ে গেল সমস্ত জমি কমানের জন্যে ইজারা নেওয়া হল। আর সেই জমিতে লোক খাটিয়ে জওয়ার, বাজরা, রাগী বোনা হল। সেই শস্যের মুনাফা কম নয়, শুধু তৈরি করে নৌকায় উঠিয়ে দিলেই হয়। তামাম ভারতের চারিদিকে সেই সব রপ্তানী করে টাকা আসতে লাগলো স্রোতের মত। লুতুফ আলির মূলধন কম কিন্তু তার শেয়ারে যা পেলো তাতে সে বাড়িয়ে ফেললো। আরো জমি কিনে নিজের জায়গার সঙ্গে যোগ করলো। গ্রামের লোক তো তার কাণ্ড দেখে অবাক। গ্রামের লোকের জন্যে সে কূয়ো করলো তিনটি। সে জল গ্রাম্য অধিবাসীর পানীয় জলের দুঃখ ঘোচালো। তারা লুতুফ আলির জয় জয়কার করতে লাগলো। লুতুফ আলি গ্রামবাসীর জন্যে শুধু কূপ খনন করে দিল না। বহু তরিতরকারীর ক্ষেত করলো এবং সে ক্ষেতের দ্রব্য গ্রামবাসীদের আহারের জন্যে বিতরণের হুকুম দিল। কোটানা গ্রামের অধিবাসীরা লুতুফ আলির কাজ থেকে নানারকম ভাবে এমন উপকার পেতে লাগলো যে তাদের কোন বিদ্বেষ থাকলো না। আর সেই সুযোগে লুতুফ আলি কোটনার সম্রাট হয়ে উঠলো। তার প্রতিপত্তিতে কেউ আর ঈর্ষান্বিত হল না।

লুতুফ আলি হানিফ চলে যাবার পর চতুর্দিকে তাকিয়ে তাই ভাবলো এতদিন ধরে এই মেহনত করে লাভ কি হল? হানিফ একবার বুঝলো না, আব্বা কার জন্যে এসব করছে? আর হানিফ ছিল বলেই তো সে এই সংসারের মধ্যে প্রবেশ করে এই সব করেছে।

ছেলেটি যদি একবার তলিয়ে বুঝতো, তাহলে এমন আচরণ করতো না।

তারপর একেবারে সাতদিন কেটে গেল।

লুতুফ আলি এই সাতদিন ধরে আশায় আশায় থাকলো, হানিফ ফিরে আসবে কিন্তু সে এল না। এমন কি তার কেউ খোঁজও দিতে পারলো না। যতদিন যেতে লাগলো, ছেলের সম্বন্ধে আশা যেন আর কমে এল। হানিফ আর আসবে না। তবে সে শাওনীর কাছে গেছে? তাই যদি হয়, তাহলে হানিফের আর তাকে প্রয়োজন নেই। চার বছর শাওনীর কাছে যে স্নেহ পেয়েছে, আর তাকে সে এতদিন কাছে কাছে রাখলো। তার আসল পিতাকে অবহেলা করে নকল মাকে নিয়ে সে ভুললো?

লুতুফ আলি প্রথমে ভাবলো, হানিফ শাওনীর কাছে ফিরে গেছে। কিন্তু কদিন

পরে হঠাৎ সে এমন একটা দুঃসংবাদ শুনলো, যা শুনে সে আর নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলো না। আবার দিল্লীর আসমানে তখন যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। সৈন্য তৈরির জন্যে দেশবিদেশ থেকে লোক যোগাড় চলছে। ঢেউ এসে মীরাটেও লাগলো। কোটানা থেকেও অনেক বলশালী যুবকদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হল।

পারস্যরাজ আহম্মদ শাহ দুররাণী হিন্দুস্থান আক্রমণ করতে আসছেন। ইদানিং মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে উঠে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছিল। সেই মুসলমানরা একজোট হয়ে পারস্যরাজকে মারাঠাদের শায়েস্তার জন্য অনুরোধ করে। অবশ্য এটি একটি মামুলি কারণ। আহম্মদ শাহ দুররাণীর আসল উদ্দেশ্য নিজের আধিপত্য বিস্তার করে ভারত জয় করা। যা' হোক পারশ্যরাজের শক্তির কথা কারুরই অবিদিত নয়। একসময় আর এক পারস্যরাজ নাদীর শাহ দিল্লী আক্রমণ করে দিল্লী অধিবাসীর ওপর কিরকম অত্যচার করেছিলেন সে কথা আজও সবার মনে আছে। সেই মনুষ্যবিগর্হিত ভয়ঙ্কর অত্যাচারের কথা আব পুনরাবৃত্তি না হোক্—এই চায সকলে। আর সেই জন্যে আগে থাকতে দেশ রক্ষা করার জন্য নিজেরাই তৈরী হতে লাগলো।

তখনও দিল্লীর সিংহাসনে বৃদ্ধ মহম্মদ শাহ আসীন। মহম্মদ শাহ নামেই সিংহাসনে বসে আছেন। রাজকার্য পরিচালনা করছেন, পুত্র আহম্মদ শাহ। আহম্মদ শাহ্ পারস্যরাজ আহম্মদ শাহের আক্রমণের সংবাদ শুনে তৈরী হতে লাগলো। আর তাঁরই অদম্য চেষ্টায় সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোর জন্যে লোক যোগাড় হতে লাগলো দেশ বিদেশ থেকে।

লুতুফ আলি সমস্ত ব্যাপারটা শুনে স্মরণ করলো সেই নাদীর শাহের আক্রমণ। নাদীব শাহ চলে যাবার পর সে দিল্লী ও দিল্লীর রাজপ্রাসাদে গিয়েছিল। দেখেছিল ধ্বংসের নিদারুণ বীভৎস ছবি। কয়েকদিনের মধ্যে মানুষের মুল্য যেন কত নেমে গিয়েছিল। তারপর রক্তাক্ত নিহত মৃতদেহের পর্বতে অগ্নি সমর্পণ করে তবে তাদের নিঃশেষ করা হয়েছিল।

আরো রাজপ্রাসাদের অতিথিশালায় শুনেছিল নির্যাতিত মানুষের আর্তনাদ। দুটি আহার, একখণ্ড লজ্জা নিবারণের বস্ত্র, একটু নিরাপদ আশ্রয়ের। মেয়ে পুরুষ, শিশুদের বাঁচবার সেই নিদারুণ চিত্র। না, লুতুফ আলি তখনও ভুলতে পারবে না সে ছবি। বড় মর্মন্তুদ সে ইতিহাস। তারপর তার জীবনে অনেক উত্থান পতনের ইতিহাস সংযোজিত হয়েছে। ভোলা উচিত ছিল সে ছবি। কিন্তু বিস্মৃতি হয় নি সে ছবি। বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবার মত নয়। তাই লুতুফ আলির চোখের সামনেই তা আজও জেগে আছে। যুদ্ধ সে করে নি। যুদ্ধ সে দেখেনি কিন্তু ভাগ্যক্রমে ধ্বংসের একটি ছবি তার দেখা হয়েছে। অবশ্য সে যুদ্ধ নয়, অত্যাচার। নিরীহ মানুষগুলিকে খণ্ডখণ্ড করে কেটে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করা হয়েছে।

যা'হোক এবার সেই পারস্যরাজ আহম্মদ শাহ তুররাণী যুদ্ধ করতে আসছেন। আর মহম্মদ শাহের পুত্র ভাবী বাদশাহ যুবরাজ আহম্মদ শাহ সেই যুদ্ধ প্রতিরোধ করবে জন্যে তৈরী হচ্ছেন।

লোক দুদিক থেকে যোগাড় করা হচ্ছিল। এদিকে মারাঠারা যুদ্ধ জয় করার জন্যে শক্তি বর্ধিত করছিল। দিল্লীর বাদশাহ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্যে তৎপর হচ্ছিল। দু'দলেই সৈন্য সংগ্রহের জন্যে অশ্বারোহী ছুটছিল। কোটানা গ্রামেও এল বাদশাহ ও মারাঠাদের লোক লুতুফ আলির কজন চাষীকে বলপূর্বক ধরে নিয়ে গেল। তাই দেখে লুতুফ আলি ভাবলো, হানিফও একেবারে শিশু নয়, হয়তো পিতার ওপর রাগ করে সেও সৈন্যদলে যোগদান করেছে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সে আর দ্বিরুক্তি না করে দিল্লী, রাজস্থান, পাঞ্জাবে যাবে বলে মনস্থ করলো। হানিফকে সে মরতে দেবে না। হানিফ যদি মরে তাহলে এই ধনসম্পত্তি নিয়ে কি হবে? তাহলে তারও মৃত্যু হোক্। সেও দুনিয়া থেকে চলে যাক্। এমনি সাত পাঁচ ভেবে লুতুফ আলি একটি অশ্ব যোগাড়ে তৎপর হল।

অর্থ দিয়ে সে একটি অশ্বকে সওদা করে নিল। সম্পত্তি দেখাশুনার জন্যে গ্রামবাসী দোস্তকে ভার দিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো দিল্লী অভিমুখে। তার ধারণা, হানিফ দিল্লীতে গেছে। কিংবা বাদশাহের লোক তার খোঁজ পেয়ে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

অশ্বারোহী ছুটে চললো দিল্লী অভিমুখে। বহুকাল লুতুফ মীরাটের বাইরে যায় নি, তাই তার এই অভিযানে একটু অসুবিধা হল। তা হোক্গে, সন্তানস্নেহে বিগলিত হয়ে, সন্তান হারাবার বেদনা মনে নিয়ে সে সমস্ত অসাধ্যসাধন করতে বদ্ধপরিকর হল। জানে না সে, কোথায় আছে বেটা হানিফ — আদৌ দিল্লীতে আছে নাকি সেই বিতস্তার তীরে শাওনীর কাছে গেল। শাওনীর কাছে সে আগে যাবে না। সর্বপ্রথমে দিল্লীর সেনানিবাসে খোঁজ নেবে। তারপর পাঞ্জাব ও রাজস্থানে যাবার আগে সে শাওনীর সরাইখানা ঘুরে যাবে।

এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে লুতুফ আলি অশ্বের বল্গা ছুটিয়ে দিল। সে একজন ভাল অশ্বারোহী, সে নিজে জানে। তাই বার বার অশ্বের পেটে পায়ের গোড়ালি দিয়ে আঘাত হেনে অশ্বকে ক্ষেপিয়ে তুললো। অশ্ব যত ক্ষিপ্ত হল, ছুটলোও তত জোরে। আর লুতুফ আলি অশ্বপৃষ্ঠে শুয়ে পড়ে পথের দিকে শুধু ব্যগ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

বেলা তখনও বেশী হয় নি। তবে সূর্যের জোরালো আলো নেমে এসেছে। রৌদ্রদগ্ধ আসমানের দিকে তাকিয়ে লুতুফ আলি সময় নির্ণয় করে পাখীদের চলে যাওয়া দেখলো। পথের দুপাশে দেবদারু সাইপ্রাস বৃক্ষ সার বেঁধে আছে। সেই বৃক্ষরাজির জন্যে ছায়া সৃষ্টি হয়েছে দীর্ঘ পথে। এ পথ মোগল বাদশাহদের দ্বারা নির্মিত, তাই পথের সৌন্দর্য পরিকল্পিত। লুতুফ আলি নিজের কোমরে বাঁধা তরবারীখানার দিকে তাকালো। সূর্যের আলো পড়েছে সেই বৃহৎ তরবারীর ওপর। প্রতিফলিত হচ্ছে আরো তীক্ষ্ণ এক রজতজ্যোতি। লুতুফ আলি তার চিরকালের সঙ্গী

এই তরবারীর কথা ভেবে মনে সাহস সঞ্চয় করলো। বহুকাল ধরে এই তরবারী দিয়েছে তাকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা। আজও সে সঙ্গে আছে। আজ চলেছে সে লড়কাকে খুঁজতে কিন্তু তাকে খুঁজতে গিয়ে পড়তে হবে বিরাট এক শত্রুর সম্মুখে। আজ তাকে সৈন্যের ভূমিকা নিতে হবে। মনে পড়লো শাওনীর কথা। শাওনী বলেছিল, 'ভাইসাহেব, ছোটবহিনের গোস্তাকি মাপ কর, সত্যি কথা বলতে কি তোমার সৈন্য হওয়ার মত শক্তিও নেই, ফকির হওয়ার মত সামর্থ নেই। তুমি সংসারী হও। তোমার একটি নিরাপদ আশ্রয় ও একজনের অবলম্বন দরকার। পারতো আবার একটি শাদী করে সে অভাব পূরণ কর!'

শাওনীর কথার সেদিন সে প্রতিবাদ করতে পারে নি। আজও করবে না। তবে সে কোনদিন যদি সুযোগ পায়, তাহলে দেখাবে সে সৈনিক হতে পারে। ফকির হওয়ার ইচ্ছে তার নেই, সৈনিক হওয়ার বাসনাই তার আছে। কোন বলশালী পুরুষকে তখনকার দিনে এই আঘাত দিলে সে সহ্য করতো না। লুতুফ আলি তখন অসুবিধায় পড়েছিল বলে শাওনীর কথার উত্তর দেয় নি, তবে মনে মনে সেদিন সে আহত হয়েছিল। আজও সেই ক্ষত একই রক্তাক্ত নিয়ে জেগে আছে মনের মধ্যে।

তাই মনে মনে লুতুফ আলি আবার তার পেশীগুলি জাগিয়ে তুলে বুকের কলিজায় শক্তি সঞ্চার করলো। হ্যাঁ, এবার সে সৈনিক হবে। যদি হানিফকে না পায়, তাহলে কোন এক সৈন্যদলে যোগদান করে পারস্যরাজের বিরুদ্ধে লড়বে। সৈনিকের সাহসের পুরস্কার। অন্তত কিছু শত্রুকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিয়ে তারপর সে বিদায় নেবে। হঠাৎ লুতুফ আলি অশ্বের গতি মন্দীভূত করে কোষবদ্ধ তরবারীখানা তুলে সূর্যকে সাক্ষী রেখে বললো, —যদি হানিফের দেখা না পাই, তবে আল্লার নামে এই শপথ করলাম; আর কোটানাতে ফিরবো না। সৈনিক হয়ে মরদের মত জীবনাহুতি দেবো শত্রু নিধন করে।

দিল্লীতে যখন এসে পৌছলো তখন আঁধার নেমে এসেছে। লুতুফ আলির কাছে দিল্লী পরিচিত জায়গা। পরিচিত মানে পথঘাট সে চেনে। তাই সে সেই আঁধার পথ চিনে রাত্রিটুকু কাটানোর জন্যে চকবাজারের দিকে এগোলো।

চকবাজারের কাছে এসে একটা সরাইখানা খোঁজ করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো তার সেই সোনীর কথা। সোনী এতকাল পরে বেঁচে আছে কিনা সে জানে না! তবে যদি বেঁচে থাকে এই অনুমানে লুতুফ একবার কৌতুহলী হয়ে বাজারের পাশের অন্ধকার গলিপথ ধরলো। তার বিশ্বাস, সেদিন সোনী প্রাসাদের হারেমে না গিয়ে অন্যত্র আত্মগোপন করেছিল।

আজ যদি সেই সোনীর দেখা সে পায়, তাহলে তাকে বেশ অপমান করে বুঝিয়ে দেবে, তারা যে ধরণের আওরত তাদের আচরণও সেই ধরণের। শুধু সেদিন লুতুফ আলি ভুল করে এক গুরুতর কার্যভার দিয়েছিল। কিন্তু সে সত্যই সেদিন ভুল করে-ছিল। আরো অনেক কথা বলবে। যদি দেখা পায়, আর যদি তাকে চিনতে পারে তাহলে সেদিনের প্রতিশোধ নিবে।

বহুকাল আগে সেই গলিপথে এসেছিল কিন্তু আশ্চর্য, লুতুফ আলি ঠিক সেই অন্ধকার গলিপথ দিয়ে সোনীর দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কোন দ্বিধা না করে বন্ধ দরজার কড়া ধরে লুতুফ আলি নাড়া দিল।

কিছুক্ষণ কড়া নাড়ার পরে দরজা খুলে গেল। একটি স্বল্প আলোর বাতিদান হাতে একটি অল্পবয়স্ক যুবতী সামনে এসে দাঁড়ালো।

আসুন।

যুবতীটি লুতুফ আলিকে ঘরের মধ্যে ডাকলো।

চমকে উঠলো লুতুফ আলি। যেটুকু আলো সেই যুবতীটির মুখের ওপর পড়েছিল, সেই আলোর প্রতিফলনে মুখখানি চেনা যায়। রূপজীবিনীদের চিনতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। যত সুন্দরই তারা হোক্, যত প্রসাধনেই ঢাকা দিক্ মালিন্য, তবু দুটি চোখের কোলে সে চিহ্ন থাকবেই। সেই রাত্রি জাগরণের চিহ্ন। সেই দেহক্ষয়ের চিহ্ন। সেই অশ্রুঝরা দুটি চোখের সজল চাউনি।

লুতুফ আলি হঠাৎ দুর্বলতা বোধ করে শক্ত হয়ে উঠলো। না, সে রূপজীবিনীর ঘরে রাত কাটাতে আসে নি। খুঁজতে এসেছে সোনীকে। আঘাত দিতে এসেছে সোনীকে।

লুতুফ আলি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে দেখে মেয়েটি ঠোঁটের কোণে হাসি আনলো। মোলায়েম কণ্ঠে বললো,—বাবুসাহেব এতদূর যখন এসেছেন, তখন গরীবের ঘরে প্রবেশ করুন। রূপেয়া বেশী চাই না।

লুতুফ আলি হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। তাই তার কণ্ঠের স্বরে ফুটলো অস্বাভাবিকতা। বললো,—না, না আমি সেজন্যে আসি নি। সোনী বলে এক আওরত এখানে থাকতো, আমি তার খোঁজে এসেছি।

যুবতীটি মৃদু হেসে বললো,—বেশ, সোনী যখন নেই, আমাকেই সোনী মনে করুন না!

না, না। সোনীকে আমার অন্য কারণে দরকার। এই বলে লুতুফ আলি আর অপেক্ষা না করে একরকম ছুটে বেরিয়ে এল সেই অন্ধকার রহস্যময় গলিপথ ছেড়ে।

সে এসে দাঁড়ালো আবার সেই দিল্লীর চকবাজারের মধ্যে। অনেক আলোর মাঝে সারি সারি বিপণির দিকে তাকিয়ে সে সেই কার্পেটের দোকানটি খুঁজতে লাগলো। কার্পেটের দোকানটি চোখে পড়লো না, সে জায়গায় সেই স্থানে একটি ফুলের দোকান দেখলো।

ফুলের দোকানের সামনেই গিয়ে উপস্থিত হল।

দোকানী বিরাট এক সেলাম করে লুতুফ আলিকে বললো,—হুজুর আসুন। আচ্ছা বসোরাই গোলাপ আছে। বেশী দাম নয়, এক তোড়া নিয়ে যান।

লুতুফ আলি মাথা নেড়ে মৃদু হেসে বললো,—আমার ফুল চাই না। আমি একটি সংবাদ জানতে এসেছি, দিতে পারেন?

দোকানী খদ্দের নয় দেখে একটু বিরক্ত হল, তারপর গম্ভীর হয়ে বললো,—

বলুন।

লুতুফ আলি দ্বিধা না করে জিজ্ঞেস করলো,—এক কসবী আওরত, নাম সোনী। বহুদিন আগে বাজারের ওপাশের এক ঘরে থাকতো, সে কোথায় গেল একটু খোঁজ দিতে পারেন!

দোকানী অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর বিস্ময়ে বললো,—কেন বলুন তো: সে তো অনেকদিন আগের কথা। তার কথা এখন আর কেন?

লুতুফ আলি বললো,—যদি তার সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাহলে দয়া করে আমাকে বলুন। আর সে এখন কোথায় থাকে, তার সন্ধান দিলেও উপকৃত হব।

দোকানী এবার একটু ম্লান হাসলো, বললো,—সে বড় বিশ্রী ইতিহাস হুজুর। সে কসবী ছিল বটে কিন্তু মন তার ছিল বড সুন্দর। সে আমাকে বড় পেয়ার করতো। একদিন এক পরদেশী এসে তার ঘরে রাত্রিবাস করলো। সেই পরদেশী তাকে কি যাদু করলো, কে জানে? সোনী তারই কথায় প্রাসাদের হারেমে কার খোঁজে গেল। সেই গেল, আর ফিরলো না। পরে জানা গেল, সে অনধিকার প্রবেশ করেছিল বলে বাদশাহ তার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন।

লুতুফ আলি হঠাৎ চমকে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়লো সেই সোনীর কথা। এই মেয়েটিকে সে কিছুক্ষণ আগে কত খারাপ ভেবেছিল। কিছুক্ষণ আগে কেন আজ এতকাল ধরে তার সম্বন্ধে অন্য ধারণাই ছিল। অথচ সেদিন রাত্রে সোনী সত্যিই প্রাসাদের হারেমে গিয়েছিল। বোধ হয় সোনীবাঁদীর সঙ্গেও তার দেখা হয়েছিল। কিন্তু সে সংবাদ আর সে বাইরে বের করে আসতে পারে নি। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক প্রহরীর হাতে ধরা পড়ে একেবারে কারাকক্ষে।

দোকানী এই সময়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো,—আপনি তাকে কি করে চিনলেন হুজুর?

লুতুফ আলির ইচ্ছে করলো সে বলে। আমিই সেই ঘাতক দোকানী, যে সোনীকে সেদিন নিজের স্বার্থের জন্যে এক ভয়ঙ্কর স্থানে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোন কথাই সে বললো না। আস্তে আস্তে সেই ফুলের দোকান থেকে সরে এসে সে একটি সরাইখানার দিকে এগোলো।

মনটি তার সত্যিই খারাপ হয়ে গেল।

সেদিন যদি সোনীকে সে বিশ্বাস করতো. তাহলে সোনীর অনুসন্ধানের জন্যে সে তৎপর হত। কিন্তু বাজারের মেয়েলোক বলে তার ঘৃণাই তার বিশ্বাস নষ্ট করেছিল। বাজারের হলেও যে অন্য মনের পরিচয় দিতে পারে, যে মন সত্য ও সুন্দর—সে কথা একবারও তার মনে হয়নি। হায় রে, সে কথা কেন সেদিন মনে হয় নি! মনে হলে তো এমনি মনের পরিচয় দিত না। অন্তত উদ্ধার না করতে পারুক, উদ্ধারের চেষ্টা করতো। তাতেও তো অনেকটা শান্তি আসতো। নিজেকে এতটা অপরাধী মনে হত না।

আজ তার নিজেকে বড় অপরাধী মনে হল। সেই বিগত দিনের স্মৃতি থেকে সেই

রাত্রের কথাগুলি লুতুফের বার বার মনে আসতে লাগলো। সোনীকে সে কপট অভি-নয় করে স্বামী হওয়ার ভূমিকায় রমণীর আসন দান করেছিল। সে বিশ্বাস করেছিল মুসাফিরকে। দারুণভাবে বিশ্বাস করেছিল। আর বিশ্বাস করেছিল বলেই এতটুকু দ্বিধা করে নি। মুসাফিরকে বিশ্বাস করে মৃত্যু দুর্গে প্রবেশ করে জীবনাহুতি দিয়েছিল।

আজ এত বছর পরে লুতুফ আলির মনে হল, সেই জয়ী। সে আওরতটি পঙ্কের মধ্যে জীবন ধারণ করে বসোরাই গোলাপের সুরভি বিতরণ করেছিল। তাকে চিনতে পারে নি লুতুফ আলি। সে আর এক সোনীর মহত্বতে আচ্ছন্ন হয়ে অন্য এক সোনীকে ভুলেছিল। অথচ এই সোনীকে যে স্বামী হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল, ইচ্ছে করলে তাকে সে গ্রহণ করতে পারতো।

সে হেরে গেল। সোনীর কাছে সে হেরে গেল। বাজারের দেহব্যবসায়ীর কাছে তার পরাজয় হল।

এতদিন পর এখানে না এলেই বুঝি তার ভাল হত। সোনীকে খুঁজে তাকে আঘাত দেবার জন্যে এসে সে নিজেই আঘাতের যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল। সেই মুহূর্তে সে ভুলে গেল, কেন এসেছিল এই দিল্লীতে। তার হানিফ আজ বড় হয়েছে। মরদের মত শক্তি পেয়েছে। সে সৈন্যদলে যোগদান করলে তাকে তাচ্ছিল্য করে সেনাপতি সরিয়ে দেবেন না। বরং এগিয়ে দেবেন সৈন্যদলের প্রথম সারিতে। সে কথা তার মনে থাকলো না।

শুধু বড় তার ক্লান্ত লাগতে লাগলো। অশ্বটিকে টানতে টানতে সে একটি সরাই খানার জন্যে তাকাতে লাগলো। এখুনি একটি ছোট্ট আশ্রয় তার দরকার। খানা-পিনা নয়, শুধু বিশ্রামের দরকার। এতক্ষণ তার পথকষ্টে কোন ক্লান্তি আসে নি। সোনীর কথা শোনার পর তার নিজেকে বড় অসহায় মনে হল। আঘাত সেই পেয়ে আসছে। আঘাত কাউকে সে দিতে পারে না। ফতুমা আঘাত দিয়েছে। সোনী বাঁদী আঘাত দিয়েছে। শাওনী দিয়েছে। বাজারের এই মেয়েলোককে সে তাচ্ছিল্য করেছিল, এও কম আঘাত দিল না।

দিল্লীর চকবাজারের জায়গা জুড়ে সেদিনও লোক ছিল কম নয়। যেমন আলো, তেমনি রংবেরঙের পসরা নিয়ে রকমারী বিপণি। তেমনি খদ্দেরেরও শেষ নেই। সব খদ্দেরই জিনিস সওদা করছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, তবে পথচারীর উৎসাহের বিরাম নেই। সেই জন্যে বেশ কিছুটা কলরব চতুর্দিক ঘিরে। এই জায়গাটুকু এই মুহূর্তে দেখলে মনেই হবে না, যে পারস্যরাজ দুররাণীর আক্রমণের ভয়ে দিল্লীবাসী কম্পিত। একটি বাড়ির দোতলা ঘর থেকে নাচ গানের শব্দ ভেসে আসছিল। যেমন সারেঙ্গী ও তবলার বাদ্যধ্বনি, তেমনি ঘুঙুরের মিঠে বোল। তার সাথে রমণী কণ্ঠের প্রাণ মাতানো গীতসুধা। অনেক লোক পথ থেকে সেই দোতলা ঘরের দিকে তাকিয়েছিল। লুতুফ আলিরও ইচ্ছা করলো, একটু দাঁড়ায় কিন্তু তার তখন শরীর ও মনের দুরবস্থার জন্যে ইচ্ছে থাকলেও সে দাঁড়ালো না। শুধু মনে মনে বললো, – যে নর্তকীটি গান ও নাচ পেশ করছে, সে বেশ দক্ষ।

তারপর একটি সে ছোট মত সরাইখানা দেখতে পেয়ে অশ্বটিকে বাইরের একটি থামের গায়ে বেঁধে রেখে ভেতরে ঢুকলো। মালিকের কাছ থেকে একরাত্রের জন্যে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সে সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে আলো না জ্বেলেই গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে। তারপর আর তার কোন খেয়াল নেই।

খেয়াল হল, যখন তখন সেই ঘরের জানালা দিয়ে সকালের আলো এসে মেঝেতে পড়লো।

লুতুফ আলির ঘুম ভেঙে যেতে সে তাড়াতাড়ি মেঝের ওপর উঠে বসলো। চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখে সে বিস্ময়ে ভাবলো এই ঘরে সে রাত্রিবেলা ছিল? এখানে যে এক মাতালই বাস করতে পারে। তবে কি সেও সরাব পান করেছিল? না হলে এই অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় ঘরের মেঝের ওপর শুলো কেমন করে?

খুব স্বল্প পরিসরের ছোট্ট ঘর। বললে ভুল হয়, একটি দরজা লাগানো চারকোনা জায়গা। সেই স্বল্প জায়গাটুকুর মধ্যে মনে হয় সরাইখানার মালিকের সারাজীবনের পরিত্যক্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি গচ্ছিত আছে। অনেক সরীসৃপের বাস ওর মধ্যে হলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে দেওয়ালগুলি চোখে পড়ছে, তার গায়ে হাজার বর্ণের চিহ্ন। যে গবাক্ষটি দিয়ে আল্লার আলো আসছিল, সেটি গবাক্ষ নয়, একটি দেওয়ালের কিছুটা অংশ লোপাট হয়ে যাওয়ার জন্যে ঐ অবস্থা হয়েছে।

লুতুফ আলি বিস্ময়ে ভাবলো,—রাজধানী দিল্লীতেও এমনি ঘর আছে? যদি সে গতরাত্রে সুস্থ থাকতো, আর রাত্রি অতো না হত, তাহলে নিশ্চয় সে এ ঘরে রাত্রিবাস করতো না। মনে হয় সরাইখানার মালিক জেনে-শুনেই এই কাজ করেছে।

লুতুফ আলি বেরিয়ে এল।

সরাইখানার মালিকের হাতে চাবি ও ঘর ভাড়ার টাকা দিয়ে দিল।

মালিক হেসে জিজ্ঞেস করলো,—হুজুর, ভাল ঘুম হয়েছে তো! কোন অসুবিধা হয় নি!

লুতুফ আলির হঠাৎ মালিকের উপর রাগ চড়ে গেল কিন্তু সে নিজেকে সংযত করে নিয়ে একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গস্বরে বললো,—ঘুম হয়েছে। অসুবিধাও হয় নি। তবে আমি যদি সুস্থ মস্তিষ্কে ঐ ঘরে বাস করতাম, তাহলে আজ আর সুস্থ থাকতাম না।

তারপর হঠাৎ 'আদাব' বলে সে আর মালিককে কোন কথা না বলতে দিয়ে সরাই-খানা থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রের চকবাজার সে দেখেছে, দিনের বাজারও সে দেখলো। দিন বলতে প্রভাতের চকবাজার। অশ্বটিকে টানতে টানতে সে নিয়ে চললো নিঝুম এক নিস্তব্ধ পুরীতে। যেন দৈত্যরা গত রাত্রে সব আনন্দ উৎসব করে সকলে বেরবার সময় সব

ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেছে। কোথাও কোন লোক নেই। আর যারা আছে, তারা নয় পথের পাশে বাড়ির চাতালে শুয়ে ঘুমচ্ছে, নতুবা নিঃশব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মুখে কোন কথা নেই। পায়ে কোন শব্দ নেই। গত রাত্রের সরাবী মেজাজ যেন আজও তাদের চোখের পাপড়ীতে।

কিন্তু লুতুফ আলির বড় খিদে পেতে লাগলো। গতকাল সারাদিনই সে অভুক্ত থেকেছে। আজ খিদে পাওয়া এতটুকু বিচিত্র নয়। সে কিছু আহারের জন্যে চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু এত ভোরে কোন দোকানই খোলা হয় নি।

কিন্তু আর তো সে বিলম্ব করতে পারে না! হানিফকে খুঁজতে হবে। হানিফকে পাওয়া না গেলে একবার শাওনীর কাছে যাবে কিন্তু দিল্লী থেকে সেই সরাইখানা অনেকদূর। যেতে গেলে আবার তাকে পরিশ্রম করতে হবে। অবশ্য শাওনীর কাছে যাবার জন্যে তার আগ্রহ আছে। এই সূত্রে সেখানে গিয়ে সে শাওনীকে তার জায়গা ফিরিয়ে দেবে। বলবে,—কৃতজ্ঞতার দান তুমি ফিরিয়ে নাও। একদিন নিয়েছিলাম বলে আজ ঋণশোধ করছি মনে কর না। আজ আমার অনেক হয়েছে। তুমি যদি তারও কিছু নাও, তাহলে উপকৃত হব।

শাওনী নেবে না সে জানে। শাওনীর স্বভাব জানতে তার বাকী নেই। এমনি জেদী মেয়ে সে কখনও কাউকেও দেখেনি। যাই হোক. তবু সে আজ বলবে। একটু আঘাত দেবার জন্যেই বলবে। চিরকাল সকলে তাকে আঘাত দিল, সে একবারও কাউকে আঘাত দেবে না?

আবার ভাবলো, যদি হানিফ সেখানে গিয়ে থাকে,—তাহলে কোন কথাই নেই। তখন আঘাত তাকেই নিতে হবে। শাওনী সাফল্যের হাসি হাসবে।

হঠাৎ শাওনীর ওখানে যাবার জন্যে লুতুফ আলি বড় ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

আহার্যবস্তু সওদা করার জন্যে আবার সে বন্ধ বিপণিগুলির দিকে তাকালো। কিন্তু বন্ধ বিপণিগুলি যে আর কোনদিন খুলবে বলে মনে হয় না।

অগত্যা খিদেকে সংবরণ করে লুতুফ আলি অশ্বের ওপর উঠে পড়লো। তারপর অশ্ব ছুটিয়ে দিল দিল্লী দুর্গের দিকে। গন্তব্যস্থান তার দিল্লীদুর্গ নয়। দুর্গের আশে-পাশের ক্ষেত্রে। খানিক দূর চলার পর সে দেখলো, উন্মুক্ত ক্ষেত্রের ওপর অনেক সারি বেঁধে ছাউনি ফেলা আছে। একটি, দুটি নয় শত সহস্র তাঁবুর উপস্থিতি। তাঁবুর মাথার ওপর মোগল পতাকা উড়ছে সদম্ভে। এই চিত্র দেখেই বোঝা যায়, পারস্যরাজ অহম্মদ শাহ দুররাণী ভারত আক্রমণ করতে আসছেন। চলতে চলতে আরো শুনলো, মহম্মদ শাহের পুত্র ভাবী সুলতান আহম্মদ শাহ দুররাণীর বিরুদ্ধে লড়বেন বলে এই আয়োজন করেছেন। দুররাণী বিরাট পারসিক ফৌজ নিয়ে পারস্য ত্যাগ করেছেন। ভারতে প্রবেশ করতে মাত্র আর কদিন বাকী। আরো শোনা যাচ্ছে, তিনি প্রথমে পাঞ্জাবের দিকে ধাবিত হবেন। পাঞ্জাবে মারাঠা শক্তি বড় বেশী উৎপাত শুরু করেছে। পাঞ্জাব আক্রমণ করলে মারাঠারাও জব্দ হবে, আর মোগল অধীকৃত একটি দেশ অধিকার করা যাবে।

লুতুফ আলি চলতে চলতে আরো অনেক কথাই শুনতে পেল। প্রবীণ বাদশাহ মহম্মদ শাহ পুত্রকে বলেছেন, পারস্যরাজের কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে লোক পাঠাতে। যুদ্ধ করে, শুধু শুধু অযথা লোকক্ষয় করে কি হবে? তার চেয়ে সন্ধি করলে শান্তিতে রাজত্ব করা যাবে, আর অযথা লোকক্ষয় থেকে ভারতবাসী পরিত্রাণ পাবে। তার উত্তরে নতুন শক্তি সন্ধানী যুবক আহম্মদ শাহ পিতাকে কটূক্তি করেছেন। তুমি কি ভুলে গেছ বাদশাহ পিতা, নাদীর শাহের কথা? তোমার সন্ধির সর্ত নাদীর শাহ কিরকম ভাবে পালন করেছিলেন? তাছাড়া মোগল বাদশাহেরা কখনও কাপুরুষতার পরিচয় দেননি। পূর্বপুরুষের সেই সুনাম রক্ষা করতে আমাদের যুদ্ধ করতেই হবে। আমরা যোদ্ধা, আমরা দুর্বল নয়। আমরা দুর্বলতা প্রকাশ করলে সমস্ত হিন্দুস্থান আমাদের দিকে তাকিয়ে অট্টহাস্য করবে।

বাদশাহের কোন কথা না শুনেই যুবরাজ আহম্মদ শাহ দুর্গ প্রাসাদ ও রাজপথ সৈন্যতে ভরিয়ে দিয়েছেন। শুধু সৈন্য দরকার। অনেক লোক, অনেক অস্ত্র—তবেই শক্তি প্রকাশ করা হবে। সেইজন্যে দেশে চলেছে অশ্বারোহী। শক্তিশালী যুবক দেখলেই ধরে নিয়ে আসছেন। আর তাদের প্রাথমিক শিক্ষা দিয়ে নিজেই সৈন্যদল প্রস্তুতে উৎসাহী হয়েছেন।

লুতুফ আলি আরো দেখলো, দুর্গের উঁচু পরিখার ওপর সারি সারি কামান। কামানের কালো নলগুলি যেন শত্রু নিধন করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। লুতুফ আলি মনে মনে বললো এমন না হলে যুদ্ধ! এই সজ্জা দেখে হয়তো পারস্যরাজ রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করবে। আরো শুনলো, যুবরাজ আহম্মদ শাহ কুড়ি হাজার অশ্বারোহী পদাতিক সৈন্য নিয়ে পাঞ্জাবের দিকে ধাবিত হচ্ছেন। পারস্যরাজকে পাঞ্জাব ও মুলতানের কাছে আক্রমণ করলে আর তিনি দিল্লী পর্যন্ত আসতে পারবেন না। দিল্লী অবশ্য প্রবীণ বাদশাহের ভরসায় অরক্ষিত রেখে যাচ্ছেন না। সেনাপতি গাজিকে অধিনায়ক করে তিনি নিশ্চিন্তে যাচ্ছেন।

এসব শুনে লুতুফ আলির বেশ ভাল লাগলো। তার নিজের সৈনিক মন হঠাৎ জাগ্রত হয়ে উঠলো। মহম্মদ শাহকে সে দেখেছে, মহম্মদ শাহ হয়তো আগে শক্তিশালী ছিলেন কিন্তু নাদীর শাহ আক্রমণের পরে দেখে তাকে এতটুকু লুতুফের ভাল লাগে নি। বাদশাহ এত কাপুরুষ প্রকৃতির লোক হলে কারই বা ভাল লাগে? যাঁর হাতের মুঠিতে শক্তিশালী তীক্ষ্ণধার তরবারী, যার একটি হুকুমে সহস্র লোকের প্রাণ যায়, সে নিজের প্রাণের জন্য এত ভয় করে দেখে লুতুফ আলির একটুও ভাল লাগে নি। তাই তার এই সংবাদে যুবরাজ আহম্মদ শাহকে দেখবার জন্যে মন উতলা হল। সেই বীরপুরুষের কলিজায় রক্তের উত্তাপ কত জোরালো, তার স্পর্শ নিতে লুতুফের আকাঙ্খা জাগলো। আহম্মদ শাহের বুকের ছাতির প্রসারতা দেখবারও ইচ্ছা জাগলো! নিজে বীর নয় কিন্তু বীরত্ব প্রকাশের বাসনা আছে; তার মনে মনে সঙ্কল্প ছিল, আরব থেকে হিন্দুস্থানে গিয়ে সৈনিক হবে কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে সৈনিক হতে পারলো না। কিন্তু সৈনিক হবার বাসনা আজও আছে। আজ যদি হানিফকে সে পায়

তাহলে তাকে কোটানাতে ফিরে যেতে বলে সে সৈনিকদলে যোগদান করবে। আহম্মদ শাহের সামনে দাঁড়িয়ে সে শপথ করে বলবে,—আমি বীরত্ব প্রকাশ করতে চাই। আমি বীরকে পূজা করি। আমাকে আপনার সৈন্যদলে নিন।

কিন্তু আশা বুঝি তার মনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে। কোনদিন কোন আশাই তার কার্যকরী হয় নি। এও তার কার্যকরী হবে না। যদি হত তাহলে এখুনি কোন অদৃশ্যস্থান থেকে হানিফ বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে বলতো,—আব্বা তুই ?

আর লুতুফ দেখতো তার বেটার শরীরে সৈনিকের পোষাক। কটিবন্ধে তরবারী ঝুলছে। বুকের ওপর জামার প্রান্তভাগে মোগল বাদশাহের প্রতীকচিহ্ন। বেটা তার সৈনিক বেশে যোদ্ধার অন্তঃকরণে নির্ভীক সাহসী একজন পুরুষ। যা তার স্বপ্ন ছিল, হানিফই তা সফল করেছে।

তখন সে ছেলেকে আশীর্বাদ করে কি বলতে পারতো,—বেটা হানিফ, তুই কোটা-নাতে ফিরে যা ? ঐ পোষাক আমাকে খুলে দে, আমি যাবো সৈনিক বেশে মোগল বাদশাহের পক্ষে যুদ্ধ করতে !

না না, এত সাহস করে বুঝি কোনদিন সে কথা বলতে পারে নি। পারে নি বলেই আজ তার এই অবস্থা। বরং হানিফ তাকে তিরস্কার করলে সে ছেলের হাত ধরে কাঁদতে পারতো, চোখের জল নিয়ে বলতে পারতো, হানু, আমাকে ক্ষমা কর, তুই ফিরে চ কোটানায়।

লুতুফ আলি আরো আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলো. এত তাড়াতাড়ি সে বৃদ্ধ হয়ে গেল ? এই তো সেদিন সে তার আব্বা ইস্রায়িলকে কত অত্যাচার করে নিজের শক্তি প্রকাশ করেছে। আর আজ হানিফের কাছে সে পরাজিত ? কেন ? কেন ?

আজ এই মুহূর্তে মনে পড়ে, ছোটবেলায় হানিফকে কোটানায় যাবার পর একটি চড় মেরেছিল। হানিফ কেঁদেছিল কিন্তু তার আনন্দ হয়েছিল। অন্তত বীরত্বটুকু প্রকাশ করে সে উৎফুল্ল হয়েছিল। আর আজ চড় মারার কথা তো কল্পনা। তিরস্কার করার প্রতিফল সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। অনুশোচনায় মন ভরা আছে আর সেই উপলব্ধি বোধে একমাত্র দীনের মত সে হানিফকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দিল্লীতে এসেছে !

লুতুফ যেখানে অশ্বপৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে সে সমস্ত আসমান-টুকু দেখবার চেষ্টা করলো। মেঘের প্রাসাদের কারুকার্য থরে থরে সজ্জিত হয়ে সমস্ত আসমানটুকুকে আচ্ছাদিত করেছে। সূর্য মাথার উপরে সগর্বে আসীন। তারই রশ্মির স্বর্ণদ্যুতিতে উদ্ভাসিত হয়ে দিল্লী দুর্গের সর্বোচ্চ মিনার সূর্যের বন্ধুত্ব কামনা করছে। সুন্দর দেখতে লাগছে আজকের এই পরিবেশ। লুতুফের মনটি যদি চিন্তাশূন্য হত, তাহলে আরো ভাল লাগতো। তবু সে আজকের দিল্লী ও দিল্লীর রক্তবর্ণের দুর্গ দেখে সেই তৈমুরের রক্তধারার চিহ্ন দেখতে পেল। মোগল শৌর্যের অনেক ইতিহাস সে মীরাটে থাকাকালীন শুনেছে। তাই এখন আর তার কাছে দিল্লীর রহস্যময় ইতিহাস

অজ্ঞাত নয়। আড়াই শ বছরের এই রাজত্বের জয়পতাকা দিন দিন ম্লান হয়ে আসছে দেখে সে ব্যথিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু আহম্মদ শাহের কথা শুনে আবার তার মনে হল, তবে কি পুনরায় কোন বীরপুরুষ জন্ম নিল যে. আবার পূর্বগৌরব জাগিয়ে তুলে মোগল সূর্যের প্রখর দীপ্তিকে অম্লান করবে?

লুতুফ হঠাৎ চমকে উঠলো। এসব কি সে ভাবছে? এসব তো তার ভাবার কথা নয়? সে তুচ্ছ লোক, ছোট কথাই তার ভাববার কথা। কিন্তু তা না ভেবে সে কেন রাজরাজড়ার উত্থান পতনের ইতিহাস সমালোচনা করছে? সে হানিফকে খুঁজতে এসেছে, হানিফকে খুঁজে চলে যাবে। আর যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, সে জায়গাটি এতটুকু নিরাপদ নয়। যে কোন সময়ে ফৌজের দৃষ্টির মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা। তখন ধরে নিয়ে গেলে বলতে পারবে না আহম্মদ শাহকে—হুজুর, আমি আপনারই উন্নতির কথা ভাবছিলাম। মোগল রাজত্ব যেন আরো বহুকাল স্থায়ী হয়, তাই আল্লার কাছে কামনা করছিলাম।

আহম্মদ শাহ নিশ্চয় তাকে পাগল ভাববেন। তারপর তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে তার কপালের বিচার করবেন।

সেই কথা ভেবে লুতুফ এ জায়গায় আর বেশীক্ষণ থাকা সমীচীন নয় মনে করে চঞ্চল হয়ে উঠলো। কিন্তু হানিফকে তো খোঁজা হল না! হানিফকে যে তার চাই। হানিফ সৈন্য দলে যদি যোগদান করে থাকে তাহলে সৈন্যদল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কেমন করে সে সৈন্যদলে হানিফের খোঁজ করবে? লুতুফ আবার তাকালো দুর্গের সামনের উন্মুক্ত ময়দানটির দিকে। ঐ ময়দানটি আগে এমনি খালি পড়ে থাকতো, এখন আর এতটুকু খালি নেই। চতুর্দিকে শুধু শ্বেতবর্ণের সমারোহ। বিভিন্ন ছোট, বড় তাঁবুর সীমাহীন বিস্তার। আর সৈনিকের অশ্বারোহণে তাঁবুর চতুর্দিকে ঘোরাফেরা। লুতুফ ভাবলো, ও যদি ঐ প্রহরীদের কাউকে তার হানিফের কথা জিজ্ঞেস করে, সে কি খোঁজ দিতে পারবে?

কিন্তু নিজের কথাটা নিজেরই বড় গুরুত্বহীন মনে হল। যেখানে সহস্র সহস্র সৈনিক তাঁবুর মধ্যে অপেক্ষায় আছে সেখানে একজন সৈনিকের খবর কে দেবে? কে জানবে তার হানিফ সৈন্যদলে যোগদান করেছে কিনা। —হানিফ অন্য কোথাও আত্মগোপন করে পিতাকে পরীক্ষা করছে। একথা তার মনে হল এইজন্যে যে, তার ছেলে কখনও এত বড় বীরত্বের কাজ করতে পারে না। সে যখন নিজেকে খুব ভালভাবে চেনে তখন তারই রক্তধারায় যে পুষ্ট, তাকে কেন চিনতে পারবে না? ছেলেকে পিতা চেনে না, কোন ইতিহাসে কি এমনি নজির আছে? হয়তো স্বভাবের মধ্যে কিছু হেরফের হয়, তবে স্বভাব পুরোপুরি বিপরীত হয়, এ সচরাচর দেখা যায় না। তাই হঠাৎ লুতুফ নিজের স্বভাবের দিকে তাকিয়ে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিল।

একথা যদি আগে সে ভাবতো, তাহলে এতদূর কখনই আসতো না। যাক্ এসে লোকসান কিছু হল না। সোনীর কথা জানা গেল। সোনীর ওপর যে অবিশ্বাস

বোধ সারাজীবন ধরে দগ্ধ করতো, সে অবিশ্বাস বোধ গেল। সোনীর দুর্নাম থাকলো না, বরং সে তার কাছে সুন্দর চরিত্র নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকলো। আওরতের স্বভাবধর্মের আরো এক দিক তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠলো। তারপর দিল্লীর বর্তমান অবস্থা সে সচক্ষে দেখলো। পারস্যরাজের আক্রমণের বিপরীতে দিল্লীর মোগলরাজ-পুরুষরা যে আয়োজন করেছেন, তা দেখা হল। এবার যে পারসারাজ দুররাণী নাদীর শাহের মত সহজে দিল্লী জয় করতে পারবে না, এ দৃঢ়বিশ্বাস তার প্রতিষ্ঠা হল।

হানিফকে খুঁজতে না এলে তো এসব তার দেখা হত না। কোটানা ছাড়া সে কয়েক বছর কোথাও যায় নি। দেশের রাজনীতি আবহাওয়া কোনদিকে এ গয়ে চলেছে ঐ গ্রামে থেকে কিছু বোঝা যায় না। আর লোকমুখে যেটুকু গল্প শোনা যায়, তা মনগড়া কথা। জাঠরা এবার দিল্লী অধিকার করবে। শিখরা পাঞ্জাবে যে রকম তাণ্ডব চালিয়েছে, মুসলমান রাজ্য আর বেশীদিন নয়। লাহোর মোগলদের হাতছাড়া হয়ে গেল। এইসব উড়ো সংবাদের নানারকম উপাখ্যান। তাতে শরীর গরম করা যায়। যায় না একটি দৃঢ়চিন্তার ভিত্তি স্থাপন করা। তাই লুতুফ আলি এসব কথা শুনেও বিশ্বাস করতো না। সে রাজ্য ও রাজত্ব নিয়ে মাথাই ঘামাতো না। কি হবে এসব ভেবে? তার চেয়ে কি করে আরো অনেক উন্নতি করা যায়, আ'রা অনেক প্রতিপত্তি। সেই দিকে তার লক্ষ্য গিয়েছিল। স্বার্থ ছাড়া সে কিছু বুঝতো না। তাই স্বার্থের যুপকাষ্ঠে আত্মসমর্পণ করে রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা ভুলেছিল। শুধু হানিফ বাড়ি ছাড়তে আর পারস্যরাজের আক্রমণ সংবাদ পেয়ে তার আবার চৈতন্যোদয় হল।

তাই সে হানিফকে খুঁজতে দিল্লী চলে এল।

লুতুফ আলি ভাবলো, হানিফ নিশ্চয় সেই শাওনীব কাছে গেছে। হানিফের যে শাওনীর প্রতি আকর্ষণ আছে, সে জানে। আর তা ছাড়া এখন শাওনীর কাছে একবার যাওয়া দরকার। কতদিন হয়ে গেল, কোন খবর নেয় নি। এখন খবর না নিলে অন্যায় হবে। ওদিকে পারস্যরাজের বাহিনী সিন্ধু অতিক্রম করবে যুদ্ধ ওখানেই মোগলদের সঙ্গে লাগবে। যুদ্ধ লাগলে সরাইখানার ক্ষতি হবে। জীবন সংশয় হতে পারে।

এই ভেবে লুতুফ আলি যমুনা তীরের সেই দীর্ঘপথ ধরলো। একদিন এই পথের ধারেই সে সোনীবাঁদীর লোকের দ্বারা মুক্তি পেয়ে সোনীর জন্যে ভাবনায় বসেছিল। সেদিন আর এদিনে কত তফাত।

সেই যমুনার স্রোত বয়ে চলেছে। সূর্যের রশ্মি প্রবাহ জলের ওপর খেলা করছে। যেন সদ্যযৌবন প্রাপ্ত কোন ক্রীড়াচঞ্চল আওরত যমুনার জলে সাঁতার কাটছে। লুতুফ আলি আগেও দেখেছে এই যমুনা, এখনও দেখলো কিন্তু এবারের দেখার মধ্যে যেন পার্থক্য অনেক। এখন তার মনের চঞ্চলতা অনেক কমেছে, তাই অন্যের চঞ্চলতা দেখে সে বেশ উপভোগ করতে পারলো। পারাবত উড়ে চলেছে নীল মেঘের বুক ছুঁয়ে। যমুনার নীল জলের ওপর তার প্রতিবিম্ব পড়েছে।

দীর্ঘপথ। পথের শেষ কোথায় দূর থেকে অনুমান হয় না। নিঃশব্দে পড়ে আছে

পথের দীর্ঘ শরীর। লুতুফ আলি চলতে চলতে ভাবলো, এই পথটির জন্ম কবে হয়েছিল জানতে পারলে ভাল হত, কত দিন ধরে এই যমুনার সাথে মিতালী করে গাঁটছড়া বেঁধে আছে! হয়তো এর বুকের মধ্যে স্মৃতির পাহাড় বহু বছরের। সেই আকবর থেকে শুরু করে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত। চারটি পুরুষের উত্থান পতনের ইতিহাস এর জীবনের সঙ্গে জড়িত। আর অসংখ্য অশ্বের পদধূলি এই পথেরই বক্ষ অলঙ্কৃত করে আছে।

দূর, এ সব কি ভাবছে সে? এখন কি এসব ভাবনার সময়? তবে কি সে হঠাৎ দার্শনিক হয়ে উঠলো?

এখন সে চলেছে শাওনীর কাছে। শাওনীর ওখানে হানিফকে পাবে কিনা তার কথা ভাবা উচিত। আর শাওনীকে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের চিন্তা করা উচিত। এই অবস্থায় তাকে দেখলে হয়তো শাওনী খুশি হবে। একদিন শাওনী তার বড় উপকার করেছিল। সেদিন শাওনী উপযাচক হয়ে ঐ জায়গাটুকু না দিলে আজ বেঁচে থাকতো না। বেঁচে থাকলেও এমনি নিশ্চিন্ত অবস্থায় বাঁচতো না।

সত্যিই সে কৃতজ্ঞ। শাওনী আচরণের মধ্যে অনেক গোলমাল থাকলেও তার উপকার সে অস্বীকার করতে পারবে না। সেদিন সর্দারজীর মৃত্যুর খবর শুনে সে শাওনীকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। সাহায্য মানে অভিভাবকহীন সরাইখানায় সে থেকে শাওনীকে পাহারা দেওয়া। কোন দুষ্ট মতলবের বাসনা লুতুফের মধ্যে ছিল না। সে আপন বহিনের মতই শাওনীকে পেয়ার করতো। তার উত্তরে শাওনী কি বলেছিল, আজও মনে আছে লুতুফের। যেন কানে বেসুরো লেগেছিল। 'তোমার আমার মধ্যে ভাইবহিনের সম্বন্ধে থাকলেও বাইরের লোক তা বিশ্বাস করবে না।'

আজও ভোলে নি সে কথা। যে কথা কখনও তার মনে হয় নি, শাওনীর কেমন করে মনে হল? তবে কি তার মধ্যে পাপ ছিল? পাপ ছিল বলেই কি ঐকথা বলে সেদিন সে সাবধান হতে চেয়েছিল? আজ স্বীকার করতে কোন বাধা নেই, ঐ স্পষ্ট কথার জের টেনেই লুতুফ আলি আর কোন সাংবাদ নেওয়ার [illegible] প্রকাশ করে নি। এতকাল শুধু এড়িয়ে এড়িয়ে চলে শাওনীকে বোঝাতে চাইলো, তুমি পাপী হতে পারো অন্য কেউ পাপী নয়।

সেই শাওনীর সঙ্গে বহুকাল পরে আজ তার দেখা হবে। কে জানে কেমনভাবে সে তাকে গ্রহণ করবে?

লুতুফ আলি যেদিন পৌছলো, সেদিন গোধূলির রক্তরাগে আবীর আসমানের বক্ষ আচ্ছাদিত করেছে। ধূসর ছায়া নেমে আসছে ধরিত্রীর বুকে। গাছের পাতায় পাতায় লালরক্তিম আভা। আর একটু পরেই আঁধার আসবে। নিঃসীম আঁধার।

তখন আর এমন করে আসমান দেখা যাবে না ধরিত্রীর। তখন কে যেন বোরখা পরিয়ে দেবে পৃথিবীকে। আর মানুষের চোখ সেই অন্ধকার নিজের দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য খুঁজবে।

লুতুফ আলি কিন্তু তখন এ সব কথা ভাবছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল একটু দূরে সরাইখানার দিকে। এইমাত্র সে এখানে এসে পৌঁছেছে। ক্লান্ত, অবসন্ন শরীর। কামিজ ভিজে ঘর্ম নির্গত হচ্ছে। কপালেও স্বেদবিন্দু। চোখের কোলেও ক্লান্তির আমেজ। চোখ দুটি অবসন্নতায় ঢুলে পড়তে চাইছে। এখন একটু বিশ্রাম দরকার। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। এই কদিন সে পেটে কিছু দেয় নি। উদরে অগ্নিপ্রদাহ। একটানা অশ্ব ছুটিয়ে এই বিতস্তার তীরে এসেছে। কোথাও থামে নি, কোথাও একটুকু বিশ্রাম নেয় নি। এমন কি সরাইখানা দেখেও আহারের জন্যে ব্যস্ত হয় নি। আহার সে একেবারে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে করবে বলে চলে এসেছে। তাই আর কোন কিছু ভাল লাগছিল না।

এখন শাওনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার আপ্যায়নে কিছু আহার ও বিশ্রাম কিন্তু সরাইখানার সামনে এসে সে অবাক হয়ে গেল। শুধু অবাক নয়, আশ্চর্য হয়ে হতবাক্ হল। তবে কি সে আবার ভুল করেছে? এ অন্য কোন সরাইখানা?

কিন্তু অন্ধকার তখনও গাঢ় হয় নি। অস্তগামী সূর্যের শেষরক্তিম শিখার দ্যুতি এখনও চতুর্দিকে ছড়ানো। সেই আলোতে সে তার বহু পরিচিত সরাইখানার বিভিন্ন অংশ দেখতে লাগলো। না. সেই সরাইখানাতেই সে এসেছে। ভুল হয় নি।

তবে ওকি? নৃত্যগীত কোথা থেকে ভেসে আসছে? মনে হচ্ছে. এই সরাইখানারই উপর তলায় কারা যেন নাচের আসর বসিয়েছে। আর সারেঙ্গী ও তবলার তালে তালে কে যেন পায়ে ছন্দ সৃষ্টি করে নাচছে। তারিফ করছে অনেক লোক। অনেক মোসাহেবের কণ্ঠ এই দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। এখনও গভীর রাত্রি নামে নি, সন্ধ্যার মুহূর্তে যখন এমনি উৎসব, তখন আরো রাত্রি এগিয়ে এলে কোন্ আনন্দোৎসবের জলসা বসবে? কিন্তু নাচছে কে? গান করছে কে? শাওনী কোথায় গেল? শাওনীর মেয়েটি কোথায় গেল? অনেক প্রশ্ন লুতুফের মনে ভিড় করে এল।

আর এত লোকই বা এলো কোথা থেকে? নিঃসঙ্গ, নির্জন এই লোকালয়হীন সরাইখানায় কখনও কখনও পথচারী বিশ্রামলাভের জন্যে এসে জুটতো। তারপর বিশ্রাম নেওয়া হলে গেল যে যার পথে চলে যেত। সেই সরাইখানায় হঠাৎ কিসের লোভে মানুষের এত আনাগোনা শুরু হল? তবে কি ফুলের কুঞ্জে যেমন ভ্রমরের গুঞ্জন শোনা যায়। তেমনি কোন গোলাপ কুসুম আমদানি হয়েছে? শাওনী তবে কি ভিন্ন ব্যবসা করবার জন্যে মধুর আমদানি করেছে? তাই যদি হয়, তাহলে শাওনীকে সে বাহবা দেবে! মরদ যা করতে সাহস করে না, রমণী হয়ে সে যদি তাই করে থাকে তাহলে তাকে সেলাম জানিয়ে যাবে।

কিন্তু এ তো অনুমান? আসলে ব্যাপারটা যে কি—সে আর চিন্তা করতে পারলো না। অদম্য কৌতূহল তার বুকের মধ্যে আলোড়ন জাগালো। ইচ্ছে করলো, ছুটে উপরে উঠে গিয়ে চাক্ষুস দেখে আসে। কিন্তু ভয় জাগলো, যদি অনধিকার প্রবেশ

করেছে বলে আনন্দভোগী আদমীরা ছুটে তাকে মারতে আসে ? আর শাওনী তার ব্যবসার লোকসান চিন্তা করে সেই সব লোকদের প্রহার করতে উৎসাহিত করে ! এই ভেবে সে আবার থমকে দাঁড়ালো।

এই সময় আবার উপরের সেই কক্ষ থেকে সরাব পাত্র আছড়ে ফেলার শব্দ, ঘুঙুরের ছন্দ, তবলার দ্রুত লয় সোচ্চার হয়ে উঠলো। লুতুফ আলির এ সব পরিবেশের সঙ্গে কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তবু তার বুকের মধ্যে কেমন যেন রোমাঞ্চ শুরু হল। রোমকূপে জাগলো শিহরণ। রক্তের মধ্যে কি এক অনুভূতির আলোড়ন জাগতে সে স্থান কাল বিবেচনা বোধ হারালো।

অশ্ব থেকে নেমে দ্রুত সে সরাইখানার কাছে গেল। তারপর একবারে সেই কক্ষে।

না, সে ঘর নয়। যে ঘরে ফতুমা মরেছিল,এ সে নয়। এটি তার চেয়ে প্রশস্ত ও সুন্দর করে সাজানো। শুধু সুন্দর করে সাজানো নয়। যেন বাদশাহী শিসমহলের মত করে সাজানো। সেই বিস্তৃত ঘরের চতুর্দিকে দর্পণের সারি। অনেক রংবেরঙের মসলিনের ঘেরাটোপ। আর অনেক আলো। এত পর্যাপ্ত আলোর প্রখর উজ্জ্বলতা সেখানে ছিল, যে প্রথম প্রবেশ করলে চোখ ধাধিয়ে যায়। লুতুফ অল্প আলো থেকে একেবারে প্রচণ্ড আলোয় হঠাৎ এসে পড়েছিল বলে প্রথমে সে কিছু দেখতে পেল না। তারপর চোখে সবই সয়ে গেল আর ঘরের পরিবেশ দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে রইলো।

ঘরের মধ্যে অনেক লোক। অনেক পানপাত্র ও মোহরের ছড়াছড়ি। আর কাশ্মীরী ফরাসের ওপর যারা মদির নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে তারা যে কম দরের লোক নয়, দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তাদের এই রাত্রির প্রথম অবস্থাতেই যেরকম ঢুলুঢুলু আঁখি, তাতে বেশীক্ষণ যে মজা লুটতে পারবে বলে মনে হয় না।

যাহোক, অবাক, বিস্ময় যা কিছু সৃষ্টি হবার তা হয়ে গেছে। এখন শুধু চোখ মেলে সেই নৃত্যরতা শাওনীর দিকে তাকিয়ে থাকা। হ্যাঁ শাওনীই [illegible]। তবে এ শাওনী-কে সে কখনও দেখে নি। সাজলে যে এত সুন্দর দেখায়, কখনও সে মনেও করে নি। আজ তাই নর্তকী শাওনীর প্রস্ফুটিত যৌবনকুসুমের অপরূপ মাধুর্য অবলোকন করে মনে মনে শিহরিত হল। রোমাঞ্চিতও হল। সে রোমাঞ্চ কামনার জন্যে নয়, সে রোমাঞ্চ অন্য ধরনের।

পরনে ঘাগরা। গোলাপী বর্ণের ঘাগরা। বক্ষের মাসুম জোয়ানী প্রবাহে কাঁচু-লীর ঘেরাটোপ। কাঁচুলী ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সম্পূর্ণ অনাবৃত উর্ধ্বাঙ্গের সবটুকু। শুধু প্রকট রমণীর রমণীয় বক্ষসৌন্দর্য। আর একটি সূক্ষ্ম বস্ত্রের ওড়না। কিন্তু ওড়না উড়ছে দুপাট্টার মত। তার আসল কার্যকারিতা অপসারিত। সে অব-হেলায় আতরের সুবাস ছড়াচ্ছে বিভিন্ন অভ্যাগতদের মুখের কাছে উড়ে গিয়ে। শাওনীর দেহ ঘিরে অলঙ্কারের জৌলুস।

ঘরের অন্য পাশে বাদ্যযন্ত্রের সমাবেশ। তখন নাচ চৌদুণে। নর্তকী যে নাচতে জানে, তা তার পায়ের ওঠানামার ছন্দতেই প্রতীয়মান হচ্ছে। শুধু দুখানি ছন্দময়

সুকোমল পদযুগলই নয়। সমস্ত দেহটি দুলছে। সুস্পষ্ট নিতম্ব দুলছে। বক্ষের লোভাতুরা স্ফীত যৌবনকুসুম দুলছে। দুলছে সমস্ত শরীরের বিভিন্ন রোমাঞ্চময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শাওনীর চোখের দৃষ্টি সুধায় যে এত কটাক্ষের মদির স্বপ্নোচ্ছ্বাস, এর আগে লুতুফ কখনও দেখে নি। চোখে গাঢ় সুর্মার অঞ্জন। দীর্ঘায়ত চোখের তারা দুটি হাঁসির দ্যুতি নিয়ে মোহ ছড়াচ্ছে। রসাপ্লুত দুটি তাম্বুল রঞ্জিত অধর। চুম্বনের আকাঙ্খা নিয়ে থরথর করে কাঁপছে। মুক্তার উজ্জলতা নিয়ে দন্তপংক্তির সারি। হাসির ছটায় পর্যাপ্ত আলোর দ্যুতিকেও ম্লান করছে।

লুতুফ আলি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ সব দেখছিল, তখন শাওনী নাচতে নাচতে একটি বাঁদীকে লুতুফকে আসরে এসে বসবার জন্যে ইশারা করলো। বাঁদী উঠে গিয়ে লুতুফকে বসতে বলতে সে মাথা নেড়ে অসমর্থন জানালো।

বাঁদী আবার চলে গেল স্বস্থানে।

তখন নাচ পূর্ণোদমে চলেছে। হঠাৎ লুতুফ লক্ষ্য করলো, শাওনী যেন কেমন ছন্দহারা হয়ে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সমতা রাখতে পারছে না। যারা কেয়াবাত, বাহবা বলে নাচের ও নর্তকীর তারিফ করছিল, তারা হঠাৎ এই বেসুরো পরিস্থিতি দেখে বিরক্ত হল।

তারিফের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ফরাসের ওপর মোহর, অলঙ্কার, কণ্ঠহার ইত্যাদি এসে পড়ছিল, তা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

লুতুফ চলে যাবার জন্য পিছন ফিরতে আকস্মিক একটি ঘটনা ঘটে গেল। শাওনী নাচ থামিয়ে ছুটে গিয়ে লুতুফ আলির গতিরোধ করে দাঁড়ালো। বাদ্যযন্ত্র তখনও থামে নি, সে সুর ধরে সেই পরিবেশকে তখনও বাঁচিয়ে রেখেছিল। শুধু অভ্যাগতরা নর্তকীর কাণ্ড দেখে বিরক্ত হল। একজন তো বিরক্ত হয়ে একটি পানপাত্র ছুঁড়ে দিয়ে দেওয়ালের এক খানি দর্পণ চূর্ণ করলো। মুহূর্তে শব্দ হল প্রচণ্ড। আর পরিবেশ হয়ে উঠলো কোলাহল মুখর।

শাওনী সেদিকে একবার চেয়ে হঠাৎ লুতুফ আলির একখানি হাত চেপে ধরে বললো,—ভাইসাহেব, তুমি যেও না।

অভ্যাগতদের মধ্যে চিৎকার উঠলো, এই নাচওয়ালী, জলদি নাচ পেশ কর। মেজাজ বিলকুল বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

শাওনী তারই মধ্যে আবার বললো,—ভাইসাহেব, তোমাকে আমি সব বলবো। তুমি কিছুক্ষণ আমাকে সময় দাও। ভেতরে আমার শয়ন ঘরে সর্দারজীর কন্যাকে চাবি বন্ধ করে রেখেছি। এই নাও তার চাবি। শাওনী বক্ষের লুকোনো স্থান থেকে চাবি বের করে দিয়ে আবার বললো,—তুমি চাবি খুলে বস। আমি এগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে এখুনি আসছি। একদিন তোমার শাওনবহিনের অন্যরূপ দেখেছিলে, আজ এত বছর পরে কেন এই রূপ দেখলে—একটু না জানলে তুমি শান্তি পাবে না। আমিও না বললে মুক্তি পাবো না।

লুতুফ আলি দেখলো শাওনীর দু'চোখে জল টলমল করছে। যে চোখে কিছুক্ষণ

আগে মুর্মার সাথে মদির কটাক্ষ ছিল, আবার সেই পূর্বের অতি পরিচিত শাওনীতে ফিরে এসেছে।

শাওনী চোখের জল মুছলো না। সেই জলভরা দু'চোখেই আবার কাতর হয়ে বললো,—তুমি যাও ভাইসাহেব এখানে আর বেশীক্ষণ থাকতে দিতে ইচ্ছা করে না। এ আমার ব্যবসা।

আসর থেকে তখন বেশ গোলমাল ছুটে আসছে। সরাবপায়ীরা সব উন্মত্ত হয়ে উঠছে। যন্ত্রসংগীত থেমে গেছে বলে কোলাহল আর চাপা দেওয়া যাচ্ছে না।

লুতুফ আলি এই দেখে আর অপেক্ষা না করে নীচে নেমে গেল।

আর তখন ওদিকে শাওনী আবার নতুন করে নাচ শুরু করবে কিনা ভাবছে। কিন্তু সব উৎসাহ তার যেন কেমন স্তিমিত হয়ে গেছে। কেমন যেন বিসদৃশ লাগছে সব কিছু। অথচ এই আসর সে প্রতিদিন বসিয়ে প্রচুর উপার্জন করে। অর্থের জন্যে, ব্যবসার জন্যে যে বাধ্য হয়ে এই করে, তা নয়। কেমন যেন এই জীবন তার হঠাৎ ভাল লেগে গিয়েছিল। নতুন নতুন লোক। নতুন নতুন উপঢৌকন। তামাম ভারতের বড় বড় আমীর ওমরাহরা তার সন্ধান পেয়ে এখানে আসেন। এখানে কোন বাদবিচার নেই। মোগল রাজপরিবার থেকে যেমন শাহজাদারা আসেন, তেমনি জাঠ সরকার জওয়াহির মল্লের পুত্রের পদধূলি এখানে পড়েছে। আবার মারাঠা সর্দার সদাশিব রাওয়ের সেনাপতি মাধব রাও কবার এসে গেছেন।

অথচ এই জীবন যতদিন সে গ্রহণ করে নি, যতদিন সে সর্দারজীর স্মৃতি নিয়ে ছিল, তার সরাইখানা অন্ধকার হয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনের সেই অসহ্য জীবন আজ আর চিন্তা করলে ভয় জাগে। সর্দারজীর মেয়েটিকে লালন পালন করবার মত সামর্থ্য নেই। নিজের আহার চলে না। আর সারা সরাইখানাটা কেমন যেন নিঃসঙ্গজীবন নিয়ে কাঁদে। লোক আসে না একটাও। যদি বা কখনও আসে, তবে তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তবে জিনিসপত্তর কিনে তাকে খেতে দিতে হয়। এমনি সময়ে একদিন একজন এলো—।

শাওনী যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব অতীতের কথা ভাবছে, একজন সরাবপায়ী তার কাছে এসে বললো,—কি বিবি, আজ কি আর নাচ হবে না?

শাওনী তার দিকে তাকালো। সর্দারজী যখন বেঁচেছিলেন, তখন এই লোকটি প্রায়ই তার কাছে আসতো। জাতিতে শিখ। সে এখন শিখদের দলে মিশে ভারতে শিখ রাজত্ব কায়েম করবার তালে আছে। ভারী ধুরন্ধর লোক। সে মনে মনে তাকে চায়। কতবার আড়ালে বলেছে—ছেড়ে দাও এই ব্যবসা। চলো আমার সঙ্গে। আমি তোমায় রাণী করবো। দেখছো না, ভারতে শিখ রাজত্ব কায়েম করবার জন্যে মোগলদের কেমন আঘাত হেনে চলেছি। লোকটির সবচেয়ে বিশেষত্ব সে হাতিয়ার ছাড়া কখনও পথ চলে না। এই আসরেও আসে কোমরে এক বৃহৎ ছোরা ঝুলিয়ে।

শাওনী কোন উত্তর দিল না, দেখে সেই লোকটি মুখের সামনে তুড়ি মেরে হাই তুলে বললো,—আজ না হয় যাচ্ছি কিন্তু কাল আসবো। তোমার নাচ বড় ভাল

লাগে। দিল খুশ হয়ে যায়। নেচ বাবা নেচ। না নাচলে আমাদের ভবিষ্যৎ ঠিক থাকবে কেমন করে? সারাদিন ধরে রাজ্য ও রাজত্ব নিয়ে চিন্তা করে মাথাটা ঘুরপাক খেয়ে যায়। মাথাটা ঠিক করতে তাই এই সন্ধ্যেবেলা একটু সরাব আর ঘুঙুরধ্বনি। অবসরটুকু বেশ ভালই কাটে।

সেই লোকটি টলতে টলতে চলে গেল।

তাই দেখে অন্যান্যরাও তাকে অনুসরণ করলে।

মুহূর্তে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। আর বাইরে অনেক অশ্বখুরের শব্দ একসঙ্গে জেগে উঠে মিলিয়ে গেল।

তারপর বাদ্যকারদের চলে যেতে ইশারা করে শাওনী নিচে নেমে এল। নিচে নেমে এসে সে তার বিশেষ পোষাকটি অন্য একটি ঘরে গিয়ে পরিবর্তন করে নিল। সেই আগের পোষাক, যে পোষাকে সে লুতুফ আলির সামনে উপস্থিত হত। শুভ্র পোষাকের শুভ্রতা নিয়ে যখন সে পবিত্র মনের প্রতিচ্ছবি এঁকে ঘুরে বেড়াতো, সেই পোষাকে সে পরিবর্তিত হয়ে মাথার অবগুণ্ঠন টেনে চোখের সুর্মা, গালের রঙ, ঠোঁটের তাম্বুল নিশ্চিহ্ন করে তার শয়ন ঘরের দিকে এগোলো।

লুতুফ আলি ক্লান্তিতে শাওনীর পালঙ্কের এক কোণে আড়ভাবে বসেছিল। সামনে আরো একজন বসে। সে সর্দারজীর লড়কী ঝর্না। ঝর্না বন্ধ ঘরে বসে বসে কাঁদছিল, লুতুফ আলি চাবি খুলে তাকে ভুলিয়েছে। ভুলিয়ে তার সামনে বসিয়ে রেখেছে। মেয়েটি খুব ছোট নয়, আট, দশ বছর বয়স হয়েছে। ফোলা ফোলা দুটি ডাগর চোখে সে লুতুফের দিকে তাকিয়ে আছে। লুতুফ তাকে কিছু বলছিল না। বলার তার সমস্ত আগ্রহ অন্তর্হিত হয়েছে। শুধু ক্লান্তি, আর অবসন্নতা। সমস্ত মনটি ঘিরে কেমন যেন বিষাদের কালিমা তাকে আচ্ছাদিত করেছে। এখানে যে হানিফ নেই, সে বুঝতে পেরেছে। হানিফ না থাকতে সে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছে। হানিফ যদি তার আম্মার এই অবস্থা দেখতো, তাহলে নিশ্চয় আহত হত। কি হত, এখন এই পরিবেশে লুতুফ আলি চিন্তা করতে পারছে না। তবে তার এই বিষাক্ত আবহাওয়া ত্যাগ করবার জন্যে মনটি আগ্রহী হচ্ছে। এখানে বেশীক্ষণ থাকলে সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারবে না। কেমন যেন নিজের প্রিয়জন হারিয়ে গেলে মনটি শোকার্ত থেকে ক্ষিপ্ত হয়, তেমনি ক্ষিপ্ত হতে চাইছে কিন্তু এখানে তার অধিকার কি? শাওনী তার পাতানো বোন। সে যাই করুক, তার তো কিছু বলার নেই। তবে কেন শাওনীকে তিরস্কার করবার জন্যে মনটা উদগ্র হচ্ছে। মনের এই ওঠানামা অবস্থার জন্যে তাকে চাবুক চালিয়ে সংযত করতে গিয়ে লুতুফ আলি ক্লান্ত হয়ে চুপ করে বসে আছে। বসে বসে তাকিয়ে আছে সর্দারজীর মেয়েটির দিকে। শাওনী বলে, এ লড়কী আমার নয়, সর্দারজীর। অবশ্য এ কথা তার দশ বছর আগের। এখন শাওনী কি বলে কে জানে? তবে মনে হয়, শাওনী এখন

তারই বেটি বলবে। কারণ খুবই সহজ। এই বেটি বড় হলে শাওনীর ব্যবসায় বেশী মুনাফা হবে। বেটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে আসরে নামালে আরো উপহার, আরো হীরে জহরত—আরো দৌলতের ছড়াছড়ি হবে। মন্দ ব্যবসাটা শাওনী বুদ্ধি বের করে নি! যে ব্যবসায় সবচেয়ে বেশী মুনাফা, সে ফাঁদ শাওনী পেতেছে। আজ তাকে বাহবা দিয়ে যেতে হবে, শাওন। সেদিন তোমার জন্যে সত্যিই চিন্তিত হয়েছিলাম। আজ বুঝছি, আমি আহাম্মক। তোমাকে আমি সেদিন চিনতে ভুল করেছিলাম।

এই সময় শাওনী এসে ঘরে প্রবেশ করলো। কিছুক্ষণ আগের শাওনী আর এ নয়। একে এখন আর দেখলে চমকাবার কিছু নেই। একে লুতুফ আলি বেশ ভালভাবে চেনে।

লুতুফ আলি কিছু না বলে শুধু শাওনীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো।

শাওনীই কথা বললো। প্রথমে কন্যাকে এ ঘর থেকে অন্যত্র চলে যেতে বলে একটি চারপাই নিয়ে সে বসলো। তারপর একটু ম্লান হেসে বললো হঠাৎ তুমি পথ ভুলে এখানে এলে কেমন করে ভাই সাহেব?

শাওনীর মুখে ভাইসাহেব সম্বোধনটি শুনতে যেন লুতুফ আলির কেমন লাগলো। ইচ্ছে করলো প্রতিবাদ করে শাওনীর মুখ থেকে ঐ সম্বোধনটি কেড়ে নেয়। সোনীকে সে ঘৃণা করেছিল, কারণ সোনী বাজারের মেয়েলোক ছিল বলে। কিন্তু সোনী বাজারের মেয়েলোক হলেও যে আচরণ প্রকাশ করে গেছে, তাতে লুতুফ আলি তাকে শ্রদ্ধাই করেছে। শাওনীকে সে প্রথম থেকেই স্নেহ করতো কারণ শাওনী ছিল তার শুভানুধ্যায়ী। তাছাড়া শাওনীর চরিত্র, তার ব্যক্তিত্ব—তার দৃঢ় স্বভাবের কাছে মাথা নত না করে এমন পুরুষ বিরল। অনেকবার শাওনী তাকে আঘাত করেছে, তার পৌরুষকে তুচ্ছ করে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। তবু এই রমণীটিকে সে অস্বীকার করতে পারে নি। এর কথাগুলি এত স্পষ্ট যে অস্বীকার করা যায় না।

সেই শাওনীকে আজ দুর্বল পেয়ে কোনদিক দিয়ে আঘাত করবে, খুঁজে না পেয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়লো। আজ তার মনে হল, আসলে শাওনী চিরকালই দুর্বল মনের মেয়ে। দাম্ভিকতা প্রকাশ করে সে নিজের দুর্বলতাটুকু ঢেকে রাখতে চায়। সেই কথা ভেবে সে আক্রমণের মন নিয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললো,—এসে নিশ্চয় তোমার খুব অসুবিধা সৃষ্টি করলাম!

শাওনী একবার মুখটি ঘুরিয়ে নিয়ে বললো, একটু অসুবিধা হল বৈ কি।

চমকে উঠলো লুতুফ আলি। আবার সেই স্পর্ধিত ভঙ্গি? আবার সেই স্পষ্ট উক্তি! এই রমণীটিই কিছুক্ষণ আগে কেঁদেছিল, এখন যেন তা একেবারে মনে হয় না।

তাই সে মনে মনে বিরক্ত হয়ে মুখে বললো,—কি বলতে চেয়েছিলে, তাড়াতাড়ি বল। আমি আবার মীরাটে ফিরবো।

শাওনী অপ্রতিভ হল না। শুধু নিম্নস্বরে বললো,—রাত্রিটা থেকে সকালে যাবে। তোমার জন্যে খানা পাকাতে বলেছি।

লুতুফ আলি চুপ করে থাকলো। তার ইচ্ছে করছিল বলে, তোমার দেওয়া খানা আমি খাব না। তোমার পাপের অর্থের খানা গ্রহণ করলে আমার হজম হবে না। কিন্তু এত বড় আঘাত দিতে কেমন যেন মনে বাজলো। তাই সে নিস্পৃহ হয়ে চুপ করে থাকলো।

শাওনী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার বললো,—শুনলাম, তুমি অনেক টাকা করেছ। কোটানার মানুষেরা আজ তোমার কথায় অজ্ঞান। প্রতিপত্তিও কম হয় নি। তুমি আমার খোঁজ না নিলেও আমি তোমার সব খোঁজ পাই। এদিকে কোথায় এসেছিলে? হানিফ কেমন আছে? সে অনেক বড় হয়েছে, না।

লুতুফ আলির নিজের কথা কিছু বলতে ইচ্ছে করছিল না। তবু শাওনীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকার জন্যে বললো,—তোমার দেওয়া জায়গীর সেদিন পেয়েছিলাম বলে এসব সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, আজ আমি ভাগ্য পরিবর্তন করেছি। হানিফ ভাল আছে। সে তোমার কথা বলে। এখানে কেবল আসতে চায়।

শুধু হানিফের প্রকৃতি ও তার বাড়ি থেকে চলে যাওয়াটুকু বললো না। কে জানে নিজের অক্ষমতাটুকু সে বলতে চাইলো না।

শুনে শাওনী খুশি হল। বললো,—আমি জানতাম, তুমি সুখী হবে। শাদী করেছ?

শেষোক্ত কথায় লুতুফ আলির ইচ্ছে করলো বলে, হ্যাঁ করেছি। কিন্তু সব মিছে কথা বলতে কেমন বাধলো। তাই ম্লান হেসে বললো,—না।

শাওনী বললো, এবার একটি শাদী করে নাও।

লুতুফ আলি উত্তর দিল না।

তাই দেখে শাওনী বললো,—কথাটা শুনলে। এবার একটি শাদী করে নিও। অর্থ, প্রতিপত্তি সব যখন হয়েছে, তখন পূর্ণ শান্তির জন্যে শাদীর দরকার। ঘরে আওরত না থাকলে ঘর সম্পূর্ণ হয় না।

লুতুফ আলি মাথা নেড়ে বললো,—ওসব কথা থাক! তোমার কথা বলো, আমি তোমার কথা কিছু শুনতে চাই।

শাওনী ম্লান হাসলো, বললো,—আমি ওপরে উঠতে পারি নি। নিচে নেমে চলেছি। তবে চেষ্টা করেছিলাম উপরে ওঠবার। তবে শোন, প্রথম থেকে বলি।

এই বলে শাওনী অন্যের গল্প বলার মত সহজ ভঙ্গিতে বলে গেল নিজের দশ বছরের কাহিনী।

আওরত দাম্ভিক হয়, অহঙ্কার প্রকাশ করে যখন সে অবলম্বনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। আমি যখন সর্দারজীর অবলম্বন পেয়েছিলাম তখন বুঝতে পারি নি, আমি নিঃসহায়া হলে নিজের গতিবিধি পরিচালনা করতে পারবো না! সে কথা চিন্তা করারও অবকাশ ছিল না। আর কখনও ভাবতেও পারিনি এই বৃহৎ পৃথিবীর একাংশে আমাকে ছেড়ে দিয়ে সর্দারজী চলে যাবে। তাই তার বিহনে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলাম। প্রাথমিক অবস্থা কাটবার পর বার বার নিজেকে নিয়েই

চিন্তা করলাম। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে বিচার করলাম। তখন হানিফ কাছে ছিল। একটি পুরুষ, হোক সে শিশু—তবু তার অবলম্বন পেয়ে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিলাম। ওদিকে আবার সর্দারজীর কন্যাটি ভূমিষ্ঠ হল। কন্যাটি ও হানিফ আবার নিঃসঙ্গ জীবনের শান্তি। তখন আর নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবনার ছিল না। দুটিকে মানুষ করার পরিকল্পনা নিয়ে সমস্ত দিনরাত্রি আমার ভরে থাকতো। সর্দারজীর কিছু গচ্ছিত অর্থ আমার কাছে ছিল, সুতরাং অর্থের জন্যে সে সময় কিছু চিন্তা ছিল না।

তারপর হানিফ একটু বড়ো হল। আমি মনে মনে ভাবলাম, তুমি যদি না ফের তাহলে হানিফের তত্ত্বাবধানে সারাজীবনটা কাটিয়ে দেব। আর সর্দারজীর কন্যা বড় হলে হানিফের সঙ্গে শাদী দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব। তখন একবারও তোমার কথা মনে হয় নি। আজ স্বীকার করতে বাধা নেই, ভেবেছিলাম তুমি আর ফিরবে না। তুমি হয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেবে, নতুবা অন্য কোন রাজ্যে গিয়ে শাদী করে সেখানে কায়েমী হয়ে থাকবে। হানিফের কথা তুমি ইচ্ছে করে বিস্মৃত হবে।

তাই হঠাৎ চার বছর পরে তোমার দেখা পেয়ে বিস্মিত হয়েছিলাম।

লুতুফ আলি এই সময়ে বললো,—তুমি তো ইচ্ছে করলে হানিফকে রেখে দিতে পারতে!

উত্তরে শাওনী ম্লান হেসে বললো,—পিতার অধিকার থেকে পুত্রকে কেড়ে নেব, এ সাহস আমার ছিল না। তাই সে কথা চিন্তা করি নি।

যাহোক তুমি হানিফকে নিয়ে চলে গেলে।

• তোমরা চলে যাবার পরেই আমি অনুভব করলাম দারুণ এক অভাব। তখন সরাইখানার মধ্যে একদণ্ড থাকতে কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠতাম। মনে হত, কেউ যেন ওত পেতে সর্বদা আমাকে আক্রমণের ফন্দিতে ঘুরছে। এক এক রাত্রিতে ঘুমের কথা ভুলে গিয়ে কান সজাগ করে দরজার বাইরে পদশব্দ শুনেছি। মৃত্যুর কথাই তখন সর্বদা মনে এসেছে কিন্তু মৃত্যুর কথা ভেবে আরো দুঃখকে চাপতে পারি নি। কেবলই মনে হয়েছে, এইজন্যেই তবে কি আমি দুনিয়াতে এসেছিলাম? আমার কামনা বাসনা বলে কিছু নেই? সর্দারজী বৃদ্ধ ছিল, এ তো আমি জেনে-শুনেই বিয়ে করেছিলাম। সর্দারজী চলে গেল দেখে আমার এই দেহ, এই যৌবন, সমস্ত আনন্দ সর্দারজীর সঙ্গে চলে গেল? তোমাকে আমি বলেছিলাম, মনে আছে কিনা জানি না। আমায় যদি কেউ নষ্ট করতে আসে, আর আমি যদি নষ্ট না হতে চাই, তবে কেউ আমাকে নষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু মনে মনে জানতাম, আমি এ জায়গায় কত দুর্বল। সর্দারজী হঠাৎ মরে গিয়ে আমার ভোগের আশা অপূর্ণ রেখে গেল। ক্ষুধা প্রচণ্ড। কামনা অসীম। সে জায়গায় বৃদ্ধ সর্দারজী কতটুকু নিবৃত্তি করে গেছেন? তাই তুমি যখন এখানে থাকতে চেয়েছিলে, আমি বাধা দিয়েছিলাম। সেদিন আমাকে তোমার বড় রূঢ় মনে হয়েছিল কিন্তু আমি তো নিজেকে ভালভাবে চিনতাম!

যাকে ভাইসাহেব বলে সম্বন্ধ করেছি। রমণী মনের আর একদিকের শ্রদ্ধা দিয়ে যাকে জড়িয়েছি, হঠাৎ যদি কোন দিন তাকেই কামনার পুরুষ বলে গ্রহণ করি—এ

লজ্জা রাখবো কোথায় ? তাই মনকে প্রবলভাবে রজ্জুবদ্ধ করে তোমাকে এরকম দূরে সরিয়ে দিই।

এদিকে সর্দাজীর গচ্ছিত অর্থ যা ছিল, তা নিঃশেষিত হয়ে এল। সরাইখানায় খদ্দের আর আসে না। দেশের অবস্থা খুব ভাল নয়। চতুর্দিকে অরাজকতার বাষ্প। জাঠ, মারাঠা, রোহিলা, মোগলরা সবসময় এক একটি জায়গা নিয়ে সংঘর্ষ লাগিয়ে দিচ্ছে। তাতে দেশবাসীর প্রাণে কোন শান্তি নেই। তারাও ধারাবাহিক জীবন থেকে ছটকে পড়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করছে। এই দিনগুলি আমার বড় দুর্বহের দিন।

এদিকে নিজের দেহের দিকে তাকাই। কেমন যেন নিজেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাই। নতুন ফসলের নতুন বর্ণের স্পর্শ যেন দেহে লাগছে। প্রথম যৌবন প্রাপ্তির পর প্রস্ফুটিত দেহকুসুমের দিকে তাকিয়ে যেমন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠতাম, তেমনি আনন্দ জাগতে লাগলো দেহের কানায় কানায়। কিন্তু কেন এই আনন্দ বুঝতে পারলাম না। পাখী ডাকে, বৃক্ষপত্রের মর্মধ্বনি কানে আসে। আসমানের বিচিত্র রঙের পরিবর্তন দেখি। প্রকৃতির অসামান্য সৌন্দর্যের দিকে হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে থাকি। আর নিজের দেহটিকে বিভিন্ন অলঙ্কারে ও কামনার রক্তরাগ বর্ণের পোষাকে সজ্জিত করি। চোখে সুর্মা, গালে রঙ, ঠোঁটে তাম্বুল রঞ্জিত করে কার প্রতীক্ষায় যেন প্রহর গণনা করি! কন্যার কথা ভুলে যাই। সর্দারজীর স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। শুধু একজনের জন্যে, সে একজন যে কে আমি জানি না। তাকে যেন আমি চিনি। সে আমার বহু পরিচিত। সে এলেই আমার এই তপস্যা সার্থক হয়, এমনি মনের অবস্থা সৃষ্টি করে আমি চঞ্চল হয়ে উঠি।

শাওনী একবার থামলো, থেমে দম নিয়ে আবার শুরু করলো বিবেক আমার ছিল না। চেতনা আমার লুপ্ত হয়েছিল। শুধু আলেয়ার পিছনে ছুটে চলেছি। তখন যদি একবার সর্বনাশের পূর্ণচিত্রটি চোখের সামনে দেখতে পেতাম তাহলে হয়তো থামতাম। তখন যদি তোমার কাছেও চলে যেতাম, তাহলেও হয়তো বেঁচে যেতাম। যাহোক তখন আমি বাঁচতে চাই নি। চেয়েছিলাম এক নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে ছুটে যেতে। তখন আমার নিজেকে নিয়েই চিন্তা। সমস্ত শরীরের প্রতিটি রোমকূপে তখন পুরুষ স্পর্শের জন্যে আত্মহারা।

এমনি সময়ে এক সৈনিকপুরুষ এসে সরাইখানায় আস্তানা নিল। শুনলাম সে গুপ্তচর। অকপট সত্যকথাটাই বললো। পারস্য থেকে আসছে। নাদীর শাহের আফগান সেনাপতি আহম্মদ শাহ দুররাণীর লোক। এদেশের সমস্ত অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করবার জন্যেই তাকে পাঠানো হয়েছে। পারসিক সৈনিক নয়, মোগল সৈনিক। মোগলের ছদ্মবেশে পারস্যের কাজ করছে।

আমার তখন অন্যচিন্তা। আমি তখন ভাবছি এই লোকালয়হীন মরুভূমিতে অন্তত বহুদিন পর একটি লোকের দেখা পেলাম। লোকটি খুব সাধারণ লোক নয়, মোগলের সেনা হয়ে পারস্যের কাজ করছে। বিশ্বাসঘাতক তা সে যাকৃগে। আমি তখন তাকেই আমার ঈপ্সিত নাগর ভাবলাম। একদিন তাকে আহ্বান

করলাম। সৈনিক হেসে আমাকে নষ্টা রমণী ভেবে গ্রহণ করলো। আমার ভোগ সম্পূর্ণ হল। কিছুদিন ধরে যে মনের মধ্যে দারুণ ক্ষুধা অনুভব করছিলাম, তার পরিসমাপ্তি হতে আমি দিশেহারা হয়ে পড়লাম। সৈনিক তিনদিন পরে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আবার যদি কখনও এদিকে আসে, তবে আমার কথা স্মরণ করবে।

আবার একক জীবন। আবার নিঃসঙ্গতা। আবার শূন্যতায় ভরে উঠলো সমস্ত সরাইখানা। কিন্তু সেই আদিম প্রবৃত্তি চরিতার্থ হবার পর দিশেহারা হয়ে পড়লাম। এ আমি কি করলাম? এমনি করে নিজেকে বিলিয়ে দিলাম? সর্দারজীর ঘরবালী হয়ে, ঝর্নার মা হয়ে—এ আমি কি করলাম? আমার রমণী আকাঙ্ক্ষাটাই বড হল। দৈহিক ক্ষুধাটাই বড হল। কিন্তু হারিয়ে যাবার পর চৈতন্য হল। অনুশোচনা জাগলো। আর সেই অনুশোচনায় আর এক যন্ত্রণার মুখোমুখি হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠলাম।

পবিত্র যখন ছিলাম তখন সৎচিন্তা ও দৃঢ় মনোভাবই নিজের জীবনকে প্রভাবান্বিত করতো। কিন্তু নিচে নেমে যাবার পর যত অসৎ, দুর্বল ও কুটিল চিন্তাই মনে বাসা বাঁধলো। আর একটি বিশ্রী চিন্তা কত সহজভাবে ভাবতে পারি, তখন তাই আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি। মানুষ পথ হারালে যে পিছল পথে চলতে আর ভয় পায় না, তখন সেই ধারণাই আমার বদ্ধমূল হল।

এদিকে সর্দারজীর ভাণ্ডার নিঃশেষিত। সরাইখানায় লোক আসে না। অন্ন-সংস্থানের কোন পথ না দেখতে পেয়ে দিল্লী যাবো বলে ঠিক করলাম।

এমনি সময়ে একটি নর্তকী হঠাৎ একদিন আমার সরাইখানায় এসে উপস্থিত হল। উদ্দেশ্য, কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে অন্যত্র যাবে। কিন্তু নর্তকীর সঙ্গে আলাপ হবার পর জানতে পারলাম, জাঠ সম্রাট মল্লজীর রাজসভা থেকে এই নর্তকী পালিয়ে এসেছে। একটি তাঞ্জাম ভাড়া করে সে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। পথে এই সরাইখানা দেখে সে থেমে পড়েছে।

সেই নর্তকাই দিল কিছু অর্থ। আর পরিবর্তে আমি তাকে দিলাম আমার দুঃখের কাহিনী। দু-চারদিন পর সে আমাকে প্রস্তাব দিল, 'তুমি দেখতে একেবারে মন্দ নও, যদি নাচ কসরত করে নাও তাহলে তোমার দৌলত মিলবে এখন হিন্দু-স্থানে নাচের বড় কদর। আর রাজসভারও কোন বিচার নেই। মোগল, জাঠ, রাজপুত, মারাঠা, শিখ, রোহিলা—যে কোন রাজসভায় যাবে তোমাকে আদর করে নেবে।

অন্যসময়ে হলে হয়তো নর্তকীর এই কথায় অপমানিত বোধ করতাম কিন্তু তখন আমার জীবন বাঁচাবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। নর্তকী যদি এর চেয়ে আরও কোন ঘৃণিত কার্যের কথা বলতো, তাতেও মনে হয় রাজী হয়ে যেতাম।

সেই নর্তকীর কাছ থেকেই নাচ কসরত করে নিলাম। শিখতে বেশীদিন সময় লাগলো না। অদ্ভুতভাবে খুব অল্পদিনের মধ্যে নর্তকীর তত্ত্বাবধানে নাচ আয়ত্ত করে

নিলাম। তারপর একদিন সকালে অতর্কিতে দেখি ভরতপুর থেকে জাঠ সরকারের লোক এসে পড়লো। সঙ্গে শ'খানেক জাঠফৌজ, একটি পালকী ও দুজন বাঁদী।

তারা একরকম নর্তকীটিকে বন্দী করে নিয়ে গেল।

আমার লাভ হল, নৃত্য কসরত। কিন্তু আমি কোন রাজসভায় নাচতে যাবো বলে এই বিদ্যা আয়ত্ত করিনি। মনে মনে আমার একটি সঙ্কল্প ছিল, সেটি কাজে পরিণত করলাম। সর্দারজীর সরাইখানাটিকে নাচমহল করবার পরিকল্পনা নিলাম।

তারপরের কাহিনী আর অবান্তর।

তুমি আমার পরের পরিচয় নিজে স্বচক্ষে দেখেছ। তোমার সেই শাওনী বহিন কত নীচে নেমে গেছে তার চাক্ষুস প্রমাণ পেয়ে নিশ্চয় আমাকে ঘৃণা করেছ। আমি জানি, তোমরা সাধারণ লোক আমার এই আচরণের সমর্থন করবে না, তবু বলবো— যা কিছু করেছি, তার জন্যে কি আমি দায়ী?

লুতুফ চুপ করে থেকে অনেকক্ষণ পরে বললো,—তুমি কি এর পরও এই জীবনই গ্রহণ করে যাবে?

শাওনী একান্ত অসহায়ের মত বললো—তাছাড়া কি করবো? একটি নষ্ট রমণীর পক্ষে আর কি করার আছে?

লুতুফ আলি মনে মনে তখন ভাবছিল, এখন একে কোটানাতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে কেমন হয়? কিন্তু শাওনীর আগের স্বভাব যা ছিল, তাতে সাহস করা যেত। আজকের যে প্রকৃতি তাতে সে প্রস্তাব দেওয়া যায় না। তবু নিজের কৃতজ্ঞতা ও শাওনীর বর্তমান মানসিক স্থৈর্য পরীক্ষার জন্যে সে বললো,—শাওনী, মনে আছে, আমি তোমায় বহু পূর্বেই আমার সঙ্গে কোটানায় যেতে বলেছিলাম, সেদিন তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে। আজ যদি সেই প্রস্তাব আবার করি, তাহলে কি তুমি তা প্রত্যাখান করবে?

শাওনী তখন নিজের ব্যর্থ জীবনের জন্যে রোদন করছিল। দুটি দীর্ঘায়ত সুন্দর চোখের কোল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল। বুকের মধ্যে তার বোধ হয় নিদারুণ বেদনা জাগছিল। নিজেকে বার বার সংযত করতে গিয়েও সংযত করতে পারছিল না। তবু তারই মধ্যে মাথা নেড়ে বললো,—না। নিজে জ্বলছি বলে তোমার সেই শান্তির ঘরে আগুন জ্বালাতে চাই না। সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিলাম নিজের চারিত্রিক শুচিতা বজায় রেখে তোমার আত্মীয়তা অটুট রাখবো বলে। আজও প্রত্যাখ্যান করছি, এমন অসম্মানিতা রমণীকে স্থান দিয়ে তুমি তোমার স্বপ্নে গড়া সেই রাজত্ব কলঙ্কিত কর না।

তাহলে তুমি আমার কোন সাহায্যই নেবে না? তবে তোমার কন্যাটিকে আমার সঙ্গে দাও। ওকে অন্তত তোমার স্পর্শ থেকে বাঁচাতে সাহায্য কর!

শাওনী শেষের প্রস্তাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো! তারপর বললো,—ভাই সাহেব, ঐটুকু আমার সান্ত্বনা। ওকে নিয়ে গেলে আমি বাঁচবো কি নিয়ে!

কিন্তু তুমি বিচক্ষণ বলেই আমার ধারণা। তুচ্ছ মায়ার আকর্ষণে ওর সর্বনাশ

করবে, এত বড় অন্যায় নিশ্চয় করবে না!

শাওনী হঠাৎ আর্তস্বরে বললো,—না, না এ কথা বল না। ওর সর্বনাশ করবো, একথা মনে স্থান দিও না সর্দারজীর বেটি হলেও ও যে আমারই গর্ভে স্থান পেয়েছে, আমারই রক্ত কণিকার মাঝে ওর সৃজন, এ কথা ভুলবো কেমন করে? তবে তুমি বিশ্বাস কর, আমার এই পাপের স্পর্শ থেকে ওকে বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

লুতুফ আলি আর অপেক্ষা করলো না। কেমন যেন নিজেই লজ্জা অনুভব করে শাওনীর অজান্তে সেই নিশীথরাত্রে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল। আসবার সময় শাওনীকে বলেও এল না। শাওনী অন্য কাজে কক্ষান্তরে গেলে সে ছুটে বেরিয়ে এসে তার অপেক্ষমান অশ্বে চেপে বসলো।

একটি বিরাট শ্রদ্ধা, অপত্য স্নেহ যার জন্যে জমা ছিল, সব আজ নিঃশেষ হতে সে নিজেই অসহায়ের মত ঐ সরাইখানা ত্যাগ করলো। সেই মুহূর্তে সোনীকে তার বড় মনে হল। হানিফকে খুঁজতে আজ বাইরে বেরিয়ে দুটি অভিজ্ঞতা তার সবচেয়ে মনকে অস্থির করলো। সোনী একজন বাজারের মেয়েলোক হয়ে তার মানসিক উজ্জ্বলতা প্রতিষ্ঠিত করে লুতুফ আলির শ্রদ্ধা কুড়োলো। আর শাওনী, যার প্রতি অনেক বড় মনের পরিচয়ে ধরা ছিল, সে অশ্রদ্ধা পেল। আশ্চর্য দুটি রমণী চরিত্র। একজন ঘৃণ্য জীবনের মধ্যে অমৃত মনের স্বর্গীয় ঐশ্বর্য দান করলো। আর একজন পবিত্র জীবন থেকে পিছলে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে নিজের সান্ত্বনা পেতে চাইলো।

দুজনের জন্যেই আজ লুতুফের বেদনা। দুজনের জন্যেই দীর্ঘশ্বাস।

তারপর একদিন কোটানাতে গিয়ে সে পৌছালো। গিয়ে দেখলো হানিফ সুস্থ শরীরে নিজের বাড়িতেই অবস্থান করছে।

লুতুফ আলি তাকে দেখে নিশ্চিত হল। অন্য লোক মারফত শুনলো, সে মীরাটের মধ্যেই ছিল, তার বাইরে যায় নি! কোথায় যেন কি একটা বিরাট উৎসব হচ্ছে, সেই উৎসবে সে আনন্দ করছিল।

হানিফকে লুতুফ আলি কোন কথা জিজ্ঞেস করলো না বা তাকে শাওনীর সম্বন্ধে কিছু বললো না।

আরো কিছুকাল পরে।

এর মধ্যে অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহের ফলে দেশের অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর আহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে বসেছেন। পারস্যরাজ আহম্মদ শাহ দুররাণী বিরাট আফগান সৈন্য নিয়ে মোগল সৈন্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছেন। একবার নয় এর মধ্যে দু দুবার পরাজয়। মোগল সাম্রাজ্য আবার মাথা

তুলে দাঁড়াচ্ছে। আহম্মদ শাহ নিজের বাহুবলে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন করেছেন। মারাঠারা পাঞ্জাব অধিকার হারিয়ে আবার শক্তিবৃদ্ধির জন্যে অন্তরালে লুকিয়েছে। তুররাণী আবার পারস্যোপকূলে দাঁড়িয়ে হিন্দুস্থান জয়ের স্বপ্ন দেখেছেন। ভরতপুরের জাঠরাজরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিজেদের রাজ্যরক্ষা করতেই ব্যস্ত। বঙ্গদেশে তখন বর্গী আক্রমণের জোয়ার। নবাব আলিবর্দী তার রণসজ্জা নিয়ে বর্গীদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছেন। বঙ্গদেশে তখন বর্গীদের অত্যাচারে বঙ্গবাসী কম্পিত। বর্গীরা চায় রাজস্ব। আলিবর্দী তাদের বিতাড়নে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে বিরাট নবাবী ফৌজ সঙ্গে একবার বিহার, একবার উড়িষ্যা একবার বঙ্গদেশে ছোটাছুটি করছেন।

ভারতবর্ষের এই যুগটি বড় সাংঘাতিক যুগ। কোথাও শান্তি নেই। চতুর্দিকে বিপ্লবের রণ সাজ। মানুষ মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। কে যে কোন্ দলের লোক এখন বোঝা মুশকিল। তাই সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে। তাই অবিশ্বাসের ধোঁয়ায় চতুর্দিক কালিমাবর্ণ হয়ে দিনরাত্রির পার্থক্য বিনষ্ট হয়েছে।

এই যখন চতুর্দিকের অবস্থা। এমনি সময়ে লুতুফ কিন্তু অন্য কথা চিন্তা করছে।

লুতুফ আলিকে তখন দেখা যাচ্ছে শাহপীরের দরগার মাঝে। না, নামাজ পড়বার জন্য লুতুফ আলির কোন দুশ্চিন্তা নেই। তার চিন্তা অন্য। সম্পূর্ণ অভিনব সে চিন্তা।

শাহপীর ফকিরের সেই স্মৃতিস্তম্ভ ছিল রক্ত প্রস্তরের দ্বারা নির্মিত। ভগবানপুরের বিরাট প্রান্তর জুড়ে একটি দীঘিকা। সেই দীঘিকার কিনারেই এক স্মৃতিস্তম্ভ। মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহান শাহপীরের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে এই দরগা প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। মোগলদের স্মৃতিস্তম্ভ পরিকল্পনা বড় অদ্ভুত ছিল। বিরাট ও শিল্প সৌন্দর্যে যেন পৃথিবীর অতুলনীয় সম্পদ বলে স্বীকৃত হয়, এই ধারণা সব সময়ে তাদের প্রভাবান্বিত করতো। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে নূরজাহানও এই দরগা নির্মাণে শক্তি ও সামর্থ্য যথেষ্ট ব্যয় করেছিলেন। মীরাটে যেমন সূর্যকুণ্ড, নৌবস্তীর দরগা, মনোহর শাহের মন্দির ইত্যাদি দর্শনীয় বস্তু ছিল, তেমনি শাহপীরের দরগা। এই দরগাকে বেষ্টন করে যেমন একটি দীর্ঘিকা ছিল, তেমনি ছিল একটি প্রস্তরময় বৃহৎ চাতাল। আর তারই ওপর প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বৈকালে নাচ গানের আসর বসতো।

এই নৃত্যগীতের কোন রীতি দরগার নিয়মে ছিল না কিন্তু কেমন করে যেন এতওয়ার ও জুম্মারাতে এই নৃত্যগীত ধর্মীয় অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হত। তাই এই দুদিন বিভিন্ন স্থান থেকে গায়ক, গায়িকা, নর্তকী শ্রোতা এসে জমায়েত হত। গোধূলির রক্তরাগবর্ণ আসমান কবরিত করে প্রকৃতিকে উদ্ভাসিত করলে এই আনুষ্ঠানিক আসর বসতো। আসরকে কোন ফুলের স্তবক দিয়ে বা হীরার ঔজ্জ্বল্য দিয়ে সাজানো হত না কিন্তু যারা আসতো তারা অপরূপ অলঙ্কার ও মূল্যবান বসনে সজ্জিত হয়ে আসতো। বিশেষ করে নর্তকীরা। নর্তকীর সুরত যেমন হুরীর মত, তেমনি মূল্যবান অলঙ্কার ও বসনে আরো অপরূপ দেখাতো। সেই উন্মুক্তস্থানে লুব্ধ দর্শকের সামনে তাদের সেই বিচিত্র ভঙ্গিমায় নৃত্য কোন রাজা, বাদশাহকে খুশি করবার জন্যে নয়, অথচ মনে হয়

কোন রাজা বাদশাহের শিসমহলেও অমনি নৃত্য হ'ত না। এক একজন নর্তকীর যেমন উদ্ভিন্ন যৌবন, তেমনি তাদের অপূর্ব নৃত্যকৌশল। তার ধারেই দীর্ঘিকার শান্তজলের স্রোত। নীল জলের দীর্ঘিকায় গোধূলির রক্তরাগবর্ণ। মনে হত কে'যেন আবীর ছড়িয়ে দিয়ে জলের বুকে কামনার রঙ ছড়িয়েছে।

এই স্থানেই হঠাৎ একদিন লুতুফ আলি গিয়ে পৌছলো। আর নৃত্যগীত উপভোগ করতে গিয়ে আবিষ্কার করলো এক খুবসুরত নর্তকীকে। প্রথমে তার রূপেই মুগ্ধ হল লুতুফ আলি। দূর থেকে তার নাচ দেখে বাহবা না দিয়ে বুকের মধ্যে কেমন যেন এক মাতন অনুভব করলো। কেমন যেন অনাস্বাদিত পুলকের হিল্লোল। কেমন যেন বিচিত্র অনুভূতিতে তার মনপ্রাণ ভরে গেল।

প্রথম দিন সে বাড়ি ফিরে এল। দ্বিতীয় দিন আবার গেল। সেদিনও দূর থেকে নাচ দেখা ছাড়া আর বেশীদূর এগোতে পারলো না। তৃতীয় দিনও একই অবস্থা। এমনি করে আরো ক'দিন যাবার পর একদিন হঠাৎ দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। না। মানসিক চঞ্চলতা অদমিত থেকে আরো যন্ত্রণা দিচ্ছে। এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে শান্তি পাওয়া যাবে না। অন্তত ঐ নর্তকীর সঙ্গে তাকে আলাপ করতে হবে। জানতে হবে তার অসামান্য রূপ সহজ জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, না তার মধ্যে কোন জটিলতা আছে! যাই থাক। তবু মনের কি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করতে সে সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে তুললো।

তাই একদিন সুযোগ বুঝে সে নর্তকীকে একান্তে আটক করলো।

নর্তকী লুতুফের কাণ্ড দেখে ঝর্ণার কলতানের মত খিলখিল করে হেসে উঠলো। চোখের তারায় এক মোহিনী আকর্ষণ সৃষ্টি করে মৃদুস্বরে বললো,—আর্জি কি আলি-সাহেব? আমার পথ আটকালে কেন?

লুতুফ আলি সরাব পান করার মত জড়িত স্বরে বললো,—আমার দিল তুমি কেড়ে নিয়েছ? তাই দিলের ফরমাইসে এই দুঃসাহস প্রকাশ করেছি।

আবার নর্তকীটি হেসে উঠলো।

কিন্তু আমি তো তোমার দিলের চাহিদা মেটাতে পারবো না আলিমোহন?

কি'উ বিবি। আমার দৌলত আছে। কোটানায় আমার ঘর আছে। আমি বিপত্নীক। কেন আমার চাহিদা মেটাবে না?

নর্তকী আবার খিলখিল করে হেসে উঠলো। আবার জলতরঙ্গ বেজে উঠলো। আবার বাদ্যযন্ত্রের নিনাদে লুতুফের দেহে শিহরণ জাগলো।

লুতুফ আলি কাতর হয়ে বললো, আমায় বিশ্বাস কর। তুমি অমন করে হেসে প্রস্তাব উড়িয়ে দিও না।

নর্তকী হঠাৎ দেহের অলঙ্কারের মৃদুশব্দকে স্তব্ধ করে দিয়ে স্থির হয়ে বললো,—কিন্তু আমি তোমার ঘরে যাবো কেন? আমার জীবন চিঁড়িয়ার মত। কারো ঘরে বাঁধা হতে চাই না। এ প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘোরাই আমার কাজ। তাছাড়া আমার এই দুরন্ত যৌবন, আগুনের মত রূপ তোমার ঐ ছোট্ট ঘরে রাখবে কোথায়?

লুতুফ বললো,—তুমি একবার রাজী হও। তারপর দেখবে, কোটানায় আমার ঘর ছোট কিনা! লুতুফ আলি কেমন যেন অসহায়ের মত নর্তকীর একটি হাত খপ করে ধরে ফেললো। তুমি আমায় বাঁচাও সুন্দরী! আমি জীবনে যা কিছু চেয়েছি সব পেয়েছি, শুধু মনের মত একজন ঘরবালী পাই নি। তুমি একবার কোটানাতে গিয়ে আমার অবস্থাটা দেখ, তুমি হয়তো নিজেই বিশ্বাস করবে না। আমার মত লোকের এত সম্পদ থাকতে পারে? আমি গর্ব করছি না। শুধু প্রার্থনা করছি তোমার কাছে। বহুকাল আগে আমার প্রথম স্ত্রী গত হয়েছে। তারপর দারপরিগ্রহ করবার কত কাউকে পাই নি। এখানে এই দরগায় এসে কদিন ধরে তোমাকে দেখেছি। কে যেন আমার অন্তরে বার বার বলছে, যাকে এতকাল ধরে খুঁজে চলেছিস্, সে তোর সামনে। তাকে ছেড়ে দিস্ নি। তার কাছে আছে তোর হারানো রতন। তাই তোমার কাছে এই দুঃসাহসিক প্রস্তাব নিবেদন করেছি। জানি না এ আমার মহব্বতের আকাঙ্ক্ষা কিনা। তবু মনে হচ্ছে, তোমাকে লাভ করলে আমার জীবনে শান্তি আসবে। ঘর হবে সুন্দর। সম্পদ হবে পূর্ণ। আর সবচেয়ে যে অভাব, সেই দিলের চাহিদা আমার সম্পূর্ণ হবে।

অন্তরের আবেগের মূল্য চিরকালই স্বীকৃত হয়েছে। তাছাড়া আন্তরিকতায় পূর্ণ নিবেদন কখনও সহজে কেউ উপেক্ষা করতে পারে।

শাহপীরের দরগার উত্তরে যে বৃহৎ প্রাচীরটি দণ্ডায়মান ছিল। যার পাশ দিয়ে দরগার উপরে ওঠবার সিঁড়ি, সেই সিঁড়ি মুখে একটি ঝরণার প্রস্রবন ছিল, আর তাকে বেষ্টন করে একটি রকমারী পুষ্পের বীথিকা। সেই বীথিকার ধারে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলছিল। এ অঞ্চলে বড একটা কেউ আসতো না। একটু নির্জনতা থাকার জন্যেই লুতুফ আলি এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। কিন্তু চাঁদ আসমানে জেগেছে। চাঁদের প্রখর আলো শুধু ফোটে নি, তবে একেবারে আলোহীন নয়। স্বল্প আলোর দ্যুতিতে অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে। তবে ছায়া আলো আঁধারির মধ্যে রমণীয় হয়েছে প্রকৃতি। নীল আকাশের ছায়া পড়েছে দরগার পাশের সেই অংশে। শুধু পাশে কেন অনেকদূর পর্যন্ত সেই আলো-আঁধারির লুকোচুরি খেলা।

কিন্তু সেই নর্তকীর রূপের জৌলুসে আঁধারের সেই ধূসরতা অদৃশ্য হয়েছে। বরং রূপের জৌলুসে ও অলঙ্কারের রোশনাইতে ভিন্ন এক চাঁদ। চাঁদের উপস্থিতিতে পথ নির্জনতা হারিয়ে মুখর আলোময় হয়ে উঠেছে।

নর্তকী বিস্মিত হয়ে আগন্তুকের কথা ভাবছিল। ভারী অদ্ভুত প্রস্তাব। একথা তো কখনও সে ভাবে নি? সত্যিই সে পক্ষীর মত জীবন ধারণ করে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চলেছে। দৌলত! না, দৌলতের লোভ নয়। জীবনের লোভে। জীবনে তার চাহিদা ভাল নর্তকী হবে। নবাব, বাদশাহের রাজসভাতে নেচে বাহবা নেবে। ইনাম কুড়োবে। দিল্লীতে বাস। দিল্লীর বাতাসে তার নিশ্বাস নেওয়া। দিল্লীর আবহাওয়ায় তার বড় হওয়া কিন্তু দিল্লীতে তার ইনাম মেলেনি। দিল্লী দুর্গে

নাচবার অধিকার সে পায় নি। ফিরিয়ে দিয়েছে বাদশাহ। এত্তেলা পাঠাতে হুকুম মেলেনি। তার সুরত দেখেনি আহম্মদ শাহ। সুরত দেখলে নিশ্চয় চমকাত্তো। তাই তার দারুণ অভিমান গর্বিত রূপের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করেছিল।

তারপর একদিন এর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই সে দেশে দেশে পর্যটনে বেরিয়ে পড়েছিল। সঙ্গে সম্বলমাত্র একটি বাদ্যযন্ত্রের দল। সে যাযাবরের মত রাজ্য থেকে রাজ্য, রাজদরবার থেকে রাজদরবারে এত্তেলা পাঠিয়েছে। 'শুধু একবার আমাকে নাচবার হুকুম দিন।' কিন্তু কেন যে তাকে বিমুখ হতে হয়েছে, সে আজও জানে না। বাপ মা নেই। নানীর কাছে মানুষ। বড় হলে জানলো, সে নানীও আপন নয়! শুধু মানুষ করেছে মাত্র। সুতরাং নিজের ভাগ্য তৈরী করতে হবে। নিজের জগৎ নিজেকেই সৃষ্টি করতে হবে।

তাই নৃত্যগীত শিক্ষা নিয়ে আর দেহের সুরতে চমক সৃষ্টি করে সে রাজদরবারের আসন যাক্‌্রা করেছিল। কিন্তু মেলে নি। কোন রাজদরবারই তাকে সম্মান দেয় নি। বরং সাধারণ সৈনিকরা তার নারীমূল্যকে ধূলি ধূসরিত করতে চেয়েছিল। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে সে হঠাৎ মীরাটের ভগবানপুরের শাহপীরের দরগায় নাচতে আসে। বাস তার এই দরগারই অতিথিশালায়। এখানে এই দরগায় আগন্তুকের বাসের জন্যে সুব্যবস্থা ছিল। সেখানেই সে বাজনদারদের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। হঠাৎ আকস্মিক লুতুফের এই প্রস্তাব।

হোক্ সে সুন্দরী, সে নৃত্যপটিয়সী কিন্তু লুতুফের এই আন্তরিক প্রস্তাবের মধ্যে কোথায় যেন মাদকতা ছিল। কোথায় যেন একটা সুগভীর আকর্ষণ তার সমস্ত গর্বকে ভেঙে চুরমার করে দিল। সমুদ্রের মাঝে একখণ্ড তৃণের ওপর ভাসতে ভাসতে সে তীর খুঁজে চলেছে। তীর পাবে কিনা তার কোন স্থিরতা নেই। বড় কিছু আশা করতে গিয়ে যদি কোন আশাই ফলবতী না হয়? মহৎ কিছু চাইতে গিয়ে যদি সব ফসকে যায়? তাছাড়া শাদীর প্রস্তাব! আগন্তুককে দেখে তা মনে হচ্ছে, সাচ্চা আদমী এবং শরীফ আদমী। তাছাড়া কাতর আবেদনের মধ্যে কোথায় যেন সুগভীর আন্তরিকতা ছিল।

সেই নর্তকীর মনটি দোলা দিয়ে উঠলো। তার আওরত মনে আগন্তুকের প্রস্তাবটি কেমন যেন নিবিড় এক স্পর্শের অনুভূতি দিল। তার চেয়ে আগ্রহ জাগলো ঘর বাঁধবার। যে বন্ধনের জন্যে প্রত্যেক রমণীরই কামনা থাকে, সেই কামনা।

তবু নর্তকীটি নিজের আগ্রহকে সংযত করে আগন্তুককে পরীক্ষা করার জন্যে বললো,—আমি যদি ঝুট হই। আমার যদি ইজ্জত কলঙ্কিত হয়ে থাকে, তাহলেও কি তুমি আমাকে শাদী করবে?

লুতুফ আলি বুঝতে পারলো না, নর্তকী তাকে পরীক্ষা করছে কিনা! তাই সে কোন জবাব না দিয়ে নর্তকীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো।

নর্তকী মনে মনে কৌতুক অনুভব করে সহজভাবে বললো,—আমি নর্তকী। যত্রতত্র নেচে বেড়ানোই আমার ব্যবসা। মরদের মনে আবেশ সৃষ্টি করে তাদের আনন্দ

দানই আমার কাজ। সেই বিলাসের রঙমহলে নাচতে গিয়ে শুধু কি বিলাসীরা আমার নাচ দেখেই আমাকে ছেড়ে দেয় ?

লুতুফ আলির মনে পড়লো সোনীকে। সোনী নিজে রূপজীবিনী হয়ে কখনও অস্বীকার করে নি তার ব্যবসা। শাওনী নিচে নেমে গিয়ে অকপটে সত্য ঘটনাই তার কাছে পেশ করেছে। ফতুমাকে সে দেখেছে। আজ দেখছে এই নর্তকীকে। আর একজন তার মনের স্বপ্নই হয়ে আছে সে কেমন ছিল তা জানে না, তবে তার নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজও গোলাপের মত ফুটে আছে। রমণীদের মনের রহস্য আজও তার কাছে অজ্ঞাতই রইলো। এরা কখন যে কি ধরনের কথা বলে বোঝামুশকিল। তাদের স্বভাবের কোনদিকটা পরিষ্কার, কোন অংশটি আলোকিত। আজ এই বয়সের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কিছুতেই বুঝতে পারলো না। তাই ভাবলো, এই নর্তকী বুঝি সেই রমণীস্বভাবের রহস্যময় দিক্‌টি মেলে ধরেছে। কিংবা তাকে বিতাড়িত করবার জন্য এই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়েছে। তাই সে দৃঢ়স্বরে বললো,—মহব্বত কখনও ইজ্জতহানির বাধা মানে না। আমি তোমার দেহের জন্য আকাঙ্ক্ষিত নয়। রূপের মেকি জৌলুসে চোখ ধাঁধিয়ে আমি তোমাকে অধিকার করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হই নি। দেহ কলঙ্কিত হতে পারে, মন তো কলঙ্কিত নয়। মনের সেই হীরক ঔজ্জ্বল্যে আমার আবেদন যদি স্পর্শ সৃষ্টি করে থাকে তাহলে নিশ্চয় আমাকে প্রত্যাখ্যান করবে না।

হঠাৎ সেই নর্তকী পুলকিত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজেকে সংযত করে, মাথা নিচু করে বললো,—উত্তরটা কাল নিও।

নর্তকী আর অপেক্ষা না করে ঘুরে অন্য পথ ধরবার জন্যে প্রস্থানোদ্যত হল। আসলে সে নিজের মনের আবেগ দমন না করতে পেরে পলায়ন করছিল।

হঠাৎ লুতুফ আলি ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, - কাল এখানে আসবে তো ?

নর্তকী মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ওড়নায় মুখ ঢেকে চলে যাচ্ছিল।

লুতুফ আলি আবার পথরোধ করে জিজ্ঞেস করলো,—তোমার নামটা তো জানা হল না।

জেমিলি।

শাওনী বলেছিল, ভাইসাহেব একটি শাদী কর। ঘরে আওরত না এলে ঘরের শ্রী ফেরে না। লুতুফ আলি তার কথাতেই শাদী করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয় নি। শাওনীর ওখান থেকে ফিরে আসার পর আরো কতদিন চলে গেছে। সে যেন তারপর থেকেই কি এক ভাবনার মধ্যে প্রবেশ করেছে। ভাবনার আসল অর্থ কি। কি সে ভাবে তার কোন সন্ধান পায় নি। তবু কেমন যেন সে দিন দিন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। হানিফকে ব্যবসার অনেক কিছু বুঝিয়ে দিয়েছে। হানিফ নিজেই এখন সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। লুতুফ আলির একরকম অবসর। হয়তো সেই বিরাট অবসরের জন্যে তার মনের মধ্যে নানান এলোমেলো চিন্তা বাসা বেঁধেছিল।

কিন্তু এই জেমিলিকে দেখবার পরই বুঝতে পেরেছিল, সে কিসের অভাবে মনের

এই স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে ?

তারপর লুতুফ আলি জেমিলিকে শাদী করে কোটানাতে এনেছিল।

হানিফ কিন্তু নতুন আম্মাকে দেখে ক্ষিপ্ত। পিতাকে হঠাৎ ছোরা বের করে হত্যা করতে গেল। জেমিলিকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিল। তাকে নর্তকী বললো। নষ্টা বললো। বুড়ো বয়সে আবার ভীমরতি হয়েছে। এক নাচওয়ালী মেয়েকে বিয়ে করে ইজ্জত কোরবানী দিল।

লুতুফ আলি হানিফের আচরণে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অবাক হয়ে একরকম অসহায়ের মত বললো,—জানিস্ হানিফ, আমি কি অবস্থার মধ্যে এই হিন্দুস্থানে এসেছিলাম ? আমি জীবনে কি পেয়েছি, তারও কি সন্ধান রেখেছিস্ ? তুই এমন করে আমাকে আঘাত দিস্ না ? বাপ্ বলে কি এতটুকু সম্মান করবি না ?

তুমিই বা আমার কি সম্মান রাখলে ? এই বুড়ো বয়েসে এক যুবতীরমণীকে শাদী করে নিয়ে এলে !

বেটা হানিফ ! লুতুফ আলি অসহায়ের মত ছেলেকে থামাতে চাইলো। আমি তোরই জন্যে এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। তোরই জন্যে দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে এই যা কিছু সম্পদ করেছি।

হানিফ ব্যঙ্গ করে বললো,—আজ তবে ঐ যুবতীর জন্যে সবকিছু ব্যয় কর।

জেমিলি অবাক হয়ে গেল হানিফের আচরণে। পুত্র অত্যাচারী, লম্পট, বদমাইস হয় কিন্তু এমন শয়তান খুব কম হয়। তাই সে লুতুফ আলির প্রেমে মুগ্ধ হলেও হানিফের আচরণে আতঙ্কিত হল। অন্তরালে লুতুফ আলিকে জানালো,—এ কেন করলে ? তোমার লড়কা যখন এমন, তখন লড়কার অনুমতি নিয়েই এগোনো উচিত ছিল।

লড়কা বড় হয়েছে। পরিণত এখন। তাকে শাসন করে শায়েস্তা করা যায় না। তাই লুতুফ আলি অধোবদনে মুখ ঢাকলো।

জেমিলির জীবনে শাদীর আনন্দটুকু এই হানিফের জন্যে বরবাদ হয়ে গেল। লুতুফ আলির কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। সে একটি রমণীর আশ্রয় চেয়েছিল। আশ্রয় পেয়ে সে স্বস্তি অনুভব করেছিল কিন্তু জেমিলি কি পেল ? অসামান্য রূপ, যৌবনের অঙ্গার, দেহের যে কামনা তার ইনাম কোথায় ? সে অনেক বড় আশা পোষণ করে, বিক্ষিপ্ত যাযাবর জীবন ত্যাগ করে এক প্রৌঢ় লোকের ব্যগ্র চাওয়াকেই সমর্থন করেছিল। সমর্থন করার ফল যদি এই জানতো, তাহলে কি এই মিলনে রাজী হত।

কেমন যেন ছন্নছাড়া জীবন থেকে শান্তি পাবে বলে লুতুফ আলিকে স্বীকার করেছিল।

না, আর ভাবনা এগোয় না। নতুন জীবনের মোহ থেকে ছটকে পড়ে নিজের কপালের ওপর করাঘাত করলো। লুতুফ আলিকে কি বলবে? তার অবস্থাও সে দেখতে পেলো।

আলিসাহেব একবার ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করে, একবার তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কিছু মুখে বলে না কিন্তু আলিসাহেবের চোখের কাতর চাহনিতে প্রমাণ হয়, তার নিরুপায় অবস্থা। কাতর হয়ে সে যেন নিরুত্তরে ক্ষমা চায়। জেমিলি ক্ষমা কর। তুমি তোমার সুন্দর অন্তর দিয়ে বিচার করে আমার অসহায় অবস্থা বিবেচনা কর।

জেমিলি সত্যিই লুতুফ আলিকে ক্ষমা করে। কিন্তু তাতে লাভ কি? তাতে কি তার স্বপ্নাতুর মন কোন স্বর্গীয় সুখের সন্ধান পেল? হ্যাঁ, তার দেহের পরতে পরতে রমণীয় ইচ্ছাই ছিল। শুধু স্বামী ও তার স্বামিত্বের সোহাগ নয়। আরো অনেক কিছু।

লুতুফ আলিকে দেখে তার প্রথম ততো ভাল লাগেনি। লুতুফ আলির বয়স হয়ে গিয়েছিল। যুবতী রমণী চায় যুবরক্তের মাতন। লুতুফ আলির সে রক্ত স্তিমিত হয়ে এসেছে। তবু স্বীকার করতে আজ বাধা নেই যে সেদিন লুতুফ আলিকে সে স্বীকার করেছিল শুধু তার তীব্র আকাঙ্ক্ষাকে অস্বীকার করতে না পেরে। আর তার যাযাবর জীবন চাইছিল একটি নিবিড় আশ্রয়। কিন্তু এ কি হল? এ তো সে চায় নি?

একটিমাত্র ছেলে, ঐ হানিফই তার সব শান্তি কেড়ে নিল। কিন্তু হানিফকে সে তো কোন অবজ্ঞা করে নি! বেটা বলে তো কাছে টেনে নিতে গিয়েছিল। অত বড় বেটা বলে অবশ্য প্রথমে লজ্জা জেগেছিল। কিন্তু সে লজ্জা কাটিয়ে উঠতেও তার সময় যায় নি। সে কিছু করে নি, হানিফের দিক থেকে আঘাতটা বজ্রাঘাতের মত এসে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করেদিল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের সামনের উজ্জ্বল সম্ভাবনাটুকু নষ্ট হয়ে গেল। অন্ধকার, নিবিড় অন্ধকার ছাড়া আর এতটুকু আলো নেই, বাতাস নেই, আশার কোন ছলনাও নেই।

এই অশ্রুঝরা চোখের নীরব কাকুতির মাঝে স্ত্রীর কর্তব্য পালন। না, লুতুফ আলিকে সে বিমুখ করে নি। বিবির সোহাগ দিয়েই তার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল, আর বলেছিল তোমার বেটাকে সব দিয়ে দাও। ও হয়তো ভেবেছে, তোমার সম্পদের ওপর লোভ করেই আমি এই শাদীকে মেনে নিয়েছি।

কিন্তু আশ্চর্য, লুতুফ আলি হানিফকে সাফ জানিয়েছে। তোর জন্যে এইসব করেছিলাম, তোর ভোগেই ব্যয় করিস্।

তারপর অবশ্য লুতুফ আলি অবাক হয়ে জেমিলিকে জিজ্ঞেস করেছে,—কাজটা কি ভাল করলে? আমি যখন থাকবো না, তোমার কি করে চলবে?

জেমিলি চিন্তা না করেই উত্তর দিয়েছে। নাচ তো ভুলে যায় নি? আবার

নাচবো।

লুতুফ আলি বিস্মিত হয়ে উত্তর দিয়েছে—কিন্তু যদি কোন বালবাচ্চা হয়ে যায়?

তখন অবশ্য জেমিলিকে চুপ করে যেতে হয়েছে। একথা তো একবারও ভাবে নি। সে রমণী। তার আলাদা একটি সত্তা আছে। আর আছে তার মাতৃত্ব। সে যে কোন সময় সেই আসনে বসতে পারে। স্বামী আছে, সোহাগ আছে। সম্ভোগের তৃষ্ণাও তার লোপ হয় নি। সুতরাং যে কোন সময়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

হলও তাই। একদিন আকস্মিক সম্পূর্ণ অনাহুতের মত সেই বার্তা দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে গেল। জেমিলির মাতৃত্বের শুভসূচনা আর চাপা থাকলো না। তার শরীরের পরতে পরতে সেই ইঙ্গিত প্রকাশ পেলো। গৌরবের চিহ্ন। রমণীর সবচেয়ে গর্বের চিহ্ন কিন্তু জেমিলি কেমন আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। তার মুখের রক্ত শুষে নিল। কে যেন তার চোখের আলো সবটুকু কেড়ে নিল।

এইসময় লুতুফ আলি একান্তে ডেকে বললো,—একদিন তুমি নিজের জন্যেই ভেবেছিলে। এবার আর একজনের জন্যে কিছু ভেবেছ?

জেমিলি এই ভয়টাই অনেকদিন ধরে করছিল। যেদিন থেকে তার মাতৃত্ব প্রকাশ লাভ করেছে। তাই স্বামীর কথায় চমকে উঠলো। চমকে উঠে সে বিস্ময়ে ভাবলো—হঠাৎ স্বামী তার সঙ্গে এমনি ব্যবহার করছে কেন? তবে কি সে ছেলেকেই মনে মনে বেশী স্নেহ করে? ভয়ের সংমিশ্রণে স্নেহের স্পর্শ সৃষ্টি হয়েছে। তার অবর্তমানে তার সম্পত্তি নিয়ে দুজনের মধ্যে কোন সংঘর্ষ না লাগে বলেই এই সাবধানতা। লুতুফ আলির মন কোনদিকে সে বুঝতে না পেরে নিজেই সমস্ত আসক্তি ত্যাগ করলো। এত ভাবনার কি আছে? নিজে তো একটি ব্যবসা শিখে রেখেছে। কন্যা যদি হয়, নাচ শিখিয়ে মানুষ করবে। পুত্র যদি হয়, তাহলে কথা কি? একটা বিরাট অবলম্বন তাকে শেষজীবনে শান্তি দেবে।

তাই স্বামীর কথায় একরকম নির্লিপ্তভঙ্গিতে উত্তর দিল, ভবিষ্যতেই ভাবা যাবে।

লুতুফ আলি তাতে কোন আস্থা স্থাপন করলো না। বললো,—না এ ছেলেমানুষের কথা নয়। সবকিছু ভেবে নেওয়া উচিত।

জেমিলি হঠাৎ কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠলো। তিক্তস্বরে বললো,—অত আমি ভাবতে পারি না। যে আসছে, সে আগে আসুক। বাঁচে কি মরে দেখো?

যদি বাঁচে?

বেশতো, তখন ভেবে একটা কিছু উত্তর দেব।

হেঁয়ালী কর না, গুরুত্ব দাও। হানিফকে তুমি চেন, তার সঙ্গে কোন সংঘর্ষ লাগুক সে আমি চাই না।

তুমি কি বলতে চাও?

আমি কি বলতে চাই, নিশ্চয় তোমার অজ্ঞাত নয়?

তাহলে জেনে রাখ, আমি তোমার কিছু চাই না। তোমার সঙ্গে হানিফের সংঘর্ষ লাগতে পারে, এমন কাজ আমি করবো না। তুমি আছ, তাই এখানে

আছি। তুমি যেদিন না থাকবে, সেদিন এ বাড়ির সমস্ত মায়া পরিত্যাগ করে চলে যাব! যে আসবে সেও আমার সঙ্গে যাবে।

সে যদি বড় হয়ে নিজের অধিকার চায়?

জেমি'লির বুকের তলে কেমন যেন কান্না জমে উঠেছিল। হঠাৎ সে কন্না আর বাঁধা মানলো না। দু চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে এল স্রোতের মত। এই লোকটি আজ এত নির্মম হয়ে উঠেছে কেন সে বুঝতে পারলো না। তবে কি সে কোমল স্বভাবের পরিচয় দিয়েছে বলেই এমনি নির্মমতা তার প্রাপ্য হল? আর যদি কঠোর হত? নিজের অধিকার যদি নির্লজ্জের মত আদায় করবার জন্যে বিদ্রোহিনী হত? সংঘর্ষ লাগতো, ক্ষতি কি? তখন এই লোকটি কি করতো? কিন্তু সে দীনা হতে পারে তবে নির্লজ্জ নয়। যে সম্পদ অল্লায়াসে পাওয়া যায় না, লোভ করে সে ছোট হতে চায় না। একথা বোধহয় তার স্বামী বুঝতে পেরেছিল, সেইজন্যে সেই সুযোগটুকু সে সদ্ব্যবহার করলো। করুক তাতে যদি সে শান্তি পায়, জেমিলি তাকে শান্তি দেবে।

তাই অশ্রুসংবরণ করে সে দৃঢ়স্বরে বললো,—ছোটবেলা থেকে তাকে তেমনিভাবেই মানুষ করবো। যদি কন্যা হয়, তাহলে সে তার আম্মার ব্যবসাই নেবে। আর যদি পুত্র হয়, পুত্রকে বলবো,—তুমি পিতার অধিকার আকাঙ্ক্ষা ক'র না। তুমি আমার সন্তান, আমাকেই অনুসরণ কর।

তারপর জেমিলি সেখান থেকে পালিয়ে গিয়েই নিজেকে রক্ষা করেছিল।

অভিশপ্ত মাতৃত্ব। অভিশপ্ত তার রমণী জীবন। কেন যে অভিশপ্ত এই গর্ভে মাতৃত্বের অঙ্কুর জেগে উঠলো! পুষ্পবৃক্ষ শাখে কুসুম কোরক জাগলে বৃক্ষের উন্মাদনা! প্রথম কিশলয় জন্ম নিলে প্রসূতির আনন্দ! সাগরের বুকে নতুন স্রোতের জন্ম হলে সাগরের কি উচ্ছ্বাস! আর আজ তার মনে হচ্ছে, সে যে নতুন জন্মকে আহ্বান জানিয়ে নিয়ে আসছে সে জন্ম না হলেই যেন সবচেয়ে মঙ্গল হত। সবচেয়ে সুখী হত সবাই। জেমিলির সেদিনের সেই বেদনা যে কি নিদারুণ তা আর কে বুঝবে।

না, এর জন্য কাউকে সে দায়ী করবে না। কাউকে অপরাধী করবে না। শুধু নিশুতি রাত্রে জ্যোৎস্নালোকিত তারায় ভরা নীলিমার দিকে তাকিয়ে কার কাছে যেন সান্ত্বনা চাইলো। কার কাছে যেন নীরবে অশ্রু ত্যাগ করে মুক্তি চাইলো। এই দুর্বহ জীবনের যেন মুক্তি হয়। ভাবীকালের সেই অনাগত প্রাণীটি পৃথিবীর আলোয় ভূমিষ্ঠ হলে যেন কারো অভিসম্পাত না পায়। যতদিন তার গর্ভে সেই জীবন্ত প্রাণীটি নির্জীব হয়ে পড়েছিল, ততদিন সে তার জন্যে বার বার ঊর্ধ্বলোকে কাকে যেন প্রার্থনা জ্ঞাপন করলো। মরলোকে কেউ তার আপন ছিল না বলে সেই অদৃশ্য কোন এক ব্যক্তিকে সে তার মনের কথা জানাতো।

তারপর একদিন সেই মুহূর্তটি এল।

কেউ শঙ্খ বাজালো না। মঙ্গলধ্বনি করলো না। আকাশে, বাতাসে কোথাও কোন শুভ সূচনার ইঙ্গিত ফুটে উঠলো না। কেমন যেন নিঃশব্দ পদসঞ্চারে পৃথিবীর

এক মানব শিশুর জন্ম হল তখন শুধু প্রত্যাহের মত নীলিম আকাশের প্রান্তর জুড়ে সূর্যের প্রখর দীপ্তিশিখা। এ ছাড়া সবই স্তব্ধ। সবই নিথর। কেন যেন প্রকৃতির আবর্তিত পরিবর্তন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে এক মানবশিশুর আবিভাব দেখছিল। প্রকৃতি কেন তখন এমন আচরণ করলো? তবে কি মানুষের সঙ্গেও তার ষড়যন্ত্র ছিল? মানুষ যখন এই মানব জন্মের বিরুদ্ধাচারণ করলো তখন প্রকৃতি কেন মঙ্গলধ্বনি করলো? সে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে আকাশে বাতাসে অস্বাভাবিক একটা কিছু সৃষ্টি করতে পারলো না! পক্ষীদলের কূজনে ভরিয়ে, বৃক্ষের সবুজ পল্লবে আনন্দ জাগিয়ে—কতরকম প্রাকৃতিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারতো। না, এই জন্মের জন্যে কারুরই আশীর্বাদ ছিল না।

যখন এই মানবশিশু মাতৃগভ থেকে বেরিয়ে আলোর জগতে বিকশিত হল, তখন সবাই দেখলো সে শিশু কন্যার রূপ নিয়ে পৃথিবীতে এসেছে। জেমিলির অবশিষ্ট জীবনের শেষ দুঃখকে বহন করে তার আবিভাব।

লুতুফ আলি প্রথম গজন করে উঠলো সেই কন্যাবস্তুকে দেখে। জ্ঞানহারা জেমিলির হঠাৎ জ্ঞান ফিরলো এই আর্তস্বর শুনে। সে বুঝতে পারলো, তারা বাকী জীবনের আর এক অভিশাপ তাকে দগ্ধ করবার জন্যে আবির্ভূত হয়েছে। নিজে রমণী, আর এক রমণীকে পৃথিবীর আলোয় নির্যাতিতা হবার জন্যে সে তাকে সাদরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এই ভয় যে সে অনেককাল ধরেই করছে।

নবপ্রসূতির ম্লান মুখের কাতর চাউনিকেও লুতুফ আলি ক্ষমা করলো না। সে যেন কেমন পরিবর্তিত হয়েছিল। জেমিলির দেহভোগের আকাঙ্খা তার নিবৃত্তি হতে সে যেন তার পুত্রকেই সমর্থন করে সন্তানস্নেহের ফল্গুধারায় স্নান করেছিল। তাই জেমিলির ব্যথাকে নিজের ব্যথা মনে না করে আরো ব্যথা দেবার জন্যে সে কণ্ঠের সোচ্চার ঘোষণাকেই প্রশ্রয় দিল। হ্যা, জেমিলি অপরাধী। যার গর্ভে প্রথম রমণী রত্ন আসে, তার গর্ভ কলঙ্কিত। সে সৌভাগ্য নিয়ে এ পৃথিবীতে আসে নি। দুর্ভাগ্য বহন করেই এ বাড়িতে এসেছে। এ বংশের কলঙ্ক। সুতরাং তাকে আর সমর্থন করা উচিত নয়।

লুতুফের জিহ্বায় যতখানি বিষ ছিল, সে সেই নবপ্রসূতির ওপর প্রয়োগ করলো। একবারও ভাবলো না। একবার যদি তলিয়ে ভাবতো, তাহলে একজন নিরপরাধিনীকে অমনভাবে আঘাত করতো না। কন্যা বা পুত্র জন্মের জন্যে সে কেন দায়ী হবে? দায়ী যদি কেউ হয়, তাহলে যিনি জগৎ নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনি দায়ী। কারুর যদি কিছু অভিযোগ থাকে, তাহলে তার কাছে করা উচিত।

হানিফ প্রথম থেকেই জেমিলির শত্রু। জেমিলিকে কোনদিন সে আম্মা বলেনি! এমন কি এক নষ্টা আওরত বলেই আখ্যা দিয়েছিল। সেই হানিফ কন্যাসন্তান আবিভাবে নিজের জয়লাভে নিজেই অট্টহাস্য করে উঠলো।

জয় তার। সে মরদ। মরদের মূল্য জগতে সবচেয়ে বেশী। তাছাড়া পিতা যে তার পুত্রকেই বিশেষ প্রাধান্য দেবেন, এই কথা ভেবে হানিফ আনন্দিত। জেমিলি হোক নষ্টা আওরত, তবু তার পিতার শাদী করা জোরু। সেই জোরুর গর্ভে যদি

পুত্র আসতো, তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীর চিন্তায় দুর্ভাবনা জাগতো।

আর জেমিলি তখন কান্নাকে সম্বল করে সেই কন্যাশিশুর মুখখানির দিকে তাকিয়ে কি করবে ভেবে চলেছে। দেবে কি তাকে চিরতরে শেষ করে? একটুকরো সদ্য-প্রস্ফুটিত কুসুম প্রকৃতি আলোয় চঞ্চলতা প্রকাশ করছে। সে জানে না তার ভবিষ্যৎ। যখন তার জ্ঞান হবে, সে যখন জগতের সৌন্দর্যের মাঝে নিজের স্বাতন্ত্র্য চাইবে, তখন তার অবস্থা কি হবে? সেই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই জেমিলি সেইমুহূর্তে শোকার্ত হল। তাই বার বার সে শোকার্ত হৃদয়ে নবশিশুকে দেখতে লাগলো। শিশু হাত-পা নেড়ে চোখের অবাক চাউনি নিয়ে দেখছে। সে হাসছে, খেলছে, জেমিলির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

এই শিশুকে সে হত্যা করতে চায়? জেমিলি নিজের বুকের ভেতর কেমন যেন আন্দোলন অনুভব করলো। অন্য কেউ এই শিশুকে অবহেলা করুক, কিন্তু সে পারে না। সে মা, তার গর্ভে এই শিশু দশমাস স্থান পেয়ে তাকে মায়ার বন্ধনে বেঁধেছে।

তারপর নিজের কথা স্মরণ হল, তারও জন্ম তো এমনিভাবে হয়েছিল। সে জানে না, তার বাপ-মা কে? জ্ঞান হবার পর এক অনাত্মীয়ার কাছে মানুষ। সে যখন বেঁচে আছে, তখন তার এই কন্যা বাঁচবে না কেন? আর দুঃখ, সে যদি কপালে লেখা থাকে খণ্ডাবে কে?

হঠাৎ জেমিলি নিজের বেদনায় নিজেই সান্ত্বনা পেয়ে কেমন যেন শান্তি অনুভব করলো। এই শত্রু পরিবেষ্টিত আশ্রয়কেন্দ্রে যখন তাকে থাকতে হবে তখন অসহ্যতা প্রকাশ করে লাভ কিছু হবে না বরং জীবনই সংশয় হবে। যে একদিন আদর করে মহব্বতের সোহাগ দিয়ে সম্মান দিয়েছিল, তার স্বভাব এখন ভিন্নপথ গ্রহণ করেছে।

আরববাসীরা কন্যা জন্মদিলে যে এত ক্ষিপ্ত হয়, সেই কথা ভেবেই আরো আশ্চর্য হল।

মুন্না, মুন্না, মুন্না।

জেমিলির সেই শিশু একদিন দাঁড়াবার শক্তি জয় করে, সমস্ত বাড়িময় প্রদক্ষিণ করে বেড়াতে লাগলো। তার কলস্বরে পক্ষীরা পর্যন্ত স্তব্ধ হল। তার চঞ্চলতায় বৃক্ষপত্র বাতাসের দোলায় দুলতে ভুলে গেল। মুন্না কথা বলে। এমন স্বরে কথা বলে যার ভাষা ঐ পক্ষীদের সঙ্গেই তুলনীয়। মানুষ না বুঝতে পেরে তাকে বোকা বলে। শিশু সূর্যের রশ্মি আলোকের দিকে তাকিয়ে অন্য এক দীপ্তিশোভা মুখে প্রজ্বলিত করে হাসে। তার হাসিতে লুতুফ আলির বাড়ির সীমা পরিধি মুখর হয়। মুখর হয় প্রকৃতি। মুখর হয় জগৎ। মুখর হয় ঐ নীহারিকার ওপারে কোন আর একটি জগৎ।

এই শিশু যদি এ বাড়ির আদরের সম্পদ হত, তাহলে তার এই শিশুচপলতার পুরস্কার সে পেত। তার আব্বা লুতুফ আলি দিত। ভাইজান হানিফ দিত। আর জেমিলির তো কথা নেই। যখন কেউ এই শিশুকে একটু আদর দেয় না, তখন সেই জেমিলির সমস্ত মন এই শিশুর জন্যে কাতর হয়। তার রমণীজীবনের ভালবাসা। যে ভালবাসা দয়িতকে দেওয়ার জন্যে তার একাগ্রতা ছিল কিন্তু শাদীর পর হানিফের আচরণ, লুতুফ আলির নিস্পৃহ ভাব তাকে সে ভালবাসা প্রদানে বাধা দিয়েছিল। সেই ভালবাসার রূপান্তর আজ স্নেহে পরিণত হল, শুধু তার পেটের সন্তান ঐ মুন্নাকে দেখে। তাই কেউ যখন তাকে ভালবাসলো না, কেবল অনাদরই করলো তখন তার সমস্ত ভালবাসা ঐ মুন্নার জন্যেই ব্যয়িত হল।

মুন্না শিশু। দু'বছর তখনও তার উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু তার দীপ্তবুদ্ধি যেন জেমিলিকে চমকিত করলো। লুতুফ আলি ও হানিফের অবহেলা ঐ বালিকাকে যেন পীড়া দিল। ঐ লোক দুটি কে? ওরা আমাকে ভালবাসে না কেন? আমাকে কেবল তিরস্কার করে কেন? ইত্যাদি প্রশ্ন তার মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়ে সে দুর্বোধ্য ভাষায় মাকে বোঝাতে চাইলো। মা, আমি কি সত্যিই মন্দ? ওরা আমাকে ভালবাসে না কেন?

তবে ওরা শয়তান, আমি ভাল। ওরা বদ্‌লোক বলে আমাকে সহ্য করতে পারে না।

জেমিলি মেয়েকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলে,—ছিঃ মুন্না। ওরা তোমার আব্বা ও ভাইজান, ওদের নামে ওকথা বলতে নেই।

মুন্না বুঝতে পারে না। বৃদ্ধটা যদি তার পিতা হয়, তাহলে তাকে আম্মার মত বুকে জড়িয়ে ধরে না কেন? কেন কাছে গেলে মুখ বিকৃত করে তাড়া দিয়ে তাড়িয়ে দেয়? আর ছেলেটা যেন কেমন শয়তান। সর্বদা চোখ পাকিয়ে কেন যেন নীরবে শাসন করে। কিছু অন্যায় করে ফেললে তো আর কথা নেই। যেন মহা অপরাধ করেছে এমনিভাবে তর্জন-গর্জন করতে করতে ছুটে আসবে। আর আম্মা বলে, ওরা একজন আব্বা ও আর একজন ভাই।

আব্বা ও ভাইজান না ছাই। তাই যদি হত তাহলে এমনি ব্যবহার করত?

মুন্না মুখে এসব কথা বলে না। কিন্তু তার মনের কথা মুখে প্রতিফলিত হয়।

জেমিলি তাই দেখে অন্তরালে চোখ মোছে।

তার গর্ভে কন্যাসন্তান এসেছে বলেই কি এমনি অবহেলা? না, পুত্রসন্তান এলেও মনে হয় এই অবহেলা থাকত. তবে একটু ভয় হয়তো এই দুর্জনদের থাকতো, এই শিশু একদিন বড় হবে, হলে এই অবহেলার প্রতিশোধ নেবে।

আরববাসীরা কন্যাসন্তানের প্রতি এমনিতেই ক্ষিপ্ত। তারা বলে, যে বাড়িতে কন্যা-সন্তান জন্মায়, সে বাড়ির ধ্বংস যেন খুবই দ্রুত সাধিত হয়। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, কন্যা না হলে রমণী না থাকলে সৃষ্টি কেমন করে স্থায়ী হবে? তারা বলে, অন্যদেশের কন্যা নিয়ে এসে শাদী করলেই তা পূরণ হবে।

জেমিলি আরববাসীর এই নীতির কোন অর্থ বুঝতে পারে না। একটি পরিবারে একটি কন্যা জন্ম নিলে সে যখন বড় হয়ে ওঠে তখন নাকি সে পুরুষের শক্তিকে খর্ব করে। রূপসী সেই কন্যার জন্যে বহু পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ হয়! এটা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। সেইজন্য তারা কন্যা জন্ম নিলে জয়ধ্বনি করে না, রোদনধ্বনিতে আকাশ মুখরিত করে।

কেউ কেউ আবার চরমদণ্ড দিয়ে সেই শিশুকন্যাটিকে জীয়ন্ত মাটির তলায় কবরে শায়িত করে।

জেমিলি সেই কথা ভেবে সবসময় নিজের কন্যাটির জন্যে সতর্ক হয়ে থাকে। তার ভয় হয়, আরবদেশের সেই নীতি যেন তার কন্যার ওপরই প্রযোজ্য হবে।

এমনি সতর্ক থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা লুতুফ আলিও তার বেটা হানিফের কথা তার কানে গেল।

তাদের ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘর থেকে চাপা-স্বরের কথোপকথন শুনতে পেল। বিশেষ করে হানিফের কণ্ঠই সোচ্চার। জেমিলি দাঁড়াতো না। পিতাপুত্রের এই মিলন বহুদিন ধরে চলে আসছিল। পুত্রের অধিকারে পিতার সমর্থন উৎসাহ ব্যঞ্জক। এর জন্যে অবশ্য জে'মলির কোন দুঃখ নেই। তার সুখ তো শাদীর পরেই শেষ হয়ে গেছে। সে সুখের জন্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে না। সুখ যদি জীবনে না থাকে, তাহলে কার সাধ্য ঐ দুর্লভবস্তু দেয়। তাই প্রথমে দুঃখ মনে জাগলেও পরে জেমিলি নিজেকে সংযত করে নিয়েছিল। সে নীরবে ঐ পিতা ও পুত্রকেই আজীবন স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখবার সংকল্প নিয়েছিল।

না, ঈর্ষা, কোন ছিল না। স্বাভাবিকতা ছাড়িয়ে ঈর্ষাকে সে জয় করেছিল। তাই লুতুফ আলি তার স্বামী কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতেও সে নিজের চাহিদার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে ক্ষিপ্ত হয় নি।

হঠাৎ তাই 'মুন্না'র কথা সেই দুই পিতা ও পুত্রের মুখে শুনে সে থমকে দাঁড়ালো। কান পাতলো দেয়ালের গাত্রে। এ স্বভাব তার ছিল না। আড়ি পেতে কিছু শোনা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। তবু মুন্নার জন্যে সে সব করতে পারে। ওযে শুধু সন্তান নয়, ও আজ তার সমস্ত জীবনের সহন প্রতিচ্ছবি। না, আশা, আকাঙ্ক্ষা সব তার শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধু জীবন ধারণের প্রশ্ন আর সেই জীবন মুন্নাকে কেন্দ্র করে। মুন্নাকে বড় করতে হবে। মুন্নাকে মানুষ করতে হবে। মুন্নার উপস্থিতি জগতের বুকে প্রতিষ্ঠিত করে সে বিদায় নেবে। বহুদিনের বঁ চবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাই সে আজকাল আর অল্প আঘাতে ভেঙে পড়ে না।

তাই মুন্নার কথা শুনে শ্রবণশক্তি তীক্ষ্ণ করে সে অন্ধকার গলিপথে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার কানে গেল, হানিফের চাপা অথচ সোচ্চার কণ্ঠস্বর। সে তার পিতাকে বলছিল—আব্বা, আমি সব ব্যবস্থা পাকা করেছি। মুন্নাকে কাল সকালেই আমি চুরি করে নিয়ে পালাবো। তোমাকে মুন্নার আম্মা জিজ্ঞেস করলে একটা গল্প বানিয়ে দিও। বলবে, তাকে শহরে পাঠানো হয়েছে। আমাদের এক আত্মীয়

দেখতে চেয়েছে। আমার নাম যেন ক'র না। কারণ আমি মুন্নাকে বেচে দিয়ে সন্ধ্যা নাগাত গ্রামে এসে পৌঁছবো। তখন যদি আমাকে মুন্নার আম্মা কিছু জিজ্ঞেস করে তাহলে ফ্যাসাদে পড়বো। পরে বিক্রির টাকা তাকে দিয়ে দিলেই হবে। এক সওদাগর পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রায় মেয়েটিকে কিনতে চেয়েছে। কিন্তু আমি তাকে দশটি স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত রাজী করিয়েছি।

জেমিলি আর সেখানে দাঁড়ালো না। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের মধ্যে এক বিদ্যুৎ প্রবাহ সমস্ত সংযম ভেঙে দিল। কেমন যেন বুকের মধ্যে এক অস্বাভাবিক যন্ত্রণার সৃষ্টি হল। মুন্নাকে এরা নিয়ে চলে যাবে? তাকে বিক্রি করবে? এ যে না শোনা পর্যন্ত বিশ্বাস করা যায় না। অথচ এইমাত্র নিজের কানে শুনে এল। নিজের কানে শোনা কথা তো অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।

হানিফ শত্রু হতে পারে। সে প্রথম থেকেই তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। তার কথা না হয় স্বতন্ত্র কিন্তু লুতুফ আলির একি আচরণ? নিজের কন্যাকে সে বিক্রি করে দিচ্ছে এক সওদাগরের কাছে? না, না এ একেবারেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। নিশ্চয় সে শুনতে ভুল করেছে। লুতুফ আলি সেখানে ছিল না, ছিল অন্য লোক। হানিফ তার সঙ্গেই ষড়যন্ত্র করছে।

তবু বিশ্বাস করতে হবে এইজন্যে যে, আলিসাহেবের কণ্ঠস্বর তার অপরিচিত নয়।

বেটা, কাজটা খুব সাবধানে করবি।

জেমিলি ছুটে চলে এল নিজের ঘরে। ঘরে স্বল্প আলোর একটি প্রদীপ জ্বলছে। সেই হলুদ আলোয় সে মুন্নার ঘুমন্ত নিষ্পাপ মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সে আর নিজেকে রোধ করতে পারলো না। দু'চোখে শ্রাবণের ধারা নিয়ে, বক্ষের অস্বাভাবিক যন্ত্রণা নিয়ে সে আছড়ে পড়লো সেই ঘুমন্ত মুন্নার ছোট্ট দেহের ওপর। সেই ঘুমন্ত দেহটিকে দু'বাহু দিয়ে বুকের মধ্যে চেপে ধরে জেমিলি কি করবে ভেবে পেল না। কি করে মুন্নাকে এই শয়তানদের কবল থেকে রক্ষা করবে ভেবে না পেয়ে আরো দিশেহারা হয়ে পড়লো। আগামী কাল প্রত্যুষে হানিফ মুন্নাকে নিয়ে পালাবে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তারপর আর তার মুন্না থাকবে না। পৃথিবীর কোথায় মুন্না চলে যাবে জানতেও পারবে না। তারপর সব শূন্য হয়ে যাবে। এই জীবন ধারণ, এই সংযম রক্ষা, সব অত্যাচারের বেদনা সয়েও বেঁচে থাকা সব শেষ হয়ে যাবে।

জেমিলি ঘুমন্ত মুন্নাকে জড়িয়ে ধরে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলো। মুন্নাকে সে কি এই ক্ষুধিত শার্দুলের কবল থেকে রক্ষা করতে পারে না? পারে না এই গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে? একদিন সে তো কত দেশবিদেশ পর্যটন করেছে! তখন কত আদমী তাকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে আসতো। আজ কেউ আসবে না? আজ কেউ তাকে আশ্রয় দিয়ে এই শিশুকে বড় করতে সাহায্য করবে না?

কিন্তু উত্তর নিজেই দিল। না, আজ তার রমণী জীবন অন্ধ খাদে প্রবাহিত হয়েছে। নদীতে প্রথম জোয়ার এলে প্রকৃতির যে আনন্দ, তারপর পুরোনো হয়ে গেলে কি আনন্দ থাকে? তেমনি তার বয়সে আজ ভাটার টান। তাছাড়া তার

রূপের আর সে চেকনাই নেই। এখন সে জননী। একটি সন্তানের জননী হয়ে সে রমণীর প্রাথমিক ধর্ম থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে। একদিন শাহপীরের দরগায় লুতুফ আলি যে রূপসী নর্তকীকে দেখে শাদীর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ইচ্ছে করেই সে রূপ সে ঢাকা দিয়েছে। আর কি হবে ? রমণীর কাম্য তো তার পাওয়া হয়ে গেছে। শাদীর সম্মান দিয়ে এক পুরুষ তাকে আসন দিয়েছিল, তারপর এসেছে এক সন্তান। এখন সেই সন্তানকে অবলম্বন করে যা কিছু চিন্তা।

তাই জেমিলি মুন্নাকে অবলম্বন করেই সমস্ত অবহেলা ভুলেছিল। না হলে লুতুফ আলির পরবর্তী আচরণে সে বিক্ষুব্ধ হয়ে হয়তো নিজের জীবন সংশয় করতো।

সে যাক্‌গে। এখন এই রাত্রে উপায় কি ?

কোন উপায় নেই। প্রভাত হলে মুন্নাকে নিয়ে চলে যাবে। আর জেমিলি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। তারপর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মেঝেতে পড়ে এক যুগ ধরে কাঁদবে ? এ ছাড়া অসহায় রমণীর আর কি করার থাকতে পারে ? আর যদি নাটকীয় কোন ঘটনার সম্মুখীন হয়, তাহলে না হয় লুতুফ আলিকে গিয়ে কৈফিয়ত তলব করতে পারে কিন্তু সে তার দ্বারা সম্ভব নয়। শুধু চিৎকার করে কতকগুলি কথা আদান প্রদান করলে কি মুন্না ফিরে আসবে ? মুন্নাকে তারা ফিরিয়ে দেবে ? যদি ফিরিয়ে দিত, তাহলে চিৎকার করে কিছু লাভ হ'ত।

জেমিলি কেমন অসহায়ের মত ভাবতে ভাবতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে মুন্নাকে জড়িয়ে ধরেই ঘুমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ বাড়িতে অনেক লোকের গোলমালে তার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি চেয়ে দেখলো পাশে। না, মুন্না তার বুকের কাছেই নিদ্রিতা হয়ে আছে। নিশ্চিন্ত হয়ে তারপর সে বিস্ময়ে ভাবলো—তাহলে গোলমাল কিসের ?

তখন প্রভাত হয়ে গেছে। গবাক্ষ দিয়ে প্রভাতের আলো ঘরের অন্ধকার দূর করেছে। পাখী ডাকছে কলস্বরে। হঠাৎ সে কানটি তীক্ষ্ণ করে বাইরে গোলমালের অর্থ জানতে চাইলো।

কিন্তু যা তার কানে গেল তাতে সে শুধু বিস্মিত হল না, স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তার স্বামী, হ্যাঁ স্বামীই সে। লুতুফ আলি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতে গিয়েছিল। অসাবধানে কূয়োতে পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। জীবন এখন সংশয়।

জেমিলি শুয়ে শুয়ে সেই দুর্ঘটনা শুনে পরম নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে খোদা তার প্রার্থনা শুনেছে। মুন্নাকে এবার নিশ্চয় হানিফ আর নিয়ে যাবে না। এখন এই অবস্থায় কি আর সে ওসব কথা মনে রাখবে ?

জেমিলির কানে আরো কোলাহল প্রবেশ করলো। সেই কোলাহলের মধ্যে তার নামটাও শুনতে পেল। সে বিস্ময়ে ভাবলো,—ওরা কেন তার নাম করছে ? ওকে কি দরকার ? আলিসাহেব আঘাত পেয়েছে, তারই পরিচর্যা করা উচিত। তবে কি মুন্নাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে কোথাও চালান দেবার ষড়যন্ত্র চলছে ? যদি তাই হয়, সে নিশ্চিন্ত। কিন্তু তাই কি ? মনে হয়, ওরা তার সাহায্যের জন্যে তার নাম

করছে। এখন তারই পরিচর্যার দরকার। অন্তত স্ত্রীর কর্তব্য কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্য সে করবে কেন? স্বামী তার কর্তব্য করেছে? স্বামী তাকে কি দিয়েছে যে, আজ সে স্বামীকে শুশ্রূষা করবে? স্বামীর এই দুরবস্থার জন্যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যাবে?

না, সে কিছুতে যাবে না। লুতুফ আলি যদি এই আঘাতে মারা যায়, তবু না। যে স্বামী তার কিছুক্ষণ আগে সম্বল, দুঃখের সান্ত্বনা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে চিরতরে সরিয়ে দিচ্ছিল, তাকে এখন সে অনুগ্রহ প্রদর্শন করবে? কেন তার কি কোন মূল্য নেই? সে ঐ লোকটির কাছে নগণ্য? কেন? কেন? কেন? শাদীর পূর্বে যে কবুল করেছিল, তার কতটুকু সে রাখলো? ইদানীং মুন্না জন্মাবার পর তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ লুতুফ আলি তুলে দিয়েছে। এখন সে লড়কার ঘরে রাত্রিবেলায় শোয়। সুতরাং সম্বন্ধ যখন নেই তখন মায়া কোথায়? মায়া, মমতা তার যখন নিশ্চিহ্ন হয়েছে তখন জেমিলির থাকবে কেন?

অনেকক্ষণ শুয়ে থাকার পর কি ভেবে জেমিলি উঠে পড়লো। না, সে দর্শকের ভূমিকা নেবে। অন্তত কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যে সে নিরুদ্বেগে চোখ দুটি মেলে থাকবে যেমন শত্রুর কোন সর্বনাশ হলে মানুষ চেয়ে থাকে, তেমনি।

এই ভেবে সে মুন্নাকে আদর করে সোহাগ দিয়ে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

দরজার মুখেই হানিফের সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত হয়ে তার কাছেই আসছিল। জেমিলিকে দেখে বললো,—তুমি কি সরাব পান করে ঘুমোচ্ছিলে? বাড়িতে কি কাণ্ড হয়ে গেল?

জেমিলির ইচ্ছে করলো হানিফকে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে দেয়। এই ছেলেটির জন্যে আজ তার আশা আকাঙ্ক্ষা অন্তর্হিত। এই ছেলেটিই তার মুন্নাকে বেচে দিয়ে আসছিল। কিন্তু কিছু সে বললো না। শুধু তার ভ্রূ দুটোয় একটু কুঞ্চন সৃষ্টি হল।

হানিফ আবার বললো,—আব্বা কূয়োর মধ্যে পড়ে গিয়ে একেবারে শেষ হয়ে গেছে। বোধ হয় তার প্রাণ সংশয়। জ্ঞান এখনও আছে, তবে আর বেশীক্ষণ থাকবে বলে মনে হয় না। হেকিম দাওয়াই দিয়ে গেছে, বলে গেছে শুশ্রূষার দরকার।

জেমিলি একটি কথাও বললো না। শুধু মন দিয়ে কথাগুলি শুনে একবার হানিফের দিকে আড়চোখে তাকালো। তাকালো এইজন্যে যে, হানিফের চোখে জল আছে কিনা দেখতে চাইলো। দেখতে চাইলো আব্বার জন্যে কতখানি কাতরতা, কতখানি উদ্বেগ তার মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে কিন্তু দেখতে পেল না, বোধ হয় বুঝতে পেরে মুখ সরিয়ে নিয়েছে।

মনে মনে শুধু হাসলো জেমিলি। বাঃ উপযুক্ত ছেলে বটে! আর এরই জন্যে আলি সাহেব আজকে তাকে অবহেলা করলো। তাকে সরিয়ে দিতে চাইলো। তার না হয় অপরাধ আছে, কারণ সে বেটার স্নেহ থেকে সরিয়ে নিয়ে লুতুফ আলিকে অন্ত মানুষে পরিণত করেতে চেয়েছিল। কিন্তু মুন্না? মুন্না কি দোষ করেছিল? একটি নিষ্পাপ সরল শিশু যে পৃথিবীর কিছুই জানে না। তাকে ঐ পাষাণ মানুষ চিরতরে সরিয়ে দিতে চাইলো! অথচ সে ভালভাবে জানে, পিতার পরিচয় সে অস্বীকার

করতে পারবে না। পিতা হয়ে কন্যার প্রতি এই অবিচার—না, জেমিলি আর ভাবতে পারলো না। শুধু একটি দীর্ঘশ্বাস তার বুক চিরে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এল।

তখন বাড়ির চতুর্দিকে অনেক লোক। কোটানার অধিবাসীরা যে লুতুফ আলিকে কত ভালবাসে, এই এত লোকের সমাবেশ দেখে তা প্রতীয়মান হয়।

জেমিলিকে দেখে তারা সরে দাঁড়ালো। কেউ কেউ কি যেন চাপা স্বরে মন্তব্য করলো। মন্তব্যের কথাগুলি জেমিলির কানে গেল না কিন্তু কেমন যেন তার ভ্রূ জোড়ায় আবার কুঞ্চন জেগে উঠলো। তার নামে কোটানাবাসীর যে অনেক কৌতূহল, এই চাপা স্বরের কথাবার্তাতেই মনে হয়। তারা যে তাকে ভাল চোখে দেখে না, তাও তাদের মুখের ওপর প্রতিফলিত। দোষ এদের কি? আলি সাহেব যদি তার সম্মান দিয়ে জোরুর সম্মান রক্ষা করতো তাহলে কি এরা সাহস প্রকাশ করতে পারতো? এরা তার পূর্বজীবনের ইতিহাস নিয়ে নানান কথা বলে। বলে তাতে তার কোন দুঃখ নেই। হ্যাঁ, সে নর্তকী ছিল। এ কথা আলি সাহেব ভালভাবেই জানতো। তার জন্মের কোন ইতিহাস সে জানে না, তাও আলি সাহেবের অজ্ঞাত নয়। সব জেনেই তো শাদী করতে উৎসাহিত হয়েছিল। তবে কেন আজকে এই সব বিশ্রী মন্তব্য তাকে শুনতে হচ্ছে?

লোকের ভিড় ঠেলে এবার সে আসল ব্যক্তিটির কাছে গিয়ে হাজির হল। যার কাছে তার সহস্র অভিযোগ। যার কাছে তার অনেক কৈফিয়ত চাইবার আছে। যে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জীবন থেকে তুলে নিয়ে এসে রমণী জীবনের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কৃতজ্ঞ সে সত্যিই থাকতো। যদি তার পরবর্তী জীবনের মাঝে সুখের স্রোতধারা প্রবাহিত হত। যাক্‌গে সেই মানুষটির সামনে গিয়ে সে উপস্থিত হল। লুতুফ আলির দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠলো। একি শেষ-পর্যন্ত এই পরিণাম হয়েছে?

স্বাস্থ্যবান সুন্দর লোকটি। বয়েস হলেও বয়সের সেই ভাটা তার শরীরের কোথাও ছিল না। শুধু কেমন যেন দিন দিন কর্মঠ শরীরটি নিস্তেজ হয়ে আসছিল। চোখের মধ্যে সেই আগের দীপ্তি নেই। তবু তাও ভাল ছিল কিন্তু একি হয়েছে? মুখটি একেবারে চেনাই যায় না। কেমন যেন একরাত্রে মুখটি পালটে গেছে? কে যেন সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে। পাণ্ডুরবর্ণ মুখাকৃতি। তার ওপর সমস্ত শরীরটি যন্ত্রণায় কাতর। শরীরের কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যে ভেঙেছে, জেমিলি সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলো না। শুধু বিকৃত আকৃতির দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো কিন্তু সে অবাক হল, লুতুফ আলির শুষ্ক মুখখানি দেখে। হঠাৎ গতরাত্রে কি এমন তার হল, যার জন্যে তার মুখের রক্ত সব শুকিয়ে গেল? তারপর কি একটা কথা ভেবে সে বিস্ময়ে মনে মনে বললো,—তবে কি মুন্নাকে সরিয়ে দিতে হবে বলে পিতা তার পিতৃস্নেহের স্রোতধারায় নিজে অবগাহন করেছে? আর সেইজন্যে তার মুখের চেহারা এইরকম! আসলে এখন কুয়োয় পড়ে গিয়ে আঘাতের বেদনা তার চরম নয়। চরম আঘাত সে গত-রাত্রিতেই পেয়েছে। পেয়েই আজ সকালে ইচ্ছে করে অঘটন ঘটিয়ে মুন্নার যাওয়া

স্থগিত করেছে।

এই কথা ভেবে হঠাৎ সে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলো। লুতুফ আলিকে আজকে তার বড় ভাল লাগলো। মনে হল এই তার যথার্থ স্বামী। এই তার সমস্ত জীবনের আরাধ্য। এই কথা যখন তার মনে এল, তখন আর সে অপেক্ষা করতে পারলো না। হঠাৎ স্বামীর জন্যে দারুণ দুশ্চিন্তা মনে নিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে লুতুফ আলির সামনে বসে পড়লো, ব্যগ্র হয়ে বললো,—কেমন আছ গো? আঘাত কি খুব বেশী?

লুতুফ শুধু ম্লান হাসলো, কোন কথা বললো না।

জেমিলি বহুকাল পরে স্বামীর মাথার চুলে নিজের আঙুলগুলি পুরে দিয়ে সেবাদান করলো। আবার সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো— হঠাৎ পড়ে গেল কেমন করে? রাত্রে কি ঘুম হয়নি?

লুতুফ আলির জ্ঞান ছিল। জেমিলির সব কথাই সে বুঝতে পারছিল কিন্তু কোন উত্তর দিতে পারছিল না। উত্তর দেবার জন্যে সে বার বার চেষ্টা করেছিল কিন্তু কেমন যেন কণ্ঠচিরে উত্তর বাইরে বের হচ্ছিল না। শুধু একসময় সে নিজের হাতখানি পরম নির্ভরতায় জেমিলির হাতের ওপর তুলে দিল। আর ঠোঁটের কোণে তার একটুকরো ম্লান হাসি জেগে উঠলো।

আরো অনেকগুলি দিন বিদায় নিল।

লুতুফ আলি সে যাত্রা উদ্ধার পেয়ে গেল, কিন্তু প্রাণ বাঁচলেও রোগ নিরাময় হল না। রোগের ছায়া তার সমস্ত শরীর ঘিরে উপস্থিতি জাগিয়ে রাখলো। সে সেই রোগের সঙ্গী হয়ে আর জেমিলির সেবা নিয়ে শয্যার ওপর অনন্ত দিনের জন্যে বিশ্রাম নিল। জেমিলির তাতে উপকার হল। সে স্বামীর অনেক কাছে গিয়ে পৌছলো। একেবারে নাগালের মধ্যে। স্বামীর শক্তি যখন ছিল সে দূরে নির্বাসিতা হয়েছিল। স্বামী অক্ষম হতে তার লাভই হল। সেই শাদীর প্রথমাবস্থার মত সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো।

আর লুতুফ আলি তার বিগত দিনের সব ইতিহাস জেমিলির কাছে পেশ করলো। কেন সে তাকে অবহেলা করেছিল? কেন মুন্নাকে সরাবার জন্যে সে হানিফের ষড়যন্ত্র সমর্থন করেছিল। সব, সব। এমন কি মুন্নাকে কেন সে পিতৃস্নেহ দেয় নি, তারও সম্বন্ধে যুক্তি। মুন্না চলে যাবে, তাকে সরিয়ে দেওয়া হবে, একথা ভেবেও সে সেরাত্রে ঘুমোতে পারেনি এবং পরদিন কেন সে ইচ্ছে করে কূয়োর মধ্যে পড়ে গেল? কূয়োর মধ্যে না পডে গেলে যে হানিফ ঠিক মুন্নাকে নিয়ে যেত সে জানতো। শেষকালে নিজের প্রাণটা দিয়ে বেটিকে বাঁচালে!

তার উত্তরে জেমিলি বললে,—তুমি এতটা না করলে পারতে।

লুতুফ আলি চুপ করে থেকে বললো,—তোমাকে আমার সে রাত্রের অবস্থা বোঝাতে পারবো না। মেয়েটিকে ছোটবেলা থেকে অবহেলা করেছি সতিকথা কিন্তু তাকে হারানোর কথা ভেবে সে রাত্রে কি যে মনে বেদনা সহ্য করেছি, তা বোঝাতে পারবো না। তখনই বুঝতে পারলাম—আমি অবহেলা করবার চেষ্টা করলেও, আমার মন তার পিতৃস্নেহ থেকে সেই শিশুকে বঞ্চিত করে নি।

লুতুফ আলি তারপর অনেক কথাই সেই রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় বলেছিল। কিন্তু একটি কথা সে বলেনি, সে হল হানিফের কথা। হানিফকে সে যে কেন ভয় করে? শুধু ভয় করে না, হানিফের ওপর তার দুর্বলতাও আছে। সেই কথাটি লাখো কথার মধ্যে একবারও জেমিলির কাছে প্রকাশ করে নি। অনেক দূরত্ব, অনেক ব্যবধান নষ্ট হবার পর অনেক কাছাকাছি জেমিলি চলে এসেছিল। এখন আর লুতুফ আলি জেমিলিকে কাছ ছাড়া করে না। প্রায় অনেক সময়ে সে জেমিলিকে তার শিয়রে ধরে রাখে। মুন্নাও বা' যায় না। মুন্নাকেও লুতুফ আলি তার শীর্ণহাতের বেষ্টনে স্নেহ দান করে। মুন্না অবাক দুটি চোখ নিযে বিস্ময়ে পিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। আর হয়তো ভাবে, এতদিন এই লোকটি কেন তার শত্রু ছিল, আর হঠাৎ মিত্র হল কেন? মিত্র না হলেই বুঝি ভাল ছিল। লোকটি একেবারে ভাল নয়।

সেই কথা সে তার আম্মাকে একসময় বললো,—তুমি কেন ঐ লোকটাকে অত যত্ন কর? আমার ওকে একটুও ভাল লাগে না। যদিও মুন্না এত স্পষ্ট করে সব কথা বলেনি তবু জেমিলির বুঝতে কষ্ট হয় নি।

কিন্তু জেমিলি গিয়ে ঐ লোকটিকে সে কথা বলে দিতে মুন্না মায়ের ব্যবহারে চমকিত হল। সে বুঝে উঠতে পারলো না, মা কেন হঠাৎ পালটে গেল? এমন তো আগে ছিল না!

আর লুতুফ আলি সেই ছোট্ট মেয়েটির মনের কথা বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বললো,—ওর কি দোষ? সব আমারই দোষ। তারপর জেমিলিকে বললো,—আমি তোমার জীবন যেমন নষ্ট করলাম, মুন্নারও। মুন্নাকে তুমি ভালভাবে মানুষ কর। হানিফ কথা দিয়েছে, মুন্নাকে বহিনের মত দেখবে।

হানিফও সেই ঘটনা ঘটে যাবার পর কেমন যেন ভালমানুষে পরিণত হয়েছিল। কেমন যেন সে জেমিলির অনুগত হয়ে ছেলের মত আচরণ করলো। যে আম্মা ডাক কোনদিনও সে ডাকে নি, সেই মা ডাক দিয়ে জেমিলিকে সে সম্মান করলো। জেমিলি অতীতের সমস্ত দুঃখ ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে হানিফকে স্নেহদান করলো।

আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ।

একটি ঘটনা কিন্তু সামান্য নয় সে ঘটনা। তাকে কেন্দ্র করে এই পরিবর্তন হতে জেমিলি ভাবে, স্বামী তার অনেক বড় উপকার সাধন করেছে। সে যদি এই অঘটন না ঘটাতো তাহলে এই পরিবর্তন আসতো না। এই পরিবারের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসছিল, হয়তো, ধ্বংস হতে আর বেশী দেরি হত না। সে সময় এই আলোর উজ্জ্বলতা সকলকেই আবার নতুন স্পর্শ দিল। তাই সে বার বার স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ

হল। মিলনের এই আনন্দে সে অকপটে স্বীকার করলো,—তুমি যদি ঐ কাণ্ডটা না করতে এই মিলন সাধিত হত না। আজ আমার কি যে ভাল লাগছে, তোমাকে কি করে বোঝাবো ?

লুতুফ আলি শুধু ম্লানমুখে খুশিতে উজ্জ্বল স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সত্যিই সে আজ এই মিলন সম্ভব করে দিতে পেরেছে ভেবে শান্তি পেয়েছে। এই শান্তিই তার দরকার ছিল। এই মিলনই সে সম্ভব করার আপ্রাণ চেষ্টা বহুদিন ধরে করছিল, এ কে জানে ? আজ নিজের জীবন সংশয় হয়েছে। হয়তো এই রোগ-শয্যা থেকেই একদিন কবরে শায়িত হবে। তা হোক্ গে। তার আর বেঁচে লাভ কি ? এখন হানিফ বড় হয়েছে। উপযুক্ত হয়েছে। সে এই ব্যবসা, বাড়িঘর, সম্পত্তি সবই দেখতে পারে। হয়তো কাচা বয়সের জন্যে একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছে। আর বদরাগী। হঠাৎ যেটা করবে বলে সে করে। ঠিক বাপের মত। লুতুফ আলিও যে একদিন এমনি ছিল, সে কথা ভেবে আজ মনে মনে হাসে। আর সেই জন্যে সে নিশ্চিন্ত এই ভেবে যে বয়সে হলে হানিফও তারই মত হবে।

তবে এসব কথা অনেক পরের।

জেমিলিকে শাদীর আগে হানিফের সম্বন্ধে এসব কথা সে ভাবতে পারে নি। যখন হানিফের সম্বন্ধে তার দুর্ভাবনাই ছিল। তাই জেমিলিকে দেখবার পর শুধু তার মনের জন্যে এই শাদীকে সমর্থন করে নি। জেমিলিকে দেখে যেমন ফতুমা, শাওনী, দুই সোনীর ছায়া দেখেছিল, তেমনি পরমনির্ভরতা এসেছিল এই ভেবে যে, এই আওরতটি তার ঘর আলো করলে শুধু তারই মনের অন্ধকার দূর হবে না। বিদূরিত হবে মনের যত দুশ্চিন্তা। তার অবর্তমানে হানিফকে সৎপথে চালিত করবার জন্যেই এই শাদীর প্রয়োজন ছিল। হানিফ একজনের প্রহরাধীনে জীবন অতিবাহিত করবে আর তার বহু আয়াসে সঞ্চিত ধনসম্পত্তি রক্ষা পাবে। কিন্তু জেমিলিকে দেখে হানিফের আচরণ ভিন্নমুখী হল। সে পিতার জোরুকে এমনভাবে অসম্মান করলো, যা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায়। কিন্তু সেই অন্যায় কে সমর্থন করবে ?

লুতুফ আলির মনের সঙ্কল্প আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিচ্ছিন্ন মনকে সে বহু চেষ্টায় সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করলো কিন্তু তা আর হল না। কেমন যেন সব উলটে পালটে গেল।

জেমিলি তার প্রথম বিবাহিত জীবনের আনন্দটুকু পেল না। লুতুফ আলি দিতে পারলো না নয়, দেবার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। তারপর হানিফের অদ্ভুত আচরণ। হানিফই লুতুফ আলির কাছে প্রধান হল। জেমিলিকে ঘরে নিয়ে এসে হঠাৎ সে অনুভব করলো, ফতুমা মরে নি। ফতুমা তার কাছ থেকে কৈফিয়ত আদায়ের জন্যে হানিফকে রেখে গেছে আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, মৃত্যুর সময় কি বলেছিল ? তার স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করে না রাখলে অবশ্য দোষ কিছু নেই কিন্তু বিবেক ? ফতুমাকে যে সে নিঃশব্দে সমর্থন জানিয়ে হানিফের নিরাপত্তা প্রদর্শন করেছিল। আজ যদি সেই কবুল করে, অবহেলা করে—তবে

দোষ কার ?

এসব কথা অবশ্য হানিফ জানতো না। সে তার নিজের প্রয়োজনের জন্যেই অধিকার দাবি করতো। তবু লুতুফ আলির মনে হত। ও হানিফ নয়, ফতুমাই তাকে বলছে আমি জীবিত থাকতেই তুমি এই মধ্যবয়সে আর এক আওরতের সর্বনাশ করলে? তুমি কি ভুলে গেছ, তুমি আওরতকে নিরাপত্তা দানে অক্ষম! আমাকে ভিন্ন পুরুষের আসক্তির কবল থেকে রক্ষা করতে পার নি, তবে আবার কেন আর একজনের পাণিগ্রহণ করলে ?

জানবে, তুমি জীবনে শান্তি পাবে না। এই যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, আওরতের স্বাদটুকু গ্রহণ করে তাকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবে তাহলে আমার মৃত্যুই তোমার সে পথের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, আমি মরে গিয়েও প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বো না।

লুতুফ আলির মনে ফতুমার এই অদৃশ্য কথাগুলি কেমন যেন মোহ সঞ্চার করলো। কেমন যেন তার সব শান্তি বিঘ্নিত হল। ফতুমা যত তাকে বিবেক দংশনে জর্জরিত করতে লাগলো, লুতুফ আলি তত জেমিলির সান্নিধ্য ত্যাগ করে হানিফের দিকে সরে যেতে লাগলো। তার মনে হল, হানিফকে অবহেলা করলে বুঝি ফতুমার অত্যাচার থেকে সে মুক্তি পাবে না। ফতুমা তার ওপর অত্যাচার করছে। ফতুমা তাকে শান্তি দেবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। সেইজন্যে সে সেই ফতুমার জন্যেই হানিফের প্রতি নিজের স্বভাববিরুদ্ধ মোলায়েম আচরণ করতে লাগলো।

জেমিলি হল অবহেলিতা। আস্তে আস্তে জেমিলির দিক থেকে মনটি সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে সে একদিকের কর্তব্য ভুলে অন্যদিকের চিন্তায় ব্যাপৃত হল। মুন্না জন্ম নিল। সেই শিশু পর্যন্ত লুতুফ আলির কাছে শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল।

প্রথম প্রথম জেমিলির জন্যে কষ্ট হত। জেমিলির জীবন বরবাদ করে দেবার অধিকার তার নেই। তার কাছে ওয়াদা করে সে তাকে ঘরে নিয়ে এসেছে। তার প্রতি কর্তব্য না করলে বেইমান আখ্যা নিতে হবে কিন্তু সে অনুশোচনা পরে তার ছিল না। পরে কেমন যেন জেমিলির জন্যে ও তার বেটির জন্যে কোন অনুকম্পাই জাগে নি। বরং বেটাকে কি করে স্ববশে আনা যায়, তারই সাধনা করেছে। আর সেই কৃতকার্যে সে সফল হতে একদিকের চিন্তায় সম্পূর্ণ শান্তিলাভ করেছিল। ফতুমা আর যেন অদৃশ্য থেকে তাকে শাসায় না। সে যে প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিচ্যুত হয়েছে, এতেই বোঝা যায়।

যাই হোক, যত শান্তিই সে পেয়ে থাকুক। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে তার তীব্র এক যন্ত্রণা এসে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিত। একি করছি আমি? যাকে ওয়াদা দিয়ে শাদী করে নিয়ে এলুম, তার প্রতি এই অবজ্ঞা প্রদর্শন যে আল্লা ক্ষমা করলেন না। এই কথাটাই তাকে বার বার দগ্ধ করে সমস্ত শান্তি কেড়ে নিত। তার মনে হত, জেমিলিকে কাছে টেনে নেয়। মুন্না সারা বাড়িময় হরিণীর কত চঞ্চল পায়ে খেলে বেড়ায়। তাকে বুকে তুলে নিয়ে পিতার অধিকার দেয় কিন্তু আবার তাকে হানিফের

কথা ভেবে সঙ্কুচিত হয়ে যেতে হত। জেমিলি দূরে চলে গেছে। তাকে কাছে টেনে নিতে গেলেও যেমন মুশকিল, আবার হানিফকে দূরে সরিয়ে দিতে গেলেও একই অবস্থা।

এই দুরকম অবস্থার মাঝে পড়ে লুতুফ আলি চুপ করে ভেবে চলেছিল দিনের পর দিন।

তারপর হঠাৎ মুন্নাকে সরাবার ষড়যন্ত্র নিয়ে হানিফ এনে তাকে উৎসাহিত করলো। তখন হানিফকে ক্ষুব্ধ করে সে তার কোন উচিত মনের পরিচয় দিতে পারে নি কিন্তু তারপরের কয়েক ঘণ্টা সে আর নিজের মধ্যে ছিল না। সে রাত্রে তার মনে হয়েছিল, জীবনে আরো কত সে অপরাধ করেছে। অপরাধের চিত্রগুলি এক এক করে তার মনে এসে তাকে তীব্র এক যন্ত্রণার মাঝে নিঃঝিম করে দিয়েছিল। সে কথা আজও বিবেককে দগ্ধ করে। কেন যে সে ধরিয়েছিল আজও জানে না কিন্তু অন্যায়টিই তার মনে আছে। অন্যায়গুলি এমনিই জীবন্ত যে, জীবনের চতুর্দিকে সেগুলি জড়িয়ে থেকে সুখ ও দুঃখে বার বার আত্মপীড়ন জাগায়। সেইজন্যে আর কোন অন্যায় করবে না বলে সেইরাত্রে লুতুফ আলি ভয়ঙ্কর এক প্রতিজ্ঞা করে বসলো। আর তার পরবর্তী কার্যধারা দেখে আর কেউ বিস্মিত না হোক্ – জেমিলি হল। সেইজন্যে জেমিলি সমস্ত অভিমান ত্যাগ করে লুতুফ আলির অঙ্গের সাথে মিশে গেল। স্বামীর সেবায় সে আত্মসমর্পণ করলো।

শয্যায় শুয়ে শুয়ে লুতুফ আলি আত্মতৃপ্তি পেল এই ভেবে যে, আজ তার সংসারে আনন্দ ফিরে এসেছে। সে যদি আজ মরে যায় ক্ষতি নেই। আজ মৃত্যু হলে এক বিরাট শান্তি তাকে আনন্দলোকে নিয়ে যাবে। আজ হানিফ তার আম্মাকে স্বীকার করেছে। মুন্না আর তার কাছে পর নয়। মুন্নাকে সে বহিনের মর্যাদা দিয়েছে। মুন্না এখন হানিফের পিছু পিছু ঘুরে বেড়ায়।

লুতুফ আলি শুয়ে শুয়ে সেই সব দেখে। রোগের যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে তার শীর্ণবক্ষ পূর্ণ হয়ে যায়। জেমিলিকে সে বলে,—আর বোধ হয় কোন ভাবনা নেই। এবার আমার ডাক এলে আমি তোমাদের রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারবো।

জেমিলি তাড়াতাড়ি স্বামীর মুখে হাত চাপা দেয়।

মুখে কিছু বলে না কিন্তু মনে মনে আতঙ্কিত হয়। না না এত তাড়াতাড়ি যেও না। এই আনন্দ, এই সুখ, শান্তি যখন এসেছে তখন এত তাড়াতাড়ি চলে গেলে যে সব ফুরিয়ে যাবে। শূন্য হয়ে যাবে এই আনন্দময় বাড়ি।

জেমিলি যেন নিজের স্বার্থের জন্যেই লুতুফ আলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলো। আরো সেবা দিয়ে তাকে আরোগ্যের পথে নিয়ে যেতে চেষ্টা করলো। একদিন এই লোকের মৃত্যু চেয়েছি, সে কথা ভেবে সে অনুতাপে দগ্ধ হল।

কিন্তু আনন্দ যদি বেশীদিন স্থায়ী হত! কোথাদিয়ে যে বছরগুলি কেটে গেল কেউ জানে না। এই দীর্ঘ দিনগুলি শুধু লুতুফ আলি পঙ্গুদেহ নিয়ে শয্যার বুকে কাটালো। আর রোগের যন্ত্রণা তাকে আস্তে আস্তে দিনের পর দিন ধরে কুরে কুরে

খেয়ে নিল। যখন নিঃশেষ হয়ে এল, একদিন তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

জেমিলি চমকে উঠলো। এইদিনটি সে অনেকদিন ধরে প্রত্যাশা করছিল। যখন সে স্বামীর চোখে কোলে মৃত্যুর ছায়া দেখছিল, তখন থেকেই সে আতঙ্কে নিজেকে তৈরী করছিল। নিজের মনকে বাঁধছিল। অনেক সেবা দিয়ে স্বামীকে মৃত্যুর পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্যে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু একদিন সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হল। মৃত্যু এসে তুলে নিল আলিসাহেবের রোগজর্জর দেহটিকে।

জেমিলি আছড়ে পড়লো স্বামীর বুকের ওপর। কান্নায় ভাসিয়ে দিল মৃতস্বামীর বক্ষ। তার কান্নার মর্মভেদী চিৎকারে কোটানার গ্রামবাসী অশ্রুজল চোখে আলি-সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়ালো।

মুন্নার বয়স তখন ছয়। সে জানে না, মৃত্যু কি? তবে তার পিতার চক্ষু দুটি বন্ধ দেখে সেও কাঁদলো। মায়ের কান্না দেখে তারও কান্না গগন বিদীর্ণ করলো।

আর হানিফ নির্বাক হয়ে সেই সব দেখতে লাগলো। সে যেন কেমন অর্থহীন চোখে তাকিয়ে রইলো পিতার দিকে।

আর যে মরে গেল তার কথা এখানে অবান্তর। তবু তার শেষ কথাগুলি কারুরই অজানা থাকলো না। লুতুফ আলি মরবার মুহূর্তে এসে তাড়াতাড়ি তার কর্তব্য শেষ করলো। হানিফকে ডেকে বললো—তোর আম্মা থাকলো, বহিন থাকলো, কোটানার অধিবাসীরা থাকলো। সকলের ভার তোর ওপর দিয়ে গেলাম। তুই তাদের আমার মতই দেখবি। আর যদি না দেখিস, জানবি আমার মুক্তি হবে না। আর আমার মুক্তি না হলে তুইও শান্তি পাবি না।

লুতুল আলি আর কোন কথা বলে নি। এমন কি হানিফের সমর্থনও আশা করে নি। তখনই তার চোখ বুজে এসেছিল। তারপর আবার চোখ চেয়ে বলেছিল,—হানিফ, শাওনীর সেই বেটির যদি কোন সাহায্য প্রয়োজন হয়, দিতে কার্পণ্য করিস না। ওদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তারপর ফতুমা এসে শিয়রে দাঁড়িয়েছিল। মনে হয় সে অট্টহাস্য করে উঠেছিল। মনে হয় সে হাত বাড়িয়ে লুতুফ আলিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে এসেছিল। তাই মৃত্যুর পূর্বে লুতুফ আলির মুখের ওপর আতঙ্কের ছায়া ফুটে উঠেছিল। পরেও ছিল সেই আতঙ্ক। সে যেন ফতুমার সঙ্গী হতে চায়নি। কিন্তু ফতুমা তাকে আর রেহাই দেয় নি। সঙ্গে নিয়ে গেছে। সঙ্গে নিয়ে কোথায় গেল কেউ জানে না। মনে হয়, ফতুমার অতৃপ্ত আত্মা তার কামনার নিবৃত্তির জন্যে আবার অন্যজগতে গিয়ে অভিসার রচনা করবে। স্ত্রীর আচরণ করে লুতুফ আলিকে নিয়ে সংসার পাতবে।

কিন্তু লুতুফ আলি আতঙ্কিত হল কেন?

লুতুফ আলি চলে গেছে।

রেখে গেছে কি? কিছু না। আরব থেকে হিন্দুস্থানে এসে এমন কিছু সম্ভাবনা সে প্রকাশ করে নি যা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার মত। শুধু কতকগুলি মানুষের মাঝে সে ঘুরে বেড়িয়েছে, আর নিজের স্বার্থের সন্ধানে ঘুরে এই কোটানায় এসে কিছু প্রতিপত্তি সৃষ্টি করেছে। তার জন্যে তো গ্রামবাসী তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা. প্রতিপত্তি। আর মৃত্যুর পর লুতুফ আলির স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্যে কবরের ওপর এক সৌধ। যেন কোন রাজা, বাদশাহ। রাজা, বাদশাহরাও বোধ হয় সব সময় এই স্মৃতি সৌধের সম্মান পান না। যদি পেতেন তাহলে বহু ক্ষমতাশালী বাদশাহের স্মৃতি সৌধ আছে, এক তাঁরা জীবিতাবস্থায় স্বকৃতিত্বে সৃষ্টি করে গেছেন, কিংবা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রেখে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মরে গেলে আর কে কতদিন মনে রাখে? প্রিয়জনদের মনে কিছুদিন শোক স্থায়ী হয়, তারপর সবই বিস্মৃতির অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

কোটানার গ্রামবাসী কিন্তু লুতুফ আলিকে মিলিয়ে যেতে দিল না। তারা নিজেরাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একটি উন্মুক্ত স্থান বেছে নিয়ে শুভ্র প্রস্তরের এক সৌধ নির্মাণ করে দিল। আর তার নিচে মাটির তলায় লুতুফ আলি ঘুমিয়ে থাকলো চিরদিনের জন্যে।

লুতুফ আলি এই সময় যদি একবার জেগে উঠতো, তাহলে সে তার এই কীর্তিময় সৌধ দর্শন করে লজ্জায় মাথা নত করতো। কি জন্যে তার এই স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখা? কি এমন কাজ সে পৃথিবীতে এসে করেছে, যার জন্যে এই স্মৃতি রক্ষা করার প্রয়োজন? বরং তার মনে হয়, সে অনেকের শত্রু হয়েই জীবনধারণ করেছে। অনেক অন্যায় কাজের মধ্যে দিয়ে তার জীবন নির্বাহ হয়েছে। তার মৃত্যুতে পৃথিবীর একটি গুরুভার কমলো, এই মনে করা উচিত। ফতুমা আজ বেঁচে থাকলে ব্যঙ্গ করতো। আব্বা ও আম্মা জীবিত থাকলে পুত্রের এই সৌভাগ্যে বিদ্বেষ প্রকাশ করতো। বুলন্ত সিং বলতো বিশ্বাসঘাতকের উপযুক্ত সম্মানই সে পেয়েছে। দরগার সেই দরবেশ বলতো, বেচারা। চকবাজারের সোনী কি বলতো কেউ জানে না। তবে সে বেঁচে থাকলে আর একটি ভাল উপাধিই দিত। শাওনী আজ কি বলে, সেও অবিশ্বাসের মত। শাওনী শেষপর্যন্ত কি চোখে লুতুফ আলিকে দেখেছিল চিন্তা করা যায় না।

শুধু কোটানাবাসীই লুতুফ আলিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখলো। তাই তার সৌধ নির্মাণ করিয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠান করলো এবং সৌধের গাত্রে খোদিত করলো, 'আমাদের অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ সুহৃদ লুতুফ হালিম আলি শেখ বাহাদুর।'

মনে হয়, লুতুফ আলি জানতো তার স্মৃতি মৃত্যুর পরেই অন্তরঙ্গদের মন থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেইজন্যে কৌশল করে এই গ্রামবাসীদের উপকার করে কৃতজ্ঞতার দান সে প্রার্থনা করেছিল। আর তার মনে যে সৈনিক হবার বাসনা ছিল, বাসনা চরিতার্থ হয় নি বলে আক্ষেপ ছিল, সেই আক্ষেপটুকু পূরণ করে দেবার জন্যে তারই স্মৃতি সৌধের ওপর লুতুফ আলির এক অশ্বারোহী প্রতিচ্ছবি গ্রামবাসীরা সৃষ্টি

করে দিল।

এ সব স্মৃতি আয়োজন অনেক পরে হয়েছিল। জেমিলি স্বামীর স্মৃতিসৌধ দেখে যেতে পারে নি। দেখলে অবশ্য সে খুশিই হত। কারণ পরবর্তী জীবনে তার আবার দুঃখ শুরু হয়েছিল। জীবন তার আবার আঁধারের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল। এক সমুদ্র জলের মধ্যে প্রবেশ করেও সে আর ভুল করে নি। স্বামীকে সে লাখোবার ক্ষমা করেছিল। স্বামীর নিরুপায় অবস্থার কথা জেনে সেদিন নিজেই তীব্র অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছিল। তাই শেষদিন রমণীর মহত্ত্বতে দয়িতকে সঞ্জীবিত করে নিজের সুখ আহরণ করেছিল।

লুতুফ আলির মৃত্যুর একমাস পর।

হঠাৎ একদিন হানিফ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল। তার অশ্ব যে কোথায় উর্ধ্বশ্বাসে চলে গেল কেউ জানে না। যাবার সময় জেমিলিকে বলেও গেল না কিছু। জেমিলি অসন্তুষ্ট হল না, কারণ সে জানতো হানিফের স্বভাবের গতিবিধি।

তারপর একটি একটি করে দিন বিদায় নিল।

সাতদিনের দিন হঠাৎ সকালে হানিফ ফিরলো। শুধু সে একা ফিরলো না। সঙ্গে একটি যুবতী রমণী।

জেমিলিকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হল না। কৌতুহল অবশ্য জেমিলির ছিল না। জীবনটাই কৌতুহলোদ্দীপক বলে সে নিস্পৃহ হয়ে থাকতো।

তাই হানিফ নিজে এসেই বললো। বললো বেশ দাম্ভিকতা প্রকাশ করে—তুমি হয়তো জানো না, আমাদের একজন আত্মীয়া স্থানীয় রমণী ছিল, তার নাম শাওনী। শাওনীর কাছে আব্বাজান খুব কৃতজ্ঞ। তারই লড়কী এই ঝর্ণা। ঝর্ণাকে আমি শাদী করবো। আম্মা তাকে ফেলে দিয়ে কোথায় পালিয়েছে। লোক এসে জানাতে তাই আমি তাকে নিয়ে এলাম। আমি তাকে পেয়ার করি।

'বেশতো'। জেমিলি ভাল করেই এই ছোট্ট জবাবটি দিয়েছিল কিন্তু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল অন্য।

হঠাৎ হানিফের স্বভাব পরিবর্তিত হল। সে সেই পূর্বস্বভাবে ফিরে এল। ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বিকৃত স্বরে বললো,—তুমি নিচু মনের আওরত বলেই এই আচরণের পরিচয় দিলে। আসলে তুমি ঈর্ষান্বিতা হয়ে আমার এই কার্যকে অন্যায় মনে করছো।

হানিফের ব্যবহারে জেমিলির চোখে জল দেখা দিল। কাতর হয়ে বললো,—হানিফ, তুমি এমন করে কথা বলছো কেন? আমি তো তোমার কাজের সমালোচনা করি নি।

হানিফ তখন অন্ধ। জেমিলির কান্না, তার কাতরতায় কোন কর্ণপাত করলো না। সে আরো সরোষে পূর্বে যেমন জেমিলির ওপর অসম্মানসূচক কথা বলতো, তেমনি করে কথা বলতে লাগলো। বাড়ির আবহাওয়া পালটে গেল। হানিফের চিৎকারে চতুর্দিক মুখর হয়ে উঠলো। কেমন যেন একটা বিশ্রী আবহাওয়া সৃষ্টি হল। 'আরো মনে হল, হানিফ যেন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবার জন্যে পূর্বে থেকে ভেবে এসেছিল।

মুন্না ছুটে এল। মুন্না আর এখন ছোট নয়। সে মায়ের স্থির চঞ্চল কান্নাজড়িত মূর্তি দেখে তাড়াতাড়ি তার হাত ধরলো।

ঝর্না এসেও সামনে দাঁড়ালো।

আর হানিফ এতটুকু দ্বিধা না করে জেমিলির সমস্ত সম্মান ধূলায় লুটিয়ে আঘাতে আঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগলো।

সহ্যের একটা সীমা আছে, আর আছে তার শেষ। জেমিলি আর সহ্য করতে পারলো না। শুধু ক্ষতবিক্ষত হতে হতে একসময় তার মনে হল, সে হানিফকে তার পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পিতার মৃত্যুর সময় কি অঙ্গীকার করেছিল? সেই কবুল ভুলে সেই পিতার অসম্মানকে ধূলায় লুটিয়ে দিচ্ছে! কিন্তু বিবেক বলে কিছু হানিফের আছে বলে তার মনে হল না। সুতরাং কাকে বলবে? তাই মনে মনে সেই মুহূর্তে এক বিরাট প্রতিজ্ঞা করে বসলো। হ্যাঁ, মুন্নার মুখ চেয়েও তাকে এই ব্যবস্থা করতে হবে। আর নয়, সহ্যেরও একটা সীমা আছে। যার ওপর তার এক তিলও দাবি ছিল সে আজ পৃথিবীর অন্যপ্রান্তে। সে যদি কোন দুর্ব্যবহার করতো অন্তত নিজেকে প্রবোধ দেবার ভাষা ছিল। আর তারও দাবি ছিল কিছু বলার কিন্তু এ একেবারেই বিপরীত। একে যেমন কিছু বলা যায় না। সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের একটি ছেলের কাছে হীন হয়ে থাকাও পদদলিতের মত। তাই জেমিলি ঠিক করলো সে এখান থেকে চলে যাবে। মুন্নাকে বাঁচাতে হবে। মুন্নাকে মানুষ করতে হবে। মুন্নার মনের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে তাকে সুন্দর করে তুলতে হবে। মুন্না বাঁচলে তবে তার স্মৃতি জগতে থাকবে। আর মুন্না না থাকলে কিছুই তার থাকবে না। শুধু কন্যার জন্যেই সেই মুহূর্তে জেমিলি নতুন করে বাঁচতে চাইলো। হানিফের আঘাতের জর্জরিত দেহ সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে গেলেও সে শুধু ঐ কন্যার কথা মনে করেই আবার উঠে দাঁড়ালো। আবার সান্ত্বনা আহরণ করলো। আবার সে নতুন এক জীবনের ছবি দেখতে লাগলো। কিন্তু ছবি খুব স্পষ্ট নয়। সে একা, অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই। নিরাশ্রয়। কে দেবে তাকে এই সব দুর্লভ বস্তু? কোথায় সে পাবে মুন্নাকে মানুষ করে তোলার রসদ! তারপর সে রমণী। এখনও শরীরে আছে জৌলুসের রোশনাই। লুব্ধ চোখের দৃষ্টিকে সে ঢাকা দিয়ে পথ চলতে পারবে না। উপকার হয়তো অনেকেই করতে আসবে কিন্তু সে উপকারের অর্থ বড় নির্মম। না, না—জোয়ান বয়সে সে তার ইজ্জত কোরবানী দেয়নি। আজ যৌবনের শেষ ধাপে নিজেকে পণ্য করে তুলবে?

কিন্তু মুন্না বাঁচবে কেমন করে? এখান থেকে চলে গেলে—কে নিঃস্বার্থে তাকে আশ্রয় দেবে?

ভাবতে তার সময় নিল। কিন্তু বেশী সময় দেবার তার উপায় ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে যা'হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

হানিফ চায়, তারা মা বেটি এখান থেকে চলে যায়। আর সে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এই বিরাট বাড়ির ধনদৌলতের ওপর বসে জোয়ান রক্তের উষ্ণস্রোতে সুখের স্বর্গ রচনা করে। এই কথাটাই স্পষ্ট না বলতে পেরে হানিফ এত বিশ্রী পরিস্থিতির আশ্রয় নিল। বিতাড়িত করবার সৎসাহস তার থাকলে জেমিলি বোধ হয় খুশি হত। যদি গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিত, তাহলে পথে দাঁড়িয়ে সে হানিফকে বাহবা দিত তার সাহস দেখে। শুধু সাহস নয়, দুঃসাহস। আর বলতো ছেলেটির স্বভাবের একটি চমৎকার দৃঢ়তা আছে সে দৃঢ়তা সচরাচর দেখা যায় না।

কিন্তু কোথায় যাবে সে ?

এই বাড়ির সীমানা ছাড়লেই সব অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোর নিশানা নেই। যে আলোটুকু দেখে মনের মধ্যে উল্লাস অনুভব করবে। শুধু সে নিজে একা নয়। সঙ্গে একটি অপরিণত বয়স্ক মেয়ে। যে এখনও ভাল করে কথা বলতে শেখে নি। ডাগর দুটি চোখ নিয়ে বিস্ময়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে। উদ্ভট উদ্ভট প্রশ্নে সে জর্জরিত করে তোলে। তার মনের প্রসার কত বড়। তার পৃথিবীটা কত বড় হয়ে বিস্ময়ের মাঝে অবস্থান করছে। মুন্নার জন্যেই জেমিলির কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশী। সে জানে না, এই বিস্ময় ভরা পৃথিবী কত নির্মমতা নিয়ে মানুষের জীবনের সমস্ত কিছু বরবাদ করে দেয়। সে যখন জানবে, সে তখন আঘাত পেয়ে মনের কুসুম প্রবৃত্তিগুলি হারিয়ে ফেলবে !

না, আর ভাবতে পারে না জেমিলি। ভাবলে কোন কিছুরই কূল-কিনারা মেলে না। এক সমুদ্র জলের মধ্যেই তাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। নিরবিচ্ছিন্ন মসীলিপ্ত অন্ধকারের মাঝে আলোর আশায় তাকে ঝাঁপ দিতে হবে। এখানে অসম্মানের জীবন যাপন করার চেয়ে অনির্দিষ্ট পথেও শান্তি আছে, হয়তো কোন একটি শান্তির আশ্রয় মিলে যেতে পারে। জগৎটা কি শুধু বিষাক্ত আবহাওয়ায় ভরা ? যদি তাই হত তাহলে নিপীড়িতরা কখনও চলাফেরা করে বেড়াতো না ! তারা সঙ্গে সঙ্গে জীবনদীপ নির্বাপিত করে মুক্তির আস্বাদন গ্রহণ করতো।

জেমিলি নিজের মনের সান্ত্বনা নিজেই আহরণ করে মনস্থির করে নিল। রাতের অন্ধকারে সে বেরিয়ে পড়বে এ বাড়ি ছেড়ে। রাত্রিতেই দেবে পাড়ি। কেউ জানবে না তার হঠাৎ চলে যাওয়া। কোন মন্তব্যের সম্মুখীন হতে চায় না বলেই সে রাত্রিবেলা চলে যাওয়াই সবচেয়ে সুবিধে মনে করলো। লুতুফ আলির বিবির সম্বন্ধ সেতো অস্বীকার করতে পারবে না। সেই লুতুফ আলি এ গ্রামের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। আর তারই বিবির এই হাল দেখে সকলে সমবেদনা জানাবে। সকলে সহানুভূতির চোখে তাকে দেখলে সে আর নিজেকে স্থির রাখতে পারবে না। তাছাড়া সে পরাভব স্বীকার করে পালাচ্ছে। ঐ হানিফের কাছে তার পরাভব। এ কথা ভাবতে গেলেও কেমন যেন উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। সে যেত না, যদি না মুন্নার কথা সে ভাবতো।

মুন্নাকে মানুষ করবার জন্যেই সে যাচ্ছে। জানে না, মুন্না মানুষ হবে কিনা! তবু এই পরিবেশ মুন্নার অনুকূলে নয় বলেই সে বিপদ বরণ করেও অনির্দিষ্ট এক দুর্গম পথে পাড়ি দিচ্ছে।

রাত্রি একটু গভীর হলে জেমিলি আর অপেক্ষা করলো না। তার নিজস্ব যা কিছু অলঙ্কারাদি ছিল সেগুলি সঙ্গে নিয়ে সে ঘুমন্ত মুন্নাকে ডাকলো—মুন্না ওঠ্, বেটি। এখন না গেলে আর সময় পাওয়া যাবে না। আমরা আসমানের আলোতেই পথ করে এগিয়ে চলবো।

কিন্তু মুন্না তখন গভীর ঘুমে অচেতন। হয়তো সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কত সুখের স্বপ্ন দেখছে।

জেমিলি আগে কিছু মুন্নাকে বলে নি। বললে পাছে নানান প্রশ্ন করে ও কেন তারা যাবে—এই নিয়ে গোলমাল করে বলে জেমিলি যাওয়ার কথা গোপন করে রেখে দিয়েছিল।

জেমিলি আরো কয়েকবার মুন্নাকে ডাকতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ঘুমন্ত দুই চোখে তখনও জড়তা। অবাক হয়ে বললো সেই শিশু,—ডাকলে কেন মা? কি হয়েছে?

জেমিলি বললো,—পোষাকটা পরিবর্তন করে নে। আমরা এখান থেকে চলে যাবো।

কেন মা? চলে যাবো কেন?

কথা বাড়াস না মুন্না। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে! পথ অনেক। হাঁটা পথেই যেতে হবে তো!

মুন্না যেন সেই মুহূর্তে মাকে চিনতে পারলো না। শুধু এই বুঝলো, মাকে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে তিরস্কার প্রাপ্য হবে। কিন্তু কেন তারা যাবে? এ বাড়িতে তাদের অধিকার তো সমান। আব্বাই বলে গেছে, হানিফও যা মুন্নাও তাই। তবে কেন মা যাচ্ছে? মাকেও তো বাবা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

মুন্না কিছুতে বুঝতে পারলো না মায়ের অভিসন্ধি। বুদ্ধি তার এই বয়সে কম প্রখর নয়। অন্য মেয়েরা যে বয়েসে একেবারে নির্বোধ থাকে, মুন্না সে বয়েসে অনেক কথা আন্দাজে বুঝতে পারে।

সেই বুঝেই বোধহয় হঠাৎ তার স্বভাবের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি করলো। সে বললো,—তুমি গেলে যেতে পারো, আমি যাব না।

মুন্না! জেমিলি মুন্নার আচরণে আশ্চর্য হয়ে ধমক দিল।

না, আমি কিছুতে যাব না। আগে বল কোথায় যাবে তাহলে ভেবে দেখতে পারি! আব্বা এবাড়ি ছেড়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে গেছে।

জেমিলির চোখে জল এসে পড়লো। ওড়নার প্রান্ত দিয়ে চোখ ঢাকা দিয়ে রুদ্ধ-কণ্ঠে বললো,—মুন্না, তোর ভালোর জন্যেই আমি যেতে চাইছি। তুই চ, আমি তোকে পথে যেতে যেতে সব কথা বলবো। যেখানে সম্মান নিয়ে থাকা যায় না, সেখানে যে

অধিকারের কোন মূল্য নেই, এ কথা তুই এখন বুঝবি না, পরে বুঝবি।

ভাইজান কি আমাদের চলে যেতে বলেছে ?

মুন্না পোষাক পরে নে মা ! আসমানে রোশনী উদয় হয়েছে।

মুন্না সেদিনের আম্মাকে কিছুতে বুঝতে পারলো না। তবে এই বুঝলো, মা অনেক আঘাত পাওয়ার পর এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। সুতরাং তাকে ব্যথা দিয়ে আর বাধা দেওয়া সমীচীন নয়। তাই সে মৌন হয়ে নিঃশব্দে পোষাক পরিবর্তন করে নিল।

জেমিলি যখন যাত্রার আয়োজন সমাপ্ত করে বাইরে এসে দাঁড়ালো, তখন আসমানে চন্দ্রিমা পূর্ণ আলোর রূপে বরণডালা সাজিয়েছে। বাতাসের মৃদুমন্দ পরশে গাছের সবুজ পাতাগুলি দুলছে। কচি পাতার ওপর চাঁদের রজতশুভ্র আলোর দ্যুতি।

সঙ্গে কিছু নেয়নি জেমিলি। কেন নেবে ? কোন জিনিসই তো তার নয় ? তার শুধু সম্পত্তি—কিছু মূল্যবান পাথর, স্বর্ণনির্মিত অলঙ্কারাদি আর কয়েকটি মোতির মালা। আরো অবশ্য কিছু জরির কামদার বসন আছে। তা সেগুলি ফেলেই যাচ্ছে। বোঝা বয়ে বেরিয়ে কি হবে ? আশ্রয় কবে মিলবে, কোথায় মিলবে তার কোন ঠিক নেই। এসব সম্পত্তি সে যখন নর্তকী ছিল, তখন অর্জন করেছিল। তাই এর ওপর একান্ত নিজস্ব অধিকার ছিল। সেগুলি একটি পুঁটুলীতে ভরে নিয়ে জেমিলি মুন্নার হাত চেপে ধরলো।

বাইরে বেরিয়ে শুনতে পেল হানিফের ঘর থেকে হাসির হররা ছুটে আসছে। একটি রমণী কণ্ঠ ও অপরটি পুরুষের। এরা কারা তাও জেমিলির ভাবতে অসুবিধা হল না।

জেমিলির কণ্ঠ চিরে শেষ একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। তারপর মুন্নার দিকে তাকিয়ে বললো,—চ, আর দেরি করবো না।

মুন্না বললো,—মা, ভাইজানকে বলে যাবে না !

জেমিলি অন্যদিকে তাকিয়ে শুধু বললো,—না।

আর দেরি নয়। সেই রাত্রের নিশুতি প্রহরে শুধু আসমান ও জ্যোৎস্নার আলোক-ধারাকে সাক্ষী রেখে দুটি রমণী তাদের সমস্ত আশা ভরসা ত্যাগ করে উদ্দেশ্যহীন পথে পাড়ি জমালো।

জেমিলি জানে না কোথায় সে যাবে ? পথও তার জানা নেই। তবু সে বেরলো এই ভেবে যে, স্বামীর ঐ বাড়িতে থাকার চেয়ে পথের বুকে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়াও অনেক শান্তির।

ভয় তার করলো না। বরং তার অদম্য সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা সংগৃহীত হল। এমন কি সে তার পূর্বের জীবনে ফিরে গেল। যখন যৌবনের বহ্নিতে দেহের তারুণ্য দুঃসাহসিক এক জীবনের মূর্তিময়ী ছিল। তখন ভয় বলে তার ছিল না। আপন বলতে কেউ না। মাত্র একদল ভাড়াটে বাদ্যকার নিয়ে সে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতো। বড় বড় শরীফ আদমীর নাচমহলে গিয়ে নৃত্য করতো। আদমী-

গুলিকে সে ভয় করতো না, কেমন যেন তুচ্ছ করে দৃঢ়পদক্ষেপে অন্যত্র চলে যেত। সেইরকম এক দৃঢ়তার ওপর দাঁড়িয়ে সে পথ চলতে লাগলো। সেদিনও যেমন ভবিষ্যৎ তার অজানা ছিল, আজও অজানা। তবে আজ ভাল লাগলো এইজন্যে যে, তার মুন্না পাশে আছে। মুন্নাকে কেন্দ্র করে সে অনেক ভবিষ্যৎ ছবি কল্পনা করতে পারে। মুন্নাকে সে নাচ শেখাবে। মুন্না তার নৃত্যকৌশলে সুরতের চেকনাইতে অনেক রাজা বাদশাহকে ঘায়েল করবে। তারা লুব্ধ হয়ে মুন্নার দিকে তাকিয়ে থাকবে। সে যা পারে নি, মুন্নার ভেতর দিয়ে তাই সে সম্ভব করবে। সে বাদশাহের দরবার কর্তৃক বিতাড়িত হয়েছে। কোন দেশের রাজাকে সে বশীভূত করতে পারে নি। কেন পারে নি সে জানে না। তার সুরত, তার নৃত্যকৌশল কারুর চেয়ে কম নয়। বরং অনেকের চেয়ে সবদিক দিয়েই সে পটু। তবু সে বাদশাহের দরবারে নাচবার হুকুম পায় নি। তার আক্ষেপ আছে।

সেই আক্ষেপ সে মুন্নার মধ্যে দিয়ে পূরণ করবে। মুন্নাকে সে এমন একজন নর্তকী করে তুলবে, যার কথা শুনে পারস্যরাজ পর্যন্ত আমন্ত্রণ না জানিয়ে পারবে না।

চলতে চলতে হঠাৎ সবকিছু বিস্মৃত হয়ে জেমিলি কেমন যেন উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলো। সে আনন্দে সেই পথের ওপরই নৃত্যের ছন্দে দাঁড়িয়ে পড়লো। হাতের মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করে সে নিশ্চিন্ত হল, না সে কিছুই ভোলে নি। এখুনি যদি বাদ্যকার যন্ত্র নিয়ে বসে যায়, তাহলে সে সেই আগের মতই নৃত্য করতে পারবে। বয়সের জন্য হাঁফাবে না। স্থূল আকৃতির জন্যে নৃত্যের ছন্দে কোন তালভঙ্গ হবে না।

মুন্না মার কাণ্ড দেখে ডাগর চোখে বললো,—মা, তুমি নৃত্য করছো?

জেমিলি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো,—হ্যাঁ। তুই নাচ পছন্দ করিস না!

মুন্না গম্ভীর হয়ে বললো,—না।

কেন নয়? জেমিলি ক্ষুব্ধ হল

নাচ যারা করে তারা ভাল নয়।

কি বললি? জেমিলি কেমন যেন চিৎকার করে রাগে ফেটে পড়তে গেল—কে তোকে একথা বলেছে?

মুন্না নির্লিপ্তভঙ্গিতে বললো,—ভাইজান।

তুই ওর কথা বিশ্বাস করলি?

মুন্না চুপ করে থাকলো।

জেমিলি কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলো। মুন্নাকে বোঝাবার উপায় অন্বেষণে দিশেহারা হয়ে গেল। মেয়ের ভুল ধারণা পরিবর্তিত করে নর্তকীর পবিত্র জীবন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তার বিবেক জাগ্রত হল। সে তারপর সংযত হয়ে শান্তকণ্ঠে বললো,— মুন্না, এ ভুল। নৃত্য হচ্ছে একটি শিল্প-কৌশল। এ সবার আয়ত্ত হয় না। তবে যাদের হয়, তারা জগতে সুনাম অর্জন করে। নৃত্যের সাথে রমণীর যদি সুরত থাকে তাহলে তার মূল্য রাজা-বাদশাহের দরবার পর্যন্ত জাগ্রত হয়। ভেবে দেখ সেই

নর্তকীর কি সম্মান ? তুমি যেখানে বহু আয়াসেও যেতে পারছ না, একটা ক্ষমতার অধিশ্বরী হয়ে সেখানে গিয়ে পৌছচ্ছো। শুধু প্রবেশোধিকার পাচ্ছো না, তার সঙ্গে সঙ্গে অঢেল ধনরত্ন উপহার পা.চ্ছো।

একটু থেমে জেমিলি বললো,—তোর নাচ শেখবার কোন বাসনা নেই ?

মুন্না মায়ের মুখের ওপর একবার বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে তারপর ভ্রূভঙ্গি করে বললো,—না।

কেন নয় ? তুই আমার কথা বিশ্বাস করলি না ?

মুন্না উত্তর দিল না।

জেমিলি কেমন যেন নিরুৎসাহ অনুভব করলো। মুন্নাকে নর্তকী করে তার মনের সঙ্কল্প মেটাবে বলে যে আশা ছিল সে আশা যেন তার নিরাশায় পর্যবসিত হল। এই বিপদ বরণ করে নিরুদ্দেশের পথে যাওয়ার মধ্যে যে উৎসাহ ছিল, তাও যেন অস্তমিত। তাই সে একান্ত ভগ্নকণ্ঠে বললো,—মুন্না, তুই শেষকালে দুঃখ দিলি ! তোর মুখ চেয়ে যেটুকু আশা আমার ছিল, তাও গেল। যাক্ নসীব যদি ভাল না হয়, হাজার চেষ্টা করেও সুখ মেলে না।

মুন্না বুঝতে পারলো না, সে নর্তকী না হলে মায়ের এত দুঃখ কেন ?

সে শুনেছে, মা পূর্বজীবনে নর্তকী ছিল এবং আরো অনেক গোলমেলে কথা ভাইজান তাকে বলেছিল, সে কিছুই বোঝে নি। তবে এইটুকু বুঝেছিল, নর্তকীরা ভাল রমণী নয়। ভাল, খারাপ বিবেচনা বোধ অবশ্য তার হয় নি। তবে ভালোর রূপ একটু অন্য, আর খারাপ তার বিপরীত। এই বোধ তাকে পীড়িত করে নর্তকীদের সম্বন্ধে সে নিজের একটি মনগড়া ধারণ করে নিয়েছিল। তারপর থেকে সে প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিল, সে কখনও নর্তকী হবে না।

মা কোনদিন নাচ শেখবার কথা তাকে বলে নি। তাই ও সম্বন্ধে তার কোন ভীতিভাব ছিল না। আজ পথে চলতে চলতে সেই কথা মায়ের মুখে শুনে কেমন যেন মাকে শত্রু মনে হল। মা যেন তাকে নিয়ে কি একটা ভয়ঙ্কর কিছু করতে চায়। আর সেইজন্যে গভীর রাত্রে বাড়ি ছেড়ে চলে এল। তার একটুও ইচ্ছে সেই জন্যে হয় নি বাড়ি ছেড়ে চলে আসার। শুধু মায়ের কাতর প্রার্থনাতে সে আসতে রাজী হয়েছিল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ সম্বন্ধে সে অজ্ঞ ছিল বলে এই ধারণা করেছিল।

এইসময় হঠাৎ তার পা দুটি অচঞ্চল হয়ে উঠলো। কেমন যেন ব্যথা করছে। সে আর চলতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

জেমিলি মনে মনে কন্যার ওপর ক্ষিপ্ত হয়েছিল। তাই কন্যার আচরণে মুখ বিকৃত করে বললো,—দাঁড়িয়ে পড়লি কেন ?

আমি যে আর চলতে পারছি মা মা !

এরই মধ্যে থেমে পড়লি ? এত যখন সুখী প্রাণ তখন দুর্ভাগ্যের ঘরে জন্ম নিয়েছিলিস কেন ?

মার তিরস্কারে মুন্নার চোখে জল দেখা দিল।

কিন্তু সে সত্যিই আর চলতে পারলো না। বসে পড়লো সামনের একটি দেবদারু বৃক্ষের নিচে।

জেমিলির রাগ কমে এল। কন্যার জন্য মমতায় তার বক্ষঃস্থল আর্দ্র হয়ে উঠলো। বেচারী! কোনদিন তো এমনি হেঁটে কোথাও যায় নি। তাই কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। সেও কি কোনদিন এত পথ হেঁটেছে? এখন তারই পা দুটো ক্লান্ত লাগছে। পথ চলা শুরু করে দ্রুত তারা অনেক পথ চলে এসেছে। কোটানা ছেড়ে চক্রধি, মহুয়া, বেনেতোল পার হয়ে তারা বাদশাহী সড়ক ধরেছে। এই পথ গিয়ে মিশেছে দিল্লী পর্যন্ত। কিন্তু কত যে দূরত্ব এই পথের সে জানে না। কবে যে এই পথ পরিক্রমা শেষ হবে, তাও তার অজানা।

তাই সে সেইসব কথা ভেবে হঠাৎ কন্যা স্নেহে আপ্লুত হয়ে মুন্নার কাছে এগিয়ে গেল। বৃক্ষতলে উপবিষ্ট মুন্নাকে কোলে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বললো, এখনও যে অনেক পথ বাকী মুন্নি!

আমরা কোথায় যাচ্ছি মা?

জেমিলি স্নেহের বক্ষে মাতৃ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে নিস্পৃহকণ্ঠে বললো,—জানি না কোথায় যাচ্ছি। তবে আপাতত দিল্লীর দিকেই এগিয়ে চলেছি।

দিল্লীতে কে আছে মা?

জেমিলি থমকে গেল। মনে পড়লো দিল্লীতে তার বাল্যকাল কেটেছে। শাহাজানাবাদ থেকে পাঁচ মাইল দূরত্বে রোশনীবাগ। সেখানেই তার নানী থাকতো।

আচ্ছা, আজ নানী কি বেঁচে আছে? যদি থাকে, তার কাছে গিয়ে কিছু দিন আশ্রয় নিলে কেমন হয়? এ কথাটা মনে আসতে তার উৎসাহ বর্ধিত হল। কিন্তু আবার পরক্ষণে ভাবলো, যদি না বেঁচে থাকে? না থাকাটাই স্বাভাবিক। অনেকদিন সে তার কোন সংবাদ জানে না। যেদিন সে জেনেছিল, নানী তার কেউ নয়; পালন করেছে মাত্র, সেদিন থেকে সে নানীর ঘর ছেড়েছে।

তবু দিল্লী তার জন্মস্থান। দিল্লীর বাতাসে আছে চেনা সুর। ফুলবীথিকায় আছে পরিচিত সৌরভ। সে সেখানেই গিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলি অতিবাহিত করবে।

কন্যার কথায় তাই উত্তর দিল—দিল্লীতে আমি বড় হয়ে উঠেছি। ওখানে গেলে কি একটা নিরাপদ আশ্রয় যোগাড় করতে পারবো না?

তারপর সেই রাত্রি বিদায় নিল। প্রভাত হল। সূর্যের উদয় মুহূর্তে তারা পথ চলতে চলতেই দেখতে লাগলো। পাখীর কিচির মিচির। বাতাসের চলাফেরা।

বিশ্রাম অনেকবার তারা নিয়েছে। মাঝে একটু ঘুমিয়েও নিয়েছিল। একটি অস্থায়ী ঘরের দাওয়া পথের ওপর পড়ে থাকতে দেখে তারা নিরাপদে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিয়েছে। তারপর উঠে আবার চলতে শুরু করেছে।

মুন্না এখন অন্য মানুষ। তার উৎসাহ অদমিত। সে নতুন স্থান দেখবার প্রত্যাশায় কাঠবেড়ালির মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে। আর পথের দুপাশে বিস্ময়ে বার বার তাকাচ্ছে। সব নতুন। নতুন। নতুন। কেমন যেন বুক ভরে যায় কি এক অনা-

স্বাদিত অনুভূতিতে। জেমিলি কন্যার কাণ্ড দেখে হেসে ফেললো। মেঘ তার মন থেকে সরে গেল।

মুন্নাকে কেন্দ্র করে আবার সে সেই মুহূর্তে ভবিষ্যতের এক সুন্দর ছবি দেখতে লাগলো। অতীতকে বর্জন করলো। অতীতের সব কথা মন থেকে মুছে নতুন মানুষে পরিণত হল। সে তার পরবর্তী কর্মনীতি মনে মনে তৈরি করে নিল। দিল্লীতে পৌঁছে তার প্রথম কাজ হবে, অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করা। তাহলে হাতে কিছু টাকা আসবে, সেই টাকায় সে ঘর ভাড়া করবে। তারপর সেখানে আবার সে নাচের কসরত করে আসর বসাবে। বয়েস যেটুকু তাকে পিছিয়ে দিয়েছে, সে অভাবটুকু তাব পূরণ করবে। আবার সে সেই অতীতের মত প্রাণচঞ্চল, সুপটু নৃত্যশিল্পী হয়ে উঠবে। তার নাচ দেখে শরিফ আদমীরা বাহবা দেবে। অনেক মুজরো সে পাবে। সুতরাং অর্থের অভাব তার হবে না। বরং প্রাচুর্যের মাঝে মুন্না মানুষ হয়ে উঠবে।

এই সব কথা ভেবে জেমিলির খুব ভাল লাগলো। পথকষ্ট তার অদৃশ্য হয়ে গেল। এমনি সময় সে লক্ষ্য করলো, কে যেন তাদেব পিছু নিয়েছে? লোকটিকে অনেকক্ষণ ধরে তাদের সঙ্গে আসতে দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎ জেমিলি মুন্নাব হাত ধরে থেমে পডলো।

লোকটি সামনে এসে পডলো।

জেমিলি তার দিকে তাকিয়ে মুন্নাকে উদ্দেশ্য করে বললো,—ঐ লোকটিকে জিজ্ঞেস কর, আমাদের কেন পিছু নিয়েছে?

আর মুন্না করলো কি—হঠাৎ সে সেই অতো বড লোকটিকে ঠাস্ করে এক চড মেরে বসলো। লোকটি জেমিলির দিকে তাকিয়ে লুব্ধদৃষ্টিতে হাসছিল। তার হাসি মিলিয়ে গেল। আর অপেক্ষা নয়, লোকটি মুহূর্তে সামনের পথ ধরে দ্রুত মিলিয়ে গেল।

জেমিলি কন্যার আচরণে দারুণ আশ্চর্য হয়ে উঠলো। কত আব বয়েস হয়েছে মুন্নার! কিন্তু মুন্না কেমন যেন এক পরিণত মনের পরিচয় দিল। সে এমনি দৃঢস্বভাবেব পরিচয় দিলে ভবিষ্যতেব বিপদ আর তাদের হবে না। কেমন যেন একটা পরম নিশ্চিন্তে জেমিলি সপ্রশংসিত দৃষ্টিতে মুন্নার দিকে তাকালো। তাবপব আবাব পথ চলতে লাগলো।

তখন বেলা অনেক। ওরা দিল্লীব দিকে এগিয়ে চললো।

তারপর অনেকগুলি বছর বিদায় নিল।

এই এতগুলি বছর অবশ্য এক লম্ফে অদৃশ্য হয় নি। একটি একটি করে দিন মালায় গেঁথে একটি বছর। তারপর এমনি করে অনেক বছর চলে গেল।

মুন্না বড হয়েছে। জেমিলি তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে। মুন্নাকে ভালভাবেই মানুষ করেছে। অভাবের মাঝে নিক্ষেপ করে তাকে দীর্ঘশ্বাসের বুদবুদ অঙ্কিত করতে দেয়নি। সে তার স্বল্প রসদ দিয়েই বিরাট একটি পরিকল্পনা সম্ভব করেছে। আবার তার নর্তকী নাম সবার কাছে প্রচারিত হয়েছে। সে আসর বসিয়েছে। মুজরো করেছে। আমীর লোকের উপস্থিতিতে তার আসর মুখর হয়ে গেছে। এসেছে উপঢৌকন। অঢেল

দৌলত। হীরা, জহরত, চুনি, পান্না যা সে বিক্রি করেছিল, আবার তার সেইসব মূল্যবান রত্নে ঘর ভরে গেছে।

কিন্তু সবই আনন্দের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছিল। শুধু মুন্না নাচ শিখতে চায় নি। কিছুতে তাকে রাজী করানো যায় নি। প্রথম তো আম্মার কর্মপদ্ধতি দেখে সে চমকিত হয়েছিল, এ আম্মা যেন তার নয়। অন্য এক রমণী তার আম্মা নাম নিয়ে তাকে প্রলোভিত করেছে। সে আম্মা দিল্লী আসার পর মারা গেছে। তাই ভ্রূকুটি করে সর্বক্ষণ মুন্না জেমিলির দিকে তাকিয়ে থাকতো। জেমিলির অদ্ভুত আচরণ সে দেখতো। জেমিলি যেন এখানে দশ বছরের পিছনে ফিরে গিয়ে উদ্ভিন্ন যৌবনা যুবতী তরুণী হয়ে উঠেছে। সে যেন নবতরুর মত প্রাণোচ্ছল। কবুতরের মত কলস্বর নিয়ে মুখরিত করে তুলেছে নিজের পরিধি। জেমিলি যত অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় দেয়, মুন্না ততো আশ্চর্য হতে হতে কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যায়।

জেমিলির যেন সেদিকে কোন খেয়াল নেই। খেয়াল থাকলেও কন্যাকে সে জেনেশুনে উপেক্ষা করতো। সে তখন নতুন এক জীবনের মোহে নতুন মানুষ। কিন্তু মোহ যে তার ছিল না পরে বোঝা গেল। মুন্নাকে মানুষ করতে যে অনেক অর্থের দরকার, সেই ভেবেই সে ফুরিয়ে যাওয়া যৌবনের সঙ্গে আবার নতুন ছন্দ পরিয়েছিল।

অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। হ্যাঁ, শুধু নর্তকীর নাচ দেখে আর তার চটুল চাহনি উপভোগ করে খদ্দেররা রত্নের ভাণ্ডার তার হাতে ধরে দেয় নি। আরো কিছু তাকে দিতে হয়েছিল। মুন্নাকে গোপন করেই সে অনেক কিছু করতো। সে এক নেশার মত অন্ধকার গহ্বরে নেমে গিয়েছিল। নিজের ভবিষ্যৎ আর ভাবে নি। আর চরিত্রের প্রয়োজন কি? চরিত্র রাখলে তো তার সঙ্কল্প বানচাল হয়ে যাবে। তাই নিজের কথা ভুলে একমাত্র কন্যার কথা ভেবে সে শুধু দৌলত বাড়িয়ে চলেছিল। আর রমণী যখন তার ইজ্জত রক্ষার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করে না, তখন সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। জেমিলিও তাই হল।

দিল্লীর এক অংশে সে এমন আলোড়ন জাগালো, যা সে তারুণ্যেও জাগাতে পারে নি। শুধু নৃত্য ও গীত। দিনরাত বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের সুরে মনপ্রাণ আচ্ছাদিত হয়ে সে অন্য এক জগৎ সৃষ্টি করে রাখলো। দাসী, বাঁদীর অভাব নেই। তাদের হাতে মুন্নার ভার। মুন্না ঠিক সময়ে আহার, নিদ্রা গ্রহণ করছে কিনা, তাই শুধু সে দেখতো। এ ছাড়া আর কিছু সে জানতে চাইতো না। মুন্নার মনের আর কিছু জানার জন্যে তার কোন আগ্রহ ছিল না। সে জানতো তার কন্যা নাচ পছন্দ করে না। ছোটবেলায় তারও অমনি মনে হত। এখন আর হয় না। এখন মনে হয়, আনন্দ দিতে গিয়েও কি আনন্দ সে পায় না? বরং বহু লুব্ধ চোখের সামনে অঙ্গের কসরত দেখাতে রোমাঞ্চই জেগে ওঠে। বাদ্যযন্ত্র বেজে উঠলে কেমন যেন মনপ্রাণে এক হিল্লোল জেগে ওঠে।

কিন্তু অর্থ সংগ্রহ হলে ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে একদিন জেমিলি আসর বসানো কমিয়ে দিল। আসরের সময় সে কন্যাকে বাঁদীর হেফাজতে একেবারে বাড়ির

অন্তপ্রান্তে সরিয়ে রাখতো। জেমিলি চায় না, সে যা করে তার কন্যা দেখুক। কন্যার জন্যে সে এত করছে আর সেই কন্যা যদি তাকে ঘৃণা করে তাহলে সে মরে যাবে। সেইজন্য সে সতর্কতা অবলম্বন করেছিল।

তারপর আস্তে আস্তে একদিন মুন্না বড় হবে উঠলে সে আসর বসানো প্রায় কমিয়ে দিল। তার নিজের ক্লান্তি লাগছিল বলে নয়, যার জন্যে এই নাচ, গান, আসর—সেই প্রাচুর্য তার কম হয় নি। এখন থামতে হবে। সামনের দরজা বন্ধ করে, অন্দরের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। তার জীবনের জন্যে তো এই আয়োজন নয়! মুন্নার জন্যে তার এই ত্যাগ। একটিমাত্র কন্যাকে কেন্দ্র করে সে তার জীবনের শেষ অধ্যায় রচনা করতে বসেছে।

তাই একদিন সে মুন্নাকে কাছে ডাকলো। মুন্না আর সেই ছোট্ট কিশোরীটি নেই। প্রকৃতিই নিয়মে তার শরীরে কেমন যেন রমণীয় ঐশ্বর্যের আয়োজন শুরু হয়েছে। তার চোখের দৃষ্টিতে মাদকতা, কণ্ঠের স্বরে সঙ্গীতের মূর্ছনা। বক্ষের সীমিতে যৌবনের উত্তালতা। মুখের সৌন্দর্যে কমনীয়তা। আস্তে আস্তে যেন বিকশিত হয়ে উঠছে কি এক ঐশ্বর্যের নতুন সম্ভাবনা।

জেমিলি যেন অনেকদিন পর কন্যাকে দেখলো। এমনিভাবে আশ্চর্য হয়ে তার কন্যার দিকে তাকিয়ে রইলো। তখনই তার মনে হল, দিন পিছিয়ে নেই। সে তার নিজের নিয়মে ঠিক এগিয়ে গেছে। অনেকগুলি বছর সে পার হয়ে এসেছে। এখন আর সময় অপব্যয় করলে হবে না। মুন্নাকে গড়ে তুলতে হবে নিজের দৃঢ় সঙ্কল্প দিয়ে।

তাই সে সম্রাজ্ঞীর মত উঁচু আসনে বসে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। গম্ভীর স্বরে বললো,—মুন্না, তৈরী হয়ে নাও। নাচ কসরত করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য, মুন্না প্রতিবাদ করলো না। বরং মৃদুস্বরে বললো,—আমি তৈরী।

হঠাৎ কেমন যেন জেমিলি বিশ্বাস করতে পারলো না, এত সহজে কন্যা তার রাজী হবে। তাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়ে মুন্নাকে জড়িয়ে ধরলো। আদর করে গাঢ়স্বরে বললো,—তুই রাজী! তুই নাচ শিখবি! তুই নর্তকী হবি!

মুন্না শান্তকণ্ঠে বললো,—হ্যাঁ মা, আমি নাচ শিখবো।

জেমিলির যেন তখনও অবিশ্বাস। কন্যা এত সহজে রাজী হবে সে বিশ্বাস করতে পারে নি। সে আবার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—তুই মনপ্রাণ সমর্পণ করতে পারবি? ঘৃণা করবি না? অশ্রদ্ধা করবি না?

মুন্না তেমনি শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল,—না মা, তুমি যার ওপর নির্ভর করে আমাকে মানুষ করে তুললে, আমি তাকে কেন অশ্রদ্ধা করবো? এখন আমি বড় হয়েছি। বুদ্ধি, বিবেচনা কম হয় নি। নর্তকী আমি হব। এবং তোমার মনের সঙ্কল্প আমি কার্যে পরিণত করবো।

এরপর আর কথা নেই। জেমিলি কন্যাকে স্নেহের মাঝে ধরে তার সেই সঙ্কল্প আবার মেলে ধরলো। জানিস্ আমি কোনদিন বাদশাহের দরবারে প্রবেশের ছাড়-পত্র পাই নি, তুই যদি আমার সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিস্ তাহলে মরেও শান্তি পাবো।

পারবি তো!

মুন্না মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে দৃঢ়স্বরে বললো, – পারবো মা। তুমি আমাকে ভাল করে নাচ শিখিয়ে দাও, আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করবো।

তারপর থেকে বাইরের আসর বন্ধ হল। অন্দরে এক নতুন আসর বসলো। সেখানে সারেঙ্গী, তবলা ও মুন্না। আর জেমিলি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কন্যাকে নাচ শেখাতে লাগলো।

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগলো। জেমিলি নিজেকে একেবারে ভুলে গেল। মুন্নার ভেতর দিয়ে নিজেকে দেখতে লাগলো। মুন্নার রূপের রোশনীতে কক্ষ আলোকিত হয়ে উঠলো। পায়ের ঘুঙুর ছন্দে নতুন এক পৃথিবী সৃষ্টি হল। সারেঙ্গীর স্বর মূর্ছনায় মুন্নার বক্ষের উত্তাল তরঙ্গে ঢেউ উঠলো।

জেমিলি নাচ শেখায়। আর কন্যার নিত্য পরিবর্তনে চমকিত হয়। ফলে ও ফুলে কেমন নতুন সৌন্দর্য বিকশিত হচ্ছে। নিজের তরুণ বয়েসের ছবি ভুলে যায়। কন্যার তারুণ্যের ছটায় তার দেহমন পূর্ণ হয়ে যায়। আর মনে মনে বলে, এবার দিল্লীর সিংহাসনে সেই রাজত্ব করুন, তার কাছে এত্তেলা গেলে আর বিমুখ হয়ে ফিরে আসবে না। মুন্না একদিন রাজদরবারে নাচের বায়না পাবে। সে তার প্রতিনিধি হয়ে বাদশাহকে নাচ পেশ করে মুগ্ধ করবে। আর অদূর নয় তার সেই বাসনা। কিছুদিনের মধ্যেই তার বাসনা চরিতার্থ হবে।

মুন্না তার মায়ের রক্তের সম্মানই রাখলো। মায়ের মতই সে একদিন নাচ শিখে ফেললো। হাতের মুদ্রা, পায়ের ছন্দ, চোখের ইশারা, মুখের হাসিতে সে অপূর্ব এক আকর্ষণ সৃষ্টি করলো। নর্তকীর যে ধর্ম, সে ধর্মে সে অপূর্ব এক ছন্দময় হয়ে উঠলো। যেন সাগরের অনেক অসামান্য ঢেউ। ঢেউয়ের দেহকে কেন্দ্র করে প্রবালের হীরকচূর্ণ।

না, জেমিলি এই দিনটির জন্যেই প্রতিক্ষায় ছিল। এই দিনটির জন্য সে কত বিনিদ্র রাত্রির প্রহর গণনা করে অতিবাহিত করেছে। আজ মুন্না বড় হয়েছে। মুন্না পেয়েছে রমণীর সব কটি রত্ন। রামধনু রঙের মত সাতরঙের বিস্তার করে সে নতুন এক আলোক সৃষ্টি করেছে।

তারপর নাচ। খুব অল্পদিনের মধ্যে মুন্না এমন অদ্ভুত নৃত্যে পারদর্শী হয়েছে, যা দেখে জেমিলি চমকিত।

এদিকে সে তার জীবনের সঙ্কল্প, মনের বাসনা চরিতার্থের জন্য বাদশাহের দরবারে সংবাদ প্রেরণের নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করলো। তখন দিল্লীর সিংহাসনে দ্বিতীয় শাহ আলম। মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেছিলেন। তাঁরই সময়ে পারস্যাধিপতি আহম্মদ শাহ দুরাণী দু'বার ভারত আক্রমণ করেন। প্রথমবার আহম্মদ শাহের হস্তে পরাজিত হলেও দ্বিতীয়বার তিনি জয়লাভ করেন। আর তখনই পাঞ্জাব ও মুলতান পারস্যাধিপতির হস্তগত হয়। ছয় বছর মাত্র রাজত্ব করবার পর আহম্মদ শাহ নিজাম-উল-মুলকের পৌত্র গাজীউদ্দিনের দ্বারা সিংহাসনচ্যুত

ও চক্ষু হারান। তারপর জাঁহাদার শাহের পুত্র দ্বিতীয় আলমগীর সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে ভারতবর্ষ চতুর্থবার আহম্মদ শাহ দুররাণী কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং দিল্লী ও মথুরায় হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন অনুষ্ঠিত হয়।

তার পর বৎসরই বাংলায় পলাশী যুদ্ধ। পলাশী যুদ্ধের ফলে আর এক শক্তির নতুন উদ্ভব হয়, সে হল ইংরেজ। পলাশী যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে বাংলাকে কেন্দ্র করে ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

এদিকে দ্বিতীয় আলমগীর আততায়ী কর্তৃক নিহত হলে তার পুত্র দ্বিতীয় শাহ আলম বাদশাহ বলে ঘোষিত হল। কিন্তু দ্বিতীয় শাহ আলম বাদশাহ হলেও সিংহাসন অধিকার করতে পারেন না। উজির গাজী উদ্দিনের জন্যে তাকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। সেইজন্যে তিনি অযোধ্যার নবাবসুজাউদ্দৌলাও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিতরূপে এলাহাবাদে অবস্থান করেন। তারপর মরাঠাদের চেষ্টায় দিল্লীতে ফিরে আসেন কিন্তু তাঁর তখন কোনই স্বাধীনতা ছিল না। নামে বাদশাহ কাজে পেশোয়ার অধীন। মহারাষ্ট্রের বীর মাধোজী সিন্ধিয়া দিল্লীর সর্বেসর্বা। আর শাহ নিজামুদ্দিন তাঁর প্রতিনিধি। তিনি দিল্লীতে থেকে রাজকার্য করতেন। শাহ আলমের কাজ কিছুই ছিল না, তিনি শুধু বৃত্তিভোগীর মত জীবন যাপন করতেন। আর মন্ত্রী ছিল নাজফ কুলী খাঁ।

যাহোক্, সে সব কথা পরের। বাদশাহের পূর্ব ক্ষমতা অপহৃত হলেও তবু বাদশাহ। পূর্ব পুরুষের রক্তের ধারা তাঁর শিরায় প্রবাহিত। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে রাজ্যে হারিয়েছেন কিন্তু স্বভাব তো হারান নি। তাছাড়া মোগল বাদশাহ যেরকম বিলাস জীবন উপভোগে অভ্যস্ত অন্য আর কে এই জীবনের কদর বোঝে।—তাঁরা যেমন দৌলতের প্রিয় ছিলেন, তেমনি ছিলেন সরাব ও রমণী প্রিয়। কত দেশবিদেশের খুবসুরত সুন্দরীরা যে তাঁদের হারেম আলো করে থাকতে তার ইয়ত্তা নেই। জেমিলি জানে। কিছু কিছু গল্প শুনেছে অন্যের কাছে। কত দেশবিদেশের সুন্দরী রমণীরা এই বাদশাহের হারেম শোভা করবার জন্যে নিজেরাই এত্তেলা দিয়ে পাঠাতো। না, সৌন্দর্য যাচাই করে কেউ ফেরত গেছে বলে কোন কথা আজ পর্যন্ত শোনে নি।

সেই দরবারেই মুন্নাকে পাঠাবে বলে জেমিলি মনস্থ করলো। বাদশাহ আর কিছু না দিতে পারুক, নিশ্চয় বেটির নাচের তারিফ করবে। সুরতের প্রশংসা করবে। তাহলেই তো সব পাওয়া হয়ে যাবে। একটি রমণীর আর কি দরকার? তার নৃত্য তার সুরতের সম্মান পেলেই তো যথেষ্ট।

আর তার অনেকদিনের সাধ পূরণ হবে। সে কতকাল ধরে ইচ্ছে প্রকাশ করে আসছে, বাদশাহের দরবারে নাচবে। সে না নাচুক, তার বেটি নাচবে। আর নাচবে তারই নাচের কৌশলগুলি আয়ত্ত করে। তাতেই তো তার নৃত্য করা হল! তাতেই তো তার ইচ্ছা পূরণ হয়ে গেল! আর অর্থ, দৌলত—দরকার কি? তার যা সঞ্চয় হয়েছে মুন্না একজীবনে শেষ করতে পারবে না। তাছাড়া মুন্না মুজরো শুরু করলে তার প্রাচুর্য আটকায় কে? স্বয়ং মাধোজী সিন্ধিয়াও আমন্ত্রণ না জানিয়ে পারবে না।

সত্যিই একদিন শাহ আলমের কাছ থেকে সংবাদ এল।

সেদিন সবচেয়ে খুশি হল জেমিলি। মেয়েকে সে সাজালো আপন মনের মাধুরী দিয়ে। পরিয়ে দিল নিজের বহু অলঙ্কার বেটির প্রতি অঙ্গে অঙ্গে। দিল একটি অদ্ভুত সুন্দর জরির নাচের পোষাক। বক্ষের উন্নত প্রবালে বেঁধে দিল সবচেয়ে সেরা এক বস্ত্রের কাঁচুলি। চোখে এঁকে দিল সুর্মা অঞ্জন কিন্তু তার চেয়ে দিল মদির এক মায়ামোহ অঞ্জন। যেন রাতের রহস্যময় আঁধারের কালি দিয়ে সেই রঙ তৈরি। প্রথম যৌবনের কৌমার্যে ভরা দুটি ওষ্ঠপুটে এঁকে দিল তাম্বুল। মেহেদি রঙের সাথে আসমানের সুষমা ধরে গণ্ডে পরিয়ে দিল অলক্ত।

তারপর দর্পণের সামনে ধরে মুন্নাকে পরীক্ষা করে খুশি হয়ে বললো, - বাহবা। পুরুষের চিত্ত জয় করতে এর চেয়ে বাহারী সাজ আর জগতে নেই। দরবারে আমি কখনও যাই নি, তবে শুনেছি সেই দরবারের বিরাট জাঁকজমকতা বেহেস্তের সঙ্গে তুলনীয়। বেহেস্ত তবু কল্পনা কিন্তু এ কল্পনা নয়। এখানে আছে প্রকৃতির যতরকম সৌন্দর্য, তারই সমাবেশ। আসমানের সবকটি পরিবর্তিত বর্ণসুষমা দরবারের দেয়ালগাত্রে সজ্জিত। তার ওপর আছে স্তম্ভের গাত্রে হীরা, চুনি, পান্নার রোশনাই। স্বর্গের যদি কোন জৌলুস থাকে তাহলে তার রোশনাই এই দরবার কক্ষেই সবচেয়ে বেশি। সেই স্বর্ণ আচ্ছাদিত দরবার কক্ষে প্রথম প্রবেশ করবার সময় চোখের দৃষ্টিশক্তি ব্যহত হবে। কিন্তু সাবধান, মনে রাখবে সেই শক্তিই তোমাকে জয় করতে হবে। তোমার সৌন্দর্য যাতে দরবার কক্ষের জৌলুসকে ম্লান করতে পারে, তারই প্রয়াস দরকার। আর সেই চেষ্টা সফল হলেই তুমি জয়ী হবে।

মুন্নাকে যেন জেমিলি শ্বশুর বাড়ি পাঠাচ্ছে, এমনিভাবে নানান উপদেশ দিল। সেই অপরিচিত স্থানে নিজের স্বাতন্ত্র্যটুকু বজায় রেখে সৌজন্য প্রকাশ করবে। অহমিকা ত্যাগ করবে, তবে একেবারে পদদলিত হবে না। নিজের সম্মান রক্ষা করে যতটুকু বিনয়ী হওয়া যায়, তাই হবে—তার বেশী নয়। এই সব উপদেশ দেওয়া হলে সে পরিচারিকা সঙ্গে দিয়ে বাদশাহের তাঞ্জামে তুলে দিল।

মুন্না কেমন যেন ভীত হয়ে উঠলো। মায়ের হাত চেপে ধরে বললো,—মা, তুমি আমার সঙ্গে চলো। আমার যেন কেমন ভয় করছে?

জেমিলি বেটির ছেলেমানুষি দেখে হেসে উঠলো। আজ তার মনের উল্লাস কানায় কানায়। কতদিনের আশা তার আজ পূরণ হতে চলেছে। তাই সান্ত্বনা দিয়ে বললো, —ছি, আমার কি সেখানে যেতে আছে? তাছাড়া আজ আমি বৃদ্ধা। সেখানে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

মুন্না তবু বললো,—কেন বাদশাহ নিজে কি বৃদ্ধ নয়?

জেমিলি মেয়ের থুতনি ধরে আদর করে বললো,—পাগলি মেয়ে আমার। তিনি বৃদ্ধ হলেও তিনি বাদশাহ।

তারপর সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করে জেমিলি চাপাস্বরে বললো,—মুন্না, আমি না গেলেও মনে রাখিস, আমি ছায়ার মত তোর পিছুতে আছি। আমার অনেক দিনের বাসনা।

তোকে আজ পাঠাচ্ছি যেন সার্থক করে আসিস্। বাদশাহ যেন খুশির আনন্দে তোকে কণ্ঠের মালা খুলে উপহার দেয়।

জেমিলি আর বলতে পারলো না। কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে থেমে পড়লো। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে চোখে কাপড় চাপা দিয়ে নিজেকে সংবরণ করতে লাগলো। আজ তার অনেক আনন্দ। এত আনন্দ বুঝি কান্নারই রূপান্তর। বাদশাহী তাঞ্জাম চলে গেলে তাই সে কেমন যেন ভয়, ভাবনা নিয়ে ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকলো। তার সন্দেহ হল, মুন্না পারবে তো! মুন্না শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে সাহস হারাবে না তো! যদি হারায়, তাহলে কি হবে? কিন্তু নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে যে তার বেটি তার চেয়ে দৃঢ়স্বভাবের মেয়ে। সে এগিয়ে চলতে জানে, পিছিয়ে আসতে জানে না। আর বুদ্ধিও যেন তার চেয়ে অনেক বেশী। সে একটা কথা কতদিন ধরে ভাবে কিন্তু বেটির কাছে সে ভাবনার স্থায়িত্ব খুব কম সময়ের। সমস্যা সমাধনের জন্যে তার মুখে কোন দুশ্চিন্তার রেখা পড়ে না। তার ওপর চোখ দুটিতে ধূর্ততার আচ্ছাদন। কেমন যেন জগৎটাকে কৌশলের দ্বারা করায়ত্ত করতে পারে, এমনি মনে হয়। সে এখন দরবার থেকে পিছিয়ে আসবে না। বাদশাহের সামনে নাচ পেশ করে তাঁর হাজারো কুর্নিশ নিয়ে বিজয়িনীর মত ফিরে আসবে। সেইজন্যে জেমিলি নিশ্চিন্ত হয়ে অন্যকাজে মন দিল।

মুন্নার আসতে বহু বিলম্ব।

এখন সূর্য প্রভাতের স্নিগ্ধ রূপের পর্ব চুকিয়ে প্রখরতা প্রকাশ করে চলেছে দরবারের কাজ বোধ হয় এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে। রাজকার্য সমাপ্ত হবার পর তার মুন্নার জীবনের পরীক্ষা হবে। জেমিলি বাইরে এসে বহুদূরে দিল্লীর প্রাসাদের তোপধ্বনি শুনতে চাইলো। আসমানের বহুদূরে কটি কবুতর চলে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবলো, 'আমি যদি এই মুহূর্তে কবুতর হতে পারতাম তাহলে দরবার কক্ষের অলিন্দে বসে মুন্নার নাচ উপভোগ করতাম।' শুধু একটি মুহূর্তের জন্যে কবুতর হলে তার মনের বাসনা চরিতার্থ হত। কত কষ্ট করে আজ সে মুন্নাকে মানুষ করেছে। আজ যদি সেই বেটি তার সুনাম অর্জন করতে পারে, তার চেয়ে গর্ব আর কিসে হবে। লুতুফ আলি বেঁচে থাকলে হয়তো মেয়ের এই নাচ শেখা পছন্দ করতো না। হয়তো তার সম্মানে বাধতো। খোদা, যা করে মঙ্গলের জন্যে করে। জেমিলি যদি সেদিন দুঃসাহস প্রকাশ করে কোটানা থেকে চলে না আসতো, তাহলে এই পরিণতি তার সম্ভব হত না। এখন মুন্নাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই ছুটি।

মুন্না যদি কখনও শাদী করে তাহলে সে তাকে বাধা দেবে। বলবে, শাদীর নমুনা তো তোর মায়ের শাদীতেই দেখেছিস্। আগে মনে হত, শাদী করলে বুঝি আওরতের জীবনে সুখ আসে কিন্তু ভুল। বরং একজনের শাসনে রমণীর জীবনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়! তার জীবনের আর কোন আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সে তাই বলবে, মুন্না যদি এমনিভাবে জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারিস্ তার চেয়ে আনন্দের কিছু নেই। বরং তুই নিজের ইচ্ছায় সবকিছু করতে পারবি। কেউ তোর চলা-ফেরায় বাধা দেবে না। কিন্তু সন্দেহ হয় মুন্না শুনবে কিনা! একটি

বয়সের সন্ধিক্ষণে এসে পৌচেছে, যে বয়স তার ছিল, আর অন্যান্য রমণীদেরও থাকে। সেই বয়সের রমণীরা কোন কিছু মানতে চায় না। প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব জয় করে একটি লক্ষ্যেই এগিয়ে যায়। একদিন এমনি সময়ে লুতুফ আলি তাকে এসে অনুরোধ করেছিল। সে তখন ফিরিয়ে দিতে পারে নি, সুতরাং তার কন্যা মুন্নাও পারবে না।

মুন্না যদি একটি রাজপুরুষকে শাদী করে বেশ ভাল হয়। এমনি কত কথাই সেদিন জেমিলি ভাবলো।

মুন্না যেদিন দিল্লীর দরবারে নাচতে গেল সেদিন প্রাসাদে অনেক সেনানায়কদের সমাবেশ। শাহ আলম তখন সবে দিল্লীতে এসে বাস করছেন। এতদিন পালিয়ে বেড়াবার পর একটা নির্ভরতার সাহায্য পেয়ে নিজের আশ্রয়ে এসেছেন। তখন আর উজির গাজীউদ্দিনের ভয় ছিল না। তার তখন শেষ। কিন্তু গাজীউদ্দিন না থাকলেও ভিন্ন শত্রুর আক্রমণ ছিল। সবারই লোভ এই দিল্লীর প্রাসাদ। প্রাসাদের ঐশ্বর্য, বাদশাহী রত্নাগার, হারেমের শোভা। আহম্মদ শাহ দুররাণীর আক্রমণ শেষ হবার পর অন্যান্য শক্তিশালীরা এই দিল্লীকেই উপলক্ষ করে আক্রমণ চালিয়ে চলেছে।

জাঠ সম্রাট তখন সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। তাঁকে পরাজিত করতে গেলে বিপক্ষ অনেকগুলি দলকেই একজোট হতে হয়। মারাঠারাও তখন কোনঅংশে কম নয়। কিন্তু তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরোধ। তবু একসময় তারাই বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এল। আর লক্ষ্য হল জাঠদের উচ্ছেদ। জাঠ সম্রাট নওয়ল সিং তখন দেখলেন সমূহ বিপদ। মারাঠাদের রণনীতির কাছে জাঠবাহিনীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করলেন। কিন্তু মারাঠারা এ সুযোগ পরিত্যাগ করলেন না। এমন কতকগুলি শর্ত তারা জাঠদের আরোপ করলেন, যা স্বভাবত সম্মান হানিকর! কিন্তু উপায় কি? বাঁচতে গেলে প্রবলের কাছে দুর্বলকে নতি স্বীকার করতে হয়। নওয়ল সিং মারাঠাদের সব শর্তই মেনে নিলেন। সন্ধি হল। মারাঠারা জাঠদের মিত্র হল। তখন এই দুই জাতিপুঞ্জ এক জোট হয়ে দিল্লী অধিকার করবে বলে মনস্থ করলো। সঙ্গে এসে যোগ দিলেন রোহিলা আফগান জাব্‌তা খাঁ।

একদিন সূর্যোদয়ের প্রারম্ভে কোলাহল মুখরিত দিল্লীর রাজধানীকে স্তম্ভিত করে শত্রু ঝাঁপিয়ে পড়লো। কামানের গর্জনে ও অসির ঝনঝনানিতে স্নিগ্ধ প্রভাতের প্রকৃতি আতঙ্কিত হল।

শত্রুদের লক্ষ্য দিল্লীবাসীর প্রাণ। লক্ষ্য ঐ দিল্লীর অত্যুজ্জ্বল নবাদশাহী

প্রাসাদ। একদিন যে প্রাসাদের সীমানার কাছ পর্যন্ত কেউ যেতে পারতো না সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি মানুষের ভয়ে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ আতঙ্কিত। সেই আতঙ্ক এখন আর নেই। সিংহাসনে সেই মানুষই বসে আছে তবে তাঁর বাহুবলের শক্তি অন্তর্হিত। তাই সেই সিংহাসন অধিকার করবার জন্যে নানান শক্তিশালী দল একের পর এক আক্রমণ করে চলেছে। আর লুণ্ঠন করে নিচ্ছে বাদশাহী দৌলত। কিন্তু কত নেবে? তৈমুর বংশের এক একটি বংশধর রাজতখতে বসে এত ধনরত্ন ভাণ্ডারে সঞ্চিত করেছে যে তা একেবারে নিঃশেষ করতে নাদীর শাহের মত আরো কয়েকজন লোকের দরকার। তাই আক্রমণের আর শেষ নাই। যে একবার মাথা তুলে দাঁড়ায় সেই একবার করে দিল্লীর প্রাসাদে হানা দিয়ে যায়।

জাঠ, মারাঠা রোহিলারাও এইজন্যে দিল্লী আক্রমণ করলো। বেশীক্ষণ যুদ্ধ না করেই মোগল সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নজফ খাঁকে পরাজিত করে প্রাসাদ অবরুদ্ধ হল। চললো তছনছ। বাধাদানকারী কেউ নেই। তাই বিজেতারা ঐশ্বর্যের মাঝে উন্মত্ত হয়ে উঠলো। শোনা যায়, একা মারাঠারাই নয় লক্ষ আসরফি হস্তগত করেছিল। তার ওপর হীরা, জহরত, চুনি, পান্না প্রভৃতি আছে। এমনিভাবে জাঠরা, রোহিলা আফগান খাঁর বাহিনী কত যে পেয়েছিল, তার কোন হিসাব নেই।

বাদশাহ শাহ আলম শুধু নিজের খাসকক্ষে বন্দী হয়ে দর্শকের ভূমিকা নিয়েছিলেন! আর পূর্ব পুরুষদের তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে খোদাকে জানিয়েছিলেন প্রার্থনা। চোখের জলও তিনি রোধ করতে পারেন নি। কান্না নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে শুধু সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নজফ খাঁকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন।

যাই হোক, লুণ্ঠনকার্য শেষ হয়ে যাবার পর শাহ আলম তিন বাহিনীর প্রতিনিধির সঙ্গে মিলিত হলেন। তাদের সঙ্গে আপোস মীমাংসা করে নিজের সিংহাসন বাঁচালেন। অতিথি হল জাঠ, মারাঠা, রোহিলার সেনানায়কেরা। বাদশাহ তাদের খানার দ্বারা আপ্যায়ন করলেন। সেই উপলক্ষে নাচ, গান, সরাবপাত্র ইত্যাদির দ্বারা উৎসব হল।

এইসময় জেমিলির প্রস্তাব নিয়ে লোক বাদশাহের সঙ্গে দেখা করেছিল। আর বাদশাহ ক'ল বিলম্ব না করে নতুন নর্তকীকে দরবারে নাচ পেশ করার জন্যে আহ্বান জানালেন।

দরবারে সেদিন বাইরের লোকের প্রচুর সমাগম। বড় বড় কেতাদুরস্ত জাঠ, মারাঠা, রোহিলারা আসন অলঙ্কৃত করেছেন। দরবার কক্ষ সাজানো হয়েছে নতুন এক ঐশ্বর্যের রোশনাই দিয়ে। বাদশাহ শাহ আলম অতিথিদের সম্মানে ঐশ্বর্যের কার্পণ্য করেন নি। বরং এই সজ্জায় একটি অর্থ ই প্রকাশ হচ্ছিল, 'তোমরা কত লুণ্ঠন করে নিঃশেষ করবে, করো, মোগল ঐশ্বর্যের শেষ নেই, তা অপর্যাপ্ত। আজকের এই দরবার কক্ষের ঐশ্বর্যই তার প্রমাণ।' ফুলের বিচিত্র বাহারে যেন সহস্র ভ্রমরের আগমন মুখর হয়ে উঠেছে। কারুকার্যময় স্ফটিকাধারে বসরাই গোলাপে রক্তরাগ শোভা। বেলা, চামেলি, গন্ধরাজ, জুঁই—কোন ফুলেরই বাকী নেই। রকমারী ভেলভেট, সাটিন,

মসলিনের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে চতুর্দিক ঘেরা। দরজায় দরজায় জরির ঝালর লাগানো মূল্যবান পর্দা। দরজার এপাশে দুজন, বাইরে দুজন প্রহরিণী। তাদের রূপের যেমন রোশনাই আছে, পোষাকেও তাই। সবচেয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেয় আলোর বর্ণাঢ্যে। স্বর্ণনির্মিত কারুকার্যময় বাতিদান যে কত তা'র ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন ধরনের অদ্ভুত অদ্ভুত সব বাতিদান। কোন বাতিদানের চতুর্দিকে হীরকের টিপ। হীরকের ওপর আলো পড়ে অন্য এক রূপের প্রতিফলন জাগিয়েছে। চুনি, পান্না, মুক্তার বিভিন্ন বাতিদান। একে এই সব মূল্যবান প্রস্তর থেকে এমনিই আলোর রোশনাই ছড়ায়। তার ওপর আলো পড়লে। সুতরাং শাহ আলম যেন ইচ্ছে করেই অতিথিদের আরো উত্তপ্ত করার জন্যেই সুকল্পিতভাবে দরবার কক্ষ সাজিয়েছিলেন। তার পর চাঁদোয়ার ওপর থেকে অসংখ্য ঝাড়ের বাতি।

মোগল সাম্রাজ্যের দিল্লীর দরবার জগতের সেরা দৌলত দিয়ে সজ্জিত—এ মনে হয় কারুরই অজানা নয়। তবু বার বার লুণ্ঠিত হয়ে হয়ে এখনও যা আছে, সে সময়ের জাঠ দরবারের সঙ্গে তুলনা হতে পারে। তবু জাঠ সম্রাটকে সেদিনের ঐ দরবার দেখে স্বীকার করতে হত, 'না অস্তমিত সূর্যের শেষরশ্মিও এত প্রখর যে তার সামনে চোখ আপনা থেকেই নত হয়ে যায়।'

যাই হোক, শাহ আলম সিংহাসনে বসে অতিথিদের পাশে আসন দিয়েছিলেন। রাজবাদ্যকাররা অনেকক্ষণ থেকে যন্ত্রসংগীতে তান তুলেছে। উদ্দেশ্য, পরিবেশটিকে মধুর থেকে মধুরতর করা।

সেদিন দরবারে নৃত্যগীত ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তাই সরাব পানের কোন নিষেধ নেই। সরাব বিতরণ করছিল অল্প-বয়েসের সুন্দরী যুবতী সব রমণীর দল। তাদের বাঁদী বলে কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। বাছা, বাছা রূপসীরা স্বল্পবসনে কমনীয় দেহসুষমা প্রখর করে অতিথিদের আপ্যায়ন করে চলেছিল। এর মধ্যেও যেন বাদশাহের কল্পনার ছোঁয়াচ ছিল।

বাদশাহ শাহ আলম সেদিন যে কি চেয়েছিলেন বোঝা যায় নি। তবে তাঁর অতিথি আপ্যায়নের দিকে সজাগ প্রখর দৃষ্টি ছিল যে, মনে সন্দেহই জাগে। শুধু কি তিনি অতিথি আপ্যায়নের জন্যেই এই যত্ন নিতে আগ্রহী হয়েছিলেন, না অন্য মতলব ছিল। যাই হোক, যাই থাক্ বিপক্ষদলের নায়করা বাদশাহের বনেদী মেজাজের নমুনা দেখে দারুণ খুশি হয়ে উঠলো। পরস্পরে আলোচনা করলো তারা, মোগল ঐশ্বর্যের যেমন তুলনা হয় না, মোগল বাদশাহদের রুচিজ্ঞানের তারিফ করতে হয়। জহুরী যেমন জহর দেখলেই কাচ বলে ভুলে করে না, তেমনি বাদশাহ মেকী জৌলুসের কার-বার করে মহফিল বরবাদ করে না।

সেই দরবারেই মুন্নার নাচ। মুন্না অবশ্য একা নয়। আরো অনেকগুলি নর্তকীই নাচবার ফরমাইস পেয়েছিল। বাদশাহের নিজস্ব নর্তকী ও বাইরের কয়েকটি ভাড়া করা নর্তকীও ছিল। নাচ শুরু হয়ে গেল একসময়। প্রত্যেক নর্তকীই সুপটু নৃত্য শিল্পী। ছন্দ, লয়, তাল, অঙ্গের দোলন, চোখের মায়ামোহ চাউনি সবই ছিল। এ

সব কৌশল নর্তকীর না থাকলে অবশ্য নর্তকী হওয়া যায় না। রূপ যেমন নর্তকীর থাকা চাই, যৌবন যেমন প্রস্ফুটিত কুসুমের মত হবে, তেমনি হবে আর আর অন্য সব উপকরণ। মুন্নার সে সবই ছিল। সে খর্বকায় হলেও তার প্রস্ফুটিত যৌবন ছিল প্রসূনের মত। তার হাসিতে ছিল ঝর্নার সুর লহরী। বুকের কৌস্তুভরত্নে ছিল মাখনের পেলবতা। শরীরের প্রতিটি রমণীয়-বাঁকে ছিল পুরুষের কামনা জাগার আমন্ত্রণ।

নর্তকীরা অন্য জায়গায় অপেক্ষায় ছিল। তাই মুন্না দরবার কক্ষের জাঁকজমকতা দেখতে পায় নি। সে অন্যদের সঙ্গে বসে বসে তাই ভয়ে কম্পিত হচ্ছিল। তবে তার সাহস ছিল অদম্য, সেই সাহস নিয়েই সে তার ডাকের অপেক্ষায় ছিল।

সাতজনের পর তার ডাক এল।

সঙ্গে সঙ্গে তার মাকে মনে পড়লো। মায়ের কথাগুলি ভেসে এল, মুন্না আমার সাধ পূরণ করিস। আমি অনেক কিছু হারিয়ে তোকে মানুষ করেছি। আজকের এই দিনটির অপেক্ষায় আমার জীবনের এই এতগুলি বছর অপেক্ষায় আছি। আমি যা পাই নি, তুই সেই আমন্ত্রণ অনায়াসে পেয়েছিস। মনে রাখিস, আমার ছায়াই তোর মধ্যে আছে। তোর সাফল্যে আমার আনন্দ গগন সীমা অতিক্রম করবে।

ভাববার সময় নেই। আহ্বান কর্ত্রী সম্মুখে দণ্ডায়মান। ওদিকে হয়তো সমস্ত দরবার কক্ষের লুব্ধ দর্শকেরা সাগ্রহে অপেক্ষায় আছে। তাই মুন্না পরীক্ষার সম্মুখীন হবার জন্যে রমণীটিকে অনুসরণ করলো।

মা যা বলেছিল তাই ঠিক। মুন্না দরবার কক্ষের মধ্যে ঢুকে কেমন যেন দৃষ্টি হারিয়ে ফেললো। ওদিকে জোরালো বাজনার সুরে নৃত্যের ছন্দ সৃষ্টি হয়েছে। মুন্না কাউকেই দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু দৃষ্টি স্বচ্ছ হলে বহুদূরে দেখতে পাচ্ছিল কতকগুলি আলঙ্করিক আসন, তার ওপর রাজসিক পোষাক পরা রাজপুরুষ। কি এতদূরে তাঁরা বসে আছেন, যে তাদের মুখাকৃতি দৃষ্টি গোচর হয় না।

মুন্না নাচ শুরু করলো। মায়ের শিক্ষায় অদ্ভুত এক নাচের কৌশল। ঐ নাচের কৌশলগুলি বুঝি কারুর জানা নেই। এমনি ঘরানা বুঝি সারা হিন্দুস্তানে দুর্লভ। ফরাসের হর্ম্যতলে, শুভ্র আলোর রোশনায়ের মাঝে কে যেন একটি ফুলের কুঁড়ি ঘুরিয়ে দিয়েছে। নেচে চলেছে মুন্না যন্ত্রের তালে তালে নিটোল দেহে দোলন জাগিয়ে! সুরের মূর্ছনায় তবলার দ্রুত তালে পেশোয়াজ ওড়না তার কেমন যেন নির্লজ্জ হয়ে ঘুরছে। দেখা যাচ্ছে তার আবীর ছোঁয়া দুটি নিটোল পায়ের অনেক খানি। যেন বিকশিত শতদল তার বর্ণসুষমা উজ্জ্বল করে দর্শকের লুব্ধ চোখের দৃষ্টি হরণ করছে। মুন্নার দুটি ডাগর চোখের দৃষ্টিতে কামনা হরণের আকৃতি। চটুল চাউনিতে কি যেন এক শিহরণ জাগানো মাদকতা। বক্ষের ওড়না আলোর ঝাড়ের বুকে দোপাট্টার মত। বক্ষের কাঁচুলির অভ্যন্তর থেকে সাগরের ঢেউ জাগানো ইশারা। কাঁচুলি ছিঁড়ে যেন কি উন্মুক্ত হয়ে সেই আসরের মাঝে বিকশিত হয়ে উঠতে চায়।

মুন্না নেচে চলেছে। তার কপালের শুভ্র জমিনে মুক্তার মত স্বেদবিন্দু। সে

যেন চৈতন্যহারা। তার যেন তখনও মনে ছিল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে তার মায়ের মেহনত সব বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তার শেষ শক্তিটুকু প্রয়োগ করে এতাদন ধরে মার কাছ থেকে যা তালিম নিয়েছিল, সবটুকু নিঃশেষ করে দিয়ে চলেছে।

কিন্তু একি? দীর্ঘ সময় ধরে রেওয়াজ করা পা দুটি কেন হঠাৎ অনড় হয়ে আসছে। কেন হাঁটুর নিচের অংশটুকু বসে যেতে চাইছে? তবে কি সে হেরে যাবে? মায়ের প্রতিজ্ঞা কি রাখতে পারবে না? শক্তি কেন নিঃশেষ হয়ে আসছে?

দর্শক মুগ্ধ হয়েছিল। বিমূঢ় হয়েছিল। স্তব্ধ হয়ে বাহবা দিতেও ভুলে গিয়েছিল।

কয়েক শত চোখ শুধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে উপভোগ করছিল মুহূর্তগুলি। বিরাট মর্মর খচিত দরবার কক্ষের রক্ত রাঙা ফরাসের ওপর মুন্না একা। আর দূরে দূরে বিভিন্ন ভাগে ভাগে দর্শকের সারি।

হঠাৎ এমন সময়ে এক গাছি বৃহৎ মুক্তার মালা মুন্নার দিকে ছুটে এল।

একটু অবসর। মুন্না সেই দাতাকে দেখবার জন্যে চোখ দুটি তুলে ধরলো। কিন্তু ততক্ষণে মোহর, আসরফি, মালা হরেক উপহার ছুটে এসে মুন্নার সামনে পড়লো।

এতক্ষণ সকলেই এই অদ্ভুত নর্তকীর নৃত্য বিস্ময় বিমূঢ় চিত্তে বক্ষের মধ্যে আনন্দের জোয়ার চেপে উপভোগ করছিল। এমন কি সরাবের পাত্র মুখে তুলতেও সবাই ভুলে গিয়েছিল।

চৈতন্যোদয় হল মুক্তার মালা হঠাৎ পড়তে। তখন সকলেরই আপসোস হল, কেন তারা আগে দিল না।

নাচের পুরস্কার। সুরতের ইনাম। যৌবনের নৈবেদ্য।

মুন্না নাচ থামিয়ে স্মিত হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে অভ্যাগতদের সেলাম পেশ করলো।

এই সময় যে প্রথম মুক্তার মালা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সে তার আসন থেকে উঠে এল। দীর্ঘ আকৃতি। রক্তাভ বর্ণ। বিশাল বক্ষ, বলিষ্ঠ বাহু। বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখ দুটি কিন্তু মুখটি কেমন যেন বিষণ্ণ। কেমন যেন আঘাতের বেদনায় মুখের উজ্জ্বলতার ওপর ম্লান ছায়া। মাথায় সোনালী চুলগুলি যত্নাভাবে অবিন্যস্ত। কিন্তু শরীরে সৈনিকের পোষাক নয়, মুসলমান বাদশাহের পোষাকের মত জমকালো আঁটসাঁট পিরান, সরু পায়জামা। মাথায় মুসলমানী টুপি। মুসলমানের পোষাক পরলেও সে যে মুসলমান নয়, তা তার চেহারাতেই প্রতীয়মান। বরং ফিরিঙ্গী কোন সাহেব, সাহেবী পোষাক অথবা সৈনিকের পোষাক পরলেই মানাতো ভাল।

লোকটি সেই ফরাসের হর্ম্যতলে একেবারে মুন্নার অতি কাছে চলে আসতে মুন্না ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি আবার অনেকগুলি সেলাম পেশ করে সে স্মিতহাস্যে লজ্জায় রাঙা চোখ দুটি অবনত করলো।

লোকটি কিন্তু শুধু দুঃসাহসী নয়, নির্লজ্জ। হঠাৎ মুন্নার চিবুকটি স্পর্শ করে মুখটি তুলে ধরে সেই অফুরন্ত আলোর মাঝে জহুরীর মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার চোখ দুটি দেখতে লাগলো। তারপর অস্ফুটস্বরে বললো,—বাঃ বহুত খুবসুরত। নাইস্ ওম্যান।

লোকটির লজ্জা নেই কিন্তু মুন্না যেন এক গাদা লোকের সহস্র চোখের সামনে রক্তিম হয়ে মাটিতে মিশিয়ে গেল। তার ওপর প্রথম পুরুষের স্পর্শ। সমস্ত শরীরের রোমকূপে কি যেন অস্বাভাবিক শিহরণ। শিরায় রক্তের স্রোতে বিরাট এক আলোড়ন। কি যে অনুভূতি বোঝানো যায় না। ভাল লাগছে অথচ দারুণ রাগ আছে। ইচ্ছে করছে, মুগ্ধ লোকটিকে কটু কথা বলে তাড়িয়ে দিতে।

হঠাৎ সেই লোকটি বললো,—তুমি থাকো কোথায়? সংসারে তোমার আর কে আছে?

মুন্না বলবার জন্যে চেষ্টা করলো কিন্তু মুখ দিয়ে তার কথা সরলো না। কে যেন বাক্‌শক্তি তার হরণ করলো।

লোকটি সে কথা বুঝে অল্প একটু হাসলো, তারপর বললো,—আমার নাম ওয়ালটার রীনহার্ড। আমার জন্মস্থান ফ্রান্স-জার্মান সীমান্তের লাক্সেমবুর্গের ট্রেভ্‌স অঞ্চলে। এদেশে এসেছি ভাগ্য পরিবর্তনে। লোকে আমাকে এখানে সোম্বার অর্থাৎ সোমরু বলে ডাকে। তুমি আমাকে শাদী করবে?

শেষোক্ত কথায় মুন্না চমকিত হল।

কিন্তু সোমরু তখন চতুর্দিকে তাকিয়ে অন্যান্য অভ্যাগতদের দেখছে। কেউ কেউ রসিকতা করলো। তার উত্তরে সোমরু চিৎকার করে বললো,—যে রমণী এত সুন্দর নাচতে পারে, তাকে যে কোন আদমী শাদী করবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে পারে। তোমরাও সুবিধা পেলে এই সুযোগ নিশ্চয় পরিত্যাগ করতে না!

বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে এই সময় এত্তেলা এল, তিনি দুজনকে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।

বাদশাহ সেই দরবারের একেবারে শেষপ্রান্তে উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন।

ওরা এগিয়ে গেল সেই দিকে। কাছে গিয়ে বাদশাহকে কুর্নিশ করতে বাদশাহ কুর্নিশের সমর্থন জানিয়ে মৃদু হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত করে, মুন্নাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—তোমার নাম কি বেটি?

যেন একটি বিস্ময়কর নাটকের অভিনয় চলছিল। যা কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত মুন্না স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি! সে চেয়েছিল নাচের সুখ্যাতি নিতে। বাদশাহকে খুশি করতে। মায়ের ইচ্ছা পুরণ করতে। কিন্তু তারপরেও যা ঘটছে, এ যেন তার অচিন্তনীয় ছিল! তাই তাঁর মুখে ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময় জাগছিল। পাশে সোমরু বলে একজন লোক তার সবকিছু অধিকার করতে চায়। সে কোন ছলাকলার আশ্রয় নেয় নি। স্পষ্টই সে তার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে। সাহস আছে। শুধু সাহস নয় দুঃসাহস। লোকটি মনে হয় যোদ্ধা। যোদ্ধার মতই বীরত্ব ব্যঞ্জক চাউনি। তার সন্মুখে বাদশাহ শাহ

আলম। রাজসিক সিংহাসনে বসে রাজসিক পোষাকের জৌলুসে নিজের ব্যক্তিত্ব সকলের উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। কত কাছে বাদশাহ বসে আছেন, অথচ মনে হচ্ছে যেন কতদূরে। হাত বাড়ালে চতুর্দিক থেকে রক্ষীরা এসে তার গর্দানি নেবে। যেমন একটি মূল্যবান জিনিসে হাত দিতে গেলে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়, ঠিক তেমনি।

সেই মুহূর্তে মুন্না ভাবলো, বাদশাহ নিজেও তো মানুষ। তবে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না কেন? তবে কি তিনি কতকগুলি রাজসিক পোষাক পরে আছেন বলেই এই দ্বিধা? আচ্ছা যদি বাদশাহ রাজসিক পোষাক ছেড়ে সাধারণ পোষাক পরেন, তাহলে কি এই দূরত্ব নষ্ট হতে পারে?

যাকৃগে এসব আবোল-তাবোল চিন্তার কোন অর্থ নেই। তার আজ অনেক বেশী সৌভাগ্য, সে বাদশাহকে কত কাছ থেকে দর্শন করতে পেল। মা শুনলে দারুণ খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরবে।

এসব কথা ভাবতে কিন্তু মুন্নার খুব বেশী সময় ব্যয়িত হল না। সে মুহূর্তে বাদশাহের কথার জবাব দিল,—মুন্না।

বাদশাহ স্মিতহাস্যে রক্তিম মুখখানি আরো উদ্ভাসিত করে বললেন,—না, মুন্না নাম বাচ্চা লড়কীর, তোমার নাম জেব-অল-নিসা। সেরা সুন্দরী রূপসীর এই নামই শোভা পায়। তারপর বললেন,—তোমাকে নাচ শিখিয়েছে কে?

আমার আম্মা।

বাদশাহ বিস্মিত হয়ে বললেন,—তোবা, তোমার মা এত সুন্দর নাচতে জানেন?

মুন্না চুপ করে থাকলো।

বাদশাহ আবার বললেন,—বহুত খানদানী নাচ তুমি পেশ করেছ। আমি বহুত খুশি হয়েছি। এমন নাচ আমি বহুত দিন দেখিনি। তুমি কি পুরস্কার নেবে পেয়ারী বেটি? বাদশাহকে যে খুশি করে মোগল কানুনে তাকে পুরস্কার দেওয়ার রেওয়াজ আছে। তুমি যা বলবে, এই বাদশাহ তাই দিতে বাধ্য। তারপর মৃদু হেসে বললেন, —মোগল কানুনের রেওয়াজ ছাড়াও বাদশাহ তোমাকে নিজস্ব খুশি থেকে কিছু দিতে আগ্রহী।

সোমরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উভয়ের কথোপকথন শুনছিল। এবার সে মুন্নার দিকে সাগ্রহে উত্তরের অপেক্ষায় তাকিয়ে থাকলো।

মুন্নার কথা বলতে ভয় করছিল। ক্ষণে ক্ষণে নানান সৌভাগ্যের উদয়ে সে কেমন যেন বিব্রত হয়ে যাচ্ছিল। বাদশাহের পরবর্তী প্রস্তাবে কেমন যেন সে আরো সঙ্কুচিত হল। মা বলে দিয়েছিলেন, বাদশাহ খুশি হলে পুরস্কার দিতে চাইবেন, তুই না নিলেই আমি সুখী হব। লোভ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি দৌলত সঞ্চয় করা মানুষের ধর্ম। একদিন এই অর্থের জন্যে আমাকে অনেক নিচু কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু ধনসম্পত্তি আমি করেছি। আর তা তোর জন্যে করেছি। বাদশাহের আশীর্বাদটুকুই যাচ্ঞা করবে, এ ছাড়া কিছু নেবে না। তাতে বাদশাহ সাময়িক অখুসী হবেন কিন্তু ভবিষ্যতে তোর আচরণে মুগ্ধ হয়ে তোকে স্মরণ করবেন।

সেই কথা স্মরণ হতে মুন্না সঙ্কোচ কাটিয়ে লজ্জিতস্বরে বললো,—আপনার আশীর্বাদই আমার কাম্য শাহনশাহ্। এ ছাড়া বাঁদীর আর কিছু প্রার্থনা নেই।

আবার বিস্মিত হলেন বাদশাহ। কিছুক্ষণ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপর বললেন,—বেশ আশীর্বাদই আমি তোমায় দিলাম। তুমি শুধু নর্তকী নামেই সুখ্যাতি পাবে না, তোমার রমণী সম্ভ্রমের অনেক উর্ধ্বে যে আর এক মর্যাদা আছে, সে মর্যাদায় তুমি অভিসিক্ত হবে। তবে তোমার অনেক প্রাপ্য থাকলো, প্রয়োজন হলে তা নিতে কার্পণ্য ক'র না। তারপর তিনি সোমরুর দিকে ফিরে বললেন,—মিঃ রীনহার্ড, আমার প্রস্তাব নিশ্চয় বিস্মৃত হননি! আমি কিন্তু সাগ্রহে আপনার সমর্থনের অপেক্ষায় থাকবো।

সোমরু নিঃশব্দে মাথা নত করে অভিবাদন জানালো।

বাদশাহ মুন্নার দিকে আবার তাকিয়ে বললেন,—আজ তোমায় নাচের যে সবচেয়ে বড় তারিফ করেছে, তার কোন প্রার্থনা যদি সম্ভব হয় পূরণ কর বেটি। কোন্ সুদূর দেশ থেকে এসে নিজের শক্তি ও সামর্থ্যে যতটুকু উন্নতি করেছেন, তার তুলনা পৃথিবীতে বিরল। আমি এই বীর সৈনিকের প্রশংসায় এতই মুখর যে তাঁর কোন শ্রীবৃদ্ধি দেখলে আমার মন সবচেয়ে সুখী হবে।

মুন্না এক বুক সৌভাগ্য নিয়ে মনের মধ্যে খুশির জোয়ারে নৃত্য করতে করতে দরবার কক্ষের বাইরে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সেই সোমরু।

রাত্রি তখন বেশ গভীর হয়ে আসছিল। দরবার কক্ষের বাইরে একটু উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়াতে মুন্না দেখতে পেল, চাঁদের জ্যোৎস্না ধারায় স্নান করেছে ধরিত্রী। এতক্ষণ দরবারের সহস্র জোরালো আলোর মাঝে থেকে চোখের যে ক্লেশ অনুভূত হয়েছিল, এই জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোয় তা শান্ত আকার ধারণ করলো।

সামনেই বাদশাহী তাঞ্জাম। শুধু তাঞ্জাম নয়, আরো অনেক উপঢৌকন সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে বাদশাহের লোক। বাদশাহ যে শুধু তাকে ফিরিয়ে দেন নি, সামনেই তার প্রমাণ।

মুন্না মনে মনে দারুণ পুলকিত হয়ে তাঞ্জামে উঠতে গেল কিন্তু কি মনে করে একবার থেমে পাশের দিকে তাকিয়ে সলজ্জভঙ্গিতে বললো,—আপনি কি আমার সঙ্গে যাবেন?

সোমরু মৃদু হেসে বললো,—এত রাত্রে কারুর নিবাসে যাওয়া শোভন নয়। শুধু তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমার কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করবো।

মুন্না আর কিছু বললো না। মনে কিসের যেন এক পুলক এসে তাকে নির্বাক করে দিল। সে নিঃশব্দে তাঞ্জামের মধ্যে উঠে বসলো। তাঞ্জাম চলতে লাগলো দুলকি চালে। সঙ্গে সেই উপঢৌকন সামগ্রী নিয়ে কয়েকটি লোক।

দিল্লীর প্রাসাদের বাইরে দিয়ে যখন তাঞ্জাম চলতে লাগলো, তখন মুন্নার কানে গেল অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। কানে যেতেই মন তার কেমন যেন নেচে উঠলো। তার রমণী মনে কি যেন এক পুলকের সঞ্চার হল। তার কণ্ঠে গজল গীতের এক সুরবাহার সুরের মূর্ছনা আকুলি-বিকুলি করে উঠলো।

আজ তার জীবন সার্থক। মা তার কত খুশি হবে। মার খুশিতেই সে আজ

সম্পূর্ণ। কিন্তু মা যখন শুনবে, সে শুধু বাদশাহকে খুশি করে নি, আর একজন সৈনিকপুরুষকে সে খুশি করেছে। আর সেই সৈনিক খুশি হয়ে তার জীবন ও যৌবন অধিকার করতে চেয়েছে। মা কি খুশি হবে? মুন্নার সন্দেহ হল। মা অনেকবার বলেছিল, বেটি শাদী না করে যদি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারিস, তারই চেষ্টা করিস্। আমি কেন একথা বললাম, আজ বুঝতে পারবি না কিন্তু একদিন বুঝতে পারবি। ওরে, শাদীর স্বপ্ন দেখা অনেক ভাল কিন্তু শাদীর পর সে স্বপ্ন আর থাকে না। জীবন বরবাদ হয়ে যায়। সমস্ত আলো চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে নিবিড় আঁধারের জমাট স্তব্ধতা ঘিরে ধরে। তখন চোখের জলে দরিয়া ভেসে গেলেও কেউ সান্ত্বনা জানায় না। তাই আমার অনুরোধ, তুই যদি শাদী না করে জীবনকে অন্যভাবে কাটিয়ে দিতে পারিস্, তার চেষ্টা করবি।

তখন মুন্নার মনে হয়েছিল, মাকে সে জিজ্ঞেস করে, অন্য কি ভাবে আওরতের জীবন কাটানো যায় মা!

কিন্তু জিজ্ঞাসা না করতে মা-ই উত্তর দিয়েছিল—নাচকে আপন করে নে। নাচের সাথে মহব্বত কর, কত নওজোয়ান এসে তোর পায়ে মাথা খুঁড়বে। তুই ফুলের মত সৌরভ ছড়িয়ে নেশা জাগাবি, ধরা দিবি না। তারা পাগল হবে, উন্মত্ত হবে—তারপর তোকে অভিসম্পাত দিয়ে চলে যাবে। তুই একলা খিলখিল করে হেসে লুটিয়ে পড়বি।

মুন্নার আবার বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—মা, এ যে বেইমানী। কিন্তু তখন সে একটি কথাও বলে নি! শুধু অবাক হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

জেমিলির চোখে তখন জল। গণ্ড বেয়ে জলের ধারা নেমে চলছে অবিরল ধারায়। জেমিলির কোন বাধা নেই। সে সেই জলভরা চোখেই বললো,—আমি জানি তুই পারবি না। জোয়ানি রক্তে যে খুনের নেশা আছে, সে তাকে স্থির থাকতে দেবে না। আমিও পারি নি। কিন্তু কি পেয়েছি? একটা অনিশ্চিত জীবং থেকে বাঁচবার জন্যে আর একটি নিরাপদ আশ্রয় ধরতে গিয়েছি, আর তার পরিণাম আজ এই সাংঘাতিক পরিণতিতে শেষ হয়ে গেল।

তাই মুন্না সেই তাঞ্জামে বসেই বার বার ভাবতে লাগলো—এত আনন্দের একি দুশ্চিন্তা? মাকে আঘাত দিয়ে সে কি করে এ কথা বলবে?

তাঞ্জামের মধ্যে তখনও অশ্বক্ষুরের ধ্বনি ভেসে আসছিল।

সেদিন মুন্না বলেনি, মায়ের বেদনাকে পরিহার করবার জন্যে গোপন করেছিল কিন্তু একদিন আর গোপন থাকলো না। সোমরু এর মধ্যে কয়েকবার অশ্ব ছুটিয়ে তাদের বাড়ি ঘুরে গেল। জেমিলির সঙ্গে আলাপ করে গেল, মুন্নার অনেক প্রশংসা

করলো। বাদশাহ শাহ আলম আরো দুবার তাঞ্জাম পাঠিয়ে দিয়ে মুন্নাকে নিয়ে গেলেন।

এই সব দেখেই জেমিলির সন্দেহ হল, সে একদিন সরাসরি মুন্নাকে কাছে ডেকে স্পষ্ট করে ডেকে জিজ্ঞেস করলো,—ঐ ফিরিঙ্গী সাহেবটা প্রায় এখানে আসে কেন রে?

মুন্না প্রসঙ্গটি চাপা দেবার জন্যে তাচ্ছিল্য করে বললো,—কে জানে কেন? বোধহয় আমার নাচ ভাল লেগেছিল বলে তাই আসা-যাওয়া করছে।

জেমিলি তার উত্তরে রূঢ় হয়ে বললো,—ফিরিঙ্গীসাহেব তোমার কাছে কেন আসে? আমি এসব পছন্দ করি না, তুমি বুঝতে পারো?

মুন্না প্রসঙ্গটিকে হালকা করবার জন্যে বললো,—বারে, তা আমি কি করবো? নর্তকী হয়েছি, নাচের তারিফ করে। তাছাড়া সাহেব একজন বড় জোরদার আদমী। বাদশাহ তাকে খুব পেয়ার করেন। তার ক্ষমতাকে সেলাম জানান। কয়েক ব্যাটেলিয়ান শিক্ষিত সৈনিক নিয়ে সোমরু সাহেব বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। বাদশাহ তাকে ছয় লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের জায়গীর দিয়ে তাঁর সেনানায়ক করতে চান। এ লোককে আমি কি করে দুর্ব্বহার করে তাড়িয়ে দেব?

মুন্নার স্মরণে এল বাদশাহ শাহ আলমের কথা। তিনি পর পর দুবার যে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন, তার মধ্যে সোমরুর কথাটাই বেশী ছিল। তিনি সোমরু সম্বন্ধে অনেক ইতিহাস তার কাছে পেশ করেছিলেন।

সোমরু যে কত বড় একজন শক্তিমান পুরুষ, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই বিদেশী সাহেবের সামরিক কৌশল এত প্রখর ও বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ যে কোন সেনানায়কই তার সঙ্গে পেরে ওঠে না। জাঠসম্রাটরা এই শক্তিমান পুরুষের কাছে সবসময়ে কৃতজ্ঞ?

সেইজন্যে বাদশাহ ঠিক করছেন, রাজভাণ্ডারের যে কোন দৌলতের বিনিময়ে এই রণনিপুণ যোদ্ধাকে নিজের করে রাখবেন। বেতন দেবেন মাসিক পঁয়ষট্টি হাজার টাকা, তাছাড়া তার সেনাদলের ব্যয়ভার রাজসরকার থেকে প্রদত্ত হবে। এছাড়া তিনি আরো এক বিরাট জায়গীর দিয়ে সোমরুকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। মীরাটের মাইল বারো দূরে সরদানায় বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকা আয়ের একটি জায়গীর দিতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্য, দিল্লীর কাছে কাছে থাকলে সোমরুর সাহায্য সবসময় প্রার্থনা করা যাবে। আরো তিনি দেবেন, যদি সোমরু তার কার্যভার গ্রহণ করে। তার প্রতিষ্ঠাই বাদশাহ চান। চিরকাল মোগল বাদশাহরা বীরকে পূজা করে এসেছেন। সম্রাট আকবর সেনাপতি মানসিংহকে সম্মান করতেন। ঔরঙ্গজেব মীরজুমলাকে ভয় করতেন। বীরকে ভয় করা প্রতি মানুষের ধর্ম। মোগল বাদশাহরা কেউই দুর্বল ছিলেন না, তাছাড়া তাঁরা বীরকে সম্মান করতে জানেন। সেই জন্যে সোমরুকে একান্ত দরকার। সোমরু বিদেশী হলেও অসীম শক্তিধর। তার মনঃতুষ্টির জন্যে যে কোন অঙ্গীকার বাদশাহ শাহ আলম করতে পারেন? বিনিময়ে সোমরু মোগল সৈন্যের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে বাদশাহের কর্মচারী নিযুক্ত হবে।

মুন্না তার অনেক পরে ডাকার অর্থ উপলব্ধি করতে পারলো। বাদশাহ শাহ আলম খুব স্পষ্ট বক্তা এবং স্বার্থসন্ধানী। সোমরুর সঙ্গে মুন্নার প্রীতির সম্পর্ক লক্ষ্য করে তিনি মুন্নারই সাহায্য নেবার প্রচেষ্টায় আগ্রহান্বিত হয়েছেন। তাই মোলায়েমকণ্ঠে বললেন,—মেরে পেয়ারী বেটি,

'গরচে মান লয়লি আসাসম্ দিল চো মজনু
দার হাওয়াস্ত
সর্ বসাহরা মি জানম্ লেকিন হায়া
জঞ্জির পাস্ত্।'

তারপর মুন্না নির্বোধের মত তাকিয়ে আছে দেখে ম্লান হেসে বললেন,—অর্থ বুঝতে পারলে না, বেটি। কবি, 'লায়লী—মজনু' মহব্বতের গীতকাব্য রচনা করে জগতে অমর এক ভাবোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রেমিকা লায়লি যেমন প্রিয়তম মজনুর জন্যে পাগলিনী হয়ে মরুপ্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছিল, আমার ইচ্ছা হয় আমি তেমনি করে ছুটে বেড়াই, কিন্তু আমার পা যে সরম সম্ভ্রমের শৃঙ্খলে বাঁধা।

মুন্না চুপ করে থাকলো, বুঝতে পারলো না, বাদশাহ তাকে ডাকলেন কেন? আর ডেকে কি এই সব প্রলাপ বকছেন? কথাগুলি ভাল কিন্তু অর্থ যে কোনদিককে উদ্দেশ্য করতে চায়, বুঝতে পারলো না।

বাদশাহ তখন নিজের খাসকামরায় বসে অল্প অল্প সরাব পান করছিলেন। তার চোখ দুটি লাল। মুখটি কেমন যেন উত্তেজনায় থমথমে। হাতে কয়েকগুচ্ছ বসোরাই গুলাব। পাশে রাখা আছে কাশ্মীরী রক্তবর্ণ আপেল্।

বাদশাহ আবার বললেন,—

'বুল্‌বুল্ আজ সাগির দিয়ম্ খুদ্ হম্ নিশিনে
গুল ববাগ্
দার মহব্বত কামিলম্ পরওয়ানা হাম্
সাগির্দে মাস্ত্।'

'ঐ যে বুলবুল সারাদিন ধরে গোলাপের কাছে কাছে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, কানে কানে চুপে চুপে মহব্বতের কথা বলে।' বুলবুল আজ সাগির দিয়ম্ . . . .

তারপর বাদশাহ মুন্নার দিকে চেয়ে বললেন,—এ বয়েতগুলি কার রচনা জানো? তোমার মত একটি রমণী সৃষ্টি করেছিল। সে আমাদেরই এই হারেমের শোভা। সম্রাট ঔরঙ্গজেব দুহিতা জেবুন্নিসা। তারা কেন এত মহব্বতের জন্যে পাগল হত জানো? তৈমুর বংশের নিয়মে শাহজাদীদের শাদী হবে না বলে এক বিধান সম্রাট আকবর সৃষ্টি করেছিলেন। উদ্দেশ্য বাইরের কোন জোয়ান এলে সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি হতে পারে। সেইজন্যে মোগল বংশের শাহজাদীদের চরমদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। আর তারই কল্যাণে শাহজাদীদের জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। শাদীর ইন্তেজার নেই। দিলের সুখ অন্তর্হিত। শুধু বেওয়ারিশ জীবনের এক উচ্ছৃঙ্খলতাকে আশ্রয় করে তারা সম্ভোগের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কিন্তু তাতে সুখ কোথায়? ব্যক্তি-

চারের তৃপ্তি শান্তির মধ্যে আহরণ করা যায় না। সাময়িক সুখ চরিতার্থ হয় কিন্তু মনের মধ্যে পুরে দেয় এক বিষের হলাহল। পাপ পুণ্যের বিচার অবশ্য নেই কিন্তু বিবেক আছে, আর আছে দারুণ এক অতৃপ্তিবোধ। জীবনের স্থায়ী একটি ভোগের মধ্যে যে আনন্দ, আর ভোগের জন্যে বুভুক্ষু হয়ে দোরে দোরে ঘোরা এক আনন্দ নয়। তাই প্রতিটি শাহজাদীর জীবন বরবাদ হয়ে গেছে। বিশেষ করে শাজাহান কন্যা জাহানারা, রোশোনারা। ঔরঙ্গজেব দুহিতা জেবুন্নিসা।

বাশাহ একটু থেমে অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন,—তোমাকে এর আগে যে কবিতা-গুলি শোনালুম, এই জেবুন্নিসার সেগুলি সৃষ্টি। অদ্ভুত একটি কুসুমের মত কোমল প্রাণ নিয়ে সে পিতার নির্মম অত্যাচার নীরবে সয়ে গেছে।

বাদশাহ থামলে মুন্না কেমন যেন অসোয়াস্তি প্রকাশ করতে লাগলো, আসলে বাদশাহ যে তাকে কি বলতে চান, সে কিছুতে বুঝতে পারলো না। তাই সে শুধু নির্বাক শ্রোতার মত নিঃশব্দে বাদশাহের সামনে ভেলভেট আচ্ছাদিত কেদারায় বসে থাকলো।

অনেকক্ষণ কি যেন মনে মনে ভেবে হঠাৎ নিজের হাতে ধরা সরাবের পাত্রের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন তাঁর চেতনা সঞ্চার হল। এতক্ষণ তিনি তার বেটির সামনে বসে সরাব পান করেছেন ভেবে লজ্জা। তাই তিনি পাত্রটি নামিয়ে রেখে চিৎকার করে ডাকলেন – বান্দা।

হুকুমের অপেক্ষায় নোকর প্রস্তুত। ছুটে এল মুহূর্তে। বাদশাহ সরাবের সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলার জন্যে হুকুম দিলেন। হুকুম তামিল হল। বান্দা চলে গেল কক্ষ ছেড়ে।

বাদশাহ এবার সহজকণ্ঠে মুন্নার দিকে তাকিয়ে বললেন,– তুমি হয়তো আমার পরবর্ত্তী প্রস্তাব শুনে স্বার্থপর বলবে কিন্তু অক্ষম পিতাকে তার জন্যে ক্ষমা কর।

মুন্নার প্রাণটি কেঁপে উঠলো কি এক অজানা ভয়ে।

বাদশাহ আর ইতস্তত করলেন না সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় সম্রাট যেমন স্পষ্টকণ্ঠে তাঁর আদেশ জানান, তেমনিভাবে জানালেন,—দিল্লীর সিংহাসন রক্ষা করতে গেলে নির্মম হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। চতুর্দিকে রাষ্ট্র বিপ্লব। সবারই লক্ষ্য এই দিল্লীর রাজ তখত। এই লোভাতুর রাজতখতে বসবার জন্যে একদিন রাজপুতরা কম চেষ্টা করে নি। তাদের বশীভূত করেছিলেন সম্রাট আকবর। তারপর মারাঠারা জাগতে শিবাজীকে শায়েস্তা করেছেন সম্রাট ঔরঙ্গজেব কিন্তু আজ কেউ এমন নেই যে, বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করে। আজ মারাঠা, জাঠ, রোহিলা, শিখ, ফরাসী, ইংরেজ বহু দল। কাকে প্রতিহত করে সিংহাসন অরক্ষিত হবে? সকলেরই লোভ এই তখতে তাউস। এই রাক্ষসী তখতে তাউসই সব গণ্ডগোলের প্রধান হয়ে এই লোভ জাগিয়ে চলেছে। সে চায় না আর মোগল বংশধরদের সিংহাসনে রাখতে।

কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়বার জন্যেই আজকে আমার এই প্রচেষ্টা। তারপর বাদশাহ বললেন,—তোমাকে ডেকেছি সেই সিংহাসনের জন্যে একটু সাহায্য করতে। আমি জানি সেই ওস্তাজীর শ্রীমহার্ড তোমাকে পেয়ার করে। তুমি যদি তোমার মহব্বত

দিয়ে তাকে অধিকার কর, তাহলে সে তোমার অধীনতা স্বীকার করবে। তখন তোমার অনুরোধের ওপর সে গুরুত্ব দেবে। লাখো রূপেয়ার বিনিময়ে যে শক্তি কিনতে পারি নি, তোমার একটি মাত্র কথায় তা অধিকার করা সম্ভব হবে। রীনহার্ড বিদেশী হলেও ভালবাসার মর্ম বোঝে। তোমার অনুরোধ সে উপেক্ষা করবে না।

মুন্না বিস্মিত হল। বিস্মিত হল বাদশাহের কণ্ঠস্বরে। কত বড় একজন ভাগ্যবান পুরুষ, তিনি শিশুর মত একটি অবলা মেয়ের কাছে কেমনভাবে প্রার্থনা পেশ করছেন। মুন্নার মনে পুলকেরও সঞ্চার হল। এই বাদশাহের সঙ্গে প্রথম কথা বলতে গিয়ে সে কত সঙ্কোচ অনুভব করেছিল! আর আজ তিনি কত কাছে। কত অন্তরঙ্গ হয়ে মুন্নাকেই রাজ্যের এক প্রধান গুরুদায়িত্ব অর্পণ করছেন! মুন্নার সেই জন্যে নিজেকে খুব বড় বলে মনে হল। তার ওপর সেই ব্যক্তিটি। যাকে সে মাত্র কবার দেখেছে। কিছু কথাবার্তা হয়েছে বটে কিন্তু সে ঘনিষ্ঠ হতে পারে নি। যদিও সাহেবের আবেগ ছিল অপর্যাপ্ত কিন্তু মুন্না ধরা না দিয়ে দূরত্ব বজায় রেখেছিল। বাদশাহ তাকেই কেন্দ্র করে এক মতলব ঠিক করেছেন। মতলব তার স্বার্থের জন্যে। সিংহাসন রক্ষার জন্যে তিনি ব্যগ্র। সিংহাসনের জন্যে হয়তো তিনি আরো নিচে নেমে যাবেন। এইমাত্র যে কথা বলতে চাইলেন, অথচ স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। কিন্তু মুন্না একেবারে বুদ্ধিহীনা নয়, বুঝতে পেরেছে সবই। সোমরুকে শাদী করে বাদশাহের অধীন করবার জন্যে প্রার্থনা। কিন্তু একটি সিংহাসনের জন্যে সে কেন এত বড় ত্যাগ স্বীকার করবে? সোমরুকে বিয়ে করবে এমন কোন মতলব তো তার নেই! অথচ মনে হচ্ছে, বাদশাহ যেন শাসকের মত মুন্নাকে হুকুম করে এই শাদী করতে স্বীকার করাচ্ছেন।

হঠাৎ মুন্নার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। যদিও তার মনের মধ্যে সোমরুর মত পুরুষের ছায়া রেখাপাত করেছিল, তবু সে বাদশাহের এই মতলবে তো মন থেকে মুছে দিল। দৃঢ় করলো তার মন। মায়ের কথা স্মরণ হল। মা চান না সে শাদী করলেও সোমরুর মত বিদেশীকে। মা একেবারেই সোমরুকে পছন্দ করে না। কেন করে না অবশ্য জানা নেই। তবে মায়ের মনে কষ্ট সে দিতে চায় না। মা অনেক কষ্ট করে তাকে বড় করেছে। আজ বাদশাহের চেয়ে মা-ই তার বড। বাদশাহের দৌলত আছে কিন্তু মায়ের মত তার মন কোথায়? তিনি দৌলত রক্ষার জন্যে সমস্ত অন্যায়কেই প্রশ্রয় দিতে পারেন কিন্তু মা কখনও তার আশ্রয় নেয় নি।

মুন্না চুপ করে আছে দেখে বাদশাহ আবার বললেন,—চিন্তার কি আছে? রীনহার্ড ভাগ্যবান পুরুষ। তুমি তাকে শাদী করতে পেলে নিশ্চয় গর্ব অনুভব করবে। এখানে জয় তোমারই। আমি শুধু সেই মিলনের আগ্রহ প্রকাশ করছি শুধু সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্যে। রীনহার্ড এ যাবৎ জাঠদেরই সাহায্য করে এসেছে। তার এক বন্ধু ম্যাডেক আমার সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছে। এখন মাত্র রীনহার্ড বাকী কিন্তু তাকে কোন লোভ দেখিয়েই বশীভূত করতে পাচ্ছি না। শুধু একটু দুর্বলতা পেয়েছি, সেইটুকু আমার সম্বল। তুমি অন্যথা কর না।

তারপর আবার বললেন,—যদি এই শাদীতে তোমার কোন বিপদ হয়, তাহলে

আমার ভাণ্ডারের সমস্ত দৌলত তোমার জন্যে থাকলো। আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করে যাবো।

এর পর আর কি বলা যেতে পারে? মুন্না কেমন যেন নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলো। বাদশাহের আদেশ, না অনুরোধ। প্রার্থনা, না হুকুম কিছুই বুঝতে পারলো না। অথচ শেষে বললেন, দিল্লীর সমস্ত দৌলত তোমার ঋণ পরিশোধের জন্যে প্রদত্ত হবে।

মুন্না শুধু দিন কয়েকের সময় নিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে এল।

একটি রমণীর জীবনের বিনিময়ে একটি সাম্রাজ্যের উত্থান পতন নির্ভর করছে। ভাবলেও কেমন যেন শিহরণ জাগে, মুন্নার যেন নিজেকে খুব বড় বলে মনে হল। আচ্ছা, বাদশাহকে যদি বিমুখ করে সোমরু সাহেবকে ফিরিয়ে দেয়, তাহালে কি বাদশাহ ক্ষুব্ধ হয়ে তার শাস্তির ব্যবস্থা করবেন? ...কিন্তু একটি আওরত নিজের সুখের বিনিময়ে কি করে অপরের স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? সোমরুকে সে এখনও ভালবাসেনি। শুধু মনে রঙ লেগেছে। এখনও স্পষ্ট হয়নি সে রঙের রেখা। একটি লোককে সারাজীবনের সঙ্গী করতে গেলে কি এত স্বল্প পরীক্ষায় মত দেওয়া যায়? অবশ্য সোমরু সাহেবের মন সে জানতে পেরেছে। নিজের মন এখনও সে জানতে পারে নি। তাছাড়া মা আছে প্রতিবন্ধক। মা যেন দিন দিন কেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে।

তাই মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলো। একদিকে বাদশাহের প্রস্তাব। মায়ের সন্দিগ্ধ মন। তার কাছে নিজের মন ঢেকে খুশী করা। সবশেষে সেই সোম্বার সাহেব। তিনি এলে নানান কথার মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃতি পরীক্ষা করা। তার যোগ্যতা সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা করবার জন্যে সে অনুসন্ধিৎসু হল।

সময় চেয়েছিল বাদশাহের কাছ থেকে কদিনের জন্যে। সুতরাং একটি করে দিন চলে যেতে লাগলা, আর মুন্নার বুকের ধুকধুকুনি যেন বেড়ে চললো। বাদশাহের কাছ থেকে কখন এত্তেলা আসে এই ভাবনায় তার আহার নিদ্রা কমে গেল।

এমনি সময়ে জানতে পারলো সে সোমরুর দীর্ঘ পরিচয়। সোমরু নিজেই বললো সে কাহিনী। এতটুকু গোপন করলো না। অন্তত মুন্না তার বলার ভঙ্গি দেখে তাই ধারণা করলো।

মাংস বিক্রেতার ছেলে সে। শহর সন্টসবার্গের অনভিজাত পল্লীতে ছিল বাস। জ্ঞান হবার পরই মা হারা। তাই বড় অনাদরে মানুষ হয়েছিল। সেইজন্যে পড়াশুনা কিছু শিখতে পারে নি। আর তাছাড়া পড়াশুনা শেখবার মত পরিবেশও ছিল না। বড় হয়ে তাই অর্থোপার্জনের ফিকির খুঁজতে লাগলো। তখন শ্বেতকায় বণিকরা ভারতবর্ষের সমুদ্রতীরে বাণিজ্য করবার জন্যে পাড়ি দিচ্ছে। বহু লোক দেশ থেকে তাই এই সুদূর ভারতে উন্নতির জন্যে চলে আসছিল।

ওয়াল্টারও সেই সুযোগ নিল। বাধা দেবার তার কেউ নেই। একমাত্র পিতা,

তাও তিনি অন্য এক রমণীকে বিয়ে করে ছেলেকে ভুলেছিলেন। তাই পিছু টান কিছু নেই। সুতরাং ওয়ালটার যীশুকে স্মরণ করে বেড়িয়ে পড়লো।

তখন এক ফরাসী মালবাহী জাহাজ ভারতবর্ষে আসছিল। ওয়ালটার সেই জাহাজে খালাসীর চাকরি নিয়ে ভারতবর্ষে এল। পণ্ডিচেরীতে যখন জাহাজ এল, ওয়ালটার খালাসীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করলো। তখন ফরাসী সৈন্য-বাহিনীতে প্রচুর লোকের চাহিদা। ফরাসীর সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী।

যুদ্ধ লেগে গেল। ত্রিচিনাপল্লী অবরোধ করলো ইংরেজেরা। মেজর স্টিনজার লরেন্স, কাপ্টেন রবার্ট ক্লাইভ, ফরাসী সেনাপতি জ্যাকুইস ফ্রাঙ্কোইস ল'র অধীনস্থ বাহিনীকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করেন। একদিন প্রভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ল সাহেব আত্মসমর্পণ করলেন। হাজার দুই সেপাই, সাত শ বাহান্নটি নিপুণ যোদ্ধা, একচল্লিশ জন পদস্থ কর্মচারী আর বহু অস্ত্রশস্ত্র কামান, বন্দুক ইংরেজদের অধিকারে এল।

মাদ্রাজ ও পণ্ডিচেরীর মাঝামাঝি ওলন্দাজদের আস্তানা ছিল স্যাড্রাসে। এখানে একদিন ইংরেজ ও ফরাসীদের আলোচনা হল কিন্তু সবটাই ইংরেজদের অনুকূলে। উপায় নেই ফরাসীদের বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হল। জ্যাকুইস ল'র সেনাবাহিনীর সদস্যদের অনেকই বাধ্য হয়ে বাঙলাদেশে চালান যেতে হল। উদ্দেশ্য, ইংরেজ পরিচালিত একটি নতুন ইওরোপীয় বাহিনী পুষ্ট করা। ওয়ালটারও সেই দলে ছিল। ভাগ্যক্রমে তাকেও আসতে হল বাঙলাদেশে।

দু'বছর পর মঁশিয়ে লালী ভারতবর্ষে এলেন ফরাসীদের পরিচালক হয়ে। জ্যাকু-ইস ল'কে পাঠিয়ে দিলেন চন্দননগরে বাংলার প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজদের প্রতিরোধ করতে। জ্যাকুইস ল সাহেবের ভাই কাশিমবাজার ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জীন ল তৎকালীন বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিশেষ প্রিয়পাত্র। ওয়ালটার একদিন পালিয়ে এসে সেই জীন ল'র সাহায্যে জ্যাকুইস ল'র শিবিরে আশ্রয় নিল। এবার আর সাধারণ পণ্টন নয়, একেবারে রীতিমত পদস্থ কর্মচারী। নতুন পরিচয় হল, সার্জেন্ট ওয়ালটার রীনহার্ড। ওয়ালটারের জীবনে প্রথম এই ভালভাবে বাঁচবার অধিকার সৃষ্টি হল। একটি সোপান পার হয়ে উন্নতির আরো সোপান অতিক্রম করবার জন্যে প্রয়াসী হল।

তখন ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার গোলমাল চলছে। সিরাজউদ্দৌলা কলকাতার ইংরেজ কোম্পানীর ঔদ্ধত্য আর আবদার কিছুতে সহ্য করতে পারছিলেন না। নবাব যদি ফরাসীদের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এই ভাবনায় ইংরেজরা বিচলিত। ক্লাইভ তখন কলকাতায়। সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী তিনি। হঠাৎ তিনি যুক্তি করে জলপথে ওয়াটসন ও স্থলপথে নিজে চন্দননগর অবরোধ করলেন। প্রাণপণে লড়াই করেও ফরাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে পেরে উঠলো না। আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। ফরাসীদের ভাগ্যই বিরূপ। ঐ বছরেই পলাশীর প্রান্তরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা রবার্ট ক্লাইভ পরিচালিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সেনাবাহিনীর কাছে পরাজিত হলেন। ল ভ্রাতৃদ্বয় সদলবলে বিহারের মধ্যে দিয়ে পাটনা ছাড়িয়ে ছাপরা হয়ে সোজা বারাণসী

পৌঁছলেন। স্তর আয়ার কুট অনেকদূর ধাওয়া করেও এদের ধরতে পারেন নি। ওয়ালটার তখন এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে।

ল ভ্রাতৃদ্বয় বারাণসীতে নিরাপদ আশ্রয়ে এলে ওয়ালটার বুদ্ধি করে এদের সঙ্গ ত্যাগ করলো। কারণ ফরাসীরা দুর্ভাগ্য বয়ে বয়ে চতুর্দিকে ঘুরছে। এদের সঙ্গ ত্যাগ না করলে তারও ভাগ্যে ঐ গুরুভারই জুটবে। তাই এদের সঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করে ওয়ালটার অন্যজীবন গ্রহণ করলো। সেনাবাহিনীতে চাকরি করে আর বিভিন্ন যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কিছু লুঠপাটের দ্বারা ওয়ালটার অর্থ সংগ্রহ করেছিল। ওয়ালটার সৈনিকের পোষাক ছেড়ে ভারতবর্ষের অধিবাসীর মত জীবন যাপন করবার জন্যে ভারতীয় পোষাক পরে নিল। মতলবটুকু তার গোপনে থাকলো। ভারতীয় পোষাকের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য মোগল পোষাক, সেই পোষাক পরিধান করলো। নিজেকে একেবারে সাহেব থেকে এদেশীয় ভারতীয়-ঘেঁষা করে ফেললো। দেহের বর্ণ, মুখাকৃতি ও মস্তকের সোনালী চুল ছাড়া সব পরিবর্তন। লেখাপড়া না জানলেও ওয়ালটার অনর্গল ফরাসী বলতে পারতো। তার সঙ্গে সে শিখে নিল হিন্দুস্থানী ও উর্দু। সেই ভাষার গুণে সে বহুলোকের সঙ্গে মিশতে লাগলো। এদেশের মানুষের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। তারই নাম হল সোমরু। সোম্বার থেকে সোমরু। ওয়ালটার গম্ভীর-প্রকৃতি, বিষণ্ণ বদন, একগুঁয়ে লোক ছিল বলে বন্ধুরা তার ঐ নাম দিল।

সোমরু শুধু আচারে, ব্যবহারে ও পোষাকে মোগল ভাবাপন্ন হল না, মোগল বিলাসিতার অঙ্গ হারেম বা জেনানা রাখা শুরু করল। এ জীবনের কথা অবশ্য সোমরু কখনও বলে নি। মুন্না পরে জানতে পেরেছিল।

সোমরু শুধু অন্তরালে বসে রাজনৈতিক আবহাওয়া লক্ষ্য করতে লাগলো। ল ভ্রাতৃদ্বয় পালাতে ইংরেজরা খুব ক্ষেপে উঠেছিল। বিহারের শাসক রামনারায়ণ পাটনায় থাকতেন। তাঁরই নিষ্ক্রিয়তায় ল ভ্রাতৃদ্বয় পালাতে পেরেছে এই অজুহাতে ইংরেজদের পরামর্শ মত মীরজাফর আলি রামনারায়ণকে বরখাস্ত করলেন। কিন্তু তাতেও ইংরেজরা মীরজাফর আলির নবাবীতে সন্তুষ্ট হল না। তখন তারা মীরজাফর আলিকে সরাবার ফন্দি করতে লাগলেন। ভান্সিটার্ট তখন গভর্নর। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মঙ্গলের জন্যে মীরজাফর আলির তিনবছরের গদি হঠাৎ গভর্নর ভান্সিটার্ট মীরজাফরের জামাই মীরকাশিম আলিকে দিয়ে দিলেন।

কিন্তু এখানেও ইংরেজরা আর এক ভুল করে বসলো। মীরজাফর আলি ছিল ভীরু প্রকৃতির লোক। তাঁর জামাই মীরকাশিম আলি তা নয়। তিনি নবাবী পেয়েই শক্তি বৃদ্ধির জন্যে সেনাবাহিনী সংস্কারে মন সংযোগ করলেন। পাশ্চাত্ত্য প্রথায় সামরিক প্রস্তুতির জন্যে আর্মানী গ্রেগরী ওরফে গুরগিন খাঁকে প্রধান উপদেষ্টা করলেন।

সোমরু দেখলো আর নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। সে অন্তরাল থেকে বেরিয়ে মীরকাশিমের সৈন্যদলে পদাতিক বাহিনীতে যোগদান করলো। মীরকাশিম তাকে দেখে চিনতে পারলেন। ইংরেজদের পরম শত্রু এই সোমরু তার দলে থাকলে তাদের জব্দ করা যাবে। এই ভেবে মীরকাশিম আলি সোমরুকে এক পদাতিক

বাহিনীর নায়ক করলেন।

এদিকে ইংরেজরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারলো না। তাদের আবদার যেন দিন দিন বেড়ে চললো। মীরকাশিম রাগে জ্বলে উঠলেন। নবাবী পাওয়ার জন্যে তিনি কম উৎকোচ দেন নি, তবু ইংরেজদের চাহিদার যেন শেষ নেই। ইংরেজ কাউন্সিলের সভ্যদের ব্যক্তিগতভাবে মোটা টাকা, কোম্পানী ফৌজের ব্যয়ভার দরুন বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের খাজনা কবুল করে তবে নবাবী পেয়েছিলেন। তবু চাহিদা মেটে না। যেন দুরন্ত ছেলের চাহিদা। কোনদিন শেষ হবে না। ফর্দের দৈর্ঘ্য দিন দিন ক্রমবিস্তার লাভ করতে লাগলো।

বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে গোলমাল। তেল, নুন, মসলা বিনা শুল্কে ইংরেজরা বেচতে লাগলো। নবাবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ষড়যন্ত্র করতে লাগলো। তারা স্পষ্টই বলতে লাগলো, মীরকাশিম আলির নবাবীতে তারা খুসী নয়। প্রয়োজন হলে তারা তাদের ভুল সংশোধন করে নেবে।

ইংরেজরা ভুল সংশোধনে তৎপর হল। মীরজাফর আলি খাঁর সঙ্গে পুনরায় মিটমাট করে নিল। কাটোয়ার পথে নবাব মীরকাশিম আলির অন্যতম সেনানায়ক মহম্মদ তকী খাঁকে পরাজিত ও নিহত করে কোম্পানীর ফৌজ মুর্শিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হল। জঙ্গীপুরের বিখ্যাত গিরিয়ার মাঠ। যেখানে আলিবর্দী সরফরাজ খাঁকে হারিয়েছিলেন, সেখানে মীরকাশিম আলির ফৌজ ও কোম্পানীর ফৌজের তুমুল লড়াই হল। সোমরু নবাবী ফৌজে থেকে বহু অসমসাহসের পরিচয় দিয়েছিল। মীরকাশিম আলি হারতেন না কিন্তু তাঁর নির্বুদ্ধির জন্যে হেরে গেলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মীরকাশিম আলি যুদ্ধ বন্ধ করতে হুকুম দিলেন। ক্লান্ত সৈনিকরা যুদ্ধ বন্ধ করে দিল। সোমরু নবাবকে অনুরোধ করেছিল যুদ্ধ বন্ধ না করতে। কারণ ইংরেজরা সুযোগ সন্ধানী, তারা নিয়মকানুন না মেনেই আক্রমণ করবে। হলও তাই। ইংরেজরা হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করে বসলো। নবাবী সৈন্য তখন বিশ্রাম করতে ব্যস্ত। আরাম পরিত্যাগ করে সাজগোজ করবার আগেই ইংরেজ ফৌজ ঝাঁপিয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ ধরে নিরস্ত্র অবস্থায় বেওয়ারিশ ভাবে মারধোর খেয়ে অবশেষে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। নবাবের পরাজয় ঘোষিত হল। কোম্পানীর ফৌজ আবার ছুটলো বিহারের পথে। মেজর অ্যাডমস কোম্পানী ফৌজের সর্বাধিনায়ক। তাঁর রণ-কুশলতা কোম্পানী ফৌজের গৌরব।

রাজ মহলের অনতিদূরে দুর্ভেদ্য উধুয়ানালার যুদ্ধে মীরকাশিম পুনরায় পরাজিত হলেন। এখানেও সোমরু মীরকাশিমকে উপদেশ দিয়েছিল কিন্তু তিনি তা শুনলেন না। কোম্পানীর ফৌজ হারতে হারতে আবার জিতে গেল। মীরকাশিম পালাতে লাগলেন। বার বার সোমরুর উপদেশ না শুনে হেরে যেতে লাগলেন দেখে সোমরুকেই এই দুর্দিনে সঙ্গী করে নিলেন। মীরকাশিম কথা দিলেন সোমরুকে, তিনি আর এক পাও সোমরুর উপদেশ ছাড়া অগ্রসর হবেন না। একরকম নবাব সোমরুর ওপরই তাঁর

জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করলেন। আবার অনেক যুদ্ধ হল। কোম্পানীর সঙ্গে সংঘর্ষ কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যাদের সুপ্রসন্ন নয়, তারা হাজার চেষ্টা করেও কিছু করতে সক্ষম হল না। সোমরু প্রাণপণে লড়েও জয়লাভ করতে পারলো না।

এই কথা বলার সময় সোমরু বিষণ্ণ মুখে আরো বিষণ্ণ ছায়া সৃষ্টি করে দুঃখ করেছিল। 'আমি অনেক কৌশলের অবতারণা করেছিলাম। অনেক বে আইনি কাজ করেছি। নিজে ছদ্মবেশে কোম্পানীর ফৌজের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের ধ্বংস করবার চেষ্টা করেছি। শত্রুপক্ষের শিবিরে চাঞ্চল্য ও শিহরণ এনেও কিছু করতে পারি নি। সেদিনের আমার সেই ব্যর্থতা মনে বড় ঝড় তুলেছিল। মনে হয়েছিল, আমার ক্ষমতা বুঝি এখানেই চিরদিনের মত শেষ হয়ে যাবে। এক দেশ থেকে এক দেশে এসে অক্ষমতার পরিচয় দিয়ে নীরবে মৃত্যুকে বরণ করে পৃথিবী থেকে চলে যাবো।'

তবে এই সান্ত্বনা, ইংরেজরা পরাজিত না হলেও তারা সোমরুর দ্বারা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। মীরকাশিম আলিকে যত তাড়াতাড়ি শেষ কববে ভেবেছিল, তা আর তাদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। প্রতিবন্ধক সোমরু।

সোমরুও বসে ছিল না। সে আবার এক ফন্দি করে নবাবকে দিয়ে এক চিঠি ইংরেজ কোম্পানীকে পাঠালো। যার সারমর্ম এই, সুবে বাঙলার নবাবী পেয়েছি আমি আর বাণিজ্য করবার অধিকার পেয়েছেন আপনারা। তাই বলে কি আপনারা সোনার বাঙলা ছারখার করবেন? এর উত্তর আপনারা সুবিবেচকের মত দিলে সুখী হব।

ইংরেজ সব সময় তৎপর। কাল বিলম্ব না করে চিঠি দিল মেজর এলিসকে পাটনা অবরোধ করবার জন্যে পাঠিয়ে। মেজর এলিস পাটনা অবরোধ করলে সোমরুর পরামর্শে নবাব রণনীতি বর্জন করে জঙ্গী আচরণ শুরু করলেন। এলো-পাতাড়ি ভাবে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করলেন, তারপর ইংরেজদের বন্দী করে এনে হত্যার আদেশ দিলেন। এতগুলি মানুষকে বধ করতে অনেকেরই আপত্তি হল। সোমরু দেখলো, ইংরেজ যেমন শত্রুবধ করতে পেলে কখনও দ্বিধা করে না, তেমনি তাদের বধ করতে কোন অনুকম্পা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বরং এই ভয়াবহকাণ্ডে ভীত হয়ে হয়তো কোম্পানী রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করতে পারে। তাছাড়া ইংরেজদের ওপর সোমরুর ব্যক্তিগত রাগ ছিল। দীর্ঘদিন ধরে তাদের হেফাজতে বেগার দিয়ে সে অনেক কষ্ট সহ্য করেছিল। তাই আর দ্বিধা না করে একাই হত্যা করবার জন্যে অগ্রসর হল। তবে একটু কৌশল অবলম্বন করে।

ইতিহাসে অঙ্কিত আছে, পাটনা কুঠির ধৃত ইংরেজদের শোচনীয় পরিণাম। ইংরেজরা যেখানেই হার স্বীকার করেছে, সেখানেই রেখেছে এক চিহ্ন। নারকীয় হত্যায় তাদের কতকগুলি প্রাণ বলি যেতে তারা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গেছে ভবিষ্যৎ মানুষের সমবেদনা অর্জনের জন্যে। অথচ তারা কত যে এইরকম সহস্র

হত্যার উৎসব আয়োজন করেছে, তার কোন ইতিহাস নেই।

পাটনা কুঠিতে ইংরেজদের নবাব একদিন খানাপিনায় আপ্যায়িত করলেন। চল্লিশ জন পদস্থ ইংরেজকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যেই এই আয়োজন। রাজকীয় সম্মান প্রদর্শনের পর তাঁদের স্বস্থানে পৌছে দেওয়া হবে, এমনি এক ঘোষণা ছিল।

বিরাট ডাইনিং টেবিল। কাঁটা, চামচ, ছুরি, মদের গেলাস, বোতল। টেবিলের ওপর চব্যচষ্য-লেহ্য-পেয়াদি রাজকীয় সমারোহ। সুখাদ্যের গন্ধ সব বাতাসে ভেসে চতুর্দিকে আমোদিত করে তুলেছিল। নবাব ত্রুটি কিছু রাখেন নি। বাদ্য-যন্ত্রেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তার সাথে কিছু ইংরেজ মেমসাহেব। তারা অতিথিদের আপ্যায়নের জন্যে বিরাট ডাইনিং টেবিলের ধারে কোমর দুলিয়ে বাদ্যযন্ত্রের মৃদুতালে নেচে চলেছে।

পদস্থ ইংরেজদের আর তখন কোন দুশ্চিন্তা নেই। তাঁরা আনন্দে মেতে উঠে ছন। এমনি সময়ে উল্লাসমত্ত সোমরু খানাঘরে প্রবেশ করলো। নিজে একা নয়, আরো কজন অনুচর তার সঙ্গে ছিল। সকলে মিলে একসঙ্গে ইংরেজদের ওপর অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ চালাতে লাগলো। জীবিতাবস্থায় কেউই পালাতে পারলেন না। সমস্ত ইংরেজগুলির সলিল সমাধি হল সেই খানাঘরে। রাজকীয় খানা আর কারো ভোগে লাগলো না। সেখানে ইংরেজদের মৃতদেহের পাহাড স্তূপকৃতি হল ভয়াবহতার প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করে।

ইংরেজরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সোমরু ও নবাবকে ধরবার জন্যে জোর তাড়া লাগালো। তারা অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করলো। মীরকাশিমের ইচ্ছা একবার শেষ আক্রমণ। ইংরেজদের একবার পরাস্ত করতে পারলেই কিস্তিমাত। সুজাউদ্দৌলাকে সেইজন্যে নবাব বোঝালেন, যদি বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাবী ফিরে পান, তাহলে তিনি সুজাউদ্দৌলাকে স্থান বিশেষ নজরানা স্বরূপ দিয়ে দেবেন। এই শর্তে ইসলামিক ভ্রাতৃত্বের আকর্ষণে অযোধ্যার নবাব কোমব বেঁধে লাগলেন। পারসিক নজফ খাঁ, জার্মান ফরাসী সোমরু আর আর্মানী মারক য় নেতাদের দ্বারা পরিচালিত নবাব মীরকাশিমও সুজাউদ্দৌলার যৌথ বাহিনী বক্সারের যুদ্ধে মেজর মনরোর কাছে পরাজিত হল। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ নবাবী এখানেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। ইংরেজ প্রভুত্ব চিরকালের জন্যে কায়েমী হয়ে গেল।

মীরকাশিম আবার পলায়ন করলেন। কিন্তু সোমরু আর তার সঙ্গ নিল না। সে দেখলো, ভাগ্যহীন এই লোকটির পিছু পিছু ঘুরে তারও ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছে। সে তার উন্নতির অন্তরায় মনে করে স্বার্থপরের মত প্রাক্তন মনিবকে ছেড়ে রোহিলাখণ্ডের আফগান নায়ক হাফিজ রাহমৎ আলির কাছে চাকরি নিল।

এদিকে ইংরেজরা সুস্থির নেই। তারা সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে এক সন্ধির প্রস্তাব করে মীরকাশিমকে ও সোমরুকে সমর্পণের জন্যে জানালো। তবে একেবারে বিনা অর্থে নয়। দুজনের মাথার দাম ধার্য হল একলক্ষ ও চল্লিশ হাজার।

সোমরুর জীবনের মূল্য চল্লিশ হাজার। সোমরু মনে মনে রোহিলাখণ্ডের দরবারে

বসে পুলকিত হল কিন্তু ভীত হল এই ভেবে যে, হাফিজ রাইমৎ আলির কলিজায় বাসা বেঁধে আছে ইংরেজ প্রীতি। হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে রাইমৎ আলির দোস্তি সর্বজন বিদিত। সুতরাং চল্লিশ হাজার টাকা লাভের চেয়ে দোস্তিটাই বড় হয়ে উঠবে।

সোমরু এ জায়গাতেও থেমে একটু দম নিয়ে মুন্নাকে বলেছিল, সেদিন আমার বড় দুর্দিন। বিশ্বস্ত অনুচরদেরও বিশ্বাস করতে পারি না। আবার নিজেরও নিরাপত্তা চিন্তা করতে পারি না। শেষকালে এত কষ্টের প্রাণ ইংরেজ আক্রোশের তলে নিঃশেষ হয়ে যাবে? কিন্তু প্রাণভয়ই চিরকাল মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছে। তখন জাঠরা ক্ষমতাশালী নৃপতি। সোমরু একদিন রাত্রির অন্ধকারে সবার অগোচরে ছদ্মবেশে ভরতপুর যাত্রা করলো। তখন সে নিজের অনুচরদের কিছু বলে নি, তবে ভরতপুরে জাঠ দরবারে গিয়ে অনুচরদের ও নিজের সৈন্যদলকে রোহিলাখণ্ড থেকে আনিয়েছিল। কিছু দেশীয় সিপাই, কয়েক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক, অশ্বারোহী সৈনিক—কামান, বন্দুক যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে জাঠ প্রধান জওয়াহির সিংয়ের দলে যোগ দান করলো।

ভরতপুরের রাজনৈতিক আবর্তে সোমরুর ভূমিকা হল নতুন ও অভিনব। মীরকাশিমের অধীনে চাকরি করে যেটুকু সঞ্চয় করেছিল, এই ভরতপুরের জাঠ অধীনে নিজের ক্ষমতার অন্য ভূমিকা স্বীকৃত হল। শুধু ধনরত্নই সোমরু সঞ্চয় করে নি, সামরিক শক্তি বৃদ্ধিও তলে তলে করেছিল। জওযাহির সিং এই সব দেখেই সোমরুকে স্বীকার করে নিলেন। তাছাড়া সোমরুর দ্বারা পূর্বে জওয়াহির সিং উপকৃত হযেছিলেন। পিতা সূর্যমলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবার সময় সোমরুর সহায়তা পেযেছিলেন, সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সোমরুকে তিনি স্থান দিলেন।

এদিকে ইংরেজেরা সোমরুকে হস্তগত করবার জন্যে যথেষ্ট চিন্তিত। তারা মতলব করে সোমরুকে করায়ত্ত করার জন্যে জাঠ দরবারের প্রীতি ও শুভেচ্ছা কামনা করে পত্র দিল, তার সঙ্গে সোমরুকে দরবার থেকে বহিস্কৃত করবার জন্যে আবেদন জানালো।

জাঠ সম্রাট জওয়াহির সিং সবই জানতেন। তাই সোমরুকে আশ্বাস দিয়ে সে পত্রের কোন গুরুত্ব দিলেন না। সোমরু নিশ্চিন্ত হল জাঠ সম্রাটের আচরণে।

এদিকে আবার কিছুদিনের মধ্যেই রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে উঠলো। জাঠ সম্রাটের মুখ শুখোলো। দক্ষিণ থেকে মারাঠা ও উত্তর-পশ্চিম থেকে আহম্মদ শাহ দুররাণী জাঠ ঐশ্বর্যে নজর ফেলতে লাগলেন। জওয়াহির সিং প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্যে নতুন ক্ষমতায় অধীশ্বর ইংরেজ গভর্নরকে কলকাতায় মিত্রতা কামনা করে পত্র দিলেন। ইংরেজ পরকে উপকার করে তখনই, যখন তার নিজের স্বার্থ তার মধ্যে সংযুক্ত থাকে। জাঠকে সাহায্য করার অজুহাতে যদি বড় শত্রু আহম্মদ শাহ দুররাণীকে পরাস্ত করা যায়, তাহলে রাজ্য বিস্তারের পথ সুগম হবে। এই অনুমানে বারাণসীতে ইঙ্গ-জাঠ বৈঠক বসলো, তাতে স্থির হল দু'পক্ষই আহম্মদ শাহাক আক্রমণ করবে। কিন্তু তখন ইংরেজরা সোমরুকে হস্তান্তরের জন্যে বললো না কেন? এ এক চিন্তা। সোমরু ভেবেছিল, ইংরেজরা এই সুযোগে তাকে হস্তগত করবে। আর জওয়াহির সিং, নিশ্চয় নিজের প্রাণ বিপন্ন করে সোমরুকে রক্ষা করবেন না!

যাই হোক সে যাত্রা সোমরু রক্ষা পাবার পর জাঠ রাজত্বে নিজে কায়েমী হয়ে বসলো। জাঠ দরবারে তার একটা এমন আসন হল, যা বেশ ক্ষমতাপন্ন। জওয়াহির সিংয়ের রাজত্বের বহু বিপদ সে নিজ বাহুবলে রক্ষা করেছিল। জয়পুরের মহারাজা মাধো সিং জাঠদের প্রতিবেশী। জওয়াহির সিং একবার সসৈন্যে পুস্কর হ্রদে স্নান করতে গেলে রাজপুতরা ভীষণ বিক্রমে জাঠদের আক্রমণ করেছিল। সে সময় যদি সোমরু ও ম্যাডেক না থাকতো, তাহলে আর জওয়াহির সিংকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে হত না। এই রেনী ম্যাডেক সোমরুর মতই ফরাসী সৈন্যবাহিনীতে ছিল, তারপর ভাগ্যান্বেষণে জাঠ দরবারে এসে চাকরি নিয়েছিল। সোমরুর মত ম্যাডেকও ছিল দুর্ধর্ষ সেনানায়ক।

তারপর একদিন জওয়াহির সিং নিহত হলেন। আততায়ী সম্রাটের কক্ষে গভীররাত্রে প্রবেশ করে তাঁর বক্ষে ছুরিকাঘাত করলো।

কিছুদিনের জন্যে জাঠ সিংহাসন নিয়ে বেশ আন্দোলন চললো। সোমরু নির্দলীয় পন্থা অবলম্বন করলো। নিহত সম্রাটের ছোট ভাই রতন সিং জাঠ সিংহাসনে বসলেন। সোমরু এঁরও খুব প্রিয়ভাজন ছিল। গদীতে বসার অল্পকালের মধ্যে রতন সিংয়ের ধারণা হল যে, তিনি ব্রজবল্লভের প্রতিভূ। আর সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে চার হাজার রূপসী কুমারী ও নৃত্যকলায় পারদর্শিনী সখী নিয়ে বর্ষাসমাগমে বৃন্দাবনে তীর্থযাত্রা করলেন। রতন সিংয়ের অনুপস্থিতিতে সোমরু ভরতপুরের ডেপুটি নিযুক্ত হল। নগর রক্ষার দায়িত্ব ভার ছিল সোমরুর ওপর। তীর্থযাত্রার ভড়ংই হল কাল। রাজনৈতিক বিপ্লবের সময় জাঠ সম্রাট যদি খামখেয়ালী মনের পরিচয় না দিতেন, তাহলে অমনি বেঘোরে প্রাণ দিতেন না। নকল ব্রজলীলা সহ্য করতে না পেরে গোঁসাই রূপানন্দ ঠাকুর রতন সিংকে হত্যা করলেন।

রতন সিংয়ের নাবালক দেড় বছর বয়েসের শিশুপুত্র খেরীকে সমর্থন করে সামন্ত-রাজারা অন্তর্বিরোধ সৃষ্টি করলো। সোমরু সমর্থন করলো নওয়ল সিংকে। ইনি রতন সিংয়ের এক ভাই। খেরী সিংয়ের অভিভাবক দানী শাহ নওয়লের শ্যালক আর তা ছাড়া সোমরুর অকুণ্ঠ সমর্থনে, নওয়ল সিংই জাঠ সম্রাট নির্বাচিত হলেন।

অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মারাঠারা জাঠ রাজনীতিতে মাথা গলিয়ে নওয়লের এক ভাই রণজিৎকে সমর্থন জানালো তারা। শুধু সোমরু আর ম্যাডেকের ভয়ে মারাঠারা সোজা-সুজি নওয়লকে আক্রমণ করলো না। শিখদের সহায়তাও পেয়েছিলেন রণজিৎ। নওয়ল রণজিতকে প্রায় বশীভূত করার সময়ে মারাঠারা করৌলি থেকে জাঠদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মারাঠাদের বর্গীর যুদ্ধ ছিল। সামনা-সামনি যুদ্ধ না করে গোপন আক্রমণ। তারা সেই গোপন আক্রমণ চালিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের উস্কানি দিতে লাগলো। মারাঠারা নাকি সোমরু ও ম্যাডেকের ভয়ে সরাসরি যুদ্ধে নামে নি।

কিন্তু সোমরু ও ম্যাডেক ছাড়লো না। তারা মারাঠাদের যুদ্ধে আহ্বান করলো। তারা ঝুমহীর দুর্গে আস্তানা নিল। সোমরু নওয়ল সিং ও দানী শাহকে পরামর্শ দিল, দুপুর গড়িয়ে বিকেল পড়েছে, এ সময় যুদ্ধ না করে পরদিনের জন্যে অপেক্ষা করা ভাল

কিন্তু গোসাঁই বালানন্দ নামে এক মাথাগরম সেনাধ্যক্ষের পরামর্শে তারা পড়ন্ত রোদেই যুদ্ধে যেতে উঠলো। যুদ্ধের ফলাফল খুব আশানুরূপ হল না। দানী শাহ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। বহু হতাহত হল। জাঠ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত নওয়াল সিং সোমরুর সিপাইদের পিছনে আশ্রয় নিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। জাঠরা সে যাত্রা সোমরু ও ম্যাডেকের জন্যে পুরোপুরি কেলেঙ্কারী থেকে বেঁচে গেল। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরাস্ত হল না। সোমরু ও ম্যাডেক নিজের সৈন্যবাহিনীর দ্বারা মারাঠাদের ঠেকিয়ে রাখলো। সুযোগ বুঝে নওয়ল সিং দীগ দুর্গে আশ্রয় নিলেন। বহু জাঠ সর্দার ও সৈন্য নিহত হল। ম্যাডেকের ক্ষতি হল আঠারোশ সিপাই। সোমরুরও হল তবে বেশী নয়।

জাঠদের অবস্থা আরো সঙ্গিন হয়ে উঠলো। মারাঠা ও মোগল বাদশাহের সেনাপতি রোহিলা আফগান নাজিবউদ্দৌল্লা একত্রে জাঠদের পিছনে লাগবার ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন, এবং শাহ আলমের প্রতিভূ হিসাবে গঙ্গা যমুনা দোয়াবের জাঠ অধিকৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের কাজে লেগে গেলেন। মারাঠা ছিল মথুরায়। নায়কদের অন্তর্দ্বন্দ্বে তারা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারলো না। ইংরেজ হস্তক্ষেপের ভয়ে নাজিবউদ্দৌল্লাও শেষ অবধি শিকোহাবাদ ও কোয়ল দখল করেই ফিরে গেলেন। জাঠেরা সে যাত্রা বাঁচলো।

এই সময় ইংরেজ ও ফরাসীদের বিরোধ ঘনীভূত হচ্ছিল। তাই পণ্ডিচেরীর শাসক শিভেলিয়র সাহেবের পরামর্শমত ম্যাডেক জাঠদের চাকরি ছেড়ে দিল্লীর দরবারে কাজ নিল। উদ্দেশ্য, ফরাসীদের যদি সুবিধা হয় এই অনুমানে। ম্যাডেক তখনও ফরাসী সংশ্রব ত্যাগ করে নি।

সোমরুর মনও বিষিয়ে উঠেছিল। তারও ইচ্ছা জাগছিল, জাঠ সংশ্রব পরিত্যাগ করার। তারা যুদ্ধের কলাকৌশল জানে না, শুধু মাথাগরম করে। সুবুদ্ধি ও সংযমের পরিচয় না দিলে যে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায় না, একথা জাঠরা স্বীকার করতে চায় না বলে সেও শেষপর্যন্ত পলায়নের পন্থা অবলম্বন করলো। একদিন এমনি মীরকাশিমের সঙ্গও সে পরিত্যাগ করেছিল। ভাগ্য যাদের বিরূপ, তাদের সাহচর্যে থেকে সোমরু নিজের ভাগ্য মন্দ করতে চায় না।

তাই সে জাঠ দরবার ত্যাগ করবার মতলব করছিল।

এই সময় হঠাৎ নওয়ল সিং নিজের সত্তাটুকু বিসর্জন দিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে বিরাট শর্তে সন্ধি করে বসলেন।

তখন অবশ্য গোপনে দিল্লী আক্রমণের ষড়যন্ত্র চলছিল। মারাঠা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গেল। জাঠ, মারাঠা ও রোহিলা আফগান জাবতা খাঁ বিরাট বাহিনী নিয়ে দিল্লী আক্রমণ করলেন। সোমরু সেই দলেই ছিল। মোগল সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নজফ খাঁকে সেই পরাজিত করেছিল। তারপর বাদশাহী ঐশ্বর্য দেখে তার চমক লাগে। কত রাজ্য, রাজ দরবার ঘুরেছে কিন্তু এমনটি সে কোথাও দেখে নি। এ যেন কল্পনাও করা যায় না, এমনি ঐশ্বর্যের রোশনাই।

মুন্না সোমরুর জীবনের সমস্ত দীর্ঘ ইতিহাস শুনে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকলো, তারপর বললো,—তাহলে বাদশাহের প্রস্তাবে রাজী হচ্ছো না কেন তুমি?

সোমরু মৃদু হেসে বললো,—তাহলে সত্যি কথাটাই তোমাকে বলতে হয়। বাদশাহ আমাকে মীরাটের কোথায় যেন ছয় লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের এক জায়গীর দিতে চাইছেন, আর সেখানে প্রাসাদ নির্মাণ করে নতুন এক স্বাধীন রাজ্য প্রস্তুত করতে বলেছেন কিন্তু আমার এ সব কি হবে? আমি দীর্ঘদিন ভারতবর্ষে এসেছি, কোথাও বেশীদিন স্থায়ী হতে পারি নি। ব্যক্তিগত জীবন আমার এত সঙ্কীর্ণ যে, কোন স্থিতি ভাবতে গিয়েও বিস্মিত হয়ে যাই। তাই বাদশাহের ঐ লোভনীয় প্রস্তাবে রাজী হতে পারি নি।

মুন্না তাকিয়ে ছিল সোমরুর দিকে। দেখেছিল অনুসন্ধিৎসু চোখের দৃষ্টি দিয়ে। আকৃতি দেখে ভালবাসবার কিছু নেই। মুখখানির মধ্যে এমন কোন অস্বাভাবিক জৌলুস নেই, যা কোন মেয়েকে আকর্ষণ করবে। বিষণ্ণ এক ম্লান মুখের ছায়া সর্বত্র ঘিরে আছে। কিসের যে বেদনা বোঝা যায় না। এমন কি মনে হয় না, এর দ্বারা কোন অসাধ্য সাধন হতে পারে। অবশ্য বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারা দেখে সৈনিক বলে মনে হয় কিন্তু সে সৈনিক খুব বড দরের কেউ না। শাহ আলম যদি এর গুরুত্ব না প্রকাশ করতেন, তাহলে মুন্না হেসেই এই লোকটিকে তুচ্ছ করতে পারতো। শুধু বাদশাহের আগ্রহেই সোমরুর অতীত কাহিনী সব বিশ্বাস করলো। আর করে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। মানুষের আকৃতিই যে সব নয়, তার প্রমাণ এই সোমরু সাহেব। সেইজন্যে তার সোমরুকে ভাল লাগলো। তবে ভালবাসা নয়, অনুকম্পা। এই লোকটির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। একটু নির্ভরতার আশ্রয় পেলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। শাহ আলমের কথা তার মনে পড়লো। তিনি এই সাহসী বীরকে হস্তগত করে রাজ্যের নিরাপত্তার জন্যে তার কাছে কত ছোট হয়েছেন। মার কথাও মুন্নার মনে পড়লো। মা এই লোকটির আকৃতি দেখে কিছুতে সহ্য করতে পারে না কিন্তু এ সময়ে মাকেও যেন মুন্নার মনে থাকলো না। মা যদি কন্যার ভালই চায়, নিশ্চয় এই মিলনে বাধাদান করে অপ্রিয় হবে না।

মনস্থির করে মুন্না হঠাৎ বললো,—আমি যদি তোমাকে শাদি করি, তাহলে তুমি জায়গীর উপঢৌকন নেবে?

সোমরু অবাক হয়ে মুন্নার দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর মনের আনন্দ আর চেপে না রাখতে পেরে আবেগ জড়িত স্বরে বললো,—আমি নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি না!

মুন্না মাথা নত করে শুধু লজ্জিতস্বরে বললো,—না। বাদশাহ শাহ আলমের ইচ্ছাতেই এই মিলন সম্ভব হল।

সোমক অন্তরালের কাহিনী জানলো না বটে তবে সে এত খুশি হল, যা তার জীবনে কখনও ঘটে নি।

আর মুন্না ভালবাসার মিলনের চেয়ে রাজনৈতিক মিলনকেই প্রাধান্য দিল বেশী।

মুন্না তার মাকে খুব বেশী গুরুত্ব দেয় নি।

কিন্তু জেমিলি এই মিলনের কথা শুনে কেমন যেন বিক্ষুব্ধ অন্তরে শান্তি হারালো। কত মেহনত করে সে এই মেয়েকে বড় করে তুলেছে। এই মেয়ের জন্যে সে নিজের সুখ, আহ্লাদ ভুলে গিয়েছিল। এই মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সেই কোটানা একদিন ত্যাগ করেছিল। না হলে কোটানা ত্যাগ করবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। হানিফ তাকে যত অপমানই করুক, সব সহ্য করেই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলতো। অন্তত স্বামীর আলয় স্ত্রীর অধিকারভূক্ত বলেই দাবী নিয়ে থাকতো। হয়তো দাবি হানিফ স্বীকার করতো না, তাতে ক্ষতি কি?

কিন্তু সেদিন সে নিজের জন্যে একটুও ভাবে নি। ভেবেছে তার কন্যার জন্যে।

মুন্না বড় হবে। মানুষ হবে। সবচেয়ে বড় কথা, সে সুখী হবে। সে সুখী হলে জেমিলির মনের দুঃখ লাঘব হবে। অন্তত সে সান্ত্বনা পাবে, তার জীবন বরবাদ হয়ে গেছে বটে কিন্তু তার স্পর্শ মুন্নার গায়ে লাগে নি।

সেইজন্যে সে মুন্নাকে তারই মনের সুরভি দিয়ে মেহনত করে নাচ শিখিয়ে ছিল। উদ্দেশ্য, রমণীর জীবনে যেদিন কোন অবলম্বন থাকবে না, এই বিদ্যাই তাকে সাহায্য করবে। যেমনি তার বিপদে এই বিদ্যাই তাকে রক্ষা করলো। মুন্না নর্তকী হোক্ এ সে চেয়েছে কিন্তু মুন্না এক কুৎসিত পুরুষকে জীবনের সঙ্গী করুক, এ বাসনা তার ছিল না। আবার সে পুরুষ বিদেশী হতে তার সংযত মনে হঠাৎ ঝড় উঠলো। সে আর নিজেকে শান্ত করে রাখতে পারলো না। এত মেহনতের দাম শেষকালে মুন্না দিল এমনি ভাবে! তার কন্যা হয়ে শেষ পর্যন্ত এমনি আচরণের সাক্ষ্য দেবে, আগে যদি কখনও তার মনে হত, তাহলে সে এমনি জীবনপাত করে পরিশ্রম করতো না।

জেমিলি কেমন যেন পাগল হয়ে গেল। শান্তি তার বিঘ্নিত হল। সান্ত্বনা সে আহরণ করতে পারলো না। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক নিয়ে সে বিগত জীবনের সমস্ত বেদনার মাঝে যন্ত্রণাক্লিষ্ট মনে শুধু মৃত্যুর প্রহর গণনা করলো। স্বপ্ন একদিন ছিল বলে বাঁচবার আকাঙ্খাও তার ছিল। স্বামীর অবহেলা, বিবাহিত জীবনের সুখ তার মেলে নি বলে সে আহত ছিল। তবু সান্ত্বনা ছিল, আর একটি ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তার মনের মাঝে আশার আলো জালিয়ে রেখেছে। কন্যা তার বড় হবে, সে মানুষ হবে। তাকে কেন্দ্র করে তার অবশিষ্ট জীবনের শান্তি সে গ্রহণ করবে। সেইজন্যে সহস্র দুঃখের মধ্যে চোখের জল দরবিগলিত ভাবে বের হলেও সে মৃত্যু চায়নি।

আজ তার সেই মৃত্যুকেই আপন করতে ইচ্ছা করলো। মৃত্যুর হিমশীতল ক্রোড়ে সমস্ত জীবনের ব্যর্থতা ঢেলে দিয়ে অন্য এক স্বর্গীয় শান্তির দেশে যাবার জন্যে জেমিলি প্রাগ্রহী হল।

মুন্না মায়ের এই মানসিক অবস্থা দেখে কেমন যেন মনে মনে মাকে ভুল বুঝলো। সে আজ পরিণত মনের রমণী। সে আজ নিজেকে কেন্দ্র করে অপরের দুঃখের অর্থ, অন্যভাবে বিচার করলো। নিজের মনের অনুসরণকে সে প্রাধান্য দিয়ে পরম অন্তরঙ্গ মানুষটিকেও সে ক্ষমা করলো না। বরং মায়ের সেই পূর্বের কথাগুলিই স্মরণ হতে মাকে সে শত্রু মনে করলো। মা চেয়েছিল, শাদী না করে নর্তকীর জীবন যাপন করবে। বহু পুরুষের মনে আগুন জ্বেলে তাদের দগ্ধ করে তাদের পাগল করবে। মুন্না যখন ছোট ছিল তখন সে মায়ের এই কথার অর্থ বুঝতে পারতো না। অবাক্ হয়ে শুধু মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো কিন্তু বড় হয়ে বুঝতে পারে, মায়ের সেই কথার অর্থ বড় সাংঘাতিক। সে শাদী করে জীবনে সুখ পায় নি বলে কন্যাকে শাদী করতে দিতে চায় না। কিন্তু রমণী শাদী না করলে সম্পূর্ণ কেমন করে হয়? এ কথা মা যদি বুঝতো তাহলে এমনভাবে তার শত্রুতা করতো না। অন্তত বুঝতো, কন্যা আর সেই ছোট মুন্না নেই। তারও আলাদা একটি চিন্তাধারা সৃষ্টি হয়েছে। সে ভাবতে শিখেছে। সে তার ভবিষ্যৎ চিত্র নিজের মনের দর্পণে দেখতে চায়।

তাছাড়া এই শাদীর মধ্যে নিছক ভালবাসাকেই প্রাধান্য দেয়নি মুন্না। বাদশাহ শাহ আলমের কাতর প্রার্থনাকেই সে স্বীকৃতি জানিয়েছে। আর সোমরু সাহেবের সম্ভাবনাপূর্ব জীবনের ভবিষ্যৎকে আরো উজ্জ্বল করবার জন্যে দিয়েছে একটা স্বস্তির আশ্রয়।

রমণী জীবন তো তুচ্ছের জীবন! যেমন বীথিকায় অগণিত পুষ্পের সমারোহ, সেই সমারোহের মাঝে একটি ফুলের সৌন্দর্যকে হরণ করে তাকে দলিত মথিত করলে যেমন হয়, তেমনি একটি রমণীর জীবন। ভোগ করলেই তা কীটবৎ পরিত্যক্ত হয়। তাই শুধু নিছক ভালবাসার স্বর্গরচনা করলে বোধহয় মুন্না এই শাদীকে সমর্থন জানাতো না। এই শাদীর পিছনে তারই এক বিরাট স্বার্থ সংযুক্ত আছে, এ কে না জানে? মা যদি তার কন্যাকে বিশ্বাস করে আস্থা স্থাপন করতো, তাহলে নিশ্চয় সে মাকে সব বলতো। বলতো, এই শাদীর পিছনে দিল্লীর বাদশাহের সম্পূর্ণ স্বার্থ নিহিত আছে। তাঁর সাহায্য পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নয়। বাদশাহ পূর্বের গৌরবে মহীয়ান না থাকলেও তবু বাদশাহ। এখনও রাজৈশ্বর্য তাঁর কম নেই। এখনও লুব্ধ দেশবাসী বাদশাহী দৌলত লুণ্ঠন করতে পারলে অনুৎসাহ হয় না। সেই বাদশাহের একান্ত মনের আশ্বাস আমি পেয়েছি। তাঁর সমস্ত দৌলত দরকার হলে আমার প্রয়োজনে ব্যয়িত করবেন। তার ওপর যাকে আমি বিয়ে করছি, সে বিদেশী হলেও তার মনে এক বলিষ্ঠ দৃঢ়তা আছে। তাকে হাজারো মানুষের মধ্যে হারিয়ে ফেলা যায় না। এমন একটি প্রাণ, যা জগতে চিহ্ন রাখবার মত। তার ওপর অতীত জীবনের রহস্যপূর্ণ বিরাট অধ্যায়। কত বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তবে নিজের পথ

করে নিয়েছে। আজ জাঠ, মারাঠা, রোহিলা, মোগল সম্রাট এই একটি মানুষের জন্যে কিরকমভাবে পাগল হয়ে উঠেছে। সে যে দলে থাকবে তাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এই মানুষটি যখন তাকে বেগম হিসাবে চায়, তখন আপত্তি করবে না? রমণী বীরকে পূজা করে। সেও বীরকে তুচ্ছজ্ঞান করবে কেন? তাই এই বীরকে শাদী করবার সমর্থন জানিয়েছে।

আর শাহ আলম বিরাট এক জায়গীর নিয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করবার হুকুম দিয়েছেন। তখন সে হবে সেই রাজ্যের রাণী। সুতরাং রাণীর সম্মান যখন সে পাবে, তখন ভাবনার কি? কটি রমণীর জীবনে এই সৌভাগ্য আসে। কটি রমণী এই সৌভাগ্য পায়? মা শুনলেও নিশ্চয় ঈর্ষান্বিতা হবে।

মুন্না বার বার রোমন্থন করে নিজেকে পরীক্ষা করলো, সে কি ভুল করছে? কিন্তু মন বললো,—যে পথ সে বেছে নিয়েছে, সে পথ ভ্রান্তপথ নয়। সে নিজে তার সৌভাগ্যে গরিয়সী হয়ে নতুন এক আলোক সৃষ্টি করবে পৃথিবীতে! সে তার স্বামীর মতই বীরাঙ্গনা হবে।

তাই এত আনন্দেও মুন্নার দুঃখ জাগলো, মা কেন তাকে ভুল বুঝলো? তাহলে কি সে জিদকে ধরে রাখতো? ভুলটা বুঝতে পারতো না? কিন্তু মা কেমন যেন? তিনদিন ধরে কেমন যেন বাড়ির মধ্যে থমথমে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে মৃত্যুর মত স্তব্ধতা ধরে রাখলো।

আর মুন্না মায়ের মুখের ভয়ঙ্কর আকৃতি দেখে মনে মনে ভীত হয়ে রইলো। সে ভয় জয় করে বাড়ির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। একটা সোচ্চার ঘোষণা, দারুণ চিৎকার, কিছু অস্বাভাবিক কোলাহল হলে এই থমথমে আবহাওয়া বিনষ্ট হতে পারে। তাহলে অহেতুক ভয়টা সরে গিয়ে মনটা হালকা হয়ে যেতে পারে। মনের ভারী বস্তুটা সরে গিয়ে যা উন্মুক্ত তাই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বরং এই নিস্তব্ধতার চেয়ে সেই কলহ অনেক ভাল।

তাই হল। মুন্না কিছু করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে একসময় মনের সাহস ফিরে পেল। সে গিয়ে দাঁড়ালো মায়ের সামনে।

জেমিলি তখন নিজের শয্যার গহ্বরে শুয়ে শুয়ে কাঁদছিল। মুন্না মায়ের এই অবস্থা দেখে কাতর হল, স্বরে আমেজ সৃষ্টি করে করুণকণ্ঠে বললো,—মা, তোমার কি হয়েছে? কাঁদছো কেন?

জেমিলি তবু মুখ তুললো না বা কোন উত্তর দিল না।

মা! মুন্না বেশ অনুচ্চকণ্ঠে ডাকলো।

জেমিলি জলভরা দুই চোখে এবার কন্যার দিকে তাকালো।

তুমি কাঁদছো কেন, বলবে কি?

জেমিলি সেই শয়ন অবস্থাতেই চোখের জল মুছলো কিন্তু কন্যার কথার উত্তর দিল না।

তাই দেখে মুন্নার মনের কাতরতা অপসারিত হল। মনের মধ্যে দৃঢ়তা এল, সে

রূঢ় হল। সে বেশ কঠিনস্বরে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কি আমার ভাল চাও না?

জেমিলি এবার আর চুপ করে থাকতে পারলো না। রুদ্ধকণ্ঠে উত্তর দিল,—কে বললো আমি চাই না?

তাই যদি চাও তাহলে এমনি করছো কেন? এমনি কান্নায় বাড়ির আবহাওয়া বিষাক্ত করে আমার শান্তি হরণ করছো কেন?

জেমিলি চুপ করে থাকলো। সে কোন উত্তর দেবে না বলেই বোধহয় প্রতিজ্ঞা করলো।

কিন্তু মুন্না আজ প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল, এর একটা হেস্তনেস্ত করবেই। সে দৃঢ়স্বরে বললো,—তুমি চুপ করে থেক না। উত্তর দাও। আমি তোমার উত্তরের জন্যেই এসেছি। তুমি এমনি ভাবে নিঃশব্দে কেঁদে আমাকে অভিশাপ দেবে, তা আমি সহ্য করবো না।

অভিশাপ? জেমিলি হঠাৎ কেমন যেন উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠলো। সে সেই অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বললো,—মুন্নি শেষকালে তুই আমাকে এ কথা বললি? আমি তোর ভালোর জন্যে নিজের জীবনের সব কিছু নষ্ট করেছি। আজ তুই বড় হয়ে উঠে এমনি ভাবে আঘাত দিচ্ছিস! আমি তোকে অভিশাপ দিয়ে তোর জীবন বরবাদ করে দিতে চাইছি?

হঠাৎ মুন্না ধমক দিয়ে উঠলো,—বাজে বকবক না করে সত্যি করে যা চাও বলো। তোমার কি সেই পুরোনো ইচ্ছেই বলবৎ রাখতে চাও? আমি জানি, আমি শাদী না করলেই তুমি খুশি হবে কিন্তু তোমার সেই স্বপ্ন,—আমি নর্তকীর জীবন যাপন করে মরদের বুকে আগুন জ্বালিয়ে যাবো। এই জীবন তোমার কাছে হয়তো অমূল্যের হতে পারে, আমার কাছে তার কোন মূল্য নেই। আমি জীবনকে বিচার করে জীবনের সুখটুকুই তুলে নিতে চাই। তোমার সেই ঘৃণ্যজীবনের দাসত্ব না করে আমি অন্য পথ অবলম্বন করবো। তুমি কি আজও তোমার মুন্নাকে ছোট্ট মেয়েই ভাবো? তার যে আলাদা একটি সত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে কি বিশ্বাস কর না?

কন্যার এই স্পষ্ট উক্তিতে জেমিলি কেমন যেন অভিভূত হয়ে গেল। বুকের মধ্যে এক অস্বাভাবিক বেদনা তাকে মথিত করে দিতে লাগলো। মুন্নাও তাকে শেষকালে নোংরা জীবন গ্রহণ করার জন্যে ঘৃণা করলো? অথচ সে কি জানে না, সেদিন যদি এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ হত? মুন্না বেঁচে থাকতো! আজ বার বার সেই দিনটি স্মরণে আসে। কোটানা থেকে সেই গভীর রাত্রে যখন সে দিল্লীর পথে রওনা হয়েছিল, মুন্নার তখন জ্ঞান হয়নি। জ্ঞান হলে আর সেদিনটি সে বিস্মৃত হত না। আর মাকে এমনি ভাবে আঘাত করতো না।

কিন্তু আজ মনে হয় সেদিন তার সেই নর্তকী জীবনের সাথে ঐ জীবন গ্রহণ না করলে আজ তার এই বিত্ত হত না। মুন্না জীবনে কোন কষ্ট পেল না বলেই এমনি ভাবে আঘাত করতে পারছে। জেমিলি কন্যাকে সে কথা বুঝিয়ে দেবার জন্যে শয্যার ওপর উঠে বসলো। তারপর নিজেকে বেশ দৃঢ় করে কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো,

—আজ তুমি খুব বড় বড় কথা বলছো, কিন্তু সেদিন যদি আমি নোংরা জীবন গ্রহণ করে তোমাকে মানুষ না করতাম, তাহলে তোমার এই স্পর্ধিত ভঙ্গি কোথায় থাকতো? আজ যদি তোমার কিছু ভাল হয়, তাহলে জানবে, আমি ঐ নোংরা জীবন গ্রহণ করেছিলাম বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

মুন্না হঠাৎ কেমন যেন ব্যঙ্গস্বরে খিলখিল করে হেসে উঠলো—জীবনে বাঁচাটাই বড় নয় মা। বাঁচার জন্যে যে কর্ম করা হয়, সেই কর্মের মানদণ্ডই বাঁচার সার্থকতা প্রকাশ করে। একটা সাধারণ লোকেও বাঁচে; একটি অসাধারণ ব্যক্তিরও জীবন নির্বাহ হয়। দুজনের কর্মই দুজনকে আলাদা করে। তুমি যে জীবন বহন করে আমাকে মানুষ করে তুলেছ, তার চেয়ে অন্যভাবেও মানুষ করতে পারতে। আর তা যদি পবিত্র হত, তাহলে এ বিড়ম্বনা সৃষ্টি হত না। সেই জীবনে যদি আমার দুঃখ আসতো তাকেও ভাগ্য বলেই মনে করতাম।

জেমিলি আর কি বলবে? হতবাক্ হয়ে কন্যার কথা শুনতে লাগলো। আজ কন্যা তাকে আঘাত করবে বলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে, সুতরাং তাকে থামানো যাবে না। অতএব এ আঘাত তাকে সহ্য করতেই হবে। সুতরাং সে চুপ করেই যাচ্ছিল, কিন্তু কি ভেবে যেন আবার বললো,—দেখ মুন্না, কাব্য করা ক্ষেত্রবিশেষে শোভা পায়। তুমি ভুলে যেও না আমি তোমার মা, তোমার অভিভাবিকা—এখনও তোমার ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আমার আছে। আমি তোমার ভালর জন্যে যা বলবো তাই তুমি করতে বাধ্য।

আবার মুন্না আঘাত করলো,—তোমার ভাল তো শাদী না করে নর্তকীর জীবন যাপন করা।

জেমিলি চিৎকার করে বললো,—না, শাদী আমি তোমায় করতে বলেছি, যদি সে শাদীর মধ্যে শান্তি পাও। কিন্তু তুমি যে শাদী করতে যাচ্ছো, তার মধ্যে শান্তি পাবে না বলেই আমার ধারণা। তারপর স্বর খাদে নামিয়ে বললো,—মুন্না, তুমি বুঝবে না আমার কি বেদনা? যদি কখনও মা হও, তাহলে তুমি বুঝবে।

মুন্নাও ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো,—তাহলে কি বলতে চাও, আমি ভুল করছি?

জেমিলি এবার নিজের মুখখানি অন্যপাশে ধরে রেখে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো,—আর আমি কিছু বলতে চাই না, তোমার যা খুশি হয় তাই কর। জেমিলি আর সেখানে দাঁড়ালো না, মুন্নাকে অবাক করে সে ঘর ছেড়ে একরকম টলতে টলতে বেরিয়ে গেল।

আর মুন্না চুপ করে মায়ের চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। সে আর তখন কিছু ভাবলো না। শুধু এই মনে করলো, মনটা আপাতত হালকা হয়ে গেল। বাড়ির মধ্যে যে থমথমে আবহাওয়াটা ঘোরাফেরা করছিল, সেটা অপসারিত হল। আর মায়ের মনের একটা স্পষ্ট ছবি সে দেখতে পেল। মা কি চায়, তারও একটা হিসাব-নিকাশ হয়ে গেল।

দুজনের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে গেল দেখে বাড়ির মধ্যে যে থমথমে আবহাওয়া ছিল তা অপসারিত হল কিন্তু হঠাৎ আবার এক আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটলো। এর জন্যে

কেউই প্রস্তুত ছিল না।

মুন্নার মনে তখন অনুশোচনা জেগে উঠেছে। হঠাৎ মাকে সে ঐরকম আঘাত না করলেই বুঝি ভাল করত। মাত্রাটা এত চড়ে গেল যে নিজেকে শান্ত করে রাখতে পারলো না। এতক্ষণে মা মনে আঘাত পেয়ে সরে গেলে সে বুঝতে পারলো, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। মারও কিছু অধিকার আছে, যেটুকু সে মেলে ধরে কন্যার কাছ থেকে কিছু দাবি করতে পারে। মুন্না বুদ্ধিহীনা নয়, সে কথা সে বোঝে বলেই তার অনুশোচনা হল। তীব্র অনুশোচনার মধ্যে সে মায়ের কাতর মনের যন্ত্রণা এমন ভাবে উপলব্ধি করলো, যার জন্যে তার তখনই মার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করলো। কিন্তু সেখানেও নিজের অহমিকা তাকে বাধা দিল। সেই অহমিকার উচ্চ সিংহাসন থেকে নামতে গিয়ে সে নামতে পারল না।

এমনি সময় পরিচারিকা এসে আর্তস্বরে জানালো, বিবি সাহেবা বোধ হয় মারা গেছেন। তাঁর দেহ কেমন যেন অসাড় হয়ে শয্যার ওপর পড়ে আছে।

শুনেই মুন্নার সমস্ত শরীরটি থরথর করে কেঁপে উঠলো। আর বুকের মধ্যে হুহু শব্দে কান্না বাইরে বেরিয়ে এল। সে ছুটলো মায়ের ঘরে। যাবার আর দরকার ছিল না, সে বুঝতেই পেরেছিল, পরিচারিকা যা বলেছে তা ভুল নয়। অভিমানিনী নিজের জীবন দিয়ে তার অপমান ফেরত দিয়ে গেছে। মা তার, তার মতই দাম্ভিকা। এতটুকু অপমান সহ্য করতে পারতো না। তার কন্যার ওপর তার আস্থা ছিল অনেক বেশী। সে কন্যাই যখন এতটুকু অনুকম্পা না দেখিয়ে বরং দুর্ব্যবহারই করলো, তখন আর এক মুহূর্ত বেঁচে থাকা নয়।

কিন্তু মুন্নার হল জীবন দুর্বিসহ। মনের মধ্যে ভবিষ্যতের এক দারুণ সঙ্কল্প নিয়ে সে মাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিল। তবে তার পরিণাম যে এই হবে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাই।

জেমিলি আর কিছুক্ষণ বেঁচে থাকলেই সে গিয়ে ক্ষমা চাইতো। ক্ষমা চেয়ে ছোট্ট মেয়ের মত মার কোলে শুয়ে আদ্যোপান্ত বলতো। তারপর মাকে জিজ্ঞেস করতো,—মা তুমিই বলো আমি কি ভুল করছি। এত বড় সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করলে যে খোদাও ক্ষমা করবে না। তুমি কেন আমার এই সঙ্কল্পকে ভুল মনে করছো? বুঝিয়ে দাও, যদি যুক্তি অমূলক না হয়, তাহলে নিশ্চয় তোমার কথা শুনবো। তবে নিজের অর্থহীন জেদকে বজায় রেখে অদূর ভবিষ্যতের কল্পনাকে প্রশ্রয় দিও না। তোমার এক্তিয়ারে যে সৌভাগ্য এসে পড়েছে তা যদি গ্রহণ না কর তাহলে জীবনে আর এ সুযোগ আসবে না।

এ সব কথা সে বেশ মোলায়েম করে বলতো, মায়ের কোমল মনের গতি লক্ষ্য করেই আরো খাদে নামতো। তার মুন্না যে সেই ছোট্টটি আছে, এ কথা তাকে বুঝিয়ে তার মনের গুরুভার নামিয়ে দিত।

কিন্তু তা আর হল না, মা ক্ষমা চাইবার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। চলে গেল তার কন্যাকে অসহায়া করে বহু যোজন দূরে। যেখানে হাত বাড়ালে আর নাগাল

পাওয়া সম্ভব নয়।

মুন্না কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল। কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারলো না। শিরায় শিরায় রক্ত প্লাবন সীমাহীন আলোড়ন জাগালো তবু সে পাগল হল না। যেমন হঠাৎ ধ্বংস হবার মুহূর্তে প্রকৃতি থমথমে আকার ধারণ করে স্থির হয়ে যায়, তেমনি মুন্না স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। আর মনের মধ্যে চললো চিন্তার স্রোত। চিন্তার সাথে অনুতাপ। অনুতাপের সাথে অভিমান। 'এত সযেও মা এইটুকু সহ্য করতে পারলো না!'

সেদিন আকাশ ছিল খুবই দুর্যোগপর্ণ। যেন এই মৃত্যুর সাথে তার মিতালী ছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। ধরিত্রী অন্ধকাবের মসী মেখে বোরখার মাঝে মুখ লুকিযেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর তাতে মনে হচ্ছে প্রলয় যেন উপস্থিত। প্রলয়ের অবতার ডমরুর ধ্বনি করতে করতে তাথৈ নৃত্য করতে লাগলো। প্রকৃতির সন্তানেরা প্রার্থনায় বসলো। পৃথিবীকে শান্ত করবার জন্যে গাছপালা, মাটি, অ কাশ কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগালো।

কিন্তু কে শোনে তাদের প্রার্থনা? ধ্বংসের দেবতা যেন কোন প্রার্থনা শুনবে না বলেই ভীষণতা জাগিযেছে। তারপর বারিধারা।

মুন্না সেই প্রলয়ঙ্কর প্রকৃতির দিকে জল-ভরা চোখে তাকিযে রইলো। না, তার কোন প্রার্থনা নেই। এই পৃথিবী যদি এখুনি লয হযে যায়, তাহলে সবচেযে খুশি হবে। তাই সে বোধ হয মনে মনে ধ্বংসই চাইলো।

ঘরে জেমিলির অসাড নীলবর্ণ মৃতদেহ বসনাবৃত হযে পডে আছে। বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। বিষের ক্রিযা সমস্ত শরীরে ছডিযে তাকে বর্ণহীন করে দিযেছে। মুখখানি কেমন যেন শুষ্ক ও যন্ত্রণাক্লিষ্ট। মনে হয়, মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে তারপর আত্মহনন কার্য সমাধা করেছে। মানুষ আত্মহত্যা করে তখনই যখন একেবারে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হযে যায়। জেমিলি সেই পর্যাযে গিযে পৌছেছিল বলেই হয়তো এই কাজ করলো।

মুন্না দুর্যোগপুর্ণ প্রকৃতির দিকে তাকিযে বুকের যন্ত্রণা রোধ করতে চাইলো। সেই সময় তার মনে হল, মা মরে তাকে অভিশাপ দিয়ে গেল। সুতরাং আগামী জীবন তার সুখের হবে না। কোথায যেন অশান্তির ঝড আজকের দুর্যোগের মধ্যে লুকিয়ে আছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই সে অশান্তিকে রোধ করে। অপর্যাপ্ত দৌলত, বিরাট সম্ভাবনা শুধু বিত্তশালিনী করে, সুখ দেয না।

তাই আর সুখ আসবে না। মা চলে গেছেন কিন্তু সঙ্গে নিযে গেছেন আমার জীবনের সমস্ত সুখ আর শান্তি।

মুন্না যখন এমনি এক অসহায অবস্থায় দুর্বল মনে অনেক কথা ভাবছে, বাইরের দুর্যোগের সাথে এ বাড়ির শোকের একটা মিতালী চলেছে, সেই সময় পরিচারিকা এসে জানালো মুন্নাকে—কে যেন এক আদমী এসেছে, আপনাকে ডাকছে।

আদমী?

মুন্না অবাক হয়ে পরিচারিকাকে জিজ্ঞেস করলো,-- তুমি কি তাঁকে কখনও দেখ নি ?

জী, না। পরিচারিকা মাথা নাড়লো।

মুন্না ভাবলো, কে এল ? এক তো তাদের বাড়িতে ঘন ঘন যা সোমরুসাহেব আসে। আর বাদশাহের লোক। তবে সে লোক বাদশাহী তকমা এঁটে অপরিচিতকে বিস্ময় থেকে মুক্তি দেয়। তাই তাদের আগমনে পরিচারিকার পরিচয় দিতে অসুবিধা হয় না।

তাই মুন্না পরিচারিকার কথায় বেশ বিস্মিত হল। কে এলো ? কে এলো ? এই দুর্যোগকে মাথায় নিয়ে কে তার এ বাড়িতে এসে হাজির হল ?

একটু অপেক্ষা করে মনের শোক সংবরণ করে মুন্না বাইরের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল।

কিন্তু কে যেন এক অপরিচিত লোককে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো। লোকটির মলিন পায়জামা, ছিন্ন অপরিষ্কার পিরান, রুগ্ন, রোগক্লিষ্ট, এক মুখ দাড়ি, কোটরগত চোখ কেমন যেন কাতর হয়ে তাকিয়ে আছে। তার শরীর চুইয়ে কামিজ ভিজিয়ে জল গড়িয়ে চলেছে।

মুন্না ভাবলো বোধ হয় ভিক্ষুক। এই দুর্যোগে আশ্রয় না পেয়ে আশ্রয় চাইতে এসেছে। কিন্তু তাদের বাড়ির যে অবস্থা, সেই অবস্থায় কাউকে বাড়িতে স্থান দেওয়া যায় না। তাছাড়া একজন জোয়ান মরদকে সাহায্য করবে কেন ? তাই কঠিন স্বরে সম্রাজ্ঞীর মত বললো,—এখানে কিছু হবে না বাপু। অন্যত্র যাও।

লোকটি মুন্নার কথায় ম্লান হাসলো। বললো,—আমি ভিক্ষে চাইতে আসিনি মুন্না।

মুন্না নিজের নাম অপরিচিতের মুখে শুনে চমকিত হয়ে বললো,—কে তুমি ? আমার নাম জানলে কেমন করে ?

লোকটি ম্লান হেসে বললো,—মুন্না আমি হানিফ। তোর ভাই।

মুন্না হঠাৎ যেন বিরাট উঁচু স্থান থেকে থপ্ করে নিচে বসে পড়লো। তারপর মুখখানি অন্যপাশে ঘুরিয়ে নিজের মনকে প্রকৃতস্থ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,— এখানে কি চাই ?

হানিফ মুন্নার আচরণে অবাক হয়ে গেল। বিস্ময়ে বললো,—মুন্না তুই আমাকে চিনতে পারলি না ? আমি হানিফ। তোর ভাইজান। আমরা এক বাপজানের দুই মায়ের গর্ভে জন্মেছি। কোটানার কথা কি তোর একটুকুও মনে নেই ?

মুন্না আরো জোরে চিৎকার করে বললো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি। তোমার মত একজন শয়তান ভাইকে বিস্মৃত হব কেমন করে ? কিন্তু এখানে তুমি কেন এসেছ ? কি অভিপ্রায়ে তোমার এখানে আগমন ? মতলবটুকু পেশ করে শীঘ্র সরে পড়লে আমি বাধিত হব। তোমার মত ভাইজানদের সাহচর্য আগুনের তাপকেই বহন করে আনে। তাই শীঘ্র বক্তব্য পেশ করে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

হানিফ একটু এগিয়ে এসে বললো,—মুন্না আমি অনুতপ্ত।

মুন্নার বর্তমানের সমস্ত ক্ষোভ যেন নবাগতের ওপর আরোপিত হল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো,—তোমার এই অনুতাপের কথা শুনে আর হৃদয় দ্রবীভূত হবে না। এই কথা বলতে যদি এতদূর এসে থাক, তাহলে ধন্যবাদটুকু গ্রহণ করে বিদায় হও। তোমার এই চেতনা সঞ্চারের জন্য ছোট বহিন হয়েও তোমাকে বাহবা জানাচ্ছি। তবে বড় দেরি করে এই অনুতাপ প্রকাশ করতে এলে। আর একদিন আগে এলে তোমার অনুতাপের কথা শুনে যার সারাজীবন বরবাদ হয়ে গেছে, সে সান্ত্বনা পেত। হয়তো তোমাকে ক্ষমাও করে যেত।

হানিফ বিস্ময়ে বললো,—কেন আম্মা বেঁচে নেই ?

মুন্না উত্তর দিল না, চোখের জল লুকাতে গিয়ে অন্যপাশে মুখ ঘোরালো।

হানিফ তাই দেখে বললো,—কি করে মারা গেল ?

আত্মহত্যা করেছে।

মুন্না তারপর আবার কঠিন স্বরে বললো,—আর তার জন্যে দায়ী কে জানো ? তুমি।

হানিফ বিচলিত হয়ে নিজেকে অসহায় মনে করলো। সে এখানে এসেছিল বড় আশা নিয়ে। একটু আশ্রয় তার দরকার। না পেলে জীবন সংশয় হবে। রোগে পঙ্গু দেহ। কপর্দকহীন ভাবে কত কষ্ট করে এই ঠিকানা যোগাড় করে এসেছে। এসেছে অদম্য এক আশা নিয়ে। লোকমুখে শুনেছে, তার সৎ বহিন আজ বড়লোক হতে চলেছে। বাদশাহ তাকে পেয়ার দিয়েছেন। এক বীর আদমীর সে বেগম হয়ে সৌভাগ্যশালিনী হচ্ছে। এইসময় নিশ্চয় তার সে অপরাধ ক্ষমা করে আত্মীয় বলে স্থান দেবে। আর তার দুর্ভাগ্যের জন্যে নিশ্চয় অনুকম্পা প্রকাশ করবে। আজ তার কিছু নেই। পিতার সঞ্চিত সব বিত্ত সে কয়েক বছরে বেওয়ারিশ জীবনের উত্তেজনায় উড়িয়ে দিয়েছে। শাওনীর কন্যা ঝর্না তাকে ক্ষমা করে নি। এক জাঠ সর্দারের রূপে মুগ্ধ হয়ে ঘর ছেড়েছে। হানিফের অবশ্য তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। ঝর্নার প্রথম যৌবনের স্বাদটুকু গ্রহণ করে সে অন্যদিকে মন দিয়েছিল। মীরাটের যত্রতত্র বহু রমণীর যৌবন উপভোগ করে সে তখন মুগ্ধ। আর পিতার অর্থে বহু ইয়ার বক্সীর আমদানি হয়েছিল। অসৎ পথে নিয়ে যাবার লোকের তাই অভাব হয় নি। যখন একে একে পিতার সব সঞ্চয় নিঃশেষিত হয়ে গেল, তখন তার চৈতন্য হল কিন্তু ফেরার আর উপায় ছিল না। নিজের বাড়ী থেকে বিদায় হয়ে পথে গিয়ে যখন নামলো, বিশ্রী ক্ষতে তার সমস্ত শরীর ভরে গেছে। উপভোগের সময় তারতম্য করে নি, তাই চিহ্ন দিয়ে গেছে মারাত্মক অসুখ।

তারপর সেই অসুখ নিয়ে দেশে আর টিকতে পারে নি। দেশের লোক তার অবস্থান্তরে শ্লেষ প্রকাশ করেছে। কোটানার অধিবাসী যে লুতুফ আলির সমাধি নির্মাণ করে পয়গম্বর বলেছিল, তারাই দেশের শান্তিরক্ষা করবার জন্যে হানিফকে বিতাড়িত করেছে।

হানিফ অনেকদিন এসেছে দিল্লীতে। এক দরগায় কোনরকমে নিজের কীর্তি গোপন করে আশ্রয় নিয়েছিল কিন্তু ঘৃণ্যরোগের সংবাদ পেয়ে দরবেশরাও তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তারপর পথই সম্বল। ভিক্ষা সে করে নি, ছলের আশ্রয় নিয়ে উদর পূর্ণ করেছে। কদিন হাজতবাসও তার হয়েছে। চুরি করার অপরাধে সিপাই বাদশাহের কারাগারে নিয়ে গিয়ে পুরেছিল। তারপর কি ভেবে ছেড়ে দিয়েছে।

এই কদিন হল হঠাৎ দিল্লীবাসীর কাছে শুনলো, এক জব্বর খবর। তারই বহিন মুন্না আজ সৌভাগ্যবতী হতে চলেছে। দিল্লীতে আসার পর মাঝে মাঝে তাদের সে খুঁজেছিল। কিন্তু ভয় ছিল, সাহস ছিল না বলে সে বেশী খোঁজে নি। তারপর এই সৌভাগ্যের কথা শুনে আর ঠিক থাকতে পারলো না। হঠাৎ তার পূর্বের দুষ্ট বুদ্ধিটা জেগে উঠলো। আবার বাঁচবার আকাঙ্খায় তার উত্তেজনা সীমাহীন হল। খোঁজ সহজেই পেয়ে গেল। এমনি একটি উল্লেখযোগ্য বাসিন্দার খোঁজ কে না দেবে?

কিন্তু এসে দেখলো যতটা আশা নিয়ে সে এসেছিল, ততটা আশা পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। পিতার সেই বৃদ্ধ বয়েসের মেয়ে-লোকটি মারা গেছে। আর মুন্না এখন রাজেশ্বরী হয়ে তার পূর্ব অপরাধের জন্যে খোয়ার করছে। এই অবস্থায় কি করবে ভেবে না পেয়ে কাতর হল। তারপর জলদি বুদ্ধি বাৎলিয়ে একেবারে নিচে নেমে গিয়ে অনুগতের মত বললো,—মুন্না, মেরী বহিন, যা হবার সে তো হয়ে গেছে। এখন তুই অভিভাবকহীন, এসময়ে আমার থাকা কি একান্ত দরকার নয়!

ছোটবেলায় হানিফকে সে দেখেছিল, হানিফের স্বভাব সম্বন্ধে অতটা ধারণা ছিল না। শুধু মার মুখের শোনা কথাতেই যেটুকু উপলব্ধি কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখলো লোকটা শুধু ধূর্ত নয়, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে আরো ক্ষুব্ধ হয়ে বললো,—তোমার অভিভাবকত্ব স্বীকার করে একদিন মায়ের জীবন মরুভূমি করেছ, আজ আমার অভিভাবকত্বের নজির তুলে কোন চালাকী করতে এস না। আমার অভিভাবক তোমার মত এক দুর্ভাগ্য পীড়িত দুষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন লোক নয়, তামাম হিন্দুস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ, দিল্লীর শাহনশাহ বাদশাহ শাহ আলম বাহাদুর।

হানিফের মুখে একবার এসে গেল, বড় নৌকায় পাল লাগিয়েছ, তা বুঝতে পারছি, তবে শেষপর্যন্ত টিকবে তো! কিন্তু সে কথা এখন বলা যায় না বলেই সে আরো নম্র হল। বললো,—মুন্না, তোর আজ সৌভাগ্যে আমারই গর্ব হচ্ছে। আমি তোর কাছে কিছু চাই না। একটু যদি আশ্রয় দিতে অসুবিধে হয়, তাহলে বাদশাহকে বলে একটা নোকরী আমার ঠিক করে দে। অন্তত পিতার স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে এই উপকারটুকু কর।

মুন্না দেখলো, অদ্ভুত একটি লোক তাকে আস্তে আস্তে পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলছে। মা থাকলে একটা পরামর্শ করার সুযোগ পেত কিন্তু এখন তাকে নিজেকেই সব করতে হবে। কিন্তু এই লোকটি কি অদ্ভুত প্রকৃতির—কিছুতে ছাড়তে চায় না। সমস্ত অপমান গায়ে মেখে সে নির্বিবাদে দাঁড়িয়ে কৃপা ভিক্ষা করছে। ভদ্রতা তো

এর শরীরে কোথাও নেই কিন্তু অভদ্র বলেও সংজ্ঞা দিলে এর সুনাম করা হয়। কি করবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা হল। তারপর আবার শক্তি সঞ্চয় করে বললো,—তুমি বিদায় হবে, না লোক ডেকে একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি করবো।

হঠাৎ যেন হানিফ বুঝে ফেললো, এখানে কিছু সুবিধে হবে না। তাই সে বিনয়ের মুখোস খুলে ফেলে নিজমূর্তি ধারণ করলো। বললো,—তোর মা ভাল লোক ছিল। তুই এমন কেন হলি সেই কথা ভাবছি। যাকৃগে অতীতের সেই অপরাধের কথা ভেবে যদি কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন না করিস্ না করবি—একবার অন্তত তোর মায়ের মরা মুখটা দেখতে দে। বড কষ্ট দিয়েছি, মানুষটাকে শান্তি না দেওয়ার জন্যে মনে বেদনা জাগছে।

কিন্তু মুন্না রুখে দাঁড়ালো, বললো,—তুমি আমার অন্দরে যাবে না। তুমি যদি বেরিয়ে না যাও তাহলে আমি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারবো না। কেমন যেন মুন্নার চোখ দুটি রক্তবর্ণ হযে রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলো। আবার বললো,—তোমার অনেক বেয়াদপি আমি দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে সহ্য করলাম। এবার যদি না যাও, তাহলে অন্য ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে।

বাইরে তখন দুর্যোগের একই প্রলয়ঙ্কর অবস্থা। বৃষ্টিধারা এতটুকু মন্থর হয় নি।

হানিফ দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—বেশ যাচ্ছি। তবে পরে তোকে এই আচরণের জন্যে আপসোস করতে হবে।

মুহূর্তে ক্ষুব্ধ হানিফ আস্ফালন প্রকাশ করে দরজার বাইরে মিলিয়ে গেল।

আর মুন্না সেই অন্ধকার ঘরের মাঝে দাঁডিয়ে দাঁড়িযে অসহায়ের মত আবোল-তাবোল ভাবতে লাগলো। মা এই কিছুক্ষণ আগে তার কাছ থেকে সরে গেছে। কিন্তু তারপর থেকে এই মুহূর্তগুলি তার কাছে কেমন যেন দুর্বহ লাগছে। কেমন যেন এক পর্বতের বাইরে এসে অসীম শূন্য আকাশের মাঝে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। নির্মম পৃথিবী কোন সাহায্যই তাকে করবে না স্বস্তি পাবার জন্যে, বরং পদে পদে তাকে বিপদের সম্মুখীন করবে। পদে পদে তাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড করিয়ে বিচার করবে। আর তাকে সর্বদা সন্ত্রস্ত হযে পা ফেলতে হবে। এতটুকু বিচলিত হলে চলবে না।

মায়ের উপস্থিতির গুরুত্ব সে বুঝতে পারলো। মা দৃঢ়হস্তে জীবনের হাল ধরছিলেন বলে তার এই এতগুলি বছর নির্বিঘ্নে কেটেছিল। এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। এখন তাকে জীবনের হাল ধরে এগিযে যেতে হবে। ভালো মন্দের বিচার করতে হবে নিজেকেই। হানিফ এসেছিল। হানিফের ওপর অভিযোগ তার কিছু নেই। তার যখন জ্ঞান হয়েছিল, সে তখন দিল্লীতে। শুধু ছোটবেলার একটু আবছা দৃশ্য তার মনে পড়ে, আব্বাজান তাকে ভাল বাসতো না। ভাইজান তার ওপর যেন কেমন দুর্ব্যবহার করতো। সে যাকৃগে তার জন্যে সে হানিফকে তাড়িয়ে দেয় নি। হানিফকে সে তাড়িয়ে দিল মায়ের জন্যে। মায়ের জীবনের আশাআকাঙ্ক্ষা নষ্ট করেছিল বলেই তার রাগ।

তারপর তার মনে শান্তি এল। মনটা আবার দৃঢ় হল, বেশ করেছে। অন্যায়ের শাস্তি দেবার জন্যে সে যেন এমনি নির্মমই হয়। হানিফ যদি আবার কোনদিন আসে; তাহলে সোমরুসাহেবকে বলে দিয়ে তার প্রাণসংশয় করবে। লোকটি যেন সাক্ষাৎ একটি শয়তান।

এমনি সব আবোল-তাবোল কথা ভেবে সে ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের প্রকৃতি দেখলো। দুর্যোগ অপসারিত হলে মায়ের শেষকৃত্য করতে হবে। মায়ের মানসিক স্থৈর্যকে অনুসরণ করেই সে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেইমুহূর্তে সে বুঝতে পারলো সেদিন মা ঘৃণ্যজীবন যাপন করেছিল, উপায় ছিল না বলে। সে যদি ঐ অবস্থায় পড়তো, তাহলে হয়তো তাই করতো। হঠাৎ মুন্নার মাকে বড় ভালবাসতে ইচ্ছা করলো।

শাদী হতে আরো কিছুদিন দেরি হয়েছিল।

সোমরুসাহেব তখন আবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। বাদশাহ্ শাহ আলমের দ্বারা বহু সাহায্য পেয়ে সোমরু কৃতজ্ঞ। এক রকম শাহ আলমের চেষ্টাতেই সে মুন্নাকে লাভ করলো। তখন তার মন সরদানার দিকে টানছে। শরীরটা অনেকদিনের পর বিশ্রাম চায়। আরামে শয্যাগ্রহণ করে একটি রমণীর কোমল হাতের সেবার জন্যে মন লালায়িত। ওদিকে সোমরুর সমর্থন নিয়ে শাহ আলমের লোক সরদানায় প্রাসাদ তৈরি করতে ব্যস্ত। একটি স্বাধীন রাজ্য প্রস্তুত হবে। আর সে রাজ্যের অধীশ্বর-হবে ওয়ালটার রীনহার্ড ওরফে সোমরু। সোমরুও কৃতজ্ঞ বাদশাহ্ শাহ আলমের কাছে। কত রাজ্য সে ঘুরেছে। কত সম্রাটের প্রিয়পাত্র সে হয়েছে। কিন্তু এমন সম্মান কেউ দেয় নি। দেয়নি বাংলার নবাব মীরকাশিম আলিও। তার জন্যে সোমরু প্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করেছিল। দেয় নি জাঠ সম্রাট জওয়াহির সিং, নওয়ল সিং। ওঁরা কৃতজ্ঞ। প্রতি পদে পদে বিপদ থেকে উদ্ধার না করলে ওঁদের প্রাণ সংশয় হত।

তবু সোমরু বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে এত পেয়েও কৌশল অবলম্বন করলো। কেন করলো তা সে জানে না। পরবর্তীকালে এ নিয়ে অবশ্য চিন্তা করেছিল। মনে হয়, সে আর বেইমানী করতে চায় নি বলে নওয়ল সিংয়ের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। জাঠ সম্রাট নওয়ল সিং তখন দীগ দুর্গে অবস্থান করেছিলেন। তবে নওয়ল সিং নিহত হবার পর সোমরু বাদশাহের সেনাধ্যক্ষ নজফ খাঁকে বলেছিল—জাঠদের উচ্ছেদ করার জন্যেই আমাকে এই দুপক্ষ অবলম্বন করতে হয়েছিল।

মুন্না তখন মাকে হারিয়ে অসহায়া হয়ে পড়তে বাদশাহ শাহ আলম তাকে নিজের হারেমে এনে রেখেছিলেন।

সোমরু একদিন মুন্নার কাছে বিদায় নিয়ে জাঠদের দলে গিয়ে ভিড়লো।

বাদশাহ শাহ আলম তখন জাঠ, মারাঠা, রোহিলাদের উচ্ছেদের জন্যে নির্বাসিত সেনাধ্যক্ষকে পুনরবহাল করে তাঁকে 'আমির উল-উমরা' উপাধি দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। মীর্জা নজফ খাঁ আবার মোগল সেনাদল গঠিত করে জাঠদের উচ্ছেদের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলেন। সোমরুর নির্দেশই নজফ খাঁ মেনেছিলেন। কারণ জাঠদের আভ্যন্তরিণ অবস্থা লিপিবদ্ধ করে সোমরু মোগল সেনাধ্যক্ষকে সাহায্য করেছিল

দান কাউয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হল। জাঠরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হল। আবার কিছুকাল পরে মথুরার কিছু দূরে বারসানায় মোগল ও জাঠের সঙ্গে অস্ত্র বিনিময় হল। জাঠরা বহু অনুচর হারালো ও ক্ষতিগ্রস্ত হল। সোমরু দেখলো, এই সুযোগ। সে জাঠদের ওপর বিগড়ে গেল। জাঠদের রণনীতি যে পরাজয় বরণ করবার জন্যে—এই কথা বলে সে তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করলো। অবশ্য সোমরু তার বাহিনী নিয়ে অপেক্ষায় ছিল, সে পরবর্তী কোন যুদ্ধেই অংশ গ্রহণ করে নি। এদিকে নজফ খাঁর গুপ্তচর তার কাছে যাওয়া-আসা করছিল।

বারসানার পর মোগলরা আরো তৎপর হল। আরো সৈন্য সংখ্যা বর্ধিত করে কোতমান দুর্গ দখল করতে গিয়ে মীর্জা নজফ খাঁকে বাধা পেতে হল। নওয়ল সিংয়ের শ্বশুর সীতারাম সেই দুর্গের অধিকর্তা ছিলেন। মোগলরা দীর্ঘ আঠারো দিন ধরে বহু লোক ক্ষয় করে তারপর কোতমান দখল করলো।

বাদশাহ শাহ আলমের জয়-জয়কার চতুর্দিকে। তিনি অবশ্য যুদ্ধে অনুপস্থিত কিন্তু তার নাম মোগল সৈন্যের মুখে যেন সহস্র রবে গগন মুখর করে তুললো। কোতমানের পর আগ্রা। মোগলদের হারানো স্থানগুলি যেন আবার মোগলদের অধিকারে আসতে লাগলো। আবার যেন অস্তমিত সূর্য নতুন রশ্মি প্রবাহ নিয়ে মোগল আসমান উদ্ভাসিত করে তুললো। আগ্রার দুর্গও জাঠদের অধিকারে চলে গিয়েছিল। মীর্জা নজফ খাঁ এটওয়ার দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ খবর পেলেন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা আগ্রার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে আগ্রা জয় করলেন।

আগ্রার পতনে জাঠদের মনোবল অপসারিত হল।

জাঠরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না দেখেই সোমরু মনে মনে হেসে জাঠ সংশ্রব চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করলো।

মীর্জা নজফ খাঁ ফারুখ নগর ও দীগ দুর্গ অবরোধ করলে জাঠের ক্ষমতা একেবারে শেষ হয়ে গেল। নওয়ল সিং দীগ দুর্গেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সোমরু তার দলবল নিয়ে একদিন দিল্লী চলে এল! তার আগমনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বাদশাহ শাহ আলম প্রাসাদ সজ্জিত করলেন এবং সাড়ম্বরে বহু ঢোকনাদি দিয়ে সোমরুকে আসন দান করলেন। সোমরুর পরোক্ষ সাহায্যেই যে এই জয়লাভ সম্ভব হল ও জাঠরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এই কথা ভেবে তিনি উৎসবের আনন্দকে আরো বর্ধিত করলেন।

তারপর সোমরুর সঙ্গে তার পেয়ারী বেটি মুন্না ওরফে জেব-অল-নিসার শাদীর ব্যবস্থা করলেন।

সোমরু যখন রাজধানীতে ছিল না এই অবসরে বাদশাহ শাহ আলম মুন্নাকে চুপ করে বসে থাকতে দেন নি। প্রত্যহ কয়েক ঘণ্টা ধরে তিনি তাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। রণনীতি কৌশল অসি চালনার কায়দা—এমন কি মুন্নাকে তরবারা হাতে বাদশাহের সঙ্গে অসিযুদ্ধ কসরৎ করতে হত। মুন্না অশ্বারূঢ় হতে পারতো না। তাকে অশ্বারূঢ় করে অশ্বচালনা করতে শেখালেন।

মুন্না অবাক হয়ে বাদশাহকে জিজ্ঞেস করতো,—আমি রমণী, আমার এ সবের কি দরকার? যে হাতে আমি নাচের মুদ্রা কসরৎ করেছি, সে হাতে অসি ধরা কি শোভা পায়?

বাদশাহ নিজের মেহেদী রাঙা শ্মশ্রুরাজিতে হাত বুলিয়ে হেসে বলতেন বেটি, দুনিয়া বড় আজব জায়গা। মানুষের সবকিছু শিখে রাখা ভাল।

কিন্তু আমি যে রমণা।

তুমি রমণী হলেও এক যোদ্ধার স্ত্রী হচ্ছ।

কিন্তু বেগমের তো হাবেমের শোভা হযে থাকতে হয। এই অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কি কাজে লাগবে?

বাদশাহ বলেছিলেন,—এরপর আর উত্তর চেযো না। যদি কখনও প্রয়োজন লাগে তাহলে আমাকে এসে বাহবা জানিও।

মুন্না আর সে সম্বন্ধে কোন কথা বলে নি। শুধু বাদশাহের যত্নে সে একান্ত নির্ভরতার অশ্বে আরোহণ, অসিচালনা, রণনীতির কৌশল, সৈন্য সমাবেশের নানান ভঙ্গি আয়ত্ব করে নিল। এমন কি দরবারে বসে কি করে রাজ্য পরিচালনা করতে হয়, সেটুকুও বাদশাহ শিখিযে দিলেন।

সরদানার প্রাসাদ নির্মাণ শেষ হযে গেল, সোমরু ফিরলে আর কালবিলম্ব না করে বিবাহ অনুষ্ঠান তিনি নানা উৎসবের মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করে দিলেন। তারপর সরদানার নতুন প্রাসাদে যাবার দিন ঘনিয়ে এল। সোমরুর সৈন্য-সামন্ত, রাজকর্মচারী ও বেগম সমভিব্যাহারে যাত্রা শুরু হল।

সোমরুর সম্মানে দিল্লীর দুর্গে তোপধ্বনি করা হল মুহুর্মুহু।

বাদশাহ শাহ আলম আপন কন্যার মত স্নেহে মুন্নাকে শিবিকায় তুলে দিয়ে তার মঙ্গল কামনা করলেন। সোমরুর সঙ্গে কথা হল, নতুন প্রাসাদে কিছুদিন বিশ্রাম উপভোগের পর শিখদের দমনের জন্যে তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে পানিপথ যাত্রা করবে।

পানিপথের সাময়িক শাসক নিযুক্ত করে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা হল।

সোমরু অশ্বারূঢ় হয়ে নতুন বেগমের শিবিকার পাশে পাশে চলতে লাগলো। মুন্নর কে খুশি লাগছিল। সে আজ এক বীরের সঙ্গিনী। হোক্ সে বীর বিদেশী। তবু তার তুলনা হয় না। যেখানে তারা যাচ্ছে, সেখানকার অধিবাসীর তারা মনিব। তাদের কর্তৃত্ব ঐ অঞ্চলের সবাইকে মেনে নিতে হবে। এমন কি বাদশাহ শাহ আলমেরও তারা অধীন নয়। কি ভাল যে লাগছে, এই কথা ভেবে। সেই ভাল লাগার চোখে শিবিকার দরজা ফাঁক করে সে দেখতে লাগলো সোমরুকে। অশ্বের ওপর রণবিজয়ী বীর মানুষটি সূর্যের দিকে মাথা উঁচু করে চলেছে, সে তার স্বামী।

তারপরের ঘটনা আরো একমাস পরের।

সরদানা। বিস্তৃত জায়গা জুড়ে সোমরুর-প্রাসাদ। মোগল শিল্পসৌন্দর্যের অপূর্ব কারুকার্যে নির্মিত হয়েছে এই প্রাসাদ। বাদশাহ সেই প্রাসাদের কক্ষগুলি আরো সমৃদ্ধ করার জন্যে দিয়েছিলেন মূল্যবান আসবাব। কক্ষে কক্ষে দর্পণের প্রতিফলন। স্বর্ণনির্মিত সব আসবার। হীর, চুনি, পান্নার রোশনাই। মেহগনি কাঠের পালঙ্ক, কেদারা। কক্ষের দরজার পর্দায় চুমকির জরি দেওয়া কামদানীপর্দা। ঝাড়ের আলো। স্বর্ণ নির্মিত কারুকার্যময় বর্তিকা। প্রাসাদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফুলের বাগিচা। ঠিক দিল্লীর প্রাসাদ অভ্যন্তরের অম্বরী বাগ, রোশনী বাগের মত।

এসব বিলাসবহুল শোভা এসে দেখলো মুন্না সরদানার রাজ প্রাসাদে। এতটা দেখবে প্রত্যাশা করে নি। ভেবেছিল দিল্লীর প্রাসাদের মত কি আর সৌন্দর্য এই সরদানার ক্ষুদ্র প্রাসাদে রক্ষিত হবে? কিন্তু এখানে এসে তার কল্পনা পরিবর্তিত হল। সে অবাক বিস্ময় নিয়ে বাদশাহ শাহ আলমের রুচিজ্ঞানের কথা ভাবলো। তিনি যত্ন করে বহু চিন্তা ব্যয় করে তবে এই সরদানার প্রাসাদকে শিল্পমণ্ডিত করেছেন।

কিন্তু বিস্ময় তার সেখানেই শেষ হল না। প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশের পর স্বামীর সঙ্গে বিভিন্ন কক্ষে ঘুরতে ঘুরতে সে নিবাক হয়ে গেল। আগে তার মুখে বিহঙ্গের কলকাকলি ছিল। খুশি মনের হিল্লোল বাইরে প্রচার হয়ে অনর্গল সে কথা বলে চলছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে সে কথার স্রোত মন্দীভূত হল। কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল তার বুকের এক অস্বাভাবিক জোয়ারের ঢেউ।

সোমরুর দলবল তারই সঙ্গে এসে প্রাসাদে প্রবেশ করেছিল। সেনাদলের থাকবার জন্যে আলাদা আবাস নির্মিত করা হয়েছিল। যে যেমন পদমর্যাদার লোক, তার তেমনি বাসস্থান। ত্রুটি কিছু নেই। কিন্তু তাদের আসার আগেই যে আর একটি দল এ প্রাসাদে অনেকদিন আগে এসেছিল, সে জানতো না। তাই জানার পর সে গম্ভীর হল। গম্ভীর আরো হল জেনানামহলে গিয়ে।

সোমরুর মিথ্যে কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়ে গেল। সে বলেছিল, জীবনটি শুধু যুদ্ধের জন্যে ব্যয়িত হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ ছাড়া যে জীবনের আর একটি ক্ষেত্রও সমুজ্জ্বল ছিল, তার সাক্ষী জেনানামহলের অগণিত রমণী। তাদের সঙ্গে পরিচয়ে মুন্না জানলো, তারা কেউ এসেছে মীরকাশিমের হারেম থেকে, কেউ এসেছে জাঠ সম্রাট জওয়াহির সিংয়ের অন্তঃপুর থেকে। তারা কেউ স্বেচ্ছায় আসে নি। সোমরুসাহেব তাদের চুরি করে এনেছে। অসংখ্য রমণী। কেউ অপূর্ব সুন্দরী, কেউ কুৎসিত দর্শন। তারা প্রত্যেকেই বিক্ষোভ প্রকাশ করলো, বললো,—সোমরুসাহেব, বড় যোদ্ধা হতে পারে কিন্তু সম্রাটদের মত বিলাসী নয়। সে ধরে এনে কক্ষে বন্দী করে রাখতে ওস্তাদ কিন্তু রমণীদের সঙ্গে উত্তম আচরণে অভ্যস্ত নয়। তারপর যাযাবর জীবন নিয়ে এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ায়। সুতরাং তার সঙ্গে ছুটে বেড়িয়ে কোন সুখ নেই, বরং দুঃখই বেশী।

সোমরু অন্য কাজে অন্যত্র ব্যস্ত ছিল বলে এই সব অভিযোগ তার কর্ণগোচর হল না। আর মুন্নাকে তার কাছে গিয়ে বললো না। সে শুধু কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে গেল। যে পর্বত প্রমাণ আশা তার মনের মধ্যে প্রাসাদ রচনা করে ছল, সে প্রাসাদ আস্তে আস্তে ভেঙে ভেঙ্গে খণ্ডবিখণ্ড হতে লাগলো।

সোমরু বলেছিল. তুমিই আমার জীবনে প্রথম রমণীরত্ন। মুন্না এতটা আশা করে নি। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হল, সোমরু মিথ্যে কথা বলাতে। সে কি একবারও চিন্তা করলো না, তার এই মিথ্যা কথা বেশীদিন স্থায়ী হবে না। স্ত্রী জানবার পর তার মনের অবস্থা কি হবে? বোধ হয় বীরসৈনিক এসব চিন্তা মনে স্থান দেয় না। দিলে পাশে চলতে চলতেই অপ্রতিভ হয়ে সঙ্গ ত্যাগ করতো। সোমরু পাশে চললো আর মুন্না কেমন যেন সমস্ত আশা ত্যাগ করে আশাহীনের মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে হাহাকার করে উঠলো। মার কথা তার মনে পড়লো। এইজন্যেই বোধ হয় মা সেদিন অমনি উত্তেজিত হয়ে এই শাদীতে বাধা দিতে চেয়েছিল। মার প্রতি সেদিন মুন্না দুর্ব্যবহার করেছিল কিন্তু আজ বুঝতে পারছে, কত বড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছিল।

সোমরু হঠাৎ একটি বন্ধকক্ষের সামনে এসে দাঁড়ালো। এখানে হঠাৎ সে দারুণ এক দক্ষ অভিনেতার মত অভিনয় করলো। সহাস্যে বললো,—তুমি আমার জেনানামহল দেখলে! কতকগুলি আবর্জনা ঐ মহলের মধ্যে পুরে রেখেছি। তুমি ওগুলি সাফ করে নিজের মনের মত করে নিও। তবে ওরা বড় দুঃখী, যে রাজা মহারাজাই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, তাদের হারেমের ভাগ্যহীনাদের কাতরতা দেখেই এই বোঝা বাড়াতে হয়েছে।

তারপর সোমরু বললো,—এবার যে দরজাটি উন্মুক্ত করছি, তার অভ্যন্তরে যাকে দেখবে সে উন্মাদ রমণী। তাকে আমি পেয়েছিলাম রোহিলাখণ্ড থেকে। এক আফগান আমীর আদমীর ঘরে বাস করতো। তখন সে খুব সুস্থই ছিল। সী ওয়াজ এ ভেরী নাইস ওম্যান। কিন্তু হঠাৎ সে আবিষ্কার করলো, আমি তার ওপর দুর্ব্যবহার করছি। ব্যস্ তারপর থেকে উন্মাদন শুরু হল। এখন একেবারে বদ্ধ উন্মাদ।

এই বলে সোমরু কক্ষের দরজার তালা খুলে দিল।

কিন্তু তার ভেতর প্রবেশ করেই মুন্নার চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। কক্ষটি দীর্ঘ এবং কক্ষের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্তর সুন্দরভাবে সাজানো। যার কথা সোমরু অতো ব্যাখ্যা করে বলেছিল, সে শান্ত কমনীয় মুখচ্ছবি নিয়ে, ঢল ঢল দুই আঁখিতে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে এদিকে তাকিয়ে আছে। একেবারে মনেই হয় না, যে এ উন্মাদিনী। এমন কি উন্মাদের কোন্ লক্ষণই তার শরীরের কোথাও নেই। সুন্দর-ভাবে পোষাকপরিচ্ছদ পরা, সালোয়ার, কামিজ, ওড়নার সুনির্বাচন। চুলের বিন্যাস রুচিমধুর। মুখেও প্রসাধনের স্পর্শ আছে। মুন্না ভাবতে লাগলো, একে কেন উন্মাদ-গ্রস্তা বলে এই কক্ষের মাঝে বন্দী করে রাখা হয়েছে? তবে কি এর মধ্যেও কোন রাজনৈতিক কৌশল সংযুক্ত আছে?

কিন্তু মুন্নার ভাবনা শেষ হল না। তার আগেই সেই রমণী হঠাৎ বিকট চিৎকার করে উঠলো। মুন্না দেখলো, সেই ফুলের মত মুখটি ঘিরে কেমন যেন অস্বাভাবিক এক রক্তবর্ণের স্ফীতি। কেমন যেন চোখ দুটি দিয়ে বিজাতীয় ঘৃণা ঝরে পড়ছে। পালঙ্কে বসেছিল সে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মুখ বিকৃত করে বললো,—দুশমন। দুশমন আছে ঐ শয়তান সাহেব। আওরতের দিল টুকরো টুকরো করে ছিনিমিনি খেলে ঐ সাহেব বীর বলে নিজেকে সবার কাছে সম্মানিত করে। সুযোগ পেলে দেব যেদিন জান্ খতম করে, সেদিন আমার ক্রোধ প্রশমিত হবে।

সোমরু ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

তাই দেখে আবার সেই রমণী স্বভাব পরিবর্তন করে খিলখিল করে হেসে উঠলো। তার একমাথা চুল এলোমেলো হয়ে কেমন যেন হাসির দমকে লুটোপুটি খেতে লাগলো। হাসির দমকে তার দেহেরও কোন সংযম থাকলো না, সে মেঝেতে বসে পড়ে কেমন যেন দুলে দুলে হেসে চললো।

তারপর হঠাৎ হাসি প্রশমিত করে মৃদুস্বরে বললো,—বহিন, কুর্সির ওপর বসো। তুমি হয়ত অবাক্ হয়ে যাচ্ছো, আমার এই অদ্ভুত আচরণে কিন্তু তোমাকে আজ কিছু বলবো না। তুমি সোমরু সাহেবের শাদী করা বেগম। মনে অনেক স্বপ্ন নিয়ে স্বামীর ঘর করতে এসেছ। এ সময়ে তোমার দিল্ ভেঙ্গে দিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমিও আওরত তুমিও আওরত। আমরা পরস্পরকে যতটা বুঝি ততটা কে আর বোঝে?

মুন্না শুধু অস্ফুট স্বরে হতবুদ্ধির মত বললো,—তুমি তাহলে উন্মাদিনী নও?

রমণীটি মৃদু হেসে বললো,—কেন আমার কথা শুনে কি তাই মনে হচ্ছে?

তাহলে তুমি সাহেবের সঙ্গে ঐরকম আচরণ করলে কেন?

বলতেই আবার সেই রমণীর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হয়ে উঠলো, চক্ষুদ্বয় স্ফীত হতে লাগলো কিন্তু সে ভাব সে গোপন করে আবার সংযত হয়ে শান্ত আকার ধারণ করলো। তারপর উত্তর দিল,—বললাম, আজ থাক্—তুমি তো আর শীঘ্র চলে যাচ্ছো না, ধীরে ধীরে সব কহিনীই জানতে পারবে।

সেদিন আর সেই অদ্ভুত রমণী কোন কথা বলে নি কিন্তু মুন্না আস্তে আস্তে সব কথাই জানতে পারলো। বললো অন্যান্যরা এক একজন এক একটি কাহিনী। তার মধ্যে থেকে সত্যটুকু তুলে নিয়ে মুন্না মনের কষ্টিপাথরে বিচার করে নিল।

বাহাবেগম সেই রমণীর নাম।

সোমরুসাহেব তাকে শাদী করেনি বটে তবে বেগমের মর্যাদা দিয়েছিল। দিযেছিল বললে ভুল হবে, দিতে বাধ্য হয়েছিল। বীর সৈনিক যুদ্ধের কৌশলে যত ওস্তাদ, ব্যবহারিক জীবনে তত নয়। তার বীরত্বের এখানেই হয়েছিল পরাজয়। এক রমণী তার শক্তি মেলে দিযে সাহেবকে কবরিত করেছিল। আর সাহেব অন্যান্য রমণীদের নিয়ে যেমন ছিনিমিনি খেলেছে, একে নিয়ে পারে নি। এ জোর করে তার অধিকার আদায় করেছিল কিন্তু শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ অধিকার আদায় করতে পারে নি। সোমরু সাহেব তাকে শাদীর সম্মান দেয় নি। অথচ দিয়েছিল এক সন্তানের মা হতে।

এরই মধ্যে একদিন মুন্না হঠাৎ একটি ধাত্রীর কোলে একটি শিশুকে দেখে। সে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তারপর এক এক করে সব কথা জানতে পারে। এই শিশুকে যখন সে দেখেছিল তখন ধাত্রী তার দৃষ্টি থেকে লুকোতে গিয়েছিল কিন্তু পারে নি। মুন্না সরোষে গর্জন করে বলেছিল, এ কার সন্তান? কি এর পরিচয়?

ধাত্রী কম্পিত হয়ে বলেছিল,—এ কথা আপনি জিজ্ঞেস করবেন না বেগম সাহেবা। সাহেব আপনার দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে আদেশ দিয়েছিলেন। এখন জানতে পারলে আমার শাস্তি হবে।

মুন্না অবাক হয়ে বলেছিল,—কেন সাহেব এ আদেশ দিয়েছেন?

তাতো জানি না বেগম সাহেবা। শুধু বলেছিলেন, আপনি যেন ঘুণাক্ষরে এই শিশুর উপস্থিতি না জানতে পারেন।

এ কথা বলার, কারণ। কেন, এ শিশুকে দেখলে ক্ষতি কি? ...মন যেন মুন্নার রক্ত কে শুষে নিচ্ছিল।

তখন ধাত্রী ছুটে পালিয়ে যেতে গেল।

মুন্না তার পথ রোধ করে কঠিন স্বরে বললো,—দাঁড়াও। আমি যখন এই শিশুকে দেখে ফেলেছি, তখন এর পরিচয় আমি নেব। আমাকে লুকিয়ে কেন সাহেব এই শিশুকে রাখতে বলেছে, তার জবাব চাই।

ধাত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললো,—বেগম সাহেবা আমি মাফি চাইছি। আমার কসুর হয়েছে আমায় ছেড়ে দিন।

মুন্নার মুখের পেশী আরো দৃঢ় হয়ে ফুলে উঠলো কিন্তু বিরক্ত হয়ে বললো,—তুমি স্থির হয়ে দাঁড়াও। সাহেব তোমাকে যাতে কিছু না বলে আমি তার ব্যবস্থা করবো। তার আগে বলো, এই গোপনতা অবলম্বনের কারণ কি? কার এই সন্তান?

ধাত্রী মাথা নত করে বললো,—মালেকা, এই শিশু সাহেবের।

মুন্না মনে মনে এই ভেবেছিল, তাই ধাত্রীর কথার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে

গেল—সাহেবের।

হাঁ মালেকা। বাহাবেগমের গর্ভে সাহেবের একটি মাত্র লড়কা।

তখন মুন্না বাহাবেগমকে চিনতো না। তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—বাহাবেগম কে?

ধাত্রী বললো,—আপনি তাকে দেখেছেন, নাম জানেন না। বেগম সাহেবা উন্মাদিনী বলে সাহেব তাঁকে দরজা বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন।

এরই নাম বাহাবেগম? তখন মুন্না অন্যের কাছে শুনেছিল, ঐ বেগম সাহেবের শাদী করা নয়। কিন্তু এখন তার সন্তান দেখে ও তার নাম শুনে মনে মনে কেমন যেন সে সঙ্কুচিত হল। তারপর তার ঐ বাহাবেগম সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল জাগলো। সে এক এক করে অন্যের কাছ থেকে সব জেনে নিল।

সে নিজের অসহায় ভাবটা ঢাকবার জন্যে মনটিকে দৃঢ় করবার প্রয়াস পেল। মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করে, অনেক চোখের জল মুছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারপর সোমরুকে আক্রমণ করলো,—তুমি আমাকে প্রতারণা করলে কেন?

সোমরু পিছনের ব্যাপার কিছুই জানতো না। বেগমের মনের মধ্যে যে আশাভঙ্গে নানান আলোড়ন চলছে সে কেমন করে তা জানবে। তাছাড়া তার যে সব দোষ ছিল, সে সম্বন্ধেও সে অজ্ঞ। রাজনৈতিক গোলযোগ, সরদানার শাসন পরিচালনা, রাজস্ব আদায়, সেনাদলের সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতেই অন্তঃপুরের ব্যাপার সব ভুলে গিয়েছিল। বাদশাহ জায়গীর দিয়ে আরো গুরুভার চাপিয়ে দিয়েছেন, তাই তার এতটুকু ফুরসৎ নেই অন্য কিছু ভাববার।

তাই নয়া বেগমের আক্রমণে সে পরাজয় স্বীকার করে হতবুদ্ধি হল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—একি কথা বলছো বেগম?

মুন্নার আকৃতি তখন আক্রমণাত্মক। বললো,—ঠিকই বলছি। তুমি সবই জানো, শুধু না জানার ভান করছো।

সোমরু চালাক লোক। ব্যাপারটা অনুমানে বুঝে নিল। কিন্তু প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে তাচ্ছিল্য করে বললো,—তোমাকে বুঝি আমার নামে কেউ কিছু লাগিয়েছে।

মুন্না গম্ভীর হযে বললো, না, কেউ কিছু লাগায় নি। আমি আমার মন দিয়ে ও চোখ মেলে সব দেখেছি ও উপলব্ধি করেছি।

এর উত্তরে সোমরুর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল কি বুঝেছে, কি দেখেছে? কিন্তু সে তা বললো না। বরং সে মুন্নার মেঘ অপসারণের জন্যে কোমল স্বরে বললো,—তুমি অযথা কেন মন খারাপ করছো বেগম? আমার পিছনের দিকে তাকিও না। সামনের দিকে তাকিয়ে আমাকে অনুসরণ কর, দেখবে তুমি লাভবানই হবে।

মুন্না এবার সোজাসুজি আক্রমণ করলো,—তোমার একটি শিশু সন্তান আছে?

এবার সোমরু বিচলিত হল কিন্তু সে ক্ষণিক মুহূর্ত। তারপর বললো,—সে সন্তান আমার নয়।

মুন্না গর্জে উঠলো,—আবার মিথ্যে কথা বলছো! আর কত মিথ্যে কথা বলবে

আমার কাছে।

সোমরু শান্ত কণ্ঠে বললো,—মিথ্যে আমি একটিও বলিনি। তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমাকে পেয়ার করি। আজনের এই দিনগুলিই আমার জীবনে উজ্জ্বল। যা আগে করেছি, তার মধ্যে কোন প্রাণ ছিল না। প্রয়োজনের খাতিরেই করতে বাধ্য হয়েছি। আর যে সন্তানকে আমার বলে প্রমাণ করছো, সে আমার শাদী করা বেগমের নয়। সে আমার জীবনের একটি দুষ্টগ্রহ। ব্ল্যাক ষ্টার। তাকে দেখবে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব।

মুন্না সোমরুর শেষ কথায় আতঙ্কিত হয়ে বললো,—তুমি এত বড় শয়তান, নিজের সন্তানকে অস্বীকার করে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চাও?

সোমরু গম্ভীর হয়ে বললো,—আমি বাহারকে শাদী করি নি।

শাদী না করলেই কি কর্তব্যকে অস্বীকার করা যায়? তুমি কেন শাদী কর নি তা আমি জানি না। তবে শাদীর অনুষ্ঠানের চেয়ে মনের মিলনই বড়। তুমি নিশ্চয় আগে বাহাবেগমকে ভালবাসতে!

না। সোমরু সবলে মাথা নেড়ে অস্বীকার করলো।

তাহলে তার জীবন বরবাদ করলে কেন?

এর উত্তরে হেসে বললো,—তুমি পুরুষ হলে এ কথা বুঝতে পারতে। বাহারের রূপই আমাকে আকর্ষণ করেছিল তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে কিন্তু ভাল আমি কখনও বাসিনি। নেভার আই লভ হার।

তাহলে তুমি স্বীকার করছো, ঐ সন্তান তোমার ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছে।

অনুমান, সঠিক বলতে পারি না।

এবার মুন্না থেমে অনেক দুঃখেও ম্লান হেসে বললো,—তাহলে তুমি ধাত্রীকে আমার কাছ থেকে ঐ শিশুকে লুকিয়ে রাখতে বলেছিলে কেন?

সোমরু তাতেও না চমকে অতি সহজে উত্তর দিল,—শুধু তুমি ভুল ধারণা করবে বলে।

মুন্নার আর ধৈর্য থাকলো না। সে সবস্ত শ্রদ্ধা মুছে ফেলে বিক্ষোভ প্রকাশ করে বললো,—তুমি কি জানতে না, সামান্য এই শিশুকে লুকিয়ে রাখলে সমস্ত ভুল ধারণা মুছে ফেলতে পারবে না। তুমি এমনভাবে তোমার সব কীর্তি-কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে রেখেছ, যাতে নির্বোধেরও ধারণা পালটে যায়।

সোমরু বাধা দিয়ে বললো,—বেগম তুমি স্তব্ধ হও। শান্ত হও। আমি তোমার আগেই বলেছি, আমার অতীত জীবনের দিকে তাকিও না।

মুন্না তখন ভেঙে পড়েছে। দু'চোখে শ্রাবণের ধারা নেমেছে। সে কাঁদতে কাঁদতে বললো,—বললেই কি সব জিনিষ মানা যায়? আমার জীবন বরবাদ হয়ে গেল। আমি কত আশা নিয়ে তোমার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলাম, আজ সবই ভুল। সবই বালির ওপর প্রাসাদ নির্মাণ।

সোমরু কাতর হয়ে মুন্নাকে বোঝাতে লাগলো কিন্তু মুন্নার মন আর প্রবোধ

মানলো না। অনেক দিনের জমানো অশ্রু এক জায়গায় অবরুদ্ধ হয়েছিল, সেই মুহূর্তে অবিরল ধারায় ঝরে পড়লো।

সেদিন আর কোন কথা হল না। সোমরু বেগমের মানসিক অবস্থা দেখে সরে পড়লো। বিদেশী হলেও সে অনেকদিন ধরে এ দেশে আছে। এ দেশের রমণী চরিত্র সম্বন্ধে তাই সে অজ্ঞ নয়। বহু রমণীর সাহচর্যে তাকে আসতে হয়েছে। রূপসী, কুরূপা, পবিত্র, অপবিত্র, সৌভাগ্যবতী; ভাগ্যহীনা প্রত্যেকের স্বভাবের সঙ্গে সে পরিচিত। এমন কি বহু ইউরোপীয় মেয়ের সাহচর্যে এসেও সে দেখেছে। একদিকে যেমন ভাগ্যপরিবর্তনের জন্যে তাকে নানান কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে। বেইমানী করেছে, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে, ঠকিয়েছে। মানুষের জীবনের কোন দুষ্ট মতলব-কেই সে পাপ বলে পরিত্যাগ করে নি। তাকে বড হতে হবে। সল্টসবার্গের সেই অন্ধকার কুঁড়েঘরটি আজও চোখের ওপর ভাসে। পিতার মাংস ফেরী করে বেডানোর দৃশ্যও বিস্মৃতি নয়। সেইজন্য তাকে বড় হতে হবে। অর্থশালী হতে হবে। দৌলতের সিংহাসনের ওপর বসে গরীবী ইজ্জতকে তছনছ করতে হবে। আর তারই জন্যে সে মানুষের কোন দুষ্ট মতলবটি অন্যায় বলে পরিত্যাগ করে নি। আজও মনে আসে, সেই পাটনার বীভৎস ঘটনা। অতগুলি ইংরেজের প্রাণ নিতে যখন সবার বিবেকে বেধেছিল, সে অবলীলাক্রমে তাদের শেষ করেছে। এতটুকু হাত কাঁপে নি, শুধু লক্ষ্য ঐ ভাগ্য পরিবর্তন। জীবনের এমন একটি উজ্জ্বল দিন তৈরি করতে হবে, যা অন্ধকারকে কবরিত করে দেয়। আর সেইজন্যেই সে এদেশের আচার, ব্যবহার শিখে পোষাক পরিবর্তন করে নিয়েছিল। বুঝেছিল, এদেশে থাকতে হলে এদেশের মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। অন্তরঙ্গ হতে পারলেই কার্য উদ্ধার হবে।

আর তখন থেকেই সে এদেশের রমণীর সঙ্গে মিশতে লাগলো। হারেম সৃষ্টি করলো। হারেমের মধ্যে সহস্র রমণীকে পুরলো। সে মীরকাশিমের বহু বিবিকে চুরি করেছিল শুধু ঐ কারণে। শুধু নিজের স্বার্থটুকু চরিতার্থ করা ছাড়া কোন দিকে তাকায় নি। সকলকে অবজ্ঞা করেছে, সকলের চোখের জল সে অট্টহাস্য করে উড়িয়ে দিয়েছে। শুধু বাহার বিবিকে পরাভূত করতে পারে নি। তার ইজ্জত কেড়ে নিয়ে তাকে এড়িয়ে চলতে পারে নি। তখনই তার চমক লেগেছে। এদেশের রমণীরা দুর্বল, তারা পুরুষের শক্তির কাছে মাথা নতই করে থাকে। অত্যাচারিত হলেও ভাগ্যকেই অপরাধী করে কিন্তু বাহার বিবি সোমরুর সে ভুল ভেঙ্গে দিল। তার শান্তি কেড়ে নিল। যখন বাহার বিবির গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব হল, তখন আর সোমরু পরিত্রাণ গেল না। তাকে স্বীকার করতে হল। বাহারকে বেগম পদমর্যাদা দিল বটে কিন্তু শাদীর সম্মান দিল না। শাদীর সম্মান দিতে কেমন যেন সোমরুর মনে বাধলো। যে রমণীকে শুধু সম্ভোগের জন্যেই প্রার্থনা করা যায়, তাকে বেগম করা যায় না। এই উপলব্ধিতে সে দিনের পর দিন বাহারকে এড়িয়ে চলতে লাগলো। তারপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর, আর সোমরুর অদ্ভুত আচরণে বাহার কেমন যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। সোমরু বুঝলো, বাহার বেগমের মানসিক

ধৈর্যচ্যুতি। দিনের পর দিন এইরকম চললে অবশ্য একদিন বাহারকে তার স্বীকার করতেই হত।

ঠিক সেই সময় মুন্নার আগমন। মুন্নাকে দেখার পর সোমরুর মতিগতি পরিবর্তিত হল। শাদী যদি করতেই হয়, তাহলে এই রমণীকেই করা যায়। এই সময় সোমরু বাহার বিবিকে ও তার সন্তানটিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার মতলব করলো। কিন্তু যে নরঘাতক মানুষ মারতে এতটুকু দ্বিধা করে না, সে কেন যে একটি রমণী ও একটি শিশুকে বধ করতে এত দ্বিধা করলো, তা রহস্যই।

তাদের মারতে পারে নি বলেই আজ এই দুর্ভোগ। আজ এই যন্ত্রণা। আজ এই সমস্যা। নয়া বেগমের কাছে সে ছোট হয়ে গেল। নয়া বেগম বুঝলো না তার মনের কথা। একটি মানুষকে বিচার করতে গেলে যে তার অতীত নিয়ে বিচার করা উচিত নয়, সে কথাটি বেগম বুঝলো না।

সোমরু সরদানার রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে উপায় অন্বেষণ করতে লাগলো। এবার তাকে ভাল হতে হবে। সরদানার শাসনকর্তা সে হয়েছে, সে এখন এক স্বাধীন দেশের সম্রাট। সে আর সামান্য লোক নয়। অন্তত লাখ লাখ লোকের মধ্যে সে হারিয়ে যাবে না। ওয়ালটার রীনহার্ড সোমরু হলেও তার ব্যক্তিত্ব স্বীকার্য। দিল্লীর বাদশাহ শুধু নয়, তামাম হিন্দুস্তানের লোক তার ক্ষমতাকে স্বীকার করে। এই তার আশা ছিল। এই ছিল সঙ্কল্প। সে অধীশ্বর হয়েছে। সুতরাং এবার তাকে ভাল হতে হবে। অতীতকে ফেলে দিয়ে নতুন বসন পরে বর্তমানকে আঁকড়ে ধরতে হবে। ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে হবে। যেন ইতিহাসে লেখা হয়, ওয়ালটার রীনহার্ড মাংসবিক্রেতার ছেলে নয়, সে সরদানার শাসনকর্তা ও একজন রণজয়ী যোদ্ধা। যার অসির ভয়ে সহস্র সহস্র সৈনিক কাঁপতো। যার রণনিপুণতায় জাঠ, মারাঠা, রোহিলা মোগল সম্রাট ভয়ে থরথর। এমন কি ইংরেজ পর্যন্ত ভয় করে এই নির্ভীক পুরুষকে। ইংরেজ এখন বাংলায় স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করেছে। তারা আর ব্যবসাদার নয়। এখন বাংলার রাজা। তারা উত্তর ভারতের এদিকে খুব বড় একটা লোভ জাগাতে পারে নি। সে কার ভয়ে?

সব, সব জানে সোমরুসাহেব। তার চোখ শুধু সামনের দিকেই সীমাবদ্ধ নয়, পিছনেও আছে, চতুর্দিকে ঘুরে চলেছে। তাই তাকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এখন নিশ্চিন্ত হতে হবে। নয়া বেগমের কাছে নিজের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করে উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিত্যাগ করে সংসারী হতে হবে। বয়েস হয়ে আসছে। রক্তের চাঞ্চল্য কমে আসছে। এখন অন্যায় করার আগে একটু ভাবতে হবে।

হারেমটাকে সাফ করা দরকার। যে সমস্ত রমণীরা তারই ব্যয়ে আরামে জীবন যাপন করছে তারাই সর্বনাশ করতে চাইছে। তাদের বহুদূরে পাচার করতে হবে। আর বাহাবেগম ও তার পুত্রটিকে। —না, তাদের একেবারে পৃথিবী থেকে লোপাট করা দরকার। সেবারে সে নিজে লোপাট করতে গিয়েছিল কিন্তু সম্ভব হয় নি, এবারে লোক মারফত সে সরিয়ে দেবে।

সোমরুর ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে কার্যও এগিয়ে চলতো। একদিন সুযোগ বুঝে সে একটি চারঘোড়ার ঢাকাগাড়িতে দুজনকে তুলে দিল। সে ছিল না, গোপনে লোকের দ্বারা এই কাজ করালো। এমনভাবে করতে নির্দেশ দিল, যেন মুন্না না জানতে পারে। কিন্তু মুন্নার সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করা সম্ভব হল না। ধরা পড়ে গেল। মুন্নার সতর্ক দৃষ্টি ছাড়াও বাহাবেগম বিকট চিৎকার করে উঠেছিল। তার মুখগহ্বরে বস্ত্রখণ্ড পুরে দেবার আগেই সে চিৎকার দিয়েছিল।

কথা ছিল সন্ধ্যার আঁধারে কারুর জানবার অবকাশ নেই। একবার ঢাকাগাড়িতে পুরতে পারলেই কাজ হাসিল। তারপর একেবারে মীরাটের বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে কোতল। বেতনভোগী কর্মচারীদের এই নির্দেশ দিয়ে সোমরু নিজের খাসকক্ষে অন্তরীণ হয়েছিল।

কিন্তু খাসকক্ষ থেকেই সোমরু বাহাবেগমের চিৎকার শুনতে পেল, আর তারপর নয়া বেগমের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর।

মুন্না ঢাকা গাড়ি থেকে শিশুটিকে নামিয়ে নিয়ে এসে ধাত্রীর কোলে দিল, তারপর বাহাবেগমকে আশ্বাস জানিয়ে সে সোমরুর কক্ষে প্রবেশ করলো।

তখন সে আর উত্তেজিত ছিল না। বরং দারুণ শান্ত হয়ে এসেছিল। সে শান্তকণ্ঠে সোমরুর সামনে দাঁড়িয়ে বললো,—তুমি এদের স্বীকৃতি জানাও। আমি সপত্নী নিয়ে ঘর করতে এতটুকু দ্বিধা করবো না। বাহাবেগম আমার বহিনতুল্য। সে হবে তোমার প্রথমা স্ত্রী, আমি দ্বিতীয়। আর তার পুত্র হবে তোমার উত্তরাধিকারী। বাহাবেগমকে তুমি শাদীর সম্মান দাও, আমি তার তোড়জোড় করে দেব।

সোমরু যেন কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন একটি নিরুদ্বেগ সমাধান সে একবারও ভাবে নি। নয়া বেগম কত সহজে সেই গুরুতর বিষয়টি সমাধান করে দিল, সেই কথা ভেবে সে বিস্মিত হল। মনে মনে মুন্নার প্রশংসা করলো। সে ভেবেছিল, মুন্না বুঝি তার এই ষড়যন্ত্রে আবার ক্ষিপ্ত হয়ে দারুণ অশান্তির ঝড় তুলবে। এমন আচরণকে সে কি ক্ষমা করবে? তার প্রকৃতি জানা ছিল বলে সোমরু ভয়ে ভয়ে কক্ষে বসে কাঁপছিল।

কিন্তু মুন্না এসে বিপরীত আচরণ করতে সে নিশ্চিন্তে হাফ ছাড়লো। তারপর মুন্নার হঠাৎ আত্মত্যাগে সে স্থির থাকতে পারলো না। মৃদুকণ্ঠে শুধু বললো,— তোমার যদি কোন সন্তান হয়, তাহলে কি করবে?

মুন্না এবার থেমে সোমরুর দিকে তাকিয়ে বললো,—তার অধিকার তোমার প্রথম সন্তানের পর।

তবু সোমরু বললো,—তুমি আর একটু ভেবে কথা বলো। হঠাৎ এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে পরে অসুবিধায় পড়ো।

মুন্না দৃঢ়স্বরে বললো,—আমি অজ্ঞানে বলছি না, সজ্ঞানে বলছি। যার স্বীকৃতি আমার আগে তার প্রাপ্য অবশ্যই পাওয়া উচিত। বঞ্চিত করলে ভোগ করা যায় না। ভাগ্যে থাকলে হবে, নয়তো পথে নামবে। তারপর ম্লান হেসে বললো,—আর যদি

সন্তান না আসে, তাহলে কোন ঝঞ্ঝাট নেই!

সোমরু দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থায় চুপ করে থাকলো, বাহারকে স্বীকৃতি জানাবার কোন উৎসাহ নেই কিন্তু নয়া বেগম যাকে স্বীকৃতি জানাতে চায়, তাকে কেমন্ করে সে উপেক্ষা করবে? বাহারকে তবু উপেক্ষা করার সাহস আছে কিন্তু নয়া বেগমকে নয়। তার দৃঢ়তা আরো সীমাহীন। বাহারের দৃঢ়তা দেখে আগে যেমন তার ভয় জাগতো, নয়া বেগমের দৃঢ়তা দেখে সে স্তম্ভিত হয়েছে। অবশ্য সে অস্বীকার করে না, সে মুন্নাকে ভালবাসে। তার বিক্ষুব্ধ জীবনে হঠাৎ চমক সৃষ্টি করে দিয়ে এই রমণীটি যেন তাকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তার অপরিমিত শক্তির কাছে যখন হিন্দুস্তানের সব যোদ্ধারা মাথা নত করেছে, তার নৃশংস প্রকৃতি দেখে যেমন মানুষ তাকে নরঘাতকের সঙ্গে তুলনা করেছিল, তেমনি সে আজ সমস্ত উপাধি হারিয়ে একান্ত সুবোধ বালকে পরিণত হয়েছে। মুন্নাকে দেখেই তার আজ এই পরিবর্তন। কেন পরিবর্তন সে তা জানে না। তবে সে অনুতপ্ত নয়। বিরাট পরিশ্রমের পর লোকে যেমন শান্তি আকাঙ্ক্ষা করে, তেমনি তার জীবনে সান্ত্বনা এসেছে। তাই নয়া বেগমের জন্যে সে সবকিছু করতে পারে। আর সেইজন্যে বার বার সে ব্যথিতকণ্ঠে প্রকাশ করেছে—বেগম, আমার অতীতকে ভুলে গিয়ে বর্তমানের মানুষটিকে নিয়ে বিচার কর। কিন্তু মুন্না অতীতকেই জড়িয়ে বর্তমানকে নিয়ে বিচারের আসনে বসেছে। বুঝতে পারে নি, সোমরু বোঝাতে পারলো না। আর তারই পরিণাম হল বিষময়।

তাই সে অনেকক্ষণ পরে বললো,—তুমি যা চাও তাই হবে বেগম।

মুন্না তাতেও শান্তি পেল না, তাতেও তার স্বস্তি হল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললো,—আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারি?

অপ্রতিভ হয়ে সোমরু মুন্নার দিকে তাকালো। তারপর ব্যথিতকণ্ঠে বললো,—পারো।

এত বড় একজন দুর্ধর্ষ পুরুষ কিন্তু তার চোখে কেন যেন জল এসে পড়লো। কেমন যেন সে অসহায়ের মত মাথা নত করে তার দুর্বলতা ঢাকতে চাইলো। মুন্না দেখেও তা দেখলো না। বুঝেও সে থমকে দাঁড়ালো না। মুন্না দীপ্তভঙ্গিতে কক্ষ থেকে চলে গেলে অনেকক্ষণ সোমরু চুপ করে বসে থাকলো। ভাবতে লাগলো জীবনের শেষ পরাজয় কি তবে এক রমণীর কাছে হবে? যে পরাজয়কে সে ঘৃণা করে জীবনের সাফল্যকেই করায়ত্ত করেছিল, সেই পরাজয় আজ এক রমণী হতেই সংঘটিত হবে। তবে কি যিনি অন্তরালে বসে সবকিছু পরিচালনা করছেন, তার অভিপ্রায়ই এই।

সোমরু আর ভাবতে পারলো না। দেরাজ থেকে নিজেই সরাব বের করে ঢক্‌ঢক করে গলায় ঢেলে দিল। রক্তের মধ্যে কেমন যেন বরফের হিমশীতলতা জাগছে। কেমন যেন জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা। রক্তকেও উত্তপ্ত করতে হবে, জীবনকেও উজ্জ্বল করতে হবে। পরাজয় সে স্বীকার করবে না। জীবনের কোথাও সে পরাজয় স্বীকার করে নি। যাকে ভাগ্যহীন দেখেছে, তারই সংশ্রব সে ত্যাগ করেছে। নবাব

মীরকাশিম তার অনেক উপকার করেছিলেন, বাংলার হারানো নবাবী ফিরে পাওয়ার জন্যে সে বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু যখন দেখলো ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়, তখন সেও মীরকাশিমকে ত্যাগ করেছিল। পরাজয় তার নয়, পরাজয় অন্যের। তাই এই পরাজয়ও আর স্বীকার করবে না।

সোমরু বল সঞ্চারের জন্যে পাত্রের পর পাত্র সরাব পান করে চললো।

অন্যদিকে মুন্নারও মনে শান্তি নেই। এই কি সে চেয়েছিল? মায়ের ওপর শক্রতা করে সে এই সাহেবকে বরণ করেছিল, ভেবেছিল একজন ভাগ্যবান পুরুষের সহধর্মিণী হয়ে তার জীবনের সৌভাগ্য সৃষ্টি করবে। সৌভাগ্যশালিনী হয়তো সে হয়েছে, দৌলতের রাণী হয়ে সম্পদের সিংহাসনে বসেছে কিন্তু সম্পদই কি জীবনের সব? সম্পদ ছাড়া যে জীবনের আর এক সুখ প্রয়োজন হয়, সে সুখ তার কোথায়? সেই সুখ পাওয়ার জন্যেই যে সোমরুকে সে বিয়ে করেছিল। মায়ের জীবন ভালবাসা না পেয়ে বরবাদ হয়ে গেছে, তাই সে সোমরুর চোখে ভালবাসার রঙ দেখেই তাকে গ্রহণ করেছিল। মা বলেছিল, ওরে, সম্পদ জীবনের সুখ নয়। যদি জীবনে সুখ না পাস, তবে সম্পদ ভোগ করতে স্পৃহা হবে না। তারপর মা বলেছিল, তার পিতার কথা। পিতা নাকি সুখ ও শান্তির জন্যে সুদূর আরব থেকে হিন্দুস্তানে চলে এসেছিল কিন্তু এখানে সে শান্তি পায় নি। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে এক একটা আঘাত সহ্য করে বিড়ম্বনাকেই সম্বল করতে হয়েছে। পায়নি শান্তি, দেয়নিও কাউকে শান্তি। তাই পিতা মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিল, আমার মুন্না ও হানিফ থাকলো, ওদের তুমি সাবধানে রেখো। জানি না আমার শেষপ্রদীপ নিভে যাবে কি না! তবে ভয় হয়, বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে সব। আরব থেকে এক দুর্ভাগা পরিবার দুটি অন্নসংস্থানের জন্যে হিন্দুস্থানে এসেছিল কিন্তু তাদের অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। যাও বা অবশিষ্ট ছিল, তা কালের ষড়যন্ত্রে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মায়ের এই কথাগুলি আজ এই অবস্থান্তরে মুন্নার কেন যেন মনে হতে লাগলো। পিতা তবে কি ভবিষ্যৎ চিত্র দেখেই এমনি আক্ষেপ প্রকাশ করে গেছে? হানিফের প্রকৃতি নয় তিনি স্বচক্ষে দেখে তার সম্বন্ধে রায় দিয়ে গেছেন কিন্তু মুন্নার সম্বন্ধে কেমন করে তিনি শঙ্কিত হলেন? তখন তো তার এমন কিছু বয়স নয়, যাকে দেখে তার আগামী জীবনের ধারণা মনে বাসা বাঁধবে? আরব থেকে যারা বাঁচবার জন্যে হিন্দুস্তানে এসেছিল তারা হিন্দুস্তানের দৌলতের উজ্জ্বল রোশনাইতে চোখ অন্ধ করে অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে।

না, না এ কিছুতে হবে না। মায়ের বেদনা, পিতার অনুতাপ, বংশের অভিশাপকে সে জয় করে সে তার সগর্ব উপস্থিতি চতুর্দিকে জাগিয়ে তুলবে। হানিফের শেষ দুরবস্থা

সে দেখেছে, তার আর কোন আশা নেই কিন্তু মুন্নার আশা আছে। মুন্না কখনও পরাজয় স্বীকার করবে না। মায়ের সেই শেষ কথাগুলির প্রমাণ যে সত্যি নয়, তার আচরণ দিয়ে সে প্রমাণ করবে।

সে রমণী হলেও কোমলতাকে সে পরিহার করবে। কোমলতাকে সে বিদায় দিয়ে পুরুষের মত শক্তিসঞ্চয় করে সোমরুর দুর্বলতাটুকুকে কাজে লাগাবে। এবার সে বুঝতে পারছে, বাদশাহ শাহ আলম কেন তাকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন। কেন তাকে অসিচালনা শিখিয়েছিলেন ? তখন তিনি মুন্নার প্রশ্নের উত্তরে হাস্য প্রকাশ করে শেষ করেছিলেন কিন্তু তার সেই নিরুত্তরে যে আগামী একটি জীবনকেই উদ্দেশ্য করেছিল, আজ বুঝতে পারছে। বাদশাহ বোধ হয় সোমরুর ব্যক্তিগত জীবন সবই জানতেন কিন্তু তিনি জেনে-শুনে কেন মুন্নাকে এক শয়তানের কবলে সঁপে দিলেন ? তার উত্তরে শুধু মুন্নার এই ধারণা হল, বাদশাহের স্বার্থ এই মিলনকে সম্ভব করেছিল। তিনি মুন্না ও সোমরুর কোন ভাল চান নি। মুন্নাকে লাভ করতে পারলে সোমরু মোগল বাদশাহের বশীভূত হবে বলেই এই মিলনে তিনি আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। শুধু রাজনৈতিক সম্বন্ধ, এর মধ্যে হৃদয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

মুন্না সেটুকু অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিল। তবে আজকের মত এতটা বুঝতে পারে নি। পারলে সে মায়ের ইচ্ছাই পূরণ করতো। সে নর্তকীর জীবন নিয়ে বড় বড় আমীরদের চোখের সামনে নৃত্য করে মোহরের পুঁটুলী উপঢৌকন নিত, আর পুরুষদের ক্রীড়াপুতুল করে এক উচ্ছল জীবনের স্রোতে ভেসে বেড়াতো। সে জীবনের মধ্যে কান্নাই সম্বল, তবু সেই জীবনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য খুঁজতো—অন্তত আজকের এই সমস্যাবহুল জীবনের টানাপোড়েনে প্রবেশ করে দিশেহারা হয়ে পড়তো না। যে মানুষটির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে তাকে জীবনের আবর্তে জড়িয়ে নিল, সেই মানুষটির ভালটাই সে দেখেছে কিন্তু এত মন্দ প্রবৃত্তি তার মধ্যে আছে একবারও চিন্তা করে নি। তাই নতুন বিবাহিত জীবনের যে মোহ, তা তার অপসারিত হয়ে কেমন যেন শুধু বিশ্রী ভাবনাই সম্বল হল।

বাহাবেগমকে সে স্বীকৃতি জানালো সে রমণী বলে। বাহাবেগমের অবস্থা যদি তার হত তাহলে সে কি করতো ? সেই কথা ভেবেই সে নিজের অনেকখানি ত্যাগ করে মেয়েটিকে বাঁচালো। তাকে অসম্মানের জগতে ফেলে না দিয়ে সামাজিক জীবনের মধ্যে ফিরিয়ে আনলো। তার পুত্র জাফরকে উত্তরাধিকারী করবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। এর জন্যে অবশ্য সোমরু খুব অবাক হল কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায়ই ছিল না। অনেকখানি ত্যাগ না করলে তার মহত্ব প্রচার হত না। সে মহৎ হতে চায় নি বটে তবে মহৎ হবেই বা না কেন ? মানুষ তো সৎ ও মহৎ দুই হবার আশা পোষণ করে। তবু মনে হয়, সে মহত্তের চেয়ে একটি রমণী ও শিশুর অবস্থার জন্যে কাতর হয়েছিল। তাদের অনাথ অবস্থা থেকে তুলে এনে আশ্রয় দেবার জন্যেই এই ব্যগ্রতা।

না, বাহাবেগমের সুখ এলে বুঝি তার মনে শান্তি আসবে। বাহাবেগম তার স্বামীর সন্তান গর্ভে ধরেছে। তার জন্যেও তার কর্তব্য করা উচিত। স্বামী যদি তার

কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হয়, সে কি সজ্ঞানে তাকে সমর্থন করতে পারে ?

সেইজন্যে সেদিন রাত্রে স্বামীর আর একটি আচরণে সে আশ্চর্য হয়ে প্রথমে হতবুদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু পরে বুঝেছিল, স্বামী অতীতকে মুছে ফেলবার জন্যেই এই আয়োজন করেছে, তাই স্বামীকে তিরস্কার না করে বরং তার প্রতি ভিন্ন আচরণ করেছিল। আর দিয়েছিল বাহাবেগম ও তার পুত্রকে স্বীকৃতি। এমন কি তার পরেও জেনানা মহলের শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্যে সে সব কর্তৃত্ব নিজের হাতে নিল।

সোমরু মুন্নার এই কর্তৃত্বে বরং খুশিই হল, সে নিরুত্তরে সমর্থন জানিয়ে মনের দুশ্চিন্তা ত্যাগ করলো।

শিখ দমনের জন্যে পানিপথে যাবার বাদশাহের আদেশ আসতে সে একদিন সরদানার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে চলে গেল। তার এক বিশ্বস্ত সহকারীকে রাজ-কর্মভার অর্পণ করে গেল, তবে যাবার সময় সোমরু মুন্নাকেই সব ক্ষমতা দিয়ে গেল।

মুন্নার মনে শান্তি নেই। কেমন যেন মনের স্বাতন্ত্র্য সে হারিয়েছে। সে কিছুতে মনের ছিন্ন অংশকে জোড়া লাগাতে পারলো না। সোমরুর অতীতকে মেনে নিয়ে সে প্রাসাদের সৌধে নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেছে, অগণিত কর্মচারী তার বশীভূত হয়ে সর্বদা সম্মান প্রদর্শন করে। সে নতুন নতুন মূল্যবান পোষাকে ভূষিতা হয়ে নতুন নতুন চমকের সৃষ্টি করে, বিস্তৃত প্রাসাদের রমণী পুরুষদের বিস্মিত করে তবু যেন তার আগের মত আনন্দ নেই। কেন নেই সে জানে না। কেমন যেন শুধু শূন্যতা। নৈরাশ্য। চতুর্দিকে শুধু শূন্যতার হাহাকার ছাড়া কোন উন্মাদনা নেই।

এমনি সময়ে একদিন একটি ঘটনা ঘটলো।

একটি বাঁদী হঠাৎ তার কক্ষে বিষপ্রানে আহত হয়ে মরণাপন্ন হল।

মুন্না যখন ঘটনাস্থলে গেল, তখন মেয়েটি শেষ হয়ে এসেছে। মুন্না তার নীলবর্ণ দেহের দিকে তাকিয়ে ঝুঁকে পড়ে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলো,—তুমি বিষপানে মৃত্যু গ্রহণ করলে কেন ?

বাঁদী শেষ কথা যা বললো তা এই—আপনার ঘরে আপনার জন্যে এক পাত্র শরবত চাপা ছিল দেখে লোভ সংবরণ করতে পারি নি। শুনেছিলাম আপনি একটি অদ্ভুত উপাদেয় শরবত আহার করেন। সেই লোভেই আমার এই মৃত্যু। আপনার সরবতে বিষ মিশ্রিত ছিল যদি জানতুম তাহলে কি এই সরবৎ পান করতুম ?

মুন্না চমকিত হল, দারুণভাবে বিস্মিত হয়ে চতুর্দিকে পাগলের মত তাকালো। তাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল! এতদূর গড়িয়ে চলেছে চক্রান্ত ? কে সেই চক্রান্তকারী ? মুন্না সরোষে আদেশ প্রাচর করলো,—কে আমার শরবতে বিষ মিশিয়েছিল যে ধরে দিতে পারবে তাকে আমি পুরস্কৃত করবো।

কিন্তু আদেশ দিয়েই সে মনে মনে কেমন যেন নিজেকে অসহায় মনে করলো। স্বামী প্রাসাদে নেই, এই সুযোগে চক্রান্তকারীরা কাজ হাসিল করতে চায় ? তাহলে তারও শত্রু সৃষ্টি হয়েছে ? তাকেও কেউ বধ করতে চায় ?

মুন্না নিজের ঘরে এসে চতুর্দিকে কেমন যেন অর্থহীন দৃষ্টিতে মৃত্যুকেই প্রত্যক্ষ

করতে লাগলো। মৃত্যু যেন তার লোলজিহ্বা বের করে তার দিকে ছুটে আসছে। তার যেন বিরাট দুটি হাত কণ্ঠনালি চেপে ধরবার জন্যে প্রসারিত করেছে। আতঙ্কে চোখ দুটি বিস্ফারিত করে মুন্না পাগলের মত চিৎকার করে উঠলো। উত্তেজনায় সে সমস্ত ঘরময় ছুটে বেড়ালো। বাইরে বেরবার জন্যে দরজা খুলতে গেল কিন্তু সামনে দরজা উন্মুক্ত থাকতেও সে দেখতে পেল না। মুহূর্তে যেন তার কেমন পরিবর্তন হয়ে গেল।

সে প্রচণ্ড উত্তেজনায় অসহায়ের মত হর্ম্যতলে বসে পড়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। সে বোধ হয় মৃত্যুকে পরিহার করবার জন্যে নিজেকে লুকাতে চাইলো। কিন্তু কেমন করে সেই প্রচণ্ড শক্তিকে প্রতিরোধ করবে ভেবে না পেয়ে দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেমন যেন কান্নার এক সীমাহীন আবেগ সমস্ত দেহকে বেদনা দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে নিল।

এই সময় এক পরিচারিকা এসে জানালো,—মালেকা, যে বাঁদী আপনার শরবতে বিষ মিশ্রিত করেছিল, সে কবুল করেছে তার অপরাধ।

মুন্নার অসহ মুহূর্তে অপসারিত হল। সে ফিরে এল নিজের স্ব-অবস্থায়। বিভীষিকা'র কুয়াশাচ্ছন্ন থেকে ফিরে এসে সে নিজের দৃঢ় অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হল। চোখের জল মুছে কর্ত্রীর মত মুখভঙ্গি করে পরিচারিকাকে বললো,—কোথায় সেই বেসরম বাঁদী? জলদি এখানে নিয়ে এস।

পরিচারিকা চলে গেলে মুন্না আরো নিজেকে প্রকৃতস্থ করে নিল। না, কঠোর হস্তে এই ষড়যন্ত্র ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ করে দিতে হবে। কার এতদূর স্পর্ধা তার জান্ নিতে সাহস করে, সেই সাহসিনীর দেখা পেলে সে তাকে টুকরো টুকরো করে দেবে। একটা অনুমান তার মনে সেই মুহূর্তে খেলে গেল। কিন্তু পরক্ষণে সে নিজেকেই নিষেধ করলো, না না এ সম্ভব নয়। যাকে এতখানি ত্যাগ স্বীকার করে উচ্চাসনে স্থান দিয়েছে, সে বেইমানী করতে পারে? কিন্তু পৃথিবীতে সবই সম্ভব। যা কখনও কল্পনা করা যায় না, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটে যায়।

এই সময় সেই পরিচারিকা বাঁদীটিকে এনে উপস্থিত করলো।

অপরাধিনী মাথা অবনত করে মুন্নার ক্ষুব্ধ চোখের সামনে এসে দাঁড়ালো। আর মুন্না তার দিকে তাকিয়ে হতবাক্ হয়ে গেল। এ যে সেই বাহাবেগমের খাস পরিচারিকা। তাহলে যা তার মধ্যে অনুমিত হয়েছিল, তাই ঠিক? তাহলে বাহাবেগম তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল? কিন্তু কেন? তাকে এতখানি আত্মত্যাগ নিবেদন করেও সে তৃপ্ত নয়? সে তাকে সরিয়ে নিজের আসন পূর্ণভাবে কায়েমী করতে চাইলো? কিন্তু সে যে সম্ভব নয়, তা কি জানে না? সোমরু সাহেব যাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়, তার যেটুকু উপস্থিতি সে তো মুন্নার জন্যেই সম্ভব হয়েছে, সে সব তো বাহাবেগমের অবিদিত নয়! তবে কী স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্যে বাহাবেগম এই কাজে উৎসাহিত হল। তবে কি মুন্নার সৌভাগ্যে বাহাবেগম ঈর্ষান্বিতা? কিন্তু ঈর্ষা প্রকাশ করে লাভ কি? যে ঈর্ষার মাঝে শুধু হানাহানিই হতে

পারে, নসীবের বিচার কেউ খণ্ডাতে পারে না, সে রক্তক্ষয়ে লাভ কি? তবু বোধ হয় লাভ বঞ্চিত করা। সেই বঞ্চনার মধ্যে এই তৃপ্তি, নিজের সৌভাগ্য না থাকলেও পরের সৌভাগ্য হরণ করা।

মুন্না সেই অপরাধিনী বাঁদীকে কোন শাস্তি প্রয়োগ না করে শুধু হুকুম দিল কয়েদ কক্ষে ধরে রাখার জন্যে। সোমরু সাহেব এসে যা বিচার করার হয় করবে।

সে এই বলে নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এল বাহাবেগমের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্যে। বাহাবেগমের মনোভিপ্রায় জেনে তারপর যা কর্তব্য সে সম্পন্ন করবে। আগে বাহাবেগমের মতলব জানা দরকার।

বাহাবেগমের মর্যাদার জন্যে সে অনেক করেছিল। একটি রমণী আর একটি সমপর্যায়ের রমণীর জন্যে এতখানি করে না। সে অদ্ভুত উদার মনের পরিচয় দেয়। নিজের খাস কক্ষের মত আর একটি কক্ষ বাহাবেগমের জন্য নির্বাচিত করেছিল। দিয়েছিল নিজের কক্ষের মত মূল্যবান সব আসবাব। এমনি কি তার পোষাকের মত পোষাকও দিয়েছিল শুধু দিতে পারে নি একটি জিনিস, সে হল সোমরুকে সোহাগ। সোমরুকে কিছুতে রাজী করাতে পারে নি, তার মত বাহাবেগমকে সোহাগ দান করতে। ঐটুকু ছাড়া মুন্নার ক্ষমতায় যা ছিল তা সে নিবেদন করেছিল। তবে কি সোমরুর ঐ অবহেলার জন্যেই বাহাবেগম ক্ষিপ্ত?

মুন্না বাহাবেগমের কক্ষে প্রবেশ করলে বাহাবেগম অদ্ভুতভাবে তাকে আহ্বান জানালো,—আইয়ে, আইয়ে বিবিসাহেবা! ক্যায়া খবর—সব আচ্ছা হ্যায় তো! কেমন যেন ব্যঙ্গ, কেমন যেন তাচ্ছিল্য। যেন বহুদিন পর দেখা, এমনিভাবে আলাপন শুরু করলো।

মুন্না বাহাবেমের কথার কোন উত্তর না দিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো,—আপনি নিশ্চয় জানেম বেগমসাহেবা, আপনার খাস পরিচারিকা ধরা পড়েছে।

বাহাবেগম তাতেও কোনরকম উৎসাহ দেখালো না। শুধু হেসে বললো,—বাঁদীর অভাব কি সরদানার প্রাসাদে? একটা গেছে নতুন একটির নোকরী কায়েমী হল। এই বলে নিজের কথাতেই নিজেই হাসলো।

মুন্না আবার বললো,—তার অপরাধ কি জানেন বেগমসাহেবা? সে আমার শরবতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, আর তার সেই অপরাধের জন্যে এক নিরপরাধিনী বাঁদী জীবন দিয়েছে।

এর উত্তরে বাহাবেগম হেসে বললো,- হ্যাঁ, ব্যাপারটা খুবই কৌতুকপ্রদ। কে একজন যেন এসে আমাকে সেই বাঁদীর লোভের কথা বললো। সেই থেকে হেসে বাঁচি না। বেশ হয়েছে, যেমন কর্ম, তেমনি ফল। বেগমের শরবত পানের লোভ চিরতরে শেষ হয়ে গেল।

মুন্না মনে মনে নিজেকে আরো তৈরী করতে লাগলো, একে সোজাসুজি আক্রমণ করতে হবে, এ ছাড়া একে ধরা মুশকিল তাই একটু রূঢ়স্বরে বললো,—আমাকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন কেন বেগমসাহেবা?

বাহাবেগম ক্ষণিক মুহূর্ত বিচলিত হল। মুখের রেখা পরিবর্তিত হলেও আবার ঠিক হয়ে গেল। নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো,—তার কোন প্রমাণ আছে?

প্রমাণ আপনার খাস বাঁদী।

সে কি কোন কবুল করেছে?

আমি অত ছোট নয়, তাকে সবার সামনে জিজ্ঞেস করে আপনার অসম্মান করবো!

তাহলে?

আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চান।

লাভ!

তা জানি না। তবে অনুমান, সাহেবের সৌহার্দ্য আমি পেয়েছি, আপনি পান নি এই আক্রোশে।

বাহাবেগম চুপ করে থেকে বললো,—তাই যদি বুঝে থাক তাহলে ঠিকই বুঝেছ। এর পর আমার আর কিছু বলবার নেই।

মুন্না হঠাৎ ভেঙ্গে পড়লো—কিন্তু কেন আমাকে আপনি হত্যা করতে চান? আমি আপনার কি করেছি! আমার ক্ষমতা যেটুকু ছিল, সেটুকু কি আমি আপনাকে দিই নি? সম্মান মর্যাদা, ক্ষমতা, সবই তো দিয়েছি। শুধু সাহেব যদি তার পেয়ার না দেয়, তাহলে কি তার জন্যে আমি দোষী হব?

বাহাবেগম মুন্নার কাতরতায় বিচলিত না হয়ে বললো,—দ্বন্দ্ব সেইজন্যেই। তোমাকে আমি সরাতে চাই নি। চেয়েছে আমার বিদ্রোহী মন। অসম্মানের জীবন নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেওয়া ভাল। তোমার ওপর আক্রোশ আমার কিছু নেই। সাহেবকে শাস্তি দেবার জন্যেই তোমাকে সরাতে চেয়েছিলাম। সাহেব আমাকে উপেক্ষা করেছে কিন্তু তোমার কাছ থেকে পেয়েছে আনন্দ। প্রতিশোধ তো এমনিভাবেই নিতে হয়।

মুন্না আর কি আর বলবে, শুধু অবাক হয়ে বাহাবেগমের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি যদি এখান থেকে চলে যাই তাতে কি কোন সুরাহা হবে?

বাহাবেগম শুধু ম্লান হাসলো, বললো—না। তোমাকে যেতে হবে না। যে হত্যা একবার বিফল হয়েছে তা আর দ্বিতীয়বার সম্ভব নয়। বুঝছি, তোমার মৃত্যু স্বয়ং খোদার অভিপ্রেত নয়। সুতরাং আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

কেমন যেন চাবুকের আঘাত খেয়ে টলতে টলতে নিজের কক্ষে চলে এল মুন্না, তারপর পরিচারিকাকে ডেকে বললো,—বেগমসাহেবার খাস বাঁদীকে কারামুক্ত করে দাও।

তারপর আর তার কিছু মনে নেই। জ্ঞানের মধ্যেই সে বিচরণ করেছিল কিন্তু কেমন যেন বিবশ অবস্থায়। সরাব পানের পর যে বেঘোর অবস্থা উপস্থিত হয়, অবশ্য সেই বেঘোরে সুন্দর সুন্দর বেহেস্তের দৃশ্য চোখের ওপর ভাসে কিন্তু মুন্না দেখতে লাগলো সব কুৎসিত দৃশ্য। কালো আলখাল্লা দিয়ে আপাদমস্তক ঢেকে কতকগুলি

বীভৎস দর্শন প্রেতলোকের মানুষ মুন্নাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো।

মুন্না নিথর দুই চোখে রাজ্যের আতঙ্ক নিয়ে নিঃসাড় হয়ে শয্যায় পড়ে থাকলো। মাঝে মাঝে তার শুধু মুখ দিয়ে কাতর দুটি স্বর বেরোলো,—মা, মাগো। একি বিড়ম্বনায় আমার সমস্ত জীবন ছেয়ে গেল? এ থেকে কি পরিত্রাণ পাবো না?

তারপর একসময় দুঃস্বপ্নের রাত্রি শেষ হল, সে মনস্থ করলো, সে এখান থেকে চলে গিয়ে বাদশাহের প্রাসাদে আশ্রয় নেবে। অন্তত সোমরু না ফেরা পর্যন্ত সে সেখানেই থাকবে। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে বাদশাহকে সব কথা বলবে। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় বাদশাহকে একমাত্র শুভানুধ্যায়ী বলে মনে হল। এমন কি সোমরুর চেয়ে তিনি আপন। হোক রাজনৈতিক কারণের জন্যে তাদের এই সম্বন্ধ, তবু যেন কোথায় আন্তরিকতা আছে।

মুন্না অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসানের জন্য একদিন সরদানা ত্যাগ করলো।

বাদশাহ তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন সুতরাং দিল্লীর প্রাসাদে প্রবেশ করতে কোন সঙ্কোচ নেই। একদিন দিল্লীর বাদশাহের কথা মনে এলে কেমন হৃৎকম্প উপস্থিত হত, আজ তিনি অনেক কাছের মানুষ। সেই ঐশ্বর্যমণ্ডিত সর্বোচ্চ সিংহাসনেই তিনি বসে আছেন, শুধু মুন্নাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। মুন্নাকে দিয়েছেন জগতের সেরা সুন্দরীর ইজ্জত। জেব-অল-নিসা। দিয়েছেন প্রিয় দুহিতার সম্মান।

মুন্না তাতেই কেমন যেন বিগলিত হয়ে গেছে। যেখানেই যত আঘাত পাক তার মনের একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল, বাদশাহের স্নেহক্রোড তার সব সান্ত্বনা আশ্রয়। মাঝে মাঝে বাদশাহ কেমন যেন প্রলাপ বকেন। কেমন যেন কবি হয়ে যান। মুখ দিয়ে সরাব পানের পর বেহুঁশী প্রলাপের মত মিঠা মিঠা বাত তিনি সুর করে বলেন। মুন্না বুঝতে পারে না সে সব কথার অর্থ। ভাবে, বুঝি বাদশাহ নিজের দুরবস্থাকে ঢাকবার জন্যে অমনি করেন। সিংহাসনে বসে তিনি একদিনও শান্তি পান নি। শুধু চক্রান্ত, লুণ্ঠন, হানাহানি যুদ্ধ নিয়েই তাকে থাকতে হয়। সিংহাসন রক্ষার জন্যে নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যেই তাঁর সব সময় চলে যায়। তবু রক্ষা হয় না পূর্বপুরুষের সিংহাসন। রাখতে পারেন না জীবনকে বাঁচিয়ে। প্রাণের সেই বিশ্রী অবস্থার মুহূর্তে থেকেই তাঁকে দিন গুজরান করে যেতে হয়। অথচ মুন্না অতো কাছের মানুষ হয়েও কখনও তিনি তার মনের কথা বলেন না। কেন বলেন না, মুন্না জানে না। বোধহয় সেখানেও তাঁর সিংহাসনের ইজ্জত তাঁকে নিচে নামতে দেয় না। সেখানেও তাঁকে পূর্বপুরুষের সম্মান বাঁচিয়ে রেখে চলতে হয়। অথচ মুন্নার মনে হয়, তিনি যেন বলবার জন্যে আগ্রহান্বিত। মনের বেদনা কাউকে প্রকাশ করলে যে মনের গুরুভার কমে যায়, সেই কথা ভেবে তিনি বার বার বলবার জন্যে আনমনা হয়ে যান। কিন্তু তাঁর দুর্বহ রাজপরিচ্ছদ, মস্তকের মুকুট, সিংহাসনের উচ্চতা আর সর্বোপরি মোগল বংশের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে গিয়ে তাঁকে নিরুত্তর থাকতে হয়।

সেইজন্যেই মুন্নার বড় ভাল লাগে বাদশাহকে। দীনের যে সম্মান আছে, তারও যে নিচে নামতে গেলে ভাবা উচিত—এই তুলনাই বাদশাহের পক্ষে প্রযোজ্য।

মুন্নার নিজের স্বভাবের মিল কোথায় যেন বাদশাহের সঙ্গে দেখতে পায়।

সে যখন গিয়ে পৌছলো, তখন বাদশাহ তাঁর খাসকক্ষে বসে কার যেন কণ্ঠের গীত শুনছিলেন। কক্ষের বাইরে থেকে সেই গীত সুধার সুর মুন্নার কানে বড় মিষ্টি লাগলো। দরবারী সুরে এক খোয়াবের গীত প্রচারিত হচ্ছিল। যে রমণী সেই গান গাইছিল সে যে সামান্য নয়, তার কণ্ঠই প্রমাণ। কণ্ঠ থেকে যেন সেতারের এক কাতরতা ইনিয়ে বিনিয়ে প্রাণের কোমল তন্ত্রে গিয়ে ধক্কা মারছে। কান্নার পূর্বে যেমন বক্ষের উদ্বেলতা অস্থির করে দেয়, তেমনি অস্থিরতা মুন্নার হৃদয়ে জেগে উঠলো। তারও মন আজ বিক্ষিপ্ত, সেই বিক্ষিপ্ত মনের কোথায় যেন এই সুর মিতালী করে তাকে ভেঙে দিতে চাইলো। বোধ হয় তার দু'চোখে শ্রাবণের ধারাও নামলো।

এমনি সময়ে গান থেমে গেল। গান থেমে যেতে মুন্না সচকিত হল। প্রহরী এসে জানালো, বাদশাহ দেখা করবার হুকুম দিয়েছেন। মুন্না রক্ষীকে বাদশাহের কাছে সংবাদ প্রেরণ করে দাঁড়িয়ে ছিল। তাই হুকুম আসতে সে আর কালবিলম্ব করলো না। চোখের জল ওড়নায় মুছে এগিয়ে গেল।

বাদশাহ মুন্নাকে সম্ভাষণ জানালেন। কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। হঠাৎ কেন আগমন—ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে তবে তার নিজের কথা শেষ করলেন।

পিতার কাছে যেমন কন্যা তার মনের সব বেদনা উজাড় করে বলে যায়, তেমনিভাবে মুন্না কিছুই গোপন করলো না, সরদানায় গমনের পর থেকে যা যা ঘটেছিল সব বলে গেল। এমন কি সোমরুর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে যা কিছু উপলব্ধি করেছিল, তাও পেশ করলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—পিতা আপনি কি এসব কিছুই জানতেন না?

বাদশাহ শাহ আলম শেষ কথার উত্তর না দিয়ে মুন্নাকে সান্ত্বনা জানিয়ে বললেন—বেটি উত্তেজিত হও না। সাহস ও শক্তিকে বৃদ্ধি কর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি তোমার ওপর অনেক আশা পোষণ করি। তুমি যদি এমনি সামান্য কারণে ভেঙে পড়, তাহলে আমার সব আশা ভরসা শেষ হয়ে যাবে। এখানে এসেছ, ভালই করেছ, কিছুদিন এখানে আরামে বিশ্রাম কর। তারপর মন সুস্থির হলে সরদানায় ফিরে যেও। অবশ্য এর মধ্যে রীনহার্ড এখানে এসে পড়বে। সে এখন পানিপথে শিখ দমনে গিয়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে তাকে খুব শীঘ্র এখানে ফিরে আসতে হবে। জাঠদের দীগ দুর্গ আক্রমণ করতে হবে। সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নজফ খাঁ একা জাঠদের সঙ্গে পেরে উঠবেন না। তাছাড়া রীনহার্ড বহুদিন ধরে জাঠদের সংশ্রবে কাটিয়েছে, সে জানে তাদের রণনীতি। সেই পারবে জাঠদের ঘায়েল করতে। সেই সময় রীনহার্ড ফিরে এলে তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে। আমিও থাকবো, তাকে বুঝিয়ে একটা কিছু ব্যবস্থা করবো'খন।

তারপর বাদশাহ শাহ আলম বললেন,—একটা কথা তোমাকে বলে রাখি বেটি, রীনহার্ড ভাল যোদ্ধা ছাড়া আর কিছু নয়। সে বিদেশী, এদেশে এসেছে নিজের

ভাগ্যপরিবর্তন করতে। তুমি নিশ্চয় তার অতীত ইতিহাস শুনেছ। তার মত নৃশংস প্রকৃতির লোক আর দেখা যায় না। তবু তাকে আমাদের মেনে নিতে হয়েছে এইজন্যে যে তার একটি গুণ সমস্ত নির্গুণকে কবরিত করেছে। আমি স্বীকার করেছি; তাকে আমার রাজ্যরক্ষার প্রয়োজনে। তুমি শাদী করেছ, একটি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষকে তোমার রমণী কোমলতা দিয়ে বশ করে কিন্তু তার চেয়েও প্রয়োজন তোমার নিজের প্রতিষ্ঠা। রীনহার্ড ভাগ্যবান পুরুষ, একথা ভো তুমি অস্বীকার করতে পার না! সেই ভাগ্যবানের সঙ্গিনী হলে তোমারও ভাগ্য তার সঙ্গে পরির্তিত হবে। সামান্য একঠি রমণী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে যদি জগতে সুনাম রেখে যাও তার চেষ্টা করবে না?

মুন্না বিস্মিত হয়ে বললো—আমাকে দিয়ে আপনি কি অসাধ্য সাধন করতে চান বাদশাহ?

বাদশাহ মৃদু হেসে হাত তুলে বললেন,—ধীরে বেটি ধীরে। অতো উতলা হও না। মানুষের জীবনের উন্নতি যেমনি একদিনে হয় না, তেমনি তোমার কথা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না। তুমি এখন বিশ্রাম নিতে যাও বেটি।

মুন্না নিঃশব্দে বেরিয়ে এল বাদশাহের কক্ষ থেকে। এসেছিল সান্ত্বনা আহরণ করতে কিন্তু বাদশাহ আবার তাকে আর এক চিন্তায় ফেলে দিলেন। সে জগতে সুনাম অর্জন করবে। কেমন যেন কৌতুকের মত মনে হয়। এক অন্দরমহলের রমণী সে হবে বাইরের লোকের আদরিণী। কিন্তু অবিশ্বাসও করা যায় না। এই বাদশাহ-ই একদিন তাকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করেছেন। অসিচালনা শিখিয়েছেন। সেদিনও সে বিস্মিত হয়েছিল। আজও হল। বাদশাহের মনের মধ্যে তাকে কেন্দ্র করে যেন কি খেলা করছে? তিনি সবই জানেন, শুধু গোপন করে কৌতূহল চরিতার্থ করেন। কেন করেন মুন্না জানে না সেই রহস্য। সেই রহস্যে বাদশাহকে কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। কেমন যেন তাকে চেনা যায় না। অথচ অন্য সব ক্ষেত্রে বাদশাহকে মুন্নার ভালই লাগে। কত আপন মনে হয়। যে কথা কাউকে বলা যায় না, বাদশাহকে বলতে সঙ্কোচ উপস্থিত হয় না।

মুন্না আর এক চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করে কেমন যেন সমস্ত চিন্তার উর্ধ্বে উঠে বাদশাহেরই কথার প্রতিধ্বনি করলো। তাকে জগতে সুনাম অর্জন করতে হবে। পুরুষের মত শৌর্যবীর্যের অধীশ্বরী হয়ে নতুন এক শক্তিময়ী হতে হবে। তুচ্ছ ভেবে, ভালবাসার কোমল তন্ত্রে ঘোরাফেরা করে সে জীবনের বিরাট উদ্দেশ্যকে নষ্ট করবে না। কি যে সে উদ্দেশ্য, সে জানে না। বাদশাহ শাহ আলমকে সে বিশ্বাস করে। সেই বিশ্বাসেই সে আপন বিশ্বাস সৃষ্টি করবে। রমণীর কোমল অনুভূতিগুলি ত্যাগ করে সে দৃঢ় হবে। প্রাসাদের মর্মরগাত্রের মত দৃঢ়। দৃঢ় হয়ে মাথা উঁচু করে সূর্যের দিকে নিষ্পলক চোখ তাকিয়ে থাকবে। ঐ সূর্যের দীপ্তির মতই তার জীবনের দীপ্তশিখা জগতে আচ্ছাদিত করবে।

সে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অতীতের সব কথা সে বিস্মৃত হল।

এমন কি বাহাবেগমের হত্যার ষড়যন্ত্র পর্যন্ত তার মন থেকে মুছে গেল। সে কেমন যেন সহজ মনে সহাস্যবদনে বাদশাহী অন্তঃপুরে গিয়ে প্রবেশ করলো।

আরো কিছুকাল জগৎ থেকে বিদায় নিল।

এর মধ্যে অনেক কিছু পরিবর্তন সাধিত হল। সোমরু ও মুন্না আবার সরদানায় ফিরে গেছে। বাহাবেগম আবার শাস্তি পেয়েছে। এবার সে উন্মাদের অভিনয় করলো না। সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেল। মুন্নার আর তার জন্যে কোন কাতরতা নেই। এখন সেও পালটে গেছে। আর তার কারও ওপর সহানুভূতি নেই? সে কঠিন, অত্যাচারী। কারও অপরাধ সহজে ক্ষমা করে না।

সোমরুকে আবার বাদশাহ পুরস্কৃত করেছেন। জাঠরা চিরতরে দীগদুর্গে ঘুমিয়ে গেছে। এবার শুধু সোমরু পুরস্কৃত হয় নি, মুন্নাও সোমরুর সঙ্গে পুরস্কৃত হয়েছে। মুন্নার বিজয়ে দিল্লীবাসীর জয়ধ্বনি আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছে। বাদশাহের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া সার্থক হয়েছে।

সোমরু যখন পানিপথ থেকে ফিরে এসে দিল্লীর প্রাসাদে উপস্থিত হল। বাদশাহ কোন ভূমিকা না করেই একরকম আদেশের ভঙ্গিতে মুন্নাকে সঙ্গে নিতে বললেন। শুনে মুন্না বিস্মিত। শুধু বিস্মিত নয় স্তম্ভিত।

মুন্নাও বাদশাহের অভিপ্রায়ে চমকিত হল। সে বুঝতে পারলো না কেন বাদশাহ তাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছেন?

সোমরু বললো,—বাদশাহ, এ কি আদেশ দিচ্ছেন, অক্ষম রমণীকে যুদ্ধে নিয়ে গিয়ে শেষকালে বিপদের সম্মুখীন হব?

বাদশাহ নির্লিপ্তভঙ্গিতে মৃদু হেসে বললেন—মিঃ রীনহার্ড, আমি যাকে বেটির সম্মান দিয়েছি, সে বাদশাহের মতই সাহসী। সে আপনার সঙ্গে গিয়ে বিপদ করবে না, বরং আমার বিশ্বাস, সে আপনার সাহায্যে লাগবে।

সোমরু তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বললো,—কিন্তু সে কি করে সম্ভব? যুদ্ধে বিনা অস্ত্রে সাহায্য করা মানে মৃত্যুকেই ডেকে আনা নয় কি?

বাদশাহ মৃদুস্বরে বললেন,—বিনা অস্ত্রে কেন আমার বেটি যাবে? অস্ত্র নিয়েই যাবে। আর সে অস্ত্রের দ্বারা যে কোন যোদ্ধাকে ঘায়েল করতে পারবে। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করে দেখো।

সোমরু বাদশাহের কথা শুনে আরো আশ্চর্য হয়ে মুন্নার দিকে তাকালো। মুন্না লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলো।

সোমরু বাদশাহের সম্মুখেই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো,—হুজুরের কথা আমি অবিশ্বাস করি না। তবু তোমায় জিজ্ঞেস করছি, তুমি তরবারী চালাতে অভ্যস্ত?

মুন্না মৃদু হেসে সোমরুর কথায় মাথা নাড়ালো।

আর সোমরু কেমন মনে মনে গর্বিত হল। বীরের স্ত্রীই বটে। একদিন যেমনি তার নাচ দেখে সে তাকে জয় করবার জন্যে আগ্রহী হয়েছিল, আজ তার সামরিক যোগ্যতা আছে শুনে আনন্দিত হল। তবু সে বাদশাহের কাছে শেষ অনুযোগ পেশ করলো,—হুজুর, কি দরকার এই ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে। সেনাধ্যক্ষ মীর্জাসাহেব ও আমি ঠিক জাঠদের পরাজিত করতে পারবো।

বাদশাহ বললেন,—সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। তবু আমার বেটির পরীক্ষা হবে এই যুদ্ধে যোগদান করে।

কথা বাড়ানো আর শোভা পায় না। বাদশাহের হুকুম, হুকুমই। সূর্য অস্ত গেছে বলে এখনও তার দীপ্তি থাকবে না, এ কেমন করে হয়? সোমরু তাই একান্ত অনিচ্ছার মধ্যেও স্ত্রীকে নিয়ে যেতে বাধ্য হল। রণস্থলে রমণীর ভূমিকা যে কিরকম ভীষণ, সেই কথা ভেবে রণবিজয়ী বীর সোমরু ভীত হল। তবু মনে মনে একধরনের পুলক অনুভব করলো এই ভেবে যে, মুন্না একেবারে বুদ্ধিহীনা নয়, তার ওপর বিশ্বাস তার অপরিসীম। সুতরাং সে যদি অস্ত্র ধরতে সক্ষম হয়, তাহলে রণস্থলে আত্মরক্ষা করতেও সমর্থ হবে।

যাহোক সংখ্যাতীত সৈন্য নিয়ে মোগল সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নজফ খাঁ যাত্রা করলেন। সোমরু তার সুশিক্ষিত দেশী ও ইউরোপীয় সৈন্য নিয়ে মোগল সৈন্যের অগ্রে এগিয়ে চললো। পাশে উপযুক্ত ভার্যা, মিসেস ওয়ালটার রীনহার্ড ওরফে বেগম সোমরু। যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সঙ্গে অনেক। পদাতিক, অশ্বারোহী সৈন্য ভাগ করা। কামানের গাড়িগুলি প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটে চলেছে। লক্ষ্য জাঠদের দীগদুর্গ।

মুন্না অশ্বে চড়ে স্বামীর পাশে। মুন্নার আর এখন অন্তঃপুরের বেশ নয়, যোদ্ধার পোষাক। পুরুষের মত যোদ্ধার পোষাক। কোষবদ্ধে তরবারী, বক্ষে লৌহবর্ম, মস্তকে শিরস্ত্রাণ শুধু মুখের ওপর একটি জালির আবরণ। রমণীর সম্ভ্রম সে সেই আবরণ দিয়ে রক্ষা করেছে।

সোমরু জানতো না মুন্না অশ্বেও উঠতে পারে কিন্তু যখন অশ্বে সওয়ার হয়ে স্বামীর অশ্বের পাশে বীরাঙ্গনার মত নিজেকে উপস্থিত করলো, সোমরু আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। মুন্নাকে সে নাচের আসর থেকে লাভ করে নর্তকীই মনে করেছিল, আর মনে করেছিল মুন্না একটি খুবসুরত আওরত। তাকে ভালবাসা যায়। সোহাগ দেওয়া যায়। পুরুষের জীবনের আকাঙ্ক্ষা মেটানো যায় কিন্তু আজ মুন্নার আর এক অভিনব মূর্তি দেখে চমকিত হয়ে গেল কিন্তু চমকিত হলেও এখন সে খুশি হল, যা সে জীবনে হয় নি। কে না খুশি হয়, যার স্ত্রী এমনি বীরত্বব্যঞ্জক ভূমিকা দেখে!

এদিকে একটি রমণীকে যুদ্ধে এগিয়ে যেতে দেখে, আর সে রমণী অন্য কেউ নয় বেগম সোমরু; সুতরাং অগণিত সৈন্যবাহিনী উল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো। মুন্নার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চললো।

দীগ দুর্গ বাহিনীর লক্ষ্য।

সেনাধ্যক্ষ মীর্জা নজফ খাঁর অধীনে বিপুল মোগল সৈন্য। আর অসংখ্য রণে বিজয়ী মেজর সোমরুর শিক্ষিত দেশী ও ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী। যার কথা শুনে শত্রু এমনিই পালিয়ে যায়। এমনি তার রণকৌশল, এমনি তার সৈন্য পরিচালনা।

এখানেও তাই হল।

জাঠদের সঙ্গে বহুদিন বাস করে সোমরু জানতো তাদের রণকৌশল, সুতরাং জয় করতে বেশী অসুবিধায় পড়তে হল না। খুব অনায়াসেই দীগ দুর্গ বিজয় হয়ে গেল। জাঠদের রাজত্ব করার আশা চিরতরে শেষ হয়ে গেল।

মুন্না যুদ্ধের মধ্যে নিজের ভূমিকা নিয়ে দেখলো সমস্ত যুদ্ধটি! রণকোলাহলের মধ্যে যেন নিজেকে সে খুঁজে পেল। নিজের সত্তাটি মৃত্যুর ভয়াবহতায় উল্লাসের মধ্যে অনুভব করলো। মানুষের আর্তনাদ, কামানের শব্দ, অসির ঝনঝনানির মধ্যে কেমন যেন শক্তির পরীক্ষা। একটু অসাবধান হলেই প্রাণ সংশয়। অথচ প্রত্যেকে প্রাণরক্ষা করে শত্রুকে নিধন করবার জন্যে কিরকম আকুলি-বিকুলি করছে। দূর থেকে যুদ্ধের কথা শোনা এক জিনিস। আর যুদ্ধের মধ্যে উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে এক অনুভূতি। সে অনুভূতি কেউ যুদ্ধক্ষেত্রে না গেলে অনুভব করতে পারে না।

তাই মুন্না যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে কেমন যেন শক্তিময়ী হয়ে উঠলো। তার বাহুবলে অস্বাভাবিক এক শক্তি এল। সে শক্তমুঠিতে অসি ধরে রণহুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বন্দুক গর্জে উঠলো। একা নিজেই কেমন যেন উন্মত্ত হয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আঘাত পেল বটে কিন্তু আঘাত করতেও সে ছাড়লো না। এমন কি সোমরুর কোন সাহায্য না নিয়েই সে নিজের ভূমিকা গ্রহণ করলো। সোমরুসাহেবও তখন ব্যস্ত। যুদ্ধজয়ের জন্যে সৈন্য পরিচালনা করছে। এই রণক্ষেত্রে পরস্পরের আত্মরক্ষা ছাড়া কেউ কাউকে দেখতে পারে না। সুতরাং মুন্না একাই নিজের ক্ষমতায় অধীশ্বরী হয়ে সৈন্যদের মধ্যে মিশে গেল।

প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। তাই অনভিজ্ঞতাই বেশী। তাই বার বার বিপদগ্রস্ত হয়েও নিজেকে অদ্ভুত কৌশলে বিপদমুক্ত করলো।

আর সৈন্যরাও কেমন যেন প্রেরণা পেয়ে এগিয়ে চললো উল্লাসে। মুন্নার জয়-ধ্বনিতে রণক্ষেত্র মুখর করে সোমরুর শিক্ষিত সৈন্যরা উন্মত্ত হয়ে উঠলো। সে এক সাংঘাতিক যুদ্ধ। এক পক্ষ আত্মপক্ষ সমর্থনে বলশালী। আর একপক্ষ আত্মরক্ষা করার জন্যে মরিয়া।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ইতিহাসবিখ্যাত সেই দীগদুর্গ মোগলদের অধিকারভুক্ত হল। রণক্ষেত্র শান্ত হয়ে এল। সৈনিকরা ক্লান্ত অবসন্ন দেহে মাটির ওপর বসে পড়লো কিন্তু মুন্নার কোন ক্লান্তি নেই। সে যেন কি একটি অসাধ্য সাধন করেছে এমনিভাবে বীরের মত দীগ দুর্গের উঁচু প্রাচীরের ওপর অশ্বারূঢ় হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মীর্জা নজফ খাঁ ও সোমরু এসে তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করলো। মুন্নার জন্যেই যে আজ যুদ্ধ জয় এত সহজে সাধিত হল, সে কথা আর গোপন থাকলো না।

সুতরাং কৃতিত্ব সবটুকু মুন্নার পাওয়া।

আবার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে সৈনিকরা মুন্নার জয়ধ্বনি করে উঠলো। সোমরুর বুকটি গর্বে ফুলে উঠলো। এতদিন সে অনেক যুদ্ধ জয় করেছে, অনেক পুরস্কার লাভ করেছে কিন্তু এত উল্লাস অনুভব করে নি। আজ সে উপযুক্ত এক রমণীর স্বামী হয়ে যেন ঈশ্বরকেই বার বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলো।

তারপর বিজয়ী ফৌজ দিল্লীতে ফিরে চললো।

বাদশাহ শাহ আলম আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন, তাই আযোজনের ত্রুটি করলেন না। বিজয়ী সৈনিকদের উপযুক্ত মর্যাদাদানের জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। বিশেষ করে মুন্নার স্বীকৃতিতে তারই আনন্দ বেশী। তিনিই একদিন এই মেয়েটিকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে ভবিষ্যতের এক চিত্র প্রত্যক্ষ করেছিলেন। আজ তা কার্যে পরিণত হতে সাফল্যলাভের আনন্দে চঞ্চল হযে উঠলেন। তিনি মুন্নাকে বিশেষ পুরস্কারে উৎসাহিত করবার জন্যে নিজের বাদশাহী মনের পরিচয দিলেন।

যাহোক একদিন বিজয়ী ফৌজ ফিরে এল।

প্রাসাদের তোরণে তোরণে বিশেষ বাদ্য বেজে উঠলো। বিজযী ফৌজের সম্মানে বহু কবুতরকে আকাশে উড্ডীন করা হল। তোপধ্বনি হল। রঙবেরঙের বস্ত্রখণ্ডে সাজানো হল প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ। ফুলে ফুলে চারিদিকে ভরিযে দেওয়া হল। গোলাপের স্তবক রক্ষিত হল স্বর্ণনির্মিত ফুলদানিতে। বেলা, জুঁই চামেলী, গন্ধরাজের সৌরভে চারিদিকে মাতোযারা হল। আতরের সুবাসে হল চারিদিকে মধুময।

বাদশাহ শাহ আলম বিজযী বীরদের অনেককেই পুরস্কৃত করলেন। মীর্জা নজফ খাঁ, কতলু খাঁ, হরবন সিং প্রভৃতি সেনাধ্যক্ষ পেল মোগল কর্মচারীর সম্মান। তাদের মূল্যবান পরিচ্ছদ, উপযুক্ত খেলাত, বহুমূল্য রত্ন উপহার দিযে সোমরুকে দিলেন আরো কয়েকটি জায়গীর। যায় আয় আরো একলক্ষ টাকা।

সবাইকে পুরস্কার বিতরণ করে বাদশাহ চিকের আড়ালে মুন্নার দিকে তাকালেন। তারপর মুন্নাকে উদ্দেশ্য করে সুমিষ্টস্বরে বললেন,—বেটি, তোমার কোন পুরস্কার তো আমি ভাবতে পারি নি। তুমি যে অসাধ্য সাধন করেছ, রমণীর ইতিহাসে তা খুবই স্বল্প। তুমি যা চাইবে তাই আমি দিতে প্রস্তুত।

চিকের আড়ালের মানুষটি কেমন যেন খুশিতে দুলে উঠলো। তার ইচ্ছে করলো অনেক কথা বলে কিন্তু এ বাদশাহের খাস কামরা নয, উন্মুক্ত দরবার। এখানে ভাবাবেগ প্রকাশ করা যায না, নিযম রক্ষা করে চলতে হয। তাই স্মিতহাস্যে বললো—আপনার আশীর্বাদ ছাড়া আর আমার কিছু প্রাপ্য নেই।

শুধু আশীর্বাদ! বাদশাহ দরবারে বসে কেমন যেন সন্দিগ্ধ হযে চিকের দিকে তাকালেন, তারপর মুন্নার প্রকৃতি স্মরণ হতে তিনি আবার স্তব্ধ হলেন। দরবারে অগণিত অমাত্যদের দিকে তাকিযে বললেন,—আপনারাই নির্বাচন করুন, এই বীরাঙ্গনার উপযুক্ত পুরস্কার। তারপর হেসে বললেন,—আমি ভেবে পাচ্ছি না, কি এমন পুরস্কার দিলে এই বীরত্বের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। পৃথিবীতে খুব কমই

এমনি সাক্ষ্য আছে, যা এই রমণীর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এমন কি আমি যদ্দুর জানি, এই মোগলদেরই কোন অন্তঃপুরিকা সম্মুখ সমরে অগ্রসর হয় নি। শুধু সম্রাটশ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর মহিষী নূরজাহান ছাড়া। তবে তিনি ছিলেন রাজমহিষী। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তিনি সম্রাজ্ঞী হয়ে এই তখ্‌তে আরোহন করেছিলেন!

কিন্তু আমত্যরা কেউ উত্তর দিতে পারলেন না।

তখন বাদশাহ স্মিতহাস্যে বললেন,—আমি জানি, আপনারাও আমার মত অক্ষম। যাহোক আমি আমার বুদ্ধি অনুযায়ী তাকে পুরস্কৃত করছি, আপনারা আমার ত্রুটি দেখলে তা সংশোধন করে দেবেন, এই বলে তিনি এক রক্ষীকে পুরস্কারের দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে আসতে বললেন।

রক্ষী নিয়ে এল একটি স্বর্ণনির্মিত বৃহৎ থালায় করে মণিমুক্তা, হীরা জহরত চুনি পান্না। একখানি বৃহৎ তরবারী। কটি মূল্যবান পরিচ্ছদ ও একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব।

বাদশাহ বললেন,—এই পুরস্কার দিযে আমি তৃপ্ত নয়। আরো থাকলো এর সঙ্গে বাদশাহের সমস্ত দৌলত। আর জাঠদুর্গের লুণ্ঠিত দ্রব্য সামগ্রীর এক তৃতীয়াংশ।

দরবারের উপস্থিত অভ্যাগতেরা বাদশাহের মহানুভবতার জয়ধ্বনি করে উঠলো। সোমরু আর কি বলবে? নিজের স্ত্রীর গর্বে নিজেই পুলকিত। সে উপস্থিত অমাত্য-দের সঙ্গে স্ত্রীর বীরত্বে জয়ধ্বনি করে উঠলো।

তারপর তারা একদিন সরদানায় ফিরলো।

মুন্না আর আগের মত থাকলো না। কেমন যেন সে পুরুষের মতই শক্তিময়ী হয়ে উঠলো। স্বামীকে অবসর দিল। সোমরুও তাই চাইছিল। এতকাল রণক্ষেত্রে ছোটাছুটি করে সে ক্লান্ত। তার মনপ্রাণ বিশ্রাম চাইছিল। মুন্না তাকে বিশ্রাম দিল। সিংহাসনে বসে রাজ্যপরিচালনা করলো না বটে তবে চিকের আডাল থেকে রাজকার্য সবই করতে লাগলো। এখন আর তার রমণীর সহজাত আকাঙ্ক্ষার মত সোহাগের স্পৃহাই উদগ্র নয়, আরো অন্য কিছু করার জন্যে মন লালায়িত। অবশ্য স্বামীর প্রতি সে কর্তব্য করতে দ্বিধা করলো না। স্বামীর চাহিদা পূরণ করেই সে সরদানার একছত্র সম্রাজ্ঞী হযে উঠলো।

প্রাসাদের আমূল সংস্কারে মন দিল। উপযুক্ত কর্মচারী উপযুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করে রাজকর্মের সুশৃঙ্খলা আনয়ন করলো। সোমরু এসব কাজে অনভিজ্ঞ ছিল। সে রণ-স্থলে সৈন্যপরিচালনা করতেই অভ্যস্ত ছিল, রাজকার্যে নয়। তাই বেগম রাজকার্যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে সোমরুকে আর এক দুশ্চিন্তা থেকে অব্যাহতি দিল। সোমরুকে

এমনি বহু অসুবিধা থেকে মুন্না উদ্ধার করলো। মুন্না যেন একাই একসহস্র হয়ে সরদানার ভূখণ্ডে নিজের দীপশিখা প্রকাশ করলো।

অন্তঃপুর সংস্কারেও সে কোন দুর্বলতাকে প্রশয় দিল না। বাহাবেগম তাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। সেদিন বাহাবেগমের ভয়ে সে দিল্লীতে পালিয়ে গিয়েছিল। এখন বাহাবেগমের শাস্তি নির্দিষ্ট করলো, অবশ্য সে শাস্তি সোমরুর দ্বারাই প্রযোজ্য হল। বাহাবেগমের জন্যে মুন্না যে সব সম্মানের পরিচ্ছদ দিয়েছিল তা কেড়ে নেওয়া হল। বিশ্রাম কক্ষ পরিবর্তন করে সাধারণ রমণীর মত কক্ষ দেওয়া হল। পরিচারিকা তুলে নেওয়া হল। এতেই সম্মানিতা রমণীর সম্মান ক্ষুন্ন হল। বাহাবেগম প্রতিবাদ না করে কেমন যেন নীরবে সহ্য করলো। কিন্তু একদিন সংবাদ রটনা হল, বাহাবেগম সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেছে।

সোমরু শুনে মুন্নাকে বললো,—আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম, এসব আবর্জনা পরিত্যাগ করাই উচিত।

মুন্না সেদিনও সে কথার উত্তর দিল না।

শুধু সে আরো কঠিন হল। বাহাবেগমের জন্যে কোন অনুকম্পা প্রকাশ করলো না। সোমরুর প্রথমা স্ত্রী হিসাবে কোন সম্মান। শুধু শিশুপুত্রটিকে আগে যেমন ধাত্রীর অধীনে রাখা ছিল, তাই থাকলো, তার আরো যত্নের জন্যে আরো পরিকল্পনা গ্রহণ করলো! এ ছাড়া অন্তঃপুরে সোমরুর অতীত দুষ্কার্যের ফলস্বরূপ যে সব রমণীরা বাস করতো, তাদের একে একে অন্যত্র মাসোহারা ব্যবস্থা করে বিদায় দিল।

এই কাজটি করতে অবশ্য মুন্নাকে অনেক বেগ পেতে হল।

কেউ কেউ বেয়াডা ধরনের। তাদের বোঝাতে পারলো না। তাদের অভিসম্পাত গ্রহণ করে সরদানার বাইরে পাঠিয়ে দিল। এমনিভাবে দিনের পর দিন একটি একটি বা দু তিনটি করে রমণীদের সরিয়ে অন্তঃপুর ফাঁকা করে ফেললো। ওদের সরালো এই জন্যে যে, এরা থাকলে উপকারের চেয়ে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। মুন্নার নিত্যনতুন সৌভাগ্য প্রাপ্তিতে তারা ঈর্ষান্বিতা। অযথা অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত করে তারা মুন্নার সম্বন্ধে নানান কটূক্তি প্রকাশ করে। সেও না হয় সহ্য করা গেল কিন্তু অতীত যতই মুন্না বিস্মৃত হয়ে বর্তমানকে নিয়েই মেতে থাকবার চেষ্টা করে, ততই মনে করিয়ে দেয় ঐ অন্তঃপুরের রমণীরা। তারা যেন সোমরুর অতীতকে ধরে রাখবার জন্যে অন্তঃপুরের মধ্যে আয়াসের জীবন উপভোগ করছে। এই সব ভেবেই মুন্না অন্তঃপুর উজাড় করে তাদের বিতাড়িত করলো। যত সহজে কথাটা বলা যায়, তত সহজে যে তা সম্ভব হয় নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সরদানার সেদিনের প্রতিটি মুহূর্ত। এখানেও মুন্নাকে অনেক কৌশলের ভূমিকা নিতে হয়েছিল।

সোমরু যেন সত্যই বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে। বেগমের কোন কাজে তার অসমর্থন নেই।

মুন্না গিয়ে কোন হুকুম চাইলে সোমরু উত্তর দেয়,—আমার মতের কি প্রয়োজন, আমার চেয়ে কম কিছু বোঝ?

শুধু বাহাবেগমের সম্বন্ধে সোমরু একবার বলেছিল সকলকে যখন বিতাড়িত করলে, তখন ওটাকে কেন আর ধরে রাখলে ?

তার উত্তরে মুন্না বলেছিল, না, ওর সম্বন্ধে এত সহজে ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। ও যদি তোমার পুত্রের জননী না হত তাহলে হয়তো অন্যদের দলভুক্ত হত।

সোমরু ক্লান্তস্বরে বলেছিল,—কিন্তু ও তো অবৈধ সন্তান। জোর করে স্বীকৃতি দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।

মুন্নার তখন সেই সন্তানের জন্যেই মানসিক স্থৈর্য লুপ্ত হয়েছে। সে প্রায় একরকম ভেবে নিয়েছে তার কোন সন্তান হবে না। তাদের বিবাহের অল্পদিন গত হল না। এখনও যখন সে সম্ভাবনা নেই, তখন অদূর ভবিষ্যতে কোন সম্ভাবনা আছে তাও অনিশ্চিত। তাই এই সন্তানকেই স্বীকৃতি দেবার জন্যেই মুন্না বদ্ধপরিকর। যদি কোনদিন তার সন্তান আসে, তাহলে সে জাফরকে উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে তার সন্তানকে বঞ্চিত করবে। কেননা সোমরুর জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে জাফরের দাবিই অগ্রগণ্য। হোক্ তার গর্ভধারিণী সমাজ পরিত্যক্তা কিন্তু সোমরু তো অস্বীকার করে নি ! বাহাবেগমের ওপর কেমন যেন দুর্বলতা সঞ্চিত ছিল। সকলকে অস্বীকার করতে পারে, বাহারকে পারে না। কেন পারে না, তার অবশ্য কোন সঠিক কারণ নেই। হয়তো বাহারের অসামান্য রূপ, তার মর্যাদা, তার অধিকার মুন্নাকে দমিত করেছিল। সোমরুর খামখেয়ালীতার পরিচয় দিয়েছে বলে বাহার অবহেলিতা। না হলে প্রথমা স্ত্রী হিসাবে বাহারের দাবি সর্বাগ্রে। সেই ভেবেই বোধ হয় মুন্না অধিকার করতে পারে নি।

তারপর প্রথম থেকেই তার যেন কেমন মনে হয়েছিল, সে মা হতে পারবে না। এ অবশ্য অনুমান, কোন প্রত্যক্ষ কারণ নিহিত ছিল না। অবশ্য মনের মধ্যে ক্ষীণ একটি জিজ্ঞাসা ছিল। মা জেমিলিকে সে অবহেলা করেছে, মায়ের চোখের জলে তার ভবিষ্যৎ পথ পিচ্ছিল হওয়ার আশঙ্কা বিদ্যমান। এমন কি ' বলেছিলেন, 'তুই যদি কখনও মা হোস্, তাহলে বুঝবি আমার বেদনা।' সেই জন্যেই তার কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছে, সে মা হবে না। মায়ের বেদনা সে বুঝতে পারবে না। আর তার জন্যেই একমাত্র বংশধর জাফরের ওপর তার যত্নের মাত্রা বেড়ে গেছে।

সন্তানের কথা বললেই কেমন যেন আজকাল তার মনে আঘাত লাগে। কেমন যেন তার দৃষ্টি ম্লান হয়ে যায়। সমস্ত উৎসাহ হারিয়ে কেমন যেন নিজেকে সে অপরাধী মনে করে।

সোমরুর সেদিনের কথাতেও মুন্নার সেই অবস্থা হল। মুহূর্তে তার চোখদুটি নত হয়ে গেল। মুখখানি ম্লান হয়ে উঠলো। কে যেন মুহূর্তে তার মুখের রক্ত শুষে নিল। তারপর সে ভাব কাটিয়ে মৃদুস্বরে বললো—এ ছাড়া উপায়ই বা কি ? এ সব ধনদৌলত তোমার আমার অবর্তমানে কে ভোগ করবে ?

ইদানীং সোমরুও বুঝতে পারতো মুন্নার মনের বেদনা। সেও কেমন যেন অসহায় হয়ে যেত। সহজে উত্তর মুখে যোগাতো না। সেদিনও তাই হল। কিছুক্ষণ চুপ

করে থেকে বললো,—সময় তো এখনও চলে যায় নি। হয়তো পরে আসতে পারে।

না. আর কোনদিনও আসবে না। এই বলে কেমন যেন চোখে হাত চাপা দিয়ে মুন্না কেঁদে উঠলো।

সোমরু অবাক। বেগমের মনের তলে এত কান্না জমে উঠেছে, সে বুঝতে পারে নি। তাই সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষাও খুঁজে পেল না। বরং কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়ে থেকে ক্রন্দন মুখরিত মুন্নার দিকে চেয়ে বললো,—তুমি কি করে জানলে আর হবে না।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মুন্না বললো,—আমার বিশ্বাস। আমার মন বলছে, এ আশা দুরাশা।

এবার সোমরু হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে উঠলো, বললো—তুমি ছেলেমানুষ। ইউ আর এবসোলুটলি চাইল্ড। যুদ্ধক্ষেত্রে অসির ঝনঝনানিতে শত্রু বধ করতে পারো।

রাজকার্যের দুরূহ বিষয় নিয়ে কর্মচারীদের সঙ্গে তর্ক তুলতে পারো—আর এই ছোট্ট একটি কারণে এত উতলা হচ্ছ ?

সোমরুর অবজ্ঞায় মুন্নার অবজ্ঞায় মুন্নার চোখের জল অপসারিত হয়ে গেল। সে ক্ষিপ্ত হয়ে বললো,—তোমার কাছে এটা তুচ্ছ হতে পারে কিন্তু আমার কাছে নয়। রমণী না হলে রমণীর বেদনা বোঝা যায় না।

সোমরু অপ্রতিভ হয়ে বললো,—এ দেশে আমি অল্পদিন বাস করছি না। এ দেশের রমণীদের সম্বন্ধে আমি একেবারে অজ্ঞ নয়। তোমারও দুঃখটা বুঝি। বিবাহের পর রমণীরা মা হতে চায়। তা না হতে পেলে তাদের জীবনের সুখ অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তুমি তো সেই সাধারণ রমণী নও, সেইজন্যে তোমার প্রকৃতিতে অন্যধরনের রূপ আশা করেছিলাম।

মুন্না স্বামীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে কেমন যেন নিজেকে সংযত করবার জন্যে পালিয়ে গেল।

রমণী রমণীই। যতই পুরুষের মত কাজ করুক তবু সে রমণী। ক্ষেত্রবিশেষেও তার ধর্ম থেকে সে বিচ্যুত হয় না। মুন্নার অবস্থাও তাই হল। সে কিছুতে তার অভাব পূরণ করতে পারলো না। দিনের পর দিন সমস্ত কাজের মধ্যে কেমন যেন নিরুৎসাহ হয়ে যেতে লাগলো। কেমন যেন সোমরুর ওপর আক্রোশ জমতে লাগলো। সোমরুর অক্ষমতায় বিদ্বেষ জমতে লাগলো। এই সময় মুন্না রমণী ছাড়া কিছু নয়। একটি পরিপূর্ণ রমণী। সে ভুলে গেল, সে ঘোড়ায় চড়তে পারে, আস চালাতে পারে। বন্দুক ছুঁড়তে পারে। রণক্ষেত্রে বর্ম পরিধান করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সব ভুলে গিয়ে সে নিজেকে সোমরুর বেগম হয়ে সে পুরুষের সোহাগের ইস্তেজারি হয়ে যুগ যুগ ধরে কাটিয়ে দিতে চায়। এ ছাড়া তার আর কোন বাসনা নেই। এই চাওয়ার মধ্যেই সে চায় তার বাসনার স্মৃতিস্বরূপ

একটি প্রতীক। একটি রক্তমাংসে গড়া শিশুসন্তান। যে তার ক্রোড় আলো করে হৃদয় উজ্জ্বল করে তুলবে। বক্ষের সুধায় দেবে অমৃতধারার প্রাবল্য। রমণী প্রথমে চায় স্বামী, মনের মত স্বামী। তারপর স্বামীর সোহাগে পরিপূর্ণ তৃপ্তি আহরণ করে চায় মা হতে। নরনারীর মিলনে যে সুধানুভবের ঐশ্বর্য সৃষ্টিই হয়, তারই রোশনাইয়ে একটি প্রতীক চিহ্নস্বরূপ স্মৃতি। তাছাড়া রমণীর সৃষ্টিই যেন সৃষ্টির বিবর্তনকে চিরস্থায়ী করবার জন্যে। তারা যেমন দয়িতের আকাঙ্ক্ষায় একদিন পাগল হয়, তেমনি পরবর্তী সময়ে চায় মা হতে।

মুন্না শাদীর পর এই অভাব বোধ করে নি বা কুমারী অবস্থাতেও এই স্বপ্ন মনে আনে নি। তখন যদিই বা আশা ছিল সে আশা প্রচ্ছন্ন। তার জন্যে কোন বেদনা ছিল না, ছিল পুলক। পুলকের রেশমী দোলায় দুলতে দুলতে শুধু ভাবতে পারতো। ভাবতে ভাল লাগতো। কিন্তু শাদীর অনেকদিন পর সেই পুলকই বেদনায় রূপান্তরিত হল। সে মা হতে চায়। মা না হলে বুকের বেদনা উপশম হয় না। কি যেন অভাব, কিসের যেন শূন্যতা! তখন স্বামীর সোহাগও ভাল লাগে না। স্বামীকে শত্রু মনে হয়, মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত অক্ষমতা নিয়েই যেন এই পুরুষ তাকে প্রবঞ্চনা করেছে।

মুন্নারও তাই হল। সোমরুকে তার ভালই লাগতো। সোমরুর সৌভাগ্যে সে সৌভাগ্যশালিনী। আজ সরদানার বিস্তৃত জায়গা জুড়ে তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। এ কেমন করে সম্ভব হয়েছে? সোমরুর বীরত্বে মুগ্ধ হয়েই বাদশাহ তাকে অধীন করবার জন্যে এই দৌলত উপঢৌকন দিয়েছেন। সোমরুর যদি বীরত্ব প্রকাশ না হত তাহলে কি বাদশাহ তাকে এই পুরস্কার দিতেন? স্বার্থ ছাড়া কোন মানুষই অধীনতা স্বীকার করে না, সুতরাং এখানে স্বার্থ ই সোমরুকে বড় করেছিল। সবটুকু ক্ষমতা সেইজন্যে সোমরুর। সুদূর থেকে বিদেশে এসে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যে কত মেহনতের — সে মুন্নাও বুঝতে পেরেছিল। সেইজন্যে স্বামীর জন্যে মুন্নার একটা গোপন গর্ব ছিল, সেই গর্বেই সে গর্বিতা। সেই গর্বে সে নিজেকে স্বামীর মত করতে প্রয়াসী হয়েছিল।

কিন্তু এসব কথা পূর্বের। যখন তার তপ্ত যৌবনের অসামান্য রূপের আগুনে ধরিত্রী দগ্ধ হচ্ছে। সে সময় সে সোমরুর স্পর্শের মাঝে এইসব কল্পনাকে হৃদয়ে স্থান দিত। তখন অবশ্য ভালই লাগতো। সেদিনের মুহূর্তগুলি বড় শিহরণের মাঝে বিদায় নিয়েছে। এমন কি সোমরুর সেই বিশ্রী অতীত—সরদানার হারেমের মধ্যে উজ্জ্বল হয়েছিল, সেই অতীতের বেদনায় বিক্ষিপ্ত হয়েও সে তার সোহাগ-স্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেলেনি। বরং উপভোগের তীর্থে আরোহণ করে সঙ্গীতের মূর্ছনার মাঝে মিশে গিয়েছিল।

আজ সে অতীত। মুন্নার আর ভাল লাগে না কিছু। এখন সোমরু যেন তার দুশমন। আর এই সরদানার প্রাসাদের সজ্জিত ঐশ্বর্য জৌলুসহীন এক আবর্জনার মতই মনে হয়। সোমরুকেও আর ভাল লাগে না। সোমরু আলিঙ্গনাবদ্ধ করতে এলে কেমন যেন তার আতঙ্ক জেগে ওঠে। মনে হয় যেন বলিষ্ঠ হাতদুটির মাঝে

জিঘাংসা লুকিয়ে আছে। সোমরু অতীতের একজন নৃশংস নরঘাতক, হত্যার সময় তার এতটুকু হাত কম্পিত হত না। সেই ভেবেই সে আতঙ্কিত হয়ে স্বামীকে সোহাগ দানেও বঞ্চিত করেছিল। সোমরুর বলপ্রয়োগ তার অনিচ্ছাকে জয় করতে পারে নি, শেষপর্যন্ত সোমরু হাল ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েছে।

এমনি সময়ে একদিন রাত্রে হঠাৎ মুন্না আবিষ্কার করলো এক গোপন অভিসার।

সোমরুর খাসমহল থেকে অন্দরমহলে যেতে গেলে দুটি পথ। একটি মুন্নার মহলের সামনে দিয়ে প্রবেশ করতে হয়, অপরটি ঘুরে যেতে হয়। ঘুর পথটি উন্মুক্ত স্থানের ওপর সীমাবদ্ধ। একটি ছোট্ট উদ্যান বীথিকা। দুটি মর্মরনির্মিত ফোয়ারাকে বেষ্টন করে আছে। ফোয়ারা দুটির জল মৃদু শব্দ সৃষ্টি করে উপরে উঠে যাচ্ছে, তারপর পাষাণগাত্রে আছড়ে পড়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই জলের মধ্যে কেমন যেন মৃদুমন্দ সুবাস। আতরের সুবাস ছড়িয়ে চতুর্দিক আমোদিত করেছে। ঠিক যেন বাদশাহী প্রাসাদের মত। বাদশাহী প্রাসাদে যেমন বিলা উপকরণের ছড়াছড়ি, তেমনি সরদানার এই স্বাধীন প্রাসাদে।

কিন্তু সোমরু কোন সময় অন্দরমহলে গেলে মুন্নার মহল দিয়েই যাতায়াত করতো। বাইরের পথ শুধু বাঁদীদের গমনাগমনের জন্যে। মুন্নার মহল দিয়ে যাবার হুকুম ছিল না। অবশ্য মুন্নার মহলও অন্তঃপুরের মাঝেই ছিল, তবে তা একটু ভিন্নাংশে। যেন সে অন্তঃপুরের প্রহরিণী হয়ে অন্তঃপুর পাহারা দিত।

সোমরু কোন সময়ই অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করতো না। যদি কোন প্রয়োজন হত, তবে সে কর্ত্রীর কাছেই তা পেশ করতো। কর্ত্রী মুন্না তার ব্যবস্থা করতো।

সেদিন রাত্রে মুন্না না ঘুমিয়ে শয্যার ওপর শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করছিল। হঠাৎ বাইরের অলিন্দে পদশব্দ উত্থিত হল এবং সেই পদশব্দ পরিচিত বলেই সে কৌতূহলী হয়ে উঠলো। কৌতূহল জাগার সঙ্গে সঙ্গে সে তাড়াতাড়ি পোষাক ঠিক করে নিযে বাইরে এল। দেখলো, নিঃশব্দে সোমরু অন্তঃপুরের মধ্যে এগিয়ে চলেছে।

সেও বিস্মিত হয়ে আত্মগোপন করে সোমরুকে অনুসরণ করলো।

অন্তঃপুরের সবচেয়ে বিশ্রীকক্ষে বাহাবেগম থাকতো। মুন্না দিল্লী থেকে আসার পর তার হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্যে বাহাবেগমকে এই শাস্তি দিয়েছিল, না হলে পূর্বে তার জন্যে নিজের মত সৌভাগ্য দান করেছিল।

সেই কক্ষের দিকে সোমরুকে এগিয়ে যেতে দেখে মুন্না হতচকিত হয়ে গেল।

যাই হোক অদম্য কৌতূহল মনে ধারণ করে মুন্না এগিয়ে চললো।

ততক্ষণে সোমরু বাহাবেগমের কক্ষে প্রবেশ করেছে।

মুন্না গিয়ে দরজার পাশে দাঁড়ালো।

কক্ষের মধ্যে থেকে দুটি রমণী পুরুষের কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

মুন্না বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে শুনতে লাগলো।

বাহাবেগমের কণ্ঠই সোচ্চার। সে কণ্ঠে আবেগ সৃষ্টি করে সোমরুকে বলছে,—হঠাৎ তোমার আদরের বীরপত্নীর ওপর আকর্ষণ কমলো কেন? বাহাবেগম পরিত্যক্তা

কিন্তু বাহাবেগম লোলুপ নয় জানবে। সে কারো অনুগ্রহে গৌরবান্বিতা হতে চায় না। তুমি যে এই প্রত্যহ আমার কাছে আসো, যদি ছোট বেগম জানতে পারে তার পরিণাম কি ভেবেছ ?

সোমরুর কণ্ঠ এবার শোনা গেল, সে বললো,—তুমি অতো ভয় কর কেন 'ডিয়ার ? এ প্রাসাদে তোমারও যে অধিকার আছে, সে কথা ভুলে যাও কেন ?

বাহাবেগম বললো,—আজ সোমরুসাহেবের মুখে এ কথা শুনছি কিন্তু আগে কোথায় এ আচরণ গিয়েছিল ? তখন বুঝি নয়া বেগমের সুরত দেখেই অন্ধ হয়ে গিয়েছিলে !

এবার বাহাবেগমের সেই পৈশাচিক খিলখিল করে হাসিতে কক্ষ মুখর হয়ে উঠলো। তারপর হাসি প্রশমিত হলে বললো,—ভাগ্যিস, ছোটবেগম সন্তান না পেয়ে তোমাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করলো, তাই আমার এই সৌভাগ্য।

তারপর বাহাবেগম একটু থেমে দৃঢ়স্বরে বললো,—তোমার এই গোপনে আমার কাছে আসা আজ থেকে শেষ করতে হবে। তুমি একজনের অবহেলায় নিজের কামনা চরিতার্থের জন্যে আমার কাছে এসেছে, তোমার এই স্বার্থকে সেলাম জানিয়ে আর নিজেকে ছোট করতে পারবো না। যদি ছোটবেগমের সামনেই তাকে উপেক্ষা করে আমাকে গ্রহণ করতে পারো, তবেই আবার এস, নতুবা এস না। একদিন যেমন আমাকে অবজ্ঞা করে ছোটবেগমকে সৌভাগ্যদান করেছিলে, ঠিক তেমনি !

সোমরু আর্তস্বরে কাতর হয়ে বললো,—বাহার, তোমরা এমনিভাবে আমার প্রৌঢ় জীবনে আঘাত দিয়ে আমাকে দুর্বল কর না !

বাহারও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—একদিন তোমার আঘাতেও আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। তুমিও আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রমণী সম্ভ্রম ধূলি ধুসরিত করেছ। সেদিন কি আমার কাতর প্রার্থনা শুনেছিলে ? বরং ছোটবেগম আমাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে, তুমি জানাও নি। অথচ তোমার কাছ থেকে আমার প্রাপ্য অনেক বেশী ছিল। আজ সুযোগ পেয়েছি, সেই আচরণের প্রতিশোধ নেব না ? ছোটবেগম সন্তান না পাওয়ার জন্যে তোমাকে অবহেলা করেছে, আর আমি তোমার আচরণে ক্ষতবিক্ষত হয়ে তোমাকে ঘৃণা করি। যতদিন বাঁচবো। যাও আর সুযোগ গ্রহণ করতে এস না। প্রবঞ্চনারও একটা সীমা আছে। প্রবঞ্চককে দিল্লীর বাদশাহ সেলাম জানাতে পারে, এই বাহাবেগম জানাবে না।

তারপর মুন্না দেখলো, সোমরু বাহাবেগমের কক্ষ থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে এল। মুন্না-আর নিজেকে গোপন করে রাখলো না, সোমরুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সোমরু তাকে দেখে চমকিত হয়ে থরথর করে কেঁপে উঠলো। অত বড় একজন বীর যে—কোন বলশালী যোদ্ধা ও তার হাতিয়ারকে ভয় করে না, সে সেই মুহূর্তে একটি রমণীকে দেখে কেমন যেন ভীত হয়ে উঠলো। চোরের ধরা পড়লে মুখের অবস্থা যে রকম হয়, ঠিক সেইরকম পাংশুবর্ণ।

সোমরু মুন্নাকে দেখে থমকে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর মুন্নার পাশ

কাটিয়ে একেবারে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

আর মুন্না! না, মুন্নার কথা থাক্।

মুন্না সে রাত্রিটি কোন রকমে অতিবাহিত করেছিল। কিন্তু প্রভাত হলে আর একমুহূর্ত থাকে নি। সে যেন তার পাহাড় সমান অভিমান নিয়ে পিত্রালয়ে যাবার মত এক শিবিকায় আরোহণ করে দিল্লীর প্রাসাদের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছিল। যাবার সময় সরদানার সম্রাট, বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসনকর্তা সোমরুকে বলে পর্যন্ত যায় নি। চিরতরে সরদানা ত্যাগের মত মনোভিপ্রায় নিয়ে, দু'চোখে জল, বক্ষে হৃদয়ে নিরুৎসাহ নিয়ে সে সবার অগোচরেই শিবিকায় উঠেছিল। তারপর অগণিত কর্মচারীর ব্যগ্রদৃষ্টিকে আহত করে সে বেরিয়ে গিয়েছিল সরদানার প্রাসাদ প্রাঙ্গণ ছেড়ে।

বাদশাহ শাহ আলমের কাছে গিয়ে সে সব বললো। এতটুকু গোপন করলো না। এমন কি নিজের সন্তান কামনার আকাঙ্ক্ষার কথা বলতেও লজ্জিত হল না।

বাদশাহ যেন তার পিতা। পিতামাতার সমস্ত অভাব যেন বাদশাহ পূরণ করে-ছিলেন। এমনিভাবে মুন্না সোমরুর বিশ্বাসঘাতকতা, তার অবহেলা আপন পরমাত্মী-য়ের কাছে বলে সান্ত্বনা পেতে চাইলো। বোধহয় সান্ত্বনা পেলও সে।

বাদশাহ যখন সস্নেহে মুন্নার মাথায় হাতের স্পর্শ দিলেন, তখন যেন সব বেদনা মুন্নার মুছে গেল।

বাদশাহ স্মিতহাস্যে বললেন,—বেটি, উত্তেজিত হও না। রীনহার্ডের এই ব্যবহারে সত্যিই আমি মর্মাহত কিন্তু কি করবো, আমি নিরুপায়। দিল্লী আজ শত্রুর ভয়ে কম্পিত। বাদশাহ নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দিনরাত ভেবে চলেছে।...তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—তুমি হারেমে বিশ্রাম নাও। দেখি, তারপর কি করতে পারি?

এর পর আর বাদশাহের সঙ্গে মুন্নার কোন মোলাকাত হল না। বাদশাহ তাকে আহ্বান জানালেন না বলেই সেও বাদশাহকে উত্যক্ত করতে সাহসী হল না কিন্তু মন তার সোমরুর জন্যে চিন্তিত হয়ে থাকলো।

একদিন হঠাৎ সে শুনলো সোমরু প্রাসাদে এসেছে। বাদশাহের নির্দেশে প্রাসাদে আসতে বাধ্য হয়েছে। আরো শুনলো, বাদশাহ তাকে সরদানার অবসর জীবন থেকে বঞ্চিত করে আগ্রায় প্রেরণ করেছেন। সেখানে সে সামরিক ও অসাম-রিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাস করবে।

এ কথা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুন্না সঙ্কোচ পরিহার করে বাদশাহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। কাতর হয়ে বললো,—এ আপনি কি হুকুম দিলেন বাদশাহ? তাকে চিরতরে আগ্রায় নির্ব্বাসন দিয়ে আমার সব কেড়ে নিলেন?

বাদশাহ বিচলিত না হয়ে মৃদু হেসে বললেন,—প্রয়োজন হলে তুমিও যাবে বেটি আগ্রায়? রীনহার্ডকে নির্ব্বাসন দিই নি, তাকে আরো সম্মান দিয়ে আগ্রায় শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেছি।

মুন্না ফিরে এল বাদশাহের কাছ থেকে। তার মন বললো, এ ভাল হল না।

কোথায় যেন একটি দুষ্ট মতলব ক্রীড়া করে সবকিছু ওলটপালট করে দিতে চাইছে। আর বাদশাহ শুধু রাজনীতির চাল চেলে সুযোগকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাচ্ছেন।

সোমরুকে সাবধান করে দেবার জন্যে তার মন বড় উতলা হল কিন্তু দেখা পাওয়া মুশকিল। কোথায় যে আছে কিছুই সে জানে না। তবু একবার দেখা-পাওয়ার জন্যে সে অনেক মেহনত করলো। এমন কি এই দেখা না হওয়ার পশ্চাতে যেন বিরাট ষড়যন্ত্র আছে বলে মনে হল। যাই হোক, এ সবই অনুমান। সঠিক ধারণা করা যায় না।

. এক বন্দীকে গোপনে উৎকোচ দানে বশীভূত করে সোমরুকে ডেকে আনালো।

কিন্তু সোমরু এসে মুন্নার সঙ্গে কেমন যেন বিরুদ্ধ মনোভাব প্রকাশ করলো। বললো,—কি ব্যাপার ? আবার ফিরবে নাকি সরদানায় ?

অপ্রতিভ হল মুন্না। আহত হয়ে কয়েক মুহূর্ত মাথা নত করে থাকলো। তারপর জলভরা চোখে বললো,—তুমি আগ্রায় যেও না।

কেন ?

কি জানি, আমার যেন কেমন খারাপ মনে হচ্ছে ?

সোমরু এর উত্তরে তাচ্ছিল্যভাবে বললো,—আর কিছু বলবে ?

মুন্না আরো কিছু বলতে চাইলো কিন্তু সোমরু দাঁড়ালো না। কেন যেন মুন্নাকে উপেক্ষা করেই সে চলে গেল।

তারপর আর মুন্নার কিছু মনে নেই। সে সেই যে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রবেশ করলো, তারপর সাতটি দিন আচ্ছন্নের মত কেটে গেল। এমন কি এই সাতদিন বাদশাহও তাকে আহ্বান করেন নি। করলে হয়তো তার চৈতন্যোদয় হত। সে অন্যকিছু ভাবতে পারতো।

এই সাতদিন পর একদিন বাদশাহের জরুরী তলবে মুন্নাকে খাসকক্ষে যেতে হল। আর বাদশাহ তাকে দেখে রুদ্ধকণ্ঠে জানালেন,—তোমাকে এ সংবাদ দিতে বড় বেদনা বোধ করছি। তবু খোদার অভিপ্রেত, আমাকে জানাতেই হবে। নসীবের অঘটন খণ্ডাবার ক্ষমতা কোন মানুষের নেই। তবু নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে, রীনহার্ডকে আমিই উপযুক্ত সম্মানের জন্যে আগ্রায় প্রেরণ করেছিলাম।

মুন্না তখনও বুঝতে পাচ্ছিল না, বাদশাহ তাকে কি বলবেন। রীনহার্ডের কথা শুনে তাই সে কেঁপে উঠলো।

কিন্তু সেই সময় বাদশাহ হঠাৎ বললেন,—হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রীনহার্ড মারা গেছে। গভীর রাত্রে আগ্রা থেকে সংবাদ দাতা দ্রুতগামী অশ্বে এসে আমাকে জানিয়েছে।

মুন্নার কানের মধ্যে সেই সংবাদ প্রবেশ মাত্রই কেমন যেন শ্রবণশক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। চক্ষু দুটি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করলো। কণ্ঠস্বর হারিয়ে সে নির্বাক হয়ে গেল।

মুন্না আর বাদশাহকে দেখতে পেল না। অন্ধকারের মধ্যে এক শয়তানকে লক্ষ

করলো। শয়তান তার রক্তবর্ণ চক্ষু মেলে ব্যাঘ্রের মত থাবা তুলে ছুটে আসছে। মুন্না চিৎকার করে উঠলো। বিকট এক চিৎকার করে সেই শয়তানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে ধপাস করে মেঝেয় আছড়ে পড়ে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো।

তারপর যখন তার জ্ঞান হল, সে দেখলো, সে অন্তঃপুরে তার নির্দিষ্ট কক্ষে শুয়ে আছে। পাশে বাঁদী তার পরিচর্যার জন্যে অপেক্ষমানা। আবার মনে পড়লো তার সোমরুর কথা। আজ সোমরু নেই। বড় বীর সৈনিক মানুষের চক্রান্তে পরাজয় স্বীকার করে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। বাদশাহকে তার বড় কুচক্রী মনে হল। এই বাদশাহকে সে আপন পিতার মত শ্রদ্ধা করতো। বিশ্বাস ছিল, বাদশাহ তার কোন ক্ষতি করে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করবেন না কিন্তু সে ভুলই ভেবেছিল। আজ বুঝতে পারছে, মোগল বাদশাহরা দরদী মনের পরিচয় দিলেও আসলে তাঁরা সুযোগ সন্ধানী। এই বাদশাহ শাহ আলম প্রথম থেকে মুন্নার সঙ্গে যেরকম আচরণ করে চলেছেন, তার কথা মুন্না আবার ভাবলো। আজ যেন সবই স্পষ্ট হয়ে চোখের ওপর ধরা পড়ছে। সোমরুকে সরাবার মতলব বাদশাহের মধ্যে অনেক দিনের। বাদশাহ তাকে যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন, অসিচালনা শিখেছিলেন, বোধহয় বর্তমানের দিনটি কল্পনা করে। সোমরু একদিন চলে গেলে এই মেয়েটি যদি কৈফিযত তলব করে সেই ভয়ে তিনি তাকে পুরুষের মত ক্ষমতার অধীশ্বরী করেছেন।

সেই সব কথা স্মরণ হতে বাদশাহের ওপর শ্রদ্ধা চলে গিযে ঘৃণা জাগলো মুন্নার। কিন্তু এখন সে কি করবে? পরিত্রাণের পথ কোথায়? বাদশাহের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তাকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। নৃশংস প্রকৃতির মানুষের অসাধ্য কিছু নেই। এঁরা জগতের যেমন নিযমের হাল ধরে আছেন, অনিযমের কাজ করতে এঁরাই পটু।

ক্রীড়নক হওয়া ছাডা উপায় নেই। নয় এদের উচ্ছেদের জন্যে মনে মতলব ধারণ করতে হবে, নয় সম্মুখ সমরে আহ্বান করে বিধ্বস্ত করতে হবে কিন্তু সে শক্তি তার এখনও হয়নি। সুতরাং বাদশাহের মতলবের ওপরই তাকে জীবন ধারণ করতে হবে।

কিন্তু সোমরু! সোমরু যাবার সময় সে তার উপেক্ষা নিয়েই চলে গেল, সে জেনে গেল না মুন্নার মনের কথা। মুন্না যে তাকে কত ভালবাসতো, সে যে অজ্ঞাতই থেকে গেল। শুধু সন্তান আকাঙ্ক্ষায় তার মন বিক্ষিপ্ত হযেছিল কিন্তু স্ত্রীর কর্তব্য থেকে তো সে এতটুকু বিচ্যুত হয় নি। বরং তার মনের মধ্যে যে আশঙ্কা জেগেছিল, সে ছুটে গিয়ে অভিমান ত্যাগ করে আগ্রা যেতে নিষেধ করেছিল। তার মন যেন বলছিল, কিছু অঘটন ঘটবে। এই যাত্রা তার এখানেই শেষ হযে যাবে।

না, মুন্না আর ভাবতে পারলো না। হঠাৎ তার যেন মনে হল, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তার শক্তিকে মেলে ধরা উচিত। শক্তি না মেলে ধরলে বাদশাহকে না ভীত করলে তিনি আবার কোন মতলব করতে পারেন। বাদশাহকে সে আর সুযোগ দেবে না। তাঁর মিষ্টি কথায় সে কিছুতে ভুলবে না একদিন তিনি যখন ত

শক্তি আহরণে উৎসাহিত করেছিলেন, সেই শক্তি সে আজ প্রয়োগ করে বাদশাহকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করে ক্ষতবিক্ষত করবে।

ভাবার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী বিহনের শোক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মুন্না হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করলো, তারপর এগিয়ে গেল বাদশাহের খাসকক্ষের দিকে।

বাদশাহ শাহ আলম মনে হয় তারই আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন, বললেন,—এস।

মুন্না আজ আর বাদশাহের স্নেহকণ্ঠে আপ্লুত হল না। সে বেশ বিরক্ত হয়ে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো,—সোমরুকে সরিয়ে দিলেন কেন?

বাদশাহ মুন্নার আচরণে চমকিত বা ক্ষুব্ধ হলেন না, তেমনি পূর্ব্বের কণ্ঠেই বললেন,—ও সব কথা থাক্। এখন শুধু আমার জিজ্ঞাস্য, তুমি সরদানায় ফিরতে পারবে? তোমার যদি মন শান্ত হয়ে থাকে তাহলে সরদানায় গিয়ে শাসনকর্ত্রীর পদ অলঙ্কিত কর। তোমাকে এই ভূমিকায় দেখবার বাসনা নিয়েই আমি সরদানায় যেতে বলছি।

মুন্না ক্ষুব্ধস্বরে বললো,—একি আপনার আদেশ?

বাদশাহ এবার চমকিত হলেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর অপরিবর্তিত থাকলো, বললেন, আদেশ নয় বেটি, অনুরোধ। আমি কখনও আদেশের ভঙ্গিতে তোমার সঙ্গে কথা বলিনি। তারপর একটু কাতর স্বরে বললেন,—মেরী বেটি, মনের উষ্মা রোধ কর, শোক সংবরণ কর। তুমি যে সেই বিদেশী সৈনিককে এত ভাল বাসতে আগে বুঝতে পারি নি। তোমার আমি ভালই চাই। সেই সৈনিক পৃথিবী থেকে সরে গেছে বলে আমি এতটুকু দুঃখিত নয়। শুধু তোমার দুঃখ দেখে আমি মর্মাহত হচ্ছি। তোমাকে একদিন আমি সামরিক ক্ষমতার অধীশ্বরী করতে চেয়েছিলাম শুধু বর্তমানের দিনটি কল্পনা করে। তুমি সরদানায় গিয়ে নিজের কৃতিত্ব প্রকাশ কর, আমার সব সাহায্য তোমার জন্যেই ব্যয়িত হবে।

মুন্না বাদশাহের কথায় শান্ত হল কিনা বোঝা গেল না, শুধু একটু থেমে জিজ্ঞেস করলো,—সোমরু দুনিয়া ছেড়ে গেল কেন? তার অপরাধ কি এইটুকু আমাকে বলবেন?

বাদশাহ একটু চুপ করে থেকে বললেন,—রীনহার্ডের লোভ ছিল আকাশচুম্বী। সে তার ক্ষমতা কোন ভাল কাজে ব্যয় না করে দুষ্কার্যে ব্যয় করার জন্যেই বেশী উৎসাহী হত। দিল্লীর সিংহাসনও তার কাম্য ছিল। সেইজন্যেও সে সরে নি। তোমার প্রতি অবহেলাই আমাকে শেষপর্যন্ত দণ্ড দিতে আগ্রহান্বিত করেছিল।

মুন্না সে সময় আর কিছু বুঝতে পারলো না। বাদশাহের কথাগুলি কেমন যেন তার দুর্বোধ্য মনে হল। কেমন যেন সে বাদশাহকে শত্রুই মনে করলো। বাদশাহকে সে পিতার মত শ্রদ্ধা করতো, সেই শ্রদ্ধা সোমরুকে হত্যার পর কেন যেন অপসারিত হয়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাদশাহের আদেশকেই শিরোধার্য মনে করে সে সরদানার পথে রওনা হল। এ ছাড়া উপায়ই বা কি? আশ্রয় কোথায়? অবলম্বন কোথায়? সোমরু নিহত। রমণীর একমাত্র অবলম্বন চলে গেছে। বাদশাহের আশ্রয়ও এখন কণ্টকসম। সুতরাং সরদানাতেই শেষ আশ্রয়। জানে না, শেষ পর্যন্ত সে আশ্রয়ও তার থাকবে

কিনা !

মুন্নার সেদিনগুলি বড় মর্মান্তিক। সামান্য এক রমণী কিন্তু বিরাট এক দুশ্চিন্তা তাকে কেমন যেন শক্তিহীন করে দিয়েছিল। পথ নেই। চতুর্দিকে শুধু অন্ধকারের মসী। অন্ধকার ছাড়া এতটুকু আলো নেই। আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই। কাউকে বিশ্বাস করারও উপায় নেই। সোমরু যে তার এতখানি ছিল, আগে কখনও বুঝতে পারে নি। সোমরুর অভাব যেন তাকে দিশেহারা করে দিল।

সরদানায় ফেরবার পর সেখানকার আর এক মূর্তি। কেমন যেন চতুর্দিকে বিশৃঙ্খল আবহাওয়া। সরদানার সিংহাসনে কে বসবে ? একদল চাইলো সোমরুর সেই পুত্র জাফর ইয়াবকে বসাতে। আর একদল চাইলো মুন্নাকে বসাতে।

মুন্না কিন্তু নিরুত্তর। কোন কিছুর ওপর স্পৃহা নেই। সে যেন রিক্ত, তার কোন কিছু নেই, এমনিভাবে দিনের পর দিন সে নিজের কক্ষের মধ্যে নিজেকে লুকিয়ে রাখলো। সরদানার সিংহাসনে যেই বসুক, তার দৌলতের ওপর যারই লোভ থাক্ অন্তত মুন্নার নেই। মুন্নাকে যেন সেই তার পিতার রক্তের ধারাই পেয়ে বসলো। লোকালয় তার ভাল লাগলো না। সাংসারিক ঝামেলা সে পরিহার করতে চাইলো। কোথায় যেন চলে যেতে মন চায়। এমন কারো স্নেহক্রোড়ে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা, করলো, যেখানে শান্তি আছে। এই দুঃসময়ে মাকে বড় মনে পড়ে। মা যদি সেদিন অমনিভাবে না আত্মহত্যা করতো, তাহলে আজ এই দুর্দিনে তার কোলে আশ্রয় নিতে পারতো। এমন কি আব্বাজানও আজ বেঁচে থাকলে তার আশ্রয় তাকে শান্তি দান করতো। মার কাছে আব্বাজানের কথা শুনেছে। তাঁর জীবন ছিল বড় বিক্ষিপ্ত। একদিন তিনিই আরব থেকে হিন্দুস্তানে এসে সুখী হতে চেয়েছিলেন কিন্তু সুখ তাঁর মেলেনি। একে একে বহু আত্মীয়ের মৃত্যুর কারণ তিনিই হয়েছিলেন। তারপর হিন্দুস্তানের চতুর্দিকে ঘুরে নিজের পথ খুঁজছেন। পথ মেলেনি। জীবনের সায়াহ্নে যদিও বা একটু স্থিতি এসেছিল কিন্তু শান্তি দুরাশা ছিল। আর তারপরের ইতিহাস বড় মর্মন্তুদ। তাঁর মৃত্যু যেন কার অভিশাপেই সংঘটিত হয়েছিল। শেষ বিড়ম্বনা তার পুত্রকে নিয়ে। সে হানিফ। হানিফের কথাও মুন্নার কাছে অজ্ঞাত ছিল। ছোটবেলার ইতিহাস বড় একটা তার মনে পড়ে না। জ্ঞান হলে সে মাকেই সামনে পায়। তাই মা ছাড়া সবকিছুই তার কাছে গল্প ছিল। শুধু হানিফকে পরে দেখে মায়ের গল্প সত্য বলে মনে হয়েছিল। আর দুঃখিত হয়েছিল মায়ের প্রতি পিতার অবমাননায়।

সে যাকগে, লুতুফ আলির সেই বিড়ম্বিত জীবনের শেষ রক্তধারা ভিন্নগামী করবার জন্যে সে শপথ গ্রহণ করেছিল। হানিফকে তাড়িয়েছিল উত্তেজনার বশবর্তী

হয়ে নয়, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে। তারপর নিজের শক্তিবুদ্ধির মধ্যে দিয়ে জগতে কীর্তি রাখতে চেয়েছিল। পিতার মনের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে চেয়েছিল।

কিন্তু কি হল? কিছু যে ভাল লাগে না। মনটা যে কিছুতে সংযত হয় না। প্রাসাদের মধ্যে এত লোক, এত কোলাহল তবু যেন তার মনে হয় সব শূন্য। হাহাকার ছাড়া, নিরানন্দ ছাড়া কোন কিছু নেই। আনন্দহীন এই শূন্য প্রাসাদে সে বাস করবে কেমন করে? বাইরে থেকে সংবাদ কানে ভেসে আসছে, বেগম সোমরুই সিংহাসনে বসবাস উপযুক্ত, তিনি ছাড়া কেউই এই পদের উপযুক্ত নয়। উত্তরাধিকারী বাহাবেগমের পুত্র জাফরের বয়স এখন মাত্র দশ। সে নাবালক, রাজকার্যের কিছু বোঝে না। তবু যেন একদল কুচক্রী এই জাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে সম্পত্তি হস্তগত করতে চায়।

মুন্না কক্ষের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকলেও, তার কিছু অজানা থাকলো না কিন্তু সে বাইরে বেরিয়ে এই চক্রান্ত ভেঙে দিতে উৎসাহী হল না। না, কিছু প্রয়োজন নেই। সোমরু গেছে, তার সঙ্গে সঙ্গে সব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। কি হবে এই দৌলতের মাঝে নিজেকে ব্যাপৃত রেখে! বরং ঝঞ্চাট বাড়বে। মস্তিষ্ক বিকৃত হবে। অথবা কিছু লোকের শত্রু হয়ে তাদর শায়েস্তা করতে হবে। সে সবই পারে কিন্তু কেমন যেন নৈরাশ্য। সোমরু তার শক্তি কেড়ে নিয়ে গেছে। সৈনিকরা জানে তাদের বেগম সব ক্ষমতা আহরণ করছে। যারা জানে তারা তারই অধীনতা চায়। কিন্তু তারা তো জানে না, তাদের বেগমের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। শক্তি একবার পথ পরিবর্তন করলে, আর ফিরে আসে না। আজকে মুন্নার সেই অবস্থা।

হঠাৎ একদিন সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মুন্না তাঁর জয়ধ্বনি শুনে চমকিত হল।

কিন্তু হঠাৎ প্রভাতে জয়ধ্বনি কেন? তার নামে অগণিত কর্মচারী জয়ধ্বনি করছে কেন? তবে কি সে স্বপ্ন দেখেছে?

মুন্না বিস্মিত হয়। সৈনিকদের কুচকাওয়াজ ধ্বনি তার কানে আসে।

মুন্না একবার বিস্ময়ে ভাবলো—এ আনন্দ কেন? সমস্ত রাজপ্রাসাদের লোক আজ কিসের আনন্দে মেতে উঠলো? তবে কি সংবাদ এসেছে, সোমরু মারা যায় নি? যে খবর এসেছিল, তা ভুল। সেইজন্যে এই আনন্দ! কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে তার নামে সৈনিকরা জয়ধ্বনি করছে কেন? সোমরু জীবিত থাকার সংবাদ শুনে সৈনিকরা কেন তার নামে জয়ধ্বনি করছে! তবে কি তারা বুঝতে পেরেছে, মুন্নার মানসিক শান্তি ও শক্তি নষ্ট হয়েছে সোমরু মারা যেতে। তাই যদি বুঝে থাক তাহলে ক্ষতি কিছু নেই। স্বামীর জন্যে সব স্ত্রীরই এমনি শোক জাগ্রত হয়।

এই সব আবোল-তাবোল কথা যখন সে ভাবছে, সেই সময় তার ভাবনার নিরসন ঘটিয়ে যে এসে কক্ষে প্রবেশ করে সেলাম পেশ করলো, তাকে মুন্না চেনে। বাদশাহের মন্ত্রীত্ব নিয়ে যিনি দরবার অলঙ্কৃত করতেন। জাতিতে জার্মান, নাম পাওলি। অদ্ভুত বুদ্ধিসম্পন্ন এই ইউরোপীয় ব্যক্তিটি বাদশাহের অনেক কাজের সহায়ক ছিল।

বয়স বেশী নয়, মুখখানিতে তারুণ্যের উজ্জলতা, সোনালী চুলগুলি অবিন্যস্তভাবে চতুর্দিকে ছড়ানো। মাথায় টুপি ছিল, টুপিটি সম্ভ্রমে মাথা থেকে খুলে বাদশাহী কায়দায় সেলাম জানিয়ে মুখে মৃদু হাসি ধরেছিল।

মুন্না তাড়াতাড়ি বসনভূষণ ঠিক করে নিয়ে বাদশাহের দূতকে আহ্বান জানানোর জন্যে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়লো। বাদশাহের ওপর ক্ষোভ তার সীমাহীন ছিল, তবু ভারতবর্ষের লোক হয়ে হিন্দুস্তানের সেরা পুরুষকে কেউই বড় একটা সামনে অবজ্ঞা করতে পারে না, মুন্না তারই আশ্রয় নিল। নিজেও হিন্দুস্থানী কায়দায় সেলাম করে সেই বিদেশীর কুশল প্রার্থনা করলো, তারপর বললো,—আপনার আগমন কিসের জন্যে তাতো অনুমান করতে পারলাম না?

মিঃ পাওলি সম্রাজ্ঞীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আবার সামরিক কায়দায় স্যালুট করে বললো, বাদশাহের নির্দেশনামা বহন করে আমি এখানে এসেছি। তিনি আপনাকে সরদানার সিংহাসন অলঙ্কৃত করতে নির্দেশ জ্ঞাপন করেছেন। আর আমাকে হুকুম দিয়েছেন আপনার সাহায্যে জীবন উৎসর্গীত করতে। এই বলে পাওলি আবার সামরিক কায়দায় স্যালুট করে একটি লিখিত নির্দেশনামা মুন্নার হাতে দিল।

থরথর করে কেঁপে উঠলো মুন্নার হাতটা। পুলকে কি বিস্ময়ে বোঝা গেল না। মুন্নার দু'চোখে হঠাৎ জল দেখা দিল কিন্তু সে সেভাব গোপন করে বাদশাহের সেই আচরণের কথা স্মরণ করে আবার ক্ষুব্ধ হল। তাকে বাদশাহ বলেই দিয়েছিলেন, যে তোমাকে আমি সরদানার সিংহাসনে বসাতে চাই। তোমাকে এমন এক ভূমিকায় দেখতে চাই, যা পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। কিন্তু বাদশাহ কি তাকে এইজন্যেই সিংহাসনে বসাতে চান, না আরো কিছু দুরভিসন্ধি লুকোনো আছে। তাই যদি থাকে, তাহলে সে আগেই তার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করবে। বাদশাহকে দেবে না আর কোন সুযোগ।

কিন্তু তবু যেন এই গুরুভার তার কেমন যেন দুর্বহ মনে হল। সে অক্ষম রমণী। যদিও পুরুষের মত অনেককিছু শিখেছিল, তবু সে রমণী। কোমলাঙ্গ সে পরিহার করে কাঠিন্য ধারণ করতে পারবে না। পুরুষের মত যাই কিছু করতে ইচ্ছুক হোক, তবু সে প্রকৃতির নিয়ম পরিবর্তিত করতে পারবে না।

কেমন যেন দ্বিধা, কেমন যেন সঙ্কোচ তাকে সেই মুহূর্তে বিচলিত করে তুললো।

তখনও মুহুর্মুহু বাইরে বেগম সোমরুর নামে জয়ধ্বনি উঠেছিল।

সেই ধ্বনি আবার একমনে শুনে মুন্না মনে মনে সাহস সঞ্চয় করলো, অগণিত জনতা তারই অধীনতা চায়, তারা সসম্মানে এক রমণীর গোলাম হতে চায়। কি করবে সে? দেবে তাদের আশ্রয়। দেবে এক রমণীর সমস্ত ক্ষমতা ঢেলে; কিন্তু পারবে কি দিতে? তার কি সে শক্তি আছে? গতরাত্রে সে একরকম ভেবেই নিয়েছিল, সে মায়ের সেই ইচ্ছাই পূর্ণ করবে। সে নর্তকীর জীবন নিয়ে রাজনীতি থেকে সরে গিয়ে একক জীবন যাপন করবে। এখানে বড় কোলাহল, অনেক সমস্যা

তার ছোট্ট মস্তিষ্কটুকু এসব সহ্য করতে পারবে না। তার চেয়ে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনের স্বাদ গ্রহণ করবে। কিন্তু আজ সকালে ঐ জয়ধ্বনিতেই তাকে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করতে যেন বাধ্য করছে। কে যেন অদৃশ্য থেকে বলছে, মুন্না, সকলে এ সুযোগ পায় না। সকলে পৃথিবীতে স্বাক্ষর রেখে যেতে প রে না। • লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে যে মাথা উঁচু করতে পারে সেই জগতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

তবু মুন্নার কেমন যেন দ্বিধা। কেমন যেন দ্বন্দ্ব। সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত।

এই সময় সালুর নামে এক ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী কক্ষে প্রবেশ করলো।

সে মুন্নাকে অভিবাদন করে দাঁড়ালে মুন্না সুমিষ্টস্বরে জিজ্ঞেস করলো—কি সংবাদ মেজর সালুর ?

মেজর সালুর অভিবাদন করে নিম্নস্বরে বললো,—বেগমসাহেবা, আজ আমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন। আমি সমগ্র ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর প্রতিনিধি হয়ে আপনার কাছে নিবেদন করতে এসেছি, আপনি যদি সিংহাসন অলঙ্কৃত না করেন, তাহলে আমরা একযোগে সরদানা ত্যাগ করতে বাধ্য হব। আমরা চাই না, এক যোগ্য প্রতিনিধি ছাড়া কোন অযোগ্যের অধীনতা স্বীকার করতে হয়। এই আবেদনই শাহনশাহ বাদশাহ শাহ আলমের সমীপে পেশ করা হয়েছিল, তিনি যে নির্দেশ দিয়েছেন, আশা করি সম্মানিত অতিথি মিঃ পাওলি আপনার কাছে ব্যক্ত করেছেন।

মুন্নার সেই মুহূর্তে মনে হল, আর সে একা নয়। স্বয়ং আল্লা যেন তার সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাকে সাহায্য করবার জন্যে অগ্রসর হয়ে এসেছেন। আর দ্বিধা বা সঙ্কোচ প্রকাশ করলে তার রমণীত্বেরই অবমাননা করা হয়। সেই কথা স্মরণ হতে তার মনে এক দারুণ শক্তি জাগ্রত হল, সে শক্তির মাঝে বিরাট এক সম্ভাবনার চিত্র দেখতে পেয়ে নিজের আবেগ আর চেপে রাখতে পারলো না।

সে সেই আবেগ বিহ্বল কণ্ঠেই বললো,—মেজর সালুর, আমায় প্রতি আপনাদের এই অহেতুক শ্রদ্ধার জন্যে আমি নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করছি। তবে একটি জিজ্ঞাস্য, আপনাদের ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীতে কতজন সৈন্য আছে। আর দেশীয় সৈন্যই বা কত ? দেশীয় সৈনিকরা কি সকলেই আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছে ? এসব না জানা পর্যন্ত আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে আমি দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি।

উত্তরে সালুর আবার বললো,—বেগমসাহেবা, ইউরোপীয়বাহিনী দশম ও প্রতি বাহিনীতে ছয় শত সৈন্য। তার মধ্যে অশ্বারোহী ও পদাতিক আছে। আর দেশীয় সৈন্যরা প্রায় ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যার সমতুল্য। তবে দেশীয় সৈন্য সকলে বেগমের বিরুদ্ধে যায় নি। তার মধ্যে যারা ধূর্ত তারাই এই চক্রান্তে উৎসাহী হয়েছে। আরও বললো,—তবে আপনি যদি একটু শক্তি প্রসার করেন, তাহলে সেই নগণ্য চক্রান্তকারী-দের শায়েস্তা করতে আপনার এতটুকু অসুবিধা হবে না।

মুন্না সালুরের কথায় খুশি হল। তারপর পাওলির দিকে তাকিয়ে সে বললো,—মিঃ পাওলি, আপনি তাহলে আমাকে জীবনপণ করে সাহায্য করবেন! বাদশাহ

আপনাকে আজীবন আমার অধীনতা স্বীকার করতে নির্দেশ দিয়েছেন ?

পাগুলি আবার স্যালুট করে বললো,—বাদশাহের নির্দেশ ছাড়াও আমি আন্তরিকভাবে আপনাকে সাহায্য প্রদান করতে চাই বেগমসাহেবা।

এই সময়ে বাইরে আবার বেগম সোমরুর নামে জয়ধ্বনি হল।

মুন্না আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল নিজের কক্ষের বাইরের প্রাঙ্গণে। তার জীবনের নতুন প্রভাত দেখতে। নতুন এক অধ্যায়ের সূচনায় প্রকৃতিতে সমারোহ জেগেছে কিনা দেখতে গেল।

আজ লুতুফ আলিকে সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে। লুতুফ আলির জীবনের কোন অধ্যায়ই উজ্জ্বলতা নিয়ে প্রতিভাত হয় নি। তার কন্যা আজ সবচেয়ে ঐশ্বর্যমণ্ডিত এক সিংহাসনে আরোহণ করেছে। লুতুফ আলি সৈনিক হতে চেয়েছিল। তার পুরুষ বীর্য এইটুকু শক্তিই প্রকাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাও তার নসীবে জোটে নি। আর সে যদি কখনও সম্রাট হতে চাইতো! না, সে অলীক কল্পনা তার ছিল না। এক গরীব আরববাসী রুজি রোজগারের জন্যে হিন্দুস্তানে এসে বাঁচতে চেয়েছিল। দেশে অনাহারে পড়ে না থেকে বিদেশে গমন শুধু খেয়েপরে বেঁচে থাকার জন্য। আর একটি ভাল নোকরী শুধু সৈনিক হওয়ার জন্যে। সৈনিক হওয়ার প্রার্থনা কেন? তখনকার দিনে শক্তিশালী পুরুষেরা ঐ প্রার্থনাই করতো। সৈনিক হতে পারলে পুরুষের সম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এই ছোট্ট আশাটুকুও তার কার্যকরী হয় নি। মেহেরবান খোদা তাকে শুধু বিড়ম্বনার মধ্যে দিয়েই জীবনকে শেষ করে দিয়েছেন। তারই কন্যা আজ সরদানার সবচেয়ে গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে আরোহণ করলো।

জগতে যদি মৃত্যুর পরও আত্মার কোন উপস্থিতি থাকে, তাহলে লুতুফ আলির আত্মা দেখবে তার কন্যার সৌভাগ্যপ্রাপ্তি। যা তার কল্পনাও ছিল না, কন্যা তার সেই সম্ভব করেছে। শুধু সিংহাসনেই কন্যা আরোহণ করে নি, তার চারপাশে অগণিত দেশী ও বিদেশী সেনাবাহিনী তার একটি হুকুমের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান।

অভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেছে।

মুন্নার মানসিক দ্বন্দ্ব আর নেই। সে নতুন বসনে ভূষিতা হয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। সে পরিত্যাগ করেছে অতীতের সব মালিন্য। অতীতের সেই দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ অধ্যায়গুলি মুছে ফেলে আগামী জীবনের নতুন সূর্যালোকের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে।

তার সেই পুরনো নামটি সে নিজেই ত্যাগ করেছে। বেগম সোমরুই এখন তার প্রধান নাম। সকলে সেই নামেই তাকে সম্মানিত করে। সেও তার জন্যে ক্ষুণ্ন

নয়। বরং তার মায়ের দেওয়া আর একটি নামকে সে স্মরণ করেছে, জোয়ানা। জোয়ানা শব্দের মধ্যে যেন কেমন এক গাম্ভীর্য, কেমন এক শক্তি আছে। তাই সোমরুর পদবী নিয়ে জোয়ানা রীনহার্ড নাম প্রতিষ্ঠিত করেছে। মিসেস ওয়ালটার রীনহার্ড ওরফে বেগম সোমরু। সোমরু যেমন বিষণ্ণ আকৃতির মানুষ ছিল, সে তা নয়। তবে স্বামীর নামের সঙ্গে তার নাম যুক্ত থাকার নীতির জন্যে তাকে বেগম সোমরু আখ্যা দিতে সে ক্ষুব্ধ হল না। বরং গর্বিত হয়ে এই ভাবলো, আজ যা কিছু সে পেল, সবই সে তার স্বামীর জন্যেই পাওয়া। সুতরাং এতে সে ক্ষুব্ধ হবে কেন?

যাই হোক, বেগম সোমরু রাজতখতে বসে রাজকার্যে মন দিলো। রমণী সম্ভ্রম, চিকের অবরোধ সৃষ্টি করে সে রাজকর্ম সম্পন্ন করতে লাগলো। কর্মচারীদের পরম্পরের কর্মধারা বুঝিয়ে দিল। একজন পুরুষ শাসনকর্তা যে শক্তি প্রকাশ করে ঠিক সেইরূপ। বরং তার চেয়ে বেশী বৈ কম নয়। একটি রমণীর যতখানি শক্তি থাকলে রাজকার্য সম্ভব হয়, তার চেয়েও অনেকখানি শক্তি ছিল বেগম সোমরুর। সে তা আগে বুঝতে পারে নি, বোধহয় বুঝেছিলেন বাদশাহ শাহ আলম। আর বোধহয় বুঝেছিল সরদানার সৈনিকরা। সোমরু নিজে সমরবিদ্যায় পারদর্শী ছিল কিন্তু একটি রাজ্য শাসন করার মত পর্যাপ্ত ক্ষমতা তার ছিল না। সরদানার অধিকাংশ রাজকর্ম তাই সোমরুর বুদ্ধিতে সম্পন্ন হত না, হত মুন্নার ক্ষুরধার বুদ্ধিতে। সোমরু জীবিত থাকাকালীন স্বীকার করেছিল স্ত্রীর বুদ্ধিকে। রমণীর স্বাভাবিক এক বুদ্ধি থাকে সাংসারিক জীবনের জন্যে কিন্তু তার চেয়ে বেশী বুদ্ধি যে রাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্যে থাকতে পারে, সোমরু জানতো না। তাই অবাক হয়েছিল এদেশের রমণীর ক্ষমতা দেখে। আর স্ত্রী নয় একজন সাহায্যকারিণীর সাহায্য পেয়ে সে খুশি হয়েছিল।

সে যাই হোক, সোমরু আজ নেই সুতরাং সে কথা অবান্তর।

বেগম সোমরু এখন আছে। তাকে কেন্দ্র করেই রাজ্যের বিভিন্ন কর্মধারা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। বরং প্রতিটি বিভাগে আরো ক্রমোন্নতি হতে লাগলো।

সোমরুর রাজ্যশাসনে যদিও বা কিছু শৈথিল্য ছিল, বেগমের শাসনে সে শৈথিল্য একেবারে অপসারিত হল। কি রাজস্ব আদায়ে, বিচার বিভাগে, সমর বিভাগে, আভ্যন্তরিণ কর্মচারীর কার্য নিয়ন্ত্রণে—সব দিকে বেগম সোমরুর দৃষ্টি। শুধু সতর্কতা নয়, অনেক বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন সাধন করে উন্নতির পথ সৃষ্টি করলো বেগম সোমরু। উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এই শক্তিময়ী রমণীর ক্ষমতা দেখে চমকিত হল। যারা স্বভাবধর্মে অনুগত, তারা আনন্দ অনুভব করলো, যারা মন্দ স্বভাবের লোক, তারা চক্রান্ত করার চেষ্টা করলো কিন্তু বেগম সোমরুর সব দিকে চোখ থাকায় তা সম্ভব হল না।

অন্তঃপুরের মধ্যে অবস্থান করে চিকের আড়ালে কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করলে কি হবে, তার দৃষ্টি সর্বদা সজাগ। সে নিজের কক্ষে বসে থাকলে কি হবে, তার সর্বদা মন পড়ে থাকতো অগণিত কর্মচারী ও সৈনিকদের আলাপ আলোচনার দিকে। গুপ্তচর ছিল অনেক। খাস কর্মচারী অপর্যাপ্ত। তারা সবার মাঝে ঘুরে বেড়িয়ে গোপনে বেগমের কাছে আলাপের সারাংশ ব্যক্ত করতো।

কত অল্পদিনের মধ্যে যে এই রাজত্বের শাসন কায়েম হল, তা চিন্তার বিষয়। বেগম যেন রাজত্ব করার জন্যেই জন্মগ্রহণ করেছিল। নর্তকী একদিন সে হয়েছিল, নাচ পেশ করে সে একদিন দিল্লীর দরবারে অগণিত অমাত্যদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল, তাকে বর্তমানে দেখে তা আর মনেই হয় না। যে হাতে নাচের মুদ্রা তুলে ধরতো, সেই হাতেই সে সরদানার স্বাধীন রাজ্যের শাসনদণ্ড তুলে নিয়েছিল।

বেগম সোমরু নিজেই তার শক্তি দেখে চমকিত হল। এই রাজতখতে নিজে বসে এত সহজে সব কিছু সুষ্ঠু পরিচালনা করতে পারবে, এ যেন তার কাছে অকল্পনা ছিল। তাই সোমরু মারা যেতে সে অতো ভেঙে পড়েছিল।

কিন্তু বর্তমানে সে ভাব তার অন্তর্হিত। সে এখন বহুমানুষের ভাগ্য বিধাত্রী। অগণিত পুরুষের শক্তিকে সে অবনমিত করে একটি স্ত্রীলোকের শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আরো ক্ষুরধার বুদ্ধি তার দরকার। সমস্ত দুনিয়াতে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের এক রমণী ক্ষমতা প্রচারিত করবে। লোকে স্তম্ভিত হয়ে ভাববে, দুনিয়াতে রমণী শুধু একটি প্রয়োজন চরিতার্থের জন্যে সৃষ্টি হয় নি, তাদের ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা মেলে দিলে দুনিয়া স্তম্ভিত হয়ে যায়।

সেই অভিপ্রায়কেই মনে ধারণ করে বেগম সোমরু আরো শক্তি আহরণের জন্যে চিন্তা করতে লাগলো। বিশ্রাম ভুলে গেল, আরামের সুখশয্যা পরিত্যক্ত হল। সামান্য একটু রাত্রিকালে নিদ্রা গিয়ে বাকী সময় শুধু রাজ্যের জন্যেই ভেবে চললো। তারপর যেমন বিরাম নেই, কর্মচারীদেরও তেমনি বিশ্রাম নেই। তাদের পরিশ্রম করতে হল অপরিসীম।

অধিক রাজস্ব যাতে রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়, তার জন্যে প্রজাদের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করলো। পরগণাগুলি ভাগ করে প্রতিটির জন্যে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হল। তারা পরগণার সমস্ত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করবে, প্রজাদের অভাব অভিযোগ জ্ঞাত হয়ে প্রাসাদে বেগমের কাছে পাঠাবে, বেগম তার ভালোমন্দ বিচার করবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হতে হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে খাজনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। যারা খাজনা না দিয়ে নানা ওজর আপত্তি দেখাতো, তারা আর তা করতে পারলো না। প্রথমে সুবাদারের রক্তচক্ষু, তারপর বেগমর শাসন। অন্যায়ের ক্ষমা নেই। বেয়াদপির দণ্ড বড় চরম। বিচার বিভাগেও বেগম সোমরু অদ্ভুত কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলো। অন্তঃপুরের পরিচারিকা থেকে শুরু করে পরগণার প্রজাদের পর্যন্ত একই বিচারের কাঠগড়ায় উপস্থিত করলো। পরিচারিকার কার্যে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্যে কোন চরমদণ্ড নেই কিন্তু শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত করলে দণ্ড আছে, আর সে দণ্ড বড় সাংঘাতিক।

কর্মচারীর বিশ্বাসঘাতকতায় অন্য শাস্তি নির্দিষ্ট ছিল। অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির ব্যবস্থা। শরীরের পোষাক উন্মোচিত করে বেত্রাঘাত। অনাহারে বদ্ধকক্ষে তিনদিন অতিবাহিত। মস্তক মুণ্ডন করে গর্দভের পিঠে শহর প্রদক্ষিণ। এসব লঘু অপরাধের জন্যে ছিল গুরুতর শাস্তি।

বেগম সোমরু যেন সব ক্ষেত্রেই সুচিন্তিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে সেখানেও অভিনবত্ব প্রকাশ। মোগল বাদশাহদের মত মৃতুদণ্ডের নানান পরিকল্পনা সৃষ্টি করেছিল বেগম সোমরু। উন্মুক্ত ক্ষেত্রে কৌতুহলী দর্শকের সামনে ক্ষিপ্ত হস্তীকে ছেড়ে দেওয়া হত। তারপর সেই ঘেরা ক্ষেত্রে অপরাধীকে রাখা হত। ক্ষিপ্ত হস্তী সেই অপরাধীকে শুঁড়ে তুলে ভূমিতে আছাড় মারতো। বিষাক্ত সর্প দিয়েও একরকম মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ হত। গুমঘরে সাতটি বিষাক্ত সর্প রেখে দেওয়া হত, তারপর অপরাধীকে তার মধ্যে পাঠানো হত। মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যে নীলবর্ণ একটি দেহ মাটিতে পডে যন্ত্রণায় ছটফট করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো। তবে সেই মৃত্যুদণ্ডর চেয়ে ভিন্ন প্রক্রিয়ায় মৃতুদণ্ড দিতে বেগম বেশী উৎসাহী ছিল। মৃত্যুর মত কঠে'র দণ্ড দিলে অপরাধীকে চরম দণ্ড দেওয়া হয় না। মৃত্যুর আগে তাকে এমন এক দণ্ড দিতে হবে যে দণ্ড অসহনীয় এক যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে অপরাধীকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেবে। তবেই সার্থক হবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া।

এই ,মনোভিপ্রায় অনুযায়ী বেগম সোমরু বিচার বিভাগ পরিচালিত করলো। এমনিভাবে সমস্ত বিভাগের কাজ নিয়মাধীনে আনয়ন করে সম্রাজ্ঞী তার শাসনদণ্ড সুপ্রতিষ্ঠিত করলো।

শুধু কঠোর নিয়মই সে প্রবর্তন করলো না, রাজসৈনিকদের মানসিক স্ফূর্তি বজায় রাখার জন্যে ব্যবস্থা করলো। নাচ, গান, হল্লা, উৎসব কোন কিছু প্রাসাদ অভ্যন্তরে কম হল না। বেগম নিজে কোন উৎসব ও আনন্দে যোগদান করতো না বটে কিন্তু কর্মচারীদের মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় বজায় রেখেছিল। এমন কি কর্মচারীদের বলতো, পরিশ্রমের পর এই সব আনন্দ উপকরণ মনের প্রসার বাড়ায়। সুতরাং আপনারা মাত্রাজ্ঞান ঠিক রেখে আনন্দ করবেন। বিশুদ্ধ আনন্দের মধ্যে মনের উদারতাই প্রকাশ হয়, আর কর্মে প্রেরণা যোগায়। এমন কি সরাব পানেও ঢালাও হুকুম দিয়েছিল।

কিন্তু বেগম এসব কিছু করতো না। তার কোন আনন্দ নেই। এমন কি তার হাসির মধ্যেও কোন উল্লাস নেই। সে শুভ্রবর্ণের হিন্দুস্থানী পোষাক পরে শুদ্ধ মনের জীবন ব্যয়িত করতো, আর রাজকর্মে সমস্ত সময় ব্যয় করে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রাখতো।

ইউরোপীয় সৈনিকরাই তার যথেষ্ট প্রিয় ছিল, ইউরোপীয় সৈনিকদের সমরশিক্ষায় এমন শক্তিশালী করেছিল, যা প্রশংসার যোগ্য। তাই ইউরোপীয়দের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশী। দেশীয় সৈনিকেরা সেইজন্যে ঈর্ষান্বিত হত। কিন্তু ঈর্ষা প্রকাশ করলে কি হবে বেগম তাদের আচরণে প্রীত নয়। ইউরোপীয়দের অনেক গুণ থাকার জন্যে তাদের সে ভালবাসতো। যদি কখনও যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, তাহলে ইউরোপীয় সৈনিকরাই তাকে সাহায্য করবে।

সেইজন্যে সে সৈনিকদের মধ্যে দুটি আইন বলবৎ করেছিল। আর লঘু আইন প্রবর্তন করেছিল ইউরোপীয়দের জন্যে। উচ্চপদস্থ ইউরোপীয়ানরা অনেক সুবিধা

ভোগ করতো। তাদের পরিবারের জন্যে মূল্যবান আসবাব, যোগ্য বাসস্থান, উন্নত জীবন যাপনের জন্যে রাজসরকারের দৃষ্টি সর্বদা নিয়োজিত থাকতো। তাদের মধ্যে আনন্দটাও ছিল একটু বেআব্রু ধরনের। রাজ্ঞীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তারা স্বেচ্ছাচারী হত। তবুও ক্ষমা তাদের জন্যে ছিল। বেগম নিজের স্বার্থের জন্যে এসব সহ্য করতো।

একদিন সন্ধ্যার পূর্বমুহূর্তে প্রাসাদের অন্যাংশে ইউরোপীয়দের এক নৃত্যগীত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। নারী পুরুষের মিলিত কামোন্মত্ত উল্লাস যেন সমস্ত শালীনতাকে লুপ্ত করেছিল। ভুলে গিয়েছিল তারা বেগম সোমরুর রাজত্বে বাস করছে। একটি আনন্দহীনা রমণী তাদের প্রধানা। তার বিরাগের কারণ হলে দণ্ড সুনিশ্চিত।

সব ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্য সংগীতের জোয়ারে বলনৃত্যে তারা বিভোর হয়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে সরাবের মাতোয়ারা। সে সময় ভারতবর্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যবিস্তারে ইংরেজদের মধ্যে আনন্দটা যেন মাত্রাজ্ঞান শূন্য হয়েছিল। শুধু ইংরেজ কেন? ফরাসী, জার্মানী, পর্তুগীজ, আরমেনিয়ান বিভিন্ন ইউরোপীয়ানরা যেন সাহসী হয়ে উঠেছিল। 'ভারতবর্ষে আমি আগন্তুক নয়, ভারতবর্ষের আমি নাগরিক, ভারতবর্ষের আমি সম্রাট।' এই গর্ববোধ প্রত্যেক ইউরোপীয়দের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল। তাই তাদের সাহসও আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

এসব কথা অবশ্য বেগম সোমরু জানে। রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে বাইরের অবস্থা লক্ষ্য করা রাজত্বের ধর্ম। আর সেইজন্যেই ভীত হয়ে বেগম ইউরোপীয়দের তোয়াজ করে চলেছিল। ইউরোপীয়দের স্বভাব ভাল, তাদের নিয়মের মধ্যে রাখলে তারা অনুগত হয়। এই সময় কতিপয় ইউরোপীয়দের তার সেনাবাহিনীতে রাখলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাবে। এমন কি ইংরেজদের আক্রমণও বিধ্বস্ত করা যাবে। আর ইংরেজ ছাড়া অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশীয় ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত, তাদের নিয়ে দল গঠনে সুবিধা আছে। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করবে।

এসব কথাও হয়তো বেগম ভাবতো না। ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য সে উপলব্ধি করেছিল সোমরু জীবিত থাকাকালীন তাদের কর্মনৈপুণ্য দেখে। সোমরু যে যুদ্ধে জয়ী হত সে এই সৈনিকদের জন্যে। দেশীয় সৈনিক তার দলে ছিল কিন্তু তাদের ওপর কোন গুরুত্ব দিত না। সেই দেখেই বেগম স্বামীর নীতি অনুসরণ করেছিল, ইউরোপীয়দের ওপর সবচেয়ে আস্থা স্থাপন করেছিল। আর ইউরোপীয়রাই একদিন তাকে সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করেছিল বলে সে কৃতজ্ঞ।

তবু সেদিনের সেই সন্ধ্যাকালের উল্লাস মুহূর্তটি সে সহ্য করতে পারলো না। কেমন যেন তার দেহের শিরা-উপশিরায় অনিয়মের বহ্নিপ্রবাহ শুরু হল। নিজের আনন্দ মুহূর্তগুলি একদিন বিদায় নিয়েছিল। সে ইচ্ছে করেই সোমরুর মৃত্যুর পর আনন্দ পরিত্যাগ করেছিল। আনন্দের মধ্যে আছে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত, প্রবৃত্তি জাগ্রত করার নেশা। নৃত্যগীতের মধ্যে অনাবিল আনন্দের চেয়ে কামনা উচাটনের প্রয়াসই বেশী। সে বিধবা। তার স্বামী নেই। সে ঐ সব আনন্দে আর যোগদান করতে পারে না

বলেই সব আনন্দ ত্যাগ করেছিল। এমনি কি কখনও মূল্যবান বসন পরিধান করতো না। অলঙ্কারাদি পরতো না। ফুলের ব্যবহারও ত্যাগ করেছিল। আতরের সুবাস তার ত্রিসীমানায় থাকতো না।

এইসব কৃচ্ছ্রসাধন কি জন্যে? শুধু নিজের মনকে রজ্জুবদ্ধ করে রাখার জন্যে। কিন্তু তাই বলে সে আনন্দকে আইনানুগ করে নি। তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভোগ-লালসা শেষ হয়েছে বলে তার কর্মচারীদের শেষ হবে এই মনোভিপ্রায় যদি গ্রহণ করে তাহলে রাজ্য আর বেশীদিন টিকবে না। সেইজন্যে সে নির্মল আনন্দ উপভোগের জন্যে কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিল। তবে সব সময় আনন্দের মধ্যে নির্মলতাই বেশী থাকবে, এও সে আশা করতো না। এ সম্বন্ধে সে একটু অন্যমনস্কতাই প্রকাশ করতো।

কিন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি নেমে এলে, নিস্তব্ধ প্রাসাদের মাঝে নৃত্যগীতের ধ্বনি প্রচারিত হলে, কিছুদিন ধরে যেন তার সব সংযম অপসারিত হচ্ছিল। কর্মে ব্যাপৃত গভীর মন হঠাৎ সব সমস্যা ত্যাগ করে সেই সংগীতের দিকে মনপ্রাণ সমর্পণ করতে লাগলো। নিজের অন্তঃপুরের মর্মর দেয়ালের গাম্ভীর্য ভেদ করেও সেই বাদ্যঝঙ্কার ও কণ্ঠসংগীতের নানান অভিব্যক্তি তার মনে দোলা দিলো। জলের একাংশে যেমন দোলা দিলে সমস্ত জলটি ঢেউয়ে ঢেউয়ে আলোড়িত হয়, তেমনি বেগমের সমস্ত মন, প্রাণ, দেহ কেমন যেন সংযম হারাতে লাগলো।

সে ভীত হল। একি পরিবর্তন আবার শুরু হয়েছে তার মধ্যে? জীবনের একদিককে সে ত্যাগ করেছে, অন্যদিককে জয় করেছিল, বলে। কিন্তু আজ সেই অবহেলিত দিকটিই আবার তাকে উৎপীড়িত করতে লাগলো।

উৎপীড়ন সীমা ছাড়ালো বর্তমানের সন্ধ্যায়। তার প্রাসাদের অন্যাংশে উচ্ছল আনন্দস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, আর সে এই রাজ্যের কর্ত্রী হয়ে স্বল্প আলোর বর্তিকার সামনে বসে বসে রাজকর্ম করে চলেছে। কি প্রয়োজন এই পরিশ্রম করার? কে আছে তার? কার জন্যে বিরাট দৌলত? তার আপন বলে তো কেউ নেই! সোমরুর পুত্র জাফর দিন দিন বড় হয়ে উঠছে। সে ভোগ করবে এই সব সম্পত্তি। জাফরের জন্যে এই কষ্ট স্বীকার কেন সে করছে? একদিন নিজে সন্তানের জন্যে উতলা হয়ে উঠেছিল কিন্তু মেলে নি সন্তান, মিললে হয়তো আজ তার জন্যেই কিছু করতো। সে সম্ভাবনা চিরতরে শেষ হয়ে গেছে। সোমরু বিদায় নিয়ে তাকে সব সমস্যা থেকে রেহাই দিয়ে গেছে। আর সন্তানের জন্যেও দুশ্চিন্তা নেই, ভোগের জন্যেও নেই কোন উন্মাদনা। সমুদ্রের জল ঢেউহীন হয়ে শান্ত আকার ধারণ করেছে।

কিন্তু হঠাৎ সেই শান্ত সমুদ্রে কেন আবার ঢেউয়ের উন্মাদনা জেগে উঠছে? কেন আবার বুকের মধ্যে আলোড়ন জাগছে? সংগীতময় হয়ে উঠতে চাইছে সমস্ত হৃদয়টি।

বেগম কেমন যেন মনের এক বিরাট অস্বোয়াস্তিতে সমস্ত কক্ষময় ছটফট করে বেড়ালো। অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের দর্পণে হঠাৎ নিজের বর্তমান প্রতিবিম্ব দেখতে পেল, দেখে সে শিউরে উঠলো। সে তখন সম্রাজ্ঞী ছিল না, সরদানার শাসন কর্ত্রীর আকৃতি তার নয়, সে অভিসারের বসন পরবার জন্যে তার দেহমন আগ্রহী।

ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করবার জন্যে রাজতখত থেকে নেমে যেতে চাইলো।

হঠাৎ নিজেকে চাবুক দ্বারা আঘাত করলো। ক্ষতবিক্ষত করে তার এই মনের বেয়াদপি রোধ করে দিতে চাইলো।

কিন্তু মন বিদ্রোহী। হাজার চাবুকেও সে তার প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করলো না।

তখন রাজ্ঞী বিপদে পড়লো। কি করবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ চিৎকার করে কয়েকজন বাঁদীকে ডাকলো। তারা এসে হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়ালে সে দেয়ালে রক্ষিত একখানি চাবুক টেনে নিয়ে সেই বাঁদীগুলির দেহে সপাসপ চাবুক চালালো। উল্লাসে আত্মহারা হয়ে উঠলো। বাঁদীগুলির কামিজ ফেটে চর্মের ওপর রক্তকণা ফুটলে, তারা ডুকরে কেঁদে উঠলে কেমন যেন আনন্দিত হল। কেমন যেন প্রতিহিংসা। কেন প্রতিহিংসা, কার ওপর প্রতিহিংসা, তার কোন অর্থ নেই, শুধু প্রতিহিংসা। যেন তার মাশুকদের এই বাঁদীরা অধিকার করেছিল, এমনিভাবে তাদের শাস্তি আরোপিত করলো। তারপর কুপিতস্বরে গর্জন করে তাদের চলে যেতে বললো।

কিন্তু তবু শান্তি কই ?

তখনও সেই প্রাসাদের অন্যাংশ থেকে ইউরোপীয়দের উল্লাসনৃত্য, বাদ্যধ্বনি ভেসে আসছিল। ড্রাম বাজছে, ভায়োলিন বাজছে, আরো অন্যান্য জোরালো বাজনা। বাজনার সাথে বল করতে ইচ্ছে করে। পুরুষের বুকে মাথা দিয়ে হাতে হাত দিয়ে, উষ্ণসান্নিধ্য নিয়ে এক সাথে নৃত্য। সোমরু নিজে বহুবার বলে যোগদান করেছে। কতবার বলেছে, তার সাথে যোগদান করতে কিন্তু মুন্না করে নি। করে নি তার কোন অবশ্য কারণ নেই। লজ্জা। সে এদেশের মেয়ে। সবার সামনে প্রিয়জনের হাত ধরে নৃত্য করতে পারে না। হোক্ না স্বামী তার বিদেশী। বিদেশীকে বিয়ে করেছে বলে একেবারে নিজের দেশের আচারনীতি ত্যাগ করবে, এর কোন অর্থ নেই। সবটাই খুশির ওপর নির্ভর করে। তার মত এদেশী অনেক মেয়েই বিদেশীকে শাদী করেছে, বলও করে ড্রিঙ্কও করে, অখাদ্য ভক্ষণ করে বেলেল্লাপনাও করে। এসব তার রুচির বহির্ভূত। সেইজন্যে সে পাশ্চাত্য আচরণ কিছুই রপ্ত করে নি।

আজ কিন্তু হঠাৎ তার সেই সব ভাল লেগে গেল। পাশ্চাত্য বাদ্যের ধ্বনিতে সে নিজেই বলের মত দুচার বার ঘুরপাক খেয়ে নিল। ড্রিঙ্ক করতে ইচ্ছে যাচ্ছে। বিয়ার, শেরি, শ্যাম্পেন তার রাজভাণ্ডারে অপর্যাপ্ত। ইউরোপীয়দের পানীয়ের জন্যে তা দেওয়া হয়। সোমরু ড্রিঙ্ক করতো। ড্রিঙ্ক যখন করতো, তখন তাকে কেমন যেন ভয়ঙ্কর দেখাতো ? মুখখানি রক্তবর্ণ হয়ে উঠতো। মুন্নার তার কাছে যেতে তখন যেন ভয় করতো। আর গেলেও সোমরু এমনভাবে তাকে বলপূর্বক আকর্ষণ করতো যা সিংহের সঙ্গেই তুলনীয়। যেন সিংহ তাঁর সমস্ত শক্তি সংযোজিত করে তাকে পিষে মেরে ফেলতে চায়।

মুন্না ভাবতো, মানুষ ড্রিঙ্ক করে কি আনন্দ পায় ? প্রচণ্ড উন্মত্ততা সৃষ্টি হয় বটে। রক্ত আরো উত্তপ্ত হয়ে কি যেন এক দুঃসাহসিক হতে চায়, তারপর—। তারপর

আ'দম প্রবৃত্তির নোকর হয়ে কেমন যেন নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলে। শুধু এইটুকুর জন্যেই এত উত্তপ্ত পানীয় গ্রহণ করা ? পরিবর্তন কি কিছু হয় না ? যে ইচ্ছাকে সে কিছুতে প্রশ্রয় দিতে চায় না, অথচ প্রবৃত্তি হার স্বীকার করতে চায় না,' তখন পানীয়ের দ্বারা সেই প্রবৃত্তিকে ভিন্নগামী করতে পারবে না ?

বেগম কোনদিন মদ্যপান করে নি। হঠাৎ আজ তার পানীয় গ্রহণের আসক্তি জাগলো। পানীয় সে আজ গ্রহণ করবে যদি প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারে। পরীক্ষামূলকভাবে পানীয় গ্রহণ। কৃতকার্য হলে সে প্রচুর পানীয় গ্রহণ করে মাতাল হয়ে শয্যায় পড়ে থাকবে। বাহ্যজ্ঞান হারা হলে আর কোন চিন্তা জাগবে না। প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়ে তাকে পথভ্রষ্টা করবে না।

এই ভেবে সে হঠাৎ চিৎকার করে পরিচারিকাকে আহ্বান করলো, সে এলে বললো,—ড্রিঙ্ক লে আও। জোরালো পানীয়।

পরিচারিকা হতবুদ্ধি হল কিন্তু বেগমের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে শঙ্কিত পদক্ষেপে সরে পড়লো। অনতিবিলম্বে স্বর্ণভৃঙ্গার পূর্ণ পানীয় এল। বেগম পাত্রের পর পাত্র গলায় ঢেলে দিতে লাগলো। জলীয় পদার্থ জ্বলন শক্তি নিয়ে যেন বেগমের বুকের মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

তবু সে তা পান করে চললো।

সে রাত্রি তার এমনি করে বিদায় নিয়েছিল। পাত্রের পর পাত্র জলীয় পদার্থ মুখে ঢেলে যখন তার চেতনা লুপ্ত হয়েছিল, যখন সে আর পাত্র তুলে মুখে ঢালতে পারছিল না, তখন রেহাই দিয়ে সেইখানে ঢলে পড়েছিল, তারপরে আর তার কোন খেয়াল নেই।

খেয়াল হল পরদিন প্রভাতের আলো গবাক্ষ দিয়ে এসে মুখের ওপর পড়তে। সে জাগ্রত হয়ে গতরাত্রের কথা ভেবে বিস্মিত হল। শরীরে দারুণ অবসাদ। কেমন যেন যন্ত্রণা। বাহুর শক্তি অপসারিত। কোন অঙ্গই তার মজবুত নয়, কেমন যেন সব শিথিল।

গতরাত্রে সে মদ্যপান করেছিল। নেশা করে প্রবৃত্তিকে দমন করেছিল। হঠাৎ সে সময় নেশা না করলে সে বিপদ ডেকে নিয়ে আসতো। সে এখন এ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। তার এতটুকু বেচাল অবস্থা দেখলে কর্মচারীরা সুযোগ গ্রহণ করবে। সেইজন্যে তার সাবধানে পথ চলা দরকার। অনেক সাবধানে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। এই কথা ভেবেই তাকে মদ্য পান করে প্রবৃত্তিকে চাবুক চালাতে হয়েছে। কৃতার্থ সে হয়েছে। পানীয় তাকে বন্ধুর মত সঙ্গ দিয়েছে।

এবার সে প্রত্যহ রাত্রে পানীয় গ্রহণ করবে। রাজকার্যের পর মনের মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হলে সে পানীয় দিয়ে ভরিয়ে রাখবে। মদ্য পান করে গত রাত্রের মত সে প্রত্যহ রাত্রে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকবে। কেউ জানবে না, কাউকে সে বিব্রত করবে না, একান্ত নির্জনে নিরুদ্বেগে এই সহনশক্তি সে আয়ত্ত করবে। যতদিন মনের প্রবৃত্তি এমনি শয়তান হতে চাইবে সে ওষুধের মত এই পানীয় গ্রহণ করবে জলীয় পদার্থ যখন গলা দিয়ে বুকের মধ্যে যায় তখন যেন সব জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। সহ্যাতীত হয়ে ওঠে কিন্তু গলাধঃকরণ হবার পর অদ্ভুত মাদকতা। কেমন যেন ঝিম এসে সারা শরীর একটু একটু করে আমেজের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। তারপর পূর্ণ হয়ে গেলে চৈতন্য লুপ্ত হয়। গভীর ঘুমের এক ছায়া এসে চোখ দুটিতে জড়িয়ে যায়। তারপর আর কিছু মনে থাকে না।

বেশ সুন্দর অনুভূতি। যারা পানীয় গ্রহণ করে তারা বোধহয় এইজন্যে করে। এর সুন্দর আশ্রয়ে অনেক নতুন উপলব্ধি বোধ জাগ্রত হয়!

তারপর বেগম সোমরুর মনে পড়লো, গতরাত্রের আর এক ঘটনা। সে তার কটি বাঁদীকে অহেতুক বেত্রাঘাত করেছিল। কেন করেছিল সে জানে না? তবে নিরপরাধিনীর প্রতি এই আঘাতে তার মন আপ্লুত হল। সে সেই বাঁদীদের ডাকতে পাঠালো, তারা এলে সে তাদের যথোচিত পুরস্কৃত করলো। বেগমের অপরাধ ক্ষমা করার জন্যে তাদের অনুরোধ করলো।

মনটি শান্ত হবার পর সে প্রত্যহের সব কাজ সাঙ্গ করলো। রাজকর্ম করার সময় সে অন্য মানুষ। তখন তার গাম্ভীর্য দেখে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত ভীত। একটি রমণীর কাছে বড় বড় সাহসী পুরুষেরা যে কিরকম ভীত ত্রস্ত হয়ে থাকতো, তা না দেখলে বোঝা যায় না।

রাজকর্ম শেষ হবার পর হঠাৎ তার সোমরুর কথা মনে পড়লো। সোমরুর জন্যে সে কিছু করে নি। অথচ এই রাজত্ব একমাত্র সে লাভ করেছে তারই জন্যে। আগ্রায় একান্ত অবহেলিতভাবে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। এমন কি একজন বড় যোদ্ধা বলে তাকে সম্মান দেওয়া হয় নি। বাদশাহ শাহ আলম সম্মান দেওয়ার কথা মনে করেন নি কিন্তু সে এতদিন বিস্মৃত হয়ে থাকলো কেমন করে? সোমরু তার স্বামী, একথা তো সে অস্বীকার করতে পারবে না। সমস্ত ভারতবাসী জানে তাদের দুজনের এই সম্বন্ধ।

তাই বেগম আর কালবিলম্ব না করে সালুর, পাওলি, বাওরস, ইতামস, দুদ্রেনেক প্রভৃতি ইউরোপীয় সেনাধ্যক্ষকে একদল সৈন্য নিয়ে তার সঙ্গে যাবার জন্যে আদেশ দিল। আপাতত আগ্রা পর্যন্ত তাদের যাত্রা, তারপর কোথায় যাবে ঠিক নেই। প্রথমে আগ্রায় গিয়ে সোমরুকে যথোচিত সম্মান জ্ঞাপন করে সম্মানীয় ভূমিতে কবর স্থানান্তরিত করবে। সেনাধ্যক্ষদেরও সে তার মত ব্যক্ত করলো। তারা উৎসাহিত হল।

বেগম শিবিকার মাঝে অবস্থান করলো, সামনে, পিছনে ঘোড়সওয়ার সৈন্যবাহিনী।

সৈন্যরা সকলেই সশস্ত্র। এই প্রথম সম্রাজ্ঞী হবার পর বেগম তার সৈন্য নিয়ে বাহির হল।

বেগম শিবিকার মাঝে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও সে সশস্ত্র ছিল। সব সময়ে মনে হত তার অনেক শত্রু। এমন কি বাদশাহ শাহ আলম তার প্রিয় হলেও শত্রু। রাজনীতির চক্রান্তে পড়ে কেউ কারো হৃদয়ের সম্বন্ধ অটুট রাখতে পারে না। তাই বাদশাহ যা করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে দোষণীয় হলেও অপরাধ নয়। সোমরু প্রাণ হারিয়েছে রাজনীতির চক্রান্তে পড়ে। তবু বাদশাহকে বেগম ক্ষমা করতে পারেন নি বলে সে তার সমস্ত আকর্ষণ ত্যাগ করেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে যে বাদশাহের সংবাদ আসতো না তা নয়। বেগম উৎসুক না হলেও কানে এসে পৌঁছতো। বাদশাহ নিজের সাম্রাজ্য আর রক্ষা করতে না পেরে মারাঠাদের সাহায্য নিয়েছেন। মাধোজী সিন্ধিয়া এখন দিল্লীর সর্বেসর্বা। দিল্লীশ্বর মারাঠাদের পেশোয়াকে প্রতিনিধি করে মাধোজী সিন্ধিয়াকে সহকারী প্রতিনিধি করেছেন। নিজের প্রতিপত্তি জলাঞ্জলি দিয়ে মারাঠাদের আশ্রয়ই একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। ইংরেজরা দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছে। যে কোন সময়ে দিল্লী অধিকার করে তাঁর অস্তিত্ব বিলীন করে দিতে পারে। তারপর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ। প্রদেশের শাসনকর্তারা মাথা তুলছে। বিদ্রোহের বহ্নি চতুর্দিকে। বৃদ্ধ শাহ আলমের কিছুই নেই, কি দিয়ে তিনি তাদের ঠেকাবেন। অর্থ নেই, সামর্থ্য নেই, আছে শুধু প্রস্তরের সিংহাসনখানা। আর কিছু মূল্যবান রত্ন। তা দিয়ে কি শত্রুকে পরাজিত করা যায়? শত্রু তাড়াতে গেলে চাই অপর্যাপ্ত সৈন্য। যা সৈন্য তার আছে, তা সেনাপতির হেফাজতে। সেনাপতিই এখন রক্তচক্ষু তুলে শাসাচ্ছে।

বেগম সব শুনেছে কিন্তু বাদশাহকে বাঁচাবার জন্যে কোন উৎসাহ প্রকাশ করে নি। কেন বাঁচাবে? সোমরুকে সরিয়ে তিনি যে আহাম্মুকের পরিচয় দিয়েছেন, তারপর তাকে কোন সাহায্যই করা উচিত নয়। বাদশাহ যত প্রিয় হোন্, তবু মুন্নার তিনি শত্রু। অবশ্য সরদানার শাসনকর্ত্রীর এমন শক্তি ছিল না, যে শক্তি দিয়ে সে দিল্লীর বাদশাহকে বাঁচাতে পারে। আর মাধোজী সিন্ধিয়ার মত ধূর্ত লোককে পরাজিত করার শক্তিও তার ছিল না। মারাঠার শক্তি অস্তমিত হলেও তবু মাধোজী সিন্ধিয়ার জন্যে জাগ্রত হয়েছে। তিনি এখন দিল্লীর বাদশাহের সহকারী প্রতিনিধি হয়ে মোগল অধিকৃত সমস্ত স্থান অধিকার করে মারাঠা রাজ্যের সীমা বাড়াচ্ছেন। আর ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে বেশ দৌত্যকার্য চালিয়ে চলেছেন।

সব জানা সত্ত্বেও কিছু করতে পারেন নি বেগম। তার ক্ষমতার এখানে অভাব। একবার পরামর্শদাতাদের পরামর্শ নিয়েছিল, তারা উৎসাহ দিয়েছিল, তবু সে উৎসাহ বোধ করে নি। তার রাজ্য স্বাধীন। সে কেন স্বাধীনতা বিনষ্ট করে শান্তি বিঘ্নিত করবে। এই ভেবেই সে বাদশাহের নিরুপায় অবস্থা অবগত হয়েও চুপ করে গিয়েছিল।

আজও সেই কথা সে শিবিকার মাঝে বসে ভাবলো। পাশে কিশোর জাফর

ইয়াব। সে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছে। সোমরুর উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করার দায়িত্ব তার। বাহাবেগম এখন উন্মাদ। সে পুত্রের জীবন রক্ষা করবে কেমন করে ? সেইজন্তে প্রাসাদে একা না রেখে বেগম তাকে সঙ্গে নিয়েছে।

অগণিত সৈন্ত সামনে ও পিছনে। মাঝখানে মোগলদের মত কারুকার্যময় এক শিবিকা। শিবিকার গাত্রের রূপোলী ও সোনালী নক্সাগুলি সূর্যের আলোয় জ্বলছে। শিবিকা বাহকেরা সৈন্যদের অশ্বের সঙ্গে সমতা রেখে ছুটছে।

শিবিকার অভ্যন্তরও কারুকার্যময়। বেগম সোমরুর রুচিজ্ঞানের পরিচয় বহন করছে। নিজেও যে পোষাক পরিধান করেছে তা বেশ জমকালো। অনেকদিনের পর সে রঙিন বসনভূষণ স্পর্শ করেছে। আগের সেই শুভ্র বসন নেই। রমণীর শোভা আভরণ, নানা ধরণের হীরা, চুনি, পান্নার অলঙ্কার পরেছে। মাথার অবগুণ্ঠন সে কখনও মোচন করে নি, সোমরুর সাথে শাদীর পূর্বেও হিন্দুস্থানী রীতি অনুযায়ী বয়স্ক মেয়েদের মাথায় অবগুণ্ঠন থাকে, সেই রীতি মেনে এসেছে। রমণীর সম্ভ্রম এই অবগুণ্ঠন সে সব সময়ে বজায় রেখে এসেছে। আজ তো কথাই নেই। আজ যেন তার আরো সম্মানকে রক্ষা করার জন্তে সর্বদা সতর্কদৃষ্টি। এমন কি মুখের সামনে থাকে একটি জালের আচ্ছাদন।

বেগম নিশ্চয় অদ্ভুত সুন্দরী। বেগমের চোখ দুটিতে কেমন যেন গভীর আকর্ষণের স্বপ্নোচ্ছ্বাস। বেগমের ভ্রূ দুটিতে আছে কামনার মদিরতা। বেগমের দুই গণ্ডে কাশ্মিরী আপেলের বর্ণ। বেগম হাসে না, হাসলে মুক্তো ঝরে পড়তো।

এই সব নানান আলোচনা হত। কৌতূহলের সীমা নেই কিন্তু কল্পনাই বেশী গুজব ছড়াতো। যারা দেখেছে তাদের কথাও এই কৌতূহলীরা বিশ্বাস করতো না। বেগমের কানেও এসব কথা যেত ; আর সে মনে মনে হাসতো। বয়স তার দিন দিন এগিয়ে চলেছে। দেহের জৌলুসও ম্লান হয়ে আসছে। তাছাড়া জৌলুসের আর দরকার কি ? জৌলুস যে প্রয়োজনে দরকার, সে প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। এখন সে রমণীর অবয়বে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে চলেছে।

তবু এই অবরোধ কেন ? নিজেকে সাবধানতার মধ্যে রাখবার জন্তে। তার স্পৃহা নয় চলে গেছে কিন্তু অপরের স্পৃহা তো যায় নি। সে রমণী, এই সত্তা সে লুপ্ত করবে কেমন করে ? তাই অবগুণ্ঠন, তাই মুখের ওপর জালের ঘেরাটোপ, তাই চিকের অবরোধ দিয়ে সে অপরের কৌতূহল থেকে নিজেকে রক্ষা করে।

আজও শিবিকার মধ্যে যখন প্রবেশ করেছিল, তখন মুখের সামনে কৃষ্ণবর্ণ জালের আচ্ছাদন দিতে ভোলে নি। শিবিকার দরজা বন্ধ করেই সে চলেছিল, সামনে শুধু পুরুষ একজন, সে জাফর ইয়াব। জাফরের সামনে তার কোন লজ্জা নেই, পুত্রের কাছে কি মায়ের কোন লজ্জা থাকে।

লজ্জা আর তিনজনের কাছেও ছিল না। সে হল, সালুর, পাওলি ও বাওরস। এদের কাছে নিজেকে মেলে দিতে হয়েছে। কারণ এরা না থাকলে তার রাজত্ব চলবে না। এদের শক্তির কাছে তাই সে অবনত। পাওলি বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত।

সেই থেকে সরদানায় এসে আছে। এই জার্মাণ ব্যক্তিটি সবসময় পরামর্শ দিয়ে বেগমকে সাহায্য ক'রে, তাই এর সামনে বেগম নিজেকে আর ভিন্ন করে রাখতে পারে নি। সালুর সমস্ত ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। তাকেও বেগম যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। সালুর নিজের পরিবার নিয়ে প্রাসাদে বাস করে। নির্ভীক ব্যক্তি, রণকুশলতায় অদ্বিতীয়। আর একজন সে বাওরস। তবে বাওরসের সম্বন্ধে বেগমের একটু দুশ্চিন্তা আছে। এমনি সে রাজসরকারের একজন একনিষ্ঠ বন্ধু, বিশ্বাসী কিন্তু প্রচুর মদ্য পান করলে তার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। বাওরসের সামনেও সে অবরোধ ছাড়াই বের হত। একদিন কি প্রয়োজনে যেন বাওরসকে বেগম ডাকতে পাঠিয়েছেন। সে সময় বাওরস প্রচুর মদ্যপান করেছিল। বাওরস এসে এমনভাবে বেগমের দিকে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকালো, অন্য কেউ হলে হয়তো বেগম তখনই তার শাস্তির ব্যবস্থা করতো। কিন্তু বাওরস বলেই তা পারলো না। সেই থেকে বেগম বাওরসের সম্বন্ধে চিন্তিত। লোকটাকে কিছু বলা যায় না, বললে সমস্ত ইউরোপীয়রা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে., অথচ তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে বেগম অনেক চিন্তা করেছে ; কিন্তু তা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয়নি।

বেগম শিবিকার ছোট্ট গবাক্ষ দিয়ে চোখ লাগিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছিল। হঠাৎ কোটানা গ্রামের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে শিবিকা থামাতে বললো। এই গ্রামে তার পিতার সমাধি আছে, সেখানে সে একবার যাবে। বহুদিন ধরে পিতৃদেবের সমাধি সংস্কারের ইচ্ছা তার ছিল, যদি এই সময় সে কাজ সমাপ্ত করা যায়, তাহলে আক্ষেপ থাকবে না।

সমর্থনের কোন প্রয়োজন নেই। বেগমের ইচ্ছাই সব। তাই তার নির্দেশ মত সকলে সেখানে অপেক্ষায় থাকলো। সালুর কয়েকজন ইউরোপীয় সিপাই নিয়ে শিবিকার অনুসরণ করলো।

আজ শুধু কোটানা নয় মীরাটের অনেক অঞ্চলেই বেগম সোমরুর জায়গীরভুক্ত। তার মধ্যে সরদানা, বরাউট, বরনাওয়া, কোটানা, বুধানা বা বুরহানা, জেওয়ার, তাপ্পাল, ধানকাউর এবং দুয়াবস্থ পাহাম্ প্রধান।

বেগমের জায়গীরের মধ্যে বরাউট, দিনাউলি, বরনাওয়া, সরদানা, জেওয়ার, ধানকাউর প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী শহর। এই শহরের বাড়ি ঘর, রাস্তাঘাট, দোকানপাট বেগমের পরিকল্পনা অনুযায়ী সজ্জিত। সোমরু বেঁচে থাকাকালীন এত উন্নতি এ সব অঞ্চলে হয় নি। বেগমের দ্বারা সেই সব সম্ভব হয়েছে।

যাইহোক, একদিন লুতুফ আলি এই কোটানা গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিল। সে গৌরব আজ অস্তমিত। আজ যারা কোটানার অধিবাসী তাদের আর লুতুফ আলিকে মনে নেই। তাই লুতুফ আলির সমাধি-সৌধ ভগ্ন হয়ে বনজঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল। এমন কি তার কন্যা আজ এই মীরাটের অধিশ্বরী হলেও কেউ তার পিতার প্রতি কোন শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে নি। এর জন্যে দায়ী কেউ নয়, দায়ী কাল। পূর্বে যদি এর জন্যে বেগম সোমরু কোন নির্দেশ প্রচার করতো, তাহলে

এই সমাধিক্ষেত্র বনজঙ্গলের আড়ালে হারিয়ে যেত না।

সরদানার শাসনকর্ত্রীর শিবিকা গ্রামে প্রবেশ করতে তাই সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

বেগম তার পিতার সমাধি-সৌধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। যত্নাভাবে ভগ্ন স্মৃতিসৌধটি বনজঙ্গলেব আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল, আর দু এক বছর গেলে তার অস্তিত্ব বিলীন হত। সেই সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে বেগম তার অতীতে ফিরে গেল। তার মা কখনও তার পিতার দুর্নাম করে নি। যদিও লোকটি অনেক অত্যাচার করেছিল তবু স্বামীর প্রতি মায়ের শ্রদ্ধা ছিল। মুন্নার শৈশবের কথা মনে নেই। পিতার মুখটিও তার মনে পড়ে না। শুধু আবছা স্মৃতি এখনও মনে ভাসে। এক বৃদ্ধ বোগশয্যায় শুয়ে তাকে কাছে ডাকতো কিন্তু সে কিছুতে তার কাছে যেত না। কেন যেন সেই বৃদ্ধকে একটুও তার ভাল লাগতো না।

তবুও আজ তার পিতার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা হল না। সে সেই সমাধি ক্ষেত্র সংস্কারের আদেশ দিল। তার জন্মভূমি কোটানার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অনেক পরিকল্পনা করলো।

এই কোটানায় কয়েকদিন তার থাকার বাসনা ছিল, জন্মভূমিতে এসে যেন কেমন নিজেকে সে সেই শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু থাকা হল না। কর্তব্যের ডাক তাকে আবার টেনে নিয়ে গেল। কোটানার বাইরে তার বিরাট বাহিনী অপেক্ষায় আছে। তাকে আগ্রায় যেতে হবে।

তাই সে পিতার সমাধি ও সমস্ত গ্রামটিকে সংস্কারের নির্দেশ দিয়ে বিরাট বাহিনীর সঙ্গে এসে মিললো।

আবার যাত্রা চললো দ্রুতগতিতে। সামনে ও পিছনে সেই বিরাট বাহিনী।

একদিন সেই বাহিনী গিয়ে পৌছলো আগ্রায়।

এখানে এসে বেগম স্বামীর কবর অবহেলিত স্থান থেকে তুলে রোমান ক্যাথলিক গির্জার প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ করলো। তারপর স্মৃতি ফলকে উল্লিখিত করলো পর্তুগীজ ভাষায় এক যশঃসমৃদ্ধ বিস্তৃত কাহিনী। স্বামীর ইচ্ছাকেই বেগম সম্মানিত করলো। 'একুই ইয়াজা ওয়াল্টার রাইনহার্ডট মোরেও এওস ফোর ডি মেয়ো নো এনো ডি।' এই পরিচয়ই উজ্জ্বল হয়ে থাকলো সল্টসবার্গ শহরের সেই মাংসবিক্রেতার পুত্রের স্মৃতি ফলকে।

বেগম এখানে এসে যেন কেমন ভেঙে পড়লো। কোটানায় গিয়ে তার মন দ্রবীভূত হয়েছিল, আগ্রায় এসে তার প্রাণের উদ্যম হারালো। স্বামীর সমাধি স্পর্শ করে যেন কেমন চঞ্চল হল। কান্নায় বুক ভেসে গেল তার। সেই শাশ্বত রমণীর মত স্বামী ছাড়া ইহজগতে রমণীর কেউ নেই, এ কথা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়লো। স্বামীর কাছে চাপাস্বরে নিজের মনের বর্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করলো,—'তুমি যখন ছিলে তোমার মূল্য বুঝি নি, আজ তুমি নেই, বুঝতে পারছি তুমি আমার কি ছিলে? আজ তোমার অভাব কি দিয়ে পুরণ করবো? আমি যে নিজেকে কিছুতে আর সংযত করতে পারছি

না। যদি কখনও অপরাধ করে থাকি, জানবে আমার দুর্বলতার জন্যই তা করেছি। রমণীর জীবনে স্বামী ছাড়া যে কোন ভিন্ন পথ নেই, সে কথা মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। তুমি আমাকে সব দিয়েছ। সম্মান, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি কিন্তু প্রতিদানে আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি নাই।'

হঠাৎ বেগম ক্যাথলিক গির্জার প্রাঙ্গণে গিয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে বলে ঘোষণা করলো। বাধা দেবার কেউ নেই বরং সঙ্গী ইউরোপীয়রা খুশি হল।

বেগমের ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করবার জন্যে এগিয়ে এলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার যাজক সম্মানীয় গ্রেগোরিও। দীক্ষা হয়ে গেল। বেগমের নাম পরিবর্তিত হল জোয়ানা নোবিলিস্। নোবিলিস শুধু যুক্ত হয়ে তাকে খৃষ্টধর্মের গৌরব দিল। বেগম শুধু নিজে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে ক্ষান্ত হল না, তার উত্তরাধিকারী জাফর ইয়াবকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করলো। তার নাম হল, ওয়ালটার ব্যালথাজার রীনহার্ড।

যাই হোক নতুন ধর্মে দীক্ষিত হয়ে বেগম কদিন আগ্রায় বাস করলো। তারপর সরদানায় ফেরার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলো। আবার বাহিনীর সাথে শিবিকায় উঠে যাত্রা শুরু করলো।

বাহিনী যখন পথ দিয়ে চলেছে এই সময় দারুণ এক দুঃসংবাদ বেগমের কানে এসে পৌছালো। আর সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী এক দূত এসে বেগমের হাতে সিন্ধিয়ার এক পত্র দিল। সিন্ধিয়া বেগমের সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। য'দ সম্ভব হয় যেন জয়নগরের রাজা প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহাকে বিপদমুক্ত করতে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করেছেন, গোয়ালিয়রে যাচ্ছেন নতুন সৈন্য সংগ্রহের জন্যে। এই অবসরে যেন বেগম প্রতাপসিংহকে শায়েস্তা করতে অগ্রসর হয়।

বেগমের প্রাণ নেচে উঠলো যুদ্ধের জন্যে। সে সিন্ধিয়ার সম্মান রক্ষার জন্যে একটি উন্মুক্ত ক্ষেত্র দেখে ছাউনি ফেললো। সরদানা থেকে আরো সৈন্য, আরো সরঞ্জাম আনার জন্যে উপযুক্ত লোক পাঠালো। সালুর, পাওলি, বাওরস, তিনজন সেনাধ্যক্ষই তার সঙ্গে আছে, সুতরাং ভাবনার কি আছে? তবে শাহ আলমের অবস্থা শুনে সে অভিমান ভুলে তাঁকেই সাহায্য করবার জন্যে ইচ্ছুক হল কিন্তু উপায় কি? সিন্ধিয়ার নির্দেশও অবহেলা করবার উপায় নেই। তাই প্রতাপ সিংহকে শায়েস্তা করার জন্যে তোড়জোড় চললো।

বেগমের বিক্ষিপ্ত মন হঠাৎ এই রণহুঙ্কারে যেন উল্লসিত হল। এবার সে তার শক্তি প্রদর্শন করে জগৎকে স্তম্ভিত করবে। আগেও অবশ্য সে বহু যুদ্ধে নিজের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তবে তার মধ্যে যতটুকু গৌরব ছিল, তার চেয়ে এ গৌরব আরো বেশী। এখন সে সরদানার শাসনকর্ত্রী। সৈন্যদের সে রণবিদ্যায় শিক্ষিত করেছে। সোমরু যেমন অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে শক্তিশালী বিপক্ষ দলকে পরাজিত করতে পারতো, তেমনি রণকৌশলে শিক্ষিত করেছে সে তার সৈন্যদলকে। বরং তার চেয়েও বেশী বৈ কম নয়। সোমরুর তবু অস্ত্রশস্ত্র কম ছিল কিন্তু বেগম যুদ্ধের জন্যে বহু অস্ত্র প্রতিদিন নির্মাণ করাতো। প্রাসাদের সন্নিকটে সেইজন্যে একটি আলাদা

দুর্গ তৈরী হয়েছিল, আর সেই দুর্গে সুসজ্জিত অস্ত্রাগার ও কামান ঢালাই কারখানা ছিল।

মাধোজী সিন্ধিয়া তাকে আহ্বান করেছেন, কম গর্বের কথা নয়। তাহলে মাধোজী সিন্ধিয়াও বুঝতে পেরেছেন সরদানার শাসনকর্ত্রীর শক্তি কম নয়। যে প্রতাপ সিংহের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন, তাঁকে শায়েস্তা করতে বেগমের শরণাপন্ন হয়েছেন।

আর সেইজন্যে বেগম সবচেয়ে খুশি হলো।

উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শিবির। শিবিরে কদিন অপেক্ষা করতে হল। এই অপেক্ষার মুহূর্তগুলি যেন বেগমকে কেমন অসোয়াস্তির মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতে হল।

তারপর একদিন বিরাট বাহিনীর সঙ্গে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র, কামান, বারুদ, খাদ্য, পোষাক—বেগমের কয়েকজন পরিচারিকা সব এসে পড়লো।

আর দেরী নয়। বেগম শিবিকা ছেড়ে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করলো। কটিবন্ধে তরবারী, মস্তকে উষ্ণীষ, বক্ষে বর্ম, মুখে জালের আবরণ। সঙ্গে বিস্তৃত বাহিনী নিয়ে পানিপথ অভিমুখে রওনা হল। সে দৃশ্য দেখবার মত। আগ্রা থেকে বাহিনী প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে এসে ছাউনি করেছিল। উদ্দেশ্য, মীরাটে ফেরা। এখন সে বাহিনী পথ পরিবর্তন করে দিল্লীর উত্তরে পানিপথে অগ্রসর হল। পথচারী এই রমণীর অসমসাহসিকতা দেখে হতচকিত হল।

যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠলো। ওদিকে প্রতাপ সিংহ সংবাদ পেল সরদানার শাসনকর্ত্রী তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে। তার সঙ্গে সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সৈন্যবাহিনী। ভীত হল প্রতাপ সিংহ।

পানিপথের যুদ্ধ সংঘটিত হল।

বেগমের সৈন্য চালনা অদ্ভুত। বিপুল সৈন্য প্রতাপ সিংহের। কিন্তু বেগমের অল্প সংখ্যক সৈন্যের কাছেই পরাজিত হতে লাগলো।

বেগম যুদ্ধ করলেও ওদিকে তার মন পড়ে ছিল শাহ আলমের জন্যে। বাদশাহ আলমের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তার আছে, কিন্তু আজ শাহ আলম বিপদগ্রস্ত, তাকে এ সময়ে সাহায্য না করলে বেইমানী হবে। একদিন এই বৃদ্ধের জন্যেই সে এই সৌভাগ্য লাভ করেছিল, সেই কৃতজ্ঞতার দান পরিশোধ না করলে বিবেকের কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। মাধোজী সিন্ধিয়ার আশ্বাসে নিশ্চিন্ত থাকলেও সে একেবারে উদ্বেগহীন নয়। তাই বিশ্বাসী লোক প্রেরণ করে সে দিল্লীর বিস্তারিত সংবাদ আনিয়ে নিচ্ছিল।

হঠাৎ সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই শুনলো, দিল্লীশ্বর শাহ আলম বিদ্রোহী কর্তৃক প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়েছেন। সাহারানপুরের শাসনকর্তা জাবতা খাঁর পুত্র গোলাম কাদির সিংহাসন অধিকার করেছে। মাধোজী সিন্ধিয়ার প্রতিনিধি শাহ নিজামুদ্দিন বিপুল সৈন্য নিয়ে যমুনার তীরেই গোলাম কাদিরকে আক্রমণ করেছিলেন কিন্তু তিনি গোলাম কাদিরের কাছে পরাজিত হয়েছেন। শাহ আলমের নাজির মনসুর আলি খাঁও গোলাম

কাদিরের সঙ্গে যোগদান করেছেন। এখন বন্দী শাহ আলমের অবস্থা সঙ্গীন। গোলাম কাদির সেই বন্দীর সামনেই আস্ফালন করে আমির-উল-উমারা পদ দাবি করছে। আরো অনেক দুঃসংবাদ। বৃদ্ধ শাহ আলমের নাকি একটি চক্ষু অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

শিহরিত হয়ে উঠলো বেগম। অনুতপ্ত হল বাদশাহের এই অবস্থার জন্যে। মাধোজী সিন্ধিয়া তাকে এমনিভাবে আশ্বাস না জানালে বাদশাহের অবস্থা এমনি বেদনাদায়ক হত না। তার সাহায্য প্রেরণ করতে সে বিলম্ব করতো না। গোলাম কাদির কত বড় শক্তিবান, তা একবার সেই যমুনাতীরে পরীক্ষা হয়ে যেত।

সুতরাং এবার আর বিলম্ব নয়। বেগম রণভঙ্গ দিয়ে পানিপথ থেকে দিল্লী অভিমুখে রওনা হল।

গোলাম কাদির বেগমকে দিল্লী প্রবেশ করতে শুনে তার কাছে দূত প্রেরণ করলো। বেগম যদি তার সঙ্গে যোগদান করে তাহলে উভয়েরই সুবিধা হবে। দিল্লীতে তাদের উভয়ের রাজত্ব কায়েম হবে। এই লোভ বেগমকে উৎসাহিত করলো না। বরং আরো ক্ষিপ্ত করলো।

গোলাম কাদিরের বাহিনীর সঙ্গে বেগমের বাহিনীর তুমুল যুদ্ধ লাগলো। গোলামের বাহিনী পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হল। গোলাম কাদির পলায়ন করলো।

বেগম গিয়ে প্রাসাদ মুক্ত করলো। বৃদ্ধ শাহ আলমের সঙ্গে প্রায় একযুগ পর দেখা হল। বৃদ্ধ বাদশাহ আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেঁদে ফেললেন। তাঁর বাদশাহের সম্মান আর থাকলো না। তিনি সেই সম্মান থেকে নেমে এসে উপযুক্ত কন্যার কাছে শিশুর মত নিজেকে সঁপে দিলেন। গোলাম কাদির তার ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। কতদিন অর্ধাহারে রেখেছে। অখাদ্য খেতে দিয়েছে। চাবুক মেরেছে। চাবুকের কালো কালো দাগ সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছে। তাতেও সে তৃপ্ত হয় নি। লৌহশলাকা উত্তপ্ত করে একটি চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছে।

গোলাম কাদিরের কাছ থেকে পরিত্রাণ যে তিনি পাবেন, এ কখন আশা করেন নি। আর সেও বোধহয় ভাবে নি, অতর্কিতে কেউ তার সম্ভাবনা ধুলিসাৎ করে দেবে। তাই অত্যাচারের মাত্রা সীমাহীন ছিল। হারেম তছনছ করেছে। বেগম মহলের শালীনতা নষ্ট করেছে! বিবিদের বাইরে এনে লাঞ্ছিতা করেছে। দফতর-খানার কাগজ পত্তর, রাজভাণ্ডের দৌলত ছড়িয়ে দিয়ে প্রাসাদের আসবাব লণ্ডভণ্ড করেছে।

বেগম নিজেও দেখলো সেই ধ্বংসের দৃশ্য কিন্তু কি বলবে সে, এর জন্যে দায়ী কে? শুধু মনে কষ্ট নিয়ে বাদশাহকে সান্ত্বনা দিল।

বাদশাহ বহুকাল পরে সেই মুন্নাকে দেখে যেন কেমন সহায় বোধ করলেন। মায়ের কাছে যেন পুত্রের হাজারো অভিযোগ! কি করে এতদিন সন্তানকে ভুলে থাকলো, পুত্র অবাধ্য হলে কি জননী পরিত্যাগ করতে পারে? এই সব নানান আবেদন বৃদ্ধ বাদশাহের আচরণে প্রকাশ হল। মুখে অবশ্য তিনি কিছু বললেন না। কিন্তু তার আচরণে এই সব অভিব্যক্তিই ছিল।

বাদশাহকে সান্ত্বনা দিয়ে তার কার্যের সুব্যবস্থা করে বেগম সরদানায় ফিরবে

ভাবলো। প্রাসাদের ফেরার জন্যে তার মন বড় উতলা হয়ে উঠছে। বহুদিন সে প্রাসাদ ত্যাগ করে আছে। না জানে, সেখানে কি বিশৃঙ্খলা চলছে? ভাবনা অনেক। রাজ্য যার আছে, রাজত্ব যাকে করতে হয়, তার সহস্র চক্ষু সহস্র দিকে মেলে রাখতে হয়। তাই বেগম আর দ্বিধা না করে সরদানার পথেই ফিরে চললো!

এমন সময় বাদশাহ শাহ আলমের আবার বিপদের কথা তার কানে গেল। আবার বিদ্রোহ। আবার দিল্লীশ্বরকে বিব্রত করবার জন্যে একাধিক শক্তি জোট সৃষ্টি করেছে। সুযোগ বুঝে জমিদাররা রাজস্ব বন্ধ করে দিয়েছে। রাজস্ব না পেলে রাজ্যের বিরাট ব্যয় নির্বাহ হবে কেমন করে? জমিদাররা নিজেরা করতে সা সী হয় নি, তাদের উৎসাহিত করেছে নাজফ কুলী খাঁ। নাজফ কুলী খাঁর অধিকারে এখন গোকুলগড় দুর্গ।

বৃদ্ধ বাদশাহ আর বসে নেই। তিনি নিজেই সৈন্য পরিচালনা করে গোকুলগড দুর্গে ছুটেছেন। মান, ইজ্জত সবই গেছে, এখন গ্রাসাচ্ছাদানের ব্যবস্থাও যায় যায়। তাই সেই এক চক্ষু নিয়েই রণসাজে সজ্জিত হয়ে এগিয়েছেন।

আবার বেগমকে চিন্তিত হতে হল। মনে পড়লো বাদশাহকে। গোলাম কাদিরের হস্ত থেকে উদ্ধার করবার পর তিনি কেমন যেন ভেঙে পড়েছিলেন। কেমন যেন শিশুর মত তাঁর অবস্থা বেগম দেখে ছিল। মুন্নাকে প্রাসাদে রেখে দিতে পারলে যেন তিনি শান্তি পেতেন। এক রমণীর কাছে এক বিরাট পুরুষের এই অসহায়তা বেগমকে লজ্জিত করেছিল।

সেইকথা ভেবেই আবার বেগমকে ফিরতে হল। সরদানায় আর ফেরা হল না। বিশ্রাম স্থগিত রেখে সেও গোকুলগড়ের দিকে বাহিনী পরিচালিত করলো।

এদিকে বাদশাহ নিজের জীবন ও মান রক্ষার্থে প্রবলভাবে দুর্গ আক্রমণ করলেন। মুহূর্তে দুর্গ হস্তগত হল। সৈনিকরা দুর্গ অধিকার করে লুণ্ঠন দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে আনন্দ উৎসব শুরু করে দিল। মোগল সৈন্যরা স্বভাবের দিক দিয়ে শ্লথ প্রকৃতির ছিল। আনন্দের সময় তাদের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত। অঢেল সরাব পান করে বেহেড মাতাল হয়ে নাচ গানের মধ্যেও মত্ত হযে উঠতো। এই গোকুলগড় দুর্গেও তারা সে রাত্রে এমনি আচরণ করেছিল।

কিন্তু অপর পক্ষ সুযোগ গ্রহণ করলো। নজফ খাঁ লুক্কায়িত স্থান থেকে তার বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে এল। অতর্কিতে আক্রমণ। উন্মত্ত মোগল সৈন্য মদের ভাণ্ড ছেড়ে তরবারী আর ধরতে পারলো না। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল।

বাদশাহ বাধ্য হয়ে বিদ্রোহী নাজফ কুলী খাঁর কাছ থেকে পলায়নের সুযোগ খুঁজলো।

এই সময় বেগম সোমরুর গোকুলগড় দুর্গে উপস্থিতি।

বাদশাহ তাকে দেখে যেন পুলকিত হয়ে উঠলেন।

বেগম আর চিন্তা না করে ভীম বিক্রমে নাজফ খাঁর বাহিনীকে আক্রমণ করলো। অদ্ভুত রণকুশলতায় বেগমের বাহিনী জয়লাভ করলো।

এবারেও বাদশাহ বেগমের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করলেন। নাজফ কুলী খাঁ ধরা পড়লো। বাদশাহ কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে গেলেন। সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাদশাহ নাজফ কুলী খাঁকেই ক্ষমা করে বসলেন। আনন্দে নিজেকে চেপে রাখতে পারলেন না, অকপটে নিজের নিরাপত্তার জন্যে বেগমের কাছে সাহায্য চাইলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে বোধহয় এই দৃষ্টান্ত বিরল। একজন রমণী একটি বিরাট সাম্রাজ্যের সবচেয়ে ভাগ্যবান বাদশাহের জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিল। আজ আর বাদশাহের সে অহমিকা নেই। নিচে নেমে এসেছেন সবচেয়ে উঁচু সিংহাসন থেকে। জৌলুসের মাঝে আর নিজের দুর্বলতাকে গোপন করে মোগল ঐতিহ্যকে বজায় রাখেন নি। তিনি বুঝতে পারছিলেন তার শক্তি আর নেই। এখন শুধু রাজত্বের বিরাট গুরুভার বহন করে তিনি ক্লান্ত। বরং এই গুরুভার চলে গেলেই তিনি শান্তি পান। কিন্তু তবু অন্য কেউ এই যখের রাজত্ব অধিকার করতে এলেও পারেন না বিলিয়ে দিতে। মায়া পড়ে গেছে এই মেকী ঐশ্বর্যের ওপর। অগণিত দাসদাসী জোরালো মোগলাই খানা না খেলে যে রাত্রে ঘুম আসে না। বিলাসের নাচমহলে একটু আরাম করে না বসলে যে মনটা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেইজন্যেই এই সাম্রাজ্য রক্ষা কিন্তু সেইটুকু সুখ উপভোগ করতে গিয়েই তো তাকে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হচ্ছে।

শাহ আলম তারপর দিল্লীতে ফিরে বিগম সোমরুকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উপাধি দিলেন। উন্মুক্ত রাজসভায় আমীর ওমরাহের সামনে 'আমার সবচেয়ে প্রিয় দুহিতা' বলে বেগম সোমরুকে সম্মান জানালেন। তারপর নিজের খাসকক্ষে বসে স্নেহজড়িত কণ্ঠে বললেন,—আজ আমার একটি স্বপ্ন সার্থক। একদিন তোমাকে দেখে আমার কেমন যেন জ্যোতিষির মত দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়েছিল।

বেগম সোমরুর বাদশাহের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ছিল। আজও তাঁকে সে ক্ষমা করতে পারে নি। তবু একজন অসহায় দুর্বল ব্যক্তিকে সে তার সাহায্য না দিয়ে পারলো না। কৃতজ্ঞতা যে একেবারে ছিল না, একথা বললে ভুল বলা হবে। একদিন এই ব্যক্তিরই সাহায্যে সে জীবন পরিবর্তিত করেছিল। সোমরুর সাথে মিলিত হওয়ার সবটুকু সাহায্য এই বাদশাহই করেছিলেন। এই বাদশাহই একদিন তাকে বিস্মিত করে দিয়ে রণবিদ্যায় দীক্ষিত করেছিলেন। সে কথা সে বিস্মৃত হয় কেমন করে?

তাঁর আজ এই দুরবস্থায় সাহায্য না করলে খোদা বেগমকে ক্ষমা করবে না।

বাদশাহ তারপরেও বেগমকে অনেক জায়গীর উপহার দিলেন, আর দিলেন দিল্লী দুর্গের মধ্যে সবচেয়ে খানদানী ভিন্ন একটি প্রাসাদ, যেটা একেবারে বেগম সোমরুর নিজস্ব সম্পত্তি বলে ঘোষিত হল। উদ্দেশ্য, বাদশাহকে নিরাপত্তা দানে সাহায্য করার জন্যে সুযোগ পেলে বেগম এই প্রাসাদে এসে বিশ্রাম নেবে, আর বেগমের একটি সৈন্য-বাহিনী সর্বদা বাদশাহের নিরাপত্তার জন্যে প্রাসাদে অবস্থান করবে।

শেষোক্ত ঘোষণা অবশ্য বেগমের। বেগম বৃদ্ধ শাহ আলমকে আশ্বাস দান করে সরদানায় ফেরার আয়োজন করলো। তাছাড়া তখন তার সৈন্যবাহিনী প্রাসাদে ফেরার জন্যে উদব্যস্ত হয়ে উঠেছে। অনেকদিন নিজেদের আশ্রয় ছাড়া। বিশ্রাম

দরকার। স্ফূর্তি দরকার। এসব না পেলে শরীর ও মন আর সুস্থির হবে না।

বেগম একদিন আবার বিজয়ী সৈন্যদের নিয়ে বিজয়িনীর মত সরদানা যাত্রা করলো।

সরদানায় এক উৎসব আয়োজিত হয়েছিল। এমন উৎসব বুঝি সরদানার প্রাসাদের মধ্যে আর কখনও হয় নি। বেগমের নির্দেশেই অবশ্য এ উৎসবের আয়োজন। বিজয়ী সৈন্যদের সে জয়ের আনন্দ উপভোগের জন্যেই এই উৎসবের ব্যবস্থা করেছিল। নিজেও উৎসবের মধ্যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেমন যেন সে সম্রাজ্ঞীর আসন থেকে সাধারণের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। নিজের আলাদা কোন সত্তাকে ধরে রাখে নি। কেন হঠাৎ এমনি মতৈক্য বোঝা গেল? অন্তঃপুরের অবরোধ হঠাৎ উন্মোচিত করে সবার প্রবেশাধিকার দিল।

উৎসবে রীতি অনুযায়ী বিভিন্ন ব্যবস্থা হল। দেশী ও বিদেশী স্বদেশী ও পাশ্চাত্য। একদিকে নাচমহলে দর্পণের পরিধির মাঝে ঘাঘরা পরা, কাঁচুলি সম্বল খুবসুরত নর্তকী। বেগমের রাজপুরীতে কোন নাচমহল ছিল না হঠাৎ রাতারাতি নাচমহল তৈরি হয়ে গেল। অভ্যন্তর সজ্জিত হল মোগল বাদশাহের ঢঙে। বাদ্যঝঙ্কার হল মোগল বাদশাহের নাচমহলের মত। নাচও তাই। মূল্যবান ফরাসের ওপর ভেলভেটের তাকিয়া ঠেস দিয়ে রাজকর্মচারীরাই সরাবের পাত্র মুখে তুললো। বেগম এখানে একটু আবরু রক্ষা করলো চিকের এক অবরোধ রচনা করে! সেও নাচ উপভোগ করলো ও সরাবের পাত্র মুখে তুললো।

অন্যদিকে আর এক উৎসব দেখতে পাই। পাশ্চাত্য উৎসবের রীতি একটু ভিন্ন রকমের। সেখানেও অনেক আলো, অনেক বর্ণাঢ্য। শেরি, শ্যাম্পেন, বিয়ার, হুইস্কী প্রভৃতির ছড়াছড়ি। ইউরোপীয় মেয়েপুরুষরা সেখানে এক। কেউ আবরু রক্ষা করে সম্ভ্রম ধরে রাখে নি। কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খলতার এক তীব্র জোয়ার। জোয়ারে ভেসে চললো নারীপুরুষরা বিগড্রামের ডুম ডুম ও ভায়োলিনের সাথে গীটারের মৃদু ঝঙ্কার। সেই প্রাণ মাতানো যন্ত্রসংগীতের সাথে এক ফরাসী রমণী গান ধরেছে, 'হাউ লভলি, হাউ লভলি দিস নাইট।'

সেই গানের সাথে ছন্দ মিলিয়ে বিরাট হলঘরের মেঝের ওপর নারীপুরুষরা গণ্ডে গণ্ড মিলিয়ে হাতে হাত ধরে বলনৃত্য করছে। বেগম সেখানে চিকের আড়াল দিয়ে উপস্থিত হতে পারলো না। কেমন যেন সঙ্কোচ উপস্থিত হল। তাছাড়া সেদিন তার মনের অবস্থা অন্যরূপ। সম্পূর্ণ অভিনব সে রূপ। সবার সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে স্বেচ্ছায় এই উৎসবের হুকুম দিয়েছেন। তাছাড়া এই নাচঘরে আছে তার চেয়ে আরো

অনেক বিদেশী সুন্দরী। তাদের মধ্যে কেউ ফরাসী, কেউ জার্মানী, কেউ ইংরেজ। তাদের রূপের কাছে সে দাঁড়াতে পারে না। তবে সম্মানের কাছে দাঁড়াতে পারে। তার যে পর্যাপ্ত অর্থ আছে, সে সেই অর্থ দিয়ে এরকম হাজারো রূপসী ক্রয় করতে পারে কিন্তু সে গর্ববোধও তখন তার ছিল না। আজ তার প্রকৃতি একটু অন্যরকমের। এই প্রকৃতি তার হঠাৎ হয় নি, মনে হয় পূর্বে থেকে সে সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাই আজ সে অসঙ্কোচে বলরুমে প্রবেশ করল এবং একসঙ্গে সরাব পান করতেও দ্বিধা করলো না।

মুখের সামনে তার সেই জালের আবরণ। হঠাৎ সে সেই জালের আবরণ সরিয়ে দিল। সকলে তার স্পষ্ট মুখাকৃতি দেখতে পেল। কৌতূহলীরা পুলকিত হল। বেগম যে সুন্দরী, সে সবাই জানতো কিন্তু সৌন্দর্যের কতটুকু দীপ্তি তা পরিমাপ করতে পারে নি, তা সেই মুহূর্তে পারলো। বেগম তাদের মধ্যে নেমে এসেছেন। অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করেছেন। সম্রাজ্ঞীর আসনে বসে হুকুম করেন নি।

বেগম একটি কেদারায় বসে নারীপুরুষের সেই নৃত্য উপভোগ করছিল। সে একাই বসেছিল, ওদিকে সকলেই জোড়ায় জোড়ায় নৃত্যে ব্যস্ত। বাজনা বেজে চলেছে। জোরালো বাজনা, মনের সংযম কেড়ে নেয়। ইচ্ছে করেছিল সেও এক সঙ্গী পেলে নৃত্যে যোগ দেয় কিন্তু সে ইচ্ছা জানাতে পারছিল না। লজ্জা করছিল, সঙ্কোচ এসে তাকে অনড় করে দিচ্ছিল। একবার তার মনে উদয় হচ্ছিল, সবক্ষেত্রে কি শাসনের রক্তচক্ষু প্রাদর্শন করা যায়?

তার মনের কথা বোধ হয় বাইরে প্রকাশ হয়েছিল। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি রমণীর সঙ্গ পরিত্যাগ করে বাওরস এগিয়ে এল। সেই দুঃসাহসী বাওরস। যাকে বেগমে সবচেয়ে ভয় করে, আজও করে। বাওরসের চোখের দৃষ্টি আজও কেমন যেন? তাকালেই যেন বেগমের বুকের মধ্যে কম্পন শুরু হয়।

সেই বাওরস একমুখ হাসি নিয়ে এগিয়ে এল। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো,—'উইল ইউ... '

কিন্তু তারপরের কথা আর বেগম জানে না। তারপরের যা কিছু সে করেছিল একান্ত নিজের বেহুশ অবস্থায়।

যে বাওরসকে সে মনে মনে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করতো, সেই বাওরসের হাত ধরেই সে নাচতে শুরু করলো। তখন তার চেতনাই ছিল না, না হলে বাওরসের গণ্ডে গণ্ড স্থাপন করে নিবিড় হল কেমন করে? কেমন করে অমনি আচরণ করতে পারলো, সে কথা অনেকদিন ধরেই বেগম ভেবেছিল। সবার সামনে সেদিনে সেই উৎসবে বেগম নাকি অদ্ভুত এক নৃত্য পরিবেশন করেছিল। বেগমের পূর্ব জীবনের ইতিহাস সবাই জানতো। বেগম যে একজন সুপটু নৃত্যশিল্পী কারো অজানা নয় কিন্তু সে নৃত্য এদেশী। বেগম যে পাশ্চাত্য নৃত্যেও দক্ষ, তার প্রমাণ সেদিন স্বীকৃত হল।

অনেকক্ষণ সেই নৃত্যের জলসা সে রাত্রে ছিল। পানীয় গ্রহণ করেছিল প্রচুর, সেই পানীয়ের মৌতাতে উত্তেজনাও তার সীমাহীন ছিল। যে পোষাকের মধ্যে তার

শালীনতাই ছিল বেশী, কখনও এতটুকু বেআবরু কেউ দেখে নি, সেই শালীনতাই তার খসে পড়লো। খসে পড়লো বক্ষের আবরণ। রমণীরত্ন লোলুপ হয়ে উঠলো। যেন এক পণ্যার মত তার আকৃতি প্রদর্শিত হল। অন্য কোন রমণী হলে হয়তো ইউরোপীয় সৈনিকরা উল্লসিত হলে উঠতো কিন্তু বেগমের এই হঠাৎ পরিবর্তনে তারা বিমূঢ় হয়ে গেল। কি করবে ভেবে না পেয়ে নির্বাক হয়ে সেই দুজনের নৃত্য দেখতে লাগলো। সকলেই এখন দর্শক। পুরুষ দর্শকরা বাওরসের ভাগ্য দেখে অনুতাপ করছে এমন জানলে আগে বেগমের সঙ্গী হবার উৎসাহ প্রকাশ করতো।

বাওরসে তখন কিন্তু অন্যকথা ভাবছিল। সোমরু যে রমণীকে জয় করতে পেরেছে, সে-ই বা পারবে না কেন? সোমরুর চেয়ে ক্ষমতায় সে কম কিসের! তাই বাওরসের আরো এগিয়ে যাবার ইচ্ছা। তার ইচ্ছা করছিল, বেগমের গণ্ডটি তার গণ্ডের সঙ্গে মিশে আছে, আর একটু এগিয়ে গেলে একটি চুম্বন অঙ্কিত করা যায়। বেগমের সুন্দর ওষ্ঠে একটু চুম্বন আঁকার জন্যে তার সমস্ত প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়েছিল।

মদির চোখে তবু দ্বিধা। তবু সঙ্কোচ। বাওরস একবার চতুর্দিকে তাকালো, না এতদূর এগোতে সাহস হয় না। যদি সৈনিকরা ক্ষেপে গিয়ে তাকে আক্রমণ করে? বরং গোপনে এই আশা সে পূরণ করবে। বেগমকে ভয় সে করে না; রমণী সে বহু দেখেছে। রমণীদের বলপ্রয়োগ করেই গ্রহণ করতে হয়। বেগম হোক্ না ক্ষমতাশালিনী! তাকে চুম্বন করার জন্যে কি শাস্তিপ্রয়োগ করতে পারবে? বরং নিজের কাছে সে দুর্বল হয়ে যাবে। আর তাছাড়া বেগমেরও যে স্পৃহা আছে, তা তার আজকের প্রকৃতি দেখে প্রতীয়মান হয়।

বাওরস বেগমের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে সেই কথা ভেবে নিল।

তারপর অনেক রাত্রে বেগম পরিশ্রান্ত হয়ে টলতে টলতে নিজের কক্ষে চলে এল। অবশ্য তার আসার পিছনে পরিচারিকাদের সাহায্য ছিল। এখন তার পরিচারিকা অনেক। ইচ্ছে করেই সে বহু পরিচারিকা নিযুক্ত করেছিল। ফরাসী, জার্মানী, ইতালী ইংরেজ বহু পরিচারিকা।

বাওরস কিন্তু মাতাল হয়েও তার সঙ্কল্প ভোলে নি। তাছাড়া বেগমের শরীরের স্পর্শ তাকে উন্মাদ করেছিল, অন্য কেউ হলে হয়তো আরো কিছু আশা করতো কিন্তু বেগমের কাছ থেকে সে আপাতত একটি আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করতে চায়। একটি নিবিড় চুম্বন। বাওরসের ঠোঁট দুটো যেন অসংযত হয়ে উঠলো।

সে আর হিতাহিত না ভেবে সেই গভীর রাত্রে বেগমের অন্তঃপুরে গিয়ে উপস্থিত হল। বেগম তখন মাতাল। অত্যাধিক নৃত্য করার জন্যে পরিশ্রমে অর্ধ চৈতন্য হয়ে শয্যার ওপর পড়েছিল। হয়তো সে বাওরসের কথাও ভাবছিল। বাওরসের নিবিড় সান্নিধ্য অনেকদিন পর তাকে তৃপ্ত দিয়েছিল। সোমরুর বিয়োগ তো আজ কম দিনের কথা নয়! এতদিন কি এক মোহের বশে থেকে এই জীবনকে ভুলেছিল। আজ যে জীবন সে হঠাৎ গ্রহণ করলো, সেই জীবনই যেন তার কাম্য ছিল। তাই তার মনে এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি এসেছিল। অর্ধ চৈতন্য অবস্থায় সে সেই তৃপ্তির

আস্বাদন গ্রহণ করছিল।

এমনি সময়ে বাওরস অতর্কিতে কক্ষে প্রবেশ করলো। এগিয়ে গিয়ে বেগমকে স্পর্শ করতেই বেগম চমকে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে পরিচারিকাদের ডাকতে গেল।

বাওরস বেগমের মুখে হাত চাপা দিয়ে তা রোধ করলো।

কক্ষ স্বল্পালোকিত। বেগমের দেহের পোষাকও অসংলগ্ন। বেগম বাওরসের দুঃসাহস দেখে চমকিত হল। ক্ষুব্ধস্বরে কিছু বলতে গেল কিন্তু বাওরস সে সুযোগ দিল না।

বেগম তবু বলপ্রয়োগ করে বাওরসের শক্তি প্রতিহত করলো। মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে বললো,—তুমি যদি এখান থেকে না যাও, তাহলে চেঁচাতে শুরু করবো। চেঁচালে তোমার পরিণাম কি হবে ভেবে দেখেছ? অগণিত তোমারই সহকারী তোমার মৃত্যু সংঘটিত করবে।

বাওরস একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর তিক্ত কণ্ঠে বললো,—বেগম নিশ্চয় এতবড় অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবেন না।

বেগম গম্ভীর হয়ে বললো,— বাওরস তুমি ফিরে যাও। আমি তোমার সাহসকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু দুঃসাহসকে বরদাস্ত করি না। তুমি ভুলে যেও না, আমি এ রাজ্যের সম্রাজ্ঞী। ইচ্ছা করলে তোমার মত একজন লোককে এই মুহূর্তে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি কিন্তু আমি তা চাই না। তোমাদের মত বীরকে সম্মান করি।

বেগম মাতালের মত জড়িতস্বরে কথা বললেও বেশ দৃঢ়স্বরে তার মত প্রকাশ করলো।

তবু বাওরস দাঁড়িয়ে রইলো। এতদূর সে অগ্রসর হয়েছে। এই তুচ্ছ হুঙ্কারে সে পিছিয়ে যাবে? তাছাড়া তার এই অভিপ্রায় অনেকদিনের। এ অভিপ্রায়কে সে দমিত করবে কেমন করে। তাই ইচ্ছার দাস হয়ে সে মৃত্যুপণ করেও ইচ্ছাকে প্রশয় জানালো। বললো,—বেগমসাহেবা আমি আপনার কাছে বিশেষ কিছু প্রার্থনা করতে আসি নি।

তবে তুমি কি চাও? বেগম গর্জে উঠলো।

হঠাৎ বাওরস করলো কি অসমসাহসিকভাবে ছুটে গিয়ে বেগমের উদ্ধত দুই অধরে কয়েকটি চুম্বন এঁকে দিয়ে পলায়ন করলো।

আর বেগম অভিভূতের মত নিথর হয়ে বসে রইল। অনুভূতি কি জাগলো না? ওষ্ঠ দুটি কি আগুনের উত্তাপে দগ্ধ হল না? শরীরে কি আর কোন পরিবর্তন জাগলো না? শুধুই কি ক্ষোভ সৃষ্টি হল? ক্ষোভের আগে যে আমেজ, আমেজের আগে যে বক্ষের আলোড়ন। সেই আলোড়ন যে রক্তস্রোতে তাণ্ডব তুলে সমস্ত কিছু একাকার করে দিতে চাইলো। বাওরস ভয় পেয়ে পালালো। সে যদি একটু অপেক্ষা করতো, একটু যদি বেগমকে নিবিড় করে আলিঙ্গনাবদ্ধ করতো, তাহলে যে বেগমের সমস্ত সংযম খসে পড়তো। বেগম যে অনেক কষ্ট করে তার প্রবৃত্তিকে ধরে রেখেছিল, সেই প্রবৃত্তি

উন্মত্ত হয়ে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতো। সে হারিয়ে যেত। তার সব সম্মান ধূলায় ধূসরিত হত। আগামীকল্য দরবারে বসে হয়তো ভালভাবে রাজকার্য করতে পারতো না। মনে হত, সকলে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। আর বাওরস এক দুঃসাহসিক সেনাপতির মত বেগমের সমস্ত সম্মানকে তুচ্ছ করছে। সে হয়তো নিজেকে ভাবছে, সবচেয়ে ভাগ্যবান পুরুষ। তা ভাবুক গে যাক্। তার জন্যে এই মুহূর্তে তার কোন ক্ষতি নেই।

কিন্তু বাওরস পালালো কেন? সে তো আরো একটু এগিয়ে এলে পারতো! যেমন জোর করে একটু দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করলো, আর একটু নয় জোর করতো।

বেগমের যেন কান্না পেতে লাগলো। নেশা ছুটে গেল। কিছুতে নিজেকে সংযত করতে পারলো না। কী অসহনীয় এই জীবন তার! একদিকে মান, সম্মান, ইজ্জত, প্রাতপত্তি, অন্যদিকে নিজের হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা। সারারাত্রি ধরে ঘুম তো আর এলই না, শয্যাতেও শুতে পারলো না। একবার ভাবলো পরিচারিকাকে ডেকে জোরালো পানীয় আনতে বলে কিন্তু আগের মত সেই পানীয়তে আর সাধ ছিল না বলে সে আর উৎসাহ বোধ করলো না। এখন সেই একটি বস্তুই তার কাম্য। যার জন্যে স্থানকালপাত্র ভেদাভেদ থাকে না। রাজা ফকিরের সঙ্গে যার পার্থক্য নেই।

বেগম নির্ঘুম দুটি চোখের ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে গবাক্ষ দিযে শেষরাত্রের থমথমে আসমানের দিকে তাকিয়ে রইলো। স্বামীর কথা ভেবে নিজেকে রোধ করতে চাইলো। সোমরু কী সুন্দর ব্যক্তি ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মন বললো, মোটেই সুন্দর ছিল না, স্বভাবের দিক দিয়ে নয়, আকৃতির দিক দিযেও নয। তুমি তাকে একদম ভালই বাস নি শুধু স্ত্রীর কর্তব্য করে গেছো। তবু বেগম স্বামীর গুণের কথা ভেবেই মনকে শক্ত করতে চাইলো। কিন্তু মন তাকে স্বামীর কোন প্রশংসা দিয়েই অভিভূত করলো না।

তখন বেগম আবার চঞ্চল হযে উঠলো। নিজেকেই নিজে সরোষে জিজ্ঞাসা করলো,—তবে আমি কি করবো? অগণিত সৈনিক, চতুর্দিকে সংখ্যাহীন প্রজা—তাদের সামনে আমি নিজেকে একেবারে সাধারণের মাঝে নামিয়ে দেবো?

রাত্রি শেষযামে ঢলে পড়লো। প্রভাত হতে আর বাকী নেই। বেগমেরও মনে শান্তি নেই। বিক্ষিপ্ত হয়ে তখন সারা ঘরময় পায়চারি করে চলেছে। যুদ্ধে কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারে নি। আজও সে অপরাজেয। শাসন পরিচালনায সে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। কোন বিদ্রোহ তার রাজ্যে নেই। বিচার বিভাগে নির্মমতা প্রকাশ করলেও সে সবার প্রশংসায় ধন্য। কোথাও এতটুকু দুর্বলতা সে প্রকাশ করে নি। কেউ কোন দুর্বলতার সন্ধান পায় বলে, অনেক কাজ সে দুর্বল ভেবেই বর্জন করেছে। অথচ এত সাবধানতা অবলম্বন করেও সে আজ নিজের কাছে পরাজিত হল।

প্রভাত হল। সারাদিন এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটলো, আবার রাত্রি হল। এই রাত্রিই যেন তাকে সর্বনাশের পথে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো। মনের সঙ্গে বেইমানী করে কতকাল আর তাকে রোধ করা যায়।

একদিন তাই হেরে গেল। দুষ্ট মতলবের কাছে নতি স্বীকার করে সে নিজেকে

সঁপে দিল। নিজের প্রবৃত্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তাই ইচ্ছার ওপর নিজেকে ছেড়ে দিল। নিরুপায় হয়েই এ অধীনতা স্বীকার করলো। জেনে-শুনেই করলো।

তবুও তার আগে বহু যুদ্ধই সে করেছিল। সম্রাজ্ঞীর সম্মান থেকে নিচে নেমে যাবার আগে অনেক শ্রম।

বাওরসকে সেদিনের কাণ্ডের পর আর প্রাসাদপুরীতে থাকতে দেয় নি। একরকম নির্বাসন দেওয়ার মত দিল্লীতে যাবার হুকুম দিয়েছিল। দিল্লীতে যে বেগমের সেনা-দল বাদশাহের সাহায্যের জন্যে রক্ষিত ছিল, সেখানে পাঠিয়ে দিল। কেউ জানলো না কিন্তু বাওরস জানলো কেন তার এই নির্বাসন? আর বেগম পাঠালো নিজের মন দৃঢ় করবার জন্যে। বাওরসের সেদিনের দুঃসাহসিকতার সে কেমন যেন বাওরসকে ভয় করে চলছিল। বাওরস যেন সম্রাজ্ঞীর মনের দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিল, এমনি ধারণা হতে বেগম বাওরসকে সরিয়ে দিল। বাওরস সরে গেলে যদি নিজেকে সে প্রকৃতস্থ করতে পারে, এই ভেবে সে এই কাজ করলো।

বাওরস হুকুম তালিম করতে সরদানা ছেড়ে চলে গেল।

বেগম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। ঐ একটি সৈনিকই দারুণ দুঃসাহসিক ছিল। আর কারো এত সাহস নেই।

কিন্তু বাওরস চলে যাবার পর তার মনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। নিজের কক্ষের মধ্যে কান্নায় ভেঙে পড়লো। কাঁদতে কাঁদতে সে অবাক হয়ে ভাবলো তার এই শোক কেন? বাওরস চলে গেছে তো কি হয়েছে? তার জন্যে মনের এই আবেগ কেন? কেন অশান্ত হচ্ছে তার এই হৃদয়? তার প্রখর বুদ্ধি ছিল, ঐ অবস্থাতেও সে তার উত্তর দিল। বাওরস না হয়ে অন্য কেউ হলেও সে হয়তো তার অভাবে ও কি এমনি কাঁদতো? যারা এই রাজ্য জুড়ে আছে তারা নিয়ম রক্ষা করে যায়, তার অধীনতা স্বীকার করে কিন্তু বাওরস সে জায়গায় অন্য আচরণ করেছিল। সে বাওরস না হয়ে যদি সালুর হত, তাহলেও তার জন্যে হয়তো বেগমের মন কাঁদতো। নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে মানুষের আকর্ষণই বেশী। বেগমের নিরুপায় অবস্থার জন্যে মন নিষিদ্ধ কার্যের দিকে বার বার ঝুঁকে পড়তে লাগলো।

এই একমাত্র উপায় ব্যাভিচারিণী হওয়া, অথবা বিবাহ করা। গোপনে ব্যাভিচার লীলা করে গেলে অবশ্য অন্যায় কিছু নয় কিন্তু তার সম্ভ্রম থাকবে না। মান, সম্মান যদি না থাকলো, তাহলে বেঁচে থেকে লাভ কি? সরদানার মসনদে বসে একটি সাধারণ কর্মচারীর ভিন্নদৃষ্টি লক্ষ্য করলেই যে তার মাথা নত হয়ে যাবে? সুতরাং সে ব্যাভিচারিণী হতে পারবে না।

এক বিবাহ করতে পারে কিন্তু কাকে করবে? তেমন যোগ্য পুরুষ কোথায়? তাছাড়া বিবাহ করলে এই রাজ্য তার থাকবে না। সোমরুর স্মৃতি এই রাজপ্রাসাদের সর্বত্র। সমস্ত সৈন্যই সোমরুর। সে যা বাড়িয়েছে তা নগণ্য। এখনও তারা প্রভুর গুণকীর্তন করে। সুতরাং বিবাহ করলে সৈনিকরা বিদ্রোহী হবে। অথচ এইজন্যেই সে ধর্মান্তরিত হয়েছিল। স্বামীর সমাধিতে বসে সে সান্ত্বনা পায় নি।

তার প্রবৃত্তি দমনের কোন উপায়ই দেখতে পায় নি। সেইজন্যে সে সেদিন ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। নিজের ধর্মে থেকে যা করতে তার বিবেকে বাধবে, অন্যধর্মে তা বাধবে না। তাছাড়া খৃষ্টধর্মের রমণীরা বহু স্বামী গ্রহণ করতে পারে বলেই তার ধারণা হয়েছিল। এমন কি তার ইউরোপীয় সমাজের মধ্যে সামাজিক বন্ধন খুব দৃঢ় নয় বলেই সে ঐ ধর্ম গ্রহণ করতে দ্বিধা করে নি। পাশ্চাত্য সমাজের নারী পুরুষের মেশামেশি লোকচক্ষে পাপ নয় বলেই সে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়েছিল।

কিন্তু তার পরিণাম কি হল? সে তো পিছনের কথা একবার ভাবে নি। সে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলেও সে সম্রাজ্ঞী। সোমরুর স্ত্রী। সোমরুকে অবজ্ঞা করে সোমরুর ধনসম্পত্তি নিয়ে সে যথেচ্ছাচার করতে পারে না। একথা যদি তার মনে হত, কখনই সে ধর্মান্তরিত হত না। সোমরুকে তার সেই মুহূর্তে মনে হল শত্রু। মা ঠিকই বলেছিল, 'মুন্নি শাদী যদি করিস, তবে নিজের দেশের নওজোয়ানকে করিস।' মায়ের কথা সে শোনে নি। মা সোমরুকে এতটুকুও পছন্দ করতো না। কেন করতো না তখন বুঝতে পারে নি, আজ বুঝতে পেরেছে।

সরদানার প্রাসাদের আবহাওয়া যেন তার কাছে বড় বিষাক্ত লাগে। সেইজন্যে কদিনের জন্যে অন্য প্রাসাদে বাস করার অভিপ্রায় ঘোষণা করলো। তার বিভিন্ন জায়গায় প্রাসাদ ছিল। জলালপুর, মীরাট, কিরওয়া ও দিল্লীতে। সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল মীরাট-প্রাসাদ। বেগম সেখানেই একদিন অসংখ্য পরিচারিকা পরিবৃতা হয়ে চলে গেল।

কিন্তু আবার তিনদিনের মধ্যেই ফিরে এল। বাইরের লোককে জানালো বিশেষ রাজকার্যের জন্যে সে ফিরে এসেছে। কিন্তু পরিচারিকারা জানতো বেগমের ভাল লাগে নি বলে তিনি ফিরে এসেছেন। তবে তার কোন কথাই বাইরে প্রকাশ হতো না। পরিচারিকাদের ওপর কড়া নিষেধ ছিল।

বেগমের তিনজন খাস পরিচারিকা ছিল। মারিয়া, সোফিয়া, রোজানা। তিনজনই প্রিয় সখীর মত ছিল। তাছাড়া আরো তার পরিচারিকা ছিল, পরিচারিকা রাখার রেওয়াজ যেন তার বেশীই ছিল। একটি কাজে সাতজন পরিচারিকা।

প্রত্যহ বেগম যখন ইউরোপীয়দের সঙ্গে সান্ধ্য ভোজনে বসতো তখন পঁয়ত্রিশজন পরিচারিকা আহার পরিবেশন করতো। সান্ধ্য ভোজনের রেওয়াজ সেই উৎসবের পরদিন থেকে শুরু হয়েছিল। উদ্দেশ্য সৈনিকদের সঙ্গে অনেকখানি অন্তরঙ্গ হলে তারা আর তাকে অশ্রদ্ধা করবে না। অবশ্য তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অন্য ছিল, সে কথা সে ছাড়া কেউ জানতো না। পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করলে যদি মনের প্রবৃত্তি দমন হয়, সেইজন্যে সে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল।

সে যাই হোক, অনেক করেও কিছু হল না। সে কিছুতে নিজেকে বাগ মানাতে পারলো না। সেদিন সেই মুহূর্তগুলি বেগম সোমরুর জীবনে যে সর্বনাশের রূপ নিয়ে এসেছিল, তার কোন সান্ত্বনা নেই। সেদিন যদি তাকে নিজের কাছে নিজেকে পরাজয় বরণ করতে না হত, হয়তো সে রাজ্যের জন্যে আরো অনেক কিছু করতে

পারতো। আরো অনেক উন্নতি। কিন্তু বয়েস এগিয়ে চললেও মন চলছিল না। আর মনের বশীভূত তার রূপসী দেহ। দেহে যেন তারুণ্য আরো প্রবল। ভাল সুখাদ্য গ্রহণে রক্তের উত্তাপ আরো উত্তাল। রমণীর সেই অশান্ত প্রবৃত্তির নোকর হয়ে বেগম দিন দিন কৃশ হয়ে যেতে লাগলো। সে বিস্মিত হয়ে ভাবলো, সে অসাধারণ হয়ে এক সাধারণ রমণীর মত কেন আচরণে অভ্যস্ত হল ?

এত ভাবনার কিছু থাকতো না, সে যে সম্রাজ্ঞী ! সে যে সরদানার শাসনকর্ত্রী।

নিজের বুদ্ধি দিয়ে যখন নিজেকে বিচার করতে পারলো না, তার প্রিয় সখীর শরণাপন্ন হল। সোফিয়া, রোজানার চেয়ে সে মারিয়াকেই বেশী সে পছন্দ করতো। তিনজনেই যুবতী ও কুমারী ছিল কিন্তু মারিয়ার স্বভাব ছিল বড় সুন্দর। স্বল্পভাষী মৃদু স্বভাবের মেয়ে। হাসি ছাড়া কখনও তাকে বিষন্ন দেখা যেত না। সেইজন্যে মারিয়াই ছিল বেগমের প্রিয়। বেগমের আপন কেউ ছিল না বলে সময়ে সময়ে মারিয়াকেই তার আপন মনে হত। সে নিজেকে মারিয়ার কাছে মেলে দিত। মারিয়ার সান্ত্বনা তার ভাল লাগতো। কিন্তু ইদানীংকার মনের অবস্থা সে মারিয়ার কাছে গোপন করেছিল। কেমন যেন লজ্জা, ইজ্জতহানি কেমন যেন নিজের অহমিকা তাকে গোপন করেছিল কিন্তু আর সে পারলো না নিজেকে গোপন করে রাখতে। নিজের হৃদয়ের গুরুভাব লাঘব করার জন্যেই মারিয়ার কাছে প্রকাশ করে বসলো।

একদিন বললো,—মারিয়া, আমি কি করবো বলতে পারিস ?

মারিয়া সবই জানতো। একটি রমণী একটি রমণীর কাছে অজানা থাকে না। তাছাড়া বেগমের ইদানীংকালের মেজাজ, তার দৃষ্টি, আচরণ সবই তার কাছে ব্যক্ত করেছিল। এমন কি কর্মচারীদের আলাপ-আলোচনাও তার কান এড়ায় নি। তবু না জানার ভান করে বিস্মিত হয়ে বললো,—কি বেগমসাহেবা ?

তবু বেগম একটু দ্বিধা করলো। একটি রমণীর কাছেও বলতে সঙ্কোচ উপস্থিত হল। এমনি তার আজ অবস্থা। তারপর অনেক পরে বললো,—মারিয়া বলতে পারিস সংযমেরদ াওয়াই কি ?

মারিয়া বুঝতে পেরেছিল, তবু না বোঝার ভান করে মৃদু হাসলো। তারপর অনেক পরে জিজ্ঞেস করলো, - বেগমসাহেবা, সোমরুসাহেব কবে মারা গেছেন ?

মারিয়ার কথায় বেগম চমকিত হল। কিন্তু সে ভাব গোপন করে বললো, তুই একথা জিজ্ঞেস করলি কেন ?

মারিয়া মাথা নেড়ে বললো, এমনি।

বেগম মারিয়ার কথার অর্থ বুঝতে পারলো কিন্তু আর কিছু বলবো না। তারপর অনেক পরে বললো, তোরা আমাকে কিরকম চোখে দেখিস রে ?

এককথায় বোধহয় সেই সম্রাজ্ঞীর হুকুম ছিল। হঠাৎ মারিয়ার মুখের ওপর ম্লান ছায়া জেগে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি শঙ্কিত হয়ে বললো, বেগমসাহেবা, আপনি আমাদের মালেকা। আমরা আপনার বাঁদী। কোন গোস্তাখী যদি হয়ে থাকে মার্জনা করবেন।

হঠাৎ বেগম মনে মনে এই দুর্বলাদের ক্ষমা করে মুখে বললো, তুই যা।

মারিয়া চলে গেল। আর বেগম ভাবলো, এরা কত দুর্বল। এরা শুধু ভয়ই করে, শ্রদ্ধা এতটুকু করে না। তার শাসনে অধীনতা স্বীকার করে কিন্তু তার দুর্বলতা পেলে সমালোচনা করতেও ছাড়ে না। মারিয়াকে তার ভিন্নধরনের একটু মনে হয়েছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে তার মনে হল, মারিয়া তার বেতনভোগী বাঁদী ছাড়া কিছু নয়।

তাই যদি না হত, তাহলে মারিয়া তাকে প্রিয় সখীর মত সবকথা অকপটে জিজ্ঞেস করতে পারতো। ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতো না, কাছে এসে বেগমের মনের সান্ত্বনা আহরণে উৎসাহী হত। এমনি রাজ্যেই সে বাস করে। কেউ আপন নেই। সব কর্তব্যের ভৃত্য। অন্তরঙ্গতা এখানে দুর্লভ।

এমনি যখন বেগমের মানসিক অবস্থা, হঠাৎ একদিন জর্জ টমাস বলে এক আইরিশ যুবক এসে বেগমের সঙ্গে দেখা করলো। সে পরিচয় দিল, ব্রিটিশ রণপোতের নাবিক-রূপে এদেশে এসেছিল। জাহাজের কাজ ত্যাগ করে মাদ্রাজে কয়েক বছর সৈনিকের কাজ করবার পর বেগমের নাম শুনে এখানে এসেছে। উদ্দেশ্য বেগমের সেনাদলে সে যোগদান করতে চায়।

পরিচয়ে মুগ্ধ হবার চেয়ে টমাসের সুপুরুষ আকৃতি দেখে বেগম মুগ্ধ হল। একমাথা অবিন্যস্ত সোনালী চুল, পিঙ্গল চোখ, শুভ্রবর্ণ বলিষ্ঠ গড়ন। সবার চেয়ে মুখের দীপ্তিতে এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা। এমন বুঝি সমস্ত ইউরোপীয় সেন্য-বাহিনীর মধ্যে একটিও নেই। মনে মনে বেগম এই নবাগত বিদেশীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করলো কিন্তু সে ভাব গোপন করে টমাসের সাহসের পরীক্ষা নেবার জন্যে বেগম তাকে পরীক্ষামূলকভাবে সৈন্য পরিচালনার পদে নিয়োগ করলো এবং অবিলম্বে এক বিদ্রোহ দমনের জন্যে অধিনায়ক করে একদল সেন্য দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

বেগমের পরীক্ষা বড় ভীষণ। টমাস নিজে জানতে পারলো না, তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে। একের পর এক সে সৈন্য পরিচালনা করে বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করতে লাগলো। কয়েকটি দেশীয় শাসনকর্তাকেও যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করলো। বেগমের জায়গীরের সীমা বর্ধিত হল। বহু বিদ্রোহ দমিত হল।

তারপর বেগম জর্জ টমাসকে ফিরে আসতে বললো। টমাস ফিরে এলে তাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়ে বেগম পুরস্কৃত করলো। তারপর তাকে নিজের প্রধান পরামর্শ-দাতা নিযুক্ত করে বীরকে সম্মান জানালো।

বেগম তার যোগ্য লোক খুঁজছিল। এতদিনে বুঝি সেই যোগ্য লোক সরদানায় এসে উপস্থিত হয়েছে। সোমরুর চেয়ে এই লোকের ক্ষমতা কিছুমাত্র কম নয়, এমনি ধারণা হতে বেগম টমাসের সঙ্গে এক অভিনব আচরণ শুরু করলো।

বেগমের খাসকক্ষেই টমাসের যা কিছু কাজ। টমাসের ওপর বেগমের হুকুম ছিল, এক আহার-নিদ্রা ছাড়া সে কোন সময়েই চোখের আড়াল হবে না।

টমাস নিরুপায়। বেগমের নির্দেশই পালন করলো। সব সময়ে তার খাসকক্ষে থেকে রাজকার্যের নানান পরামর্শ দিতে লাগলো।

বেগম কিন্তু টমাসের কাছে শুধু রাজকার্যই প্রার্থনা করতো না, আরো কিছু। হৃদয়ের কোন কথা। ব্যক্তিগত প্রশ্ন। তাই বেগম বার বার টমাসকে বলতো—জর্জ, ওসব বিষয়ের গুরুত্ব আপাতত রেখে দাও। একটু অন্য বিষয় আলোচনা কর।

টমাস প্রভুর আচরণে বিস্মিত হত। অবশ্য চতুর সৈনিক, সবই বুঝতে পারতো কিন্তু পাছে কোন অপরাধ হয়ে যায় এই ভয়ে সন্ত্রস্ত। বুঝতে পারতো না, হঠাৎ বেগম কেন তার প্রতি এত সদয় হলেন? তাই রাজকর্মের বিষয় ছাড়া ভিন্ন আলোচনা করতে তার প্রথমে সঙ্কোচই উপস্থিত হত।

বেগম টমাসের আচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো, তিক্তকণ্ঠে বলতো,—জর্জ তুমি কি পাথর? তুমি কি শুধু কর্তব্য করতেই এখানে এসেছ? আমি তোমাকে যে পদগৌরবে ভূষিত করছি, তা কি জন্যে জানো না? তুমি সত্যই নির্বোধ।

টমাস নীরবে সেই অপমান হজম করতে লাগলো। শুধু সহ্যের একটা সীমা আছে। তাছাড়া টমাসের শরীরে যুবরক্ত। তারুণ্যে চঞ্চল কি সেও নয়? সেও কি রমণীর কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে পুরুষশক্তি ধরে রাখে নি? বেগমের মহলের বাইরে তো সে প্রাণচঞ্চল! ইউরোপীয় বলরুমে তার স্ফূর্তি সর্বজনবিদিত। সবাই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তরুণীরা তার সঙ্গ পাবার জন্যে লালায়িত। এমন কি এর মধ্যে দুটি ফরাসী মেয়েদের মধ্যে টমাসের সঙ্গে নৃত্য করা নিয়ে কলহ হয়ে গেল।

এসব কথাও বেগমের কানে গেল। কিন্তু সে সংযত প্রকৃতির রমণী। কলহপ্রিয় রমণীর মত উচ্ছ্বাস তার শোভা পায় না। তাই অন্য আচরণের আশ্রয় নিল। টমাস তার, টমাস যে আর কারো নয় এইটুকু ঈর্ষা মনে ধরে সে কৌশলের আশ্রয় নিল। রাজকার্যে বেগম কতবড় একজন শ্রেষ্ঠা, সে সকলেই দেখেছিল। এবার বেগম প্রেমের ভূমিকাতেও অপূর্ব অভিনয়ের ক্ষমতা প্রদর্শন করলো।

টমাস তার পরামর্শদাতা। বেতনভোগী। তার নির্দেশ মেনে না চললে আইনত অপরাধ। সুতরাং টমাসের সেই নিরুপায় অবস্থার সামনে বেগম তার রমণী শরীর মেলে ধরলো। একটি পুরুষের তপস্যা ভঙ্গ করতে একটি রমণীর বেশী শ্রম স্বীকার করতে হয় না। ঈশ্বর রমণীর শরীরে সেই আকর্ষণীয় ক্ষমতা দিয়েছেন। রূপসী বেগম অশান্ত হৃদয় নিয়ে বহুদিন ধরে চঞ্চল হয়েছিল। নিজের পথ ঠিক করতে, নিজেকে বিচার করতে অনেক সময় নিয়েছিল। তারপর জর্জ টমাস আসতে তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব সব অপসারিত হয়েছে। অনেক তো চেষ্টা করলো, কিন্তু নিজেকে শান্ত করতে পারলো কই? যাক্ যা হবার তা হবে। এতদিন মনের বিরুদ্ধে লড়ে যখন পরাজয় বরণ করতে হল, তখন মনের স্বাধীনতাই প্রকাশিত হোক্। পরিণাম চিন্তা করে ভীত না হয়ে ইচ্ছার মাঝেই জীবনের স্রোত প্রবাহিত হল।

তাই বেগম টমাসের প্রতি এক অস্বাভাবিক আকর্ষণ অনুভব করে তাকে কর্তব্যপথ থেকে বিচলিত করলো। বেগম কোনদিনও নিজের যৌবন সুষমা প্রকটিত করে নি। এ জায়গায় যেন সে ভিন্ন এক প্রকৃতির মেয়ে। এমন কি মা যখন তাকে নাচ শেখাত, তখনও সে পর্যাপ্ত বসনে নিজেকে আবরিত করে রাখতো। কতদিন মা তার জন্য

কটূক্তি করেছে। বলেছে, মুন্নি, বসন সংক্ষিপ্ত কর, না হলে নাচের কৌশল আয়ত্ত করতে সঙ্কোচ আসবে। তাছাড়া নর্তকীর যৌবন সুষমা প্রকটিত না করলে নাচের ইনাম মিলবে না।

তবু মুন্না সেদিন বসন সংক্ষেপ করে নি। বরং পর্যাপ্ত বসনের ঘেরাটোপ দিয়েই সে লোলুপ যৌবনকে ঢেকে রেখেছে। সেই মুন্না আজ বেগম হয়ে একি করলো? মানুষের জীবনের কাল একই অবস্থায় যায় না, এই দৃষ্টান্তই প্রমাণ। এমন কি স্বভাব সেই জীবনের মুহূর্তকে স্বীকার করতে গিয়ে পরিবর্তিত হয়, বেগমের দৃষ্টান্তে তা প্রমাণিত হল।

যাই হোক, টমাস বুঝলো বেগম তাকে অন্যভূমিকায় দেখতে চায়। তাই কর্ত্রীর সম্মানকে বাঁচিয়ে রেখে সামান্য অগ্রসর হল।

কিন্তু সামান্য তো বেগম চায় না, বেগম চায় অনেক। একটি পুরুষের কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়ার আশা তার। এমন কি সেই বাওরসের মত বন্যস্বভাব নিয়ে যদি টমাস এগিয়ে আসে, তাতেই সে খুশি হয়।

কিন্তু টমাস মার্জিত, বাওরস ছিল বন্য। বাওরস বেগমকে সাময়িক আনন্দের সঙ্গিনী করতে ইচ্ছুক হয়েছিল, টমাস সে ভূমিকা চিন্তা করতেই পারে না।

টমাস দিন দিন কেমন যেন বেগমের আচরণে কর্ত্রীর সম্মান ধরে রাখতে অক্ষম হল। আর বেগম তো অনেকদিন আগেই কর্ত্রীর সম্মান থেকে সরে গিয়ে টমাসকে আপন করেছে। এমন কি একদিন বেগম স্পষ্ট বলে দিল,—জর্জ, তুমি ঐ সৈনিকদের বলরুমে যাও, আমি পছন্দ করি না।

টমাসের মুখে তখন এসে গিয়েছিল—আমিও তো সৈনিক। কিন্তু সে কথা সে বললো না, শুধু বেগমের অবগুন্ঠনহীন মুখের ওপর নির্বোধের মত তাকিয়েছিল।

বেগম যে কি চায় সে কিছুতেই বুঝতে পারে না।

টমাস বোধহয় আস্তে আস্তে বেগমের রূপের মোহে অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল। তপস্যা বোধহয় তার পথ পরিবর্তন করেছিল। পরবর্তী আচরণ কেমন যেন টমাসের পরিবর্তিত হচ্ছিল। এখন বেগম চঞ্চলতা প্রকাশ না করলেও টমাস চঞ্চল হয়। টমাস বেগমের সঙ্গে অন্তরঙ্গের মত কথা বলে। রাজকর্ম ছাড়া ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার দিকেও যায়। একদিন টমাস এসে বেগমকে বললো, বেগমসাহেবা আপনার কর্মচারীদের মধ্যে আমাদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

বেগম ক্ষুণ্ণস্বরে বললো,—তার জন্যে কি করতে পারি? প্রস্তরের সিংহাসনটির মত যদি শাসনককর্ত্রীও পাথর হত, তাহলে এই আলোচনা হত না।

এমনি সময়ে একদিন আর এক সৈনিক পুরুষ এসে সরদানার শাসনকর্ত্রীর কাছে চাকরির জন্যে আবেদন করলো। নাম লিভাসো, জাতিতে ফরাসী। শিক্ষিত, সুপুরুষ। জর্জ টমাসের সমকক্ষ।

লিভাসো ও টমাস।

লিভাসো যেন টমাসের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার জন্যে সরদানায় হঠাৎ আবির্ভূত হল।

টমাসের মুখ শুকোলো। এতদিন সে যদি বা বেগমের আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল, এখন যেন বেগমের জন্যেই সে চিন্তিত হয়ে উঠলো।

লিভাসো প্রথম থেকেই বেগমের প্রিয়পাত্র হল। টমাসকে তবু পরীক্ষা দিয়ে বেগমের প্রিয়পাত্র হতে হয়েছিল, কিন্তু লিভাসোর তা আর দরকার হল না।

বেগম যেন ইচ্ছে করেই এই দুজনকে প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করলো! তাই প্রথম থেকেই টমাসের সঙ্গে লিভাসোর সংঘর্ষ বাঁধলো। টমাস বুঝতে পারে নি লিভাসোর ওপর বেগমের পক্ষপাতিত্ব ছিল। সেই না বুঝতে পারার জন্যে টমাস লিভাসোর বিরুদ্ধে বেগমের কাছে বার বার অভিযোগ পেশ করতে লাগলো। টমাসের অভিযোগ, লিভাসোর অপরিণামদর্শিতা, কার্যে অমনোযোগী, শৈথিল্য বিষয়ের নানান নিদর্শন সে বেগমের কাছে প্রকাশ করলো!

কিন্তু বেগম টমাসের কথায় কর্ণপাত করলো না। বরং লিভাসোর দিকেই তার আচরণ হয়ে উঠলো ভিন্নমুখী। এমন কি বেগমের মনের পরিচয় অজ্ঞাত থাকলো না। টমাসের সঙ্গে বেগম আগে যেমন ব্যবহার করতো লিভাসোর সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করতে লাগলো।

টমাস সবই বুঝতে পারলো, তবু লিভাসোর ওপর তার শত্রুতা পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকলো।

বেগম নিজেকে আলাদা রেখে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপভোগ করতে লাগলো।

টমাস শেষপর্যন্ত পেরে উঠলো না। অগত্যা তার রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন ছাড়া উপায় থাকলো না। সে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখলো কারণ তখন সত্যিই সে বেগমকে ভাল বেসেছিল। লিভাসোর মত প্রেমিক বেগমকে জয় করবে এ সহ্য করতে না পেরেই হয়তো ভালবাসা তার জাগ্রত হয়েছিল।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত টমাস সহ্য করতে না পেরে কর্মত্যাগ পত্র দাখিল করলো। ভেবেছিল, বেগম হয়তো এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে টমাসকে পত্র প্রত্যাহার করতে বলবে কিন্তু তা না বলতে টমাস অভিমান করে সরদানা পরিত্যাগ করলো।

বেগম মনে মনে এই চাইছিল। টমাসকে একদিন সে ভালবাসা দান করবার জন্যে উৎসাহী হয়েছিল, সেদিন আর কেউ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না বলে এবং বেগম সেই অশান্ত মনের জন্যে টমাসের সঙ্গে নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছিল। এখন টমাসকে সোজাসুজি কিছু বললে পাছে সেই সব ঘটনা সে ক্ষুব্ধস্বরে বলে এইজন্যে বেগম নির্বাকের ভূমিকা নিয়েছিল।

টমাস চলে যেতে বেগম তার মনোভিপ্রায় প্রকাশ করলো। লিভাসো চতুর এবং বুদ্ধিমান ছিল তাই সে বেগমের কৌশলটি বুঝতে পারলো। কিন্তু বেগম একেবারে বিবাহের প্রস্তাব করতে সে অবাক হয়ে গেল এবং আশ্চর্য হয়ে সরদানার শাসনকর্ত্রীর মুখের ওপর বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো।

শুধু একটি সুন্দরী রমণী নয়, তার সঙ্গে অঢেল ধনদৌলত ও একটি সুবিস্তৃত রাজ্য,

যার বার্ষিক আয় বাইশ লক্ষ টাকা।

ফরাসী সেই ব্যক্তিটি আর যেন নিজেকে সংযত করে রাখতে পারলো না। আবেগে ছুটে গিয়ে বেগমের গণ্ডদেশে একটি প্রগাঢ় চুম্বন আঁকলো।

এ ছাড়া উপায়ও ছিল না। বেগম পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতাকে জয় করে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমাকে প্রসারিত করেছিল। শুধু একটি শক্তিকেই সে পরিহার করতে পারে নি, আর তার কাছেই নিজেকে বলি দিতে বাধ্য হল। প্রণয়ের আচরণ করে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজের উজ্জ্বল চরিত্রকে কলঙ্কিত করার চেয়ে এ অনেক ভাল। তবু বিবাহের মধ্যে যে প্রশান্তি আছে তাতে মনের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। সেই স্বাতন্ত্র্যের জন্যেই বেগম লিভাসোর মাঝেই নিজের সব বিলিয়ে দিল কিন্তু তবু সে পূর্ণ সাহস প্রকাশ করতে পারলো না। সোমরুর রাজত্ব। সে সোমরুর বেগম। সোমরুর বেগম বলেই এই রাজত্ব পরিচালনা করবার অধিকার সে পেয়েছে। সেই সোমরুকে অবমাননা করে অন্য কাউকে শাদী করলে যে কর্মচারীরা সহ্য করবে না, তা সে জানতো বলেই শাদী প্রকাশ্যে করতে পারলো না।

জীবনের কী বিচিত্র রহস্য। সরদানার শাসনকর্ত্রীর শাদী হল ধর্মযাজক গ্রেগোরিওর ছোট্ট একটি কক্ষে। রোমান ক্যাথলিক মতে বিবাহ হল। শুধুমাত্র দুটি লোক পৃথিবীতে সাক্ষী থাকলো। দুজনেই বেগমের সবচেয়ে বিশ্বাসী লোক। সালুর ও বার্ণিয়ার। বার্নিয়ার সালুরেরই একজন বিশ্বস্ত সহকারী ছিল।

কিন্তু বিয়ের পরেও বেগমকে সোমরুর বিধবার মত প্রকাশ্যে থাকতে হল। অবশ্য গোপনে তারা বিবাহিত জীবন উপভোগ করতে লাগলো। কিন্তু বিরাট রাজপুরীর মধ্যে বিশেষ করে বেগমের গতিবিধি সম্বন্ধে সবারই একটু দৃষ্টি ছিল। কিন্তু লিভাসো বহু সদগুণের অধিকারী হলেও উদ্ধত প্রকৃতির লোক। তার আচরণ খুব বন্ধু ভাবাপন্ন নয়। সে বেগমের স্বামী হয়ে যেন বেগমের ওপর কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে লাগলো। এই ঔদ্ধত্য কর্মচারীদের সহ্যাতীত হল। বেগমও এই উদ্ধত ব্যক্তিকে শুধু প্রণয়ের অধিকারে কেন সহ্য করছেন, বুঝতে না পেরে তারা বিরক্ত হল। বেগমের সেই দৃঢ়স্বভাবের শাসন পরিচালনায় কোথায় যেন শৈথিল্য জেগে উঠেছে। সে লিভাসোর বিরুদ্ধে কোন কথাই বলতে পারলো না।

এমন কি দিন দিন লিভাসো তার স্বামীত্বের অধিকারই প্রকাশ করতে লাগলো।

ইউরোপীয়দের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার জন্যে বেগম সান্ধ্যবৈঠকে যোগদান করত এবং একসাথে খানাপিনা করত।

লিভাসো সেই নিয়ম বন্ধ করে দিল। সে বেগমকে জানালো, ইউরোপীয় সেনানায়কদের সঙ্গে আর একত্রে আহার করতে পারবে না। এমন কি সব মেলামেশাও বন্ধ

করে অন্তঃপুরিকার মত থাকতে হবে।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর শাসন। বেগম নিরুপায়। স্বামীকে স্বীকার করলে তার শাসনও মানতে হবে। তবু সে বললো, 'লিভাসো ঐ আদেশ প্রত্যাহার কর। দুর্ধর্ষ মূর্খ ইউরোপীযদের চটালে ভাল হবে না। তাদের শক্তিতেই রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর করছে। সামান্য একটু ভদ্রতা প্রদর্শন করে একত্রে পানভোজন করলে ওরা যে কি খুশি হয় বোঝ না! ওদের সঙ্গে আত্মীয়তা সৃষ্টি করলে তাতে আনুগত্য ও শ্রদ্ধায় রাজের মঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অবজ্ঞা প্রদর্শন করলে অনর্থ সংঘটিত হতে পারে।'

. লিভাসো তবু জিদ বজায় রাখলো। সে দূরদর্শী বেগমের যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। ইউরোপীয়দের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিল।

ফল যা হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল। অসন্তোষের বহ্নি প্রজ্বলিত হতে বেশীদিন সময় লাগালো না। একে লিভাসোর উদ্ধত আচরণ তার ওপর বেগমের এই লিভাসোর ওপর পক্ষপাতিত্ব, সেনানায়কদের ক্ষিপ্ত করলো। এতকালের শ্রদ্ধা তারা বিস্মৃত হয়ে অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে একজোট হল।

বেগম পরিণাম আগেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু উপায় কি? লিভাসোর কাছে সব তার বিলিয়ে দিতে হয়েছে, এখন ফেরবার উপায় নেই।

সে নিজের কক্ষের মধ্যে আতঙ্কিত হয়ে বসে থেকে অধীন সৈনিকদের ঔদ্ধত্য ও অবাধ্যতার পরিচয় পেতে লাগলো। রাজ্য তার সুশৃঙ্খল ছিল, তার আজ এই পরিণাম দেখে বিমূঢ় হল। কিন্তু উপায় কি? এমন যে হবে তা সে জানতো। তার প্রবৃত্তি যেদিন থেকে তাকে অশান্ত করে তুলেছে, সেদিন থেকেই সে বুঝতে পেরেছিল সরদানা রাজ্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সর্বনাশা তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, তার কাছ থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই।

আজ সেই ভবিষ্যৎ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ফুটতে শুরু করেছে। আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। পরিণাম তো সে জেনেই ছিল।

তাই সরদানার দর্পিতা কাল ভুজঙ্গিনী ফণা সঙ্কুচিত করে, আর এক বিরাট শক্তির কাছে পরাভবে পরিত্রাণের উপায় খুঁজতে লাগলো।

অন্ধকারের মধ্যে এতটুকু আলোর জন্যে সে দিশেহারা হয়ে উঠলো। তারপর লিভাসোকে জানালো পালাতে হবে।

লিভাসোও পরিণাম দেখে সমর্থন না জানিয়ে পারলো না।

চতুর্দিকে তখন গুপ্ত ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। প্রাণ সংশয় হওয়াও বিচিত্র নয়। শুধু লিভাসো মরবে না, ক্ষিপ্ত সৈনিকেরা বেগমকেও তার দুর্ব্যবহারের শাস্তি দেবে। এখন আর তারা বেগমের অনুগত নয়। শ্রদ্ধাও অপসারিত হয়েছিল। সোমরুর বেগম, সোমরুর প্রতি শ্রদ্ধা না প্রদর্শন করে অন্য পুরুষের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছে, সুতরাং সোমরুর অবমাননার জন্যে বেগমের শাস্তি প্রাপ্য। সোমরুর প্রতিনিধি হয়ে যেন সৈনিকরা সোমরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে বেগমের বিচার চাইলো।

আর বেগমের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। তার সে আগের তেজ আর ছিল না।

লিভাসোর সঙ্গে গোপনে বিবাহিতা হবার পরই যেন তার সব উৎসাহ চলে গিয়েছিল। অন্যায় জীবনে সে করে নি। সেই অন্যায় করতে বাধ্য হয়ে তার জীবনের এক দৃঢ়তা অপসারিত হয়েছিল। তাছাড়া যে সৈনিকদের বাহুবলের ওপর নির্ভর করে তেজস্বিনী হয়েছিল, তারা বিরুদ্ধাচরণ করতে তার সব কর্মোদ্যম চলে গেল।

সুতরাং এরপর মান, সম্মানের প্রশ্ন। জীবন যদি যায়, তার জন্যে অতো চিন্তা নয়, মান সম্মান গেলে আর থাকলো কি? তাই সে মান সম্মানে বাঁচানোর জন্যে সরদানার সমস্ত আধিপত্য ত্যাগ করে চলে যেতে মনস্থ করলো।

বিলম্ব করবারও উপায় নেই। যে কোন সময়ে বিদ্রোহীরা রাজভবন আক্রমণ করতে পারে, তাই অবিলম্বে পলায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

লিভাসোও উপায়ন্তর না দেখে সরদানা ত্যাগের জন্যে ইংরেজপক্ষীয় কর্নেল ম্যাকগাউয়ানের শরণাপন্ন হল। ম্যাকগাউয়ান এই সময়ে গঙ্গাতীরবর্তী অনুপশহর সেনানিবাসের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। অনুপশহর সরদানার বেশী দূরে নয়। সরদানা ত্যাগ করে দ্রুত সেই আশ্রয়ে পেঁছিলেই সুবিধে। তাই লিভাসো ম্যাকগাউয়ানকে জানালো, তারা সেনানিবাসে আশ্রয় নেবে, তারপর কর্নেলের তত্ত্বাবধানে ফরাক্কাবাদে গমন করবে। সেখানেই তাদের উপস্থিত বাস করবার ইচ্ছা। ম্যাকগাউয়ানকে অবশ্য তাদের বিবাহের কথা জানালো না।

কিন্তু কর্ণেল সম্মত হলেন না। সম্রাটের একজন কর্মচারীকে পলায়নে সহায়তা করে পরে হয়তো দোষী সাব্যস্ত হবেন।

অগত্যা লিভাসো ভারতের গভর্নর জেনারেল স্যার জন শোরের কাছে পত্র লিখলো। জন শোর আবার বেগম ও তার সঙ্গীর সম্বন্ধে ইংরেজ দূত মেজর পামারকে দিয়ে সিন্ধিয়ার দরবারে অনুরোধ করলেন। লিভাসো জন শোরের কাছেও তাদের বিবাহ গোপন করে গেল।

মাধোজী সিন্ধিয়া তখনও দিল্লীর সর্বেসর্বা। শাহ আলমেব আর ক্ষমতা ছিল না। তাঁর তখন শেষ অবস্থা। তাঁর যদি ক্ষমতা থাকতো, হয়তো বেগমের এই বিপদে সাহায্য করতেন। কিন্তু তাঁর কোন ক্ষমতা ছিল না বলে বেগমও তার সাহায্য প্রার্থনা কবে নি। না হলে সে বিপদে বোধ হয় তখন শাহ আলমই বেগমকে আশ্রয় দিতেন।

মাধোজী সিন্ধিয়া বেগমের উপকার বিস্মৃত হলেন। বরং এই বিপদে তিনি সুযোগ গ্রহণ করলেন। বেগম দিল্লীশ্বরের সৈন্য সাহায্যার্থে প্রদত্ত জায়গীর ভোগ করছে। সুতরাং স্থান ত্যাগের জন্যে সিন্ধিয়ার অনুমতি নেওয়া দরকার। যদি স্থান ত্যাগ করতে চায় তাহলে সৈন্য চালনারূপ দুরূহ কার্য থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যে বারো লক্ষ টাকা সিন্ধিয়াকে দিতে হবে।

বেগম শুনেই ক্ষুব্ধ হল। সিন্ধিয়ার ব্যবহারে চমকিত হল। টাকা কে পাবে? বেগমেরই তো পাওয়ার কথা। তাই সে পরিবর্তে সিন্ধিয়কে জানালো,—সরদানার সমস্ত সৈন্য পরিচালনার ভার আমি আপনার হস্তে ন্যস্ত করছি। আমার এবং স্বামীর

যাবতীয় সৈন্যের ব্যবহারার্থ সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে যে অর্থ ব্যয় করেছি, তা অবিলম্বে যখন আপনার ওপর ন্যস্ত করলাম, তখন টাকা আমারই প্রাপ্য। সুতরাং সেই মত ব্যবস্থা করে প্রেরণ করবেন।

তারপর কয়েকদিন ধরে সিন্ধিয়ার সঙ্গে এই নিয়ে পত্র বিনিময় চললো। অবশেষে ঠিক হল, সিন্ধিয়ার এক কর্মচারীর হাতে সেনাদলের ভার অর্পণ করে বেগম জায়গীর ত্যাগ করবে। এই কর্মচারী শুধু জাফর ইয়াবকে আমরণকাল মাসিক দু'হাজার টাকা বৃত্তি দেবে।

লিভাসোর ওপর নির্দেশ হল, সে ইংরেজ সীমানায় বাস করতে পারবে তবে বন্দীর মত। অবশ্য ইচ্ছা করলে সস্ত্রীক চন্দননগরে গিয়েও বাস করতে পারবে।

তখন আর তাদের বিবাহ গোপন ছিল না। তাই বেগমের যে সৈন্যদল দিল্লীতে ছিল তারাও বিদ্রোহী হল। তারা জাফর ইয়াবকে পৈত্রিক জায়গীর উদ্ধারার্থে উৎসাহিত করবার জন্যে কৃতসঙ্কল্প হল। ভাগ্যগুণে তখন জাফর দিল্লীতে বেগমের প্রাসাদেই অবস্থান করছিল। বিদ্রোহী সেনাদল দ্রুত সরদানার অভিমুখে যাত্রা করল বেগম ও তাঁর বর্তমান স্বামীকে ধরবার জন্যে।

সংবাদ চাপা ছিল না। বেগম ও লিভাসো গুপ্তচরের মুখে বিদ্রোহীদের অভিযান অবগত হয়ে একদিন মধ্যরাত্রে গোপনে সরদানা পরিত্যাগ করলো।

লিভাসোর কথা না ছেড়ে দেওয়া গেল কিন্তু বেগম? বেগমের তখনকার অবস্থা চিন্তার বহির্ভূত। মৃত্যুর মুখোমুখি সেদিন তাকে পৌঁছতে হল। এক প্রবৃত্তি দমন না করতে পেরে মসনদের উজ্জ্বল মঞ্চ থেকে একেবারে নিচে পতিত হল। মান, গেল, ইজ্জত গেল। বিরাট প্রতিপত্তিও তার গেল। শুধু প্রাণরক্ষার জন্যে এক শিবিকায় আরোহণ করে অন্ধকার গভীর রাত্রে গোপনে সরদানা ত্যাগ করতে বাধ্য হল।

স্বামী অশ্বারূঢ় হয়ে হস্তে পিস্তল ধরলো। বেগমের হস্তে শাণিত ছুরিকা সঙ্গে কয়েকটি পরিচারিকা, সেই মারিয়া, সোফিয়া, রোজানাও ছিল।

বিদ্রোহীরা তখন ছুটে আসছে। কত পথ এসেছে কে জানে? তাদের পৌঁছাবার আগে অনুপশহরে গিয়ে পৌঁছতে পারবে কিনা সন্দেহ হল। তাই তারা ঠিক করলো, বিদ্রোহীদের হাতে যদি ধরা পড়ে তাহলে তার আগেই আত্মহত্যা করবে। এইজন্যে লিভাসো পিস্তল উত্তোলিত করে বেগমের শিবিকার পাশে পাশে চললো আর বেগমও শিবিকার মধ্যে ছুরিকা হস্তে বসে থাকলো।

অন্ধকার রাত্রি। সেদিনও চাঁদ ওঠে নি। বনজঙ্গলের পাশ দিয়ে আলোকহীন পথে বাহকের কাঁধে শিবিকা চলেছে। আর সঙ্গে অন্য কোন দ্বিতীয় রক্ষী নেই। যার শত শত রক্ষী, তার আজ অরক্ষিত অবস্থায় গভীর রাত্রে পথ চলা।

যাই হোক সরদানা থেকে তারা তিনমাইল মাত্র গমন করেছে। কাব্রির কাছে গিয়ে পৌঁচেছে, এই সময় বিদ্রোহীদের পদশব্দ শুনতে পাওয়া গেল। উন্মত্ত একদল অশ্বারোহীর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসা অশ্বের পায়ের শব্দ সেই অন্ধকারে যেন ঝড়ের তান্ডব তুললো।

আর সময় নেই। এখুনি যা কিছু করবার করতে হবে। নয় মৃত্যু নয় বিদ্রোহীদের হস্তে ধৃত হওয়া। লিভাসো বেগমের শিবিকার পাশ দিয়েই চলছিল, শেষ একবার সে বেগমকে জিজ্ঞাসা করলো তার পূর্বসঙ্কল্প স্থির আছে কিনা।

বেগম তখন মনকে সম্পূর্ণ দৃঢ় করে নিয়েছে। বিদ্রোহীদের মান সম্মান দিয়ে নির্যাতন ও অপমান সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। একদিন উচ্চসিংহাসনে বসে মানুষের শ্রদ্ধা কুড়িয়ে যে দৃঢ় সঙ্কল্পের ওপর তার জীবন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজকে প্রাণের মমতার চেয়ে সেই মান সম্মান বাঁচাবার জন্যে সচেতন হওয়াই স্বাভাবিক। বেগম মনস্থির অনেক আগেই করে নিয়েছিল। তাই লিভাসোর কথায় ম্লান হেসে বললো,—মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই আমি অপেক্ষা করছি।

লিভাসো শিবিকার বাহকদের এগিয়ে যেতে বলে কেন যেন পিছিয়ে গেল। তার তখন মানসিক অবস্থা বোঝা যাচ্ছিল না, তবে তার হস্তে পিস্তল ধরা ছিল। তবে কি লিভাসো ভয় পেয়ে পলায়নের জন্য সুযোগ খুঁজছে ?

কিন্তু তার চিন্তার অবকাশ ছিল না। প্রতিটি মুহূর্ত তখন মূল্যবান ছিল। বিদ্রোহীদের অশ্বের পায়ের শব্দ আরো প্রচন্ড হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, তারা আর বেশী দূরে নয়।

এমনি সময়ে বেগমের পরিচারিকাদের মধ্যে কান্নার রোল উঠলো। বেগম বক্ষে ছুরিকাঘাত করেছে। রক্তে তার বক্ষবাস প্লাবিত হচ্ছে। বোধ হয় বেগম নিহত।

লিভাসো একটু পিছিয়েই ছিল, ছুটে এসে স্বল্পালোকের মধ্যে বেগমের অবস্থা অনুধাবন করে সেও আর দ্বিধা না করে বুকের ওপর পিস্তল চেপে ধরে ট্রিগার টিপলো। নিস্তব্ধ আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনি তুলে দুটি পিস্তলের গুলিতে লিভাসোর বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেল। সে অশ্ব থেকে মাটিতে মুহূর্তে পড়ে গেল।

বিদ্রোহীরা এসে পেঁছিলো। তাদের হাতে প্রজ্বলিত মশাল। সেই মশালের আলোয় তারা বেগমকে পরীক্ষা করে দেখলো, বেগম সংজ্ঞাহীন, তবে মৃত নয়। তার বক্ষে ছুরিকা আমূলে বিদ্ধ হয় নি, একখানি অস্থিতে প্রতিহত হয়েছে। কিঞ্চিৎ শুশ্রূষায় তারা বেগমকে বাঁচিয়ে তুললো। বাঁচিয়ে না তুললে যে নির্যাতন করা যাবে না। যে রমণীকে একদিন তারা সবচেয়ে ভালবাসতো, আজ তাকেই নির্যাতন করার জন্যে যে তারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। আর তার জন্যেই যে এত আয়োজন করে ছুটে এসেছে সঙ্গে সেই সপত্নী পুত্র জাফর ইয়াব ছিল, যাকে একদিন বেগম সামাজিকতা দান করেছিল, সোমরুর উত্তরাধিকারী বলে সম্মান দিয়েছিল, বেঁচে থাকার জন্যে দিয়েছিল যত্ন। সেই জাফর মায়ের নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সবচেয়ে নির্মম হল। বেগমকে শাস্তি প্রয়োগের জন্য তার হস্ত হল সবচেয়ে দৃঢ়।

আর লিভাসো। তাকে জীবিত ধরতে না পারার জন্যে বিদ্রোহীরা আফসোস করলো। যে লোকটির জন্য বেগমের আজ এই পরিণাম, সেই লোকটিকে জীবিতাবস্থায় ধরতে পারলে বুঝি সবচেয়ে মঙ্গল হত। অন্তত প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদ্রোহীদের

নির্মমতা সবচেয়ে তৃপ্তির আস্বাদন গ্রহণ করতো। কিন্তু তবুও তারা লিভাসোকে পরিত্রাণ দিল না। সহস্র বিদ্রোহীর শাণিত ছুরিকা সেই মৃতকেই খণ্ডবিখণ্ড করলো, তারপর পরিত্যক্ত অংশগুলি পদাঘাতে সামনের পয়ঃপ্রণালীতে নিক্ষিপ্ত করল।

বিজয়ী সেনাদল বেগমকে বন্দী করে সরদানায় গিয়ে পেঁছিলো। বেগমের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। সোমরুর প্রতি অবহেলা করার জন্যে ও নিজের চরিত্র কলঙ্কিত করার জন্যে জাফর ইয়াবের নির্মম বিচারই হল মৃত্যুদণ্ড। তবে সে মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সংঘটিত হবে। বেগম যেমন মৃত্যুদণ্ড দিতে গেলে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্য নিত, বেগমের মৃত্যুদণ্ড তেমনি ভিন্ন এক নির্মমতার মধ্যে দিয়ে ঘোষিত হল। তাকে একটি বৃহৎ কামানের সঙ্গে রজ্জুবদ্ধ করে রাখা হল। বদ্ধ জায়গায় অনাহারে তাকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাবে।

যে অপমান ও নির্যাতনের ভয়ে বেগম প্রাণসংশয় করতেও দ্বিধা করে নি, সেই অত্যাচার ও লাঞ্ছনা তার ভোগ করলে হল। সুতরাং নিঃশব্দে আবার মৃত্যুরই প্রার্থনা করা উচিত। এখন মৃত্যুই তার জীবনের শান্তি দেবে। অন্যায় সে করেছে, কৃতকর্মের ফল তার অবশ্যই প্রাপ্য। অভিযোগ করার তার কিছু নেই। নসীবের লিখন খণ্ডাবার সাধ্য কার আছে? শুধু আজ প্রার্থনা, মৃত্যু। তার পূর্বধর্মের উপাস্য খোদার কাছে প্রার্থনা করলো, বর্তমান ধর্মের ঈশ্বর যীশুর কাছে প্রার্থনা করলো—হে ঈশ্বর, তুমিও তো একদিন নির্যাতনের পর শান্তির কোলে সমাহিত হয়েছিলে, আজ সেই শান্তি আমাকে মানবিক অবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিয়ে সংঘটিত কর।

কিন্তু তখনও তার বোধ হয় বাঁচবার কাল শেষ হয় নি। তখনও তার বোধ হয় এই জগতে আরও কর্ম করার প্রয়োজন ছিল। গোপনে পরিচারিকারা তাকে দিল আহার্য বস্তু। যে পরিচারিকাদের একদিন সে নির্মম শাস্তি দিয়েছে। বহু পরিচারিকা নয়, মাত্র দুজনকে। সে নিজে কখনও অন্যায় করতো না, কেউ অন্যায় করলে রেহাই দিত না। তবু জুবেদা ও সহেলিকে ভোলা যায় না। তাদের অপরাধ হয়তো সুরাং বিচারে সাংঘাতিক কিন্তু বেগমও সাংঘাতিক শাস্তি দিতে কার্পণ্য করে নি। জ্যান্ত কবরের আদেশ দিয়েছিল। অপরাধ তারা ব্যভিচারিণী হয়েছিল। বেগম যখন ইহারাও টমাসের সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত, সেই সময় পরিচারিকারাও কেমন যেন বেগমকে অনুসরণের করতে গিয়েছিল। বেগম জানতে পেরে অপরাধ ক্ষমা করলো না নিজের সম্বন্ধে বাজেয়ে বললো—প্রবৃত্তি সে দমন করতে পারে নি বলে বাধ্য হয়ে এই আচরণ করেছে, দৃঢ় বলে তারই দাসীরা সংযম ধারণ না করে চারিত্রিক শুচিতা নষ্ট করবে! বেগমের শান্তি তখনই রাজ্যের শুচিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলো। আর তার বিচার হল, পরিচারিকাদের জীবন্ত কবর। উদ্দেশ্য, ভবিষ্যতে এমনি আচরণ করতে কেউ আর সাহসী হবে না। বেগম নিজের শয়ন কক্ষের মেঝেতে জুবেদা ও সহেলিকে জীয়ন্ত কবর দিয়ে সাত রাত্রি তার ওপর শুয়েছিল।

আবার পরিচারিকারাই তার এই দুঃসময়ে সাহায্য করতে এল। বেগম বুঝতে পারলো, ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় তার মৃত্যু হোক। পরিচারিকাদের ছদ্মবেশে তাই পরিত্রাণ

তাকে বাঁচিয়ে তুলতে এসেছে। বেগম সেই বন্দী অবস্থাতেই আবার রাজ্যোদ্ধারের পরিকল্পনা মনে ধারণ করলো।

জর্জ টমাস সেই পরিত্রাতা। বেগম বন্দী অবস্থায় সেই জর্জ টমাসের কথাই ভাবছিল, যাকে একদিন সে অবিচার করেছিল। যার কর্মত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করার জন্যে অনুরোধ পর্যন্ত করে নি, সেই অভিমানে বীর সৈনিক একদিন চোখের জল ও বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে বিদায় নিয়েছিল। বেগম কি তার মনের কথা সেদিন বুঝতে পারে নি? চতুরার অবিদিত কি ছিল? কিন্তু সে যে তখন কুহকিনীর মায়াজালে আবদ্ধ। তখন যে তার বিবেচনা বোধ লোভ পেয়েছিল। সে তখন স্বার্থপর কুলটা রমণী ছাড়া কিছু নয়। লিভাসোর রূপে মুগ্ধ হয়ে টমাসের নীরব প্রণয়কে সে উপেক্ষা করেছে। সব সে জানে। তবু তাকেই সে এই বিপদে সাহায্যের জন্যে প্রার্থনা জানালো। রাজ্যে তার এত শুভানুধ্যায়ী ছিল, তাকেই বা কেন এত মনে পড়লো, এ ইতিহাস অব্যক্ত।

শুধু জর্জ সরদানা ছেড়ে বেগমের সান্নিধ্য থেকে চলে গিয়েছিল তা নয়, অন্যত্র কর্ম নিয়ে সে বেগমের শত্রুতা করতেও ছাড়েনি। একদিন যে বেশী আপন হয়, সেই পরে শত্রু হয়! টমাস বেগমের কর্ম পরিত্যাগ করে আপ্পাখাণ্ডি রাও নামে মহারাষ্ট্রের শাসনকর্তার অধীনে কর্ম নিয়েছিল। টমাস আপন শক্তিতে শক্তিবান ছিল। বেগমের কর্ম করার সময়েই তার ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। তাই স্বতন্ত্র সেনাদল গঠন করতে বেশী সময় লাগেনি। সেই স্বতন্ত্র সেনাদলের অধিনায়ক হয়ে প্রথমে তেজারা ও ঝাঝার অধিকার করলো। তারপর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে বেগমের বহু জায়গীর লুঠ করতে লাগলো।

বেগম এই সময়ে চিন্তিত হল। টমাসের ধ্বংস সাধন না করলে শান্তি নেই। দিন দিন সে যেরকম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে, তাতে ভবিষ্যতে রাজ্য পর্যন্ত অধিকার করতে পারে। এই কথা ভেবে বেগম আপ্পাখাণ্ডি রাওকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে টমাসকে কর্মচ্যুত করার জন্যে অনুরোধ করলো, তারপর নিজে লিভাসোর সঙ্গে পরামর্শ করে ঝাঝার আক্রমণের জন্যে সৈন্যদল নিয়ে রওনা হল। এ কাজ বিবাহের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। ঝাঝারের সতেরো ক্রোশ দূরে শিবির সংস্থাপনের আগে টমাসের এক সহকারী (বেগমের তখনও কর্মচারী ছিল) লিগোইস বেগমকে টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে নিষেধ করেছিল কিন্তু লিভাসো তার এই বিরুদ্ধতায় তাকে পদচ্যুত করলো। সৈন্যেরাও টমাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করতে চায় নি।

তবু বেগম তখন সদম্ভের সিংহাসনে উপবিষ্ট, কারো কথায় কর্ণপাত করে নি। একবারও ভাবেনি, যাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতা করবে, সেই পরে আরো প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করতে পারে। বেগম অনেক বেশী বুদ্ধিসম্পন্না ছিল কিন্তু সেদিন তার সত্যিই

বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, না হলে এত সহজ কথাটা সে বুঝতে পারে নি কেন ?

তাই টমাস বেগমের পত্র পেয়ে অনুতপ্ত হল। যাকে একদিন সবচেয়ে বড় শত্রু মনে হয়েছিল, তার এই নির্যাতনে হৃদয় আর্দ্র হল। সত্যিই প্রতিহিংসার জন্যে সে সেই রমণীর গুণগুলি বিস্মৃত হয়েছিল। তাকে প্রতারণা করে বিতাড়িত করেছে বটে কিন্তু বেগমের শক্তি সাহস বিস্মৃত হবে কেমন করে ? সেই বীরাঙ্গনা রমণী আজ জীবন রক্ষার জন্যে তার শরণাপন্ন হয়েছে। টমাসের চিত্ত কেমন যেন দ্রবীভূত হল, চক্ষু হল সজল। অথচ এই বেগমের ধ্বংস সাধনের জন্যে সেই সবচেয়ে বড় শত্রুতা করেছে। সেই দিল্লীর সৈন্যদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগ্রত করেছে। সেই জাফরকে মসনদের শাসনকর্তা নির্বাচিত করে বিদ্রোহীদের উৎসাহিত করেছে। সমস্ত পরিণামই তো তারই দ্বারা সংঘটিত। তবে এখন কেন বেগমের জন্যে মন কেঁদে উঠছে ? বেগমের উদ্ধারের জন্যে বাহুদ্বয় অস্থির হচ্ছে তাকে আবার সিংহাসনে বসাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করছে।

বেগম পত্রে লিখেছিল, অধিক বিলম্ব করলে শত্রুরা তাকে হয়তো জীয়ন্ত কবর দেবে, সেইজন্যে সত্বর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মহারাষ্ট্রীয়রা যদি এই সময়ে তার উদ্ধার সাধনে সাহায্য করে তবে রাজ্য প্রাপ্তির পর বহু ধনরত্ন তাদের প্রদত্ত হবে। টমাস বাপু সিন্ধিয়ার কাছে অবিলম্বে সেই সম্বন্ধে জ্ঞাত করলো এবং সৈন্য চালনার জন্যে এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা দেবে বলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হল। আর এদিকে গোপনে টমাস সৈন্যদল নিয়ে সরদানার আট ক্রোশ দূরে কাথুনি গ্রামে উপস্থিত হল, উদ্দেশ্য জাফরের সৈন্যদলকে ছত্রভঙ্গ করে নিজের সৈন্যদলে আনা। টমাসকে জাফরের সৈন্য দল বিশ্বাস করতো, একদিন তারই উৎসাহে এই সৈন্যদল বেগমকে শাস্তি প্রয়োগ করতে এগিয়েছিল। টমাস যে পরে তার মত পরিবর্তিত করেছে এ তারা কেমন করে জানবে ? টমাস তাই জাফরের সৈন্যদলকে বোঝালো, জাফর ইয়াব মসনদে উপবিষ্ট হওয়ার উপযুক্ত নয়, বেগমকে না বসালে সম্রাট আবার জায়গীর কেড়ে নেবে। সুতরাং স্বার্থসন্ধানী সৈনিকরা জাফরের শাসন পরিচালনায় খুশি ছিল না। জাফরের যোগ্যতা যেন বেগমের যোগ্যতার কাছে আকাশ প্রমাণ তফাত। তাছাড়া জাফরের চেহারাও সম্রাট হবার উপযুক্ত নয়। কন্ঠও কেমন যেন দুর্বল। সেই কন্ঠের হুকুম যেন দুর্বলের মত মনে হয়। একজন সাধারণ সৈনিকের উপযুক্তও নয়। তাই কদিনের রাজত্বে জাফরের ওপর সৈনিকরা আস্থা হারিয়েছিল। টমাসের কথা শুনে তাদের বিশ্বাস দৃঢ় হল। তাদের মত পরিবর্তিত হল। এদিকে সালুরও সেনানায়কদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসছিল। বেগমের বিরুদ্ধে যখন সকলে গিয়েছিল, সালুর নিরপেক্ষ ছিল। সেই সালুর বেগমকে পুনঃপদে বহাল করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলো।

তারপর আর কি ? সকলের মিলিত চেষ্টায় বেগম একদিন উদ্ধার পেল ও সিংহাসনে বসলো। বিদ্রোহীদল আবার বেগমের অধীন হল। বেগম আবার নিজের পূর্বক্ষমতা ফিরে পেল। আবার তার শাসন পরিচালনা শুরু হল পূর্বের মত। বেগম ত্রিশজন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় সেনানায়কদের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়ে ঈশ্বর ও যিশুখৃষ্টের নামে

শপথ করালো, তারা যতদিন জীবিত থাকবে, বেগমের আদেশ প্রাণপণে পালন করবে।

জাফর ইয়াবের যে অপরাধ, তার দন্ড অনেক নির্মম হওয়া উচিত কিন্তু বেগম সকলকে ক্ষমা করেছিল বলে তাকেও ক্ষমা করলো। শুধু সরদানা থেকে বহিষ্কৃত করে দিল্লীতে বেগমের প্রাসাদে বন্দী অবস্থায় থাকতে নির্দেশ দিল। সিন্ধিয়ার কর্মচারীকে সেই সঙ্গে দেড় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে পাঠিয়ে দিল।

সালুরের কার্যের পুরস্কারস্বরূপ তাকে সেনাপতিপদে বেগম বরণ করলো এবং তার অধীনে সমস্ত অশ্বারোহী, পদাতিক, গোলন্দাজ বাহিনীর কর্তৃত্ব অর্পিত হল।

সবার শেষে বেগম টমাসকে নিয়ে তার সেই পূর্বের খাসকক্ষে প্রবেশ করলো।

তখন আর বেগমের সেই পূর্বের উন্মাদনা ছিল না। সর্পাহত মানুষ যেমন তেজ হারিয়ে ফেলে, তেমনি বেগম তেজ হারিয়ে কেমন যেন শান্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তার মেজাজ স্নিগ্ধ ও মার্জিত। উত্তেজনা যে কখনও তার ছিল, মনেই হয় না।

বেগম তাই শান্তকণ্ঠে টমাসকে জিজ্ঞেস করলো,—জর্জ, বলো তুমি আমার কাছ থেকে কি চাও? আজ একান্ত তোমার সাহায্যেই আমার এই প্রাণ ও হৃতরাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হয়েছে।

টমাস কি বলবে? আজ তার বলার কিছু ছিল না। বেগমের পত্র পেয়ে যে শক্তি তার জেগেছিল, আজ বেগমকে তার রাজ্য ফিরিয়ে দিতে পেরে, সে শক্তি আবার ঘুমিয়ে গেছে। তবে কি সে প্রতিদান আশায় এখনও এখানে আছে? কি প্রতিদান চায় সে এই রমণীর কাছ থেকে?

কিন্তু পৃথিবীতে অনেক ঘটনা যেমনি হঠাৎ ঘটে যায়, তেমনি টমাসের অজান্তে তার মুখ দিয়ে সহসা বেরিয়ে গেল,—বেগমসাহেবা, আমি বলতে লজ্জা অনুভব করি, তবু বলছি, লিভাসো ভাগ্যবান ছিল, সে আপনার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছিল, আমি কি আজও সে ভা য আশা করতে পারি না!

হঠাৎ বেগমের সমস্ত শরীর শিহরিত হল। অতীতের দৃশ্য আবার চোখের ওপর ভেসে উঠে তাকে যন্ত্রণা দিল। সে ভুলে গেল, টমাসের দ্বারা সে যা উপকার পেয়েছে, তার তুলনা নেই। বরং বর্তমান মনের অনুতাপে সে যে শান্ত হয়ে এসেছিল, তারই আবর্তে চঞ্চল হয়ে উঠলো। দু'চোখে হঠাৎ হু হু করে জল এসে তার গন্ড প্লাবিত করলো, তারপর রুদ্ধকণ্ঠে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বললো,—না জর্জ না, আর আমাকে প্রলোভিত কর না। আমি সোমরুর বিধবা স্ত্রী, এই নামে আমাকে পরিচিতা হ ত দাও। তুমি আমার অনেক উপকার করেছ, তোমার ঋণ অপরিশোধ্য। তোমার প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই, এ কথা মনে স্থান দিও না। সেদিনও ছিল, আজও আছে। না'হলে আমার অতো বড় বিপদে তোমার শরণাপন্ন হতাম না। তবে তাই বলে আজ আবার আমাকে আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত কর না। অনেক শাস্তি তো পেলাম। একদিন প্রবৃত্তির কাছে পরাভব স্বীকার করে বহু অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়েছি, তার পরিণাম মর্মে মর্মে আজ উপলব্ধি করছি। আজ মান, সম্মান, ইজ্জত সবই গেছে। রাজ্য আবার ফিরে পেয়েছি কিন্তু সেই আগের গৌরব আর কোথায় পাবো?

বেগম তখন ক্রন্দন করে চলছিল। যেন বহুদিনের জমানো কান্না তার আজ পথ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। বাধা মানবে না। বাধা দেবার জন্যেও বেগম চঞ্চলতা অনুভব করলো না। সেই অস্থির অবস্থাতেই সে বললো,—জর্জ তুমি বিবাহ কর। আমার প্রিয় সখী মারিয়া তোমার অযোগ্য হবে না। তুমি বিয়ে করে অন্যত্র চলে যাও। তুমি এখানে থেক না, থাকলে আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারবো না। আমি সম্রাজ্ঞী, রাজ্য পরিচালনা করাই আমার ধর্ম। প্রজাদের মঙ্গলসাধন করাই আমার কর্ম। সেই পথ থেকে আর আমি বিচ্যুত হতে চাই না। আমাকে কর্তব্য করতে সাহায্য কর। এই কথা বলে বেগম কেমন যেন উধর্বশ্বাসে সেস্থান ত্যাগ করে চলে গেল।

টমাস অভিভূতের মত দাঁড়িয়ে রইলো।

বিরাট প্রলয় হয়ে যাবার পর ধরিত্রীর যেমন শান্ত অবস্থা হয় তেমনি বেগম একেবারে শান্ত হয়ে গেল। মাদকদ্রব্য বর্জন করলো। বিলাসিতা ছেড়ে দিল। পূর্বে সোমরুর বিধবা স্ত্রীর মত যেমন জীবনযাপন করতো, তেমনি জীবনের মধ্যে আবার প্রবেশ করলো। উপাসনাই তার সম্বল হল। ঈশ্বরের কাছে জীবন উৎসর্গ করে শুধু ঈশ্বরেরই কৃপা চাইলো। এই সময় সে বহু ভজন লয় সৃষ্টি করেছিল। আজও যে ধর্মমন্দিরটি সরদানার বুকে অতুলনীয় কীর্তি নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে, তা বেগমেরই ইচ্ছায় নির্মিত হয়েছিল। Catchedral Church of St. Mary সেই খ্রীষ্টিয়ানদের সুবৃহৎ ধর্মমন্দিরের নাম। তাছাড়া তার যত্নে ও অর্থে ক্যাথলিক ধর্মসম্প্রদায়ের বিস্তার ও পুরিপুষ্টি লাভ করেছিল। দেশীয় প্রোটেষ্টান্টদের জন্যেও বেগম বহু অর্থ দান করেছে। মীরাটে মিঃ রিচার্ডসের উৎসাহে Church Missoary গীর্জাই তার প্রমাণ।

বেগম শুধু ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করেই বাকী জীবন অতিবাহিত করে নি, মানবের কল্যাণের জন্যেও তার মনপ্রাণ নিয়োজিত হয়েছিল। জীবনের অবশিষ্টকাল ধরে শুধু অনাথ, আতুর ও প্রজাদের সাহায্যই করে গেছে। তার সাহায্যে কত দুঃস্থ পরিবার যে মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

শেষের দিনগুলি তার বড় ধীরগতিতে অতিবাহিত হয়েছিল। সরদানার শাসনকর্ত্রীর সেই শেষদিনগুলি দেখে কেউ বিশ্বাসই করতো না, অতীতে এই রমণী কোন এক ঘটনার প্রধান নায়িকা ছিল। সেই অতীত ভোলার জন্যেই যেন তার পরবর্তী দিনগুলি এক মর্মপীড়া নিয়ে এগিয়ে গেছে। তবু কি বেগম সেই কৃতকর্ম ভুলতে পেরেছিল?

টমাস কোনদিনও আর সরদানার আসে নি। বেগমের প্রার্থনানুযায়ী তার প্রিয় সখী মারিয়াকে বিবাহ করে চলে গিয়েছিল। বেগম টমাসের উপকারের জন্যে যে

যৌতুক উপহার দিয়েছিল, তা কখনও কেউ পায় নি। মনে হয়, বেগম তার সমগ্র ধনসম্পত্তির এক চতুর্থাংশ যৌতুকস্বরূপ টমাসকে দেয়। এই যৌতুক প্রদানের মধ্যে বোধহয় বেগমের সেই দুর্বলতাটুকু সংযুক্ত ছিল।

যাই হোক, তারপর আর কেউ কখনও জর্জ টমাসকে সরদানার রাজপুরীতে দেখে নি।

বেগম আরো দীর্ঘদিন জীবিত ছিল। মৃত্যু সে প্রত্যহ উপাসনার সময় প্রার্থনা করতো কিন্তু মৃত্যু ততই বুঝি তার দূরে সরে গিয়েছিল।

রাজ্য ঠিকই তার সুষ্ঠু পরিচালনায় সম্পন্ন হয়েছিল, আর কখনও কেউ তাকে এতটুকু কর্তব্য থেকে বিচলিত হতে দেখে নি। সৈনিকরা নিয়মশৃঙ্খলা মেনে ঠিকই বেগমের অধীনে কার্য করে গিয়েছিল। তারাও আর মাথা তুলতে সাহস করে নি!

সবই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। বেগমের অটল কর্তব্যনিষ্ঠার কাছে আর সবই পদানত। শুধু একটিবারের জন্যে যে ঘটনার মুখোমুখি তাকে হতে হয়েছিল, তারই মূল্য দিতে বাকী জীবনও তার সুখে কাটে নি। বাইরে বেগম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অটল বিশ্বাসী, শাসন পরিচালনায় আর কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন করে নি কিন্তু অন্তরের সঙ্গে সে কখনই সন্ধি করতে পারে নি, সেখানে যেন বিশ্বাসভঙ্গের আঘাতে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। মৃত্যু তাই তার সবসময় কাম্য ছিল। লোকে হয়তো তার অপরাধ বিস্মৃত হয়েছে কিন্তু সে কি করে বিস্মৃত হতে পারে? হতে পারলে অবশ্য সে সুখী হত বেশী কিন্তু হতে পারলো কই? লিভাসোর মৃত্যুও সে ভুলতে পারে না, টমাসের বেদনাও ভোলবার নয়। বাওরসের সেই সোহাগ চিহ্ন যদিও উন্মাদ মনের স্মৃতি, তবু তাও ভুলবে কেমন করে? সব ভুলে সোমরুর মুখটি যদি সর্বদা চোখের সামনে ভেসে থাকতো, তাহলেই যে শান্তি পেত বেশী!

সেও যেমন বেদনাময় স্মৃতি নিয়ে প্রাসাদপুরীর মাঝে বেঁচেছিল, আর ছিল সেই বাহাবেগম। বাহাবেগম এ জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল বলে তার কোন যন্ত্রণা ছিল না। সে তখন অন্য এক অভিনব জগতে গিয়ে পূর্ণ উন্মাদ হয়ে কক্ষে আবদ্ধ হয়ে আছে। তারও যেমন মৃত্যু নেই বেগমেরও তেমনি মৃত্যু নেই।

আগে তবু বহু পরিচারিকার ভিড় ছিল, তাও সে কমিয়ে দিয়েছিল, প্রয়োজন ছাড়া সে কারো সাহায্য নিত না। দরবার, উপাসনার পর বাকী সময়টা তার কাটতো সম্পূর্ণ একাকী এক বন্ধ কক্ষের মধ্যে। সে যেন নিজের কাছেই দিন দিন কেমন যেন ছোট হয়ে আসছিল।

এমনি নিরবিচ্ছিন্ন দিনও তার একদিন অসহ্য হয়ে উঠলো। সংবাদ পেল জাফর ইয়াব সেই দিল্লীর আব্বাসেই বিসূচিকা রোগে মারা গেছে। এখন তার একটি মাত্র কন্যা জুলিয়া এনকে নিয়ে জাফরের বিধবা বড় দুঃখে দিন অতিবাহিত করছে। জাফরের একটি পুত্র সন্তানও হয়েছিল, সেই এলয়সিয়াসও বেঁচে নেই।

বেগম জাফরকে অনেকদিনই ক্ষমা করেছিল। এখন সেই তার কন্যাটিকে ও জাফরের বিধবাকে নিয়ে আসার জন্য উদগ্রীব হল। তার শূন্য প্রাসাদে আর দিন

কাটছিল না। শূন্য প্রাসাদ পূর্ণ করার জন্যেও তাদের দরকার। আর তাদের সাহায্য করা একান্ত কর্তব্য। এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী তো তারাই। জাফর অন্যায় করে ছিল বলে অধিকার হারিয়েছিল কিন্তু অধিকার তো তারই সর্বাগ্রে! সোমরুর স্মৃতি কারা আর বাঁচাবে? যেদিন সে মরে যাবে, সেদিন এই প্রাসাদ এই রাজ্য, এই ধন-কে ভোগ করবে? তার আর কে আছে? পিতৃকুলেও কেউ নেই। স্বামীরও আর কেউ নেই। আর তো কোন সন্তানও হল না।

বেগম কত কথাই এই অবসর মুহূর্তে বসে বসে ভাবতো। এখনও তার সন্তানের জন্যেই বেদনা জাগে। মনে মনে নিজের ছেলেমানুষীর জন্যে হাসে, একদিন সে কি ছেলেমানুষ ছিল। সন্তানের জন্যে সোমরুর সঙ্গে কিরকম কলহ করেছিল। কত স্মৃতি, কত বিড়ম্বনা। কোন স্মৃতি তাকে বেদনা দিত, আবার কোন স্মৃতি তাকে আনন্দ দিত, তবে বেদনার স্মৃতিই বেশী। তার সারাজীবনটা শুধু বেদনার সেতু দিয়ে পার হয়ে গেল। অথচ জীবনকে শান্তিময় করবার জন্যে কত পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

এমনি সময়ে তার রাজ্য নিয়ে আবার চিন্তায় পড়তে হল। রাজনৈতিক আবহাওয়া বড়ই সঙ্কটময়। ইংরেজ শক্তি সমস্ত ভারতকে গ্রাস করেছে। শেষ মহারাষ্ট্র শক্তি জেগেছিল, তার পরাজয় সংঘটিত হল। লর্ড লেক আর্যাবর্তে ও ওয়েলেসলি দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তি নির্মূল করলেন। প্রকৃতপক্ষে এইসময় থেকেই ভারতবর্ষ পূর্ণ ইংরেজাধীন হয়। ১৮০৩ সাল ইংরেজ জাতির জীবনে এক মহা উল্লেখযোগ্য বছর।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী বেগম সরদানায় বসেই বুঝতে পারলো, ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার না করলে আর পরিত্রাণ নেই। তার রাজ্যও থাকবে না, প্রতিপত্তিও শেষ হবে। ইংরেজের অধীন হয়ে বাকী দিনগুলি উদ্বেগহীনভাবে কাটানোর জন্যে আবার এক কৌশল করল। ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে এক নাতিদীর্ঘ পত্র জেমস স্কিনারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবার্ট স্কিনারকে দিয়ে লর্ড লেকের কাছে প্রেরণ করলো। বেগ-মের প্রস্তাব ছিল, সে যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন তার অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে। তার মৃত্যুর পর জায়গীর ইংরেজ অধিকারভুক্ত হবে। বেগমও এই অনুগ্রহের বিনিময়ে আমরণ ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করবে। এখন থেকে তার সৈন্যদলের একদল রাজস্ব আদায় ও আত্মরক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রক্ষিত হবে, অবশিষ্ট সৈন্যদল ইংরেজের অধিকার-ভুক্ত থাকবে।

লর্ড লেক সানন্দে বেগমের সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

ইংরেজ আনুগত্য স্বীকার করে বেগম মৃত্যু পর্যন্ত সগর্বে তার রাজ্যশাসন করে গেল। যতদিন সে বেঁচেছিল, বিরাট ইংরেজশক্তি তাকে একেবারে নির্মূল করে দেয় নি। কেন দেয় নি, তাও যেমনি বিস্ময়কর, আবার বেগমের শক্তিরও প্রশংসা করতে হয়। সমস্ত ভারতের স্বাধীনতা যখন ইংরেজ রাজশক্তির কাছে পরাভব স্বীকার করেছিল, তখন কি এমন মহামূল্যবান স্তুতি জানিয়ে সে ধুরন্ধর ইংরেজদে বশীভূত করলো? যাই হোক মৃত্যু পর্যন্ত তার এই সগর্বে রাজ্য পরিচালনা করা তার আকাশসমান শক্তিকেই প্রমা-ণিত করে। বহু ইংরেজ রাজপুরুষ স্বদেশ থেকে এসে এই রমণীর আতিথ্য গ্রহণ

করেছিলেন, তাঁরা তার ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। তাঁরা বিভিন্ন পত্র-পত্রি এই প্রতিভাশালিনীর সম্বন্ধে বহু প্রশংসা লিপিবদ্ধ করেছেন। বহু ধর্মযাজকও সরদা উপাসনাগৃহে সংলগ্ন আবাসে দীর্ঘকাল কাটিয়ে গেছেন।

দীর্ঘদিন নিঃসঙ্গ জীবনের মাঝে বিচরণ করে একদিন সেই মৃত্যুই বেগমকে পরম শান্তির কোলে টেনে নিল কিন্তু সত্যিই কি বেগম মৃত্যুর পরপারে গিযে শান্তি পেল? নব্বইটি বছর ধরে তার জীবনের প্রদীপ প্রজ্জলিত ছিল। কিন্তু সে প্রদীপ যেমন এক-দিকে উজ্জ্বলতা দান করেছে, তেমনি অন্যদিকে দিয়েছে অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ। সেই অন্ধকার প্রদেশটিই তার অন্তরের সর্বোত্তম বেদনা। জন্মাবার পর তাকে সওদাগরের কাছে বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছিল, যদি সত্যিই সে সওদাগরের কাছে বিক্রি হযে যেত? বহু লক্ষ, কোটি জীবনের কথা নয, একটি জীবন যেন একটি উজ্জ্বল তারা। একটি তারার প্রভাবে যেমন সমস্ত নীহারিকা উজ্জ্বল হযে ওঠে, তেমনি একটি জীবন। বেগম যদি মার ইচ্ছায় নর্তকী হত?

না, সে উপযুক্ত জীবনই পেয়েছিল। জন্ম তার যেমন অভিশাপ নিয়েই পৃথিবীতে আসুক, অভিশাপ তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। তার অন্তর প্রদেশে যে হাহাকারই গাঁথা থাক, বাইরের মানুষ তার সাহচর্যে এক নতুন জীবনের উৎসাহ পেয়েছিল। উপযুক্ত আরো যদি ক্ষেত্র সে পেত, তাহলে পৃথিবীতে তার প্রতিভার মূল্য নতুন এক কীর্তির সূচনা করতো। সামান্য এক অবলা রমণী, সামান্য এক নিঃসঙ্গ রমণী হযে তখনকার দিনের রাজনৈতিক গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত যে আভা বিকরণ করেছিল, সে সামান্য ছিল না।

লুতুফ আলির কথাই এ সূত্রে মনে আসে। জীবনে সে এতটুকু স্থিতি পায নি। আরব থেকে হিন্দুস্তানে এসেছিল কিন্তু আসতে গিয়ে তাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছিল। মূল্য দিয়েও যদি সে কিছু করে যেতে পারতো, তাহলে তার আক্ষেপ থাকতো না। সে মরবার সময় হানিফের কথাই ভেবেছিল, হানিফের দ্বারা কোন মহৎ কাজ হবে না। সেই ভেবেই তার মৃত্যুও শান্তির মধ্যে সংস্থাপিত হয় নি। কিন্তু যদি সে একবারও এই মুন্নার কথা ভাবতো? মুন্না রমণী, রমণী পুরুষের সান্নিধ্যের জন্যে এই পৃথিবীতে এসেছে, তার দ্বারা মহৎ কিছু হতে পারে না বলেই লুতুফের ধারণা ছিল।

সেই ধারণা কি লুতুফ আলির আজ পরিবর্তিত হল না? মৃত্যুর পরপারেও যদি কোন জীবনের উপস্থিতি থাকে, তাহলে লুতুফ আলি তার কন্যার কীর্তিতে মহীয়ান হবে, গর্বিত হয়ে তার বেদনা ভুলবে। আর জেমিলি যে কন্যার ব্যবহারে জীবনকে

অকালে বধ করেছে, সে অনুতপ্ত হবে। বৃহৎ জীবনের এক সম্ভাবনা কন্যার ভেতরে লুকিয়েছিল, তার রশ্মি দেখতে না পাওয়ার জন্যে আক্ষেপ করবে।

বাইরের জগতে মুন্না নিজের প্রতিষ্ঠা দৃঢ়ভিত্তির ওপর সংস্থাপিত করে গেছে, শুধু অন্তরের শান্তিই সে আহরণ করতে পারে নি। অন্তরের শত্রুতাতেই সে পরাভব স্বীকার করে জীবনের আনন্দটুকু হারিয়ে গেছে। হৃদয়ের সেই হাহাকারই তার সমস্ত জীবনকে বিষাদ করে দিয়ে গেল।

সোমরুকে কোনদিনও সে ভালবাসতে পারে নি। বিবাহ করেছিল রাজনৈতিক মিলনকে সম্ভব করবার জন্যে কিন্তু বাইরের সম্বন্ধের সঙ্গে হৃদয়ের যোগসূত্র যে এক নয় একথা তার ধারণাতীত ছিল। যদি সে পূর্বাগ্রে বুঝতে পারতো, তাহলে হয়তো সেদিনই এই মিলনে স্বীকৃতি জানাতো না। তবে নসীবের কারসাজিতে তাকে একদিন রাজ্যেশ্বরী করবে, সুতরাং সে এই ঘটনাকে পরিহার করতো কেমন করে?

যাই হোক, তবু শেষ জীবন পর্যন্ত সেই সোমরুর স্মৃতিই সে বার বার ভেবে গেছে। সোমরুর রাজ্য নিয়েই তার রাজত্ব, সুতরাং স্বামীকে প্রতারণা করে স্বামীর দৌলৎ নিয়ে ভোগ করবে কেমন করে? কিন্তু সবক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের আশ্রয় যে নেওয়া যায় না, তার প্রমাণ এই বেগমের জীবন। সবার সঙ্গে বেইমানী করা যায়, মনের সঙ্গে যে বেইমানী করা যায় না, নব্বুইটি বছর ধরে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী রমণী তার নিদর্শন লক্ষ্য করে গেছে।

সোমরু তার অন্তরের অবহেলিত হলেও সে সোমরুর স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার জন্যে শেষপর্যন্ত বহু পরিকল্পনারই আশ্রয় নিয়েছিল। জাফরের একমাত্র কন্যা জুলিয়া এনকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছিল এই জন্যেই। উত্তরাধিকারী সে পূর্বেই ঘোষণা করেছিল জাফরকে। সোমরু মৃত্যুর আগেই দেখে গিয়েছিল। কিন্তু জাফরের অপরাধের জন্যে বেগম তাকে নির্বাসিত করেছিল। শেষপর্যন্ত কিন্তু সে দণ্ড আর তাকে ভোগ করতে হয় নি। জাফর মরবার পূর্বেই বেগমের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছিল।

যাই হোক বেগম জাফরের কন্যাকে প্রাসাদে স্থান দিয়ে উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিল। উপযুক্ত পাত্রটি আর কেউ নয়, বেগমের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক কর্ণেল ডাইস। ডাইসের অনেকগুলি পুত্রকন্যা হয়েছিল কিন্তু শৈশবেই কতকগুলি মারা যায়। তারপর একদিন জুলিয়া এনও মারা যায়। তখন বেগম এই মা হারার অবশিষ্ট একটি পুত্র ও দুটি কন্যাকে এনে মানুষ করে। এদের মধ্যেই বেগম একদিন তার বৃদ্ধবয়সের শান্তি খুঁজে পেয়েছিল।

কন্যাদ্বয় জর্জিয়ানা, এনা মেরিয়া বয়োপ্রাপ্ত হলে তাদের ইতালীয় বংশের এক যুবক সোলারোলী ও ট্রপ নামে একজন ইংরেজের সঙ্গে বিবাহ দেয়। বিবাহকালে বেগম তাদের বহুমূল্যবান যৌতুক প্রদান করেছিল।

সর্বশেষ কর্নেল ডাইসের পুত্রের প্রতি তার সমস্ত স্নেহ অর্পিত হয়েছিল। সোমরুর প্রপৌত্র বলে তাকে বেগম ডেভিড অকটরলোনী ডাইস সোম্বার নামে অভিহিত করেছিল এবং এই যে তার শেষ উত্তরাধিকারী এ ঘোষণা করতেও অস্বীকার করে নি।

বেগমের মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত এই ডাইসকে উপযুক্ত করার জন্যে সে

তারপর তার মৃত্যু হলে ডাইস সোম্বার বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী সবই ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয়েছিল, তবু যা তা সামান্য নয়। একটা কেন? আরো অনেকগুলি পরিবার প্রতিপালন করা বেগম মরবার সময় তার সঞ্চিত ধনসম্পত্তি বহু তার প্রিয় কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টন দিয়ে গিয়েছিল। বহু প্রতিষ্ঠান তার সাহায্যে পুষ্ট হয়েছিল। বহু গরীব, দুঃখী দানতায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছিল। এমন কি জর্জ টমাসের পুত্রকেও কিছু ধনরত্ন করেছিল।

বেগম তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করে গেছে কিন্তু সরদানার রাজপুরীর বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। ডাইস সোম্বার একদিন বিলাত যায়, সেখানে ভাইকাউণ্ট ভিনসেণ্টের কন্যা মেরী জারভিসকে বিবাহ করে। কিন্তু স্ত্রীর সামাজিক আচার ব্যবহার তার পছন্দ হয় না। স্ত্রীকে আদর্শ পত্নীর মত ব্যবহার করতে বলতে স্ত্রী সে উন্মাদাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। ডাইস সোম্বার ভয়ে ফ্রান্সে পালায়। সেখানেই তার একদিন মৃত্যু হয়।

তারপর তাকে এনে সরদানায় সমাহিত করা হয়।

তার মৃত্যুর পর ডাইসের বিধবাকে লর্ড ফরস্টার বিবাহ করেন। লেডি ফরস্টার একদিন সরদানায় এসে প্রাসাদ ও প্রাসাদ সংলগ্ন ভূমি রক্ষা করতো। একদিন তারও মৃত্যু হয়। তারপর আগ্রার ক্যাথলিক সম্প্রদায় সামান্য মূল্যে প্রাসাদ ও উদ্যান ক্রয় করে খৃস্টান অনাথাশ্রম সৃষ্টি করে।

সরদানার সেই কীর্তি কত তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গেল। বেগমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার উজ্জ্বলতা অস্তমিত হয়েছিল। পড়েছিল বিরাট একটি শূন্যতা তাও একদিন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। শুধু জেগে থাকলো একটি অম্লান স্মৃতিসৌধ। সেই স্মৃতিসৌধ, সেই রমণীর। যে একদিন সরদানার আকাশে বাতাসে তার সগর্ব উপস্থিতি জাগিয়ে রেখেছিল। বেগম মৃত্যুর পূর্বেই তার স্মৃতিসৌধটি তৈরি করিয়েছিল। সেই স্তম্ভের মাঝেও তার প্রখর চিন্তাধারা ও সুপ্রতিষ্ঠিত মনীষার পরিচয় মেলে।

স্মৃতিস্তম্ভের শীর্ষে দেশীয় পরিচ্ছদ ভূষিত বেগম সোমরু। বেগমের দক্ষিণে টুপি হস্তে ডাইস সোম্বার বিষণ্ণবদনে স্তম্ভের ওপর হস্ত ন্যস্ত করে দণ্ডায়মান। বামে মন্ত্রী দেওয়ান রায়সিংহ, পশ্চাতে বিশপ জুলিয়াস সিজর ও বেগমের অশ্বারোহী সৈন্যের সেনাপতি এনজেলো। দ্বিতীয়, প্রজ্ঞার মূর্তি—এক অবগুণ্ঠিতা রমণী দক্ষিণহস্তে একটি সর্প [illegible] চিন্তামগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান। তৃতীয় মূর্তি—কাল, এক স্বর্গীয় দূত বালুকার ঘটিকা যন্ত্র হস্তে বেগমকে সময় দেখাচ্ছে, তার দক্ষিণ হস্তে মশাল নেববার ছলে জীবন দীপ নির্বাণের সূচনা।

স্মৃতিস্তম্ভের বামদিকের প্রথম মূর্তি—মাতৃস্নেহ। একজন রমণী অসীম স্নেহে শিশুপুত্রকে বক্ষে ধরে আছে, বালক প্রতিদানে মাতৃস্নেহের ফলস্বরূপ একটি আপেল জননীকে প্রত্যর্পণ করছে। দ্বিতীয় মূর্তি, প্রাচুর্য—উল্লসিত বদনে একজন রমণী নানা ফল